সানন্দা

পুজো ১৪৩০



পু জো ১ ৪ ৩ ০

সানন্দা

সূ চি প ত্র

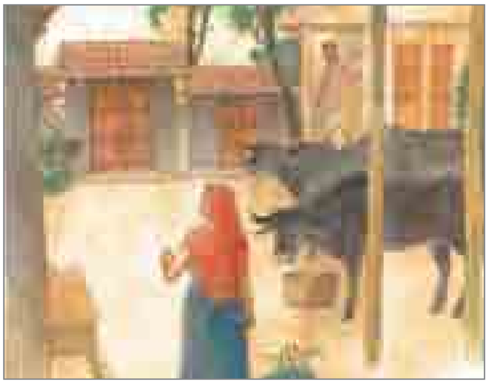








উপন্যাস ১



পারো দরিয়া

বিমল লামা

অসমের মেয়ে পার্বতী 'মোলকি বহু' হয়ে আসে আজাদপুরে। পয়সা দিয়ে কেনা বউ পার্বতীর 'পারো'-প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই তাকে দাঁড় করায় কোন মহাবিপদের মুখে? সে কি পারবে জিততে? পৃ.৩২

উপন্যাস ২



মৎস্য কন্যার ঘাট

মহুয়া চৌধুরী

গোরার স্মৃতি জুড়ে শুধু জেগে আছে পূর্বপুরুষের ভিটে, তালবেড়ে। স্বামীর কাছে প্রতারিত হয়ে জীবনে বীতস্পৃহ জিতা। এদের কোন প্রেরণার মন্ত্র দেয় নীনা? কোন বোধে ঋদ্ধ হয় তারা? পৃ.১৩৪

উপন্যাস ৩



... এবং অপালা আত্রেয়ী

অঞ্জন সেনগুপ্ত

সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা প্রাচীন ভারতীয় নারীদের বিদ্যাভ্যাসের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার খতিয়ান। ঋষি নন, ঋষিকারাই এই কাহিনির কেন্দ্রে। পুরাণের ব্রহ্মবাদিনী নারী অপালা, লোপামুদ্রাদের জীবন-আলেখ্য। পৃ.২৩৪

উপন্যাস ৪



পুতুলপট্টির শামিয়ানা

বীথি ব্রহ্ম

পুতুলপট্টির মৃৎশিল্পী ধীমান পালের হাতে জাদু আছে! সহকর্মীদের জন্য কিছু করতে চায় সে। তার লড়াই কি শেষ পর্যন্ত সফল হয়? কী হয় নিবিড়, তপতী, মল্লিকা, মিঠিদের? পৃ.৩১২

গল্প ১



সমুদ্রযাত্রা

নন্দিতা বাগচী

এক জাহাজের গেস্ট সার্ভিস ম্যানেজার নির্ঝরিণী। জাহাজের অতিথি লিয়ানের সঙ্গে আলাপ কোন যাপনচিত্র মেলে ধরে তার চোখের সামনে? পৃ.৯৬

গল্প ২



ডাক্তারবাবু

শেখর মুখোপাধ্যায়

জিতেন্দ্রলাল, শক্তিনাথ ও অনির্বাণ— তিন প্রজন্মের চিকিৎসক। পিতা এবং সন্তানের মাঝে কোন টানাপোড়েনে ক্ষত-বিক্ষত হন শক্তিনাথ? শেষ পর্যন্ত এক মধ্যরাত্রে কে আসে তাঁর কাছে? পৃ.২১২

গল্প ৩



শান্ত স্যর

শাশ্বতী নন্দী

ছাত্র-অন্তপ্রাণ শান্ত স্যর কেন চড় মারেন ছাত্র রজতাভকে? স্কুল থেকে কি বিতাড়িত হতে হয় তাঁকে? না মুখোমুখি হন নতুন কোনও দায়িত্বের? পৃ.৩০০

অফবিট

COFFEE কথা

জন্মলগ্ন থেকে যৌবন... কফির এই যাত্রাপথ কম রোমাঞ্চকর নয়! উৎপাদন থেকে নানা পদ্ধতি পেরিয়ে থাকছে কফি তৈরির গল্প। পৃ.১৬৬

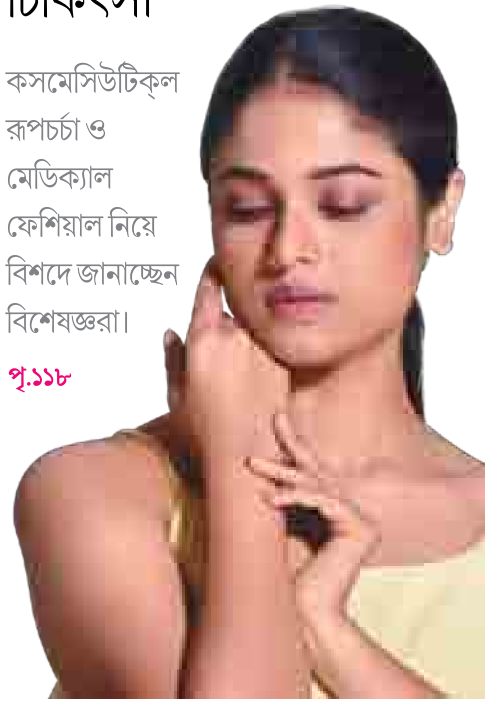


বিউটি বৃত্তান্ত ১

রূপকথার চিকিৎসা

কসমেসিউটিক্যাল রূপচর্চা ও মেডিক্যাল ফেশিয়াল নিয়ে বিশদে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

পৃ.১১৮



ফ্যাশন ফ্রেম ১

আশ্বিনে ‘আনন্দ’ধ্বনি

আশ্বিনের স্নিগ্ধ নীল আকাশ বার্তা দেয়, মা আসছেন। দেবীর আগমনে আকাশে বাতাসে বেজে ওঠে আনন্দ ধ্বনি। ষষ্ঠীর বোধন থেকে দশমীর বিসর্জন, দেবী আরাধনার সাজ চিরন্তনী ‘আনন্দ’ শাড়ির সঙ্গে। পৃ.২০



বিউটি বৃত্তান্ত ২

নতুন ট্রেন্ড J BEAUTY

কোরিয়ান রূপচর্চার পাশাপাশি সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে ‘জে বিউটি’। থাকছে জাপানের রূপচর্চার সেই কাহিনি। পৃ.২৩০





ফ্যাশন ফ্রেম ২

FESTIVE ফিউশন

পুজোর পাঁচদিন চাই গ্ল্যামারাস ও এলিগ্যান্ট সাজ। ডিজ়াইনার কালেকশনে অভিনেত্রী উষসী রায়-এর পুজোর ফ্যাশন ফাইল।

পৃ.১২৪



ফ্যাশন ফ্রেম ৩

দক্ষিণের শাড়ি-সংস্কৃতি

দক্ষিণ ভারত শাড়ি-বৈচিত্রে ঋদ্ধ। তামিলনাড়ু, কর্নাটক, অন্ধ্র প্রদেশ, তেলঙ্গানা ও কেরল... রইল পাঁচ রাজ্যের শাড়ির বুনন-কাহিনি।

পৃ.২১৮



ফ্যাশন ফ্রেম ৪

পশ্চিমি পোশাকে উৎসবের রং

পুজোয় সাজ তালিকায় রইল এক্সপেরিমেন্টাল পশ্চিমি পোশাকের কালেকশন।

পৃ.২৬২

ফ্যাশন ফ্রেম ৫

‘আনন্দ’-এ অপরূপা

আনন্দময়ীর আগমনে কখনও সাবেকি ধারায়, আবার কখনও আধুনিকা রূপে ‘আনন্দ’ শাড়ির ক্যানভাসে ধরা দিলেন অভিনেত্রীরা।

পৃ.২৭৮



ফ্যাশন ফ্রেম ৬

The RETRO Man



পোশাকে ও মেজাজে ভিনটেজ ভাইবস। সাত, আট বা নয়ের দশকের পাশ্চাত্য পুরুষের সাজ-অনুপ্রেরণায় তৈরি পাঁচটি বিশেষ লুকে ধরা দিলেন অভিনেতা ইন্দ্রাশিস রায়।

পৃ.৩৬০



ফ্যাশন ফ্রেম ৭

The Abstract Atelier

নিময় মাফিক প্রিন্ট, প্যাটার্ন থেকে বেরিয়ে পুজোর ফ্যাশন ফ্রেমে তুলে ধরা হল অ্যাবস্ট্র্যাক্ট প্রিন্ট ও মেক-আপের নতুন ট্রেন্ড।

পৃ.৩৬৫

ফ্যাশন ফ্রেম ৮



রূপে-অরূপে অষ্টনায়িকা

অভিসারিকা থেকে স্বাধীনভর্তৃকা, বৈষ্ণব পদাবলীতে রয়েছে নায়িকার ভাবের আট বৈচিত্র। তুলে ধরা হল অষ্টনায়িকার সাজকথা। পৃ.৩৮৬

ফ্যাশন ফ্রেম ৯

উৎসবে উজ্জ্বল সাজ



শক্তির প্রতীক লাল। দেবী শক্তির আরাধনায় ডিজ়াইনার সরোজ ও হর্ষবর্ধন জালান-এর এক্সক্লুসিভ সাজে অভিনেত্রী তৃণা সাহা। পৃ.৪০৮

রসনাবিলাস ১

পার্বণী অন্নভোজ

ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে উৎসবে ভোগ দেওয়া হয়, যার মূল উপকরণ চাল। রইল তেমনই কিছু পদ। পৃ.৭৬



রসনাবিলাস ২

ভিন্ন স্বাদের মাটন স্টার্টার

অনুষ্ঠান বাড়ি হোক বা ঘরোয়া খাবার, স্টার্টার যদি হয় মাটন-ময়, লোভ সামলানো যায় কি? রইল ছকভাঙা কিছু মাটনের স্টার্টার। পৃ.৯০



রসনাবিলাস ৩

ইউরোপীয় স্বাদ সমাচার

পর্তুগাল থেকে ইংল্যান্ড—ইউরোপের দশ দেশের বারোটা অথেনটিক রেসিপি। পৃ.১০২



রসনাবিলাস ৪ (পর্ব ১)

নানা রাজ্যের মাছের স্বাদ...

দক্ষিণ ভারত ও উপকূলীয় এলাকার হরেক স্বাদের মাছের রেসিপির সংকলন। পৃ.১৭৬



রসনাবিলাস ৪ (পর্ব ২)

মাছে ভাতে...



বাংলার বাইরে উত্তর ও উত্তর-পূর্বের মাছের নানা স্বাদের রেসিপির হদিস থাকছে এবারের সংখ্যায়। পৃ.১৮৬

রসনাবিলাস ৫

মশলাদার মিষ্টি



মিষ্টিতে মশলা! নয় কেন? মিষ্টির স্বাদ আর মশলার খাদ্যগুণকে এক করে, পাত সাজানো হল। পুজো মধুময় হোক! পৃ.২৭০

দৃষ্টিকোণ



কলকাতা-কোরিয়া ‘কানেকশন’

কলকাতার কোরিয়ানরা কতটা মিশতে পেরেছেন বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে? হালফিলের ‘কে-কালচার’-এর জনপ্রিয়তাই বা কতটা কলকাতায়? পৃ.১৩০

রম্য রচনা



যন্ত্রের কানে প্রেমের মন্ত্র

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কোথাও কোথাও হয়ে উঠছে মানুষের একাকিত্ব কাটানোর সঙ্গী। টলমল পায়ে সবে হাঁটতে শেখা এক যন্ত্রকে প্রেম নিবেদন? সম্ভব? পৃ.৩৫৬

ট্র্যাভেল TALK

মন কেমনের রং



অ্যামস্টারড্যামের অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে রয়েছে যত রং, তত গল্প। শিল্পের ও শিল্পীদের কথা। জীবন ও প্রেমের কথা। রইল ভ্রমণের আলেখ্য। পৃ.২০৪

দে শ বি দে শ

এক টুকরো ভিয়েতনাম

হ্যানয় থেকে হ্যালং, ভিয়েতনামের এক রোমাঞ্চকর ভ্রমণকাহিনি। পৃ.৪০২



ফি ট নে স ১

অ্যাপে ফিটনেস চর্চা



ফিজ়িক্যালি অ্যাক্টিভ থাকুন ফিটনেস অ্যাপের সাহায্যে। যার ফলে বাড়বে ইমিউনিটি। রইল আলোচনা। পৃ.১৭২

ফি ট নে স ২

রেইকি ও ভাল থাকা

হাতের তালুর ব্যবহারেই পাওয়া যায় জীবনীশক্তি। থাকছে রেইকি নিয়ে আলোচনা। পৃ.৩৭০



Screen সংবাদ ১

অপরিহার্য চরিত্রাভিনেতারা



এঁরা প্রত্যেকেই একাধিক মাধ্যমে চুটিয়ে কাজ করেন। তথাকথিত মুখ্য চরিত্র না হয়েও সিনেমা, সিরিয়াল বা ওটিটি-তে সমান জনপ্রিয়। বহুমুখী চরিত্রে সাবলীল অভিনেতাদের সাক্ষাৎকার। পৃ.১৯৬

Screen সংবাদ ২

পর্দায় ভয়

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভূতের সিনেমার ধরন পাল্টেছে হলিউড ও বলিউডে। বিষয়ভাবনা হোক বা কৌশল, বিবর্তন ঘটেছে সব ক্ষেত্রেই। রইল বিশেষ আলোচনা। পৃ.৩০৬



কথোপকথন ১



মুখোমুখি সুধা চন্দ্রন

দুর্ঘটনায় পা হারানোর পরে তাঁর প্রত্যাবর্তনের গল্প অনুপ্রেরণা দেয় অনেককে। নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রীর দ্বৈতসত্তায় সমান উজ্জ্বল সুধা চন্দ্রন। **পৃ.২৬৬**

কথোপকথন ২



মুখোমুখি জয়িতা সেন

কর্পোরেট সংস্থার কর্ণধার জয়িতা সেন অল্প বয়সেই পৌঁছেছেন সাফল্যের চূড়ায়। হয়ে উঠেছেন বহুজনের অনুপ্রেরণা। রইল তাঁর সাক্ষাৎকার। **পৃ.৩৮০**

ফোটোফিচার ১



চোখে পাখির রং...

উৎসবের মরসুমে মন থাকে পাখির মতো মুক্ত, রঙিন। এবারের পুজোয় চোখে থাকুক পাখির পালকের ক্যানভাস। রইল তার সাজ প্যালেট। **পৃ.২৮৮**



ফোটোফিচার ২

Holographic Look

মেক-আপে উজ্জ্বল রং, শিমারড ও গ্লিটারি এফেক্ট। একটু ছকভাঙা ও বোল্ড সাজতে গেলে বেছে নিতে পারেন হলোগ্রাফিক মেক-আপ। **পৃ.৩৭৬**

অন্দর কাহিনি



মুখোমুখি চিত্রা বিশ্বনাথ

পরিবেশ-বান্ধব বাসস্থান ও রেন ওয়াটার হারভেস্টিং নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। রইল তাঁর বাড়ির সাজ। পৃ.২৯৪

প্রচ্ছদ: নুসরত জাহান

ছবি: সোমনাথ রায়, **মেক-আপ:** বাবুসোনা সাহা, **ফোন:** ৮২৪০৫৫০৮৮৪
হেয়ার: অবিনাশ ভৌমিক, **ফোন:** ৮৫৮৪৯১৩৭১২, **স্টাইলিং:** কিয়ারা সেন, **ফোন:** ৯০৫১৪৭৩৬০৬,
গয়না:অঞ্জলি জুয়েলার্স, **ফোন:** ০৩৩ ২৪৪০৮৬৩৬, **লোকেশন ও হসপিটালিটি:** অঞ্জলি কুঞ্জ (বারুইপুর)
ফোন: ৯৮৭৪১৬০২০৭

শাড়ি: আনন্দ
কুইন্স ম্যানসন ১৩ রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১, **ফোন:** ২২২৯২২৭৫, ৯৬৭৪৩৯২২৭৫

সম্পাদক: পায়েল সেনগুপ্ত

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিঃ সিপি-৪, সেক্টর ফাইভ, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১ থেকে মুদ্রিত।

RNI Regd No. 44046/86

Edited by Payel Sengupta and printed and published by Pradipta Biswas on behalf of ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001. Printed at Ananda offset Pvt. Ltd, CP-4, Sector V, Salt Lake City, Kolkata- 700091



উপনিষদ জানিয়েছে, "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ..." অর্থাৎ আমরা সকলেই অমৃতের সন্তান, আমাদের অন্তর্শক্তিতে কোনও নেতিবাচকতা নেই। কিন্তু কী এই অমৃত? সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, নিশ্চিন্ত আরাম? তাই কি অপার শান্তি? কথায় কথায় আমরা যে তবে মায়ের কাছে বলি, 'শান্তি দাও,' কী সেই শান্তি? সৃষ্টির আদি থেকে সেই শান্তির খোঁজে মিলিত হয়েছে পৃথিবীর সমস্ত দর্শন। নিজেদের মতো করে আমরা তার ব্যাখ্যা করে নিয়েছি। কখনও তাকে খুঁজেছি গৃহকোণে, কখনও তাকে বিস্তীর্ণ আকাশের তলায়। সম্পূর্ণ তাকে কোথাও পাইনি। এই না পাওয়াই জন্ম দিয়েছে 'অপেক্ষা' শব্দের। আপাতত তাই আমরা সেই শান্তি ও অপেক্ষার মধ্যবর্তী সেতুতে দোদুল্যমান। আমাদের চারপাশ ভেসে যাচ্ছে রক্তে-বিস্ফোরণে। 'মা' বলে যাদের ডেকেছি, তাদের সম্মান রক্ষা করতে না পারার প্রমাণ নিয়ে আমরা নিশ্চুপে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি, মাঝে-মাঝে কিছু শব্দজাল তৈরি করছি, সমাধানের এক প্রহেলিকা তৈরি করে সান্ত্বনা দিচ্ছি নিজেদের, এ-ও তো একধরনের শান্তি, তাই নয় কি? তা হলে কি বলতে পারি এই শান্তির অপর নাম স্বার্থপরতা? মস্তিষ্ক যখন প্রশ্ন ভারাক্রান্ত, মনের ভিতর উত্তরের হা-হুতাশ, প্রয়োজন তখন সমর্পণের। স্বার্থপরতা কখনও সমাধান নয়। নিজের শান্তি যখন অন্যকে আঘাত করে, তা এক অশান্ত অন্যায়। এই অন্যায় যে প্রশ্রয়যোগ্য নয়, সেকথা বোঝাতেই মা আসেন প্রতিবছর। ভিতরে-বাইরে নানাবিধ বিস্ফোরণে কেঁপে যাওয়া যেসব রক্তাক্ত মানুষ বারবার পড়ে গিয়েও উঠে দাঁড়াচ্ছে, মায়ের আশীর্বাদধন্য হোক তারা। 'মাতৃ'সুখ যাঁরা দিতে পারেন, মা সর্বতোভাবে তাঁদের হোন! আমরা অমৃতের সন্তান। আমাদের শরীর থেকে ক্ষরিত হোক, রক্ত নয়, মধু! প্রবাহিত হোক সুবাতাস, সুশীলা নদী, সমস্ত জগৎ হোক অমৃতময়..."মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ/ মাধ্বীর্ণ সন্তোষধিঃ...."



বারো মাস পর আইলি উমা

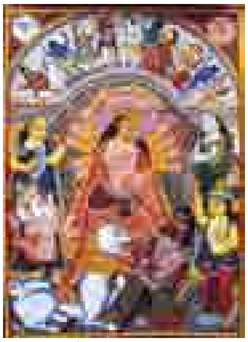
এক বছরের প্রতীক্ষার পর দুর্গাপুজোয় আরও একবার বেঁচে ওঠে বাংলার হারাতে বসা লোকশিল্প। তেমনই কিছু লোকসংস্কৃতির কথা রইল। কলমে দেবলীনা অধিকারী।



মাটির পটের দুর্গা, ছবি: প্রদীপ মাহাতো

কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় পল্লীগ্রামের দুর্গাপুজোর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, "এমন সময় বাবুদের বাড়িতে সন্ধ্যার আরতি-সূচক শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসি, ঢাক, ঢোল ও নহবৎ বেজে উঠলো। .... বাড়িতে 'গোপাল অধিকারীর' যাত্রা...তারা রাত নটা বাজতেই খোল-কত্তালে চাঁটি মারতে লাগল" এই বর্ণনা ১৮৬২ সালের গ্রাম বাংলার দুর্গাপুজোর। তারপর চলে গিয়েছে প্রায় ১৬১ বছর। জমিদার বাড়ির অনেক পূজাই পরিণত সার্বজনীন বারোয়ারি পুজোয়। সাবেকি সহজতার জায়গায় স্থান পেয়েছে থিমের উৎকর্ষতা। আর খোল করতাল, মাদল, ধামসার জায়গায় এসেছে কনটেম্পোরারি গান, চাঁদোয়া টাঙিয়ে যাত্রার বদলে জনপ্রিয় হয়েছে ডিজে নাইট বা সান্ধ্য

পটদুর্গার প্রচলন হওয়ার একটা বড় কারণ রাজনৈতিক ও বিদেশি শক্তির আগ্রাসন, অর্থনৈতিক বিপন্নতা, সহজ বহন যোগ্যতা, বর্গি হাঙ্গামা



পটের দুর্গা



ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ির পটদুর্গার পুজো। ছবি: দেবরাজ ঘোষ



বর্ধমান রাজবাড়ির পটদুর্গা। ছবি: উদিত সিংহ



বর্ধমান দেবেন্দ্রবাড়ির পটদুর্গা। ছবি: অর্পণ সিংহ

জলসা। তবে পুজোকে কেন্দ্র গড়ে ওঠা লৌকিক সংস্কৃতিতে এখনও একেবারে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে যায়নি। প্রত্যেকবার বাংলার হারিয়ে যেতে বসা ঢাকের বাদ্যি, ধুনুচির ধোঁয়া, ছৌ নাচ, সঙের গান, পটের চিত্র হঠাৎ করেই এই সময় বড় বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। পুজোয় ধূপ-ধুনোর মধ্যে দিয়ে শহরের মণ্ডপে আসতে থাকে গ্রাম-বাঙলার ধুলো-মাটির সোঁদা গন্ধ। দুর্গা ঠাকুরের বিরাট যৌথ পরিবারে আবার প্রাণ পায় গ্রাম বাংলার শিল্প-সংস্কৃতি।

পট শিল্প

এ গল্প কালীঘাটের পট শিল্প জনপ্রিয় হওয়ার অনেকটা আগের। তখনও ভারত ইংরেজ শাসনের সঙ্গে পরিচিত হয়নি। বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমানে এই পটের দুর্গার চল অধিক পরিমাণে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে 'দুর্গাপট' প্রবন্ধে আদিত্য মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, পটের প্রচলনের একটা বড় কারণ রাজনৈতিক ও বিদেশি শক্তির আগ্রাসন, অর্থনৈতিক বিপন্নতা, সহজ বহন যোগ্যতা, বর্গি হাঙ্গামা ইত্যাদি। এ কথা পুরোটা সত্য হলেও সম্পূর্ণও হয়তো নয়। এর কারণ খুঁজতে গেলে চলে যেতে হবে বইয়ের পাতায়। পট কথাটা এসেছে সংস্কৃত 'পট্ট' থেকে। যার অর্থ কাপড়। এর উল্লেখ আছে 'হরিবংশ', 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা', 'উত্তর রামচরিত' প্রভৃতি হাজার বছরের পুরনো বইয়ে। বেদান্তের পঞ্চদশী গ্রন্থে 'চিত্রদীপ' নামে এক পরিচ্ছেদ আছে, যেখানে চিত্রের চার অবস্থার কথা বলা হয়েছে। সেখানে 'ধৌত' ও 'রঞ্জিত' এই দুই অবস্থার সঙ্গে পট শিল্পের সাযুজ্য আছে বলে মনে করা হয়। গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর 'প্রাচীন শিল্প পরিচয় চিত্রবিদ্যা' প্রসঙ্গে বলেছেন, চিত্র সাধারণত পটে ও ভিত্তিতে আঁকা হত। তবে? শুধু হানাহানি ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থাই যে পটের দুর্গা সৃষ্টির একমাত্র কারণ যে নয়, সেটা মোটের উপর বলাই চলে। তাহলে অন্য কারণ কী? উল্লেখ রয়েছে চৈতন্য চট্টোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপদ রায়চৌধুরীর 'দুর্গাপূজা-চিত্রাবলী'তে। প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় যাতে প্রত্যেকে দেবীর রূপ দর্শন করতে পারে তাই বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ব্রত



ছৌ নাচের পোশাক

পট কথাটা এসেছে সংস্কৃত 'পট্ট' থেকে। যার অর্থ কাপড়। এর উল্লেখ আছে হরিবংশ', 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা', প্রভৃতি হাজার বছরের পুরনো বইয়ে।



হাতিবাগানের দুর্গামণ্ডপে পুরুলিয়ার ছৌ নাচ। **ছবি:** বিশ্বরূপ দত্ত

> পটকে নানা দেশজ রঙে রাঙিয়ে তোলা হয়। সেই জন্য গাছের পাতা, ফুলের রস, গাছের আঠা, ভুসো কালি, ইটের গুঁড়ো, সাদা খড়ি, আলতা, সিঁদুর, কাঠ-কয়লা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।



ছৌ নাচের মুখোশ

কথা ও উৎসবে আলপনা ও পটের মূর্তি স্থান পায়। পশ্চিমবঙ্গে মূলত দু'ধরনের পট পাওয়া যায়। পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক বিষয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত জড়ানো পট ও পুজো পার্বণে চৌকো পট ব্যবহার করা হয়।

পটের রূপ-রং: জড়ানো পট সাধারণত ১৫ থেকে ৩০ ফুট লম্বা হয়, চৌকো পট আকারে ছোট হয়। কাপড়ের উপর কাদা, গোবর, মাটি লেপে তৈরি হয় পটের জমিন। সেই জমিনে তুলির টানে মৃণ্ময়ী দেবী ছবি রূপে জায়গা পায় পটে। পটকে নানা দেশজ রঙে রাঙিয়ে তোলা হয়। সেই জন্য গাছের পাতা, ফুলের রস, গাছের আঠা, ভুসো কালি, ইটের গুঁড়ো, সাদা খড়ি, আলতা, সিঁদুর, কাঠ-কয়লা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। তুলি হিসেবে ব্যবহার করা হয়, পশুর লেজের চুল ও পাখির পালক।

পটুয়াদের ধারা: এলাকাভেদে এঁদের নামের পরিচিতি বদলে যায়। পটুয়া, চিত্রকার, পটিকার, পটিদার ইত্যাদি অজস্র নামে এঁদের পরিচয়। এর সঙ্গে গানও হয়। জাতিধর্মেরও এক নিজস্ব ধারা গড়ে উঠেছে এই পট শিল্পকে কেন্দ্র করে। চিত্রশিল্প, সঙ্গীত রচনা করা ও গায়কি বাংলার এক লোকায়ত জীবন-জীবিকা। যাই হোক আসা যাক দুর্গা-পট প্রসঙ্গে। রমেশ বসুর 'বাংলার প্রাচীন চিত্র ও পট' বইটা পড়া থাকলে একটা কথা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, প্রাচীন প্রাপ্ত পটগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই হল দুর্গা-পট।

বংশ-পরম্পরা ও রীতি:
বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অনেক জায়গায় মূর্তি পুজোর বদলে এই পটের পুজো হয়।এমনই কয়েকটি জমিদার বাড়ি ও পটের-দুর্গার উল্লেখ রইল—

মেদিনীপুর: ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ির পট দুর্গার বয়স প্রায় শতাধিক বছর, যা সর্বেশ্বর মল্ল উগাল ষণ্ড বাহাদুরের সময় থেকে চলে আসছে। এই জেলার আরও এক বিখ্যাত পুজোর নাম হাসিমপুরের দত্ত বাড়ির পুজো, যার বয়সও প্রায় দেড়শো বছর। পূর্বপুরুষ হংসনারায়ণ দত্ত এই পট-মূর্তির পুজো শুরু করেছিলেন। বাঁশের কাঠামোর সঙ্গে কলাগাছের খোলের উপর শোলার পাতযুক্ত কাগজে ফুটিয়ে তোলা হয় দেবীকে। আনুমানিক ছয় ফুট উচ্চতা ও পাঁচ ফুট চওড়া এই পট-দুর্গার কাঠামো। একে স্থানীয় ভাষায় 'মেড়' বলা হয়।

বর্ধমান: এবার যাওয়া যাক ধানের শহর বর্ধমানে। এই শহরের দাস বাড়ির পট-দুর্গার উচ্চতা প্রায় ছফুট, প্রস্থে পাঁচ ফুট। প্রায় শতাধিক বছর আগে দেবেন্দ্রলাল দাস এই পটের পুজো শুরু করেছিলেন। মনে করা হয় শরিকি ঝামেলার জন্য পৃথক মৃণ্ময়ী রূপ তৈরি করতে সময় বেশি লাগত। তাই এই পুজোর প্রবর্তন। গুসকরার পাত্র বাড়ির পট দুর্গাও বিখ্যাত। অখণ্ড শাল কাঠের উপর কাপড় জড়িয়ে এই পট তৈরি করা হয়। এখানেও প্রচলনের কারণ হিসেবে মনে করা হয় শরিকি বিবাদ।

বাঁকুড়া: বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের পটদুর্গার প্রাচীনত্বও ও ঐতিহ্য দুই-ই আছে। বংশ পরম্পরায় শহরের ফৌজদাররা এই পট তৈরি করেন। তিনটি আলাদা আলাদা পটের মূর্তি আছে এখানে। বর ঠাকুরানি, মাইতন ঠাকুরানি ও ছোট ঠাকুরানি নিয়ে তৈরি এই পটদুর্গা। এই পট বিসর্জন হয় না, পুজোর পর সারা বছর মন্দিরেই রাখা হয়। স্থানীয় মানুষেরা মাইতন ঠাকুরানিকে কলাবউ ও ছোট ঠাকুরানিকে পাটেশ্বরী বলে থাকেন।

বীরভূম: এখানেও অনেক জমিদার বাড়িই পটের দুর্গা পুজোর জন্য বিখ্যাত। নানুর থানার হাটসেরান্দি গ্রামের চট্টোপাধ্যায় বাড়ির পুজো, ঘোষ বাড়ি, মণ্ডল বাড়ির পট দুর্গা উল্লেখযোগ্য। উপরের প্রায় প্রত্যেক পট-দুর্গার বয়স আনুমানিক দুশো বছর।

ছৌ নাচের ছন্দে

চারিদিকে ধামসা-মাদলের বোল আর তার সঙ্গে মুখোশ সহযোগে অ্যাক্রোব্যাটিক ছন্দে চলে অদ্ভুত বীর রসাত্মক নৃত্য। এই অপূর্ব দৃশ্য পুরুলিয়ার ছৌ নাচের। নীল আকাশে যখনই কাশফুলেরা তিরতির করে মাথা নাড়ায় তখনই পুরুলিয়া গমগম করে ওঠে ছৌ নাচের মহড়ায়। 'ছৌ' শব্দটি এসেছে ছাউনি থেকে। পুরুলিয়া ছাড়াও বিহারের ময়ূরভঞ্জ, ঝাড়খণ্ডের সরাইকেলাও ছৌ নাচের জন্য বিখ্যাত। এই নৃত্যের জন্মের সময়টা আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দী। কালাপাহাড় ও বর্গিদের আক্রমণের হাত থেকে মুক্তি পেতে গড়ে উঠেছিল ছৌ বাহিনী। এই নৃত্যের ভঙ্গীতেই আছে সেই যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় তালিমের মুদ্রা। তাই একে যুদ্ধ নৃত্যও বলা হয়। এই নৃত্য মূলত পুরুষ প্রধান। তবে বাকি জায়গার থেকে পুরুলিয়ার নৃত্যের কিছু পার্থক্য আছে। এখানের ছৌ নাচে রাজার আভিজাত্যের বদলে আছে পুরুলিয়ার লাল পাথুরে মাটির স্বাদ। কাহিনিতে মূলত দেব-দেবীর বর্ণনা থাকে। বর্ণিত হয় দুর্গা-পালা, মহিষাসুরমর্দিনী পালা। অসুরের চরিত্রে লম্ফ-ঝম্ফ অনেক বেশি হয়। তাঁর নৃত্য ভঙ্গি হয় অ্যাক্রোব্যাটিক। 'লার্জার দ্যান লাইফ' চরিত্রে ধীর ক্লাসিক মুদ্রায় আসেন ছৌ নাচের দেবী দুর্গা। স্টেজে সিংহ ও মহিষের বেশে যাঁরা আসেন তাঁদের ক্ষিপ্রতায়, ভঙ্গীতে থাকে পশুর চলন। আর থাকে লম্ফ-ঝম্ফ ও লড়াইয়ের মুদ্রা। উজ্জ্বল হলুদ, সবুজ ও লাল পোশাকে সজ্জিত হয়ে আসেন তিনি। তাঁর মুখোশ ও গয়না রঞ্জিত থাকে লাল রঙে। অসুরের পোশাক সাধারণত



ছৌ নাচের দৃশ্য

হয় কালো ও লাল রঙের। ছৌ নাচের মুখোশ সাধারণত মাটির হয়ে থাকে। ময়ূরভঞ্জ, সরাইকেলার চেয়ে এই মুখোশ অনেক বেশি ভারী হয়। অসুরের মুখোশ অনেকটা বড় হয়। হাঁ মুখ, মুখের উপর কোঁচকানো চুল ও মোটা ভ্রূ এই হল তাঁর মুখোশের বাহ্যিক রূপ। দুর্গার মুখের আদল হয় স্নিগ্ধ। স্মিত হাসি থাকে মুখোশের গড়নে। ময়ূরের পালক, জুট, প্লাস্টিকের ফুল, এমব্রয়ডারি সাজে সজ্জিত থাকে মুখোশের সাজ। গোল করে এই নৃত্য প্রদর্শিত হয়। অন্ধকার নেমে এলে ধামসা-মাদলের ছন্দে শুশুনিয়া পাহাড় মেতে ওঠে বীর রসাত্মক নাচের তালে। সরাইকেলার ছৌ নৃত্য জাতীয় মঞ্চে প্রদর্শিত হয়। কিন্তু ব্রাত্য থাকে পুরুলিয়ার এই ছৌ নাচ। তবে কলকাতার পুজোর কার্নিভাল হোক বা পুজোর মণ্ডপ, এই চারদিন যেন বড় জীবন্ত হয়ে ওঠে বাংলার এই আদিম লোকনৃত্য।



বাংলার সঙের গান

দুর্গাপুজোর সঙ্গে আরও একটা প্রথা জড়িয়ে আছে, তা হল যাত্রা পালা, সঙের গান, বহুরূপী প্রথা। এই সবগুলোই প্রাচীন বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি। শোনা যায়, পল্লিগ্রামে অন্তঃপুরবাসীরাও চিকের আড়াল থেকে যাত্রা পালা, কবির লড়াই দেখত। বসত সঙের গানের আসর, পুতুলের মেলা। সেই ঐতিহ্য আধুনিকতার ঠেলায় প্রায় উঠতে বসেছে। কেবল পুজোকে কেন্দ্র করে আজও কোথাও বেঁচে আছে। মধুবাটি, শিবরামবাটি, বিশ্বেশ্বরবাটি, শিমুলপুকুর প্রভৃতি গ্রামে সঙের আসর বসত। বর্ষণ শেষের আনন্দে, ঝলমলে শরতের আকাশে মা আসছে। তাই ফসল ভাল রাখার উদ্দেশ্যে নারী-পুরুষ মিলিত ভাবে এই গান গাইতেন। সঙের পালা রচনা করতেন গ্রামের কবি শ্রী মথুরা মোহনমালিক। বটতলার সঙের গান আবার একটু অদ্ভুত, শহুরেও বটে। সেখানে শিবঠাকুরের মূর্তি তৈরি করে সঙের দল বাড়ি বাড়ি ঘুরতেন। যে বাড়িতে গৌরীমূর্তি পুজো করা হত, সেখানে সঙের দল উঠতেন। তাঁরা যেন বরযাত্রী। ফল মিষ্টি খেয়ে পরেরদিন হর গৌরী নিয়ে বিসর্জনের মিছিল বের করতেন তাঁরা। বীরভুমের কুরুম গ্রামের লোকেরাও নানারকম সঙ সেজে বের হতেন। কেউ সন্ন্যাসী তো কারোর হাতে বিরাট ত্রিশূল। মুখোশ পরে তাঁরা গ্রাম পরিক্রমা করতেন। এঁদেরকে অনেকে বহুরূপীও বলেন। চুঁচুড়া ও কৃষ্ণনগরের ছিল বসা পুতুল। পুজো উপলক্ষে তাঁরা নানারকম পুতুল নির্মাণ করতেন। তাঁদের গড়ন এতটাই নিখুঁত ছিল যে প্রসিদ্ধ হতে লাগল কৃষ্ণনগর। শোনা যায় কলকাতা থেকেও লোকে এই পুতুল দেখতে আসতেন। পরবর্তীকালে কলকাতাতেও আসে বসা পুতুলের এই চল। ডিহি এন্টালি রোডের দেবনারায়ণ দেব দুর্গাপুজোতে বসা পুতুলের প্রচলন শুরু করলেন। চণ্ডীমাহাত্ম্য অবলম্বনে দেবীর অসুর বধের বিভিন্ন মূর্তি সুন্দর করে সাজানো হত। বাংলার বাইরেও দুর্গাপুজো অবলম্বনে সঙের গান ও পুতুল সাজানোর প্রথা দেখা যায়। বেনারস, এলাহাবাদ, মির্জাপুর প্রভৃতি শহরেও দুর্গাপুজোয় রামলীলার চৌকি বসে। সেখানে



পুরুলিয়ার ছৌ নাচের দৃশ্য



মণ্ডপে ঢাকির দল



পুজোর আমেজে কলকাতা

নানা পুতুল সাজানো থাকে। নানা রকম গান হয়। বাংলা থেকে নানা কারণে এই আদিম সংস্কৃতি প্রায় অবলুপ্ত। শহুরে জাঁকজমক, মাইকের আওয়াজের মাঝে খোয়া গেছে বাংলার এই নিজস্ব গৌরব।

ঢাকের বাদ্যি ও ধুনুচির তালে

যুদ্ধক্ষেত্রে গম্ভীর নিনাদ সৃষ্টি করতে ঢাকের ব্যবহার হত। যার আওয়াজকে ডঙ্কা বলা হত। ঢাকের মুখের ব্যাস হয় দেড় হাত পরিমাণ। যেদিকে বাজানো হয় সেইদিকের চামড়া পুরু হয়, ওপর দিক হয় অপেক্ষাকৃত পাতলা। রয়েছে আলাদা ঢাকের নাম—ঢাক, জয়ঢাক, বীরঢাক ইত্যাদি। ঢাকের বোলও অত্যন্ত জটিল। যাঁরা বংশানুক্রমে ঢাকে বোল তোলেন তাঁদের বিশ্বাস এই বোল স্বয়ং মহাদেবের সৃষ্টি। দুর্গাপুজোয় যে বোল আমাদের মহিত করে রাখে তার মধ্যেও বৈচিত্র আছে। দেবীর বোধনে, ঘুম ভাঙাতে, পূজা চলাকালীন, আরতির সময় ও বিসর্জনে এর বোল পৃথক। যদিও অর্থনৈতিক বিপন্নতা হানা দিয়েছে সেই বোলেও। ঢাকের আওয়াজ আমাদের কাছে পুজোর আমেজ নিয়ে আসে। অথচ পুজো চলে গেলে কেমন থাকেন ঢাকিরা তার খোঁজ কী আমরা আদৌ রাখি! দুর্গামূর্তির মাটির সামনে সরায় রাখা নারকেলে ছোবড়া ও জ্বলন্ত কয়লা, কর্পুর, ধুপ ধুনো। তা হাতে তুলে নিয়ে শুরু হয় নাচের নানা মুদ্রা। সঙ্গে বেজে ওঠে ঢাক, কাঁসর-ঘণ্টা। বাংলার প্রাচীন ধুনুচি নাচ। মনে করা হয় অসুর বধের আগে দেবী নিজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য ধুনুচি নৃত্য করেন। আজও চলে সেই পরম্পরা। এ হল সমবেত নৃত্য-ভঙ্গি। সঙ্গে ঢাকের বোল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঢেকে যায় দেবী প্রতিমা।

বঙ্কিমচন্দ্র খেদ করে বলেছিলেন “বাঙ্গালার ইতিহাস নাই”। কিন্তু ইতিহাস তো আছে, লোক সংস্কৃতিও আছে। কিন্তু তা নিয়ে কোনও গর্ব নেই, তার প্রতি সম্মান নেই। সম্ভবত সেই কারণেই এই শিল্পীরা শিল্পের মুল্যে পায় সীমাহীন দারিদ্র, অসম্মান। অর্থনৈতিক বিপন্নতার কারণেই বাংলার এই নিজস্ব শিল্প আজ বিলুপ্তির পথে। তবু শরতের নীল আকাশের তলায় প্রত্যেকবার বেঁচে ওঠেন তাঁরা। এবারেও হয়তো গ্রামে-গ্রামে চলছে মহড়া, শেষ মুহূর্তে তুলির টান। মা আসছেন যে।

তথ্যসূত্র:
আনন্দবাজার আর্কাইভ, বাংলার পটের দুর্গা: দীপঙ্কর ঘোষ।
ছবি সৌজন্যে: আনন্দবাজার আর্কাইভ ও আইস্টক

অলঙ্করণ: রৌদ্র মিত্র

আশ্বিনে 'আনন্দ' ধ্বনি

আশ্বিনের স্নিগ্ধ নীল আকাশ বার্তা দেয়, মা আসছেন। দেবীর আগমনে শরতের আকাশে বাতাসে বেজে ওঠে আনন্দ ধ্বনি। ষষ্ঠীর বোধন থেকে দশমীর বিসর্জন, দেবী আরাধনায় সাজ সম্পূর্ণ হয় চিরন্তনী শাড়ির সাজে। শারদোৎসবে 'আনন্দ'-র ঐতিহ্যবাহী বেনারসি, গাদোয়াল থেকে অভিনব প্রিন্ট শাড়ির অপূর্ব সম্ভারে সাজলেন অভিনেত্রী দেবচন্দ্রিমা সিংহ রায় ও হিয়া মুখোপাধ্যায়। উৎসবের সাজকাহন তুলে ধরলেন মৌমিতা সরকার।

■ বেনারসের তাঁতিদের হাতে বোনা ম্যাজেন্টা সিল্ক জামদানি শাড়ি। পাড়ে ঢাকাই স্টাইলে জরির কাজ। জমিতেও একই রকম জ়রি বুটি। আঁচলে ট্র্যাডিশনাল 'কনিয়া' স্টাইলে জ়রির ডিজ়াইন।







■ ভালবাসা ও শক্তির প্রতীক লাল। উজ্জ্বল লাল পাটলি পল্লু প্রিন্টেড সিল্ক শাড়ি। গোল্ডেন ইয়েলো ও পার্পলের বাহারে জিওমেট্রিক প্যাটার্নের ডিজ়াইন। পুজোয় চিরন্তনী লাল শাড়ির সাজ।



■ ট্র্যাডিশনাল তসর শাড়িতে চকোলেট ব্রাউন পাড়। জমি জুড়ে ডার্ক নেভি ব্লু ওয়াইল্ড ফ্লোরাল প্রিন্ট। আঁচলেও তসর ডিজ়াইন। করসেট ব্লাউজ় ও বিডসের গয়নার সঙ্গে কনটেম্পোরারি লুক।



সফ্ট সিল্কে বেজ তাঞ্চোই প্রিন্ট। পাড় ও আঁচলে কমলা পেজ়লি প্রিন্ট। এই শাড়ির ইউএসপি অলওভার ওভারলেয়ার করা মেরুন বড় বড় ফ্লোরাল মোটিফ। হালকা হিরের গয়নার সঙ্গে ক্লাসিক লুক।

■ গোলাপি কাতান বেনারসি শাড়িতে লাল জ়রি পাড় ও আঁচল। অলওভার জালিকা প্যাটার্নে মিনাকারি কাজ করা শাড়ির সঙ্গে মানানসই ট্র্যাডিশনাল গয়না। (বাঁদিকের ছবি)

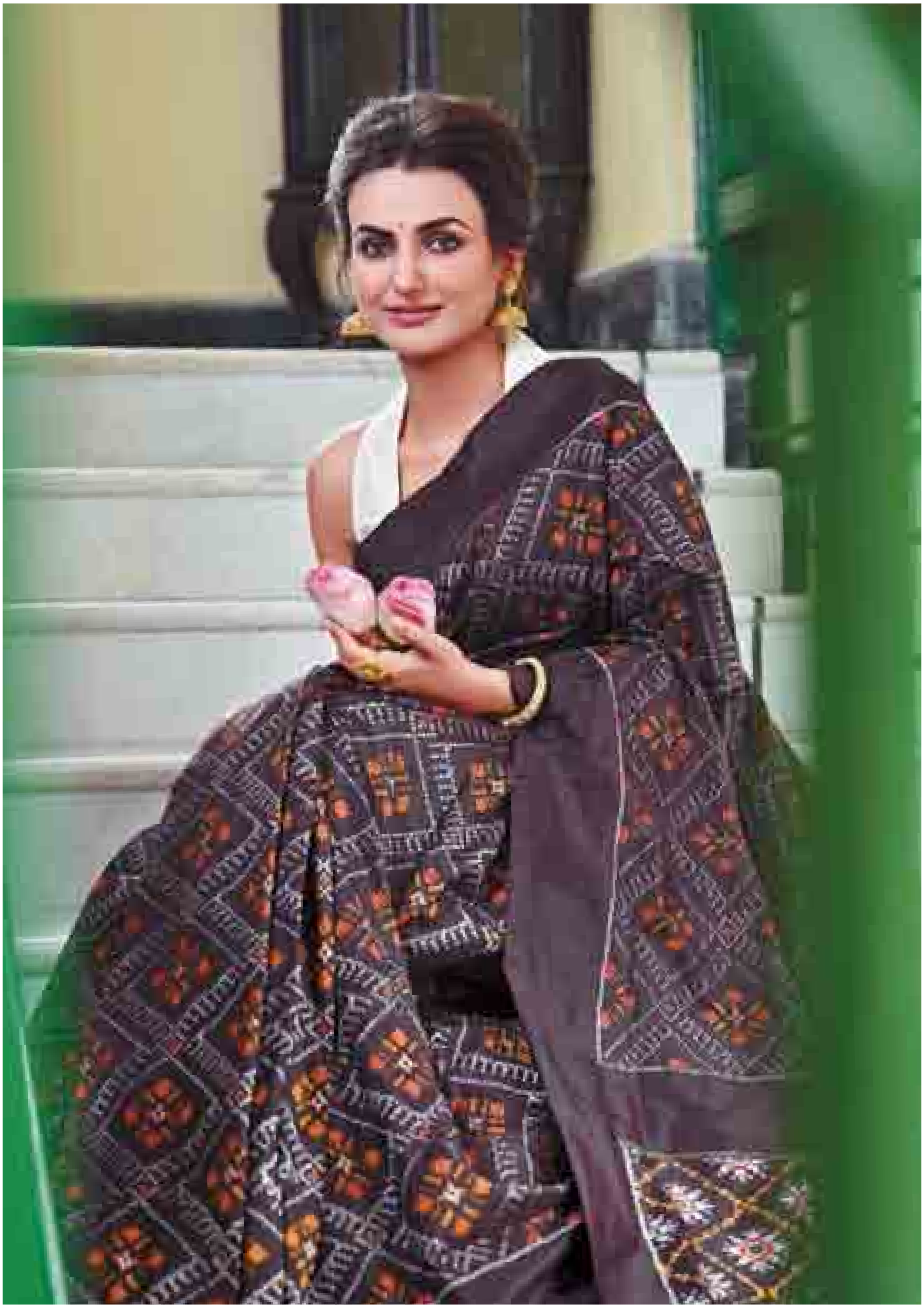
■ হালকা গ্রিন স্পান সিল্কের উপর বাঁধনি স্টাইলে জ়রি বেনারসি শাড়ি। অলওভার ম্যাজেন্টা, ডার্ক গ্রিন ও গোল্ডেন জ়রির ফ্লোরাল বুটি ডিজ়াইন। আঁচলেও একই রকম ভরাট কাজ। সঙ্গে জ়রি এমব্রয়ডরি কাজ করা সবুজ ভেলভেট ব্লাউজ় ও রুপোর গয়না। (ডানদিকের ছবি)



■ রাস্ট রেড ও কালোর কনট্রাস্ট, অভিনব ফ্লোরাল ডিজ়াইন। 'আনন্দ'-র এই এক্সক্লুসিভ ডিজ়াইনে আছে খানিকটা ইক্কত প্যাটার্ন। পুজোর সকালের সাজে এইরকম একটি প্রিন্টেড সিল্ক শাড়ির সঙ্গে চাই বিচ ওয়েভ হেয়ার স্টাইল ও রুপোর গয়নায় পারফেক্ট লুক।



■ হালকা হলুদ
ক্লাসিক্যাল কাতান
বেনারসি শাড়িতে
ফিফটিজ়ের স্টাইলে
জ়িগজ্যাগ ডিজ়াইন।
পাড় ও আঁচলে
ভরাট জ়রির কাজ।



■ অন্ধ্রপ্রদেশের তাঁতির হাতে বোনা কালো ও খয়েরি শট কালার কম্বিনেশনে ট্র্যাডিশনাল ইক্কত সিল্ক শাড়ি। নিউট্রাল পাড় এবং অলওভার গোল্ডেন ইয়েলো ও লালের ডিজ়াইন। ট্র্যাডিশনাল শাড়ির সঙ্গে অফ হোয়াইট হল্টারনেক ব্লাউজ় ও সোনার গয়নায় সাজে আধুনিকা।

ব্লাউজ়: অরণ্য, **ফোন:** ৯৮৭৪১৬০২৭০



■ হালকা মভ সিল্ক শাড়িতে ভার্টিকাল প্যাটার্নে তাঞ্চোই প্রিন্ট। ম্যাজেন্টা চওড়া পাড় ও আঁচলে ফ্লোরাল ডিজ়াইন। স্টাইলিশ অফশোল্ডার ফ্রিল ব্লাউজ় ও মিনিমাল গয়নায় কনটেম্পোরারি লুক।



■ অফ হোয়াইট ও হালকা খয়েরি কনট্রাস্টে ট্র্যাডিশনাল চেক্‌ড সিল্ক গাদোয়াল শাড়ি। জমিতে সিলভার ও কালো ফ্লোরাল বুটি। শাড়ির পাড় ও আঁচলে চোখ জুড়ানো সিলভার জ়রির কাজ ও পাখির মোটিফ। রুপোর গয়নার যোগ্য সঙ্গতে অপরূপা। (বাঁদিকের পাতা)

■ পিচ-ইশ পিঙ্ক প্রিন্টেড সিল্ক শাড়ির পাড় ও আঁচলে টারকোয়েজ় ব্লু ও মভ কালার কম্বিনেশনে পেজ়লি প্রিন্ট। (ডানদিকের পাতা)



শাড়ি: আনন্দ
কুইন্‌স ম্যানসন
১৩ রাসেল স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন: ২২২৯২২৭৫,
৯৬৭৪৩৯২২৭৫

ছবি: সোমনাথ রায়
মেক-আপ: বাবুসোনা সাহা
ফোন: ৮২৪০৫৫০৮৮৪
হেয়ার: তনয়া সর্দার
ফোন: ৯৮০৪১৭৮৮৮৩
স্টাইলিং: কিয়ারা সেন
ফোন: ৯০৫১৪৭৩৬০৬
গয়না: অঞ্জলি জুয়েলার্স
ফোন: ০৩৩ ২৪৪০৮৬৩৬
০৩৩ ২৪৪০১৭৯২
শুটিং লোকেশন ও
হসপিট্যালিটি পার্টনার:
অঞ্জলি কুঞ্জ (বারুইপুর)
ফোন: ৯৮৭৪১৬০২০৭
রূপায়ণে: অসীম হালদার





পায়ে দরিয়া

বি ম ল লা মা

সকাল সন্ধ্যে নিয়ম করে সরকার আর তার আধিকারিকদের মা বেহেন করে আশপাশের পাঁচটা গ্রামের লোকে। এই চলে টানা বেশ কয়েক মাস। যতদিন না গ্রীষ্মের আগুন ঝরা মাসগুলো গিয়ে বর্ষা নামে অবিশ্বাস্য তোড়ে। চারিদিকের রুক্ষতার উপর দিয়ে কুলকুলিয়ে বইতে শুরু করে অজস্র জলের ধারা। চাল, দেওয়াল বেয়ে গড়িয়ে নেমে ধারাগুলো জড়ো হয় উঠানের নাবালে। নাবাল উপচে বেরিয়ে পড়ে জল। গড়িয়ে যায় সদর দরজার দিকে। দরজার চৌকাঠের সামান্য বাধা টপকে যায় সহজেই। তারপর গ্রামের অন্য বাড়ির প্রতিবেশী জলধারার সঙ্গে মিশে হুড়মুড়িয়ে যৌথ জলধারা বয় গ্রামের কাঁচা রাস্তা ধরে। বেরিয়ে যায় গ্রাম ছেড়ে। আজাদপুর লেখা সরকারি সাইনবোর্ডের লোহার দুই ঠ্যাং ছাপিয়ে। গ্রামের বাইরের বড় রাস্তায় আরও কত জলধারা। সবে মিলে অস্থায়ী এক নদীর মত বয়ে যাচ্ছে দুর্বার বেগে। এমনকি ক্ষেত খলিয়ন উজিয়ে উঠে আসছে জল। দৃষ্টির বিস্তীর্ণ পরিসরের মধ্যে যেখানে যত জল সকলেরই যেন লক্ষ্য একটাই। সেদিকেই বয়ে যাচ্ছে সহস্র ছোট বড় জলধারা। হঠাৎ বৃষ্টির কোলাহল ছাপিয়ে কানে আসে একটা মানুষের তীব্র গলা। উত্তেজনায় চিৎকার করছে গ্রামের রাস্তায়। ছোটাছুটি করছে এমাথা ওমাথা। কৌতূহলে কেউ দরজা দিয়ে উঁকি মারে রাস্তায়। কেউ জানলা ফাঁক করে। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে তিড়িংবিড়িং করে লাফাচ্ছে সরু লম্বা একজোড়া কালো ঠ্যাং। লিকলিকে আর কালো তার দুটো হাত, পাঁজর বার করা খালি গা। কোমরে আটকে আছে হাঁটু পর্যন্ত একটা না হাফ না ফুল প্যান্ট। বিকট রকম লাল তার রং। প্রতিটা ঘরের সামনে গিয়ে সে চিৎকার করে করে কিছু বলছে। দরজায় দাঁড়িয়ে মগন জানতে চায়, ‘‘ক্যা ভয়ো রে সোনুয়া?’’

সোনুয়া মগনকে দেখে আরও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তার কালো শুকনো চার হাত পায়ে এলোমেলো বৃষ্টি কেটে বলে, ‘‘ভর গয়া।’’

‘‘ভর গয়া?’’

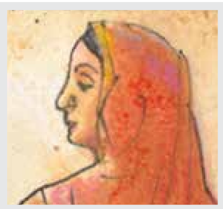
‘‘হাঁ হাঁ ভর গয়া, পুরা ভর গয়া।’’

‘‘ক্যা ভর গয়া?’’

‘‘দরিয়া... দরিয়া...।’’

চিৎকার করতে থাকে সোনুয়া। এই দরিয়া একদিন জলে ভরে যাবে, বলে গেছিল সরকারি আধিকারিকেরা। কেউ বিশ্বাস করেনি। করার কথাও না। কারণ জায়গাটা ছিল বনজর আর পথরিলা। দীর্ঘ দিনের পতিত ভেস্ট জমি। বালি কাঁকড়ে ছয়লাপ

চারিদিক। হাজার খুঁড়েও সেখানে জল তো কি, কাদাও করা যায় না। তবু গোটা সরকারি দল লেগে পড়েছিল খোঁড়াখুঁড়ির কাজে। দিনে রাতে অবিরাম কাজ। হবে প্রায় মাস তিনেক, কি তারও বেশি। তারপর লোটা-কম্বল গুটিয়ে সব চলে গেল যেমন এসেছিল। পিছনে পড়ে রইল বিরাট খাদ। পাঁচটা গ্রামের সীমানা ছোঁয়া খটখটে পতিত জমির বদলে বিরাট খাদ। এত বিরাট যে তল পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতে বাজরার রুটি আর রাজমার কারি হজম হয়ে আবার খিদে পেয়ে যায়। তেষ্টায় শুকিয়ে যায় ছাতি। খাদের অন্তিম তলে সামান্য জল উঠেছে মাত্র। তাতে পা কাদা করা ছাড়া আর কিছুই হয় না। খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে এতদিন লোকে তাই বাপান্ত করে গেছে এই সরকারি ব্যর্থ উদ্যোগের। অবশেষে পাগলা সোনুয়া জলে ভিজে ভিজে খবর দিয়ে যাচ্ছে, ''ভর গয়া… ভর গয়া…!''

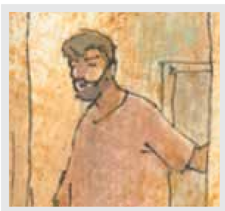


আচমকাই পায়ের তলার মাটি হড়কে যায় সোনুয়ার। ভারসাম্য রাখতে না পেরে উল্টে পড়ে জলের ওপর। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে দেখে পায়ের তলায় মাটি নেই।

হঠাৎ কোত্থেকে ছুটে এসে পার্বতী জাপটে ধরে সোনুয়াকে। টেনে হিঁচড়ে তাকে নিয়ে যেতে চায় ঘরের দিকে। কিন্তু সোনুয়া আপ্রাণ চেষ্টা করে নিজেকে ছাড়াতে। তুমুল এক ধস্তাধস্তি শুরু হয় বৃষ্টির ভেতর। ভারসাম্য রাখতে না পেরে জল-কাদায় উল্টে পড়ে দুজনে। গড়াগড়ি খেতে থাকে রাস্তার ওপর। চেঁচাতে চেঁচাতেই একসময় তারা মুখোমুখি বসে পড়ে রাস্তার জলের মধ্যে। দু'হাত নেড়ে সোনুয়া কিছু বলতে থাকে পার্বতীকে। পার্বতী শান্ত হয়ে শুনতে থাকে তার কথা। তারপর চোখ বড় বড় করে বলে, ''ব্রহ্মপুত্র!''
''একদম ব্রহ্মপুত্র! ইসপার উসপার!''
এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ায় পার্বতী। টেনে তোলে সোনুয়াকেও। তারপর দু'জনে হাত ধরাধরি করে দৌড় দেয় গ্রাম ছেড়ে। গ্রামের রাস্তায় জলের প্রবাহ উত্তাল হয়ে উঠেছে আরও। তারই স্রোতে গা ভাসিয়ে যেন সোনুয়া আর পার্বতী বেরিয়ে যায় গ্রাম ছেড়ে। গ্রামের বাইরে বড় রাস্তায় জলের তোড় আরও বেশি। যেন একটা সত্যিকারের নদী বয়ে চলেছে ভাটির দিকে। দুজনের হাঁটু ছাড়িয়ে উঠে এসেছে জল। সেই জল ভেঙে তারা এগিয়ে যায় প্রবাহের অভিমুখে। জলের প্রবাহ একসময় গিয়ে পড়ে মোহনায়। অসংখ্য জলরাশির ভিতর মিশে গেছে রাস্তা উপচানো নদী। তারই পারে হাত ধরে দাঁড়ায় দু'জনে। সরু কালো হাত তুলে সোনুয়া ওপারটা দেখায় পার্বতীকে। বলে, ''দেখ দেখ, ব্রহ্মপুত্র হ্যায় কি নহি দেখ।''
এত জলের পরেও জল এসে যায় পার্বতীর চোখে। সোনুয়া যদিও দেখতে পায় না সে জল। সে তাকায়ও না তার মুখের দিকে। সামনে তখন ব্রহ্মপুত্রের বিভ্রম। অনুমান করতে পারে হয়তো পার্বতীর মনটা। যার জন্মই হয়েছে ব্রহ্মপুত্রের তীরে। হাঁটতে শিখেছে তারই জলে পা চুবিয়ে চুবিয়ে। বেড়েও উঠছিল তার দু'পাড়ের লকলকে চির সবুজ গাছ-গাছালির মতোই, যখন সোনুয়া গিয়ে হাজির হয় একেবারে তার দোরগোড়ায়। হাজার মাইল পথ পেরিয়ে। মরুর দেশ থেকে জলের দেশে। ব্রহ্মপুত্র তখন সবে শান্ত হয়েছে দু'পাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভাসিয়ে। যত কাঁচা ঘরবাড়ি, ক্ষেত, গোয়াল তছনছ করে আবার সে সবে ফিরেছে তার নিজস্ব খাতে। উনুন জ্বলছে না ঘরে ঘরে। সরকারি গুড় চিঁড়ে চিবিয়ে দিন কাটছে লোকের। এমন সময় পার্বতীর বাবার হাতে একতাড়া নোট ধরিয়ে দেয় বিপন। সামনে এনে হাজির করে সোনুয়াকে। সঙ্গে তার বাপ কাকা দাদা মামা…। ভরসা দিয়ে বলে,
''মোর চিনাকী মানুহ। ভাল পরিয়াল।''
বিপন গ্রামেরই ছেলে। রাজস্থানে জ়রির কাজ করে। বছরে দু'বছরে ফেরে গ্রামে একা মায়ের কাছে। টাকা পাঠায় মাসে মাসে। বন্যার খবর পেয়ে ছুটে এসেছে মাকে দেখতে। সঙ্গে এনেছে সোনুয়াকে। কথা দিয়েছে বউ একটা জুটিয়েই দেবে। প্রথম প্রস্তাব পার্বতীর বাবার কাছে। পার্বতীর বাবা এত টাকা একসঙ্গে কখনো হাতে ধরেনি। তাকে দু'হাতে ধরতে হয়েছে টাকাগুলো। তাতেও কিছু কম লাগছে না তার চাপ। কথা সরছে না মুখে। তাড়া দেয় বিপন, ''এ সুযোগ আর পাবে না কাকা। না হলে বল মেয়ের তো অভাব নেই গ্রামে।''
''কিন্তু ওর যে বিয়ের বয়স…।''
''ওসব বড় লোকের বয়স কাকা, আমাদের নয়। ওরা মেয়েকে আঠারো বছর ঘরে রেখে স্কুলে কলেজে পড়াবে। গানবাজনা, ক্যারাটে কম্পিউটার শেখাবে। তুমি কী শেখাবে মেয়েকে! পাড়া বেপাড়ার ছেলে কখন নষ্ট করে দেবে তখন…। তার চেয়ে বিয়ে দিয়ে দাও। ভাল পরিবার। প্রচুর জমিজমা। মেয়ে ওখানে রাজ করবে শ্বশুর ঘরে।''
''সেটা কোথায়? দিল্লি?''
''বিশ্বাস না হলে চলো, দেখে আসবে নিজের চোখে। এই দেখো ছবি।''
''আর এই হল পাত্র। দেখে নাও।''
পার্বতীর বাবা তখনও একই ভঙ্গিতে ধরে আছে টাকার বান্ডিল। চোখ তুলে তাকায় সোনুয়ার দিকে। কালো রোগা একটা ছেলে। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হবে। দেখতেও মন্দ না। কিন্তু একটু কেমন যেন। সেকথা বিপনকে বলতেই সে অহমিয়ার আড়াল নিয়ে বলে, ''নেমু অলপ। সেইবাবেই তেওঁলোকে নিজর দেশত ছোৱালী নাপায়।''
তবু ভাবে পার্বতীর বাবা। পাঁচ-পাঁচটা মেয়ে তার। একটাই ছেলে। পার্বতীই বড়। বয়স ষোলো পেরোয়নি এখনও। এক চিলতে জমির চাষে আধা বছর খাওয়া চলে। বাকিটা জোগান দিতে মুটেমজুরি করতে হয় তাকে, তার বউকে। এমনকি পার্বতীও বাসন

মাজে, কাপড় কাচে হেল্‌থ সেন্টারের ডাক্তারের কোয়ার্টারে। সব ফসল বন্যার তোড়ে ভেসে গেছে এবার। হাইওয়ের ক্রসিং এ গাড়ি থামলে ভিক্ষে করছে তার ছোট মেয়ে দুটো। এই অবস্থায় দুহাত ভর্তি টাকা...।
আরও লোভ দেখায় বিপন, ধুমধাম করে বিয়ে হবে। গোটা গ্রামের লোক খাবে। ভরপেট মাংস ভাত। নতুন শাড়ি গয়না। জামা কাপড় সবার জন্য।
''আপোনার হাতর টকা হাতত থাকিব। এটকাও খরচ করিব নালাগে।''
পার্বতীর বাবা দশ আঙুলে খাঁচা বানিয়ে ঘিরে ফেলে টাকাগুলোকে। তারপর হঠাৎই মাইক বাজতে শুরু করে বন্যা দুর্গত অহমিয়া গ্রামে। ঘরে ঘরে গিয়ে নেমন্তন্ন করে আসে পার্বতীর বাবা, ''কাইলৈ পার্বতীর বিয়া। তোমালোক সকলোরে ভোজলৈ আহিবা।''
আসেও লোকে বিয়ে খেতে। হতবাক হয়ে যায় আয়োজন দেখে। লোকের মনের কুড়কুড়ে নানা প্রশ্ন মুখে উঠে আসার আগেই সে উত্তর দেয় গায়ে পড়ে। জনে জনে ডেকে ডেকে বলে, ''আমার বন্ধু। ভাল অবস্থা...। জমিজমা গরু মোষ.... দুধ ঘি...। সামান্য ল্যাংড়া। তাই মেয়ে পাচ্ছে না দেশে। ওদের দেশে মেয়ের বড় আকাল....। কন্যা ভ্রূণ হত্যা... জানো তো সবই।'' ওদের একটাই মাত্র ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বর কনের জন্য। রাত পোহালে পার্বতী দ্যাখে অত ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না, সোনুয়াকে যত ভয় সে পেয়েছিল। এমনকি অনুমতি নিয়েছিল তার ঘোমটা তোলার আগে। বলেছিল, ''মনা করতি হো তো নহি ছুঁয়েঙ্গে হম।''
মানা করেনি পার্বতী। কেউ তো কখনও কোনো ব্যাপারে অনুমতি চায়নি তার। বাপ পয়সা খেয়ে বিয়ে ঠিক করে দিল অনুমতি না নিয়েই। একা পেয়ে নিজের মামাই একদিন তার গায়ে হাত দিল অনুমতি না নিয়েই। এই প্রথম কেউ তার অনুমতি চাইল। পূর্ণ অধিকার দিল, না বলবার। এরপর আর কী করে সে না বলে! ধাপে ধাপে জানতে চেয়েছে, ''ভয় করছে না তো... কষ্ট হচ্ছে না তো... ব্যথা লাগছে না তো... কোনও অসুবিধা...।''
যেন তার সুখ স্বাচ্ছন্দের খেয়াল রাখাটাই তার কাজ। রাত ভোর হতে হতে সোনুয়া পার্বতীকে প্রায় আপনই করে ফেলে। এতটাই যে ভোরবেলা পার্বতী নিজেই তার হাত ধরে বলে, ''নদী দেখনে যাওগে?'' গোটা গ্রাম তখনও ঘুমচ্ছে। বিয়ের সাজ ছেড়ে রোজকার পোশাকে বেরিয়ে আসে পার্বতী সোনুয়ার হাত ধরে। গ্রামের রাস্তা ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে বাঁশ বনের দিকে। বাঁশ বনের আড়াল পেরিয়ে ওপাশে যেতেই অবাক সোনুয়া। ব্রহ্মপুত্রের ওপার দেখা যাচ্ছে না। জলের ওপর ছোট ছোট ঢেউ নদীজোড়া কারুকৃতির মত টলটল করছে।
''ইতনা সারা পানি!''
পার্বতী বোঝানোর চেষ্টা করে এ তো কিছুই নয়। কদিন আগেই তো জল ঢুকে এসেছিল তাদের গ্রামে। যে ঘরে তারা রাত কাটালো, সে ঘরেই তো ডুবো জল আটকে ছিল হপ্তা খানেক।
কথাগুলো বলতে বলতে পার্বতী নেমে যায় জলের দিকে। জল তার কোমর ছাড়াতেই ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে আসে সোনুয়া। উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলে, ''ডুব যাওগি!''
পার্বতী হাসতে হাসতে নেমে যায় আরও গভীরে। যতক্ষণ জল তার গলা পর্যন্ত চলে আসে। সোনুয়া বারবার তাকে উঠে আসতে বলে। নিজেও নেমে আসে কোমর জলে। কিন্তু পার্বতীর সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়তেই থাকে। নদীর ওপারের ঝাপসায়ার দিকে ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে পার্বতী।
সোনুয়া দুহাত বাড়িয়ে দেয় পার্বতীর দিকে। যতটা পারে শরীর ঝুঁকিয়ে নিজেকে প্রসারিত করতে চায়। গলায় অকৃত্রিম উৎকন্ঠা নিয়ে বলে, ''মত যাও.... মত যাও...।''
উত্তরে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে পার্বতী। সরে যায় আরো দূরের দিকে। ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসে তার মাথা। তার খিলখিল হাসি কানে এলেও থেকে থেকে মিলিয়ে যায় তার মুখ। বিস্তীর্ণ জলতলের ওপর ঝিকমিক করে ছোট ছোট ঢেউ। ব্যস্ত হয়ে এদিক-ওদিক চায় সোনুয়া। তারপর হঠাৎ কানে আসে পার্বতীর ক্ষীণ স্বর। সোনুয়া দেখে আরও দূরে গিয়ে ভেসে উঠেছে পার্বতী। প্রায় দেখাই যাচ্ছে না তার মাথাটা। জলের আলোড়নের ভেতর এমন করছে যেন সে কোনও বিপদে পড়েছে। জলের তলায় কোনও কিছুতে বুঝি...।
আচমকাই পায়ের তলার মাটি হড়কে যায় সোনুয়ার। ভারসাম্য রাখতে না পেরে উল্টে পড়ে জলের ওপর। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে দেখে পায়ের তলায় মাটি নেই। কোথাও মাটি পায় না। যত না পায় ততই ব্যস্ত হয়ে সে পা চালায়। পাগলের মত সে সাইকেল চালায় জলের তলায়। আর তারই টানে সরে যায় আরও গভীরের দিকে। জলের ওপর মাথা ভাসিয়ে রাখার কৌশল তার জানা নেই পার্বতীর মতো। তাই জলের ওপর তার মাথাটা আর দেখতে পায় না পার্বতী। সে ব্যস্ত হয়ে সাঁতরাতে থাকে সোনুয়ার দিকে।
আরও বেড়েছে বৃষ্টির তোড়। শুধু জল আর জল। জলের ওপর বুলেটের মতো এসে লাগছে বৃষ্টির ফোঁটা। রক্তের কুয়োর মতো ছোট একটা গর্ত তুলে ঢুকে যাচ্ছে জলের ভেতর। এমন অস্থায়ী ছোট ছোট কুয়োর অন্তহীন ভাঙা-গড়া চলছে জলের ওপর। বৃষ্টি যত বাড়ছে ততই বাড়ছে এই জল-বুলেটের খেলা। তারই দাপটে আচ্ছন্ন গোটা জলরাশি। সেখানে কোথাও কোনও চিহ্ন নেই সোনুয়ার কালো মাথা বা তার লাল বারমুডার। শুধু পার্বতী একা ছটফট করছে কোমর জলে দাঁড়িয়ে। তার বুকের উপর থেকে সরে গেছে তার দুপট্টা। হাওয়া ধরে জলের ওপর ভেসে আছে ফুলে ওঠা লাশের মত।
খবর পেয়ে বৃষ্টির মধ্যেই ছুটে আসে বাড়ির লোক। আসে গ্রামের আরও অনেকে। জলভরা সরকারি খাতের পাড়ে দাঁড়িয়ে তারা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে জলের দিকে। সোনুয়ার কথা ভুলে তারা বলাবলি করে শুধু জলের কথা, ''ইতনা সারা পানি!''
বৃষ্টির মধ্যেই খোঁজ চলে। পার্বতীরই

নেতৃত্বে। কারণ গ্রামের প্রায় কেউই সাঁতার জানে না। সোনুয়া তো নিতান্তই সেদিনের ছেলে। একটা গণমত তৈরি হয়ে যায় গ্রামে। নিজেই নিজের সুহাগ খেয়েছে পার্বতী। গোটা গ্রামের সামনে এখন গা বার করে কেঁদে কেঁদে সাঁতার খেলা দেখাচ্ছে ওই বাহারওয়ালি।
সোনুয়ার মূল্য ধরে পাওয়া বউ মোলকি। চুঁড়েল পারো।
পার্বতীকে ভালবেসে পারো বলছে না এরা কেউ। বাইরে থেকে পয়সা দিয়ে কিনে আনা বাহারওয়ালি বউকেই বলে পারো। সে কথা বুঝতেও বেশ সময় লেগেছিল পার্বতীর। যখন বুঝলো, দেখল পারো সে একা নয়। গ্রামের ঘরে ঘরে আরো কত পারো!
''ইতনা সারা পারো?''
সোনুয়া রসিকতা করে বলত, ''লেকিন তু হ্যায় পারো নম্বর ওয়ান।'' সেই নিয়ে নিজেরই গর্বের শেষ ছিল না সোনুয়ার। আজাদপুরে কি আশেপাশের গ্রামে কোনও নতুন পারো এলেই সে ছুটে গিয়ে দেখে আসত। তারপর গর্বের পারদ আরও একধাপ চড়িয়ে বলতো, ''তেরে সে আচ্ছা নহি হ্যায়।'' পার্বতীকে নিয়ে তার এত অহংকার সে শুধু পার্বতীর দামের জন্য নয়। আজকাল তো লোকে লাখ টাকা দিয়েও পারো ঘরে তুলছে। কিন্তু তারা কেউই পার্বতীর মতো এত গোরি নয়। এত লম্বা চুলও নেই কারও। এত সুন্দর চোখ মুখ... এত উজ্জ্বল চামড়া... এত গোলগাল হাত-পা... এত চঞ্চল... এত উচ্ছ্বল...।
''ছড্ডো জি। বাতেঁ ন বনাও।''
স্থানীয় নখরা শিখে নিয়েছিল পার্বতীও। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই। আসলে সে পারো হলেও স্থানীয় কোনও বধূর চেয়ে কিছু কম ছিল না গুণেমানে। এমনকি সে নাম সইও করতে পারতো গোটা গোটা হরফে। তাও আবার তিন তিনটে ভাষায়, অহমিয়া হিন্দি ইংরেজি। আখবার পড়তে পারত গড়গড় করে, যা সোনুয়া তো কি ওর বাপেও পড়তে পারত না। তার ফল হল এই যে, সোনুয়াটা বনে গেল একেবারে জোরু কা গুলাম। আর এই ব্যাপারটাই সহ্য করতে পারত না সোনুয়ার মা। পারো নিজেই একটা কেনা গোলাম। আর তার ছেলে কিনা সেই পারোরই গোলাম!
''নাক বোলে তো কটওয়া দিয়া, শুনতে হো সোনুয়াকে বাপু?''
সোনুয়ার বাপেরও মাথাব্যথা শুরু হয় তার ছেলের কাণ্ড দেখে। গোটা মেওয়াট জুড়ে ঘরে ঘরে পারো। কোথাও তো এমন দেখা যায় না। পারো মানেই তো ঘরের সব কাজ করবে। ঝাড়ু বর্তন সাফসফাই...। গুরুজনদের গায়ে পায়ে তেল মালিশ। বাড়ির গরু-মোষ ভেড় বকরির দেখভাল... গোইঠা গোবর ঘাঁস চারা... রসোঁই ঘরের জিম্মা....। সেইসব সকাল সকাল নিপটারা করে আবার ওদিকে ক্ষেতের কাম কাজ আছে। ভেড় বকরি চরানো আছে। পানি ভরতে যাওয়া আছে। কিন্তু সোনুয়ার প্রশ্রয়ে তাদের ঘরের পারোটার এত স্পর্ধা বেড়েছে যে সে মুখের উপর বলে বসে, ''দোনো দিদি কিঁউ নহি যাতি?''
সোনুয়ার বড় দুই ভাইয়ের বউদের কথা বলছে। তারা স্থানীয় মেয়ে। কুলের বধূ। তাদের সঙ্গে নিজেকে সমান ভাবতে শুরু করেছে এই পারো। বাইরে ক্ষেতে কাজ করতে মেয়েরা যায় না এখানে। যারা যায় তারা মেয়ে হলেও এখানকার নয়। অসম বাংলা বিহার থেকে পয়সা দিয়ে কিনে আনা পারো। তার আবার প্রশ্ন, ''দোনো দিদি..।''
এতটা আর সহ্য করতে পারেনি সোনুয়ার মা সেদিন। চুলের মুঠি ধরে দু'ঘা দিতেই হল। ঘোমটায় মুখ ঢেকে শ্বশুরের সঙ্গে তর্ক। আসুক সোনুয়াটা আজ ঘরে! নালায়ক! পারো কা গুলাম! মাথায় তুলে রেখেছে বউটাকে!
সোনুয়ার বাঁ পায়ে একটু সমস্যা আছে। ভারী কাজ, ক্ষেতের কাজ করতে পারে না। তাই বাজারে একটা কিরানা দোকান করে দিয়েছে ওর বাপে। সেই দোকানেই সে থাকে দিনভর। রাতে ফেরার সময় পার্বতীর জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসে লুকিয়ে। টিপের পাতা, মাথার ক্লিপ, চুলের ফিতে, দাঁতের ব্রাশ, নখের পালিশ... এইসব। সেদিন পকেটে ভেলপুরি। উঠোনে পা দিতেই মায়ের ঝাঁঝালো গলা, ''আগয়া পারো কা গুলাম?''
শুনেই মাথা গরম সোনুয়ারও। তারপর মা ব্যাটায় তুমুল ঝগড়া। মা প্রাণ খুলে গালাগাল দেয় পার্বতীকে। তার জাত ধর্মকে। অভিযোগ করে, যে টাকায় তাকে কেনা হয়েছিল, তার এক আনার কাজও সে গত এক বছরে করেনি। গালাগাল দেয় সোনুয়াকে তার গোলামি করার জন্য। আর রোজ রোজ লুকিয়ে এটা-সেটা এনে দেওয়ার জন্য। সন্দেহ প্রকাশ করে বলে, ''ক্যা হ্যায় জেব মে দিখা। দিখা... দিখা...।''
একটা ধস্তাধস্তিই লেগে যায় মা-বেটায়। শেষে ছিঁড়ে পড়ে সোনুয়ার পকেট। কাগজের ঠোঙা ফেটে উঠোনময় ভেলপুরি। সেই দেখে মায়ের গলা সপ্তমে। চিৎকার করে করে ডাকে ঘরের লোকেদের, ''দেখো জি দেখো... গুলামি কা হদ দেখো....!'' যেন বউয়ের জন্য লুকিয়ে আনা মোতির হারই ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়েছে উঠোনময়।
''মায়ের জন্য কিছু না। বৌদিরা আছে তাদের জন্য কিছু না। নিজের পারোটার জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে পকেটে ভেলপুরি...।''
হঠাৎ মা ঝাঁপিয়ে পড়ে সোনুয়ার অন্য পকেটটার ওপর। ''দিখা.... অউর ক্যা হ্যায় দিখা।'' সোনুয়াও দু'হাতে চেপে ধরে পকেট। টানাটানিতে তার



পার্বতী তো ভাবল পাগলই বোধহয় হয়ে গেল তার মরদটা। কিন্তু না, পাগল সে হয়নি। হয়তো হয়েই যেত আর কিছুদিন ওই দাওয়াই চললে।

প্যান্ট খুলে যাওয়ার উপক্রম। শেষে আত্মসম্মান রক্ষার তাগিদেই সে পাল্টা আক্রমণের পথ নেয়। এক ধাক্কা দেয় মাকে। আর তাতেই মা চিৎপাত নুন লঙ্কা মাখা ভেলপুরির ওপর। আর পড়েই মড়া কান্না। ছুটে আসে সোনুয়ার মজলা ভাই। সোনুয়ার কলারটা ধরে সপাটে একটা চড় মারে তার গালে। ক্রোধে উন্মত্ত সোনুয়া কাপড় কাচার মুগুরটাই তুলে নেয় হাতে। উঁচিয়ে মারতে যায় মজলা ভাইকে। কিন্তু তার আগেই বড় ভাই এসে ধরে ফেলে তাকে। তারপর দুই বড় ভাই মিলে বেধড়ক মার দেয় সোনুয়াকে। ছুটে আসে পার্বতী। নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে সোনুয়াকে। তাকে সরানোর অছিলায় মেজ ভাসুর বেশ জাবড়ে ধরে চটকে দেয় তাকে। তারই মধ্যে চকিতে চোখাচোখি হয় সোনুয়ার মজলা ভাইয়ের সঙ্গে। তার চোখের কোণে পরিষ্কার লোলুপ হাসি দেখে পার্বতী।

মার খেয়ে সে রাতেই জ্বর এসে যায় সোনুয়ার। সকাল হতে হতে জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে পার্বতী। শ্বশুর ভাসুররা বাধা দিয়ে বলে, ‘‘হমারে বেটে হম পে ছোড় দে।’’ তারা গিয়ে ডেকে আনে ভিন গাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তার ইউনুসকে। সে আবার শুধু ডাক্তারিই করে না, ঝাড়ফুঁকও করে। তারই তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলে সোনুয়ার টানা একমাস। আধা ঘুমে আধা জাগরণে ঘোরের মধ্যেই কেটে যায় তার গোটা মাস। মনে হয় যেন কষে নেশা করেছে। সে নেশার ঘোর কাটার আগেই আবার চড়িয়েছে। সকালের দিকে ঘোর পাতলা হয়ে এলে কখনো বা কাছে ডাকত পার্বতীকে। তার হাত ধরে বলত, ‘‘অউর দওয়া নহি লেঙ্গে।’’

কিন্তু তারপরই এসে হাজির হতো ইউনুস ডাক্তার। বোতলে কালচে পাঁচন নিয়ে। খেতে চাইতো না সোনুয়া। বাধা দিত পার্বতীও। কিন্তু তার শ্বশুর ভাসুররা এসে চেপে ধরে তাকে খাইয়ে দিত এক কাপ পাঁচন। তারপর আবার ঘোরের মধ্যে তলিয়ে যেত সোনুয়া। পরের দিন সকাল পর্যন্ত। একমাস এই চলার পর রেহাই মিলল ইউনুস ডাক্তারের হাত থেকে। ধীরে ধীরে ঘোর কাটতে লাগলো সোনুয়ার। পার্বতী জলের গ্লাস তার সামনে ধরতেই সে মুখ তুলে বললো, ‘‘আপ কৌন?’’

পার্বতী তো ভাবল পাগলই বোধহয় হয়ে গেল তার মরদটা। কিন্তু না, পাগল সে হয়নি। হয়তো হয়েই যেত আর কিছুদিন ওই দাওয়াই চললে। কিন্তু মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায় দাওয়াই। মাঝপথেই থেমে যায় সোনুয়াও। পুরো পাগল সে হয় না। কিন্তু পুরো সুস্থও সে আর থাকে না। যদিও শেষ পর্যন্ত চিনতে পারে পার্বতীকে। আর চিনতে পেরেই শুতে চায় তার সঙ্গে। যুক্তি দিয়ে বলে, ‘‘বিবি সে সোনা চাহিয়ে।’’ শুতে গিয়ে পার্বতী দেখে তার শরীর যেমনকার তেমনই আছে। কোথাও কোনও কমজোরি নেই। এমনকি, তার বাঁ পায়ের সমস্যাও সামান্যই আছে আগের মতো। শুধু তার মাথাটা...অথবা মনটা... পার্বতীও ঠিক বুঝতে পারেনা কোনটা, আর আগের মতো নেই।

‘‘ক্যা করদিয়া সবনে মিলকে?’’ চিৎকার করে জানতে চায় পার্বতী।

মেজ ভাসুর দাঁত চিবিয়ে বলে, ‘‘বচালিয়া উসকো তেরে চঙ্গুল সে।’’

আর কোনও বাধা থাকে না পার্বতীকে পুরো দস্তুর পারো করে তুলতে। আপত্তি করলে চড় থাপ্পড় বসিয়ে দেয় যে যখন পারে। মেজ ভাসুর তার ঘরে ঢুকে আসে তাকে শাসন করতে। দেওয়ালে ঠেসে ধরে। সোনুয়া কিছুই বলে না। যেন এসবের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। তার শুধু খাওয়ার আর শোওয়ার তাড়া। পার্বতীর জীবন ঘরে বাইরে পাল্টে যায় ভোর থেকে রাত। সোনুয়া আর দোকান যায় না সকালে উঠে। ব্যবসা করার মতো মাথার অবস্থা তার আর নেই। বদলে তার বাবাই এখন চালাচ্ছে দোকান। সকালে ঘুম ভেঙেই পার্বতী দেখে সোনুয়া পাশে নেই। প্রথমে উদ্বিগ্ন হয়ে খুঁজতে বেরত। ধরে আনত গ্রামের রাস্তা মন্দির স্কুলের মাঠ ক্ষেত খলিয়ানের নির্জনতা থেকে। পরে অভ্যেস হয়ে গেল। সারাদিন না ফিরলেও আর খুঁজতে যেত না। অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিল, সে ফিরবেই। না ফিরলেই কী! তার থাকা না থাকা সমান হয়ে গিয়েছিল ততদিনে তার কাছে। রাতের শয্যাসঙ্গী হওয়া ছাড়া আর কোনও ভূমিকাই ছিল না তার। রাতেও ফেরেনি সোনুয়া একদিন। অগ্রাহ্য করার চেষ্টায় পাশ ফিরে শুয়েছিল পার্বতী। কিন্তু ঘুম আসেনি কিছুতেই। খুট করে দরজা খুলে উঁকি দিয়েছিল বাইরে। চওড়া উঠোনের কোণে তখনও জেগে আছে মোষ দুটো। গোয়ালে তিনটে গাই। পাঁচিল ঘেরা বাড়ির সদর দরজা আটকানো ভিতর থেকে। হয়তো সে বাইরেই পড়ে আছে ঢুকতে না পেরে। ওদিকে কালো মেঘ নেমে এসেছে ছাদের কাছে। ছাদের ঘরে একাই থাকে রোশন, বড় ভাসুরের ছেলে। পড়াশোনা করে অনেক রাত পর্যন্ত। কিন্তু আজ তার ঘরেও আলো জ্বলছে না। বাইরের একটাই মাত্র হলুদ আলো কোনও রকমে আটকে রেখেছে মেঘটাকে মাথার উপর।

পার্বতীর ঘরের সমকোণে আরও তিনটে ঘর। সোনুয়ার দুই দাদার আর বাবা মায়ের। সেদিকে তাকায় পার্বতী সতর্ক চোখে। দরজা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে পার্বতী। উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। সদর দরজার দিকে যেতে গিয়েও কী ভেবে থমকে যায়। তারপর শ্বশুর শাশুড়ির ঘরের পাশ দিয়ে উঠে যায় সিঁড়ি বেয়ে, ছাদের দিকে। রোশনের ঘরের কার্নিশ ধরে রাস্তার দিকে ঝুঁকে দেখে পার্বতী। সদর দরজার বাইরের দিকটা চোখে পড়ে এখান থেকে। দরজা বরাবর একটাই মাত্র গাঁথা ইটের ধাপ। তারই ওপর কুঁকড়ে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে সোনুয়া, মাথার তলায় কনুই মুড়ে। যেন কতই আরামে!

‘হায় রাম!’ আঁৎকে ওঠে পার্বতী। বোধহয় শুনতে পায় সোনুয়া। মাথা তুলে একবার তাকায় তার দিকে। চেয়ে থাকে বেশ কিছু ক্ষণ, যেন কিছু শোনার অপেক্ষায়। পার্বতী হাত নেড়ে বলে, ‘‘রুকো! অভি আতি হুঁ!’’

আশ্বস্ত হয়ে আবার মাথা নামায় সোনুয়া। কনুই মোড়া বালিশে মাথা দিয়ে আবার শুয়ে পড়ে আগের মতোই। এবার যেন

আরও নিশ্চিন্ত আরামে। দ্রুত পায়ে পার্বতী নেমে আসে সিঁড়ি বেয়ে। গোয়াল পেরিয়ে দরজার দিকে এগোতেই হঠাৎ গোয়ালের অন্ধকার থেকে হাত বাড়িয়ে কেউ চেপে ধরে তার হাত। চমকে উঠে সে তাকায় মুখ তুলে। অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে সোনুয়ার মজলা ভাই। সান্দ্রতা ধরা চাপা গলায় বলে, ''কহাঁ চলি ইতনি রাত গয়ে?''

''বাহার সোনুয়া...!''

উত্তেজিত পার্বতী। কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই তার মুখের ওপর চেপে বসে মেজ ভাসুরের অন্য হাত। কানের কাছে মুখ নিয়ে আরও চাপা গলায় বলে, ''আওয়াজ না কর। চল অন্দর চল।''

''সোনুয়া বাইরে...''

''আমি জানি। আগে ঘরে চল। কথা আছে তোর সাথে।''

পার্বতীকে প্রায় টেনে হিঁচড়ে তারই ঘরের দিকে নিয়ে চলে মেজ ভাসুর। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় ভেতর থেকে। তারপর তার কাঁধ দুটো ধরে ঠেসে বসিয়ে দেয় বিছানায়। পাশে বসে বলে, ''শুন, বাত শুন...।''

''কিন্তু ও যে বাইরে...।''

''সেই কথাই বলছি, শোন।''

সেই কথা মেজো ভাসুর বলে না। সে অন্য কথা বলে, একেবারেই অন্য কথা। প্রায় ভান ভনিতাহীন সোজাসাপ্টা কথা। আমার সঙ্গে শুতে হবে। না হলে সোনুয়াকে তো ঢুকতে দেব, কিন্তু তোকে বার করে দেব গেটের বাইরে। আর লোককে ডেকে বলব, সোনুয়াকে খোঁজার নাম করে এতক্ষণ তুই বাইরে ছিলি। হাত পা ছুঁড়ে পাল্টা আক্রমণ করতে যায় পার্বতী। চিৎকার করতে যায় গলা ফেঁড়ে। কিন্তু তাকে বিছানার উপর চিৎ করে ফেলে তার গলা টিপে ধরেছে তার মেজো ভাসুর। শ্বাসও বেরোচ্ছে না তার গলা দিয়ে। ওই অবস্থাতেই অন্য হাত দিয়ে সে দ্রুত খুলে ফেলছে তার চেলির হুকগুলো, ঘাঘরার বাঁধন গুলো...।

দুই পা ছুঁড়ে লড়ার চেষ্টা করে পার্বতী। আর তখনই তার দুই উরুর ওপর চেপে বসে মেজ ভাসুর। আগেই সে কখন সরিয়ে ফেলেছে নিজের লুঙ্গি। সরিয়ে ফেলেছে পার্বতীর তরফেরও সব বাধা। দু'টো হাত দিয়ে চেপে ধরেছে তার গলাটা। ঝুঁকে পড়েছে তার ওপর। দাঁত কিড়মিড় করে বলছে, ''মান যা... মান যা...! বরনা জান চলি জায়েগি তেরি।'' সেই মুহূর্তে সেটাই সত্যি মনে হল পার্বতীরও। প্রাণটাই যাবে তার। আর কয়েক সেকেন্ড যদি একইভাবে সে টিপে ধরে থাকে তার গলাটা, নিশ্চিত বেরিয়ে যাবে তার প্রাণ। সেই প্রাণ বাঁচানোর তাগিদেই তাড়াতাড়ি আত্মসমর্পণ করে পার্বতী। সমস্ত লড়াই শেষ করে আলগা করে দেয় হাত পা দেহ কাণ্ড। খুশি হয়ে তার গলা ছেড়ে দেয় সোনুয়ার মেজদা। ধড়ে প্রাণ ফিরে পাওয়ার মতো করে শ্বাস নেয় পার্বতী। মেজ ভাসুর খুশি হয়ে সোহাগের হাত বুলিয়ে দেয় তার সারা বুকে। পার্বতী নিজের প্রাণটুকু মুঠোয় করে পড়ে থাকে লাচার হয়ে। খেয়ালই করেনি কখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে বাইরে, ঝমঝমিয়ে।

হঠাৎ ঘেন্না করতে ইচ্ছে করে পার্বতীর নিজেকে। সমস্ত শরীর মুছড়ে সে কুণ্ডলি পাকিয়ে যেতে চায় কোনও সরীসৃপের মতো। তবু শরীর তার বাগ মানে না। সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি পাপ পুণ্য বিনাশ করে তার শরীর বেঁকে বসে পাপিষ্ঠের মতো। কুণ্ডলি পাকানোর আগে তারই ভিতর জড়িয়ে নেয় সোনুয়ার দুরাচারী মেজদাকে। তার ঘাতক বেষ্টনীর ফাঁক থেকে কোনও রকমে মুখ বার করে শ্বাস নেয় সোনুয়ার দাদা। ফিসফিস করে বলে, ''বিস্‌ওয়াস নহি হোতা... বিস্‌ওয়াস নহি হোতা...।''

সোনুয়ার মজলা ভাই চলে যাওয়ার পরও বেশ কিছু ক্ষণ বিছানায় একা পড়ে থাকে পার্বতী। লাঞ্ছনা অপমান ভোঁতা অথচ খুব ভারী কোনও ব্যথার মতো চেপে থাকে মাথার ভেতর। অথচ ছোট ছোট বিষ নেশার দানা তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে তার ছুটন্ত রক্তের ভেতর। সব জেনে সব বুঝেও যার সুখানুভূতি অগ্রাহ্য করতে পারেনা পার্বতী। হতাশায় নিজেই খানিক চুলোচুলি করে নিজের সঙ্গে। তারপর উঠে পোশাক পরে। চুল ঠিক করে। ভেজানো দরজা খুলে বেরিয়ে আসে বাইরে। গোয়ালের জীব গুলো লেজের ঝাপটায় মশা তাড়াচ্ছে আগের মতোই। নিঃশব্দ বার্তা ভাসছে ফুরফুরে বাতাসে—ঠিকই তো আছে সব... ঠিকই তো আছে সব... কেউ কিছু দেখেনি... কিচ্ছু না...। শুধু একটু জলকাদা হয়েছে উঠোনটা। সকাল হতে হতে শুকিয়ে যাবে আবার।

সদর দরজা খুলে পার্বতী ডাকে সোনুয়াকে, নির্লিপ্ত কন্ঠে, ''উঠো জি, অন্দর চলো।''

ভিজে চুপসে গেছে সোনুয়া, লাল বারমুডার ওপর একটা গেঞ্জি পরেছিল সকালে। এখন খালি গা। জিজ্ঞেস করতেও ইচ্ছে করে না পার্বতীর। হাত ধরে টান দেয়, নিয়ে চলে তার নষ্ট বিছানার দিকে।

মাঝ উঠানে পিছলে পড়ে সোনুয়া। হাঁচড় পাঁচড় করে সোনুয়া ওঠার জন্য। একেবারে চার হাতে পায়ে। বারবার পিছলে যায় তার হাত পা। পার্বতী নির্লিপ্ত দাঁড়িয়ে থাকে পাশেই। হাত বাড়িয়ে দেয় না তার দিকে। অদ্ভুত এক মজা পায় যেন সোনুয়াকে ওইরকম করতে দেখে। দিনের বেলা হলে গোটা বাড়ি হেসে কুটোপাটি হতো। বাড়ি বয়ে হাসতে আসত গ্রামের লোক। পাড়া প্রতিবেশি। এমন জন্তুর মত আচরণ....।

তবু সেদিন হাত বাড়িয়ে দেয়নি পার্বতী। আজ হাত পা ছুঁড়ে অথৈ জলে খুঁজছে তাকে। মুষলধারে বৃষ্টির ভিতর যদি কোথাও দেখা যায় তার লাল বারমুডা। কালো মাথা বা সামান্য বিকল পা একটা। সরকারি স্কিমের খাদ তখন ভরে এসেছে অনেকটা ওপর পর্যন্ত। তার ঢালু পাড় আর মাত্র কয়েক হাত বেরিয়ে আছে জলের বাইরে। সেই পার বরাবর চক্রাকারে দাপাদাপি করে পার্বতী। কেঁদে কেঁদে। কখনও কোমর জলে। কখনও বুক। কখনও আবার সাঁতার দেয় ডুবো জলে। গোটা গ্রামের লোক জড়ো হয়েছে খাদের পারে। ছাতা মাথায় ধরে। হতবাক হয়ে তারা দেখে কি আশ্চর্য সাবলীল কায়দায় সাঁতার কাটছে চৌহানদের পারোটা। যেন কোনও

জলেরই জীব। কী গোল গোল চক্কর মারতে পারে যতবার চাই। কোনও খাল বিল নদী ঝিলই পারবে না ওর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে। ব্রহ্মপুত্রের দেশের মেয়ে সে। এপার ওপার দেখা যায় না ব্রহ্মপুত্রের। সেই নদীর কুয়াশার ভিতর সকাল সকাল কোথায় মিলিয়ে যেতে পারে এই মেয়ে, কোনও অলৌকিক জলজীবের মতো। নিজের চোখেই তো দেখেছে সোনুয়ার বাবা দাদা কাকা..। ঘুম জড়ানো চোখে বেরিয়ে আসে তার বাবা দাদারা। বেরিয়ে আসে তার শ্বশুর শাশুড়ি পাড়া প্রতিবেশিরা।

''ক্যা হুয়া? হুক্কা হুয়া...?'' ক্যাঁচর ম্যাচর সাত সকালে। বেয়াক্কেলে মর্দ পার্বতীর। উত্তেজনায় সোনুয়া ঠিকমত কথাও বলতে পারেনা। নদীর দিকে হাত দেখিয়ে কোনও রকমে বলে, ''খো গয়ি... গায়ব হো গয়ি...।''

হুড়মুড়িয়ে লোকজন ছোটে ব্রহ্মপুত্রের দিকে। বাঁশ বন পেরিয়ে নদীর কিনারায় এসে অবাক সোনুয়ার বাবা দাদারাও। নদী যেন কোহরা হয়ে আকাশে উঠে গেছে। অথবা আকাশটাই নদী হয়ে নেমে এসে বয়ে গেছে ওদের গ্রামের পাশ দিয়ে। সোনুয়া সেই দিকেই হাত দেখিয়ে বলে, ''উস্ তরফ..কোহরে কে অন্দর..।''

সব শুনে পার্বতীর বাবা ওদের বোঝায়, সে তার রোজকার অভ্যেস। রোজ সকালে পার্বতী সাঁতার কাটে ব্রহ্মপুত্রের জলে। সে হল বুলবুলপুরের সেরা সাঁতারু। শুএকবার সাঁতার প্রতিযোগিতা হয়েছিল আশেপাশের সমস্ত গ্রামের ছেলেমেয়েদের নিয়ে। সবাইকে পেছনে ফেলে ফার্স্ট হয়েছিল পার্বতী। সেই থেকে সাঁতার তার নেশার মতো।

''আরে সে নয় হল, কিন্তু মেয়েটা গেল কোথায়?''

''কোথাও তো দেখা যাচ্ছে না।'' অধৈর্য হয়ে বলে সোনুয়ার বাবা। নদীর ওপার দেখা না গেলেও বেশ অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। শুধু জল আর জল। পার্বতীর নাম ধরে হাঁক পাড়ে তার বাবা। নদীর দিকে মুখ করে। মুখের সামনে হাতের একপেশে চোঙা তুলে। বার তিনেক ডাকতেই সাড়া আসে কুয়াশার ভিতর থেকে। অত্যন্ত ক্ষীণ কোনও শিশুকণ্ঠ মনে হয়। স্থির হয়ে অপেক্ষা করে পার্বতী শ্বশুরবাড়ির, বাপের বাড়ির লোক। আর কিছু ক্ষণের মধ্যেই কুয়াশার ভেতর নড়ে ওঠে একটা কালো মটর দানা। উল্টিপাল্টি খেতে খেতে এগিয়ে আসে পাড়ের দিকে। আর কাছে আসতেই লজ্জায় সে যেন নিজেই গলে জল হয়ে যেতে চায়। তার বেয়াক্কেলে পতিদেও গোটা গ্রাম জড়ো করেছে নদীর পারে, শ্বশুর ভাসুর সমেত। সে নতুন বালিকা বধূ। গোটা গা সে ডুবিয়ে রাখে জলের আড়ালে। লজ্জায় সামনে এগিয়ে দেয় শুধু তার ছোট্ট মাথাটা। সমানে তাকে তখন বকে যাচ্ছে তার মা। বিয়ে হয়ে গেছে তার। আর ছোটটি নেই...। শ্বশুর ঘরে গিয়ে এমন করলে...।

তখন কি আর সে জানত তার শ্বশুরের দেশে ডুবোজল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। জলের উপর অনন্ত ঝাপসায়া তো কল্পনারও অতীত। তবু সেদিন সে সাঁতারের প্রথম পাঠ দিয়েছিল সোনুয়াকে। ব্যাপারটা বুঝে সবাই চলে গেলে সোনুয়া একা দাঁড়িয়ে ছিল নদীর পাড়ে। পার্বতী তখনও জলে। তাকে একা পেতেই উঠে এসে হিড়হিড় করে টেনে নামিয়ে ছিল নদীতে। হাত পা ছুঁড়ে হাঁচড় পাঁচড় করে সোনুয়া সেদিন আন্তরিকভাবেই নিয়েছিল সাঁতারের প্রথম পাঠ। এখন সেই বিদ্যে খাটিয়ে সে হয়রান করছে পার্বতীকে। মুষলধারে বৃষ্টির ঝাপসায়ার ভিতর সেও লুকিয়ে আছে ইচ্ছে করে। শোধ তুলছে পার্বতীর ওপর। কেমন সে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল সেদিন তাকে। আজ তার পালা।

পার্বতী হাঁক পাড়ে যত জোরে পারে। বৃষ্টির ঝমঝম কোলাহলের ভিতর করুণ লাগে তার কণ্ঠ। তবু সে ডাকতে থাকে তার গলা ভেঙে পড়া পর্যন্ত, ''শুনতে হো জি... মুনিয়াকে পাপা... কাঁহা চলে গয়ে...।''

পিছন ফিরে দেখে পারে দাঁড়িয়ে সোনুয়ার বাবা। তাঁর কাছে গিয়ে পার্বতী বলে, ''বাবুজি আপ বুলাও না... আপ তিনবার বুলাও বাবুজি... তিনবার...।''

সোনুয়ার বাবা ডাকে সোনুয়ার নাম ধরে। বারবার তিনবার। সাগ্রহে জলের দিকে তাকিয়ে থাকে পার্বতী। আর সত্যি সত্যিই...। চমকে ওঠে সে। আর্ত চিৎকার করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে। সোনুয়ার বাবাও দেখে বৃষ্টির ঝাপসায়ার ভিতর জলের উপর ভাসছে একটা মটর দানা। বৃষ্টি পড়ে উল্টিপাল্টি খাচ্ছে অসহায় ভাবে। কিন্তু এগোচ্ছে না পাড়ের দিকে একই জায়গায়...।

পার্বতী সাঁতার কাটছে দানাটার দিকে। ঘাঘরা চোলি দুপট্টা পরেও অবিশ্বাস্য সাবলীল তার গতি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে পৌঁছে যায় বস্তুটার কাছে। আর হতাশ হয়ে দেখে, সোনুয়া নয়। তবে জিনিসটা সোনুয়ারই সম্পত্তি। একটা প্লাস্টিকের কৌটো। প্যাঁচ দেওয়া ঢাকনা আঁটা। সর্বক্ষণ থাকত সোনুয়ার বারমুডার পকেটে। কৌটোটা আঁকড়ে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠে পার্বতী। সেটাই সঙ্গে নিয়ে আবার উঠে আসে পারে। সন্তর্পণে কৌটটা খুলে দেখে ভিতরে ওসব কিচ্ছু নেই। শুধু একটা প্লাস্টিকের গোলাপি নিপল। কাল রাতেই এর কথা সে বলছিল তার আড়াই মাসের মেয়ে মুনিয়াকে। কাঁথায় শুয়ে তার মেয়ে শুধু খিলখিলিয়ে হাসে আর হাতের কাছে যা পায় তাই মুখে দিয়ে চোষে। পার্বতী বলেছিল, ''মুনিয়াকে পাপা শুনতে হো, কল এক নিপল লা দেনা হমার বিটিয়া রানি কে লিয়ে।''

সোনুয়া তখন পাশে বসে তাকিয়ে ছিল মেয়ের দিকে। পার্বতী সত্যিই তাকে জিনিসটা আনতে বলেনি। অতটা দায়িত্ব নেওয়ার মতো সুস্থতা তখনও তার ফেরত আসেনি। যদিও ওই ইউনুস ডাক্তারের পাঁচন পর্ব শেষ হওয়ার পর ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতিই হচ্ছিল বলা যায়। বিশেষ করে পার্বতীর পেট ফুলতে শুরু করার পর।

ততদিনে সামান্য হলেও উন্নতি হয়েছে সোনুয়ার। চব্বিশ ঘন্টা এক রকম সে আর থাকত না। সকালের দিকে সদ্য বিছানা ছেড়ে বেশ সুস্থই মনে হত তাকে। ঘরের কাজে হাত লাগাতো স্বেচ্ছায়। কথা শুনত পার্বতীর বাধ্য স্বামীর মতো। মুনিয়া



জন্মানোর পর তো রীতিমতো পাল্টে গেছিল সোনুয়া। বাচ্চার সারা রাতের কাঁথা ন্যাকড়া সব ওই কাচত সকালে। পার্বতী অবাক হয়েছিল যেদিন সোনুয়া ওর মাজলা ভাইয়ের কথা জানতে চেয়েছিল। বেশ অসংলগ্ন রাগ দেখিয়ে বলেছিল, ''ওহ্ কিঁউ আতা হ্যায় তেরে পাস?''
ওর মজলা ভাইয়ের আসাটা যদিও অভ্যেস হয়ে উঠেছিল পার্বতীর কাছে ততদিনে। সোনুয়াকে আরও উসকে দেওয়ার জন্য বলেছিল, ''কিঁউ? কোই পরেসানি হ্যায় তুঝে?''
কথার ধরনে শ্লেষ ছিল যথেষ্ট তীব্র। এতটাই যে সোনুয়ার মতো লোকও কেঁদে ফেলেছিল সেদিন। কাঁদতে কাঁদতে সে জানিয়েছিল, ''তার ভাল লাগেনা। রাগ হয়... দুঃখ হয়...। ইচ্ছে করে খুন করে ফেলি।''
''তো করো না কেন? দিনের পর দিন তোমার বউয়ের ইজ্জত লুটছে তোমার সামনে! কেমন মরদ তুমি? চোখ বুজে থাকো! লজ্জা করে না তোমার! নিজের বউয়ের মর্যাদা বাঁচাতে...।''
আরও কত কি বলে সোনুয়ার মাথা খেয়েছিল পার্বতী সেদিন। তারপর পাকানো বাঁশের তেল খাওয়া লাঠিটা সোনুয়ার হাতে দিয়ে বলেছিল, ''পকড়ো। সর ফোড় ডালো উসকা।''
চোখে মুখে অমানুষিক জেদ নিয়ে লাঠিটা আঁকড়ে ধরেছিল সোনুয়া। পার্বতী যদিও গুরুত্ব দেয়নি। কারণ, সে জানত রাতের খাবার সময় হতে হতে সোনুয়া সব ভুলে যাবে। তারপর নিজেই তাড়াহুড়ো করে বিছানায় টেনে নেবে পার্বতীকে। কখন যে রাত গভীর হলে তার মজলা ভাই এসে দরজায় টোকা দিল। তার বউ উঠে ছিটকিনি খুলে দিল। তারপর যাতে না তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, দুজনে কম্বল পেতে শুলো মেঝের ওপর। শুয়ে শুয়ে বিস্তারিত খুঁটিনাটির যত্ন নিতে লাগল একে অপরের শরীর জুড়ে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত... মাথা থেকে পা পর্যন্ত। এমনকি পায়ের দিকে মাথা দিয়ে তার মজলা ভাই...।
আর সেই সুযোগটাই নিল সোনুয়া। লাঠির সামনে সহজ লক্ষ্য পেয়ে গেল সাজানো মটকার মতো। একঘায়ে চুরমার করার মন নিয়েই চালিয়ে দিল লাঠিটা। কিন্তু অন্ধকারে ঠিক দাগে দাগে পড়েনি। তাতেই মজলা ভাইয়ের প্রাণটা গেল বেঁচে। কিন্তু মাথা ফেটে রক্তারক্তি হওয়া তাতে আটকাল না। তার চেয়েও বড় কথা গোটা গ্রামের লোকে জেনে গেল, দো ভাই এক পারোর কিসসা। কারণ, মজলা ভাইকে নিয়ে মাঝরাতে ছুটতে হল হাসপাতালে। বাবা মা, বড় ভাই, বড় দুই জা..., সবাই মিলে দুষতে লাগল পার্বতীকেই। এরপর থেকে গভীর রাতের ওই খেলাটা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পার্বতীর দুর্দশা যায় আরও বেড়ে। তাকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা দেওয়ার নতুন একটা মোক্ষম কারণ যেন সবাই পেয়ে যায় হাতে। পার্বতী একদিন বলতে গিয়েছিল তার মজলি জেঠানির কাছে। সোনুয়ার মজলি ভৌজি। তিনটে গ্রাম পেরিয়েই তার মাইকা, বাপের ঘর। একেবারে খাঁটি মেওয়াটি দেশি মেয়ে। পারোদের থেকে মানে ইজ্জতে অনেক উঁচু দরের জীব। যতই সে বাধ্য হোক শাড়িটাকে বোরখা করে পরতে। তবু সে পারো নয়। তাই কোনও পারো সামনে এসে দাঁড়ালে গর্ব হয় নিজের জন্য।
পার্বতী মজলি জেঠানিকে বোঝানোর চেষ্টা করে, ''কসুর মেরা নহি থা দিদি।'' সে কথা মানতে নারাজ মেজো জেঠানি। তারই হয়ে কথা বলতে এগিয়ে আসে বড়কি জেঠানিটাও। সেও যে লোকাল মেয়ে। তারা দুজনে মিলে চাপা স্বরে গালাগালি দেয় পার্বতীকে। যাতে না বাড়ির অন্য লোকের শুনতে পায়। কানে

আসে তারা যা নয় তাই বলে যাচ্ছে তার নামে। সে নাকি একটা বেশ্যা মাগি। বরটা পাগল হওয়াতে সেও পাগল হয়েছে পুরুষের ওইটার জন্য। লজ্জার মাথা খেয়ে হাত বাড়িয়েছে তাদের পুরুষদের দিকে। খেয়ালও তার নেই যে সম্পর্কে তারা ভাসুর হয়। এতই তার...।
পার্বতী মুখ বুঝে শোনে সব গালাগাল। তারা থামলে সে আবার বলার চেষ্টা করে জবরদস্তি করা হয়েছে তার ওপর। ক্ষেপে গিয়ে আবার গালাগাল শুরু করে দুই জেঠানি মিলে। পার্বতী চুপ করে শোনে। টানা প্রায় আধঘণ্টা সে দাঁড়িয়ে থাকে দাঁতে দাঁত চেপে। নিজেকে অন্যমনস্ক করার চেষ্টায় অন্য কথা ভাবে। মন দিয়ে দেখে তাদের গা হাত পায়ের রুক্ষতা। কর্কশতা। তাদের বড় হাড়ের কাঠামোর কাষ্ঠলতা। সামগ্রিক বিরসতা। তারপর আচমকাই নিজেই নিজের ব্লাউজ টেনে তোলে ওপরে। ভিতর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসে বিরাট দুটো স্তন। দুচোখে তীব্র শ্লেষ ফুটিয়ে পার্বতী বলে, ‘‘দেখ্। আঁখে ফাঁড়কে দেখ্।’’
সত্যি তারা তখন দু’চোখ ফেঁড়ে দেখছে। হাঁ হয়ে গেছে দুজনেরই মুখ। কিন্তু আওয়াজ বেরোচ্ছে না গলা দিয়ে। অবাক বিস্ময়ে শুধু চেয়ে আছে পার্বতীর বুকের দিকে। যেন সত্যিই সেগুলো বিস্ময়কর। পার্বতী আবার বলে, ‘‘দেখ্! দেখ্! অউর অপনাওয়ালা নিকালকে দিখা...।’’
জেঠানিরা ঠিক বুঝে উঠতেও পারে না পারোটা কী বলতে চাইছে। শেষে পারো নিজেই ব্যাখ্যা করে বোঝায়, ‘‘এমন জিনিস যদি হাতের কাছেই থাকে, তো তোদের দিকে আর কে ফিরে তাকাবে!’’ বাকরুদ্ধ তার দুই জেঠানি। অদ্ভুত অহংকার হয়েছিল সেদিন পার্বতীর। ওদের স্থানীয় অহংয়ের মূলে যেন কুঠারাঘাত করতে পেরেছিল। তার সেই স্তন আজ মায়ের সুধারসে পরিপূর্ণ। ভরাট হয়ে উঠেছে তার চোলির সীমানা ঠেলে। তার পাতলা দুপট্টা ভিজে লেপটে আছে স্বচ্ছ পর্দার মতো। তার সেই অহংকার সে নিঃসংকোচে মেলে ধরে আছে গোটা আজাদপুরের সামনে। একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার শ্বশুর। তার পাশে সোনুয়ার দুই দাদা। সোনুয়ার প্লাস্টিকের কৌটোটা তাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে পার্বতী কাঁদতে কাঁদতে বলে, ‘‘দেখিয়ে তো! কিতনি খয়াল রখতে থে অপনি বচ্চি কা।’’
ততক্ষণে সোনুয়ার কৌটোটা ভরে উঠেছে বৃষ্টির জলে। জলের ওপর ভেসে উঠে একেবারে হাতের নাগালে চলে এসেছে প্লাস্টিকের গোলাপি নিপল। সোনুয়ার বাবা কৌটোটা উল্টে জল ফেলে দেয়। নিপলটা আবার কৌটোর তলায় তলিয়ে গেলে ঢাকনা এঁটে দেয় প্যাঁচ ঘুরিয়ে। পার্বতী আবার কেঁদে পড়ে তার পায়ে, ‘‘এসা কুছ করো বাবুজি। পম্প সে পানি নিকালো।’’
বৃষ্টি ছেড়ে গেছে ততক্ষণে। খবর রটে গেছে আরো পাঁচটা গ্রামে। সরকারি খাদের জলে ভরে ওঠা। আর সেই জলে একজনের ডুবে মরা। কাতারে কাতারে লোক জমেছে খাদের গোলাকার পাড় ঘিরে। অবাক হয়ে তারা দেখছে খাদের জল। তারপর খোঁজ নিচ্ছে সেই অলৌকিক পারোর। খাদের পাড়ে যে জায়গায় পার্বতী তখনো থেবড়ে বসে আছে, সেখানেই ভিড় জমেছে সবচেয়ে বেশি। কথায় কথায় লোকে নামও দিয়ে দেয় এই নতুন জলাশয়ের, ‘পারো দরিয়া।’
বৃষ্টি ছেড়ে গেলে তার ঝাপসায়াও আর থাকে না। খাদের এপার ওপার পরিষ্কার দেখা যায়। ছেঁড়া মেঘের কালচে টুকরোয় ছয়লাপ হয়ে থাকে আকাশ। তাদেরই ছায়া পড়ে দরিয়ার জলে। মেঘ-আলো-জল-ছায়া মিলে দরিয়া জুড়ে তৈরি করে বিভ্রম। পারে বসে মনে হয় অনেক কিছু ভেসে বেড়াচ্ছে জলাশয় জুড়ে। তাদের মধ্যে কোনওটা বা সোনুয়ার দেহ হতেও পারে। ব্যস্ত হয়ে পার্বতী আবার জলে নামতে যায়। তাকে বাধা দেয় সোনুয়ার বাবা। সোনুয়ার ভাইপো রোশন। ধীরে ধীরে কমে আসে ভিড়। কমতে থাকে আলো। এক সময় অন্ধকার করে আসে জল মাটি ঝোপঝাড়। পার্বতী তেমনই বসে থাকে খাদের পাড়ে। হাজার চেষ্টা করেও তাকে ঘরে ফেরাতে পারে না তার শ্বশুরবাড়ির লোক। কেঁদে কেঁদে সে বলে, ‘‘ঘর তো মেরা ডুব গয়া দরিয়া মে...।’’
অবশেষে সেই মজলি জেঠানিই পারে তাকে ঘরে ফেরাতে। দুধের জন্য কাঁদতে থাকা মেয়েকে কোলে করে নিয়ে যায় দরিয়ার পাড়ে, তার মায়ের কাছে। পার্বতীর কোলে তাকে তুলে দিয়ে বলে, ‘‘দিনভর ভুখি হ্যায়।’’ মাতৃ প্রবৃত্তির নিয়মেই হয়তো বুকের দুধ খাওয়াতে যায় পার্বতী তার মেয়েকে। তারপর কী ভেবে থেমে যায় হঠাৎ। সোনুয়ার কৌটোটা খুলে বার করে আনে প্লাস্টিকের নিপলটা। তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ বস্তুটার দিকে। তারপর গুঁজে দেয় মেয়ের মুখে। মেয়ে প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়ে চোখ তুলে তাকায় মায়ের দিকে। অশ্রদ্ধা ভরে টানে নিপলটা দু-একবার। তারপর হঠাৎই যেন পেয়ে যায় অন্য স্বাদের মজা। হাত পা ছুঁড়ে মহানন্দে সিন্থেটিক মধুর নেশায় মজে যায় মেয়ে। এই প্রথমবার পার্বতী সত্যি সত্যি মন ফেরাতে পারে দরিয়ার দিক থেকে। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় এ আরো বড় এক দরিয়া। পার করতে হবে তাকে একা একা।
মেয়েকে কোলে নিয়ে পার্বতী পিছন ফেরে দরিয়ার দিকে। দৃপ্ত ভঙ্গিতে পা বাড়ায় ঘরের মুখে। তাকে দেখে মনে হয় না কোথাও কোনও পিছুটান আছে।
সোনুয়ার শোক সামলে ওঠার জন্য তিন দিন সময় পেল পার্বতী। এই তিন দিন সে, যাকে বলে, বসে বসে খেলো। তারপর তৃতীয় রাত ভোর হতেই টোকা পড়ল তার দরজায়। বড় জেঠানি ডাকতে এসেছে। কাল রাতের চৌকা বর্তন সব পড়ে আছে। জামা কাপড় কাচা হয়নি কতদিন। উঠোনে ঝাড়ু পোছা পড়েনি ঠিকমতো বহুদিন হল। গরু মোষগুলো গোবর মেখে বসে আছে। চান করাতে হবে তাদের। পরিষ্কার করতে হবে গোয়ালঘর। রান্নাবান্না আছে। তারপর যেতে হবে মাঠে ক্ষেতের কাজ করতে। সেখানে জমি তৈরি হয়ে আছে জল পেয়ে। ছড়াতে হবে শস্য বীজ। বাজরা,

বার্লি, রহর...। নিড়াতে হবে আগাছা, কোদাল কাস্তে নিয়ে...।

এক রকম তাকে টেনে বার করে নিয়ে গেল তার ঘর থেকে। আর আক্ষরিক অর্থেই তাকে জুতে দিল কাজে। যেন সে একটা গৃহপালিত পশু, যাকে পোষাই হয়েছে কাজ করানোর জন্য।

পার্বতীর মেয়ে তখনো ঘুমোচ্ছে। সদ্য পিতৃহারা সে, যার গুরুত্ব সে বোঝেনা। পার্বতীও সদ্য স্বামীহারা। কিন্তু সেও বোঝেনি তার গুরুত্ব। একজন তরুণী পারো, কন্যা সন্তান নিয়ে বিধবা হলে কী হয়, সে জানে না তখনও। হয়তো সংসারে কাজ বেশি করতে হয়। অধিকার কম খাটাতে হয়। একটু কুঁকড়ে থাকতে হয় আশ্রিতের মত। পরিবারের করুণার পাত্র হয়ে।

মনে মনে এসব সে ভেবেই রেখেছিল। এক রকম সে প্রস্তুতই ছিল এটুকু মেনে নেওয়ার জন্য। তাই বড় জেঠানির কোনও অসুবিধাই হল না পার্বতীকে ঘুম থেকে তুলে টেনে কাজে লাগাতে। না হলে যা সে জেদি মেয়ে! প্রতিবাদে ফুঁসে উঠবে জেনেই বড় জেঠানি এসেছিল তাকে ডাকতে। মেজো হাতে মোটা লাঠি নিয়ে অপেক্ষা করেই ছিল দরজার আড়ালে। কিন্তু তারা অবাক হল দেখে, সেসবের কোনও প্রয়োজন হল না। কেন হল না সেটাও একটা ভাববার বিষয়।

কিন্তু প্রতি রাতে যে শুধু বাসন আসবে না, সে কথা পার্বতী আন্দাজই করেছিল। কিন্তু সে ভেবেছিল মূলত আসবে তার মেজো ভাসুর। যেমন সে আগেও এসেছে। সোনুয়া থাকতেই এসেছে। এখন তো সোনুয়া নেই। সে তো আসবেই। পার্বতীর মনে হল যেন বা সে এক রকম অপেক্ষাই করছে মেজো ভাসুরের জন্য। মনে মনে সে প্রস্তুতই হয়ে আছে তার লালসার শিকার হওয়ার প্রত্যাশায়। তাই ঘরে বাইরে সারাদিন গৃহপালিত পশুর মত খেটেও পার্বতী জেগে থাকে তার ঘুমন্ত মেয়ের পাশে। কান পেতে থাকে দরজার দিকে।

তারপর একদিন গভীর রাতে সত্যিই খুটখুট আওয়াজ ওঠে দরজার শেকলে। ঘুম ভেঙে যায় পার্বতীর। কিন্তু আর কোনও শব্দ হয় না। অনেকক্ষণ হয় না। তারপর আবার শব্দ ওঠে শেকলে কাঠে ঠোকাঠুকির। এবার যেন আর একটু জোরে। পার্বতীর বুক ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। আতঙ্কের একটা হিমস্রোত নেমে যায় তার শিরদাঁড়া বেয়ে। আড়ষ্ট হয়ে সে পড়ে থাকে তার বিছানায়। কান পেতে থাকে দরজার দিকে। কিন্তু সে শব্দ আর হয় না। পার্বতী কান পেতে শুয়ে থেকে থেকে এক সময় কখন আবার ঘুমিয়ে পড়ে। খেয়াল নেই কতক্ষণ পরে আবার ঘুম ভেঙে যায় পার্বতীর। আবার সেই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে। কিন্তু শব্দ এবার সংকোচপূর্ণ নয়। উল্টে একধরনের আগ্রাসন আছে। পার্বতী তবু ওঠে না। বন্ধ জানলার ফাঁকে আলোর আবছা রেখা দেখে বোঝে ভোর হয়েছে। সময় হয়েছে এই যৌথ সংসারের জোয়াল কাঁধে তুলে নিয়ে কাজে লেগে পড়ার। এমন এক সংসার যে সংসারে নিজেকে একজন ভাবতে পার্বতীর ঘেন্না হয়। আর সে জানে তার মেয়ে বাদে বাকি এগারো জনেরও ঘেন্না হয় তাকে সংসারের একজন ভাবতে। অবশ্য বাড়ির বাচ্চারা তাকে পছন্দ করে। বিশেষ করে, রোশন। বড় জেঠানির বড় ছেলে। কলেজে পড়ে। সে আর বাচ্চা নেই যদিও। আবার ঝনঝনিয়ে ওঠে লোহার শেকল। শাল কাঠের পাটার উপর ঠোকাঠুকিতে ধৈর্যহারা তার ছন্দ। সঙ্গে বিরক্ত এক নারী কণ্ঠ আসে কানে। শাশুড়ির গলা, 'অউর কিতনি সোয়েগি মহারানি! অনেক আরাম হয়েছে। ওঠ, এবার কাজে লাগ।'

পার্বতীর ভাবনাগুলো ছিড়ে পড়ে। ঘুম ভেঙে কেঁদে ওঠে মেয়ে। দরজা খোলার আগে মেয়েকে ভর পেট দুধ খাইয়ে দিতে চায় সে। জানে না আবার কখন কাছে পাবে। তাই সে মেয়েকে কাছে টেনে একটা স্তন গুঁজে দেয় তার মুখে। গলা তুলে বলে, 'মেয়েকে দুধ খাইয়ে যাচ্ছি।' বাইরে থেকে আরও কী কী বলে দজ্জাল বুড়িটা, পার্বতী কানে নেয় না। তার ভীষণ ইচ্ছে করে শুয়ে থাকতে। সারাদিন শুয়ে থাকতে। না হয় খাবে না আজ কিছু। একদিন না খেলে কী হয়! এমন কত অনাহারে দিন কাটিয়েছে যখন ছোট ছিল। খালি পেটেই ভাই বোনেরা হেসে খেলে কাটিয়ে দিত গোটা দিন। আজ ফিরে ভাবলে মনে হয় ভালই তো ছিল। কোনও কষ্ট তো ছিল না মনে। কখনও তো জীবজন্তু মনে হয়নি নিজেকে। এমনকি গুনগুন করে গান গাইত বাবা। রান্নার ফাঁকে ফাঁকে মা ট্রেনিং দিত বিহু নাচের। মা বলত, 'যে মেয়ে বিহু নাচতে পারে না, সে অসমের মেয়ে না।'

বিহুর মাঠে লাল সাদা এক প্রজাপতির মতো যেন ওড়াউড়ি করত তার মা। প্রতিবছর বৈশাখে আর পৌষে। সেই দৃশ্য দেখতে গোটা গ্রাম জড়ো হত মাঠে। গ্রামের মেয়েরা বিহুর গুরু মানত তার মাকে। উৎসবের আগের গোটা মাস তারা নাচ শিখত মায়ের কাছে। আর কী যে আনন্দ পেত মা এইসব করতে! সে আর বলার কথা না। কোনও দিন হয়তো ভাতই জোটেনি পেটে। কিন্তু তার মুখ দেখে সে কথা বোঝা যেত নয়। আর এই মায়ের মেয়ে হয়ে পার্বতী কিনা সাঁতারে বেশি আগ্রহী! মায়ের সেটা মোটেই পছন্দ ছিল না। কিন্তু বাবা ছিল তার দলে। বাবা বলত, ''আরে ও বিহুই তো নাচে। শুধু ডাঙার বদলে জলে নাচে। ওর বিহু জলবিহু।''

বাবার কথা শুনে পার্বতী সত্যিই চেষ্টা



ওর মজলা ভাইয়ের আসাটা অভ্যেস হয়ে উঠেছিল পার্বতীর কাছে। সোনুয়াকে আরও উসকে দেওয়ার জন্য বলেছিল, ''কিঁউ? কোই পরেসানি হ্যায় তুঝে?''

করত জলবিহু ধরনের কিছু একটা করতে। বিহুর মতো কোমরে হাত দিয়ে সাঁতার কাটার এক অভিনব কৌশল সে রপ্তও করেছিল। সেটাকেই সে বলত জলবিহু। তার বন্ধুরা দেখে খুব মজা পেত। কী জানি কেন, আজ আবার ভীষণ ইচ্ছে করছে তার জলবিহু নাচতে। জলও তো আছে এখন দরিয়ায় ভরপুর। চাইলে সে...।

হঠাৎ ঝাঁঝালো গলা কানে আসে পার্বতীর। বাইরে থেকে তার শাশুড়ি বলছে, ''ফুর্তি দেখো! ফুর্তি দেখো পারো কি! গুন গুন করে গান গাইছে!''

পার্বতীর খেয়াল হয়, নিজের অজান্তেই কখন সে বিহুর সুর গুনগুনিয়ে গাইতে শুরু করেছে। প্রথমটা খুব ঘাবড়ে যায়। যেন কোনও অপরাধ করে ফেলেছে। তারপর মনে হয়, গানই তো গেয়েছে। মরুক গে চেঁচিয়ে বুড়িটা। ঝাল মুড়ি নিয়ে ওই সিনটা না করলে আজ সোনুয়া বেঁচে থাকত। এমন অনাথ হয়ে পড়ত না তার মেয়েটা। পার্বতী গড়িমসি করে আরও মিনিট দশেক কাটিয়ে দেয়। তারপর গিয়ে খোলে দরজাটা। ততক্ষণে বাইরে তার শাশুড়ি আর দুই জেঠানি রেগে আগুন। পারলে মেরেই ফেলে পার্বতীকে। গাল দেয় প্রাণ ভরে। শুধু তাকে নয়। তার বাপ মাকে। তার গ্রামকে। তার গ্রামে যত নদীপুকুর জলাশয় আছে, তাদেরকে। বলতে গেলে ব্রহ্মপুত্র-সহ গোটা অসমকে গালাগালি দেয় তার শাশুড়ি। যেন পার্বতী নিজেই একটা অসম। তার নাচ গান বিহু সাঁতার জলরাশি সবই যেন এক একটা ত্রুটি। সোনুয়ার মৃত্যুর জন্য পার্বতীকেই দায়ী করে তার শাশুড়ি। ভুল নাকি সোনুয়ার বাপ দাদারই। তারাই পয়সা দিয়ে সুদূর অসম থেকে কিনে এনেছে এক মূর্তিমান অভিশাপ। এইসব গালাগালি পার্বতী যে শুয়ে শুয়ে খাচ্ছে, এমন নয়। সে তো রাজ্যের বাসন নিয়ে বসেছে কুয়ো তলায়। লাভের মধ্যে বাসনে একটু বেশি আওয়াজ তুলছে সে। ঘষছে বেশি। যাতে বাসনে চাপা পড়ে যায় বুড়ির কটু কথাগুলো। যদিও সেটাই আবার নতুন গালাগালির প্রেরণা হয়ে দাঁড়াচ্ছে শাশুড়ির কাছে। বাসন ধোওয়ার পর পার্বতী ঝাড়ু পোছায় লাগে। গোড়াতেই সে সাবান জলে ভিজিয়ে রেখেছিল তিন গামলা জামা কাপড়। সেসব সে কেচে ধুয়ে নিংড়ে আবার গামলায় জড়ো করে। তারপর গামলা নিয়ে ছাদে চলে যায় রোদে মেলতে।

ছাদের একমাত্র ঘরে থাকে একা রোশন। সেখানেই সে পড়াশোনা করে। রাতে ঘুমোয়। পার্বতী ছাদে গিয়ে দেখে রোশন বাইরে একটা চারপাইয়ের ওপর রাজ্যের বই ছড়িয়ে বসেছে। পার্বতীর ছাদে ওঠার আওয়াজ পেয়ে রোশন চোখ তুলে তাকায়। চোখাচোখি হতেই মিষ্টি করে হাসে। পাল্টা হাসে পার্বতীও। কিন্তু কোনও কথা বলে না। দড়িতে জামা কাপড় মেলতে শুরু করে। কিছু ক্ষণ পরে রোশন নিজেই বলে, ''কাকি শুনছ?''

''কি?''

''এক বাত পুঁছু?''

''পুছো।''

''এই বুড়িটাকে তোমার ক্যালাতে ইচ্ছে করে না?''

পার্বতী হেসে ফেলে রোশনের কথা শুনে। শরীরের এত পরিশ্রমের সঙ্গে মনটাও মরে আসছিল ধীরে ধীরে। রোশনের কথা শুনে তার পরেও হাসি ফোটে পার্বতীর মুখে। রোশনটা এমনই। হয়তো শিক্ষিত বলেই অনেকটা মানুষের মতো নিজেও, আর মানুষ ভাবে পার্বতীকেও। শুধু পার্বতীকে বলে নয়। সব পারোদেরই সে মানুষ ভাবে। বলে তাদের অধিকারের কথা। যদিও গোপনে। গোপন শুধু তার পরিবারের কাছ থেকে নয়। গোটা গ্রামেরই কাছ থেকে। শুধু গ্রামই বা কেন, গোটা প্রদেশের কাছ থেকে। কারণ, পারো তো এদেশের ঘরে ঘরে। আর কম বেশি সব ঘরেই একই দশা পারোদের। যেহেতু পয়সা দিয়ে কেনা বউ, একেবারে লাভ ক্ষতির নিক্তিতে ঝোলানো পারোদের জীবন। একটু এদিক ওদিক হলে টালমাটাল হয়ে পড়ে সবকিছু। এমনটা হলে এদের সুবিধা। সবার সুবিধা। তাই এই ব্যবস্থাই বজায় রাখতে চায় সবাই। এমন স্থানীয় মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, যে উল্টো কথা বলবে। রোশন এমনই এক উল্টো মানুষ।

পার্বতী উত্তর দিচ্ছে না দেখে রোশন আবার বলে, ''ইচ্ছে করে, তাই না?''

পার্বতী বলে, ''থারো দাদি ছে ওহ্।''

রোশন বলে, ''তুমিও তো বৌমা ওর। সে কথা কি ও মানে?''

পার্বতী উত্তর দেয় না। এইসব কথা বলে লাভ তো কিছু নেই। বরং অত্যাচার বাড়তে পারে। তার জন্য বকুনি খাবে রোশনও। সোনুয়া নেই বেশ কিছু মাস হয়ে গেল। মেয়েও বড় হচ্ছে তরতরিয়ে। এর মধ্যে একদিনও সে মার খায়নি। একদিনও গভীর রাতে মেজো ভাসুর কড়া নাড়েনি তার দরজায়। খেতেও পায় পেট ভরে। গ্রামের অন্য পারোদের তুলনায় সে তো ভালই আছে বলতে হবে। ওদের ক্ষেতের পাশাপাশি ক্ষেত বিষ্ণু সিং ঠাকুরদের। ওদের মোলকি সুস্মিতা। পশ্চিম বাংলার মেয়ে। খুব কাঁদে মেয়েটা। জামা তুলে ঘাঘরা তুলে দেখায় মারের কালশিটে, নীলশিটে। সুস্মিতা মেনে নিতে পারে না এই পারোদের জীবন। পালানোর চেষ্টা করেছিল তিন তিন বার। প্রতিবারই ধরে এনে মেরে আধমরা করেছে ওর বর ভাসুর আর শ্বশুর মিলে। ঘরে আটকে রেখে খেতে দেয় নি টানা কয়েকদিন। তবু সুস্মিতা শুধরায়নি। চতুর্থ বার পালিয়ে সে সোজা থানায় গেছিল। ভরসা ছিল পুলিশের ওপর। কিন্তু পুলিশ যে...।

''পালাও না কেন তুমি কাকি?'' হঠাৎ বলে বসে রোশন।

''পালাব?''

''হ্যাঁ! এইভাবে কি সারা জীবন কাটাবে?''

''পালাতে গিয়ে সুস্মিতার কি হল, দেখলে তো!''

রোশন বেশ কিছু ক্ষণ চুপ করে থাকে। পার্বতী ধূসর একটা চাদর তারে মেলে আড়াল করে দেয় রোশনকে। কিন্তু চাদরটা এত পাতলা যে আবছা করে তারপরও দেখা যায় রোশনকে। শোনা যায় সে বলছে, ''ওই রকম বোকার মতো দৌড় দিলে হবে না। অনেক আঁটঘাট

বেঁধে নামতে হবে।''
পার্বতী বলে, ''বোকা কোথায়? ও তো পুলিশের কাছেই গেছিল। মানে বলা যায় কানুন এর কাছে। দেশের কানুন দাঁড়াল ওর পাশে? উল্টে সাথ দিল ওদেরই।''
জবাব নেই রোশনের কাছে। কারও কাছেই নেই। অথবা জবাব আছে সবার কাছে। কিন্তু কেউ সে কথা মুখে আনবে না। কারণ, পুলিশ বলেছে সুস্মিতাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওর বাড়ির লোক সকাল সকাল গিয়ে থানায় রিপোর্ট লিখিয়েছিল, তাদের আদরের বহুরানি সুস্মিতা জাংরা, স্বামী রণবীর জাংরা, ভোরবেলা লোটা নিয়ে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। কিন্তু লোকে বিলকুল জানে সত্যিটা কী। সুস্মিতা ভোরবেলা বেরিয়ে নিজেই থানায় গেছিল ইনসাফ মাংতে। কিন্তু পুলিশ তাকে চৌকিতে আটকে রেখে ওর শ্বশুরবাড়ির লোককে ডেকে পাঠায়। তাদের দিয়ে মিসিং ডায়েরি করায় সুস্মিতার নামে। তারপর বলে, ''যাও, ঘর যাকে ব্যায়ঠো আরামসে। আমরা তিন দিনের মধ্যে তোমাদের বহুরানিকে খুঁজে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসব।''
এইসব কথা হয় চৌকিতে। সুস্মিতার সামনে। বিপদ বুঝে সুস্মিতা সঙ্গে সঙ্গেই দৌড় দেয় চৌকি থেকে। কিন্তু ওরা ধাওয়া করে ধরে নেয় ওকে। সুস্মিতা বড় রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছেই গেছিল। সেখানে কিছু লোকে দেখে, দু'জন পুলিশ ওর চুলের মুঠি ধরে চৌকির ভেতর নিয়ে যাচ্ছে। সেই শেষ দেখা গেছিল সুস্মিতাকে।
লোকাল পেপারে রিপোর্ট বেরিয়েছিল, 'এক মোলকি ভাগ গয়ি।' থানা প্রভারি বয়ান দিয়েছিলেন, 'খোঁজ জারি ছে।' মাসখানেক হয়ে গেল। লোকে ভুলেও গেছে সুস্মিতার নাম। কিন্তু সত্য ঘটনা কেউই ভুলবে না কোনও দিন। কারণ, এমনটা রোজ রোজ হয় না। আগেও হয়নি। হয়তো ভবিষ্যতেও হবে না। তাই লোকে ভুলতে চেয়েও ভুলতে পারেনা ওই বঙ্গালিন মোলকি পারোর কথা। চৌকিতে সেদিন আরও কিছু কয়েদি ছিল হাওয়ালাতের ভিতর। স্থানীয় চোর চক্কর। তারাই চৌকির গভীর রাতের গোপন গল্প ফাঁস করেছে বাইরে। সুস্মিতাকে আসলে চৌকিতেই গনধর্ষণ করা হয়েছিল। টানা পাঁচ দিন। তার চাপা চিৎকার রাত হলেই শোনা যেত পুলিশ চৌকির মোটামোটা দেওয়ালের ভুলভুলাইয়ার ভিতর। প্রথম দিন রীতিমতো তেজি চিৎকার। তরতাজা প্রতিরোধী চিৎকার। তার পরদিন সেই চিৎকার শুনে মনে হয়েছিল, আহত। রীতিমত জখম আর পঙ্গু। তৃতীয় দিন তো বলা যায়, অপাইজ হয়ে পড়েছিল সুস্মিতার কণ্ঠ। চতুর্থ দিন শুধু গোঙানি। পঞ্চম দিন ধুকপুকুনি। ষষ্ঠ দিন থেকে নীরব। আর কখনও কেউ শুনতে পায়নি সুস্মিতার গলা। দেখতে পায়নি কেউ তার রঙিন ঘাঘরা চোলির আভাস। সুস্মিতা যেন বিলীন হয়ে গেল ছোটখাটো দুর্গের মতো পুলিশ চৌকির ভুলভুলাইয়ার ভিতর। এসব গল্প সকলের জানা। স্থানীয় অখবারের পত্রকাররাও জানে এসব কথা। এমনকি, তারা তফতিস তদন্ত করতে হানাও দিয়েছিল পুলিশ চৌকিতে। একেবারে থানা প্রভারির টেবলে তার মুখোমুখি ক্যামেরা ধরে জেরা করেছিল তাকে। পরে সেই তদন্ত রিপোর্ট প্রতিবেদনের আকারে ছেপেও ছিল অখবারে। তাতেই গোটা দেশ জানল, আজাদপুর থেকে, 'এক মোলকি ভাগ গয়ি।' থানা প্রভারি জানিয়েছেন, 'খোঁজ জারি ছে।' হয়তো সুস্মিতা এখনও পুলিশ চৌকির ভেতরেই আছে। ভুলভুলাইয়ার শেষ প্রান্তে কোনও গোপন কোণে দফন হয়ে আছে। কিন্তু সুস্মিতা তো শুধু একটা জিসম ছিল না। তার একটা আত্মাও ছিল। সেই আত্মাটাও রয়ে গেছে পুলিশ চৌকির ভেতরেই। তাকে তো আর মাটিচাপা দিয়ে বিলুপ্ত করা যায় না। হাতকড়ি, পা বেড়ি দিয়ে আটকে রাখাও যায় না। সে মুক্ত আত্মা। তেমন সংযোগ হলে তার উপস্থিতি টের পায় কয়েদিরা। নাইট ডিউটির পুলিশেরা। অনুভব করতে পারে সুস্মিতার আত্মা নীরবতা ভাঙার চেষ্টা করছে। শুনতে পায় তার ধুকপুকুনি। তার গোঙানি। লোকে বলে, সুস্মিতার স্রাপ লেগে গেছে পুলিশ চৌকিতে। ছাদের ওপর পরপর তার টাঙিয়ে জামা কাপড় মেলার ব্যবস্থা। সব তারে জামা কাপড় মেলা হলে কেমন একটা পরপর গলিপথের মতো তৈরি হয়। তারই ভিতর এদিক ওদিক করতে করতে পার্বতীর মনে হয়, সেও একটা ভুলভুলাইয়ার ভিতর আটকে পড়েছে। সেই পুলিশ চৌকির মতো। যদিও এখানে অনেক আলো আছে। বাতাস আছে। আছে অনন্ত আকাশ আর অফুরান রঙের লহর। অন্ধকার এক ফোঁটা নেই কোথাও ওই পুলিশ চৌকির মতো। কিন্তু আদতে এটাও একটা ভুলভুলাইয়াই। ডাইনে বাঁয়ে আগে পিছে যেদিকেই মোড় নাও, পথ খুলে যাবে। নতুন নতুন পথ। কিন্তু কোনও পথই বাইরে নিয়ে যাবে না। ঘুরেফিরে সব পথই আবার এসে পড়বে যেখান থেকে শুরু করেছিলে সেইখানে। আর তখনই তোমার মনে হবে আলো আছে। বাতাস আছে। খোলা আছে চারিদিক। কিন্তু মুক্তি নেই। কারণ, এটা ভুলভুলাইয়া। এখানে আর যাই থাক, মুক্তির পথ নেই।
রোশনের গলা শুনে পার্বতীর চটকা ভাঙে। সে বলছে, ''সুস্মিতা অন্যদের একটা সুবিধা করে দিয়ে গেল।''
পার্বতী অবাক হয়ে বলে, ''কি সুবিধা?''
''এটাই যে পুলিশের কাছে গেলে হবে না।''
''তাহলে আর কি রইল উপায় বল?''
''উপায় আছে।''
''আছে? কি উপায় শুনি?''
''একটা সংস্থা আছে। তারা...।''
তারা কি করে আর শোনা হল না পার্বতীর। বাড়ির বাচ্চাগুলো হুটোপাটি করতে করতে দৌড়ে উঠে এলো ছাদের ওপর। এসেই একজন জড়িয়ে পড়ল তারে মেলা একটা শাড়ির ভিতর। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আর এক জন। আর সব নিয়ে তার ছিঁড়ে আছড়ে পড়ল সবসমেত। পার্বতী সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল এক পাশে। যেন দোষটা তারই। এর জন্য গালমন্দ মারধোর যা খাওয়ার খেতে হবে তাকেই।
চারপাই ছেড়ে দৌড়ে এল রোশন।

সে বাচ্চাগুলোকে তুলতেই যাচ্ছিল হঠাৎ থমকে গেল পার্বতীর মুখ দেখে। তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল, ''আরে তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন?''
স্পষ্টতই ভয়ে শুকিয়ে গেছে পার্বতীর মুখ। সে উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, ''কি হবে?''
''কীসের কি হবে?''
''সব জামাকাপড় যে ধুলোয় পড়ে গেল?''
রোশন হেসে বলল, ''তোমার কাজ বাড়ল। আর একবার ধুতে হবে।''
রোশন নিচু হয়ে পড়ে যাওয়া জামাকাপড়গুলো তুলছিল, তখনই ছাদে এসে হাজির হয় তার মেজো কাকি। পার্বতীর মজলি জেঠানি। এসেই চকিতে একবার মেপে নেয় পার্বতীকে। তারপর রোশনকে ধমকের সুরে বলে, ''লিখাই পড়াই ছেড়ে ওকে মদত করতে লেগেছিস!''
রোশন ভিজে শাড়ির পরত সরিয়ে একটা বাচ্চাকে তার ভেতর থেকে বার করে বলল, ''মদত ছোটি চাচিকে করিনি। তোমাকেই করছি, মেজো কাকি। দেখো তোমার বেটা কোথায় আটকে পড়েছিল।''
মেজো কাকি মুখ বেঁকিয়ে বলে, ''হুঁ! ছোটি চাচি!'' পার্বতীর দিকে তীর্যক দৃষ্টি হেনে সে নেমে যায় ছেলেকে নিয়ে।
রোশন ছিঁড়ে পড়া তারটা আবার টেনে বেঁধে দেয়। পার্বতী ধুলোয় পড়া কাপড়গুলো আবার ধুয়ে আনে। রোশন বই নিয়ে বসে থাকে। দু'জনে আর কোনও কথা বলে না। মেজো জেঠানি চোনা দিয়ে গেছে মেজাজে।
সংসারের সব কাজ শেষ করে খেতে বসে পার্বতী। আজ সে রান্নাঘরে ঢোকার সময় পায়নি। বড় দুই জা মিলেই করেছে রান্না। বাকি সবার খাওয়া হয়েও গেছে। উনুনের পাশে ঢাকা আছে তার খাবার। পার্বতী ঢাকা খুলে দেখে থালায় দুটো বাজরার রুটি। তারই পাশে এক দলা রসুনের চাটনি আর এক খাবলা দই। আর কিছু নেই। কিন্তু আজ পনির রান্না হয়েছিল। সঙ্গে মোষের দুধের ক্ষীর। সে সবের কোনও চিহ্ন নেই গোটা রান্নাঘরে। তার ভাগেরটাও মনে হয় খেয়ে নিয়েছে বাকিরা ভাগ করে।
পার্বতী খাবার ছেড়ে রান্না ঘরের বাইরে আসে। বড় জেঠানি মজলির ছোট ছেলের চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল। পার্বতী তাকেই জিজ্ঞেস করে, ''দিদি, ক্ষীর আর পনির হয়েছিল না আজ?''
দিদি একটু সময় নিয়ে উত্তর দেয়, ''মা সে পুছ।''
পার্বতী বরাবরই সাহসি মেয়ে। নিজে হয়তো দজ্জাল শাশুড়িকে ক্ষীর পনিরের কথা জিজ্ঞেস করতে যেত না। কিন্তু পার্বতী যায়। জিজ্ঞেস করে তার ভাগের ক্ষীর পনির কোথায়। শাশুড়ি তার স্বভাব সিদ্ধ গালাগালির সুরে পার্বতীকে জানায়, বিধবার অত গুরুপাক খাবার খাওয়া ঠিক না। বিশেষ করে অল্প বয়সি বিধবার। তাতে মন চঞ্চল হয় অকারণ। জীবনের শান্তি নষ্ট হয়। এই কথার উপর বলার মতো কথা পার্বতী খুঁজে পায় না। কিছু ক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর এক প্রস্থ ধমক খেয়ে ফিরে আসে রান্না ঘরে। খেতে বসে তার শরীর ঠান্ডা রাখার উপযোগী আহার। রসুনের চাটনি সহযোগে।
খেতে খেতে পার্বতী ভাবে, রোশনের কথা মতো তার কি পালানো উচিত? পালানোর চেষ্টা তো জীবন মরণের ঝুঁকি। কোনও সংস্থার কথা বলছিল রোশন। তারা কী বা করবে?
ভাবনাটা মাথায় নিয়েই খাওয়া শেষ করে পার্বতী। মেজে ফেলে এঁটো বাসন গুলো। যে ক্ষীর পনির সে খায়নি সাফ করে তার দাগ-ধব্বাও। উপাদেয় গন্ধ লাগে নাকে। রাগ বেড়ে যায় বুড়িটার ওপর। সত্যিই তার ক্যালাতে ইচ্ছে করে বুড়িটাকে। চাঁদা তুলে ক্যালাতে ইচ্ছে করে, যেমন কথায় কথায় বলত তার নিরীহ অক্ষম বাবা। বাইরে কোথাও অপমানিত হয়ে ঘরে ফিরে এসে মায়ের কাছে বলত, ''চাঁদা তুলে ক্যালানো উচিত লোকটাকে।''
মা বলত, ''চাঁদা তুলতে শুরু কর আজ থেকেই। তাহলে একদিন না একদিন ঠিক ক্যালাতে পারবে লোকটাকে।''
তখন তো পার্বতী বুঝত না। এখন মনে হয়, মা প্রতীকী কথা বলত। হয়তো বাবাকে বলতে চাইত, পরিশ্রম করো। নিজেকে তিলে তিলে প্রস্তুত করো। তাহলে তুমিও একদিন শক্তিশালী হবে। কিন্তু বাবার ছিল ওইটাই বড় দোষ। মায়ের ভাষায়, অসমের সবচেয়ে অলস লোকটাই জুটেছে তার বর হিসাবে। খালি পেটে থাকবে। তবু শুয়েই থাকবে। আর মা তাকেও বলত, সে নাকি বাপের স্বভাব পেয়েছে। সমান অলস সেও। আজ যদি মা তাকে দেখত, কি বলত! নিশ্চয়ই কাছে টেনে আদর দিয়ে বলত, অসমের সবচেয়ে পরিশ্রমী মেয়েটাই আমার মেয়ে। তাহলে এই পরিশ্রম কি তাকে তিল তিল করে শক্তিশালী করে তুলবে! একদিন কি তাহলে সে পারবে বুড়িটাকে মনের সুখে ক্যালাতে! তাহলে তো তাকে গোটা পরিবারটাকেই ক্যালাতে হবে। কারণ সবাই তো তেড়ে আসবে বুড়িটার হয়ে লড়তে।
হয়তো রোশন আসবে না। সে কি তবে তার দলে! বলে তো সে কথাই। বলে, সে চায় পার্বতী এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও চলে যাক। সেসব ভাবনা সত্যি হোক বা না হোক শুনতে ভালই লাগে পার্বতীর। যদিও এই ভাললাগার ভবিষ্যৎ ভাল না। কারণ রোশনের তার প্রতি এই সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ লক্ষ করেছে বাড়ির লোকে। কেউ কিছু বলেনি এখনও। কিন্তু বলবে আজ নয় কাল। মেজো জেঠানি তো আজকে বলেই ফেলেছে একরকম। ওকেও ক্যালানো উচিত চাঁদা তুলে।
পার্বতী অবাক হয়ে ভাবে, হঠাৎ সে এতসব ভাবতে পারছে কিভাবে! রোশনের ভরসায়! তবে কি সে এই পরিবারের মধ্যেই আর একজনকে পেল ভরসা করার মতো! আজ সোনুয়া থাকলে বেশ জোরালো হত তার দল।
হাতে একটা হাঁসুয়া আর একগাছা দড়ি নিয়ে ক্ষেতের দিকে রওনা দেয় পার্বতী। আখের ক্ষেতের ভিতরে ভিতরে অনেক আগাছা গজিয়েছে। সেগুলো কেটে আনাই তার রোজকার কাজ এখন। আখ ক্ষেতের ভেতর ঢুকে পড়লে মনে হয় হারিয়ে গেছে কোনও বনের ভেতর। যেদিকেই তাকাও শুধু আখ ছাড়া আর

কিছুই চোখে পড়ে না। চাইলে ভেঙে খাও। মিষ্টি আখ। চাইলে শুয়ে গড়াগড়ি খেয়ে নাও নরম ঘাসের সবুজ বিছানা বিছিয়ে। অদ্ভুত এক শান্তি আছে আখ ক্ষেতের ভেতর। বলা ভাল আখ বনের ভেতর। কিন্তু ক'দিন পরেই উজাড় হয়ে যাবে এই শান্তির বন। মুনাফার লোভে সব গাছ কেটে ট্রাক্টরে তুলে নিয়ে চলে যাবে কলে পিষতে। পড়ে থাকবে শুধু একটা উজাড় বনজর মাঠ। চারিদিকে ছড়ানো থাকবে মৃত আখের খণ্ড খণ্ড অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। আখের মিষ্টি রসই তো এর কারণ। তার রস তেতো হলে মানুষ ফিরেও তাকাতো না আখের দিকে। মানুষ তাকে এমন করে ধরে বেঁধে চারিদিকে কাঁটাঝোপের বেড়া দিয়ে আটকে রাখত না আবদ্ধ ক্ষেতের ভেতর। কিন্তু এসব মোটেই তাকে যত্ন করে বাঁচানোর জন্য করে না মানুষ, করে যত্ন করে মারার জন্য। সদলবলে। গণহারে। গ্রামের এই দিকটাতে শুধু আখ ক্ষেত। মাঝখান চিরে চলে গেছে ধুলোর চওড়া রাস্তা। ট্রাক্টর ছাড়াও বাস চলে টেম্পো চলে। মোটর গাড়িও চলে। গাড়ি গেলে তার পিছনে ধুলোর মেঘ পাকিয়ে ওঠে। কী সুন্দর দেখতে লাগে তখন! আখ ক্ষেতের ভেতর থেকে গাড়ির শব্দ পেলে পার্বতী ছুট্টে বেরিয়ে আসে রাস্তায়। ধুলো দেখবে বলে। আজও তার দু' দুবার ধুলো দেখা হয়ে গেছে। তৃতীয় বার গাড়ির আওয়াজ পেতেই পার্বতী আবার ছুটে বেরিয়ে আসে রাস্তায়। কিন্তু এসে দেখে গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়েছে ওখানে। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে আসে চার-পাঁচ জন লোক। আর তারা দৌড়ে ঢুকে যায় ওপাশের আখ ক্ষেতের ভিতর। পার্বতী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সেদিকেই।

লোকগুলোকে আর দেখা যায় না। নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে তারা। মনে হচ্ছে খুব জোরে দৌড়চ্ছে আখ ক্ষেতের ভেতরে। পার্বতী নিজেদের ক্ষেতের প্রান্তে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে। আখ বনের মাথার এলোমেলো দুলুনি দেখে বোঝার চেষ্টা করে ভেতরে কী ঘটছে। কিন্তু সে কিছুই বুঝতে পারে না। যখন ভাবছে তার দেরি হয়ে যাচ্ছে, এবার ফেরা দরকার, তখনই তীব্র আর্তনাদ ভেসে আসে আখ ক্ষেতের ভেতর থেকে। কোনও মেয়ের গলা মনে হচ্ছে। তীব্র যন্ত্রণায় সে পরিত্রাহি চিৎকার করছে। যেন আখ কাটা কাস্তে দিয়ে কেউ বুঝি তার হাত পা গুলোই কেটে দিচ্ছে। ওই লোকগুলোই হবে। নিশ্চয়ই মেয়েটার খোঁজে ঢুকেছিল ওরা। এখন ধরতে পেরে অত্যাচার করছে।
অত্যাচার মানে যৌন নির্যাতন। অতগুলো লোক মিলে একটা মেয়েকে! মেয়েটা তো মরেই যাবে। সুস্মিতার মতো। সুস্মিতাকে তো বাঁচানো যায়নি। হয়তো একে বাঁচানো যাবে।
পার্বতী এদিক ওদিক তাকায় সাহায্যের জন্য। ধূ-ধূ রাস্তা। শুনশান আখবন। কেউ কোত্থাও নেই। যদি একটা গাড়িও এসে পড়ত এখন। ভাবতে ভাবতেই অনেক দূরে রাস্তার ওপর ধুলোর ফোয়ারা দেখতে পায় পার্বতী। পিছনে আখ ক্ষেতের ভেতরে সমানে ভাসতে থাকে সেই আর্তনাদ। পার্বতী ভাবে দেরি হয়ে যাচ্ছে। হয়তো আর বাঁচানোই যাবে না মেয়েটাকে। সে উদ্ভ্রান্তের মতো দু'হাত তুলে রাস্তা আটকায় গাড়িটার। দাঁড়িয়েও যায় সাদা রংয়ের গাড়িটা। চারিদিকে কাঁচ তোলা। ভেতরে নারী পুরুষ বাল বাচ্চা গোটা পরিবার। গান বাজছে জোরে। ঠান্ডা পানীয়র বোতল হাতে হাতে। খাবারের প্যাকেট। জানলার কাঁচ নামিয়ে একজন জিজ্ঞেস করে, ''কি ভয়া?''
পার্বতী হাঁপাতে হাপাতে বলে, ''ওরা আখ ক্ষেতের ভেতরে একটা মেয়েকে রেপ করছে। ওকে বাঁচান। না হলে...।''
পার্বতীকে কথা শেষ করতে না দিয়েই গাড়ির কাঁচ তুলে দেয় গাড়ির চালক। তারপর ধুলোর উপর আরো ধুলো উড়িয়ে ধুলোয় সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়ে যায় পার্বতীকে। সে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে গাড়িটার দিকে। তারপর আবার দৌড় দেয় তার পিছনে।
ততক্ষণে আখ ক্ষেতের আর্তনাদ আরও মর্মভেদী হয়েছে। খানিকটা যেন থেঁতলে গেছে চিৎকারটাও। হয়তো মেয়েটার মুখের ভেতর কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছে। যাইহোক, আর্তনাদ শুনে মনে হচ্ছে আর বেশি সময় নেই মেয়েটার হাতে। পার্বতী দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে নিজেই দৌড় দেয় সেই আর্ত চিৎকারের অভিমুখে। কিছুটা আখ ক্ষেতের ভেতর যেতেই সে দেখতে পায় মানুষগুলোর আদল। কাছে পৌঁছে পার্বতী দেখে পারুল। তার চেনা মেয়ে। ধিংড়াদের মোলকি। ঝাড়খণ্ড থেকে এনেছে বছর খানেক হল। খুব নাকি মারে মেয়েটাকে। হয়তো সুস্মিতার মতো পারুলও পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। এখন ধরা পড়ে মরতে বসেছে।
আখ ক্ষেতের মাটির উপর চিৎ করে ফেলেছে ওরা পারুলকে। টেনে ছিঁড়ে খুলে নিয়েছে ওর ঘাঘরা চোলি। আর একজন উপুড় হয়ে আছে পারুলের ওপর। বাকি দুজন ছবি করছে মোবাইলে। পার্বতী অপ্রকৃতিস্থের মতো চিৎকার করে বলে, ''ছোড় দে উসকো। জানোয়র লোগ। ছোড় দে।''
চকিতে সকলে ঘুরে তাকায় পার্বতীর দিকে। ঘটনার আকস্মিকতায় চিৎকার ভুলে গেছে পারুলও। লোকগুলোও সময় নেয় ব্যাপারটা বুঝে উঠতে। তারপর পারুলের হাত ধরে থাকা একজন বলে, ''পকড় উসকো ভি। চৌহানদের মোলকি।''
মোবাইল হাতে একজন ধেয়ে আসে



খেতে খেতে পার্বতী ভাবে, রোশনের কথা মতো তার পালানো উচিত? পালানোর চেষ্টা তো জীবন মরণের ঝুঁকি। কোনও সংস্থার কথা বলছিল রোশন। তারা কী বা করবে?

পার্বতীর দিকে। ফোনটা পকেটে রেখে জাপটে ধরতে যায় তাকে। কিন্তু তার আগেই পার্বতী চালিয়ে দেয় কাস্তে। আর কাস্তের ডগাটা সোজা গিয়ে গেঁথে যায় লোকটার গলা আর কাঁধের সংযোগস্থলে। পার্বতী টেনে ছাড়িয়ে নেয় নিজের কাস্তেটা। আর লোকটার ক্ষতস্থান দিয়ে গলগলিয়ে বেরিয়ে আসে রক্ত। নিজের রক্ত দেখে ভয়ে কেঁদে ফেলে লোকটা। বন্ধুদের দিকে ফিরে আতঙ্কিত স্বরে বলে, ''মর যাবা। ম্যায় মর যাবা। হসপতাল লে চল। মুঝে হসপতাল লে চল।''
ততক্ষণে ধাতস্থ হয়েছে বাকি তিনজন। পারুলের ওপর উপুড় হয়ে থাকা লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে বন্ধ করছে প্যান্টের চেন। তারা বুঝতে পারছে না হাসপাতাল যাবে না পার্বতীকে ধরবে। তিনজন এগিয়েও যায় পার্বতীর দিকে। পার্বতীর তখন রণচণ্ডী মূর্তি। রক্তের স্বাদ পাওয়া কাস্তে উঁচিয়ে ধরে আছে ডান হাতে। সাহস করে না লোকগুলো এগোতে। জখম লোকটা বলে, ''ছোড় উসকো। পরে দেখে নেব। চল হাসপাতাল।''
তাড়াহুড়ো করে সত্যিই চলে যায় লোকগুলো। নিজের ঘাঘরা চোলি কুড়িয়ে নিয়ে আবার পরে ফেলেছে পারুল। ভয়ে আতঙ্কে আর অত্যাচারে যেন সে নিজেই একটা রস নিংড়ানো আখের মত হয়ে পড়েছে। শুকনো মুখে তাকিয়ে আছে পার্বতীর দিকে।
পার্বতীর সম্বিত ফিরেছে ততক্ষণে। উধাও হয়ে গেছে তার রণরঙ্গিনী মেজাজ। নত হয়েছে তার কাস্তে, যার ডগায় তখনও লেগে আছে অত্যাচারীর রক্ত। অজানা আতঙ্ক গ্রাস করেছে তাকে। ধড়াস ধড়াস করছে তার বুকটা। তবু সে শান্ত থাকার চেষ্টা করে। অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস সামলে পারুলকে বলে, ''কৌন থে ওহ্?''
পারুল কোনও রকমে বলে, যাকে সে জখম করেছে, সে তার ভাসুর। বাকিরা তার বন্ধু। বাইরের লোক।
পার্বতী জানতে চায়, ''কিন্তু আখের ক্ষেতে এসে পড়লি কি করে?''
আসলে কেসটা সুস্মিতার মতোই। অত্যাচার সইতে না পেরে পালাচ্ছিল সেও। কিন্তু কোনও ভাবে জানতে পেরে গাড়ি নিয়ে পিছু ধাওয়া করে তার ভাসুর। পার্বতী চিন্তিত গলায় বলে, ''এখন তাহলে কি করবে?''
''পালাব। এখানে থাকলে মরে যাব।''
''পালিয়ে কোথায় যাবে?''
''জানিনা। কিন্তু এখানে আর থাকব না।''
পার্বতী ভেবে বলে, ''পুলিশের কাছে যেও না কিন্তু।''
''নাহ্ জানি। ওখানে তো সুস্মিতাকে ওরাই মারল।''
পার্বতী কিছু মনে পড়ার মতো করে বলে, ''আচ্ছা, শোনো...।''
বলেই এদিক ওদিক কিছু খুঁজতে শুরু করে সে। তারপর একটা পোড়া মাটির হাঁড়ির ভাঙা টুকরো কুড়িয়ে আনে। তার ওপর খুব যত্ন করে একটা ফোন নাম্বার লেখে তারই আর একটা টুকরো দিয়ে। সেটা পারুলের হাতে দিয়ে বলে, ''এই ফোন নাম্বারে ফোন করে সাহায্য চাইবে। ও তোমাকে একটা সংস্থার সন্ধান দেবে। ওরা পারোদের পালাতে সাহায্য করে। নাও, এখন যাও। এতক্ষণে ফোনে ফোনে সব খবর হয়ে গেছে। এসে পড়বে ওরা।'' পারুল বিভ্রান্ত চোখে পার্বতীর দিকে তাকিয়ে বলে, ''আর তুমি?''
নির্লিপ্ত গলায় পার্বতী বলে, ''আমি ঘাস কেটে রেখেছি। নিয়ে ঘরে ফিরব।''
''আর আমার ভাসুরের গলায় যে কাস্তের কোপ দিলে?''
''থানা পুলিশ হবে আর কী!''
''আবার পুলিশ!''
''সেটাই চিন্তার। তুমি পালাও। যাও। ফোন করবে ওই নম্বরে।''
পারুল দৌড় দেয় আখ বনের আরও গভীরে। কিছু ক্ষণের মধ্যে তার আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। পার্বতী ভাবে রোশনকে বলে রাখতে হবে। আসলে মোবাইল নম্বরটা রোশনেরই। সে মুখস্থ করে রেখেছিল। এমন সংস্থা আছে বলে সে-ই তো বলেছিল। হয়তো ওরা পালাতে সাহায্য করে পারোদের। যদিও সে কথা সে আন্দাজেই বলেছে পারুলকে।
আখের ক্ষেত থেকে বেরিয়ে পার্বতী দেখল রাস্তার ধুলোয় রক্ত পড়ে রয়েছে তখনও। নিজের কাস্তেটা একবার দেখে নিয়ে সে ঢুকে গেল নিজেদের আখ বনের ভেতর। তার প্রিয় শান্তির বন। আজ যদিও রক্ত ঝরেছে সে বনেরই এক শাখায়। তারই নমুনা কাস্তের ডগায় দোলাতে দোলাতে পার্বতী এগিয়ে গেল তার নরম সবুজ ঘাসের বিছানার দিকে। নিজের সমস্ত উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নিয়ে সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো নরম ঘাসের ওপর। এক সময় আলো কমে আসে আখ বনের ভেতর। পার্বতীর খেয়াল হয়, দিন শেষ হয়ে এল। এবার তাকে ফিরতেই হবে। বিছানা গুটিয়ে ঘাসের বোঝা বানিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে পার্বতী ভাবে তার কী করা উচিত!
বাড়িতে এখন রোশন নেই। কলেজ গেছে। কলেজ তার জেলা শহরে। বাসে ঘণ্টা দুয়েক লাগে। যেতে আসতেই চার ঘণ্টার বাস। পড়াশুনা নিয়ে গোটা দিন তার চলে যায় বাইরে বাইরেই। ফেরে সন্ধ্যা রাতে। এমন জরুরি কিছু ঘটে গেলে তাকে পাওয়া মুশকিল। ও বাড়িতে থাকলে হয়তো পার্বতী ঘরে ফিরতে এতটা ভয় পেত না। এতক্ষণ নিশ্চয়ই খবর গেছে তার বাড়িতেও।
কীই বা আর করবে পার্বতী! যা থাকে কপালে ভেবে সে ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে রওনা দেয় গ্রামের দিকে।
কিন্তু বাড়ি ফিরে সে তো অবাক। তাদের বাড়ির সামনে একটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটাকে ঘিরে ভিড় করে আছে গোটা গ্রাম। পার্বতীকে ঘাস মাথায় আসতে দেখেই সবাই পথ ছেড়ে দেয়। যেন তারই অপেক্ষায় ছিল তারা এতক্ষণ। উঠোনে পা দিয়েই পার্বতী দেখে বাইরে চেয়ার পেতে বসে আছে দু'জন পুলিশ। দাঁড়িয়ে আছে আরও তিনজন। একজন মহিলা পুলিশ। তাদের হাতে শরবতের গ্লাস। তাদের ঘিরে তার গোটা পরিবার। সঙ্গে গ্রামের কিছু মাতব্বর মুখিয়া নেতা গোছের লোক। পার্বতী থমকে দাঁড়িয়ে যায় দরজার কাছেই। সকলে ঘুরে যায় তার দিকে।

পুলিশগুলো আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে তাকে। তারপর বসে থাকা একজন, বোধহয় বড় পুলিশ বাবু, উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ''এহি ছে?''

''জি, হুকুম।''

পুলিশ সাহেব তার এক সহকারীকে বলেন, ''কেমরা করো।''

সহকারী মোবাইল ক্যামেরা তুলে ধরে পার্বতীর দিকে। ভিডিও করছে। পুলিশ সাহেব বলেন, ''ঘাঁস উতারো।''

পার্বতী গোয়াল ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। গরুগুলোর নাগালের বাইরে আছড়ে ফেলে ঘাসের বোঝা। বোঝার টানে সরে যায় তার মাথার কাপড়। শান্ত ভঙ্গিতে সে আবার ঢেকে নেয় নিজের মাথা। দেখা যায়, কাস্তেটা তখনও তার হাতে। পুলিশ সাহেবের ইশারায় আর এক সহকারী এগিয়ে আসে পার্বতীর দিকে। একটা কাপড়ের ব্যাগ তার সামনে মেলে ধরে বলে, ''হাঁসুয়া।''

পার্বতী তার কাস্তেটা ব্যাগের মধ্যে রেখে দেয়। সহকারী ছোঁয়া বাঁচিয়ে ব্যাগে মুড়ে নেয় কাস্তেটা।

পুলিশ সাহেব তারপর বলেন, ''থানায় যেতে হবে। তৈরি হয়ে নিন।''

মহিলা পুলিশটা এগিয়ে এসে বলে, ''চলিয়ে, ম্যায় মদত করতি হুঁ।''

পার্বতী বলে, ''আর আমার মেয়ে?''

''সঙ্গে নিতে পারেন। অসুবিধা নেই।''

এই সময় এগিয়ে আসে পার্বতীর শ্বশুর। সে পুলিশকে বোঝানোর চেষ্টা করে, বাচ্চা নিয়ে যাওয়ার কোনও দরকার নেই। বাচ্চার যত্ন তারা নিতে পারবে। সবটা ভিডিও রেকর্ড করছে একজন পুলিশ। তাই কারও কথায় বা আচরণে কোনও বেচাল নেই। পার্বতীও একই রকম শান্ত স্বরে বলে, ''বাচ্চা আমার বুকের দুধ খায়। আমাকে ছেড়ে ও থাকতে পারবেনা।''

পুলিশ সাহেব বলেন, ''ঠিক আছে। বাচ্চা সঙ্গে যাবে। দরকারি জিনিসপত্র যা আছে বাচ্চার আর মায়ের, একটা ব্যাগে করে দিয়ে দিন।''

পুলিশ প্রায় মিনিট কুড়ি সময় দেয় পার্বতীকে তৈরি হতে। সর্বক্ষণ যদিও মহিলা পুলিশ তার সঙ্গে থাকে। কিন্তু সেও খুবই ভদ্র ব্যবহার করে পার্বতীর সঙ্গে। পার্বতী অবাক হয়ে ভাবে, পুলিশ কি সবার সঙ্গেই এমন ভাল ব্যবহার করে! এরাই কি সেই একই চৌকির একই পুলিশ, যেখানে সুস্মিতা গেছিল? কিন্তু পার্বতীর চেয়েও হতবাক তার বাড়ির লোক। তারা তো ভাবছিল পুলিশ পার্বতীকে ওখানেই মেরে আধমরা করবে। একজন মোলকির এত বড় সাহস যে ধিংড়াদের বড় ভাইকে কাস্তের কোপ মারে! কত সে প্রভাবশালী লোক এলাকার! কত তার জান পহেচান!

আর গ্রামের লোক ভীষণ হতাশ। একটা রেপ আর একটা অ্যাটেমপ্ট টু মার্ডার কেস। যেখানে দু-দুটো মোলকি জড়িয়ে, সেই কেস যে এমন পানসে করে শেষ হবে কেউ ভাবেনি। ফালতু এতক্ষণ সময় নষ্ট করল চৌহানদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

পার্বতীকে নিয়ে পুলিশের গাড়ি চলে গেল তাদের মুখের ওপর ধুলো ছিটিয়ে।

বিভ্রান্ত পুলিশও। স্থানীয় চৌকির সেই একই পুলিশ, যারা সুস্মিতাকে গায়েব করেছিল। সেই একই বড়বাবু। খবর তিনি আগেই পেয়েছিলেন আখ ক্ষেতে কী ঘটেছে। হয়তো ভাবছিলেনই, সুস্মিতার মতো আর একজনকে পাওয়া যাবে কিনা নিজেদের গ্রাসের ভেতর! তখনই জেলা সদর থেকে ফোন। ডিএসপি সাহেব স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, রীতিমতো পার্বতী চৌহান আর পারুল ধিংড়ার নাম করে। কেসটা ছানবিন করে দেখতে। পারলে ওদের হেফাজতে নিতে। আর পুরো কারবাহি ভিডিও ক্যামেরা করে তাঁর কাছে পাঠাতে। খবর যে কী করে হেডকোয়ার্টারে চলে গেল, ভেবে ভেবে পুলিশ প্রভারি অস্থির। চৌকির ভেতর পার্বতী আর তার বাচ্চার আদর যত্নের ব্যবস্থা করতে করতে তিনি অনুমান লাগানোর চেষ্টা করেন, কে করে থাকতে পারে এই চুকলিখোরি। নিশ্চয়ই আজাদপুরেরই কেউ। যার নিশ্চয়ই যোগাযোগ আছে ওইসব এনজিওগুলোর সঙ্গে, যারা মোলকিদের বাঁচানোর নামে ব্যবসা ফেঁদেছে।

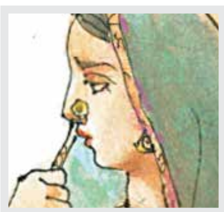
আর ভাবতে ভাবতেই এনজিও হাজির। সন্ধ্যে নাগাদ একটা গাড়ি এসে দাঁড়ায় থানার সামনে। দু'জন পুরুষ আর একজন মহিলা নেমে আসেন গাড়ি থেকে। থানা প্রভারির সঙ্গে দেখা করে পরিচয়পত্র দেখান নিজেদের। সঙ্গে এসপি সাহেবের সই করা চিঠি। মুখে বলেন, ''নমস্তে। হম সোশ্যাল ওয়ার্কার। ওমেন ইন নিড অর্গানাইজেশন থেকে আসছি।''

তারা পার্বতীর সঙ্গে দেখা করে তার খোঁজখবর নিতে এসেছে। তাদের মধ্যে একজন উকিল। পার্বতীকে আইনি সাহায্য তিনিই দেবেন। বাকিরা ততক্ষণে লক আপে যায় পার্বতীর সঙ্গে দেখা করতে। চাপা গলায় তারা কথা বলে। পার্বতীকে বল ভরসা দেয়। বলে, ''ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।''

তাদের ভাল লাগে দেখে যে, পার্বতী নিজের কথা বলে না। উদ্বেগ প্রকাশ করে পারুলের জন্য। জানতে চায় তার খবর। আর জেনে নিশ্চিন্ত হয় যে, পারুলকে রেল স্টেশন থেকে রেসকিউ করে উইন অর্থাৎ উইমেন ইন নিড-এর হোমে রাখা হয়েছে। তার ভাসুর রাঘব ধিংড়া আর তার চার বন্ধুর নামে ধর্ষণের অভিযোগ জানানো হয়েছে সদর থানায়। পুলিশ তাদের খুঁজছে।

শুনে পার্বতী কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে। কার কাকে খোঁজার কথা আর কে কাকে খুঁজছে! ব্যাপারটা শুরুই হয়েছিল একটা খোঁজা দিয়ে। পারো আর তার শ্বশুরবাড়ির মধ্যে রোজকার চোর পুলিশ খেলা। খবর আসতেই থাকে আজ এদের পারো পালিয়েছে তো কাল ওদের পারো পালিয়েছে। আজ এরা পারোর খোঁজে বেরিয়েছে তো কাল ওরা পারোর খোঁজে বেরিয়েছে। ধরা পড়া, মার খাওয়া, কখনও বা মরেই যাওয়া বা নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া লেগেই আছে। বরাবরই ব্যাপারটা একতরফা। পরাস্তের দলে বরাবরই পারো। আজ হঠাৎ কেমন উল্টো ঘুরছে চাকা। পারুলের শ্বশুরবাড়ির লোককে খুঁজছে পুলিশ। খুঁজছে ধরবে বলে, হাজতে পুরবে বলে। চরম শাস্তি দেবে বলে। কী করে হল এইসব? এনজিওর দিদির নাম সুহানা।

তিনি পার্বতীর গালে আদর দিয়ে বলেন, ‘‘এসব তো তুমিই করেছ।’’
‘‘আমি?’’
‘‘হ্যাঁ। কেমন বুদ্ধি করে ভাঙা হাঁড়ির টুকরোয় লিখে দিয়েছিলে ফোন নম্বর। সেই নম্বরে ফোন করেছিল পারুল।’’ কথাটা শুনে ধড়াস করে ওঠে পার্বতীর বুকটা। নিশ্চিন্ত হওয়ার বদলে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। ভাবে সে বোধহয় রোশনকে বিপদে ফেলল। পারুল হয়তো বেঁচে গেল, কিন্তু সে নিজে জেলে গেল। আর রোশন কী জানি, হয়তো ফেঁসে গেল। কোথায় যে গিয়ে দাঁড়াবে কোথাকার জল, ভেবে ভেবে সে আকুল হয়ে পড়ল। তার যদি ফাঁসি হয়ে যায়, তার মেয়ের কী হবে! রোশনের বাড়ির লোক যদি জানতে পারে, পারুলকে সে-ই পালাতে সাহায্য করেছে, তাহলে তারা কী করবে! আর যদি ঘুণাক্ষরেও টের পায় যে রোশন পার্বতীকেও পালানোর জন্য উসকাচ্ছে, হয়তো তার হাত পা ভেঙে অপাহিজ করে দেবে। আর যদি! আর যদি...!
কথাটা ভাবতে গিয়েও গলা শুকিয়ে আসে পার্বতীর। কিন্তু আবার ভাবতেও ইচ্ছে করে। বারবার তার ভাবতে ইচ্ছে করে যে, তার ভীষণ ভাল লাগে রোশনের কাছাকাছি থাকতে। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে। আর সে অনুভব করে রোশনেরও তাকে একই রকম ভাল লাগে। হয়তো সে তার সম্পর্কে কাকি হয়, কিন্তু বয়সে ছোটই হয়। পার্বতীর মনে আছে, স্কুলের কাগজে লেখা তার জন্ম তারিখ। সেই হিসেবে তার বয়স আঠারো হতে আরও কয়েক মাস বাকি আছে। রোশনের বয়স কুড়ি।
যদিও শেষ পর্যন্ত তেমন কিছুই হল না। সবকিছু এমন শান্তিপূর্ণভাবে মিটে গেল যে, পার্বতী একটু অবাকই হল।
এনজিওর লোকজন চলে যাবার পর পার্বতীর ভয় করছিল সেই দুর্গের মত পুলিশ চৌকির ভেতর। মনে পড়ছিল সুস্মিতার কথা। গুজবের কথা। সুস্মিতার আত্মা এখনো আটকে আছে এই চৌকির ভুলভুলাইয়ার ভেতর।
কিন্তু তার ভয়, ভাবনা তেমন দানা বাঁধার আগেই একজন মহিলা পুলিশ তার রাতের খাবার নিয়ে আসে। রুটি সব্জি, সঙ্গে আবার আন্ডা। আর সিল করা বোতলে স্বচ্ছ জল। মেয়ের জন্য কাচের বোতলে গরম দুধ। প্যাকেটে বেবি ফুড। বাটি চামচ। সঙ্গে বিছানা বালিশ মশারি। সেসব পেতে বিছিয়ে টাঙিয়ে দেয় সেই মহিলা পুলিশ। তারপর বসে বসে অনেকক্ষণ গল্প করে তার সঙ্গে। সে বাথরুম গেলে ধরে দেয় তার মেয়েকে। যেন সে তার ঘরেরই লোক। মা। অথবা মায়ের মতো। এই জায়গায় কী করে সুস্মিতার সঙ্গে এমন হল!
সকালে একই রকম আদর যত্ন পায় পার্বতী আর তার মেয়ে। তারপর জল খাবার খেয়ে গাড়ি চড়ে সোজা আদালতে। সেখানে ততক্ষণে আগেই পৌঁছে গেছে তার উকিল। সুহানা দিদি, আরও দুজন। আর রোশন।
রোশনকে দেখে আগে কখনও এত আনন্দ হয়নি পার্বতীর। যেন ভীষণ আপনজন কেউ। রোশনও পুলিশের গাড়ির কাছে ছুটে চলে আসে। উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে তাকে আপাদমস্তক দেখে। ভীষণ আবেগে হাতটা চেপে ধরে বলে, ‘‘রাতে ওরা মারধোর করেনি তো?’’ পার্বতীরও ভীষণ ভাল লাগে রোশনের এই উদ্বেগ। এই যত্ন। সে নিজের হাতটাকে আরও লাচার, আরও কমনীয় করে ছেড়ে দেয় রোশনের পুরুষালি পাঞ্জার গ্রাসের ভেতর। উপভোগ করে তার প্রতিটা ছোঁয়া। প্রতিটা মোচড়, চাপ, ঘর্ষণ। আগে কখনও রোশন তার এত কাছে আসেনি। গাড়ি থেকে সে তখনও নামেনি। গাড়ির দরজা খুলে রোশনই অর্ধেক প্রায় ঢুকে এসেছে গাড়ির ভিতর। কথা বলছে তার কানের কাছে মুখ এনে। তার গরম শ্বাস এসে পড়ে পার্বতীর কানের ওপর। আর কী যেন এক বার্তা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ঢুকে যায় তার কানের ফুটোর প্যাঁচালো গভীরতার ভেতর। সেখান থেকে আরও ভিতর, আরো গভীর, আরো মরমী কোথাও।
‘‘মারধর করেনি তো? খেতে দিয়েছে? শুতে দিয়েছে? অন্যরকম অত্যাচার?’’ পার্বতী বোঝে রোশন সুস্মিতার কথা মাথায় রেখেই এসব বলছে। সে তাকে আশ্বস্ত করে বলে, ‘‘পুলিশ খুব ভাল!’’ রোশন পার্বতীর পাশে বসা মহিলা পুলিশটার দিকে তাকায়। মহিলা পুলিশ মিষ্টি করে হেসে বলে, ‘‘এবার নামতে হবে।’’ কোর্টে সেদিনই জামিন পেয়ে যায় পার্বতী। পুলিশের গাড়ি তাকে নামিয়ে দিয়ে আসে তার বাড়িতে। সঙ্গে যায় এনজিওর গাড়ি। সেই গাড়িতে রোশনও। যেন বা সে ওদেরই লোক। বাড়ি এসে পার্বতী খবর পায়, রাঘব ধিংড়া আর তার চার বন্ধু গিরফতার হয়েছে। যদিও রাঘব হাসপাতালেই আছে। কিন্তু পুলিশ ওকে হেফাজতে নিয়েছে। এবার তাদের কোর্টে তোলা হবে পার্বতীর মতো। জামিন অথবা জেল। গোটা আজাদপুর এখন বসে আছে সেই অপেক্ষায়। আগে কখনও এত কাণ্ড হয়নি কোনও পারোকে নিয়ে। তাদের পরিণতি সুস্মিতার মতোই হয়ে এসেছে চিরকাল।
আসলে সমস্যাটা শুধু ধিংড়াদের নয়। শুধু চৌহানদেরও না। সমস্যাটা পারো নিয়ে। তাই যার ঘরেই পারো আছে, তার ঘরেই বসে আছে একই সমস্যার বীজ। আর পারো আছে ঘরে ঘরে। আজ রাঘব ধিংড়া কাস্তের কোপ খেলো, কাল অন্য যে কেউ খেতে পারে। আজ তার ঘরের পারো পালালো। পারোর পুরো দামটাই জলে গেল। তার ওপর পুলিশ কেস খেয়ে গ্রেপ্তার হল। এতদিন যে পারো ছিল পরিবারের সম্পদ, বলা যায় প্রাণী সম্পদ, লাইভস্টক। ভেড় বকরি ভঁইস গরুর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান আর উপকারী, সে-ই আজ আপদ হয়ে ওঠার ভয় দেখাচ্ছে। এই রকম চললে তো সমাজের সন্তুলন বরবাদ হয়ে যাবে। আগামী প্রজন্মের সর্বনাশ। সুতরাং গ্রামের লোককে বসে এক জায়গায় বাতচিত করতেই হল। সেখানে চৌহানদের, ধিংড়াদেরও ডাকতেই হল। সবাই মিলে এক হয়ে একে অপরের পাশে থাকার কসম নিতে হল।
এনজিওর লোকজন পার্বতীর ঘরের ভেতর পর্যন্ত ঢুকে এল। সুহানা দিদি উকিল বাবু সবাই। তার খাট-বিছানা



রোশনকে দেখে আগে এত আনন্দ হয়নি পার্বতীর। যেন ভীষণ আপনজন। রোশনও পুলিশের গাড়ির কাছে ছুটে চলে আসে। উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে তাকে আপাদমস্তক দেখে।

জামাকাপড় সবই দেখল পরীক্ষা করে। ছবিও তুলে নিল মোবাইলে। তারপর পার্বতীর হাতে একটা কাগজ দিয়ে গেল। তাতে অনেক ফোন নাম্বার লেখা। বলে গেল, ‘‘দরকারে ফোন করবে যে কোনও নম্বরে।’’

ওরা চলে যেতে যেতে বেশ সন্ধে হয়ে গেল। পার্বতী মেয়েকে কোলে নিয়ে বসে রইল একা ঘরে। কান পেতে শুনতে লাগল বাইরে কোনও অর্থবহ শব্দ হয় কিনা। কেউ কোনও কথা বলে কিনা। তেমন কোনও শব্দ পার্বতীর কানে আসে না। যেসব শব্দ কানে আসে তাতে আলাদা কোনও সংবাদ নেই। থাকলেও সে প্রসঙ্গ নেই। পাথরের মেঝেতে ক্ষুরের ঠোকাঠুকি বা লেজের ঝাপটায় মশা-মাছির খবর আছে। রসোঁইয়ের ভেতর বাসনের টুংটাং-এ দাল রোটি-সবজির সংবাদ। এমনকি শ্বশুরের কাশিতে রোগের বার্তা। কিন্তু পার্বতীর কোনও খবর নেই। শুধু নিজের মেয়েটা কেঁদে উঠলে সে বোঝে সে আছে। বাইরের জগতটা যতই তাকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করুক, খবরে আসলে সে-ই আছে। হয়তো তাই-ই। না হলে তার মেজো ভাসুর এত রাত করে বাড়ি ফেরার লোক তো না। বাড়িতে সবাই খেয়ে শুয়ে পড়েছে। শুধু মজলি জেঠানি জেগে বসে আছে উদ্বেগে। থেকে থেকে সদর দরজায় গিয়ে রাস্তা দেখছে। অবশেষে অনেক রাতে বাড়ি ফেরে মেজো ভাসুর। পার্বতী নিজের বন্ধ দরজার ভেতর থেকে শুনতে পায় তার ফেরার বার্তা। স্বামী-স্ত্রীতে উদ্বিগ্ন কথাবার্তা। মেজো বলছে, ‘‘ইতনি রাত গয়ে! কী করছিলে?’’

‘‘মিটিং!’’

পরের কথাগুলো পার্বতী কাটা-কাটা শুনতে পায়। কথার মধ্যে পার্বতীর নাম আসে বেশ কয়েকবার। তাতেই সে অনুমান করতে পারে, তাকে নিয়েই কোথাও মিটিং করে এল মেজো ভাসুর। হয়তো বন্ধুদের সঙ্গে। রাঘব ধিংড়া যেমন মিটিং করেছিল বন্ধুদের সঙ্গে পারুলকে নিয়ে। ওই শব্দের বার্তা ধরে ধরে পার্বতী বুঝতে পারে ওরা রান্নাঘরে ঢুকল। পার্বতীকে কেউ খেতে ডাকেনি আজ। ভাবছিল খাবে না। কিন্তু তার ভীষণ খিদে পেয়েছে। তাই সে মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে দরজা খুলে। পা টিপে টিপে রান্নাঘরে যায়। আলো জ্বালায়। ঢাকা খুলে দু’টো রুটি নেয় হাতে। তারই ওপর একটু সবজি। ঘরে গিয়ে খাবে ভেবে আলো নেভায়। দরজায় শেকল তোলে। তারপর নিজের ঘরের দিকে ফিরতেই অন্ধকারে পিছন থেকে কেউ তার মুখ সজোরে চেপে ধরে। পার্বতী কিছু করার আগেই তার কানের কাছে মুখ এনে একটা চাপা ধরাধরা গলা বলে, ‘‘আমি রোশন। শব্দ করো না। এদিকে এসো।’’

রোশন তার মুখ ছেড়ে দেয়। কিন্তু তার হাতটা ধরে তাকে টানতে থাকে সিঁড়ির দিকে। পার্বতী প্রতিবাদ করে ফিসফিসিয়ে বলে, ‘‘কী করছ! ছাড়ো।’’

রোশন তেমনি ফিসফিসিয়ে বলে, ‘‘এখানে কথা বোলো না। মেজো কাকা কাকি জেগে আছে। ছাদে এসো।’’

পার্বতী সন্দিগ্ধ স্বরে বলে, ‘‘ছাদে...!’’

রোশন একরকম জোর করে ঠেলতে ঠেলতে তাকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে তোলে। ছাদের মাঝামাঝি গিয়ে বলে, ‘‘বসো। দাঁড়ালে বাইরে থেকে দেখতে পাবে।’’ তারপর চাপা স্বরে বলে, ‘‘রিল্যাক্স। আগে খেয়ে নাও।’’

কিন্তু তখন ভয়ে উৎকণ্ঠায় পার্বতীর গলা শুকিয়ে কাঠ। সে বলে, ‘‘যা বলার তাড়াতাড়ি বলো। দেখতে পেলে দু’জনকেই খুন করবে তোমার বাড়ির লোক।’’ রোশনও উত্তেজিত একই রকম। তারও বুক কাঁপছে। তবু সে এতটা সাহস দেখাতে পেরেছে পরিস্থিতি সেরকম বলেই। আসলে সে জানতে পেরেছে আজাদপুরের গ্রাম সমাজ ভালভাবে নেয়নি পার্বতী আর পারুলের ব্যাপারটা। বিষয়টাকে তারা একটা সামাজিক সঙ্কট হিসেবে দেখছে। আর এর মোকাবিলাও করতে চাইছে সামাজিকভাবেই। আর সমাজ তো রাজনীতির বাইরে নয়। তাই কিছু লোক উদ্দেশ্য নিয়েই রাজনৈতিক রং লাগাতে চাইছে কেসটাতে। আর সামনেই পঞ্চায়েত ভোট হওয়াতে ব্যাপারটা ভীষণই গুরুতর চেহারা নিয়েছে। হয়তো সেই ধারণা পার্বতীর একেবারেই নেই। রোশনেরও পুরোটা নেই।

হাজার হোক পার্বতী এখনও অনুর্ধ্ব আঠেরো, মানে আইনত শিশু। রোশনের কথা শেষ হলে সে বলে, ‘‘কী বললে আমি বুঝতে পারলাম না। পারুল কেমন আছে?’’

‘‘পারুল ভাল আছে। ভালই থাকবে। তুমি নিজের কথা ভাবো।’’

‘‘কী ভাবব?’’

রোশন সাধ্যমত বোঝানোর চেষ্টা করে পার্বতীকে যে, আসলে সে একটা যুদ্ধ শুরু করে বসে আছে। শুধু তার নিজের পরিবার বা ধিংড়াদের বিরুদ্ধে নয়, গোটা আজাদপুরের বিরুদ্ধে। সমগ্র প্রদেশের বিরুদ্ধে, যেখানে বউ কেনাবেচার চল আছে। ঘরে ঘরে যেখানে কেনা বউ পারোদের, মোলকিদের ওপর শোষণ নির্যাতন চলে। আর এই পারো-নির্ভর সমাজের সুখ শান্তি আরামের উৎসই হল পারো-সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করেছে পার্বতী। এই সমাজ তাকে সহজে ছাড়বে না। পার্বতী একটু ভয় পায় রোশনের কথা শুনে। কিন্তু যতটা পাওয়া দরকার ততটা পায় না। রোশন চাইছে পার্বতী ভয় পাক। কিন্তু পার্বতী সে কথা বুঝছে না। হয়তো থানা পুলিশ কোর্ট কচেরির মধুর অভিজ্ঞতার

জন্য। রোশন সে কথাই তাকে বোঝাতে চাইছে। পুলিশ ভাল ব্যবহার করেছে চাপে পড়ে। সময় মতো উইন এনজিও জড়িয়ে পড়ায়। কিন্তু এই চাপ উইন রাখতে পারবে বলে রোশনের সন্দেহ আছে। কারণ সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। সেই ভোটে পঞ্চায়েত প্রধানের কুর্সিটা লুটতে চাইছে রাঘব ধিংড়া। সেই মতো সে বিনিয়োগ করে বসে আছে। এখন সেই পথে যদি পার্বতী বাধা হয়ে দাঁড়ায় রাঘব ধিংড়া কী করবে কেউ জানে না।

পার্বতী ততক্ষণে রুটি সবজি শেষ করে ফেলেছে। কিন্তু তার ভাব দেখে মনে হয়, সে রোশনের কথাগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছে। বেশ উদ্বিগ্ন স্বরে সে বলে, ''মানে পুলিশ আর পাশে থাকবে না?''

''না।''

পার্বতী খানিক ভেবে বলে, ''সুহানা দিদিরা?''

''ওরা হয়তো থাকতে চাইবে। কিন্তু ওদের থাকতে দেবে না। ছোট সংস্থা। সরকারি সাহায্যেই চলে।''

পার্বতী একটু ভেবে বলে, ''কোর্ট?''

''কোর্টকে ওরা গুমরাহ করবে। মামলা সাজাবে নিজেদের মতো করে। পয়সা দিয়ে সাক্ষী নিয়ে আসবে। পক্ষের সাক্ষীকে কিনে নেবে।''

পার্বতী এবার সত্যিই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। অন্ধকারে শুধু দু'টো ছায়া মূর্তি মনে হয় তাদের। তবু পরস্পরের সান্নিধ্য অনুভব করতে পারে তারা। চকিত কোনও তারার আলোয় রোশন দেখতে পায় পার্বতীর চোখও। পার্বতী চোখের পলক না ফেলে তাকিয়ে থাকে রোশনের চোখের দিকে। হাত বাড়িয়ে তার হাতটা ধরে। মৃদু অথচ ভীষণ ঘন স্বরে বলে, ''আর তুমি?''

রোশন উত্তর দেয় না। পাল্টা চাপ দেয় তার হাতে। নিজের দুই হাতের ভেতর নিয়ে কচলাতে থাকে পার্বতীর হাত। পার্বতী বাধা দেয় না। বেশ কিছু ক্ষণ উপভোগ করে রোশনের আবেগের স্ফূরণ। তারপর নিজেই তার গালে আদর দিয়ে বলে, ''আমি নিষেধ করব তোমাকে আমার পাশে থাকতে। আমি তোমার পরিবারের শত্রু। তোমার গ্রাম সমাজের শত্রু। তোমার দেশের, তোমার এই পারো সংস্কৃতির শত্রু। তুমি আমার পাশে থেকে এত কিছুর বিরুদ্ধে যেও না। কারও ভাল হবে না। এমনকি হয়তো শেষ পর্যন্ত আমারও ভাল হবে না। তুমি আমার পাশে থেকে হয়তো আমার ক্ষতিই বেশি করে দেবে। তাই আমি বলব...।''

কিন্তু রোশন তাকে আর বলতে দেয় না। সে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে পার্বতীকে। অপ্রকৃতিস্থের মত অনিয়মিত শ্বাস ফেলতে থাকে। শ্বাসের সঙ্গে উঠে আসে মৃদু চাপা গোঙানি। সঙ্গে অস্পষ্ট কথা, ''আমি তোমায় ভালবাসি পার্বতী। ভীষণ ভালবাসি। ভীষণ... ভীষণ...।''

পার্বতীর ভাল লাগে রোশনের এই বেসামাল আচরণ। সে বেশ কিছু ক্ষণ নিশ্চল থেকে উপভোগ করে তার আদর। তারপর একসময় খেয়াল করে, রোশন আসলে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বাচ্চাদের মত সে কাঁদছে পার্বতীকে জড়িয়ে ধরে। পার্বতী এবার নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। সোজা হয়ে বসে হাত দিয়ে মুছে দেয় রোশনের চোখ গাল চিবুক। তারপর মৃদুস্বরে বলে, ''আর সমস্যা বাড়িও না রোশন। সম্পর্কে আমি তোমার কাকি হই। এত কিছুর ওপর আর বোঝা বাড়িও না।''

''কিন্তু বিশ্বাস কর পার্বতী, আমি তোমায়...।''

পার্বতী তাড়াতাড়ি হাত চাপা দেয় রোশনের মুখের ওপর। নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করে বলে, ''আমি জানি রোশন। আমিও তোমায় ভালবাসি। আগে আমার লড়াই আমাকে লড়তে দাও। একাই লড়তে দাও। আমার পাশে তুমি থেকো না। যদি আমি জয়ী হই, নতুন এক জীবন অর্জন করতে পারি, তখন তোমায় খবর দেব। তখনও যদি মনে হয় আমায় ভালবাসো, তো আমার কাছে এসো। আমি তোমায় মেনে নেব। কিন্তু এখন না।''

রোশন চোখের জল মুছে ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করে বলে, ''কসম খাও আমার মাথা ছুঁয়ে।''

পার্বতী এবার নিজেই রোশনের মাথাটা নিজের বুকের ওপর টেনে নেয়। বলে, ''কসম খাওয়ার কিছু নেই। তোমাকে পেলে আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে।''

রোশন পার্বতীর নরম স্নিগ্ধ বুকের মাঝে মুখ গুঁজে বলে, ''আমি সুহানা দিদিকে বলব তোমাকে পালাতে সাহায্য করতে। তারপর দেখা যাক কী হয়!''

ওরা দু'জনে অনেকক্ষণ ওভাবেই বসে থাকে, একে অপরের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে। তারপর এক সময় পার্বতী বলে, ''একটা কথা জিজ্ঞেস করব? তুমি কি একদিন অনেক রাতে আমার দরজায় কড়া নেড়েছিলে?''

রোশন চুপ করে থাকে। পার্বতী অপেক্ষা করে কিছু ক্ষণ। তারপর তার চুলের মুঠি ধরে আদর দিয়ে বলে, ''বলো?''

''তুমি জেগেছিলে?''

''হুঁ।''

''তাহলে দরজা খোলনি কেন?''

''কী করে জানব বাইরে তুমি?''

''জানলে খুলতে?''

''কী জানি!''

রোশন সোজা হয়ে বসে বলে, ''আচ্ছা। কাল আবার যাব। তিন বার আওয়াজ করব। ঠিক আছে?''

''ঠিক আছে।''

কিন্তু সে সুযোগ আর রোশন পায় না। কারণ সকালে উঠে সে আর পার্বতীকে দেখতেই পায় না। পার্বতীর ঘরে তালা। পার্বতী আর তার মেয়ে বাড়িতে নেই। উঠতে তার দেরি হয়েছিল। তাই সে জানতেই পারেনি সাত সকালে কী ঘটেছে বাড়িতে। রোশন উসখুস করতে থাকে। বারবার উঁকি দিয়ে নীচে তাকায়। কিন্তু পার্বতীর দেখা কোথাও পায়না। শেষে আর না পেরে যখন ভাবছে নিচে গিয়ে খোঁজ করবে, তখনই অঙ্ক দেখাতে ছাদে উঠে আসে নবিতা। মেজো কাকির মেয়ে নবিতা। অঙ্ক জিজ্ঞেস করার আগেই সে নবিতাকে জিজ্ঞেস করে, ''ছোট কাকিকে দেখছি না। কোথায় গেল জানিস?''

নবিতা ফাইভে পড়ে। সবই জানে বোঝে। সোজা উত্তর না দিয়ে সে জানতে চায়, ''কেন? ছোট কাকিকে

তোমার কি দরকার?''
রোশন বোঝে নবিতার ইঙ্গিতে দুষ্টুমি আছে। তাই সে তাকে গুলিয়ে দেবার জন্য বলে, ''শুনছিলাম পুলিশ আবার তাকে নিতে আসবে পুছতাছের জন্য। তাই ভাবছিলাম, সকালে এসে নিয়ে গেল কিনা!''
নবিতার সত্যি গুলিয়ে যায়। সে বলে, ''না, পুলিশ নিয়ে যায়নি। আমার বড় মামা এসেছিল গাড়ি নিয়ে। সে-ই নিয়ে গেছে ছোট কাকিকে।''
রোশন অবাক হয়ে বলে, ''তোর বড় মামা? মানে বিক্রম চাচা? কোথায় নিয়ে গেছে?''
''এই অঙ্কটা করে দাও তো।''
অঙ্কের খাতাটা হাতে নিয়ে রোশন বলে, ''কোথায় নিয়ে গেছে ছোট কাকিকে?''
''মামার বন্ধুর বিয়ে। ওদের বাড়িতে নিয়ে গেছে কাজ করতে।''
''ও আচ্ছা। বিয়েতে নেমন্তন্ন করেনি?''
''হ্যাঁ করেছে। আমরা যাব তো।''
কথায় কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে অঙ্কের সঙ্গে গুলিয়ে মিলিয়ে রোশন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক তথ্য বার করে নবিতার কাছ থেকে। সব কথা সাজিয়ে যেটুকু বুঝতে পারে, তা খুবই আশঙ্কাজনক। এমনিতে পার্বতীকে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে পাঠিয়ে তার মেজো কাকা যা করেছে, তা প্রচলিত একটা ব্যাপার। কোনও আত্মীয় বন্ধুর বাড়িতে অনুষ্ঠান থাকলে সেখানে মোলকিদের কাজ করানোর জন্য সাময়িকভাবে নিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ আছে। সেটা কয়েকদিন থেকে শুরু করে কয়েক মাসও হতে পারে। তার জন্য মোলকির পরিবার কখনও বা ভাড়াও নেয়। কখনও ওই ভাবেই পুরনো ঋণশোধ করে। মোলকিদের পক্ষে মানসিকভাবে ব্যাপারটা যাই হোক শারীরিকভাবে কমবেশি একই রকম। কিন্তু ব্যাপারটা কখনও বা খুবই খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। মারধর হতে পারে। গালমন্দ, মানসিক নির্যাতন হতে পারে। ঠিকমতো খেতে না দেওয়া হতে পারে। কিন্তু চরম আকার নেয়, যখন নতুন বাড়িতে পারো যৌন শোষণের শিকার হয়। একরকম যৌনদাসী বানিয়ে আটকে রাখা হয় তাকে। এই পর্ব সাময়িক হতে পারে। আবার বাকি জীবনের মতো স্থায়ী বন্দোবস্তও হতে পারে। যতদিন না সেই পারোকে বার্ধক্য এসে যৌনসেবার অনুপযোগী করে দিচ্ছে, ততদিন তার মুক্তি নেই। আর মুক্তি অবশেষে যদি আসেও বা, তা আসে সার্বিকভাবে। গ্রামের প্রান্তে কোনও ঝুপড়িতে একা একা তাকে দিন গুনতে হয় শেষ মুক্তির অপেক্ষায়। মৃত্যু! আর যদি মানসিক ভারসাম্য সে হারিয়ে ফেলে, তো তাকে দেখা যাবে সর্বত্র। তারপর একদিন কালের নিয়মে মরে পড়ে থাকে কোনও নিভৃত কোণে অথবা প্রকাশ্য রাজপথে। পড়ে পড়ে পচতে থাকে যতক্ষণ না কোনও সরকারি দপ্তর খবর পেয়ে এগিয়ে আসে তার সৎকারে। এতসব ভাবনা মাথায় নিয়ে বাস রাস্তায় বেরিয়ে আসে রোশন। বেরিয়েছে কলেজ যাবে বলে। কিন্তু ঠিক জানে না কোথায় যাওয়া তার উচিত! কলেজ? থানা? উইন?
বাস রাস্তা থেকে তাদের গ্রাম এক কিলোমিটার ভেতরে। রাস্তার ধারে সবুজের ওপর সাদা লেখার বোর্ড লাগানো আছে, আজাদপুর। বোর্ডের কাছেই আছে বিরাট একটা পিপল গাছ। সেই গাছের তলায় একটা পোক্ত প্রতীক্ষালয়। পঞ্চায়েত থেকে বানিয়ে দিয়েছে। তিন দিক খোলা। মাথার উপর ছাদ। বসার জন্য ধাপি। রোশন বসেছে তার চিন্তার বোঝা নিয়ে। আর কেউ নেই আশেপাশে। যানবাহন বিশেষ নেই। থেকে থেকে দু'একটা বাইক। ছোট গাড়ি। দেখে শুনে বিশ্বাস হবে না, বাসও আসবে একটু পরে। রাস্তার অপর পারে খিরৌলি গ্রাম। প্রায় দেড় কিলোমিটার ভেতরে। সেই গ্রামের রাস্তা সোজা দেখা যাচ্ছে প্রতীক্ষালয়ে বসে। যে কোনও কারণেই হোক ওদিকটা আজাদপুরের মত এত রুক্ষ নয়। গাছপালা আছে রাস্তা বরাবর। বের, তাড়, খজুর, কন্টা... নানারকম জেদি লড়াকু গাছ। যাদের পারোদের মতোই কড়া জান। ধূসরতার ভেতরেও একটা সবজেটে আভা লেগে থাকে খিরৌলির প্রবেশপথে। শুধু সেটুকুর টানে রোশন কখনও বা হাঁটতে যায় ওই রাস্তায়। ওখানেই সে দেখেছে মাঝামাঝি একটা হনুমান মন্দির আছে। মন্দিরের পিছন দিকে আছে একটা আবর্জনার স্তূপ। এক ঝলকে অন্তত তাই মনে হয়। কিন্তু খেয়াল করলে বোঝা যায়, আসলে একটা মানুষের বাসা ওটা। রোশন একদিন তাকে বেরতে দেখেছিল। কৌতূহলে খোঁজ নিয়ে জেনেছিল, সে একজন পারো। তার নাম সোনা। কোনও পারোর কাছ থেকে কতটা আদায় উসুল করা গেছে সেই নিয়ে গল্প চালু আছে। একটা পারো কিনতে পাঁচ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগে বর্তমানে। তেমন গুণমান থাকলে লাখ টাকাও উঠতে পারে দাম। আজকের হিসাবে লাখ টাকার পারো ছিল এই সোনা। গোটা জেলা হতবাক হয়ে দেখতে এসেছিল সোনাকে যখন ওই অভূতপূর্ব দাম দিয়ে উড়িষ্যা থেকে কিনে এনেছিল হরদেব সিং। সোনার গুণমান উচ্চস্তরীয় ছিল ঠিকই, কিন্তু ওই দাম দেওয়ায় হরদেবকে কেউ কেউ বোকাও ভেবেছিল। নিজের জন্য এনেছিল সোনাকে। তার বউটা অকালে মারা যাওয়ায়। হরদেবের বয়স তখন পঞ্চাশ পার। সোনার ষোলো হবে। হরদেবের বড় ছেলের বয়সই ছিল উনত্রিশ। পিঠোপিঠি আরো তিন ছেলে। সবারই বিয়ে-থা হয়ে গেছে। ছেলেপুলেও আছে। তবু হরদেব ঘরে তুলল নতুন কেনা বউ। মোলকি বহু। যারা হরদেবকে বোকা ভেবেছিল তারা বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বুঝল হরদেবের মত তেজ দিমাগ তাদের নেই। সোনাকে কাজে লাগিয়ে তার মূলধন যে কত গুণ বাড়িয়ে নিয়েছে হরদেব তার হিসাব নেই। আসলে পারোকে অন্যের বাড়িতে খাটতে পাঠানোর ওই রেওয়াজটা হরদেবই চালু করেছিল এ অঞ্চলে। সোনা প্রায় সারা বছরই খেটে বেড়াত এর কাছে তার কাছে। কখনও বা জেলার বাইরেও পাঠাত হরদেব। বলা যায় সোনাকে নিয়ে সে এক রকম এজেন্সিই খুলে ফেলেছিল। নিজেই হয়েছিল তার ম্যানেজার। যদিও লোকে

বলত দালাল। নিজেই সে গাড়ি করে সোনাকে পৌঁছে দিয়ে আসত ক্লায়েন্টের ঠিকানায়। ফেরত নিয়ে আসত নিজেই আবার গিয়ে। কখনও বা কয়েক মাস পরে। কখনও মাসটেক কী সাত দিন। এমনকি সন্ধ্যায় দিয়ে সকালে ফেরত নিয়ে আসার কারবারও সে শুরু করেছিল শেষের দিকে।

হরদেব মারা গেছে। কিন্তু ছেলেদের জন্য রেখে গেছে বিপুল সম্পত্তি। সে তার একাংশ জমি বেচেই সোনাকে কিনেছিল। পরে সোনাকে খাটিয়ে একশ গুণ জমি সে ফিরে কিনেছে। খিরৌলিতে বাড়ি করেছে প্রাসাদের মতো। এছাড়া জেলা শহর নুহ্-তে দোকান, ফ্ল্যাট, গ্রামে ট্রাকটার, প্রাইভেট গাড়ি। সে-ই ছিল খিরৌলির সবচেয়ে ধনী লোক। মরার আগে ভোটে জিতে পঞ্চায়েত প্রধানও হয়েছিল হরদেব। সোনা শব্দটা এমন ভাবেই উচ্চারণ করত, যেন তার মানে স্বর্ণ হতে পারে, আবার শয়নও।

সেই সোনা যদিও অচল হয়ে গেছিল শেষের দিকে। বয়স ত্রিশ পেরোনোর পরেই রোগ বাসা বেঁধেছিল তার শরীরে। হয়তো অতিরিক্ত ব্যবহারেই হয়েছিল। আধা পঙ্গু হয়ে পড়েছিল সে। সোনা আর বাইরে বেরয়নি বহুদিন। তার জন্য বরাদ্দ ছিল একটা ঘর। মূল বাড়ির পিছন দিকে আলাদা একটা বাড়িতে, যেখানে চাকর-বাকররা থাকত। সেখানেই যেন সে অজ্ঞাতবাসে চলে গেছিল স্বেচ্ছায়। এভাবেই সোনা ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছিল মানুষের স্মৃতি থেকে। হরদেবের বৈভবের কালো রহস্য কালের প্রলেপে ধূসর হয়ে আসছিল ধীরে ধীরে। হয়তো স্বস্তিও পাচ্ছিল হরদেবের ছেলেরা। নাতি নাতনিরা। আগের মত আর লোকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করত না তাদের সোনে কি কারোবারি বলে। কিন্তু এই স্থিতাবস্থা রইল না। সোনা আজ সর্বত্র বিরাজমান। আজাদপুর, ভালওয়া, পানিখেড়ি, ধুমিলপুর, সীতাপুর...সর্বত্র সোনাকে দেখা যায়। সারাদিন সে তার পোঁটলা বগলদাবা করে ঘুরে বেড়ায় এই পারো সংস্কৃতির মূর্তিমান কলঙ্কের মত। যেন সে ঘুরে ঘুরে সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চায় হরদেবের কালি করতুত। কালিমা লেপন করতে চায় তার সৎ ছেলেমেয়েদের অভিজাত চাকচিক্যের ওপর। কিন্তু নিঃশব্দে। যদিও হরদেবের পরিবার সোনাকে বার করে দেয়নি রাস্তায়। সোনা নিজেই বেছে নিয়েছে এই স্বেচ্ছা নির্বাসন। সে নিজের হাতে বানিয়েছে হনুমান মন্দিরের পেছনে নিজের আস্তানা। সেখানেই ফিরে আসে রোজ সন্ধ্যে হলে। সকালে আবার বেরিয়ে যায়। নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ায় যেখানে মন চায়। লোকে বলে, আসলে সে ফিরে ফিরে যায় সেই সব ঠিকানায় যেখানে হরদেব তাকে মোটরগাড়ি করে নিয়ে যেত। নিয়েও আসত ফিরিয়ে। আজ সে হেঁটেই যায়। হেঁটেই ফিরে আসে।

রোশনের ভাবনার চটকা ভেঙে যায় বিকট এক গন্ধ নাকে এসে লাগায়। মুখ তুলে দেখে কখন পাশের ধাপিতে এসে বসেছে সেই পাগলি পারো। সোনা। যেন সেও বাস ধরে কোথাও যাবে। রোশন মন দিয়ে দেখে সোনাকে। কালিঝুলি মাখা মুখ ঘাড় গলা গা হাত পা। জট পড়া ধুলোটে চুল। চোখে পিচুটি। লম্বা লম্বা নখের ভেতর ময়লা জমা। বয়সের ছাপ পড়েছে মুখে। জীর্ণ তার সর্বাঙ্গ। কিন্তু এখনও অনুমান করা যায় তার যৌবনের গুণমান। তার কাঠামো। তার উচ্চতা। কপাল চিবুক নাকের গড়ন। চোখের স্নিগ্ধতা। রোশন অবাক হয়ে যায় সোনাকে এত কাছ থেকে দেখে। যদিও সোনা তার দিকে ফিরেও তাকায় না। রোশনের অদ্ভুত অনুভূতি হয় সোনার পাশে বসে। পার্বতীর ভাবনায় সে এমনিতেই কাহিল হয়ে ছিল। সোনা এসে যেন তাকে শেষ করে দিল। তার নিঃশব্দ উপস্থিতি দেখে মনে হয়, গোটা জীবনটাই যেন তার শব্দহীন। যেন সে অবলা জীব একটা। মুখ বুজে যে শুধু পরিষেবা দিয়ে যায়। রোশন ভাবনা পাল্টানোর জন্য রাস্তার দিকে তাকায়। মোবাইল বার করে সময় দেখে। আধ ঘণ্টার ওপর সে বসে আছে। বাস আসছে না। এমনটা হয় মাঝে মাঝে। তখন পরের বাসের জন্য বসে থাকতে হয়। রোশনের ইচ্ছে করে সোনার সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু সে নাকি কথা বলে না। কারও কোনও প্রশ্নের উত্তর দেয় না। নিজেও কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করে না। কিছুই চায় না কারও কাছে। পেলে খায়, না পেলে খায় না।

রোশন নিজের জলের বোতলটা ব্যাগ থেকে বার করে সোনার দিকে বাড়িয়ে ধরে। মুখে বলে, ‘‘পানি।’’

সোনা তাকায় না। কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করে সে আবার বলে, ‘‘পানি পিজিয়ে।’’

এবার সোনা ফিরে তাকায়। সন্দিগ্ধ চোখে তাকায়। তারপর ঝপ্ করে জলের বোতলটা ছিনিয়ে নেয়। নিয়েই সে ধাপি ছেড়ে উঠে পড়ে। প্রতীক্ষালয় থেকে বেরিয়ে রাস্তা পেরিয়ে দৌড় দেয় খিরৌলির দিকে। যেন ছিনতাই করে পালাচ্ছে। রোশনের সন্দেহ হয়, হয়তো বা তার মেজো কাকা তেমন কিছু ভেবে বসে আছে পার্বতীর জন্য। সোনার মতো। যদি তাই হয়, আর দেরি করা উচিত হবে না। সে মনস্থির করে ফেলে সোজা সে উইনের অফিসে যাবে।

কিছু ক্ষণ পরে পরের বাস এসে হাজির হয়। রোশন পৌঁছে যায় উইনের দপ্তরে। সেখানে তার দেখাও হয় পারুলের সঙ্গে। পারুল জানতে চায় পার্বতীর কথা। আজাদপুরের খবর। আর তার শ্বশুরবাড়ির কথা। কিন্তু তার ভাসুর রাঘব ধিংড়া আর তার চার বন্ধু গ্রেফতার হয়েছে শুনে পারুল কেমন ভয় পেয়ে যায়। সে চমকে উঠে বলে, ‘‘গিরফতার! সে কী!’’

ভয় তার চরম আতঙ্কের আকার নেয় যখন রোশন তাকে বলে, কেস উঠবে কোর্টে। সাক্ষী দিতে যেতে হবে তাকে। পারুল বিভ্রান্ত হয়ে বলে, ‘‘আমি কী সাক্ষী দেব?’’

রোশন বলে, ‘‘উকিল যা জিজ্ঞেস করবে তার উত্তর দেবে। সত্যি কথা বলবে। যা কিছু হয়েছে তোমার সঙ্গে সব বলবে।’’

পারুল কিছু ক্ষণ ভেবে বলে, ‘‘কিন্তু তাতে তো নিজেরও অপমান। ওরা কী না করেছে আমার সঙ্গে। ওর বাবা ওর কাকা ওর দাদারা, এমনকি বন্ধু বান্ধবরা মিলেও দল বেঁধে অত্যাচার করেছে আমার উপর। সে সব কথা আমি কীকরে বলব আদালতে দাঁড়িয়ে?’’



রোশন বলে, ''বলতেই হবে। না বললে ওদের থামানো যাবে না। তুমি হয়তো পালিয়ে বেঁচে গেলে। পার্বতী এখনও ওদের কাছেই আছে। এরকম আরও কত মেয়ে আছে। তাদের বাঁচানোর জন্য তোমাকে সত্যি কথা বলতেই হবে। এদের চরম শাস্তি হলে হয়তো অন্যরা ভয় পাবে এই কাজ করতে।''

রোশন অনেকক্ষণ কথা বলে পারুলের সঙ্গে। আসলে সুহানা দিদি অফিসে নেই। ফিরবে ঘণ্টাদুয়েক বাদে। তারই অপেক্ষায় বসে আছে রোশন। শেষ পর্যন্ত সুহানা দিদি সেদিন আসে না। রোশন তাকে ফোনেই বলে পার্বতীর কথা। সুহানা জানায়, কালকেই তারা ওদের বাড়ি যাবে পার্বতীর খোঁজে। সত্যিই তাই। পরদিন সকাল সকাল উইনের গাড়ি আসে রোশনদের বাড়ি। গাড়িতে ওই একই দল। সুহানা, উকিল আর একজন। কিন্তু পুলিশের গাড়ি কোথাও দেখে না। কথা ছিল পুলিশ সঙ্গে নিয়ে আসবে সুহানা দিদি। নাহলে ওদের পাত্তাই দেবে না রোশনের বাড়ির লোক। দেয়ও না। ওদের বাড়ির ভেতর ঢুকতেই দেয় না রোশনের মেজ কাকা। রোশন ছাদ থেকে দেখে। সুহানা দিদি পার্বতীর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। ওর মেজ কাকা বলছে, সে বাড়ি নেই। উকিল বলছে, কিছু আইনি পরামর্শের প্রয়োজন আছে। মেজ কাকা বলছে, মাসখানেক পরে আসতে। এইরকম চলতে থাকে বেশ কিছু ক্ষণ। কিন্তু উইনের লোকজন কোনওই সুবিধা করতে পারে না। শেষে উকিল সাহেব বলেন, ''যেখানে আছে তার ঠিকানা দিন। আমরা ওখানে গিয়ে পার্বতীর সঙ্গে কথা বলব।''

মেজ কাকা হঠাৎ বলে, ''ওহ্ তো বহুত দূর হ্যায়।''

''কিতনি দূর?''

''অসম।''

''অসম?''

''জি। উনকে মা বাপ আয়ে থে, মাইকে লে গয়ে মাহিনা ভরকে লিয়ে।''

রোশন মেজো কাকার মিথ্যে কথার বহর শুনে অবাক হয়ে যায়। তার ওপর থেকে চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, ঝুট! ঝুট! হয়তো পেট থেকে উঠেও এসেছিল কথাটা গলা পর্যন্ত। শেষ ধাপে আটকাতে যাওয়ায় বিষম খেয়ে যায় রোশন। শব্দ ওঠে। সবাই মুখ তুলে তাকায় ওপরের দিকে। মেজ কাকাও। তাই চেয়েও সে ইশারা করতে পারে না। ভাবলেশহীন মুখে পাল্টা চেয়ে থাকে মানুষগুলোর দিকে। চেয়ে চেয়ে শোনে অসমের কোনও কাল্পনিক ঠিকানা মেজো কাকা বলছে ওদের। ওরা সেটাই লিখে নিচ্ছে ডায়েরিতে। সুহানা দিদিরা চলে যায়। তার কিছু ক্ষণ পরেই রোশনের মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠে। সুহানা দিদি ফোন করেছে। সুহানা দিদি বলে, ''আমরা বাস রাস্তায় ওয়েট করছি। তুমি চলে এস। তোমার বিক্রম চাচার বাড়ি যাব।''

রোশন অতটা সাহস দেখাতে রাজি হয় না। সে বলে, ''আপনারা চলে যান। আমি অফিসে দেখা করব।''

হয়তো সুহানা দিদি একটু বিরক্তই হয়। কিন্তু রোশন তখনকার মত আর কিছু করতে পারে না। সে বুঝতে পারে না, পার্বতীর প্রতি তার ভালবাসা ঠিক কতটা গভীর? কেন সে ওদের সঙ্গে যাওয়ার সাহস দেখাতে পারল না?

প্রায় আধঘণ্টা পর রোশন আনমনা ভঙ্গিতে বাড়ি থেকে বেরয়। এমন করে রাখে নিজের মনটাকে যেন সে চাইলেই অসম চলে যেতে পারে। একেবারে ব্রহ্মপুত্র নদীর পাড়ে। কিংবা উইনের দপ্তরে, লোকাল থানায়। কিংবা, চাইলে... কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা বিক্রম চাচার বাড়ি। গিয়ে একদম তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে বলতে পারে, আমি পার্বতীকে ফেরত নিতে এসেছি। কী করবে তখন ওই বিক্রম গাড্ডুটা! এলাকায় তার দুর্নাম আছে গুণ্ডা বলে। সে তার বোনের

শ্বশুরবাড়ির লোক। সে পারবে না তার গায়ে হাত তুলতে। হয়তো গাল দেবে। রেগেমেগে চিৎকার চেঁচামেচি করবে। বাড়ির সব লোককে জড়ো করবে। তখন কি পার্বতীও বেরিয়ে আসবে কাজ ফেলে? তার কাছে ছুটে এসে কি বলবে, আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল রোশন? তখন সবাই জেনে যাবে রোশন আর পার্বতীর অবৈধ প্রেম। লজ্জায় পড়ে যাবে সে। লজ্জায় পড়ে যাবে তার বাবা মা। তার পরিবার। সমাজের সামনে বংশের মাথা সে নিচু...। তাই বা কেন, পার্বতীর সঙ্গে তো শুয়েছে তার মেজ কাকা, তখন তো নিচু হল না বংশের মাথা। অত্যাচার করলে দোষ নেই, ভালবাসলেই দোষ? দমন-পীড়ন সমাজস্বীকৃত, কিন্তু ভালবাসা নিষিদ্ধ? এই যদি হয় সমাজের বিচার, অগ্রাহ্য করা উচিত সেই সমাজকে। চুনকালি পড়া উচিত সমাজের মুখে। নাকি তার মুখে যে...। মুখেই লাগে রোশনের। এত জোরে যে ভারসাম্য হারিয়ে উল্টেই পড়ছিল আর একটু হলে। কোনও রকমে টাল সামলে দেখে ফুটবল। বাচ্চারা খেলছিল মাঠে। আর সে দাঁড়িয়ে আছে মাঠের মাঝখানে। বল এসে লেগেছে তার মুখে। রোশন গালে হাত বোলাতে বোলাতে দ্রুত পায়ে পেরিয়ে যায় খেলার মাঠ। আর কিছু ক্ষণ পরেই উপলব্ধি করে সে দাঁড়িয়ে আছে যেন এক ফুলের উপত্যকার মাঝখানে। যেদিকে তাকাও বিস্তৃত সরষে ফুলের পরিসর। দূরে দেখা যাচ্ছে এক ধুলোটে পাহাড়। রোশন কী ভেবে হাঁটা দেয় ওই পাহাড়টার দিকেই। সর্ষের ক্ষেতটা শর্মাদের। ওদের তেল কলও আছে বাজারে। সেটা পেরিয়ে পবনদের বার্লি ক্ষেত। তারপর ধিংড়াদের বাজরার ক্ষেত। এই বাজরার ক্ষেতেই কত খাটুনি খেটেছে পারুল। তারপর আছে একটা আলটপকা আখের ক্ষেত। এমনিতে আখের ক্ষেতগুলো গ্রামের পূর্বদিকে। ঢোলকিরা কেন জানি তাদের এই পশ্চিমের ক্ষেতটায় আখ লাগায় প্রতি বছর। গ্রাম আর পাহাড়ের মাঝে একটা আড়ালের মত দাঁড়িয়ে থাকে ঢোলকিদের আখের ক্ষেতটা। লোকে বলে ওটাই ওদের উদ্দেশ্য, আড়াল তোলা। আখ ক্ষেতের আড়ালে ওরা অনেক অপকম্ম করে। এমনিতেই ওটা গ্রামের শেষ ক্ষেত। তারপরে পাহাড়। ওদিকে তেমন কেউ যায় না। অপকম্ম বলতে আর কী, ওটাই! রোশনের কলেজে পড়া বন্ধুরা বলে, আউটডোর সেক্স। শত প্রতিশৎ কুদরতি। সেজন্যই বোধহয় ঢোলকিদের বাড়িতে সবচেয়ে বেশি পারো। চার ভাইয়ের চার বউই পারো। দুটো বাঙালি একটা বিহারি আর একটা নেপালি। ফক্কড় লোকেরা ওদের নাম দিয়েছে পশ্চিমী গন্না। গ্রামের পশ্চিম দিকের আখ ক্ষেতে ওদের প্রায় সব সময়ই পাওয়া যায় বলে ওই নাম। রোশন দেখল বউগুলো সত্যি ক্ষেতেই আছে তখনও। হাতে কাস্তে নিয়ে টুকটাক কাজে ব্যস্ত। অথবা ব্যস্ততার ভান। রোশনকে দেখে সবাই একবার করে মুখ তুলে তাকায়। ওদের প্রত্যেকের চেহারায় সুখে আরামে থাকার ছাপ আছে। আখ ক্ষেতের ভেতর দিয়েই ওপাশে যাওয়ার রাস্তা। পাহাড়ে যাওয়ার ওটাই পথ। তাই রোশন ঢুকে পড়ে আখ ক্ষেতের ভেতর। আর দশ-বিশ পা যেতেই সেও অদৃশ্য হয়ে যায় আখবনে। হঠাৎ পিছনে সড়াৎসড় শব্দে চমকে ওঠে রোশন। ফিরে তাকিয়ে দেখে ওই মেয়েদেরই একজন দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে মুখ নিচু করে। সে দাঁড়িয়েই থাকে। কিছু বলে না। রোশনও কিছু বলে না। অপেক্ষা করে। তারপর আখবনে সংযত শব্দ তুলে যেন আবির্ভূত হয় আর একটি মেয়ে। তারপর বাকি দুজনও এসে হাজির হয় রোশনের সামনে। এ অঞ্চলের কুপ্রসিদ্ধ আড়ালের ভেতর। রোশন খানিক শঙ্কিত বোধ করে। খানিক উত্তেজনা জড়ো হয় তার রক্ত বাহিকাগুলোর ভেতর। মুখ তুলে তাকায় মেয়ে চারজনের দিকে। প্রত্যেকেই তারা উগ্র যুবতী। অন্তত সেই মুহূর্তে নওজওয়ান রোশনের চোখে ভীষণ আবেদনময়ী মনে হয় তাদের। কিন্তু রোশন অবাক হয়ে দেখে কোনও উগ্রতা নেই তাদের ভাবে ভঙ্গিতে। আচরণে। রোশন আরও কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করে। মেয়েগুলো দাঁড়িয়েই থাকে একভাবে। একবারের জন্য তার মনে হয় একজনকে বেছে নিতে বলছে না তো তাকে! ভাবনাটা দানা বাঁধার আগেই একটা মৃদুস্বর কানে আসে। তাদের একজন বলে, ''এক বাত পুছনি থি।''

রোশন আশ্বস্ত হয়ে বলে, ''জি, পুছিয়ে।''

একটু সময় নিয়ে মেয়েটি বলে, ''ক্যা পারুল ভাগ নে মে কামিয়াব হো গয়ি?''

''জি।''

''আপনে উসকো ভাগনে মে মদত কি?''

''মন্নে! কৌন বোলা সে!''

রোশন অবাক হয়ে যায় মেয়েগুলোর কথা শুনে। তারা বলে, তেমনই নাকি রটেছে। রোশনের সাহায্যে পারুল পালাতে পেরেছে। আর পার্বতীকেও সে-ই উসকাচ্ছে নিজেরই পরিবারের বিরুদ্ধে। তাই গোটা সমাজ তার ওপর ক্ষুব্ধ। কিন্তু পারোরা ভীষণ শ্রদ্ধার চোখে দেখছে তাকে। যারা পালিয়ে বাঁচতে চায়, তারা গোপনে যোগাযোগ করার কথা ভাবছে রোশনের সঙ্গে। পুলিশ সুস্মিতার সঙ্গে কী করেছিল সবাই জানে। তারাই আবার পার্বতীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করল সেও গোটা গ্রাম দেখেছে। সে নাকি রোশনেরই জন্য। মেয়েগুলো যেন নিজেদের মধ্যেই হুড়োহুড়ি করে কথাগুলো বলার জন্য। বলতে বলতে আশ্চর্য এক ভক্তিভাব ফোটে তাদের চোখে মুখে। যেন রোশন আসলে মহান কেউ, যার দর্শন পেয়ে তারা ধন্য। রোশন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে মেয়েগুলোর আচরণ দেখে। তার ইচ্ছে করে গর্বিত হতে। কিন্তু আসলে সে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তার মানে গোপন কথাটা আর গোপন নেই। সবাই জানে রোশন ভেতরে ভেতরে পারোদের পক্ষে। এনজিওতে নাম লিখিয়ে সে নিজেই নিজের সমাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। সে আসলে এক ধরনের সমাজবিরোধী। স্থানীয়ভাবে দেশদ্রোহী। এইসব কথা মেয়েগুলো বলে না। কিন্তু যা বলে, তার থেকে রোশন নিজেই এই ব্যাখ্যা বার করে এবং সেগুলো তার অযৌক্তিক বলে মনেও হয় না।

তাই যদি হয়, তাহলে তো সে নিজেও পার্বতীর চেয়ে কম বিপন্ন নয়। কিন্তু তখনও মেয়েগুলো সব কথা বলে উঠতে পারেনি। ভাবে, আচরণে গোড়ার সেই সংকোচও নেই। এমনকি, একজন একটা হাত দুয়েক লম্বা আখের টুকরো নিজের দুপট্টা দিয়ে ঘষে মুছে রোশনের হাতে দিয়ে বলে, ‘‘খা কর দেখিয়ে। বহুত মিঠা হ্যায়।’’

রোশন হাত বাড়িয়ে আখটা নিতেই মেয়েটা মিষ্টি করে হাসে। নির্মল হাসি। কিন্তু পাশ থেকে অন্য একটা মেয়ে বলে, ‘‘পশ্চিমী গন্না।’’

রোশন শুধু হাসে। আখের খোসা দাঁত দিয়ে ছাড়ানোর চেষ্টা করে। তখনই এক প্রশ্ন তার কানে আসে, ‘‘আপ পার্বতী সে পেয়ার করতে হো?’’

রোশন চমকে উঠে তাকায় মেয়েটার দিকে। বোধ হয় বিহারন। সেও তাকিয়ে আছে রোশনের দিকে। কিন্তু তার দৃষ্টিতে কোনও কৌতুক বা দুষ্টুমি নেই। নির্ভেজাল কৌতূহলেই সে জিজ্ঞেস করেছে কথাটা। রোশন আখ নামিয়ে বলে, ‘‘ওহ্ হামার কাকি সে।’’

মেয়েটা বিষণ্ণ হেসে বলে, ‘‘পারো কিসিকা কুছ নহি সে। ওহ্ সির্ফ অউরত সে।’’

রোশন বলে, ‘‘ম্যায় অ্যায়সা নেহি সোচতা।’’

‘‘পতা সে। তবেই না আপনি পার্বতীকে ভালবাসতে পেরেছেন। না হলে একজন পারোকে কে কোথায় ভালবেসেছে!’’

রোশন হঠাৎই হাতজোড় করে বলে, ‘‘ঠিক সে। রাম রাম। চলতে হ্যায়।’’

‘‘ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন?’’

‘‘পাহাড়ে।’’

‘‘কী দরকার পাহাড়ে?’’

সে তো রোশন নিজেও জানেনা ওর কী দরকার পাহাড়ে। মন ওদিকেই টানছে। তাই যাচ্ছে। উত্তরে সে সত্যি কথাই বলে, ‘‘পতা নহি।’’

তখন একজন কণ্ঠে হালকা আশঙ্কা ফুটিয়ে বলে, ‘‘কেউ টানছে না তো ওদিকে?’’

রোশন খানিক সচেতন হয়ে বলে, ‘‘হ্যাঁ। সত্যিই টানছে। আমার মন।’’

মেয়েগুলো এবার একসঙ্গে আঁতকে উঠে বলে, ‘‘হায় রাম! মত যাও উধার।’’

‘‘কিঁউ?’’

‘‘কারণ, আপনাকে ও-ই টানছে।’’

‘‘কে টানছে?’’

খানিক ইতস্তত করে ওরা বলে, ‘‘ওর নাম নিতে নেই ভরদুপুরে। একটা চুঁড়েল থাকে পাহাড়ে। কাউকে কাউকে সে টানে নিজের দিকে।’’

রোশন কণ্ঠে খানিক কৌতুক ফুটিয়ে হাসি চেপে বলে, ‘‘তারপর?’’

‘‘ইয়ার্কি না। চুঁড়েল খুব খতরনাক।’’

যুবতীগুলোকে হঠাৎ বাচ্চা মনে হয় রোশনের। কতই বা বয়স হবে ওদের! সবচেয়ে বড়টা যার নাম বলল রুমল, পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। বিহার থেকে ওকে ঢোলকিরা কিনে এনেছিল প্রায় বারো-তেরো বছর আগে। সেই যে এসে আজাদপুরে ওদের বাড়িতে ঢুকেছে, আর সে পা রাখেনি গ্রামের বাইরে। এই আখ ক্ষেতই তার যাওয়া সবচেয়ে বড় দূরত্ব। এমনকি ওই পাহাড়েও সে কখনও যায়নি। অদৃশ্য এক খতরনাক দ্বাররক্ষী নিজেই সে বসিয়ে রেখেছে নিজেকে আটকানোর জন্য। হয়তো সে পার্বতী বা পারুলের মতো নয়। পালাতে চায় না এই জীবন ছেড়ে। বাপের ঘর থেকে শ্বশুর ঘর। আসলে তো এক কষ্ট থেকে আর এক কষ্টে এসে পড়া। তুলনামূলক বিচারে যদি শ্বশুর ঘরটা কম কষ্টের মনে হয়, তাহলে নতুন জীবন অর্জনের আকাঙ্ক্ষা আর বোধহয় থাকে না পারোদের মনে। তৃতীয় পছন্দের কোনও জায়গা নেই। দু’টোই মাত্র পছন্দ। দু’টোই আসলে অপছন্দের। কষ্টের। যে কোনও একটা বেছে নিতে হবে। নিয়েছেও। তাই ক্ষেত পেরিয়ে পাহাড়ের কাছে যাওয়ার পথটাও নিজেই বন্ধ করে রেখেছে নিজের কাছে। এটাও হয়তো এক ধরনের সুখে থাকার কৌশল। নিজেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখা অনুমোদিত গণ্ডির ভেতর। সে যতই কষ্ট থাক বাস্তবে।



আখ ক্ষেতের আড়ালে ওরা অনেক অপকম্ম করে। এমনিতেই ওটা গ্রামের শেষ ক্ষেত। তারপরে পাহাড়। ওদিকে তেমন কেউ যায় না। অপকম্ম বলতে আর কী, ওটাই!

মেয়েগুলোর প্রবল বাধা সত্ত্বেও রোশন হাঁটা দেয় পাহাড়ের দিকে। কোনও মতেই আটকানো যাচ্ছে না দেখে একজন একটা বিরাট আখ এনে তার হাতে দেয়। বলে, ‘‘কমসে কম এক লাঠি লেকর যাও।’’

রসিকতা করে আর একজন বলে, ‘‘চুঁড়েল মিলে তো মারনা। নহি তো খা লেনা।’’

রোশন একবার সিমলা গেছিল বেড়াতে। সেই সিমলা পাহাড়ের কাছে এই পাহাড় পৃথিবীর বুকে একটা ফুসকুড়িও না। তবু এর চৌহদ্দির ভেতর এসে পড়ে রোশনের বেশ থমথমে লাগে। এক তো জনপ্রাণি নেই ত্রিসীমানায়, তারপর ধূ-ধূ করা দুপুর আর নেপথ্য আবহে চুঁড়েলের গল্প। পাহাড়টার নাম বকরি পাহাড়। কেন যে এই নাম কেউ জানে না। এই বকরি পাহাড়ের ভেতরেই একটা গুহা আছে, যাকে লোকে বলে ভূত গুফা। ছোটবেলায় রোশন এসেছে বহুবার এই ভূত গুহায়। ভেতরটা ভিজে-ভিজে ভাব। ভরা গ্রীষ্মের দুপুরেও ফ্রিজের মত ঠান্ডা। বখাটে ছেলেরা ওখানেই দীক্ষা নেয় বখাটেপনার। আর একটু উঁচু দাগের নষ্টামির। রোশন নিজের অজান্তেই এগিয়ে যায় ভূত গুফার দিকে। যেন সত্যি সত্যি কেউ তাকে টানছে তার চরম বিন্দুর দিকে। গুহার মুখে গিয়ে একবার দাঁড়ায় রোশন। দেখে গুহার মুখটা ভীষণ পরিচ্ছন্ন। যেন কেউ সাফ-সুতরো করে রেখেছে। হয়তো কেউ এসে বসেছিল বন্ধুরা মিলে। পানভোজন

করে গেছে। এক কোণে স্তূপাকারে পড়ে আছে মদের, বিয়ারের, জলের বোতল, খাবারের প্যাকেট, প্লাস্টিকের গ্লাস। বেশ বড় বাজেটের ঠেক বসেছিল মনে হচ্ছে। হঠাৎ কৌতূহলের বশে হাতের বড় আখটা দিয়ে স্তূপটা খোঁচাতে শুরু করে রোশন। তলা থেকে বেরিয়ে আসে বেশ কয়েকটা ব্যবহৃত কনডোম। রোশন ভাবে, পশ্চিমী গন্নাই হবে এর অনুপ্রেরণা। বেচারা চুঁড়েল।
রোশন গুহার ভেতর একটু ঢুকে ছায়ার মধ্যে বসে। তারপর এই বকরি পাহাড়ের নির্জনতা ধীরে ধীরে যেন গ্রাস করে নেয় তাকে, ভেতর থেকে। তার আত্মা, তার মন শান্ত হয়। নির্জন হয়। একসময় তার শব্দহীন মনে হয় নিজেকেও। তার উপলব্ধি হয়, যেন তার আত্মা কথা বলতে চাইছে তার সাথে। তার কথা শোনার আগ্রহে নিজের আত্মার দিকে মন দেয় রোশন। বহির্জগত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে সে হয়ে উঠতে চায় আত্মমুখী। আত্মভেদী।
এক রকম যেন সে ধ্যানেই বসে যায় বুদ্ধ মুদ্রায়। একসময় যেন সত্যিই আলোকিত লাগে নিজের ভেতরটা। সে শুনতে পায়, তার আত্মা তাকে বলছে, আমার কথা শোনো। পরদিন রোশন সকালে উঠেই সোজা চলে যায় উইনের অফিসে। কাল সুহানা দিদি ফোন ধরেনি। তাই জানতে পারেনি কি হল। আজও অফিসে এসে দেখা পায় না তার। তবে উকিল সাহেব ছিলেন অফিসে। তার কাছেই রোশন শোনে বিক্রম চাচার বাড়িতে কী হল।
প্রথমে তো অনেক হম্বিতম্বি করে বিক্রম। হুমকিও দেয় তার স্বভাবমতো। কিন্তু সুহানা দিদি ওকে বিভ্রান্ত করে দেয় শুধু কাগজ দিয়ে। থানার, কোর্টের, সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন ধারা উপধারার প্রিন্ট আউট...। গুচ্ছ গুচ্ছ কাগজ বিক্রমের হাতে দেয় আর বলে, ‘পড়কে দেখিয়ে... পড়কে দেখিয়ে...।’ বিক্রম একসময় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সব কাগজ গোছা করে সুহানা দিদির হাতে ফেরত দিয়ে বলে, ‘পার্বতী ভাগ গয়ি।’ বিক্রম স্বীকার করে, তার এক বন্ধুর বাড়িতে বিয়ে উপলক্ষে কাজেকর্মে সাহায্য করার জন্য পার্বতীকে আনা হয়েছিল। রাতে তার বাড়িতেই পার্বতী আর তার মেয়ের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। কথা ছিল, সকালে ওকে নিয়ে যাওয়া হবে কাজের বাড়িতে। কিন্তু সকাল থেকে পার্বতীকে পাওয়া যাচ্ছে না। মা মেয়ে দুজনেই গায়েব।
তারপর সুহানার চাপাচাপিতে তারা থানায় যায়। আজাদপুর নয়। অন্য থানা, মাটিয়ারা। মিসিং ডায়েরি করে সেখানে।
রোশন শুনে চিন্তিত হয়ে পড়ে। বলে, ‘‘পুলিশ তো কিছু করবে না। করবে?’’
উকিল সাহেব বলেন, ‘‘না। আর যদি করেও ওদের হয়েই করবে।’’
‘‘তাহলে?’’
‘‘পার্বতীর কেসটা কোর্টে আছে। আমরা কোর্টকে জানাচ্ছি বিষয়টা। পুলিশের সুপারকে চিঠি করা হয়েছে। কিন্তু...।’’ উকিল সাহেব হঠাৎই থেমে যান।
রোশন ব্যগ্র ভঙ্গিতে বলে, ‘‘কিন্তু কী?’’
‘‘মনে হচ্ছে, কোনও বড় নেতা বা মন্ত্রী পুলিশকে কিছু বলেছে। আগের সেই সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। সামনে ভোট। জানই তো, যে পার্টি পারোদের অধিকার নিয়ে কথা বলবে, সেই পার্টি একটা ভোটও পাবে না।’’
রোশন ধীর পায়ে বেরিয়ে আসে উইনের অফিস থেকে। নুহ্ শহরের বাস আড্ডা থেকে আজাদপুরগামী শেষ বাস ছাড়ে সন্ধ্যে সাড়ে ছ’টায়। বাড়ি পৌঁছতে নটা বেজে যায়। রোশনের আজ বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করেনা। তাই ওই শেষ বাসেই ফিরবে ভেবে হাঁটা দেয় শহরের রাস্তা ধরে। মাথায় দুশ্চিন্তার বোঝা। একটা নির্জন চৌকো পুকুর দেখতে পেয়ে সেদিকেই এগিয়ে যায় রোশন। লাল পাথরে বাঁধানো চারপাশ। প্রশস্ত ঘাটে চওড়া সিঁড়ি। বাঁধের মত দেওয়াল চলে গেছে পুকুরের মাঝখান পর্যন্ত। সিঁড়ির ওপর গিয়ে বসে রোশন। পাথরের দেওয়ালের ওপর দিয়ে হেঁটে পুকুরের মাঝ বরাবর পাথরের ছত্রির ভেতর পৌঁছে যায়। তারপর সেখানেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। মাথা এলিয়ে দেয় ঐতিহাসিক লাল পাথরের ওপর। শুয়ে শুয়ে পুকুরের ভাবনা মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করতে থাকে, যাতে নিজের ভাবনাগুলো কিছুটা বেরিয়ে যায় মাথা থেকে। এই পুকুরটাকে বলে ছুইমল কা তালাও। কে জানে কে ছিলেন ছুইমল। কিন্তু পুকুরটা বানিয়েছিলেন খরচ করে। লাল পাথরে চারপাশ বাঁধানো। জলের ভেতর পর্যন্ত পাথরের অসম্পূর্ণ সেতুর মতো পথ। আর সে পথের প্রান্তে জলের উপরে পাথরের ছত্রি। অপূর্ব কারুকার্য করে সাজানো। গরমের দিনে নিশ্চয়ই ওই ছত্রির তলায় আসন পেতে বসতেন ছুইমল। পাশে রাখা থাকত সুরা আর সুখাদ্য। চারপাশের ঘাটগুলোতে হয়ত হত সন্ধ্যারতি। ছত্রির ওপর বসে নিশ্চয়ই পুকুরটাকে মায়াময় দেখাত। ভীষণই মায়াময়। আর অলৌকিক। এতটাই যে আকাশ থেকে জিনপরিরা এই দৃশ্য দেখে আকৃষ্ট হত। আর তারা একে একে তাদের নিঃশব্দ ডানায় ভর করে নেমে আসত পুকুর পাড়ে। নেমে এসে বসে যেত যে যেখানে পারে। ছত্রির তলায় বসে ছুইমল নেশায় হয়ত বুঁদ হয়ে যেত। তারপর এই মায়া সরোবরের মাঝখানে এলিয়ে পড়ত গভীর নিদ্রায়। সে ঘুমিয়ে পড়ার পরও প্রদীপ জ্বলত। জিনপরিরা এসে বসত। কিন্তু ছুইমল আর কিছুই জানতে পারত না। কারণ, তখন সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।
ধীরে ধীরে নিভে আসত প্রদীপের আলো। একে একে আকাশে ফিরে যেত পরির দল। গভীর অন্ধকার নেমে আসত চারপাশ ঘিরে। তখন গুটিগুটি জলের দিকে এগিয়ে আসত নিশাচরের দল। যারা এতক্ষণ অপেক্ষা করেছিল খিদে তেষ্টা বুকে চেপে। এইবার সুযোগ পেয়ে তারা জড়ো হত জল ঘিরে। মুখ নিচু করে পান করত আকণ্ঠ জল। তারপর তৃপ্তির উল্লাসে আকাশের দিকে মুখ করে ফেটে পড়ত জান্তব হুঙ্কারে। আর সেই হাড় হিম করা চিৎকারে চমকে জেগে উঠত...। সত্যিই যেন কানের কাছে রোশন শুনতে পায় সেই হুঙ্কার। গরম নিঃশ্বাস এসে লাগে তার মুখে। নাকে লাগে বিকট বোঁটকা জান্তব দুর্গন্ধ। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে রোশন।

জলের দিকে দ্রুত নেমে যায় কোনও চারপেয়ে রোমশ জন্তু। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নেই। জেগে উঠে দেখে চারপাশ অন্ধকার। তার বাস ধরার কথা সাড়ে ছটায়। পকেট থেকে মোবাইল বার করে। সুইচ অফ করে রেখেছিল। অন হতেই দেখে রাত সাড়ে এগারোটা বাজে। বাড়ি থেকে অনেকগুলো মিসড কল। এত রাতে আর কল ব্যাক করার কথা সে ভাবে না। কোথাও আর যাওয়ার উপায় নেই। তাই রোশন সোজা হয়ে বসে থাকে ছুইমলের ছত্রির তলায়। বাকি রাত ওখানেই বসে বসে কাটিয়ে দেয় রোশন। ফোনটা সুইচ অফ করে রাখে আবার। রোশন আর দেরি না করে রওনা দেয় বাস আড্ডার দিকে। বাড়ি পৌঁছে রোশন খানিক অবাকই হয়। যতটা বকুনি খাবে ভেবেছিল, ততটা রাগ দেখায় না বাড়ির লোক। শুধু তার মা বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজখবর নেয় সে রাতে কোথায় ছিল, কেন ছিল। রোশন বলে, বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে গিয়ে বাস মিস করেছিল, তাই। ব্যস্, এটুকুই। মেজো কাকি তো কটাক্ষ করে বলে, ‘‘আমি তো ভাবলাম পালিয়ে অসম চলে গেলি।’’

আসলে গোটা বাড়ি কোথাও যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল সকাল সকাল। দাদা দাদি সমেত। মানসিকভাবে সবাই ব্যস্ত। বাচ্চারা তুমুল উৎসাহিত। কিন্তু রোশন কিছু জানেনা। জিজ্ঞাসাও করে না সে। শেষে তার দাদি বলে, ‘‘সবাই গেলে তো হবে না। তাই তুই বাড়িতে থাক। আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। তোর ভাগেরটা প্যাক করে নিয়ে আসব।’’

রোশন জানতে চায়, ‘‘কোথায় যাচ্ছ?’’

‘‘ভোজ খেতে।’’

‘‘কিসের ভোজ?’’

‘‘বিক্রমের বন্ধুর বিয়ে না! সেখানেই।’’

রোশন ভাবে তাই তো! পার্বতী না হয় পালিয়ে গেছে। তাই বলে বিক্রমের বন্ধুর বিয়ে তো আর আটকাবে না! কিন্তু সে বন্ধু তো অচেনা লোক। তার বিয়েতে গোটা বাড়ি নিমন্ত্রিত কেন? বিক্রম মেজো কাকির বড়দা। ছোটখাটো বাহুবলী বলা যায়। অবশ্যই রাজনৈতিক প্রশ্রয় প্রাপ্ত। মেজো কাকি তার দাদার প্রতিপত্তি নিয়ে গর্বিত। বাড়ির লোকেরা গর্বিত না হলেও প্রয়োজনে সুবিধা নিতে পিছপা নয়। সত্যি কথা বলতে কী, রোশনের নিজেরই মেওয়াট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অ্যাডমিশন হচ্ছিল না। তারপর যখন হল মেজো কাকি জানাল, সে বিক্রমকে বলেছিল। বিক্রম প্রিন্সিপালকে বলেছিল। রোশন জানে না কথাটা সত্যি কিনা! কিন্তু অ্যাডমিশনের বাধা অপ্রত্যাশিতভাবেই কেটে গেছিল।

হঠাৎ গেটের বাইরে তীব্র হর্নের শব্দ ওঠে। বেশ অধৈর্য ভঙ্গিতে। সুহানা দিদি অথবা পুলিশ এল কিনা ভেবে রোশন ছুটে যায়। বাইরে একটা সাদা রংয়ের গাড়ি দাঁড়িয়ে। তার ড্রাইভার জানলা দিয়ে মুখ বার করে জিজ্ঞেস করে, ‘‘শামপাল চৌহানকা ঘর এহি সে?’’ শামপাল রোশনের ঠাকুরদার নাম। ড্রাইভার জানায়, বিক্রম ভাই গাড়ি পাঠিয়েছে। রোশন ড্রাইভারকে চায়ের নেমন্তন্ন জানায়। কিন্তু বাড়িতে নয়। রাস্তার মোড়ে। ডুকার চায়ের দোকানে। দোকানের দিকে হাঁটতে হাঁটতে রোশন গল্প জমায়, ‘‘নাস্তা ভি কর লিজিয়ে।’’ ড্রাইভার চা নাস্তা করে। রোশন শুধু চা খায়। খেতে খেতে গল্প করে তারা। তারপর ফিরে আসে বাড়িতে। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে রোশন ভিতরে গিয়ে জানায়, ‘‘গাড়ি আ গে সে।’’ ভোজবাড়িমুখী উচ্ছ্বসিত পরিবারে নতুন উচ্ছ্বাসের ঢেউ লাগে। তাড়া পড়ে যায় যৌথ প্রাবল্যে। সেসব ব্যাজার মুখে অগ্রাহ্য করে রোশন উঠে যায় নিজের ছাদের ঘরে। কেউ তার পরোয়াই করে না। ড্রাইভারের কাছে সে জানতে পারে, সত্যিই তারা বিয়েবাড়ি যাচ্ছে আর বিয়েটা বিক্রম ভাইয়ার বন্ধুরই। তবে বিয়েবাড়িটা একটু দূরে আছে।

‘‘দূরে মানে? কত দূরে?’’

রোশন জানতে চেয়েছিল ড্রাইভারের কাছে। ড্রাইভার জানায়, আসলে বিয়েটা কোনও গ্রামে হচ্ছে না। কোন মন্দিরেও হচ্ছে না। হচ্ছে একটা খামারবাড়িতে। লোকালয় থেকে দূরে। নির্জনে। কিছুটা বলা যায়, গোপনেও।

‘‘গোপনে কেন?’’

‘‘আসলে বুড়ো লোক তো! লজ্জা পাচ্ছে বোধহয়। তাই শুধু কাছের লোকজনকেই ডেকেছে।’’

‘‘বুড়ো মানে?’!

ড্রাইভার খোলসা করে বলেছিল বিয়ের গল্প। লোকটার বড় ছেলের বয়সই উনত্রিশ। আছে আরও দুই ছেলে। সবারই বিয়ে হয়ে গেছে। বাল বাচ্চা আছে। কিন্তু লোকটার বউ মরে গেছে হঠাৎ করে। তাই আবার বিয়ে করছে। গল্পটা শুনেই রোশনের মনে পড়েছিল সোনা আর হরদেব সিংয়ের বিয়ের কথা। কী জানি এই বুড়োটারও একই মতলব কিনা! সোনার মতো কোনও অসহায় মেয়েরই কপাল পুড়তে যাচ্ছে হয়তো। তারপরেই হঠাৎ রোশনের মাথায় বিদ্যুৎ চমকের মত খেলে যায় কথাটা। পার্বতী নয় তো? ওর বাড়ির লোকই দেখাশোনা করে পার্বতীর বিয়ে দিচ্ছে না তো বুড়োটার সঙ্গে? আর বিয়েতে গোটা বাড়ি নিমন্ত্রিত। কারণ, আসলে এরাই কনেযাত্রী। কন্যাদান করতে যাচ্ছে শামপাল চৌহান। তার ঠাকুরদা। সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে তার গোটা পরিবারকে। রোশনকে ওরা বাদ দিয়েছে। কারণ, ওরা জানে এই বিয়েতে ওর মত নেই। সে ব্যাগড়া দিতেও পারে। রোশনের বুকটা কেমন হু-হু করে ওঠে। অচেনা এক ধরনের শূন্যতা যেন ঘুরপাক খেতে থাকে বুকের ভেতর। আগে কখনও এমনটা হয়নি। তার কুড়ি বছরের জীবনে এই অনুভূতি এক নতুন সংযোজন। তাই এর গভীরতা ও গুরুত্ব ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারে না রোশন। কিন্তু একথা স্পষ্ট করেই বোঝে, এই অনুভূতি আসলে ক্ষয়ের অনুভূতি। তার কর্তব্য একে আটকানো। কিন্তু পরিবারে তার অবস্থান ক্রমতালিকার নিচের দিকে। তার গুরুত্বও সীমিত। সেটুকু সম্বল করেই সে সরাসরি শামপালের কাছে গিয়ে বলে, ‘‘বিয়েতে আমিও যাব।’’

শামপাল এমন ভাবে তাকে অগ্রাহ্য করে, যেন সে একটা শিশু। উল্টে তার হাতে একশ’ টাকা দিয়ে বলে, ‘‘মিঠাই

খা লেনা।''

সত্যি বলতে কী, ঠাকুরদার সামনে দাঁড়িয়ে তার নিজেকে ছোটই মনে হয়। বাহ্যত দমেই যায় রোশন। একেবারে নাবালকের মতো দমে যায়। তারপর দাবি, ইচ্ছা, অধিকার ত্যাগ করে মায়ের কাছে গিয়ে বলে, ''আমিও যাব।''

আর মা তাকে এক্কেবারে শেষ করে দেয় শিশুর মত আদর দিয়ে। যদিও মা উল্টো কথা বলে মুখে, ''এত বড় হয়ে বাচ্চাদের মতো আবদার করিস!''

রোশন বিষণ্ণ মুখে একবার তাকিয়ে দেখে তার যৌথ পরিবারটাকে। এতজন বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যের প্রবল উপস্থিতিতে তার আর বড় হয়ে ওঠা হয় না। সে বিকল্পের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে ওঠে মনে মনে। আর তখনই তার মনে পড়ে ড্রাইভারের কথা। বাইরে এসে দেখে ড্রাইভার গাড়িতে বসে মোবাইল খোঁচাচ্ছে। শামপালের দেওয়া একশ টাকার নীল নোটটা সোজা ড্রাইভারের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, ''এক রিকোয়েস্ট সে।''

''কী রিকোয়েস্ট?''

রোশন দুঃখ পাওয়ার মতো ভাব করে বলে, সে খুব মিস করবে। কারণ, সে বিয়েতে যেতে পারছে না। বাড়ি পাহারা দিতে হবে তাকে। তাই ড্রাইভার যেন তাকে বিয়ে বাড়ির ছবি, ভিডিও পাঠায়। ড্রাইভার রাজি হয়। তারা মোবাইল নাম্বার দেওয়া-নেওয়া করে। তারপর গাড়িতে বোঝাই হয়ে রওনা দেয় রোশন বাদে তার গোটা পরিবার। রোশন হাত নাড়তে নাড়তে ভাবে, পার্বতীর কনেযাত্রী কিনা কে জানে!

বাড়ির ভেতর ফিরে এসে রোশন দেখে সে যেন একচ্ছত্র অধিপতি এই গোটা বসত বাড়িটার। পাঁচিলঘেরা এই প্রশস্ত চৌহদ্দি যেন তার সাম্রাজ্যের সীমানা যার প্রতিটা কোনায় কোনায় তার আধিপত্য। গম্ভীর মুখে পায়চারি করতে করতে রোশন ভাবে, তার আরও সাহসী হওয়া দরকার। নিজের ইচ্ছেগুলোকে এইভাবে একের পর এক নিহত হতে দেওয়া উচিত না। একটা মানুষের সব ইচ্ছে যদি একে একে খুন হয়ে যায়, তাহলে পড়ে থাকে শুধু একটা খোলস। এমনই গুরুত্বহীন তার অস্তিত্ব।

গোয়াল ঘরের উল্টো দিকেই পার্বতীর ঘর। রোশন আলতো করে বসে পার্বতীর খাটে। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করে তার ময়লা জামাকাপড়। অনুভব করে এই ময়লার ভেতর পার্বতীর অংশ আছে। হয়তো সেই কারণেই শিহরণ জাগে তার ছোঁয়ায়। বেশ কিছু ক্ষণ পরে মোবাইল বার করে সময় দেখে। ওরা রওনা দিয়েছে তিন ঘণ্টা হয়ে গেছে। কিন্তু ড্রাইভারটা কোনও ছবি পাঠায়নি। কলও করেনি। কল করার জন্য রোশন ড্রাইভারকে সিলেক্ট করে কিন্তু কল করে না। যদি এখনও সবাই গাড়িতেই থেকে থাকে! ফোন ধরেই তো গাধাটা বলবে, ''বোলিয়ে রোশন ভাই!'' তখন আর কারও জানতে বাকি থাকবে না সে ড্রাইভারকে জাসুস লাগিয়েছে তাদের পিছনে। রীতিমতো অগ্রিম বেতন দিয়ে। আরও কিছু সময় অপেক্ষা করে রোশন। প্রায় ঘণ্টাখানেক। তারপর কল করে ড্রাইভারকে।

''নট রিচেবল। আউট অফ নেটওয়ার্ক...।''

এইসব যান্ত্রিক ঘোষণা কানে বাজে। রোশনের বাকি দিন ড্রাইভারকে ফোন করে করেই কেটে যায়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। বিকেল ঢলে যায় সন্ধ্যার দিকে। সন্ধ্যা গুটিগুটি গিয়ে মিশে রাতের সার্বিকতায়। শুধু শেষ আলোর স্মৃতি টুকু ধরে রেখে আবছা হয়ে থাকে পারো দরিয়া। রোশন এসে একা একা বসেছে এই জলাধারের কিনারায়। এই ঝিলের জলেই একদিন সে দেখেছিল পার্বতীকে মৎস্যকন্যার মতো যেন নৃত্য করছে। পরে সে তার কাছেই জেনেছিল এর নাম জলবিছু। এক সময় দরিয়াটাও অদৃশ্য হয়ে যায় রাতের অন্ধকারে। অন্ধকারে মিশে যায় রোশন নিজেও। সে নিজেই আর নিজেকে দেখতে পায় না। যেন আসলে সে নেই এই বাস্তবের মাটির ওপর। আছে শুধু ভাবনায়। যেমন পার্বতী না থেকেও আছে তার ভাবনায়। তার বিশ্বাসে। ভাবতে ভাবতেই রোশন এগিয়ে যায় জলের দিকে। অন্ধকারেই। আন্দাজে পা ফেলে ফেলে। একথাও তার মনে থাকে না যে, সে সাঁতার জানে না। পায়ে জল লাগতেই সম্বিত ফেরে রোশনের। বুক পকেটে মোবাইল ছিল। সশব্দে মেসেজ ঢুকতে থাকে একটার পর একটা। শব্দ শুনে রোশন বোঝে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ। রোশন তাড়াতাড়ি মোবাইল বার করে মেসেজ দেখে। ছবি পাঠিয়েছে ড্রাইভার। সঙ্গে ছোট্ট বার্তা, ''সরি, টাওয়ার নহি থা দিন ভর।'' ছবিগুলো ডাউনলোড হতেই রোশন দেখে ঠিকই সে ভেবেছিল। বিয়ে পার্বতীরই। কনের সাজে বসে আছে মুখ ঝুলিয়ে। যেন লজ্জা পাচ্ছে। যদিও মুখে আনন্দ নেই। কিন্তু প্রতিবাদও দেখতে পায় না রোশন। প্রায় খান তিরিশেক ছবি পাঠিয়েছে ড্রাইভার। কনের বরের। বর পক্ষের আর কনে পক্ষের। উপস্থিত অতিথিবৃন্দের। এমনকি, খাবারদাবারের। রান্নাবান্নার। বিছানা বালিশের। আর পার্বতীর মেয়ের। যাকে কোলে নিয়ে তার মায়েরই বিয়ে দেখাচ্ছে মেজো কাকি। যাতে সে মায়ের দুধ খেতে চেয়ে কোনও রকম বিঘ্ন ঘটাতে না পারে। কারণ, খুশি খুশি মুখে একটা বুড়ো ভাম বসে আছে পার্বতীর পাশে। ধরে আছে পার্বতীর হাত। যেন সে বুঝে নিচ্ছে তার দাম দিয়ে কেনা সামানের অধিকার। রোশন দ্রুত ফোন লাগায় সুহানা দিদিকে। সুহানা ফোন ধরতেই রোশন কেঁদে ফেলে। কাঁদতে কাঁদতেই বলে, ''দিদি, পার্বতী কো বেচ দিয়া। বেচ দিয়া পার্বতী কো...!''

সুহানা চুপ করে শুনে যায় রোশনের বিলাপ। তারপর তাকে হতাশ করে দিয়ে বলে, ''আইনত কিচ্ছু করার নেই!''

রোশন রাগত স্বরে বলে, ''কেন কিচ্ছু করার নেই? এভাবে কি একটা মেয়েকে বেচে দেওয়া যায়?''

''বেচে দিচ্ছে প্রমাণ করতে পারবে না। বরং লোকে বলবে এক অল্পবয়সি অসহায় বিধবাকে বিয়ে করে পুণ্যের কাজ করছে।''

রোশন ফোন কেটে দিয়ে মুখ খিস্তি করে হতাশায়। পারো দরিয়ার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বিলম্বিত

বিলাপের সুরে যার শেষ দিকে কান্নার ভাঙন ধরে যায় তার অজান্তেই। তারপর চোখ মুছে উঠে আসে জল থেকে। হাত গুটিয়ে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে থাকে দরিয়ার পাড়ে। অনেক ক্ষণ। বহু ক্ষণ। তাকিয়ে থাকে দরিয়ার জলের দিকে। আর হঠাৎই খেয়াল করে দৃশ্যপটে বদল ঘটেছে। ওপারে হঠাৎ দৃশ্যমান হয়েছে বকরি পাহাড়ের মাথা। তার কাঁধের কাছে আটকে আছে পার্বতীর কাস্তের মতো সরু এক ফালি চাঁদ। আর সেই চাঁদের আলোয় ভোরের স্বপ্নের মতো দেখা যাচ্ছে আজাদপুরের নৈশ নিসর্গ। তার দুর্ভাবনা অতিক্রম করে যায় এই দৃশ্য। এরপর ঘরে ফেরার মতো মনের জোরও সে জুগিয়ে উঠতে পারে। একটুও তাড়াহুড়ো না করে, বাতাসে বিন্দুমাত্র দোলা না লাগিয়ে রোশন সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তারপর যেন বাতাসে ভর করে হাঁটা দেয় গ্রামের দিকে। সদর দরজায় তখনও তালা মারা। কেউ ফেরেনি এখনও পার্বতীর বিয়ে খেয়ে। হয়তো সর্বনাশের শেষ পেরেক এখনও পোঁতা হয়নি। সেটুকু সম্পন্ন হলে তবেই ফিরবে ওরা।

তালা খুলে রোশন ভেতরে ঢোকে। স্থির হয়ে খাটে পড়ে থাকে একভাবে। যতক্ষণ না ঘুম এসে তার অস্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় তার বাস্তবতা থেকে।

ওরা কখন ফিরেছে রোশন জানেনা। সকালে ঘুম ভেঙে দেখে সারা বাড়ি অভ্যস্ত কোলাহলে মুখর। এমনকি, নবিতা অঙ্ক নিয়ে বসে আছে তার জেগে ওঠার অপেক্ষায়। রোশন বাইরে বেরিয়ে মুখে বোতলের জলের ঝাপটা দেয়। তারপর নির্লিপ্ত স্বরে মেজো কাকিকে জিজ্ঞেস করে, ‘‘কিতনে মে বেচা ছোটি চাচি কো?’’

মেজো কাকি তার স্বভাব মতো শ্লেষাক্ত স্বরে বলে, ‘‘কিঁউ তুঝে তকলিফ সে কোই?’’

রোশন বলে, ‘‘তকলিফ আমার তো কিছু নেই। কিন্তু তোমার তো থাকা উচিত। কারণ, এ বাড়ির লোকগুলোকে তোমারও তো ভয় পাওয়া উচিত।’’

‘‘কে মতলব?’’

‘‘মতলব এরা যদি কাল তোমাকেও বেচে দেয়?’’

মেজো কাকি কাপড় মেলা থামিয়ে রোশনের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। ক্রোধে ফেটে পড়ছে তার চোখ মুখ। বেশ গলা তুলে বলে, ‘‘কী বললি?’’

রোশন একইরকম নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলে, ‘‘তোমাকে বলিনি। বললাম এ বাড়ির পুরুষগুলোকে। ওরা কি বাড়ির মেয়ে বউগুলোকে একে একে বেচে দেবে ঠিক করেছে নাকি?’’

মেজো কাকি আরও গলা চড়িয়ে বলে, ‘‘এসব কী বলছিস আবোল তাবোল? পার্বতীর শোকে কি পাগল হয়ে গেলি নাকি? ওই দুই টাকার পারোর সঙ্গে তুই বাড়ির মেয়ে বউদের তুলনা করছিস?’’

নীচ থেকে রোশনের মা বলে, ‘‘কী হল? চেঁচাচ্ছ কেন মেজো?’’

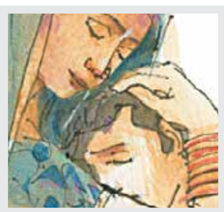
মেজো কাকি আরও উৎসাহিত হয়ে আরও জোরে চেঁচিয়ে বলে, ‘‘দেখো দেখো তোমার ছেলে কী বলছে। একে একে নাকি বাড়ির মেয়ে বউদের..।’’

হুলুস্থুল লেগে যায় বাড়িতে। কিন্তু রোশন যেন একাই একশ। কেমন ভূতে পাওয়া মানুষের মতো সে নির্লিপ্ত ভাবে দিয়ে যায় সব কথার উত্তর। যেন সে নয়, তার ভেতর থেকে অন্য কেউ কথা বলছে। রোশনকে থামানো যায় না কিছুতেই। শেষে গায়ে হাত তুলতেই হয় ওর বাবাকে। কাকাকেও। কারণ, রোশন পাল্টা হাত তোলার উপক্রম করে। যা ভাবতেও পারে না কেউ। শেষে বড় দুই ভাই মিলে কব্জা করে রোশনকে। অনেক বল প্রয়োগ করে। ঠোঁটের কোণে রক্ত ঝরিয়ে। রোশনের মাথাটা মেঝেতে ঠেসে ধরে। মানে রীতিমতো একটা পারিবারিক ধস্তাধস্তি যুদ্ধ করে থামাতে হয় রোশনকে। এই দৃশ্য দেখে সবারই আগের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু কেউ সে কথা মুখেও আনে না। শুধু রোশনের দজ্জাল দাদি কাঁদতে কাঁদতে বলে, ‘‘সোনুয়ার ভূত কি ঢুকল রোশনের ভেতর? হে ভগবান!’’

বাড়ির বাচ্চাগুলো ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে। তাদের স্মৃতি প্রখর। এখনও তাজা হয়ে আছে তাদের স্মৃতিতে সেদিনের সেই গৃহযুদ্ধ। বাড়ির বড় দুই ছেলে উঠোনে ফেলে লাঠিপেটা করছে বাড়ির ছোট ছেলেকে আর ছোট ছেলের বউকে। সেই বড় দু’জন এবার ধরেছে বাড়িরই আরও একজনকে। সেই ঘটনার শেষ পরিণতির কথা মনে আছে সবারই।

কদিন পরেই বাড়িতে একটা নতুন মোষ কেনা হয়। আসলে মোষনি। তার নাম দেওয়া হয় পার্তি। স্পষ্টতই পার্বতীকে বেচার টাকাতেই কেনা হয়েছে। যদিও পারোর দামে মোষ হয় না। মোষের দাম দ্বিগুণ তিনগুণ পড়ে। কিন্তু কোনও কোনও পারো সোনাও হয়। হয়তো পার্বতী তেমনই এক পারো। বেশ কয়েক দিন রোশন ঘর থেকে বের হয়নি। কিন্তু আজ তাকে বেরতেই হবে। কারণ, আজ পার্বতীর শুনানি আছে কোর্টে। সে আসবে। ওখানেই তাকে দেখতে পাবে চোখের দেখা হলেও। কলেজ যাওয়ার নাম করে রোশন বেরোয়। ব্যাগে মা টিফিনও দিয়ে দেয়। হাতে দুশো টাকা। গালে আদর দিয়ে বলে, ‘‘তোর ভবিষ্যৎ অনেক উজ্জ্বল। নিজের হাতে তা নষ্ট করিস না। আমাদের কথাও ভাব।’!

রোশনের কোনও ভাবান্তর হয় না। যদিও কোর্টে পৌঁছে সে আর নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। কারণ, ওখানে পার্বতীকে সে দেখতে পায়। সময়ের হিসাবে মাত্র কয়েকদিন পরেই দেখা। কিন্তু ঘটনার হিসাবে মনে হল যেন এক পূর্ণ বিবর্তিত



ড্রাইভার জানায়, আসলে বিয়েটা কোনও গ্রামে হচ্ছে না। কোন মন্দিরেও হচ্ছে না। হচ্ছে একটা খামারবাড়িতে। লোকালয় থেকে দূরে। কিছুটা বলা যায়, গোপনেও।

কালচক্রের অপর পারে তাদের দেখা হল। সময়ের ব্যবধান সেখানে যতই সংক্ষিপ্ত হোক, ভাবনায় যেন যুগাবসান হয়ে গেছে। এরপর মানুষ আর একই রকম থাকতে পারে না। ছিলও না। রোশন তো নয়ই। পার্বতীও না। তাই তারা যখন মুখোমুখি হল, মনে হল যেন দুই মুখ-চেনা মানুষের সাক্ষাৎ হল, যাদের কোনও যৌথ অতীত নেই।
কোর্টের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল পার্বতী। গোপনে রোশনের হাতে একটা ভাঁজ করা কাগজ দিয়ে বলল, ''আমি জানি। বেশি কথা বলার সময় নেই। এতে সব লেখা আছে।'!
সময় ওদের সত্যি ওখানেই শেষ হয়ে যায়। পার্বতীর নতুন বর এসে পড়ে ঘাড়ের ওপর। মেজাজ যদিও তার প্রফুল্লই। হেসেই বলে, ''কী কেমন দেখলে কাকিকে? ভাল রেখেছি তো?''
রোশন হাসে। নির্লিপ্ত। মন দিয়ে দেখে পার্বতীর বরকে। রোশনের তাকে জরিপ করা লক্ষ করে ভদ্রলোক। তারপর তার কানের কাছে মুখ এনে বলে, ''উতনে ভি বুঢ়ে নহি হ্যায় হম।''
রোশন হঠাৎ বলে বসে, ''বুঢ়ে ইয়া বুড়ে?'' কথাটা ধরতে একটু সময় নেয় লোকটা। তারপর কঠিন করে তাকায় তার দিকে। আর উচ্চারণে বেশ জোর দিয়ে বলে, ''বুঢ়ে।''
সেই খণ্ড মুহূর্তের চাহনি আর মুখের ভাবেই রোশন বুঝতে পারে লোকটা বুড়া আদমি হোক বা না হোক বুঢ়া আদমি অবশ্যই। যদিও তারপরেই অনুযোগ করে সে বিয়েতে আসেনি বলে। খাওয়া তো তার পাওনাই আছে। তাই আজ তারা একসঙ্গে হোটেলে খাবে। ইচ্ছে না থাকলেও রোশন রাজি হয় এই ভেবে যে, আরও কিছু সময় পার্বতীকে কাছ থেকে দেখতে পাবে। হয়তো একান্তে দু'টো কথা বলার মতো অবসরও মিলে যেতে পারে। কিন্তু সে সবই হবে কোর্টপর্ব মিটে যাওয়ার পর। পার্বতীর সময় বেলা দু'টো তিরিশ।
রোশন এদিক ওদিক তাকায় উইনের গাড়ির খোঁজে। সুহানা দিদি নিশ্চয়ই আসবে হয়তো। কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পায় না। যাকে দেখতে পায় তাকে দেখার ইচ্ছে তার ছিল না। রাঘব ধিংড়া। একেই খুনের চেষ্টার অভিযোগ পার্বতীর বিরুদ্ধে। যদিও এরও জেলেই থাকার কথা। কিন্তু জামিন পেয়েছে, কী জানি কী করে! হয়তো পারুল অভিযোগ তুলে নিয়েছে, কোনও সওদার বিনিময়ে। অথবা চাপের কাছে নতি স্বীকার করে। কিন্তু রোশন অবাক হয় দেখে যে রাঘব ধিংড়া সোজা চলে আসে তাদের কাছে। হাসিমুখে। প্রফুল্ল মেজাজে। যেন তারা একই পক্ষ। ধিংড়ার কাঁধে তখনও ব্যান্ডেজ। আলগা করে ঢেকে রেখেছে সাদা একটা সিল্কের গামছা দিয়ে। তাকে দেখে সমান উৎফুল্ল পার্বতীর বরও। সেও দুই বাহু প্রসারিত করে এগিয়ে যায় ধিংড়ার দিকে। ধিংড়া তাকে আন্তরিকভাবে আলিঙ্গন করে বলে, ''ক্যাসে হো মজিদ ভাই!'' রোশনের দিকে ফিরে বলে, ''তু ভি আ গয়ো ছোরা?'' তারপর পার্বতীর দিকে ফিরে হাতজোড় করে, কিন্তু প্রখর দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, ''নমস্তে ভাবিজি। আজ সে দুশমনি খতম।'' মুখে বলে, কিন্তু একবার গামছা সরিয়ে কাঁধের ব্যান্ডেজটা পার্বতীকে দেখায়। হেসে বলে, ''জখম অভি ভরা নহি।''
রোশন খানিক বিভ্রান্তই হয়। কিন্তু তা কাটতেও সময় লাগে না। পার্বতী বনাম ধিংড়ার কেসটা তারপরেই কোর্টে ওঠে। আর তখনই রোশন জানতে পারে ধিংড়া তার সব অভিযোগ তুলে নিয়েছে। সে বলেছে আখ ক্ষেতে ওই রকম কিছু ঘটেইনি। রোশন আরও জানতে পারে পারুলও নাকি ওই কথাই বলেছে। তাই পার্বতী বেকসুর খালাস। খালাস ধিংড়া নিজেও। মানে সব দুশমনি খতম।
এর মানে কি দোস্তি শুরু? রোশনের ভীষণ অশুভ মনে হয় সংযোগটা। আসলে যেন এক ধরনের জোট হচ্ছে। গঠবন্ধন। রাঘব ধিংড়া আর মজিদ খানের মধ্যে। প্রতিপক্ষ পার্বতী। কী জানি হয়তো রোশনকেও ওরা রেখেছে পার্বতীর দলে। আসলে সবাই সবই জানে। গড়াপেটা চালাচ্ছে হয়তো ভেতরে ভেতরে।
এরপর আর খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না রোশনের। কিন্তু মজিদ আর ধিংড়া দু'জনে প্রায় চেপে ধরে তাকে দু'দিক থেকে। এক রকম টানতে টানতে নিয়ে যায় হোটেলে। যেন তাকে শেষ খাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছে। দু'জনেরই সাঙ্গপাঙ্গ ছিল সঙ্গে। সব মিলে প্রায় জনা বিশেক লোক। খেতে বসেছে একসঙ্গে। যা খাবে। যত খাবে। যদিও অরুচিতে গা গুলিয়ে আসে রোশনের। ভালর মধ্যে পার্বতীর সঙ্গে একান্তে কথা বলার সুযোগ হয়। খানিক পরিচয়ও পাওয়া যায় মজিদ খানের। আভাস পাওয়া যায় রাঘব ধিংড়ার মতলবের। হোটেলের ভেতর মহলে পানশালা। একে একে সেখানেই চলে যায় রাঘব, মজিদ, দুই বাহুবলী আর তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা। একসময় দেখা যায়, শুধু পার্বতী আর রোশন বসে আছে টেবিলে। সাহস করে পার্বতীর হাত ধরে রোশন। বাধা দেয় না পার্বতীও। অনেকক্ষণ চুপচাপ পাশাপাশি বসে থাকে দু'জনে হাতে হাত ধরে। ধীরে ধীরে রোশন চাপ দেয় পার্বতীর হাতে। চাপ বাড়ায় ধাপে ধাপে। বাড়াতেই থাকে যতক্ষণ না পার্বতীর চোখ উপচে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা। রোশন ব্যস্ত হয়ে বলে, ''কাঁদছো কেন? সত্যিটা আমায় বলো পার্বতী। কী হয়েছে?''
পার্বতী চোখ মোছে। শিশুদের মতো নাক টানে। তারপর বলে, ''চিঠিতে লিখেছি, পড়ে নিও।''
''এখন তো ওরা ভেতরে মদ খাচ্ছে। খাবে অনেকক্ষণ। সময় আছে।''
পার্বতী স্থির হয়ে থাকে বেশ কিছু ক্ষণ। নীরবে হাতের মুঠো শক্ত করে। যেন ভেতরের কোনও দুর্ভাবনার সঙ্গে যুদ্ধ করছে। তারপর হঠাৎই রোশনের হাতটা আঁকড়ে ধরে বলে, ''আমার খুব ভয় করছে রোশন। ভীষণ ভয় করছে। ধিংড়া আমাকে ছাড়বে না। ওর দু'চোখে কেমন প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে দেখেছ। কেস তুলে নিল শুধু ওই জন্য। আমাকে নিজের হাতে শাস্তি দিতে চায়।''
রোশন বলে, ''কিন্তু মজিদ খান তো তোমার বর। ওরা বন্ধু। তোমাকে ভাবী বলছে। ও কি তোমার ক্ষতি করবে?''

আপাতভাবে এমনটাই ধারণা হওয়ার কথা। পার্বতীও মানে সে কথা। লোকের সামনে মজিদ খান ভীষণ ভাল ব্যবহার করে। যেন সে ধন্য হয়ে গেছে পার্বতীর মত বউ পেয়ে। কিন্তু সবটাই নাটক। মদ খেলে ও পাগল হয়ে যায়। আর মদ সে রোজই খায়। পার্বতীকেও জোর করে খাওয়ায়। তারপর বেডরুমের দরজা বন্ধ করে অত্যাচার শুরু করে তার ওপর।
রোশন বিভ্রান্ত হয়ে বলে, ''অত্যাচার!''
পার্বতী কাঁদতে কাঁদতে বলে, ''ভীষণ। ভীষণ অত্যাচার করে। জানোয়ারের মতো।'' একটা উৎকট নীরবতা ঘিরে ধরে দু'জনকে। হোটেলের ওয়েটার টেবল সাফ করতে আসে। পার্বতী বসে থাকে মুখ নিচু করে। একে অপরের শ্বাস ফেলার শব্দ ছাড়া আর কিছুই তারা শুনতে পায় না। ওয়েটার চলে যাওয়ার পরও বেশ কিছু ক্ষণ জমাট বেঁধে থাকে তাদের নীরবতা। তারপর রোশন ভীষণ মৃদুস্বরে বলে, ''কিন্তু বিয়ে করলে স্বামী তো ওটুকু করবেই। তাই না?''
পার্বতী চোখ মুছতে মুছতে বলে, ''এটা সেরকম না। ওই সময় ও উন্মত্তের মতো হয়ে যায়। আজেবাজে কাজ করতে বলে। আপত্তি করলেই মারে। চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকায়। দেওয়ালে মাথা ঠুকে দেয়। বুকে পেটে কিল চড় ঘুঁষি মারে। আর কাজ হয়ে গেলে লাথি মেরে খাট থেকে ফেলে দেয়। মুখ খিস্তির কথা তো ছেড়েই দিলাম। রাতগুলো আমার কাছে আতঙ্ক হয়ে গেছে।''
শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে রোশনও। দাঁত চেপে বলে, ''শালা পারভার্ট।''
ওরা আরও অনেক ক্ষণ কথা বলে। কারণ, ভেতর থেকে বেরতে সময় নেয় ধিংড়া আর মজিদের দল। যখন বেরয় দেখা যায় মজিদ আর আগের মতো সেই ভাল মানুষ নেই। চোখ দু'টো লাল হয়ে উঠেছে। মুখটাও। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। সামনে এসে দাঁড়ায় রোশন আর পার্বতীর। ভীষণ নোংরা চোখে দুজনকে জরিপ করে বলে, ''মাহ্রে বিবিকে সাথ তু ক্যা কররিয়া সে?''
ভাবখানা এমন যেন এক্ষুণি মারবে। উঠে দাঁড়ায় রোশন। মজিদের দিকে কঠোরভাবে তাকায়। যেন সে প্রস্তুত আছে তার চুনৌতি গ্রহণ করতে।
আর কোনও কথা কেউ না বললেও পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে সবার কাছে। তাই হয়তো মজিদের দুই স্যাঙ্গাত এগিয়ে আসে। মজিদকে দু'দিক থেকে ধরে বলে, ''দওয়া কা টাইম হো গয়া তাওজি। গাড়ি মে চলিয়ে।'' মজিদ আরও কিছু ক্ষণ একভাবে চেয়ে থাকে তার দিকে। কোথাও কোনও নমনীয়তা দেখা যায় না রোশনের চোখে। সেই অবস্থায় হিসাব অসমাপ্ত রেখে বেরিয়ে যায় মজিদ। মাতব্বর গোছের আর একজন এসে পার্বতীকে বেরোতে ইশারা করে। সে রোশনের দিকে একবার চোখ তুলে চায়। তারপর চোখের ভাষাতেই কিছু বলে সেও বেরিয়ে যায়। রোশনের বুঝতে অসুবিধা হয় না পার্বতী কি বলে গেল। হোটেল থেকে সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর রোশন বাইরে আসে। এসে দেখে গাড়ির কাছে মজিদ আর ধিংড়ার বিদায় পর্ব তখনও চলছে। গাড়িতে তখন পার্বতী একা। কাচের ভেতর দিয়ে সে সবই দেখে। দেখে মজিদের তার দিকে ফিরে তাকানো। তারপর ধিংড়াকে মাথা নেড়ে সম্মতি জানানো। পার্বতীর বুকটা ধড়াস করে ওঠে আশঙ্কায়। যে ভয়টা সে পাচ্ছিল, হয়তো তারই রূপায়ণের চুক্তিতে যৌথ স্বাক্ষর করছে মজিদ খান আর রাঘব ধিংড়া। পুরো রাস্তা আর একটাও কথা বলে না কেউ। না মজিদ খান না পার্বতী। তাদের ড্রাইভারও থাকে মুখে তালা দিয়ে। বাকিরা অন্য গাড়িতে। পার্বতীর হঠাৎ ভীষণ ইচ্ছে করে ওই কোলাহলের মধ্যে গিয়ে পড়তে। এই বিকট নীরবতার যন্ত্রণা থেকে পালিয়ে বাঁচতে। থেকে থেকে মজিদের শ্বাস নেওয়ার শব্দ কানে আসছে। সে বসেছে সামনের সিটে। সিটটাকে পিছনে হেলিয়ে দিয়ে প্রায় আধশোওয়া হয়ে আছে। পিছন সিটে পার্বতী একা। মজিদের বিরাট শক্ত মাথাটা পার্বতীর একদম হাতের কাছে। তার গলাটা টান হয়ে আছে। উঁচু হয়ে আছে তার টুঁটির তেকোণা হাড়। হাতে একটা ক্ষুর থাকলে পার্বতী এখন সহজেই শেষ করে দিতে পারত মজিদকে। কারণ, এখন সে ঘুমোচ্ছে। তার সমস্ত পাশবিক হিংস্রতা নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে। হয়তো এভাবেই সে তার হারানো শক্তি পুনরায় সন্নিবিষ্ট করছে। বলা যায় নিজের নৃশংসতা রিচার্জ করে নিচ্ছে। কারণ, বাড়ি ফিরেই তাকে সেই শক্তির পূর্ণ প্রয়োগ করতে হবে পার্বতীর ওপর। যেমন সে রোজ করে। বলাই বাহুল্য, আজ বিশেষ দিন। বিশেষভাবেই সে আজ প্রয়োগ করবে তার শক্তি। চিতা বাঘের মতো সে রাতভর খেলবে এক অসহায় হরিণ ছানাকে নিয়ে।
অসাড় পড়ে থেকে থেকে নিজের হারানো প্রাণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে পার্বতী। বলা যায়, নিজের চলাফেরার শক্তি পুনরুজ্জীবিত করে নেয় সে। সময় লাগে। কিন্তু কাজ হয়। পরীক্ষা করে নেয় নিজেদের, ভেঙে কেটে গেছে কিনা। আর অবাক হয়ে দেখে রোজকার মতো আজও গোটা গোটাই আছে। শুধু ওপর ওপর কিছু আঁচড়ের দাগ। ছোটখাটো কিছু কাটা ফাটা। সে সব থেকেই বেরিয়েছে কিছু রস কিছু রক্ত। যার অফুরন্ত ভাণ্ডার মজুত আছে পার্বতীর এই নবীন দেহে। মজিদ খান চিৎপাত হয়ে ঘুমোচ্ছে খাটের ওপর। তার শরীরে কোনও পোশাক নেই। পার্বতীর মতো কোথাও কোনও কাটা ছেঁড়াও নেই। শুধু তার পৌরুষের ধ্বজা পরাস্ত ভঙ্গিতে লটকে পড়ে আছে একদিকে। দেখে বিশ্বাস হয় না, ওটাই আসলে এই নৃশংসতার উৎস মুখ।
মজিদ খানের গলা একই রকম টানটান হয়ে আছে। উঁচু হয়ে আছে তার টুঁটির হাড়। রোজকার মতো আজও পার্বতীর ইচ্ছে করে একটা ক্ষুর চালিয়ে দিতে। চিরকালের মতো দূর করে দিতে রোজকার এই দুঃস্বপ্নের রাত।
ধীর পায়ে সে এগিয়ে যায় খাটের দিকে। এলইডি বাল্বের সাদা আলো এসে পড়েছে মজিদের ওপর। তাকে একটা মৃতদেহ মনে হয় পার্বতীর। হয়তো সেভাবেই সে দেখতে চায় তার বরকে। মৃতদেহ। যার ডেথ সার্টিফিকেট হাতে

পেলে সে বাঁধিয়ে রাখবে সোনালি ফ্রেম দিয়ে। যেমন লোকে বাঁধিয়ে রাখে নিজের কৃতিত্বের শংসাপত্র। গর্ব করে। তার জন্য সকলের আগে মরতে হবে মজিদ খানকে। সে তো নিজে থেকে মরবে না। তাই মারতে হবে তাকে। মারতে হবে তার গলার নলিটা দু'ফালা করে দিয়ে।
আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল পার্বতী। ক্ষুর জোগাড় করতে না পারলেও পেয়েছিল একটা সবজি কাটার ছুরি। সেটাই গোপনে শান দিয়েছিল বেশ কয়েকদিন ধরে। তারপর লুকিয়ে রেখেছিল গদির তলায়। পায়ের দিকের এক কোণে। এখন সেই কোণটার উপর পা দিয়ে ঘুমোচ্ছে মজিদ। পার্বতী তার পা-সুদ্ধু গদিটা তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। গদির তলায় ঠেলে হাত ঢুকিয়ে ছুরি খোঁজে। পায় না। শেষে আর উপায়ন্তর না দেখে মজিদের পা-টা তুলে সরাতে যায়। আর তখনই ঘুম ভেঙে যায় মজিদের। সে চোখ মেলে তাকায়। ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে উঠে বসে। হুঙ্কার দিয়ে বলে, ''তু অভি তক ইধার হি সে! চল ভাগ।'' বলেই কষে এক লাথি মারে পার্বতীর বুকে। পার্বতী আবার ছিটকে পরে মেঝের উপর। মজিদ খান খাট থেকে নেমে আসে। পার্বতীর চুলের মুঠি ধরে তাকে টেনে দাঁড় করায়। তারপর টানতে টানতে নিয়ে যায় দরজার দিকে। দরজা খুলে এক ধাক্কায় তাকে বাইরে বার করে দেয়। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায়। পার্বতী কেঁদে বলে, ''মেরে কপড়ে..!'' তার কাপড়চোপড় মেঝেতেই পড়েছিল। মজিদ লাথি মেরে সেগুলো বাইরে বার করে দেয়। তারপর দরজা বন্ধ করে দেয় সশব্দে। পরোয়াও করে না নিচের তলা থেকে তার ছেলেরা বা অন্য কেউ শব্দ পেল কিনা। সে জানে কেউ কিছু মনে করবে না। কারণ, সে মদ খেয়ে আছে। আর মদ খেয়ে নিলে সে অন্য মানুষ। মজিদের বেডরুম ছাড়াও আছে সিঁড়ির ঘর। বাকিটা পুরো খোলা ছাদে। সিঁড়ির দরজা বন্ধ। তাই চাইলেও কেউ ছাদে আসতে পারবে না। সিঁড়ির ঘরে পাতা আছে পার্বতীর বিছানা। সেই বিছানায় শুয়ে অকাতরে একা একা ঘুমোচ্ছে পার্বতীর মেয়ে। পার্বতী ঐ অবস্থায় ছাদের মাঝ বরাবর দাঁড়ায়। একদিকে মজিদ খান তার নতুন মরদ। অন্য দিকে তার মেয়ে সোনুয়ার বেটি। আর সিঁড়ির দরজায় তালা। যার চাবি মজিদের কাছে। খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে নিজেকে কয়েদি মনে হয় পার্বতীর। একদিকে তার মেয়ে কয়েদ করে রেখেছে তার প্রাণটাকে। অন্যদিকে মজিদ খান আটকে রেখেছে তার শরীরটাকে। তুলনায় সিঁড়ির তালা দেওয়া দরজাটাকে তেমন বড় বাধা মনে হয় না। মুক্তির পথ তো খোলাই আছে ছাদের পাঁচিলে। পাঁচিল টপকে ঝাঁপিয়ে পড়লেই হল নিচে। যদি মেয়েকে ছেড়ে একা যেতে না পারে মুক্তির পথে, তাকে সঙ্গে নিলেও হয়। কী-ই বা হবে এই সমাজে বড় হয়ে? এত যন্ত্রণা এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও একসময় ঘুমিয়ে পড়ে সে। জুড়িয়ে যায় তার সব জ্বালা। দেওয়ালে টিকটিকি ডেকে যায় জ্যান্ত ঘড়ির মতো। যেন সে সব হিসাব রাখছে সময়ের। সব্বার সময়ের। বাইরে ছাদের ওপর চলাফেরার শব্দ। যেন অলৌকিক হালকা পায়ের জীবেরা চাঁদের আলোয় নৃত্য করছে। সেই দেখে ডানা ঝাপটে উড়ে যাচ্ছে বিরক্ত পেঁচা। ওরা আলো ছায়ার কল্পলোক তৈরি করে চলে পার্বতীর ঘরের বাইরে। জগতের সব সান্ত্বনা খুঁজে এনে জড়ো করে তার দোরগোড়ায়। যাতে সে শান্তিতে ঘুমোতে পারে অন্তত। যতই হোক সে তো আসলে ব্রহ্মপুত্রের মেয়ে। কী করে এত সহজে সে মুক্তি নিয়ে চলে যাবে মজিদ খান রাঘব ধিংড়া আর তার মেয়েকে একই পৃথিবীর ভিতর ছেড়ে রেখে?
অসম ছাড়ার পর আর মাছ-মাংস খায়নি পার্বতী। সোনুয়ারা ছিল শুদ্ধ শাকাহারী। মজিদ খানের পরিবার মাংসাশী। একটু বেশি রকমের মাংসাশী। এসে থেকে এক দিনও এমন যায়নি যে বাড়িতে মাংস হয়নি। এর মধ্যেই অরুচি ধরে গেছে পার্বতীর। তাই খেতে বসে সে শুধু ডাল, রুটি বেড়ে নিল নিজের জন্য। বাকি তিন জনকে, সম্পর্কে যারা তার সৎ পুত্রবধূ, বেড়ে দিল মাংস, রুটি, আচার, ডাল। দেখে ছোট বৌমা বলে, ''আপ গোস্ত নহি লেঙ্গে, অম্মি?''
এটাও একটা নতুন অভিজ্ঞতা। পার্বতী এখন সবার অম্মি হয়েছে। তিন ছেলের তিন-তিন জন বউ, সবাই তাকে অম্মি ডাকে। প্রথম দিকে বিকট লাগলেও এখন সয়ে গেছে। এমনকি ভাল লাগতে শুরু করেছে। বিশেষ করে ছোট বৌমা যখন ডাকে। কারণ, একমাত্র সে-ই বয়সে তার চেয়ে ছোট। হয়তো সেই জন্যই তার ডাকের মধ্যে একটা সততার আভাস পায় পার্বতী। অন্তত অবাস্তব মনে হয় না তার অম্মি ডাক। সব মিলিয়ে মিষ্টি মেয়েটা। নাম সবিনা। তার বিয়ের আগেই আগেই হয়েছে সবিনার বিয়ে। তবে সে পারো নয়। মেওয়াটের ভূমিকন্যা। পার্বতী হেসে বলে, ''এ ক'দিনে সারা বছরের গোস্ত খেয়ে নিয়েছি। আবার এক বছর পর খাব।'' তার হাসিতে কোনও যন্ত্রণা নেই। এমনই কাটে পার্বতীর দিনগুলো। দেখে মনেই হয় না এমন দিন গিয়ে শেষ হতে পারে ওই রকম রাতে। কিন্তু বাস্তবে তাই হয়। প্রতিটা দিনের শেষে যেন ওঁৎ পেতে বসে থাকে বিভীষিকা। কিন্তু তারও পরে থাকে তার মেয়ের ঘুমিয়ে পড়া মুখ। জীবনের সমস্ত যন্ত্রণার অবসান। তার দোরগোড়ায় জড়ো হয়ে থাকে চাঁদের আলো, জগতের সব সান্ত্বনার ডালি নিয়ে। তার খোলা দরজার বাইরে নৃত্য করে আলো আঁধারির অলৌকিক সহেলিরা। নাচে নাচে তারা বার্তা দেয় তাকে। একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে জাদুবলে। সব ঠিক হয়ে যাবে একদিন। শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে সেই জাদুর পথ চেয়ে। পার্বতী এটাকেই কৌশল করেছে। এই কৌশলেই সে রোজ রাতে পেরিয়ে যায় বিভীষিকার নির্যাতন কক্ষ। সারা দিনের আলো দিয়ে সে ভোঁতা করে দেয় মজিদ খানের দাঁত নখ। কখনও সবিনার অন্তরের অম্মি ডাক। কখনও মেজ বউমার মুক্তো ছড়ানো হাসি। কখনও বড়টার বেয়াড়া রসিকতার উদ্ভট আদর। আসলে বড় বৌমা একটু

বখাটে স্বভাবের। বয়সে পার্বতীর চেয়ে বছর চারেকের বড়। পার্বতীকে জড়িয়ে ধরে দুধের শিশুর মতো নাটক করে বলে, ''অম্মি ভুক লাগে সে। দুধ খাব, দুধ দাও।'' আর বাকি দু'টো তখন হেসে কুটোপাটি। এত তারা হাসে যে, উদ্বৃত্ত হাসি রাশি রাশি এসে পড়ে পার্বতীর ওপর। তারই রক্ষাকবচের মতো তারা রয়ে যায় নির্যাতন কক্ষ পর্যন্ত। কখনও বা সেসব কম পড়ে গেলে আছে তার চার নাতি আর দুই নাতনি। বড় আর মেজোর ছেলে মেয়ে। সবাই এরা দাদি বলে ডাকে পার্বতীকে। যেন তার দাদি হওয়ার বয়স হয়েছে! আর দৌড়ে এসে এমন ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কোলে পিঠে, যেন তাকে পেড়ে ফেলবে। নির্যাতন কক্ষে পার্বতীর হয়ে দুর্ধর্ষ লড়াই চালায় তার আধ ডজন নাতি নাতনি। লড়াইয়ের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা তার সঙ্গ ছাড়ে না। ততক্ষণে প্রতিপক্ষ নিস্তেজ হয়ে আসে। যদি বা নাও হয়, তবু পার্বতী অসহায় বোধ করে না। কারণ তার পরেও সে জানে তার পথ চেয়ে বসে আছে তার মেয়ের ঘুমিয়ে পড়া মুখ। তার একলা ঘরের দোরগোড়ায় চাঁদের আলোর অনন্ত উপশম। আর খোলা ছাদের আলো আঁধারির ভেতর অব্যর্থ জাদু। পার্বতী ভেবে দেখল, মজিদ খানের অত্যাচারটুকু সইয়ে নিতে পারলে বাকিটা ভালই। সত্যি কথা বলতে, সোনুয়ার পরিবারের নিজস্ব অংশ সে কখনওই ছিল না। সোনুয়া মরদ হিসেবে তাকে ভালবাসত। দিনের শেষে স্বামী স্ত্রী দরজা বন্ধ করে চার দেওয়ালের মধ্যে ভালবাসার একটা নিজস্ব জগৎ নির্মাণ করতে পারত। আর সেই জগতের আবেশে রাতভর বিভোর হয়ে থাকতে পারত। এখানে ছবিটা উল্টে গেছে। রাতের একাংশ বিভীষিকাময়। কিন্তু দিনগুলো ভালবাসায় ভরা। যদিও বৌমাদের মতো ছেলেরা তাকে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। তারা কেউ তাকে অম্মি বলে ডাকে না। আসলে তারা কেউ কথাই বলে না পার্বতীর সঙ্গে। এতে পার্বতীর সামান্য মনোকষ্ট ছাড়া আর কোনও সমস্যা নেই। কারণ, এক তো তারা সারাদিন বাড়িতে থাকে না। ব্যবসার কাজ সেরে ফিরতেও রাত হয়ে যায়। আর নিজেরা কথা না বললেও বউ ছেলে মেয়েকে নিষেধ করে না। তাই সবদিক ভেবে পার্বতী দেখল, মজিদ খানের নিপীড়নটুকু সইয়ে নিতে পারলে সে এখানে ভালই থাকবে।

তাছাড়া যাকে সে নিপীড়ন বলছে, আসলে সে তো স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কই। যন্ত্রণা তাকে সোনুয়াও দিত। ওর মেজদাও দিত। কিন্তু যন্ত্রণার কথা বললে তার দিকটা বিবেচনা করত। আর মজিদ খান আসলে তার যন্ত্রণাটাকেই উপভোগ করে। তাদের সম্পর্কটা পারস্পরিক উপভোগের নয়। যেমনটা ছিল সোনুয়ার সঙ্গে। সম্পর্কটা পীড়ক আর পীড়িতের। এ সম্পর্ক সইয়ে নেওয়া মানে নিজের পীড়নকে মেনে নেওয়া। পীড়নের মধ্যেই সুখের উপাদান খুঁজে বার করা। হয়তো সেটা সম্ভবও। উপায়ান্তর না দেখে পার্বতী সে চেষ্টাই করতে শুরু করেছে। আর অবাক হয়ে লক্ষ্য করছে মজিদ খানের পীড়নের সেই তীব্রতা আর নেই। ভোঁতা হতে হতে প্রায় প্রশমিত হয়ে আসছে। কখনও বা উপভোগ্য লাগছে পার্বতীর কাছে। আর সেটা দেখে সে নিজেই খুশি হয়ে পড়ছে নিজের ওপর। এমনই এক ভাল রাত ভোর হলে পার্বতী বাইরে এসে দেখে কী অপূর্ব লাগছে দিনের শুরুটা। ছাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে মনে হয় যেন ব্রহ্মপুত্রের উঁচু বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। নদীর দিকে পিঠ করে। চোখের সামনে সবুজ হয়ে উঠছে পৃথিবী। যেন ব্রহ্মপুত্রের আশীর্বাদে। এমন দিনে একজন ব্রহ্মপুত্রের মেয়ের আর কী-ই বা মনে হতে পারে! তাই ছাদের কিনারায় দাঁড়িয়েই গুনগুন করে পার্বতী, বিহু বিহু লাগিছে মোর গাত। অসম ছাড়ার পর এত আনন্দ পার্বতী আর করেনি। বাড়ির ছেলেরা রোজকার মতো বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে পার্বতী প্রস্তাব দেয় বাকিদের। বলে বিহুর গল্প। আর বলে, ''আজ দিনভর বিহু।''

হবে হয়তো, বাতাস ছিল পূবালী সেদিন। গোটা দেশ পার করে ব্রহ্মপুত্রের বাতাস এসে মিশেছিল পারো দরিয়ার জলে। আজাদপুর তো বেশি দূর নয় এই অলবেলিয়া থেকে। অন্তত বাতাসের কাছে তো নয়ই। তাই হয়তো পারো দরিয়ার সে বাতাস এসে পড়েছে অলবেলিয়ার ছাদে। সঙ্গে করে এনেছে পার্বতীর বাপের বাড়ির গ্রাম বুলবুলপুর থেকে ব্রহ্মপুত্রের নির্যাস। তাই হয়তো পার্বতীর সকাল সকাল বিহু-বিহু লাগে গায়ে মনে। আর তারই উদযাপনে সে জড়িয়ে ফেলে তার গোটা পরিবারকে। তার একান্ত আপন নিজস্ব পরিবারকে। প্রস্তুতি পর্বে বিহু নাচের ভিডিও দেখায় পার্বতী। সবিনার স্মার্টফোন আছে। সেই ফোন হাতে নিয়েই পার্বতীর মনে পড়ে রোশনের কথা। মনে পড়ে যায় তার নম্বরটাও। ইচ্ছে করে একবার ফোন করে কথা বলতে। কিন্তু সবার সামনে বলতে পারেনা। ওদিকের কোনও খবর পায়নি বহুদিন। প্রায় তিন মাস।

''অরে সোচ ক্যা রহি হো? দিখাও বিহু।'' বড় বৌমার ধমকে বিহুতে ফেরে পার্বতী। আজ তার মা দেখলে কত খুশি হতো। সে বিহু শেখাচ্ছে মেয়েদের! চার যুবতি আর ছয় বাচ্চার বিহু দল তৈরি হয় বাড়িতেই। তারপর মোবাইলে বিহু গান চালিয়ে নাচ শুরু হয়। নাচতে নাচতে পার্বতী বলে, ''ভোগালী বিহু বলে একে।''

যদিও সে জানে না বিহু কবে। মাঘ মাস কবে তার কাছে হিসাবও নেই। কিন্তু তার মনে আছে ভোগালী বিহু মানেই পিঠা আর লাডু খাওয়ার উৎসব। কতদিন পিঠা খায়নি পার্বতী। লাডুও না। তাই সে সবার জন্য পিঠা বানায়। চাল গুঁড়া বানায় সাবিনা, মিক্সিতে। গুড় ছেনে জলে গোলে মেজো বৌমা। বড় সব গুলে বানায় পিঠার গাঢ় ঘোল। আর সেই ঘোলের ছোট ছোট ফুলকো পিঠে ছাঁকা তেলে ভেজে তোলে পার্বতী। প্লেট ভর্তি পিঠা সাজিয়ে সে বলে, ''ইসে কেহতে হ্যায় বর পিঠা।''

পার্বতী নিজেই অবাক নিজের পিঠা দেখে। মাকে যেমন করতে দেখেছিল তেমনই শুধু করে গেছে। তাতেই তৈরি হয়েছে বর পিঠা। কিন্তু তিলের লাডু দেখে তো ওর বৌমা গুলো হেসেই বাঁচে

না। সাবিনা বলে, ''ইয়ে তো লোমড়ি কা গু কা লড্ডু হ্যায়। কেসে খায়ে!'' কালো তিলের লাড়ু তো কালোই হবে। খেতে তো ভালই হয়েছে। পার্বতী বলে, ''চুনা লগাকর খা।''
খেয়ে যদিও খুশি সবাই। প্রত্যেকেই নিজের মরদের জন্যও বাঁচিয়ে রাখে। পিঠা এবং লাড়ু। সবিনা বলে, ''অম্মি আপ ভি রখলো পাপাজিকে লিয়ে।'' পার্বতীর মন থেকে ইচ্ছে করে না। আসলে ভয় করে। তবু সে রাখে ক'টা আলাদা করে, মজিদ খানের জন্য। হয়তো এভাবেই একদিন সয়ে যাবে সবকিছু। রাতে পিঠা আর লাড়ু নিয়ে পার্বতী গেছিল মজিদের কাছে। যে কোনও রকমের প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে। তাকে অবাক করে মজিদ খান পিঠা খায়। লাড়ুও খায়। আর বলে, ''বহুত অচ্ছা!''
পার্বতী আরও অবাক হয় যখন মজিদ খান বলে, ''জলদি সো যা। সুবহ যানা হ্যায়।''
পার্বতী অবাক হয়ে বলেছিল, ''যানা হ্যায়? কিধর?''
''এক বন্ধুর বাড়ি অনুষ্ঠান আছে। কাজে কম্মে একটু হাত বটাতে হবে। যা ঘুমিয়ে নে। সকাল হলেই ওরা গাড়ি পাঠাবে।'' পার্বতী প্রতিবাদ করতে চায়। কিন্তু কোনও কথা জুগিয়ে উঠতে পারে না। শুধু বলে, ''কিন্তু...।'' আর তাতেই ক্রোধে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে মজিদ খান। পার্বতী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। ফিরে আসে নিজের ঘরে। নিজের মেয়ের কাছে। মেয়ে তখন একা একা চামচের ব্যবহার শিখছে। একটা বাটিতে একটু চটকানো পিঠা। হাতে স্টিলের চামচ। সারাদিন অকাল বিহু উদযাপন করে ভীষণ খুশি ছিল পার্বতী। অসম ছাড়ার পর এত আনন্দ আর সে করেনি। যদি মাকে দেখাতে পারত! এমন দিনের শেষে যে এই দুঃসংবাদ অপেক্ষা করে থাকবে কল্পনাও করেনি পার্বতী। সে জানে এর ফল ভাল হবে না। বন্ধুর বাড়ি অনুষ্ঠান...। এ কথাই বলেছিল রোশনের বাড়ির লোকেও। সেই অনুষ্ঠান স্থায়ী হয়ে গেছে তার জীবনে। এটা ভাগ্যের কথা যে, যা হয়েছে ভালই হয়েছে এখনও পর্যন্ত। পার্বতী ভাবতে শুরু করেছিল বাকি জীবন এমন করে কেটে গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু মজিদ খানের কথায় সে বুঝেছে, তা হবার নয়।
অভ্যাস মতো ভোরবেলা ওঠে পার্বতী। একই বাতাস গতকাল কত আনন্দ বয়ে এনেছিল। আজ যেন আতঙ্কের রোঁয়া তার ছোঁয়ায়। পার্বতীর ভেতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। আজ সে আবার..। যেন সে গৃহপালিত পশু একটা। প্রয়োজনে যাকে রাখা, আবার প্রয়োজনে বেচে দেওয়া। যদিও সহজে মেনে নেয় না পার্বতী। কারণ মজিদ খান মেয়েকে রেখে যেতে বলে। পার্বতী মেয়েকে ছাড়তে চায় না। সে ফুঁসে ওঠে প্রতিবাদে। চিৎকার করে হুমকি দেয় মজিদ খানকে। এদিক ওদিক অস্ত্র খোঁজে। হয়তো কাস্তেই খোঁজে। সামনে দেখে রাঘব ধিংড়াকে। যেন সে মজিদ খান সেজে আবার এসেছে তার মুখোমুখি। হয়তো জখম এখনও ভরেনি। বাকি আছে হিসাব। শেষ পর্যন্ত পার্বতী হেরেই যায় যদিও। কারণ, মজিদ খান প্রস্তুত ছিল। তাকে মেয়ে ছাড়াই গাড়িতে তোলে মজিদ খান। তাকে সাহায্য করে নিতে আসা গাড়ির তিনজন। মাঝখানে তাকে ঠেসে বসায়, দু'দিক থেকে ধরে থাকে দু'জন। গাড়ির কালো কাচ তুলে দিয়ে রওনা দেয় ড্রাইভার। পার্বতীর মেয়েটা তারস্বরে চিৎকার করে মায়ের জন্য। তাকে কোলে তুলে নেয় সবিনা। আদর দিয়ে বলে, ''বিহু বিহু লাগিসে মোর গাত...।''
অনেক হাত পা ছুঁড়েছিল পার্বতী। কিন্তু দু পাশের দুই গুণ্ডা তাকে বিড়াল ছানার মতো টিপে ধরেছিল দু'পাশ থেকে। পরোয়া করেনি সে একটা মেয়ে। ভেঙে যেতে পারে তার হাত পা। কী মরেই যেতে পারে দম আটকে। এক রকম প্রাণের দায়েই সহযোগিতা করতে হয় পার্বতীকে। তখন তারা বোতল খুলে জল দেয় তাকে। প্যাকেট খুলে বিস্কুট। সে শান্ত হয়ে তাকায় জানলার বাইরে। আর দেখে কিভাবে পৃথিবী রাহুর গ্রাসে চলে যাচ্ছে দ্রুত বেগে।
কিন্তু অনেক সময় লাগে। গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছতে বিস্তর সময় লাগে গাড়িটার। পথে কত যে ক্ষেত টিলা পাহাড় খাল তালাব পেরিয়েছে, তার হিসাব নেই। ঠিক কতটা সময় পেরিয়েছে, সে হিসাবও নেই পার্বতীর কাছে। খিদে দিয়ে যদি সময় মাপা যায়, তো বলতেই হয় অনেক সময়। কারণ, সকালে নাস্তা করেই বেরিয়েছিল। এখন আবার খিদে পেয়ে গেছে। হয়ত অনেক দূরে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে তাকে। আজাদপুর থেকে দূরে। অলবেলিয়া থেকে দূরে। যাতে ফিরে আসার পথ সে খুঁজে না পায়। অথবা তাকে বিভ্রান্ত করার জন্য ঘুর পথে নিয়ে যাচ্ছে কোথাও। হয়তো আসলে কাছেই, কিন্তু ভাবনায় নাগালের বাইরে। গাড়ির জানলা দিয়ে হঠাৎ একটা পাহাড় চোখে পড়ে পার্বতীর। অনেকটা দূরে। তাই বেশ ধোঁয়াটে আবছা লাগে। কিন্তু তার চূড়ার আদল দেখে পার্বতীর মনে হয় ওটা বকরি পাহাড়। তাহলে তো ওই পাহাড়টার ওপাশেই সেই পশ্চিমী গন্নার ক্ষেত। তারপর কয়েকটা অন্য ক্ষেত পেরিয়েই আছে পারো দরিয়া। তারপর আজাদপুর। মানে সে কাছাকাছি কোথাও আছে। যেন খানিক ভরসা পায় পার্বতী। যতই যাই হোক সত্যিটা হল বাড়ির কাছাকাছি ভয় কম করে লোকের। এর একটু পরেই একটা বিরাট বন্ধ গেটের সামনে এসে দাঁড়ায় গাড়িটা। হর্ন বাজায় বার কয়েক। তারপর ধীরে ধীরে বিরাট লোহার পাল্লা দুটো সরে যায় দু'দিকে। ভেতরটা দেখতে পায় পার্বতী। একেবারেই ফাঁকা রুক্ষ একটা ধুলোটে চত্বর। সেই চত্বর পেরিয়ে গাড়ি এগিয়ে যায় একটা একতলা দালানের দিকে। রংচটা মোটা দেওয়ালের একটা দালান, যার কোথাও কোনও গৃহস্থালির ছাপ নেই। সাড়া নেই জনপ্রাণির। গাড়ি থেকে নামিয়ে পার্বতীকে সেই দালানের দিকেই টেনে নিয়ে যায় গুণ্ডাদু'টো। ড্রাইভার এগিয়ে যায় দালানের সদর দরজার দিকে। দরজায় বিরাট একটা লোহার তালা ঝুলছে। চাবি ঘুরিয়ে তালা খোলে ড্রাইভার। ভারী কাঠের পাল্লা দুটো দু'দিকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। পার্বতী দেখে

ভেতরটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারের দিকে ওরা ওকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়। পার্বতীর ভীষণ বুক কাঁপে। একবার ভাবে, পিছন ফিরে দৌড় দেয়। কিন্তু গেট ততক্ষণে আবার বন্ধ হয়ে গেছে। একটা বুড়োটে লোক গেটে তালা দিচ্ছে ভেতর থেকে। হয়তো ও-ই খুলেও ছিল। বাড়িটার দরজার সামনে থমকে দাঁড়ায় পার্বতী। খানিক সময় তাকে দেয়ও লোক দু'টো। হয়তো ধাতস্থ হবার জন্য। তারপর নির্লিপ্ত গলায় একজন বলে, ''অন্দর চলো।''

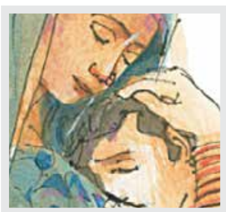
পার্বতী খানিক অবাধ্য স্বরে বলে, ''কিস কাম কে লিয়ে লায়া মুঝে?''

প্রথমজন আবার উত্তর দেয়, ''মালিক আকর কাম সমঝা দেঙ্গে।''

''মালিক?''

''হুঁ মালিক। ইস প্রপার্টি কা মালিক।''

অন্যজন ব্যঙ্গের স্বরে হেসে বলে, ''তুমহারা মালিক।''



সারা দিনের আলো দিয়ে সে ভোঁতা করে দেয় মজিদ খানের দাঁত নখ। কখনও সবিনার অন্তরের অগ্নি ডাক। কখনও মেজ বউমার মুক্তো ছড়ানো হাসি।

পার্বতীর ফুঁসে উঠে বলে, ''মতলব?''

''মতলব তু ভি উস কি প্রপার্টি। সে তোকে কিনে নিয়েছে মজিদ খানের কাছ থেকে।''

''কিনে নিয়েছে?'' বিস্মিত কণ্ঠে বলে পার্বতী।

উত্তর বাজে কানে, ''তিন গুনা ভাও দেকর।''

আরও কিছু টুকরো কথা বলে তারা। কথার মধ্যেই তাকে ঠেলে নিয়ে যায় অন্ধকার ভেতর ঘরে। আলো জ্বালায়। চোখে পড়ে উঁচু ছাদের চারটে দেওয়াল। ডান দেওয়ালে আর একটা দরজা, ছোট। সেই দরজা ঠেলে খুলে একজন আলো জ্বালায়। মুখে বলে, ''বাথরুম। পানি হ্যায়। সাবুন শ্যাম্পু হ্যায়। চান করে নাও। খানা পাঠিয়ে দিচ্ছি।''

বলেই তারা বেরিয়ে যায় দু'জনেই। টেনে বন্ধ করে দিয়ে যায় দরজা। লোহা লক্কড়ের শব্দে পার্বতী বোঝে, ওরা দরজায় তালা দিচ্ছে বাইরে থেকে। যেন সে বন্দি হলো কারাগারে। ওই রকমই ভয় জাগানো কিছু তথ্য দিয়ে গেছে ওরা। মজিদ খান নাকি বেচতে চাইছিল না তাকে। কিন্তু ওদের মালিক জেদ ধরে বসে বেচতেই হবে। তখন মজিদ খান তিনগুণ টাকা দাবি করে। তাতেই রাজি হয়ে যায় ওদের মালিক। অবাক হয়ে পার্বতী জানতে চেয়েছিল, ''কিঁউ?''

একই রকম বাঁকা হেসে উত্তর দিয়েছিল একজন, ''সে কথা মালিক এসেই সমঝাবে তোমাকে।''

''কে তোমাদের মালিক?''

''বস্! আতে হি হোঙ্গে। দেখে নিও নিজের চোখেই! সারপ্রাইজ!''

ঘরের পিছন দেওয়াল ঘেঁষে একটা খাট পাতা। আসলে চৌকি। চৌকির ওপর নতুন কেনা গদি। চাদর নেই। সেই রকমই দুটো বালিশ। ওয়ার ছাড়া। খাটের উপর একটা জানলা। তার মোটা কাঠের পাল্লা দু'টো শক্ত করে আটকানো। পার্বতী খাটের উপর উঠে জানলা খোলার চেষ্টা করে। কিন্তু এক চুলও নড়ে না জানলা। মনে হয় বাইরে থেকে কোনও ভাবে আটকানো আছে। ফার্নিচার বলতে এক কোণে থাক করা কয়েকটা প্লাস্টিকের চেয়ার। একটা নামানো মেঝের ওপর। তারই ওপর বসে পার্বতী ভাবে। অজান্তেই তার ভাবনায় উঠে আসে সুস্মিতার মুখ। তার মা দেখলেই বলত, এই হল বিছুর মেয়ে! এখন অতৃপ্ত আত্মা হয়ে ভটকে বেড়াচ্ছে পুলিশ চৌকির ভেতর। ছোটখাটো দুর্গের মতো ভুলভুলইয়া ঘর বারান্দা অলি গলি তার। ভেতরটা অনেকটা এই রকমই। এই ঘরটা যেন ওই পুলিশ চৌকিরই ভেতরে। সেখানে যা হয়েছিল এখানেও তা হতেই পারে। সুস্মিতার সঙ্গে যা হয়েছিল এখানে তার সঙ্গেও...। ভাবতে গিয়ে আতঙ্কে চুপসে যায় পার্বতীর মুখটা। বুকের ভেতর যেন দামামা বাজে। শিথিল হয়ে আসে হাত-পা। আর ঠিক তখনই ঝপ করে নিভে যায় আলো। বিকট অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ে চারদিক থেকে। পার্বতী নিজেই আর নিজেকে দেখতে পায় না। পার্বতী ভয়ে কাঠ হয়ে বসে থাকে চেয়ারের ওপর। এখন যদি সে একটা ছোট্ট পাখি হয়ে যেতে পারত! একটা ভীষণ কার্যকরী উপায় মাথায় আসে পার্বতীর। কিন্তু সেই ভাবনা তাকে আরো হতাশার দিকে ঠেলে দেয়। কারণ, ওইভাবে সে বেরিয়ে হয়তো যেতে পারবে। কিন্তু কারও কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। দেখাও দিতে পারবে না। আত্মা! যদি সে এখন একটা আত্মা হয়ে যায়! তাহলে সে ধোঁয়ার মতো উড়ে বেরিয়ে যেতে পারবে ওই ঘুলঘুলি দিয়ে। কিন্তু বাইরে গিয়েও সে ধোঁয়াই হয়ে থাকবে। অদৃশ্য আত্মাই হয়ে থাকবে। রক্তমাংসের মানুষ হয়ে ফিরে আসতে পারবে না। কিংবা হয়তো বেরোতেই পারবে না। সুস্মিতা তো আত্মাই হয়েছিল। আত্মা হয়েও তো বেরিয়ে আসতে পারল না পুলিশ চৌকির ভুলভুলইয়া ছেড়ে। পার্বতী বুঝতেও পারে না কখন সে কাঁদতে শুরু করেছে। খেয়াল হয় দরজা খোলার শব্দে। পাল্লা দু'টো সরে যেতেই বাইরের আলো এসে পড়ে ঘরে। হাতে থালা নিয়ে ঘরে ঢোকে একটা লোক। মনে হয় সেই বুড়োটে লোকটা যে গেটে তালা দিচ্ছিল। থালায় দাল, রোটি, সবজি। পার্বতীর হাতে সেটা দিয়ে নির্লিপ্ত স্বরে বলে, ''এখনই কাঁদছ?''

পার্বতী কোনও উত্তর দেয় না। চোখ মুছে মুখ তুলে তাকায় লোকটার দিকে। এমনই বদসুরত যে আঁতকে ওঠে পার্বতী। যদিও নির্লিপ্ত তার ভাব। তার চাহনি। কোনও ব্যঙ্গ নেই। ভরসা পায় পার্বতী। জিজ্ঞেস করে, ''ইয়াহাঁ কোই সাদি হ্যায়?''

লোকটা চুপ করে থাকে কিছু ক্ষণ।

তারপর বলে, ‘‘পতা নহি।’’
পার্বতী আরও বলে, ‘‘শুনেছিলাম বিয়ের অনুষ্ঠান আছে। কাজে হাত বটাতে হবে?’’
‘‘পানি।’’ একটা জলের বোতল মেঝেতে নামিয়ে রাখে লোকটা। বিনীত ভঙ্গিতে বলে, ‘‘আর কিছু লাগবে?’’
পার্বতী বলে, ‘‘একটা খবর লাগবে। দেবেন?’’
‘‘বলুন কি?’’
‘‘এখানকার মালিক কে?’’
এর উত্তর লোকটা দিয়ে যায়। কিন্তু তার মনে হয় না দিলেই ছিল ভাল। কারণ, পার্বতী যে আশঙ্কায় কান্না আটকাতে পারছিল না, লোকটা সেই আশঙ্কাতেই সিলমোহর দিয়ে যায়। পার্বতীকে জানিয়ে দিয়ে যায়, এই প্রপার্টির মালিক রাঘব ধিংড়া।
পার্বতী খাবার শেষ করে। বাথরুম যায়। হাতমুখ ধোয় কলের জলে। তারপর বিছানায় এসে বসে। তার মাথার ভেতর পাক খেতে থাকে রাঘব ধিংড়ার সঙ্গে তার দ্বৈরথের বিভিন্ন ছবি। সে বোঝে শুধু প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই ধিংড়া তার তিনগুণ দাম চুকিয়েছে। এখন খোলাখুলি লড়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কোনও উপায় নেই। তাই সেই কাস্তেটা তার দরকার। ঘাস কাটা সেই কাস্তেটা যা ধিংড়ার রক্তের স্বাদ পেয়েছিল।
পার্বতী আঁতিপাঁতি করে খোঁজে সারা ঘর। বাথরুমে চৌকির তলায় দরজার আড়ে। কিন্তু কোথাও কিছু নেই। কাস্তে তো কী, একটা আলগা পেরেকও নেই যা সে বাগিয়ে ধরতে পারে। অগত্যা সে মনে মনে নিরস্ত্র রণকৌশলের ছক কষে। হাত পা দাঁত নখ সম্বল করে। বাড়তি অস্ত্র বলতে সে একটা কলের মাথা খুঁজে পায় বাথরুমে। ভাঙ্গা কিন্তু লোহার। সেটাই সে বেঁধে নেয় তার দুপট্টার এক প্রান্তে। অন্য প্রান্ত হাতে ধরে কয়েকপাক ঘুরিয়ে অভ্যাস করে নেয়। কয়েকবার দেওয়ালে মেরে পরীক্ষা করে নেয় তার আঘাত। আশ্বস্ত হয় তার প্রহার দেখে। সেটাই বালিশের পাশে আলগা ওড়নার মতো ফেলে রাখে পার্বতী। তারপর সেই বালিশেই মাথা দিয়ে চিৎ হয়ে সিলিং এর দিকে চেয়ে আবার ভাবে, যদি সে আত্মা হয়ে যায়! কিন্তু পার্বতীর এসব কিছুই করা হয় না। কারণ, সে বোকা বাচ্চার মতো ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের ঘোরে সে ভুলে যায় তার রণকৌশল। হারিয়ে ফেলে সমস্ত অস্ত্র। কলের মাথা।
যদিও তার ঘুম ভাঙানোর অনেক চেষ্টা করেছিল অনেকে। অনেক লোকে। আধো ঘুমের ভেতর সে কখনও বা টেরও পেয়েছিল। কারা যেন তাকে ডাকছে। তাকে টেনে তুলছে। আছড়ে ফেলছে। প্রবল ভাবে ঝাঁকাচ্ছে তার কাঁধ ধরে। কোমর ধরে টানছে। তার হাত ধরে পা ধরে, এমনকি তাকে খিঁমচে ধরছে। তবু পুরোপুরি জেগে উঠে সে সচেতন হতে পারে না। শেষে ক্লান্ত হয়ে লোকজন চলে যায় একে একে তার ঘর ছেড়ে। তার বিছানা ছেড়ে। তাকে ছেড়ে রেখে যায় একাকী তার বিছানায়। তারই ভবিতব্যের হাতে ফেলে রেখে।
অবশেষে যখন পার্বতীর ঘুম সত্যিই ভাঙে, সে বুঝতেই পারে না সে কোথায় আছে, কেন আছে। সঙ্গে মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। সে একাই পড়ে আছে গদির ওপর। সিলিং এর নিচে ঘুলঘুলি অন্ধকার। হয়তো রাত নেমেছে বাইরে। দরজা তেমনই বন্ধ।
পার্বতী ওঠার চেষ্টা করে। মাথার যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায়। হাত তুলে ধরতে যায় মাথা। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে সে। হাত দুটো যেন তার ভেঙে গেছে। খুলে গেছে বুঝি কাঁধের জোড়ের হাড়ও।
তবুও পার্বতী ওঠার চেষ্টা করে। ব্যথায় সে কঁকিয়ে ওঠে। আবার শুয়ে পড়ে। তার সর্বাঙ্গ যেন যন্ত্রণায় ভেঙে পড়তে চায়। যেন কেউ লোহার দৈত্যাকার সাঁড়াশি দিয়ে শক্ত করে চিপে রেখেছিল তার ওইসব অঙ্গগুলো। অনেক ক্ষণ। বহু ক্ষণ। তারই ফলে এখন অবশ লাগছে জায়গাগুলো। গলাটা শুকনো লাগে পার্বতীর। জলের বোতলটার খোঁজে শরীর মুচড়ে তাকায় মাথার দিকে। আর তখনই জ্বালা করে ওঠে তার বুকটা। পরীক্ষা করতে গিয়ে মাথা নিচু করে তাকায় নিজের বুকের দিকে। আর দেখে তার গোটা শরীরে কোনও পোশাক নেই। একটা সুতোও না। কিন্তু টান পড়ে আরও জ্বালা করে বুকটা। জ্বালা উপেক্ষা করে এবার উঠে বসে পার্বতী। আলোর দিকে ফিরে পার্বতী পরীক্ষা করে দাগগুলো। আর দেখে ওগুলো আসলে কামড়ের দাগ। প্রথমটা পার্বতী এত ভয় পেয়ে যায় যে কেঁদেই ফেলে। অন্তহীন আশঙ্কায় সে বিব্রত হয়ে পড়ে। এমনকি, তার মনে হয় সে মরেও যেতে পারে দংশনের বিষক্রিয়ায়। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে পারল না, কেন এমন অত্যাচারেও তার ঘুম ভাঙল না। তবে কি খাবারে কিছু মিশিয়ে দিয়েছিল? হতে পারে সমস্তটাই ওরা ছকে রেখেছিল আগেই। তাই তার ভাঙা কলের ছক কাজেই আসেনি কোনও। পার্বতী মাথার কাছে খোঁজে তার দুপাট্টায় বাঁধা কলের মাথা। কিন্তু নেই। দু’টোই বেপাত্তা। এমনকি, তার কামিজ, সালোয়ার, ব্লাউজ, ব্রা…। বিছানার কোথাও সে খুঁজে পায় না তার জামাকাপড়। হয়তো বাথরুমে আছে। ভাবতে ভাবতে বহু কষ্টে পার্বতী নেমে আসে চৌকি থেকে। কোনও রকমে সে বাথরুমে গিয়ে ঢোকে। আলো জ্বালায়। আর আয়নার সামনে দাঁড়ায় নিজের মুখোমুখি। নিজেকে দেখে প্রথমেই যে কথাটা তার মাথায় আসে তা হল, অর্ধভুক্ত। তারপর আর একটু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে মনে হয়, আধমরা। আধ জ্যান্ত অথবা আধ কাটা। রাঘব ধিংড়া আর তার লোকেরা যেন তার সবকিছুই আধখানা করে কেটে নিয়ে গেছে। রেখে গেছে বাকি আধখানা। তারপর হঠাৎই পার্বতীর যন্ত্রণাগুলো কেমন ভোঁতা হয়ে যায়। এমনকি যে আতঙ্ক গ্রাস করে রেখেছিল তার অন্তরাত্মা, তাও কাটতে শুরু করে রোদ লাগা কুয়াশার মত। এই যে উলঙ্গ সে দাঁড়িয়ে আছে এলইডি আলোর নিচে, কোনও সংকোচ নেই তার ভঙ্গিতে। দরজায় যে তালা দেওয়া বাইরে থেকে, যেন পরোয়া নেই তার কোনও। পার্বতী কোথাও খুঁজে পায় না তার জামাকাপড়। ঘরে আর কিছু নেই যা দিয়ে সে লজ্জা ঢাকতে পারে। অগত্যা পার্বতী তেমনই বসে থাকে



খাটের ওপর। সে জানে না রাত কত হল। যদিও তার আন্দাজ আছে। কারণ, সে সময় মাপার নতুন একক পেয়েছে। খিদে। সেই হিসাবে তার মনে হয় রাত অনেক হল। তার খাবার সময় পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। তবু তার খাবার নিয়ে আসেনি কেউ। হয়তো এটাও রাঘব ধিংড়ার প্রতিশোধ। তাকে অনাহারে রাখবে। তার ওপর অত্যাচার করবে। আর এভাবেই শেষ করে দেবে তার জীবন। সে কখনওই আর দেখতে পাবে না তার মেয়েকে। রোশনকে। তার বাবা মা ভাই বোনদেরকে। এই চার দেওয়ালের ভেতর সেও সুস্মিতার মত...। হঠাৎই চমক ভাঙে পার্বতীর। তালা খোলার শব্দ হয়। ধীর স্থির শান্ত ভঙ্গিতে। শব্দ শুনেই যেন পার্বতী দেখতে পায় দুটো কর্কশ হাত। চাবি ঘুরিয়ে তালা খুলছে। শেকল নামাচ্ছে। তারপর দরজা ঠেলে ঢুকে আসছে ঘরের ভেতর। সেই বদসুরত লোকটা। জনপ্রাণির সাড়া নেই। শুধু কানে আসে লোকটার নির্লিপ্ত ঘুম-ঘুম স্বর, ''খানা।''

পার্বতী চাইলে বালিশটা টেনে নিয়ে বুকের ওপর চেপে ধরে নিজেকে আড়াল করতে পারত। কিন্তু সে করে না। প্রয়োজন বোধই করে না সে। লোকটা দাঁড়িয়ে থাকে খাবারের থালা হাতে। পার্বতী হাত বাড়ায় না। আশ্চর্য নির্লিপ্ত লোকটাও। পার্বতীকে এই অবস্থায় দেখেও তার কোনও হেলদোল নেই। যেন এমনটাই হওয়ার কথা। সে দাঁড়িয়েই থাকে খাবার হাতে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে লোকটা আবার বলে, ''খানা খা লিও।''

পার্বতী মুখ তুলে তাকায়। সোজা তাকিয়ে আছে লোকটাও। পার্বতী বলে, ''সব চলে গয়ে?''

''জি।''

কিছু ক্ষণ চুপ করে থেকে পার্বতী আবার জিজ্ঞেস করে, ''কিতনে লোগ থে?''

''পাঁচ।''

পার্বতী ভাবে, সেই পাঁচ জনই হবে, যারা পারুলকে আক্রমণ করেছিল আখ ক্ষেতের ভেতর। রাঘব ধিংড়া আর তার চার বন্ধু। লোকটা খাবারের থালাটা পার্বতীর পাশে খাটের ওপর নামিয়ে রাখে। থার্মোকলের থালায় বাটিতে খেতে দিয়েছে। রুটি সবজি। বাটিতে দাল। সঙ্গে জলের বোতল। সব নামিয়ে রেখে লোকটা চলে যেতে উদ্যত হয়। পার্বতী জিজ্ঞেস করে, ''মেরে কপড়ে?''

লোকটা কোনও উত্তর না দিয়ে এগিয়ে যায় দরজার দিকে। পার্বতী আবার বলে, ''মেরে কপড়ে লে আইয়ে।''

লোকটা থেমে যায়। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছু ক্ষণ। তারপর পিছন না ফিরেই বলে, ''উনহোনে জ্বলা দিও।''

পার্বতীর বাড়তি কিছু আঘাত লাগে না এই সংবাদে। বরং যেন তার সামান্য স্বস্তি হয় লোকটার স্বর কানে বাজতেই। মনে হয়, তার স্বরটা যেন আহত। অর্থাৎ লোকটা হয়তো পুরোপুরি ওদের দিকে নয়। পার্বতীর দিকেও অবশ্যই নয়। কিন্তু তার বিরুদ্ধেও নয়। হয়তো।

একটু যেন ভরসার ভাব আসে প্রাণে। তাতেই ভর করে সে আবার জিজ্ঞেস করে, ''আপ কৌন সে?''

''নৌকর।''

খানিক বিরতি নিয়ে লোকটা আবার বলে, ''ধরম সিং নাম সে।''

পার্বতী জানতে চায় সে কোথায় আছে। লোকটা উত্তর দিতে চায় না। এলোমেলো কিছু কথা বলে। সে অনুমান করে আজাদপুর থেকে খুব বেশি দূরে সে নেই হয়তো। লোকটা দরজায় তালা দিয়ে চলে যায়। দরজার বাইরে তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই ঘিরে আসে নৈঃশব্দ্য। বিকট নৈঃশব্দ। এমনকি, একটা ঝিঁঝিঁ পোকাও ডাকে না কোথাও। টিকটিকিও না। পার্বতী

শুনতে পায় না তার নিজের শ্বাস ফেলার শব্দ। আসলে যেন বিকল হয়ে গেছে তার শ্রবণেন্দ্রিয়। বিকল হওয়ার মুখে বাকি সব ইন্দ্রিয়গুলো। তাই হয়তো এত কষ্টেও তেমন কষ্ট হচ্ছে না তার। কিন্তু একটা অনুভূতি প্রকট হয়ে আছে পার্বতীর মনের ভেতর। অন্তরাত্মার অনেক গভীরে কোথাও সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে, বড় কিছুই ঘটতে যাচ্ছে অচিরেই। খুবই বড় কিছু। কী সে জানে না। হয়তো তার মৃত্যুই ঘটতে যাচ্ছে। সুস্মিতার মতো। এই চার দেওয়ালের ঘেরাটোপের ভেতর চিরদিনের মতো দেহ মুক্ত হতে যাচ্ছে তার আত্মা। কিন্তু হাজার ভেবেও সে একটা উপায়ও বার করতে পারে না নিজেকে শেষ করার। হয়তো সেই জন্যেই ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে তার জামাকাপড়। যাতে তার থেকে সে কোনও দড়ি পাকাতে না পারে, বেঁচে থাকে যতক্ষণ না রাঘব ধিংড়া নিজের হাতে শেষ করে তাকে। সে কথা দ্বিতীয় দিনে নিজের মুখেই বলে গেছে ধিংড়া। আর কিছুই মিশিয়ে দেয়নি তার খাবারে। ক'দিন বিশ্রামও দিয়েছে তাকে। যখন সে দেহে-মনে সুস্থ বোধ করছে খানিক, আবার হানা দেয় রাঘব ধিংড়া। সদলবলে। সন্ধ্যে নামতেই উঁচু সীমানা পাঁচিলের বাইরে ধূ-ধূ মাঠের ওপর মোটর গাড়ির শব্দ ওঠে। সেই শব্দ দীর্ঘক্ষণ অনুরণিত হতে থাকে নৈঃশব্দ্যের চার দেওয়ালের ভেতর। তারপর যেন গায়ের ওপর এসে পড়ে। পার্বতী বুঝতে পারে, আসলে মেন গেটের বাইরে। পার্বতীর অন্তরাত্মার ভেতর কোথায় যেন এক অতল পতনের অনুভূতি পাক খেতে থাকে। তবু সে শান্ত থাকে বাইরে। মৃদু আলোর ভেতর সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তার নগ্ন নারীমূর্তি ধীর পায়ে দরজা থেকে হেঁটে যায় বিছানার দিকে। শান্ত হয়ে বসে গদির ওপর। যেন সে অপেক্ষা করে আছে রাঘব ধিংড়া আর তার দলবলের জন্য।

স্পষ্ট শুনতে পায় তার দরজার বাইরে দলবদ্ধ পায়ের শব্দ। তাদের অধীর হয়ে ওঠা শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। তারপর কড়া-পড়া হাতের তালুর ভেতর তালাটাকে আঁকড়ে ধরা। শেষে তালার ফুটোর ভেতর লোহার দাঁতালো চাবির ঢুকে আসা। ভেতরের কলকব্জা নেড়ে ঘেঁটে বিন্যাস বদলে দেওয়ার অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। হয়তো ভুল চাবি বাছা হয়েছিল। তাই অনেক নেড়েঘেঁটেও তালা খুলতে পারে না। উন্মত্তের মতো একটার পর একটা চাবি ঢোকাতে থাকে। একে একে গোছার সব চাবি দিয়েই চেষ্টা চালায়। কিন্তু কোনওভাবেই কাজ না হওয়ায় শেষে আবার গোড়া থেকে শুরু করে। তবু তালা খোলে না। শেষে চরম আক্রোশে আর হতাশায় নির্মম আঘাত করে তালাটাকে। হাতের সামনে যা পায় তাই দিয়ে। কত ক্ষণ চলে এই প্রক্রিয়া খেয়াল থাকে না। শেষ হয় এক সময়। শান্ত হয়ে আসে চারপাশ। শব্দেরা মিলিয়ে যায় একে একে। ফিরে আসে বিকট নৈঃশব্দ্য। তারই ভিতর একটা ক্রূর কণ্ঠ বাজতে থাকে পার্বতীর মাথার ভেতর। সেই কণ্ঠ তাকে বলতে থাকে, ''মৌত কি ভিখ মাঙ্গেগি তু... মৌত কি ভিখ...।''

এরপরেও দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ে পার্বতী। আংশিক সংজ্ঞাহারা এক সুগভীর ঘুম। যেন সবকিছু পার করে সে পৌঁছে গেছে ব্রহ্মপুত্রের কাছে। মৃদুমন্দ বাতাসে উড়ছে তার চুল। তার শুভ্র শাড়ির আঁচল। তার হাতে লম্বা বাঁশের বৈঠা। সে ভেসে চলেছে মাঝ দরিয়া বরাবর। ব্রহ্মপুত্রের দু'পাড় জুড়ে যেন উৎসব লেগেছে। পাতলা কুয়াশা ভেদ করে দেখা যাচ্ছে লাল সাদা পাখির মত মেয়েরা আনন্দে নৃত্য করছে। ছেলেরা মাথায় ফেট্টি বেঁধে ঢোল বাহি আর গোগোনা বাজাচ্ছে। পেপা ফুঁকে ডাকছে সবাইকে উৎসবে শামিল হতে। পার্বতী চঞ্চল চোখে এদিক ওদিক চায়। বিহু নর্তকী দলের প্রতিটা মেয়ের মুখ সে দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের নাচের গতি আর কুয়াশার আবছায়ায় সে কাউকে ঠাহর করতে পারে না। ভেলা বেয়ে পার্বতী এগিয়ে যায় যেখানে ব্রহ্মপুত্র কাস্তের মতো বাঁক নিয়েছে। যেন অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে রেখেছে এক ঘন সবুজ ঝিরঝিরে বাঁশবন। বাঁশ বনের ভেতর বসানো আছে ছোট ছোট ঘর। দরমার দেওয়াল। টিনের চাল। ছিটে বাঁশের বেড়া। বেড়ার ওপর উপচে পড়া গুচ্ছ গুচ্ছ রঙিন ফুল। চালে লটকে লকলকে লাউলতা। উঠোন ঘিরে সুপুরি পেঁপে সজনে নিম। গোবর মাটিতে নিকোনো উঠোনে উৎসবের আগুন। আগুনে চাটু। চাটুতে পিঠা। পিঠার গন্ধে ম-ম করছে চারিদিক। লাল সাদা বিহুর সাজে মা পিঠা করছে উঠোনে বসে। আর সেই পিঠা পরব ঘিরে গোল হয়ে বসে আছে পার্বতী আর তার ভাই বোনেরা। চাটু থেকে একটা পিঠা মা তুলে দেয় তার ভাইয়ের হাতে। গরম পিঠার ছ্যাঁকা লেগে চিৎকার করে ওঠে ভাই। একেবারে পার্বতীর কানের কাছে।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে পার্বতী। চোখ মেলে দেখে একটা লোক খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বোতলে জল। শান্ত স্বরে বলে, ''খানা খা লিও।''

পার্বতী বিভ্রান্ত চোখে চারদিকে তাকায়। যেন সে কিছুই বুঝতে পারছে না। কিছুই চিনতে পারছে না। পার্বতী তেমনই বসে থাকে ঠিক যেমনটা তাকে ফেলে রেখে গেছিল রাঘব ধিংড়া আর তার দলবল। দলিত মথিত। ভীষণ রকমের আহত। অথচ জীবন্ত। আপাদমস্তক জীবন্ত। যার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ। সাময়িক বৈকল্য কাটিয়ে উঠে তারা আবার সক্রিয়। হয়তো সেই জন্যই, ভীষণ কষ্ট হয় পার্বতীর। সবে মিলে শেষ পর্যন্ত কাঁদিয়ে ছাড়ে পার্বতীকে। রীতিমতো শব্দ করে কাঁদতে থাকে পার্বতী। শিশুদের মতো করে। যেন গরম পিঠার ছ্যাঁকায় পুড়ে গেছে তার কোমল ত্বক। নরম মাংস।

পার্বতীকে ওভাবে কাঁদতে দেখে কেমন বিচলিত হয়ে পড়ে ধরম সিং। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে ধরতে যায়। কিন্তু পার্বতীর প্রকট উলঙ্গ নারীরূপ তাকে সংকোচে ফেলে দেয়। ছোঁয়া এড়িয়ে বিভ্রান্ত হয়ে লোকটা চেয়ে থাকে পার্বতীর দিকে। আহত স্বরে বলে, ''রোও মত...। রোও মত...।''

শরীর কুঁকড়ে মাথা নিচু করে কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, ''দর্দ হো রা সে। বহত দর্দ..।''

ধরম সিং কিছু মনে পড়ে যাওয়ার মত করে বলে, ''এক মিনট!'' তারপর পকেট হাতড়ে একটা ট্যাবলেটের পাতা

বার করে। তারই একটা ট্যাবলেট খুলে পার্বতীর হাতে দিয়ে বলে, ‘‘দর্দ কি গোলি। খা লিও। মন্নে খাতা ঘুটনো কে লিয়ে।’’ পার্বতী কিছু না ভেবেই খেয়ে নেয় বড়িটা। বোতলের জল দিয়ে। চেষ্টা করে দাঁতে দাঁত চিপে কান্না আটকানোর। ধরম সিং বিব্রত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে কিছু ক্ষণ। তারপর ধীর পায়ে এগোতে থাকে দরজার দিকে। হঠাৎ ফোন বেজে ওঠে লোকটার। রীতিমতো ঝনঝনিয়ে তীব্র শব্দে। পকেট হাতড়ে একটা ছোট্ট হলুদ রঙের ফোন বার করে সে। কানে চেপে ধরে বলে, ‘‘জি হুকুম!’’
কান্না থামায় পার্বতী। কান পেতে থাকে। ফোনের ওপাশ থেকে আবছা জড়ানো কণ্ঠে কেউ বলে, ‘‘জিন্দা সে কি মর গয়ো?’’
লোকটা সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে তাড়াহুড়োয় বলে, ‘‘জিন্দা সে। জিন্দা সে।’’ বলতে

বলতে একবার ফিরে তাকায় পার্বতীর দিকে। তারপর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। পার্বতী শুনতে পায় তালা চাবি লোহা লক্কড়ের শব্দের সঙ্গে মিশিয়ে লোকটা বলছে, ‘‘জি হুকুম! জি হুকুম!’’
তারপরেই মিলিয়ে যায় তার পায়ের শব্দ, ম্লান এলইডি জ্বলা আধো অন্ধকার চত্বরের ওপারে কোথাও। পার্বতী আবার নিজের দিকে ফিরে ভাবে এত কেন কষ্ট হচ্ছে তার! একটু আগেই কী ভীষণ আনন্দ হচ্ছিল! ব্রহ্মপুত্রের জলে ভেলা ভাসিয়ে বিহুর ভেতর দিয়ে যেন সে চলেছিল কোন মহোৎসবের দিকে। হয়তো সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিল তখন। আর সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেই বিরাজ করছিল সেই কল্পলোকে। এখন জ্ঞান ফিরে দেখছে বাস্তবে শুধু যন্ত্রণাই আছে তাকে ঘিরে। লোকটা খবর দিয়েছে পার্বতী মরেনি। এখনও সে জ্যান্ত আছে। তাদের সব অত্যাচার হজম করে সে এখনও জ্যান্ত আছে। সামান্য সে এক নাবালিকা পারো ব্যর্থ করে দিয়েছে তাদের যৌথ পৈশাচিকতাকে। এমনই প্রবল তার জীবনীশক্তি। এমনই সে জেদি অসমের মেয়ে। হয়তো কাজ করছে দর্দ কি গোলি। ব্যথা কমে আসছে ধীরে ধীরে। ব্যথা কমতেই খেয়াল হয় আসলে ভীষণ খিদে পেয়েছে তার। সেই দেখে নিজের ওপরেই ঘেন্না হয় পার্বতীর। এত কিছুর পরেও কী ভীষণ খেতে ইচ্ছে করছে তার। ওদেরই দেওয়া খাবার। রোটি, রাজমা, আচার, জল। মন থেকে খেতে না চেয়েও নিজেকে সংবরণ করতে পারেনা পার্বতী। ধীর বেগে রোটি ছেঁড়ে। জড়িয়ে নেয় রাজমা। ঠেকিয়ে নেয় আচারে। তারপর মুখে নিয়ে চিবোতে থাকে বিষণ্ণ ভঙ্গিতে। কিছু পরে ঘুমিয়েও পড়ে নিশ্চিন্তে। যেন আসলে তার কোনও কষ্ট নেই। দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা বলে কিছুই নেই। চাইলেই সে ঘুমতে পারে এমন আরামে, এমন নিশ্চিন্তে। কারণ, আর সে আগের মতো নেই। এবার সে বদলে গেছে। রাঘব ধিংড়াকে দেখে নেওয়ার মতো করে সে বদলে ফেলেছে নিজেকে। ভেতরে ভেতরে। সংগোপনে। আসলে হাতে একটা অস্ত্র পেয়েছে পার্বতী। না কাস্তে নয়। তবে তার চেয়ে কিছু কম কার্যকরীও নয়। একটা পায়া। যে চৌকির ওপর সে অত্যাচারিত হচ্ছে, তারই ছ’টার মধ্যে একটা পায়া। মাঝের একটা। একেবারে আলগা হয়ে এসেছে সেটা। ধরে টান দিতেই উপড়ে হাতে চলে আসে। বেশ ভারী কাঠের পায়া। পার্বতী উপড়ে আসা পেরেকে চাপ দিয়ে আবার জায়গা মতো বসিয়ে দেয় পায়াটাকে। চাইলেই সহজেই খুলে নেওয়া যাবে যখন ইচ্ছে। রোজকার মতো অভ্যস্ত ব্যথা নিয়ে বাথরুমে যায় পার্বতী। আলাদা করে আর তাকে জামাকাপড় খুলতে হয় না। বাথরুম পর্ব শেষ হলে আবার সেসব পরে নেওয়ার ঝামেলাও নেই। কারণ, তার পরনে কোনও জামাকাপড়ই নেই।
কিছু ক্ষণ পর জলখাবার নিয়ে আসে ধরম চাচা। কাগজের থালায় ছাতু মাখা। পাশে এক থোবলা পাঁচমিশালি আচার। তার তেল গড়িয়ে যাচ্ছে ছাতুর গোলার দিকে। সঙ্গে প্লাস্টিকের গ্লাসে এক গ্লাস ভর্তি দুধ। চিনি দেওয়া। তখনও হালকা গরম। খাবারগুলো বিছানার উপর নামিয়ে রেখে লোকটা জানতে চায়,
‘‘দর্দ সে?’’
পার্বতী কেমন পোষমানা স্বরে বলে,
‘‘হলকা।’’
‘‘গোলি ওর লেবে?’’
‘‘এক দো।’’
লোকটা ট্যাবলেটের পাতা বের করে তার থেকে একটা বড়ি পার্বতীর হাতে দেয়। পার্বতী জলখাবার শেষ করে ধীরে সুস্থে। তারপর রোজকার মতো একটা চেয়ার নিয়ে বসে দরজার কাছে। দুই পাল্লার জোড়ের ওপর কান রেখে শব্দ দিয়ে দেখার চেষ্টা করে বাইরেটা। আজও সে দেখে দ্বিতীয় একজনের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে। টানা বেশ কয়েকদিনের পর্যবেক্ষণের পর এখন সে জানে ওটাই রাঁধুনি। পার্বতী বেশ কয়েকদিনের চেষ্টায় বুঝেছে এরা সব লেবার। ক্ষেতে কাজ করতে আসে সকালে। জল খাবার খেয়ে যায়। দুপুরে আবার খেতে আসে। বিরাট লোহার গেটটা তো সে দেখেইছে। সামনে প্রশস্ত পরিসর। ধুলোওড়া খোলা চত্বর। তার বাঁদিকে রাখা বেশ কয়েকটা ট্রাক্টর। পিক-আপ ভ্যান। আর সম্ভবত আরও বিরাট বড় কোনও গাড়ি। গেটের ডানদিকে রান্নাঘর। রান্নাঘরের গা ঘেঁষে একটা বাড়ি আছে বোধ হয়। হয়তো বা শখের কটেজের মতো। এমনটাই দেখেছিল বলে মনে হয় পার্বতীর। ওখান থেকেই ধিংড়ার দল এক এক করে মদে বিরতি নিয়ে উঠে আসে এদিকে। পার্বতীর ঘরের দিকে। দরজার তালা খুলে দেয় ধরম সিং। তারপর ঘরে ঢুকে আসে একজন। হতে পারে ধিংড়া নিজে অথবা তার পুরনো চার বন্ধুর মধ্যে



এক কোণে থাক করা কয়েকটা প্লাস্টিকের চেয়ার। একটা নামানো মেঝের ওপর। তারই ওপর বসে পার্বতী ভাবে। অজান্তেই তার ভাবনায় উঠে আসে সুস্মিতার মুখ।

কেউ একজন। তাদের সকলকেই চেনে পার্বতী। একজনের তো তার বাবার নামেই নাম। জিতুয়া। বয়সে যদিও বড়ই হবে তার বাবার চেয়ে। বড় সে লম্বায় এবং চওড়ায়ও। সবার চেয়ে বড়। মানে ভারী। তাই পার্বতী সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যখন সে দেখে, দরজা খুলে জিতুয়া ঢুকে আসছে। এই পাঁচজনের বাইরেও লোক আসে আসরে। পানভোজন করে ধিংড়ার ব্যক্তিগত পানশালায় বসে। তারপর মদে বিরতি নিয়ে ঘুরে যায় পার্বতীর ঘর থেকে। ধিংড়ার নির্দেশ মতো সবরকম চেষ্টা চালায় পার্বতীকে তার সহ্য সীমার শেষ দাগে ঠেলে দেওয়ার। যাতে সে বাধ্য হয়ে ভিখ মাগে মৌতের। ধিংড়ার পায়ে পড়ে। কিন্তু পার্বতী এখনও তা করেনি। এখনও সে ভরসা হারায়নি জীবনের উপর থেকে। হয়তো অধৈর্য হয়ে পড়েছে রাঘব ধিংড়া। সে কল্পনাও করেনি পার্বতী এত লম্বা টেনে নিয়ে যাবে এই খেলা। এদিকে ভোট এসে গেছে। সেই কাজে সময় দিতে হচ্ছে বিস্তর। কিন্তু মন পড়ে আছে পার্বতীর দিকে। সে এখন নিজেই চাইছে যে করেই হোক এর একটা অন্ত ঘটাতে। কাস্তের জখম তার শুকিয়ে এসেছে। দাগ যদিও রয়ে গেছে স্থায়ী হয়ে। সেই দাগের দিব্যি খেয়ে সে আজ এসেছে তার দলবল নিয়ে। যাতে আজই হয় এই খেলার শেষ রজনী। সে কথা নিজের মুখে পার্বতীকে বলে গেছে রাঘব ধিংড়া। রোজকার মতো সন্ধ্যা নামতেই বাইরে ধুলোর মাঠে শব্দ ওঠে গাড়ির ইঞ্জিনের। তারপর গেটের তালায় চাবি ঘোরায় লোকটা। গাড়ি ঢুকে আসে ভেতরে। ধুপ ধাপ শব্দে নেমে আসে পিশাচের দল। পার্বতী গোনার চেষ্টা করে পায়ের শব্দ। এক... দুই... তিন..। মনে হয়, পাঁচ। কিন্তু এরপরেও আরও কয়েকটা শব্দ সে ঠাহর করতে পারে। হয়তো সাত। হয়তো আট। হয়তো দুই গাড়ি লোক। হয়তো আর আধঘণ্টা। তার মধ্যেই মদে বিরতি নিয়ে কেউ না কেউ আসবে তার কাছে।

কিন্তু তার অনুমান সত্যি হয় না। আধঘণ্টা সময়ও সে পায় না নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য। তার আগেই দরজায় শব্দ ওঠে তালা খোলার। পার্বতীর বুকটা যেন চুপসে যায় আতঙ্কে। হয়তো আজ অন্যরকম হবে খেলাটা। দরজা খুলতেই পার্বতী দেখে রাঘব ধিংড়া নিজেই দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। তার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। যেন সে তাকিয়ে আছে তার সাত জন্মের দুশমনের দিকে। পার্বতী তেমনই বসে থাকে তার খাটের ওপর। ধিংড়াও দরজায় দাঁড়িয়ে টানতে থাকে সিগারেট। চোখ তার নিবদ্ধ পার্বতীর দিকে। তার নগ্নতার দিকে। সংকোচ নেই কোনও পার্বতীর চাহনিতে। আচরণে। আতঙ্ক, যা দেখতে চায় ধিংড়া মেয়েটার চোখে, তা তো নেই একেবারেই।

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঘরের ভেতর ঢুকে আসে ধিংড়া। তার ইশারায় বাইরে থেকে দরজা টেনে বন্ধ করে দেয় ধরম চাচা। নির্দেশ মতো দাঁড়িয়ে থাকে বাইরে, পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায়। মনে মনে আতঙ্কিত হতে থাকে মেয়েটার কথা ভেবে। প্রস্তুত হতে থাকে অভ্যাস মত পার্বতীর আর্তনাদ শোনার জন্য। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে একে একে সব শব্দই কানে আসে ধরম চাচার। কিন্তু পার্বতী কোনও শব্দ করছে না। তার মুখ দিয়ে সামান্য টুঁ শব্দটাও বের হচ্ছে না, যাতে বোঝা যায় সে কষ্ট পাচ্ছে। অথবা সে বেঁচে আছে। উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে থাকে ধরম চাচা। এক সময় নির্দেশ আসে ভেতর থেকে, ''দরবাজা খোল্।''

ব্যস্ত হাতে দরজা খোলে ধরম চাচা। ভেতরে ধিংড়া বিধ্বস্ত। তখনও অর্ধ উলঙ্গ। কোনও রকমে পাজামার দড়ি বাঁধছে। অসংলগ্ন ভঙ্গিতে বেরিয়ে যায় ধিংড়া। পার্বতী চিৎ হয়ে পড়ে আছে বিছানার ওপর। নড়াচড়া করছে না তার কোনও অঙ্গ। প্রাণের কোনও সাড়াই পাওয়া যাচ্ছে না তার দেহে। ধরম চাচা ভয়ে ভয়ে ডাকে, 'পারতি!'

এক ডাকেই পার্বতী ফিরে তাকায়। ধরম চাচা নিশ্চিত হয়, এখনও সে লাশ হয়ে যায়নি। কিন্তু কতক্ষণ না হয়ে থাকতে পারবে সে জানে না। হয়তো আর কয়েক ধাপ। আজই তো দুই গাড়ি লোক এসেছে তার জন্য। পার্বতী কি পারবে?

ধরম চাচার দায়িত্ব হল এক এক জন বেরিয়ে গেলে পরের জনের জন্য পার্বতীকে প্রস্তুত করা। এতদিনে পার্বতীও বুঝে গেছে সে কথা। তাই আজকাল আর তাকে বলতে হয় না। সে নিজেই বাথরুমে গিয়ে গা হাত পা ধুয়ে নেয় কলের জলে। কিন্তু আজ পার্বতী ওঠে না। হয়তো সে উঠতেই পারছে না। ধরম চাচা কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করে বলে, ''বাথরুম যাওগি?'' সঙ্গে সঙ্গে পার্বতী সটান উঠে বসে। তারপর চৌকি থেকে নেমে সাবলীল হেঁটে বাথরুমে ঢুকে যায়। যেন তার কিছুই হয়নি। ধরম চাচা তাকিয়ে থাকে বিভ্রান্ত হয়ে। হঠাৎ তার ফোন বেজে ওঠে। কানে ধরে সে বলে, 'জি হুকুম। অভি আয়া।' দ্রুত সে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। দৌড় দেয় ধিংড়ার পানশালার দিকে। সেখানে জোড়া টেবিল ঘিরে বসে আছে ধিংড়ার পুরোনো পাঁচ জনের দল। সঙ্গে অতিরিক্ত তিনজন অতিথি। প্রত্যেকের সামনে মদের গ্লাস। অসংখ্য প্লেটে বিভিন্ন খাবারের স্তূপ। ধিংড়া বলে, ''আজ সব রুকেঙ্গে। সোনে কা ইন্তেজাম করো।'' পানশালা থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে ধরম চাচা ভাবে, খতম করেই যাবে আজ। ধরম চাচা কখনও এমন ধরম সংকটে পড়েনি আগে। বহু বছর সে এখানে কাজ করছে। বাকি জীবন এখানেই কাটাবে ভেবে এসেছে বরাবর। কিন্তু এই পার্বতী এসে তার সব ভাবনা গুলিয়ে দিয়েছে। ধরম চাচা ভাবে, তার পাপের বোঝা বাড়ছে। এদের দুষ্কর্মে সেও সমান মদতগার। ওপরওলার বিচারে তারও নরকবাস কেউ আটকাতে পারবে না।

এক সময় আবার নির্দেশ আসে দরবাজা খোলার। নতুন তিন অতিথির একজন গিয়ে ঢোকে। বাকি দুইজন প্রায় লাইনেই দাঁড়িয়ে থাকে বলা যায়। তারা তিনজন পর পর যায় আর আসে। কিন্তু পার্বতী আশ্চর্য রকম শব্দহীন। ধরম চাচা প্রতিবারই ঘরে গিয়ে দেখে পার্বতী নিষ্পলক চেয়ে আছে ঘুলঘুলির দিকে। যেন সে চোখে কোথাও জীবন বলে কিছু নেই। ভয় ভাবনা তো নয়ই।

পুরনো দলের বাকিরাও ঘুরে যায় এক এক করে। বাইরে দাঁড়িয়ে শব্দ শোনে

ধরম চাচা। শিউরে শিউরে ওঠে একা একা। লোক বেরিয়ে গেলেই ছুটে যায় পার্বতীর কাছে। প্রতিবারই দেখে পার্বতী একই রকম। যেন তার কেউ কোনও ক্ষতি করতে পারবে না আর। একবিন্দু বাড়তি যন্ত্রণা কেউ পারবে না তাকে দিতে। কারণ, সেসবের ঊর্ধ্বে চলে গেছে সে। শেষে যদিও তার ভুল ভাঙে। শেষজন ছিল জিতুয়া। সে বিশেষভাবেই যত্ন নেয় ধিংড়ার সবচেয়ে কার্যকরী সাগরেদ হয়ে ওঠার জন্য। তাই হয়তো সে পারে যা আর কেউ পারেনি। পার্বতীকে কাঁদাতে। জিতুয়া বেরিয়ে যেতেই ধরম চাচা পার্বতীর ঘরে ঢুকে দেখে পার্বতীর শরীর কুণ্ডলি পাকিয়ে পড়ে আছে মেঝের ওপর। কান্না চাপার চেষ্টায় টানা গোঙানির মতো আওয়াজ বেরিয়ে আসছে যেন তার অন্তরাত্মা ভেদ করে। ধরম চাচা তাকে তুলে চৌকির ওপর শুইয়ে দেয়। রক্ত উঠে আসছে মুখ দিয়ে। তবুও চোখ দুটো তার খোলা। নিষ্পলক চেয়ে আছে তখনও ঘুলঘুলির দিকে। যেন সে এবার সত্যিই ঘুলঘুলি গলে বেরিয়ে যাবে বাইরে।

ধরম চাচা একটা ব্যথার বড়ি ফেলে দেয় পার্বতীর মুখে। জল দিতে গিয়ে দেখে নিজেরই রক্ত দিয়ে সে বড়ি গিলে নিয়েছে পার্বতী। হাতের জল তার হাতেই রয়ে যায়। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কিছু ক্ষণ। তারপর বলে, ‘‘নাহা লো। ম্যায় খানা লাতা হুঁ।’’

বেশ কিছু ক্ষণ পরে ধরম চাচা ফিরে আসে তার খাবার নিয়ে। ততক্ষণে ব্যথার বড়ি খানিক কাজ করেছে পার্বতীর শরীরে। উঠে বসেছে সে চৌকির ওপর পা ঝুলিয়ে। ঠিক তখনই পিছনে পায়ের শব্দ হয়। দুজনেই চোখ তুলে দেখে রাঘব ধিংড়া এসেছে। নেশায় বেসামাল তার অবস্থা। নিজের ওপরই নিয়ন্ত্রণ নেই। চোখ মুখ থম থম করছে। হাতে সিগারেট জ্বলছে তখনও। ঘরে ঢুকে এসে ধরম চাচাকে বলে, ‘‘বাহার যাও।’’

ধরম চাচা বেরিয়ে যায়। দরজা টেনে দেয় বাইরে থেকে। তালা লাগাতে লাগাতে শোনে ধিংড়া বলছে, ‘‘আজ আখরি রাত সে তন্নে। আখরি রাত।’’

এরপর বাইরে দাঁড়িয়ে চাচা সেই সব শব্দগুলোই শুনতে থাকে যা সে আগেও শুনেছে। তারপর হঠাৎই একটা অচেনা শব্দ শোনে ধরম চাচা। যা আগে শোনেনি। তাই সে দেখতে পায় না শব্দটা। তারপর আরও কিছু অচেনা আওয়াজ তার কানে আসে। কোনওটাই সে শোনেনি আগে। ধরম চাচা বুঝতে পারে না ভেতরে কী হচ্ছে! ধিংড়া বলছিল, আখরি রাত। হয়তো তাই। শেষ হল অবশেষে। কৌতূহলে দরজায় কান পাতে চাচা। কিন্তু ভেতরটা তখনও নিঃশব্দ। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে ধরমচাচা। তারপর দরজায় টোকা দিয়ে ভয়ে ভয়ে বলে, ‘হুকুম!’

কোনও সাড়া নেই। আরও কয়েকবার ডাকে সে। সাড়া নেই। শেষে সাহস করে তালা খোলে চাচা। শেকল নামিয়ে ঠেলা দেয় পাল্লায়। ভেতরে চৌকির ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে পার্বতী। ভয়ঙ্কর রকম শান্ত তার ভঙ্গি। ঘরের ভেতর রাঘব ধিংড়ার কোনও চিহ্ন নেই।

ধরম চাচা ঘরের ভেতর এক পা ঢুকিয়ে বলে, ‘হুকুম?’ পার্বতী ইঙ্গিতে বাথরুম দেখায়। চাচা তাকায় বাথরুমের দিকে। দরজাটা বন্ধ। সে কয়েক পা এগিয়ে যায় সে দিকে। কান পেতে শোনে। কিন্তু কোনও শব্দই হচ্ছে না ভেতরে। ফিরে তাকায় পার্বতীর দিকে। কিন্তু তার চোখ মুখ ভাবলেশহীন। ধরম চাচা আরও কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করে। তারপর বাথরুমের দরজার কাছে গিয়ে ভয়ে ভয়ে ডাকে, ‘হুকুম!’ বেশ কয়েকবার ডেকেও যখন সাড়া পাওয়া যায় না, তখন দরজায় টোকা দেয়। দরজা ভেজানো ছিল। টোকায় সামান্য ফাঁক হয়ে যায়। সেই ফাঁক দিয়ে চাচা দেখে ভেতরে ধিংড়া পড়ে আছে মেঝের ওপর। ব্যস্ত হয়ে সে পুরো দরজা খুলে দেয়। রাঘব ধিংড়ার মাথা ফেটে রক্ত বেরচ্ছে তখনও। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বাথরুমের মেঝে। তার মাথার কাছেই পড়ে আছে চৌকির একটা রক্তমাখা পায়া। ধরম চাচা কিছু করে ওঠার আগেই পার্বতী ছুটে আসে। প্রচণ্ড এক ধাক্কা দেয় তাকে পেছন থেকে। ধিংড়ার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে ধরম চাচা। সেই সুযোগে বাথরুমের দরজা টেনে বন্ধ করে দেয় পার্বতী। লাগিয়ে দেয় ছিটকিনি। বাইরে থেকে শোনে ধরম চাচা করুণ সুরে ডাকছে, ‘পারতি! পারতি!’ পার্বতী এক ছুটে বেরিয়ে আসে বাইরে, খোলা চত্বরে। সোজা সামনে দেখতে পায় বেদির ওপর আলোকিত পানশালা। ভেতরে অনেক লোক বসে আছে। তার পাশেই রান্নাঘর। রান্নাঘরের ডান দিকে সেই বিরাট লোহার গেট। আর কিছু না ভেবেই পার্বতী দৌড় দেয় গেটের দিকে। তার খেয়ালও নেই, তার পরনে কোনও পোশাক নেই। শুধু সে জানে বেরতে হবে এখান থেকে। তাকে বেরতে হবে, বিদেহী আত্মা হয়ে ঘুলঘুলির পথে নয়, রক্তমাংসের শরীর নিয়ে তাকে বেরতে হবে। গেট পেরিয়ে গিয়ে পড়তে হবে ধূ-ধূ মাঠ চিরে চলে যাওয়া ধুলোর রাস্তায়। তারপর সেই রাস্তার ধুলো দু’পায়ে উড়িয়ে তাকে ছুটে যেতে হবে ওই সুদূর দিগন্তের দিকে। যেখানে বাঁশ বনের মাথার ওপর আলতো করে ঝুলে আছে চাঁদ। আর বাঁশের গোড়া ছুঁয়ে বয়ে গেছে প্রবল এক জলধারা, ব্রহ্মপুত্র। তারই জলে সাঁতার কেটে কেটে সে জিতেছে কত পুরস্কার। নেচেছে জলবিহু। একবার সে জলে গিয়ে পড়তে পারলে আর তাকে কেউ ধরতে পারবে না। পানশালা থেকে কেউ বোধহয় দেখে ফেলেছিল পার্বতীকে গেটের দিকে ছুটে যেতে। লোকটা চিৎকার করে ওঠে, ‘ভাগ্ গয়ি!

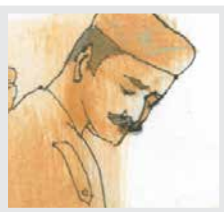


পার্বতী তেমনই বসে থাকে ঠিক যেমনটা তাকে ফেলে রেখে গেছিল রাঘব ধিংড়া আর তার দলবল। দলিত মথিত। ভীষণ রকমের আহত। অথচ জীবন্ত।

ভাগ্ গয়ি!'
ওমনি হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসে কয়েকজন। দৌড় দেয় তারাও গেটের দিকে। পার্বতী ততক্ষণে পৌঁছে গেছে গেটে। খুলে ফেলেছে আগল। তারপর বিরাট ভারী পাল্লা ঠেলে পরিসর বানিয়ে ফেলেছে নিজের রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে বেরিয়ে পড়ার মতো। পর মুহূর্তে সে বাইরে এসে পড়ে। নিজেই সে বিশ্বাস করতে পারেনা সে মুক্ত করতে পেরেছে নিজেকে রাঘব ধিংড়ার কয়েদ থেকে।
পার্বতী দ্রুত হাতে বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয় গেট। তারপর দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে দৌড় দেয় সামনের দিকে। রাত তখন কত ধারণা নেই পার্বতীর। পার্বতীর পায়ের তলায় ধুলোর রাস্তা অস্থির উষ্ণতায় জড়িয়ে নিয়েছে তার নগ্ন পা দুটো। তারই প্ররোচনায় পার্বতী দৌড় দেয় দিগন্তের দিকে। পিছনে তখন প্রবল ধাতব শব্দের কোলাহল। ভেতর থেকে গেট ভেঙে ফেলার উপক্রম করছে নৈশ শিকারির দল। পার্বতী সেসব অগ্রাহ্য করে দৌড় দেয় জ্যোৎস্না মাখা বাতাসের ভেতর দিয়ে। সে শুরু করেছে তার জীবনের শেষ দৌড়। দৌড়তে দৌড়তে পার্বতী অনেকদূর চলে আসে। চারিদিক যদিও একই রকম। জনপ্রাণিহীন এক নৈশ নিসর্গ। কোথাও কোনও ইমারতের চিহ্ন নেই। তবু কিছু শব্দ আসে কানে। কুকুর ডাকে দূরে কোথাও। সুর করে বিলাপ করে শেয়াল। চকিত চিৎকারে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায় পেঁচা। পথের ধারে জোনাকি জ্বলে ঝাঁকে ঝাঁকে। খিদে তেষ্টা আর ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে আসে পার্বতীর শরীর। তার ওপর অত্যাচারের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আর শুধু মনের জোরে অগ্রাহ্য করতে পারে না সে। ভিজে ভিজে লাগে জায়গায় জায়গায়। হয়তো রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়নি তখনও। পথের ধারে একটা গাছ দেখতে পায় পার্বতী। গাছের তলায় ধাপি। ধাপির ওপর কিছু না ভেবেই সে বসে পড়ে। আর বসতেই যেন ভেঙে পড়তে চায় তার শরীর। মাথা ঝুঁকে যায় আপনিই। মাটি যেন টানতে থাকে তার শরীরটাকে নিজের দিকে। ধরাশায়ী করতে চায় তাকে বিশ্রামের অনিবার্য শয্যায়। পার্বতী জেদ করে জেগে থাকে। বসে থাকে। ভাবে একটু ধাতস্থ হয়ে আবার শুরু করবে দৌড়। তবু শরীর তো শরীরই। তার সহ্যেরও সীমা আছে। ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে থাকে পার্বতী। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েও বোকা মেয়েটা। শরীর যদিও তার বসাই থাকে ধাপির ওপর। দুদিকে দুটো হাতের ঠ্যাকনা দিয়ে ঝুঁকে থাকে মাথা। তখনও সজাগ তার ইন্দ্রিয়গুলো। আর তখনই চেনা ফুলের গন্ধ উড়ে আসে। এই গন্ধই লেগে থাকত সারাদিন বিহুর দিনগুলোতে। বিশেষ করে ভোগালী বিহুর সময়। সাদা সাদা বেলফুলের মালা গোছা করে খোঁপায় লাগাত তার মা। লাগিয়ে দিত তার গলায়। অন্য মেয়েরাও লাগাত ফুলের মালা। সবে মিলে এই গন্ধটাই যেন হয়ে উঠত ভোগালী বিহুর গন্ধ। ব্রহ্মপুত্রের ধারে তাদের গ্রামের মাঠে জড়ো হত মেয়েরা। মাঠের মাঝখানে গ্রামের ছেলেরা মেজিঘর বানাতো। বিরাট উঁচু করে। ব্রহ্মপুত্রের জলে ডুব দিয়ে সবাই জড়ো হতো মেজিঘর ঘিরে। আগুন দেওয়া হতো মেজিতে। তারপর আগুন ঘিরে নাচত গাইত সবাই। আর উরুকার দিনে তো পার্বতী ছিল চ্যাম্পিয়ন। কারণ, আসলে তো সে ছিল আধা জলচর। তাই উরুকার মাছ ধরা পরবে কেউ তার নাগাল পেত না। শেষবার এত মাছ ধরেছিল যে কত সাবান মেখেও মাছের গন্ধ তার আর যায় না। মা বলেছিল, আঁশটানি মেয়ে। বাবা বলেছিল, মৎস্যকন্যা। অসমের মৎস্যকন্যা, ব্রহ্মপুত্রই যার ঘর। সেই মেয়ে কীকরে বাঁচবে এমন রুখা মরু প্রদেশে! তাকে তো গিয়ে পড়তেই হবে জলে। ব্রহ্মপুত্রের জীবন মুখর জলে।
হঠাৎ চমকে ওঠে পার্বতী। যেন ঘুম ভেঙে উঠে চোখ মেলে তাকায়। সামনে যা দেখে, ভয়ে শুকিয়ে যায় তার প্রাণটা। একদল রোমশ জন্তু দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে তাদের চোখ। চাপা স্বরে অস্থির কোলাহল তুলছে তারা। যেন পছন্দ করছে না পার্বতীর ওই জায়গায় ওভাবে বসে থাকা। পার্বতী নড়াচড়া করে না। স্থির বসে পাল্টা চেয়ে থাকে জন্তুগুলোর দিকে। ওরাও সম্ভবত বিভ্রান্ত এমন আজব এক জীবকে দেখে। এইভাবে বেশ কিছু সময় কেটে যায়। হঠাৎ ডেকে ওঠে একটা কুকুর। রাস্তার ওপারে খাড়া ফসলের মাঠ। হয়তো বাজরার ক্ষেত। তারই প্রান্তে কোথাও ডেকে ওঠে কুকুরটা। এই জন্তুর দল নিমেষে ঘুরে যায় সেই ডাকের দিকে আর ধেয়ে যায় যৌথ আক্রমণে। চাঁদের আলোয় পার্বতী দেখে, অসহায় একটা কুকুর প্রাণপনে দৌড়াচ্ছে মাঠ পেরিয়ে। আর তার পিছনে ধাওয়া করছে এক পাল হিংস্র জন্তু। সহজ শিকারের গন্ধে পৈশাচিক উল্লাসে তারা ফেটে পড়ছে। যতদূর চোখ যায় পার্বতী দেখে সেই জীবন মরণের দৌড় চলছে তো চলছেই। হয়তো ওপাশে কোথাও গ্রাম আছে। গ্রামে বাড়ি আছে কুকুরটার। বাড়িতে আছে তার প্রিয়জনেরা। একবার সেখানে পৌঁছতে পারলে আর কিছুই করতে পারবে না ওই পিশাচেরা। পার্বতী মনে মনে প্রার্থনা করে যেন কুকুরটা নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে যায়। হয়তো তার সুরক্ষার ক্ষেত্র আছে কোথাও। আছে নিরাপত্তার গণ্ডি। তার যেমন ব্রহ্মপুত্রের জল। একবার যদি সেই জলে গিয়ে পড়তে পারে সে, জগতে আর কেউ কোনও ক্ষতি করতে পারবে না তার। কারণ, তার বাবা বলেছে সে মৎস্যকন্যা। ব্রহ্মপুত্রের জলে সে বিহু নাচে। জল বিহু।
হঠাৎ তার মনে হলো সামনের রাস্তাটা বেশি উজ্জ্বল লাগছে। চাঁদের আলো যেন দ্বিগুণ হয়েছে। বসে বসেই সে ঘাড় ঘোরায় পিছনদিকে। তাকায় মাঠের ওপারে দিগন্তের অভিমুখে। আর চমকে ওঠে। দিগন্তের ওপরে লেগে আছে দু- দুটো চাঁদ। একটার ওপর একটা। দুটোই সমান উজ্জ্বল। দুটোই সমান মায়াময়। তাতেই হয়তো দ্বিগুণ উজ্জ্বল লাগছে রাতের এই নিসর্গ। পার্বতী নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেনা পুরোপুরি। ঘুরে বসে পেছনদিকে। সামনে সোজাসুজি তাকায় একজোড়া চাঁদের দিকে। হতবাক হয়ে কিছু ক্ষণ সে চেয়ে থাকে। তারপর হঠাৎই শিহরণ খেলে যায় তার সারা গায়ে। শিরা ধমনী আর স্নায়ুতন্ত্রের প্রান্তে উপান্তে। মনে পড়ে জোড়া চাঁদ সে আগেও দেখেছে। একাধিকবার দেখেছে। বর্ষায় যখন ডুবে যেত তাদের গ্রাম, আশ্রয় নিত গিয়ে ব্রহ্মপুত্রের উঁচু পাড়ে। ব্রহ্মপুত্র তখন

সীমাহারা। এপার ওপার তার দেখা যায় না। শুধু অনন্ত জলের বিস্তার। এমন সময় চাঁদের রাত চলে আসে কখনও বা। মেঘের পরতও ছিঁড়ে যায়। এলোমেলো অসীম জলরাশির ওপারে চাঁদ ভাসে। ছেঁড়া মেঘ আর বাঁশের বনসুদ্ধু। আর ঠিক তার নিচে ভাসে আর একটা চাঁদ। তার অনুসঙ্গও ছেঁড়া মেঘ। বাঁশের বন। ঠিক যেন দু দুটো চাঁদ উঠেছে দিগন্তে। কিন্তু সবাই জানে আসলে তো তা নয়। চাঁদের ছায়া পড়েছে জলে। এমন অপূর্ব সে ছায়া, যে মনে হয় সত্যিই একজোড়া চাঁদ উঠেছে আকাশে। ব্রহ্মপুত্রের জল যেন তখন আর জল নয়, একটা দিগন্তব্যাপী স্বচ্ছ আয়না। ভাবতে ভাবতে পার্বতীর শিহরণ বেড়ে যায় শত গুণ। উত্তেজনায় সে সটান উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। ধড়াস ধড়াস করতে থাকে তার বুক। তবে কি সামনেই ব্রহ্মপুত্রের জল। সে জলেই পড়েছে চাঁদের ছায়া? আর তাতেই আকাশ জুড়ে জোড়া চাঁদ। পৃথিবী জুড়ে দ্বিগুণ জ্যোৎস্না!

পার্বতী ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকায়। কোনও নিশানদিহি খোঁজে ব্রহ্মপুত্রের। অসমের। তাদের বাঁশ বনঘেরা গ্রাম বুলবুল পুরের। সবচেয়ে উঁচু সেই মেজি ঘরের। উরুকায় ব্যস্ত মানুষজনের। শব্দের একটা হালকা রেশ বাজেও পার্বতীর কানে। যদিও সে ধরতে পারে না কীসের শব্দ। বোঝার চেষ্টায় আরও উৎকর্ণ হয় পার্বতী। আরও উন্মনা। আরও উদভ্রান্ত। আর তখনই ঠাহর করে প্রখর হচ্ছে আলো। আর দেখতে দেখতে হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ে তীব্র আলোর স্রোত আর প্রবল শব্দের কোলাহল। কানে আসে মানুষের কণ্ঠ। তখনই সম্বিত ফেরে পার্বতীর। আর বোঝে একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। দরজা খুলে নেমে আসছে রাঘব ধিংড়ার দলবল। বিপদ বুঝেও সে পালাতে পারে না। যেন জোড়া চাঁদের ঘোর তখনও কাটেনি তার। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। একজন এসে ধরে ফেলেছে তার চুলের মুঠি। টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে গাড়ির দিকে। তারপর পিছন থেকে ঠেলে গাড়ির ভেতর ঢোকানোর চেষ্টা করছে তাকে। শরীরের উর্ধ্বাংশ পেছনের সিটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে পার্বতীর। সিটের ওপর একটা ভারী টর্চলাইট পড়েছিল। সেটাই এক হাতে বাগিয়ে ধরে সে। আর আচমকা ঘুরে গিয়ে টর্চটা দিয়ে প্রচণ্ড এক আঘাত হানে লোকটার মুখের ওপর। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে লোকটা। সরে যায় দুহাতে মুখ চাপা দিয়ে। সেই সুযোগে পার্বতী দৌড় দেয় মাঠে নেমে। আর কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা সেই জোড়া চাঁদের দিকে। রাস্তা ছেড়ে বেশ কয়েকজন লোক তার পিছু ধাওয়া করে।



ধরম চাচা কিছু করে ওঠার আগেই পার্বতী ছুটে আসে। প্রচণ্ড এক ধাক্কা দেয় তাকে পেছন থেকে। ধিংড়ার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে ধরম চাচা।

পার্বতী কিছুই পরোয়া করে না। প্রাণ হাতে করে ছোটে। মানসিক নিয়ন্ত্রণ তার অনেকটাই শিথিল। খানিক সেই রকমই অবস্থা তাদেরও, যারা তাড়া করেছে ওকে। কারণ, তারা নেশা করে আছে। নেশার ঘোরে অনেক ভোঁতা হয়ে গেছে তাদেরও সংবেদনশীলতা। তাতেই হয়তো সুবিধা হয়েছে তাদের তাড়া করতে। না হলে এই গভীর রাতে এই উজাড় ক্ষেতের ওপর দিয়ে এমন উদভ্রান্তের মতো হয়তো দৌড়তে পারত না লোকগুলো। পার্বতী কোনও নেশা করেনি। কিন্তু একই রকম অবসন্নতা তার রক্তে। ভেতর থেকে তারা পিছু টেনে থামাতে চাইছে পার্বতীকে। গভীর রাতের এই স্নিগ্ধ মাটির উপর ফেলে বিশ্রাম করাতে চাইছে তাকে। হয়তো তারই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় ক্রমশ অসংলগ্ন হয়ে আসছে পার্বতীর ভাবনা চিন্তা। তখনই হঠাৎ কানে আসে গালাগাল। অথবা আহত আর্তনাদ। পিছন ফিরে দেখে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এক সাদা কুর্তা। কিন্তু আরও তিনজন ধেয়ে আসছে তার দিকে। আবারও পার্বতী গতি বাড়ায় সামনের দিকে। সোজা তাকায় দিগন্তের পরপারে। সেখানে এখনও লেগে আছে একটা চাঁদ। আর সেই চাঁদের নিচে আরও একটা চাঁদ। এখন আর বেশি দূরেও মনে হচ্ছে না। বরং ভীষণ ভরসা হচ্ছে চাঁদ দেখে। বিশেষ করে নিচেরটাকে দেখে। কারণ, সে আছে জলের ভেতর। যে জলে একবার গিয়ে পড়তে পারলে, সে চোখের পলকে চলে যাবে সবার নাগালের বাইরে। কিন্তু বাস্তবে সে ধরা পড়ার মুখে। লোকগুলোর সঙ্গে তার দূরত্ব ক্রমশ কমে আসছে। অবসন্ন দুটো পায়ের পেশির ওপর সর্বোচ্চ চাপ দিয়েও সে আর বিন্দুমাত্র বাড়াতে পারছে না তার গতি। মনে হচ্ছে শেষ রক্ষা বুঝি বা হল না আর। উল্টো দিকে একেবারে চোখের সামনে এসে গেছে চাঁদটা। আর এক পা এগোলেই তার মুখ লেগে যাবে চাঁদের গায়ে। চাঁদের আলো মেখে যাবে তার গায়ে মাথায়। হয়তো তাতেই উজ্জ্বল লাগে নিজেকে পার্বতীর। যেন সে মানুষ নয়। তাই সে যেতেও চায়না মানুষের কাছে। তাকে ধরতে আসা মানুষগুলোর গ্রাস এড়িয়ে সে চলে যেতে চায় উল্টো দিকে। ওপরের চাঁদ তেমনই থাকলেও নিচেরটা আর নেই শুধু তার ছায়া হয়ে। বদলে সে ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র জলরাশির বিস্তার জুড়ে। গোটাটা জুড়েই চাঁদ যেন ঠেসে বসে আছে জলরাশি ঢেকে। হঠাৎ পার্বতীর খেয়াল হয় জলরাশি বহমান নয়। প্রলম্বিত নয়। অর্থাৎ তাকে নদী মনে হচ্ছে না মোটেই। যেন সে ব্রহ্মপুত্র নয়। তার মতো চোখের সামনে দিয়ে সে বয়ে চলে যাচ্ছে না ভাটির দিকে। বদলে অনড় হয়ে বিছিয়ে আছে তারই পায়ের তলায়। যেন তারই পদার্পণের অধীর প্রতীক্ষায়। পার্বতীর মনে হয় গোটা চাঁদটাই যেন সপাট করে বিছানো আছে তার সামনে। আর কয়েক পা গেলেই পার্বতী পৌঁছে যাবে চাঁদে। হয়তো সেখানেই বসে আছে তার প্রিয়জনেরা

তার পথ চেয়ে।
ওই কিনারার কাছাকাছি যেন সে ঠাহরও করতে পারে তেমনি এক আদল। বাড়িয়ে আছে হাত তার দিকে। কিন্তু উদ্যোগ নেই এগিয়ে আসার। হয়তো পার্বতীর উপরেই ছেড়ে দিতে চায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার। হঠাৎ শিউরে ওঠে পার্বতীর সারা গা। সে চমকে উঠে ভাবে কে সে? যে তাকে কাছে টেনে নিতে চায়! তার মা? যে তাকে বিহুর সাজে দেখতে চায় মেজি ঘরের আগুন ঘিরে নাচতে। নাকি তার বাবা? যে তাকে উরুকার উদ্দামতার মাঝে দেখতে চায় জলের ফোয়ারা ছোটাতে। অথবা রোশন। যে তাকে উৎসবের বর্ণাঢ্য সাজের মতো একটা নতুন জীবন অর্জন করে দিতে চায়। অথবা সোনুয়া। যে তাকে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতে চায় পৃথিবীর মুখের ওপর। যে গোপনে কানে কানে, একান্তে মগ্ন স্বরে তাকে বলতে চায়, 'ম্যায় পারো কা গুলাম!'
হয়তো পার্বতী ভুলেই গেছিল একদল সুগন্ধি মানুষ ধেয়ে আসছে তার পিছনে। তার নাগাল পেতে আর মাত্র কয়েক পা বাকি ছিল তাদেরও। তার পা চাঁদের মাটিতে পড়ার মুহূর্তেই হয়তো তাদেরও পা পড়ে গেছে তার পায়ে। আর তখনই নাগালে পেয়ে ভারী কিছু দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করেছে তার মাথার পিছন দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই তার পা পড়েছে চাঁদের ওপর আর চাঁদ ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে তার ভার সইতে না পেরে। পার্বতী হুড়মুড়িয়ে গিয়ে পড়েছে সেই চাঁদ ভাঙা জলরাশির গভীরতার ভেতর।

#

ভোর ভোর রটে যায় দেহ ভাসছে। পারো দরিয়ার জলে আবার দেহ ভাসছে। আজাদপুর সহ পাঁচটা গ্রামের লোকে সচকিত হয়ে ওঠে খবর শুনে। কারণ এমন খবর তারা আগেও শুনেছিল একবার। সেদিনও এমনই অবিশ্বাস্য তোড়ে বৃষ্টি নেমেছিল সকাল সকাল। এমনই তার ঘনত্ব যে ঝাপসা হয়েছিল দরিয়ার ওপরটা। এমনই ঝাপসা যে গায়েব করে দিয়েছিল একটা আস্ত মানুষকে। তারই খোঁজে জলচর জীবের মতো গোটা দরিয়া সাঁতার দিয়ে চষে ফেলেছিল এক পারো। সে নাকি ছিল জলের দেশের মেয়ে। বছর ঘুরে আবার বৃষ্টি নেমেছে সেই দরিয়ার ওপর। আর সকাল সকাল আবার রটেছে দেহ ভাসছে। হয়তো এই অবিশ্বাস্য সংযোগের জন্যই অগ্রাহ্য করতে পারে না লোকে। আসলে লোকের মনে আছে সোনুয়ার দেহ পাওয়া যায়নি। দরিয়া যতই বড় হোক, আসলে তো বদ্ধ জলাশয়। সেখান থেকে কোথায় যাবে একটা আস্ত মানুষের দেহ। মাঝখানে যে গোটা বছর ঘুরে গেছে, সে কথা মানতে চায়না মানুষের মন মগজ। তাই আজ বৃষ্টিঘন একই রকম সকালে ভাসমান মানব দেহের খবরে দরিয়া পাড়ে জড়ো হয়ে সোনুয়ার দেহই যেন দেখতে চাইছে লোকে। নিজেরই অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে সোনুয়ার নাম।
যদিও সোনুয়ার বাড়ির লোকে তেমনটা ভাবছে না। বিশেষ করে যারা পার্বতীর বাড়ি গেছিল সোনুয়াকে নিয়ে। সেদিনও এই দরিয়া যেন ব্রহ্মপুত্রের রূপ ধরে গায়েব করে দিয়েছিল সোনুয়ার দেহ। বছর ঘুরতে না ঘুরতে আজ আবার সেই রূপ। ভোরবেলা বেরিয়ে ফগনলাল দুধওয়ালা পরিষ্কার দেখেছিল একটা দেহ ভাসছে দরিয়ার জলে। মৃত দেহের পরনে কোনও পোশাক ছিল না। উপুড় হয়ে সেটা ভাসছিল। যেন কিছু খুঁজছে জলের ভেতর। তারপর খবরটা পাঁচটা গ্রামে রটে যেতেই ভিড় জমে গেল। কিন্তু সেই দেহের আর দেখা নেই। ভিড়ের মধ্যেই দাঁড়িয়ে ছিল রোশনও। নিজের পরিবারকে এড়িয়ে, একা একা। সেও অধীর আগ্রহে তাকিয়েছিল দরিয়ার জলের দিকে। যদিও সে জলের ভেতর তার সোনুয়া কাকার দেহ খুঁজছিল না। বরং তার মনের গভীরে কোথাও অন্য আশঙ্কা দানা বাঁধছিল। তার মনে হচ্ছিল পার্বতীর কথা। রোশন নিজে ব্রহ্মপুত্র দেখেনি। দেখেনি তার বানভাসি বা কুয়াশা ঘেরা মায়ারূপ। কিন্তু গল্প শুনেছে পার্বতীর কাছে। পার্বতী ফিরে যেতে চাইত ব্রহ্মপুত্রের কাছে। তার অনন্ত জলের ভেতর সাজানো মঞ্চে আবার গিয়ে নাচতে চাইত জলবিহু।
ভাবতে ভাবতে চোখে জল চলে আসে রোশনের। তোলপাড় করতে থাকে তার বুকের ভেতরটা। পার্বতী যেমন তার বুকের ভেতর বসিয়ে রেখেছিল ব্রহ্মপুত্রকে, সেও বসিয়ে রেখেছিল পার্বতীকে। আজ পার্বতী নেই। কিন্তু তার ব্রহ্মপুত্র যেন রয়ে গেছে তার বুকের ভেতর। তাই হয়ত পার্বতীর চোখ দিয়ে সে দেখতে পাচ্ছে এই দরিয়া। যেন জলছবির মতো এক কলার ভেলা শান্ত গতিতে ভেসে চলেছে উজানের দিকে। ভেলার ওপর কাঁচা বাঁশের সবুজ লগি হাতে দাঁড়িয়ে আছে পার্বতী। তার পরনে লম্বা হাতা লাল ব্লাউজ। লাল পেড়ে সাদা শাড়ি। মাথায় সাদা ফুলের গুচ্ছ মালা। সে এগিয়ে চলেছে স্থির মন্থর বেগে। যেন জলে নয়, বাতাসে ভর করে। ব্রহ্মপুত্রের জলধারা বেয়ে। মেঘের আসনে ঠেস দিয়ে গোলাকার মঞ্চ ঘিরে বসে আছেন অলৌকিক নারী পুরুষেরা। সেই মঞ্চে আজ বিহু হবে। নাচবে অসমের এক মেয়ে, যে বহু বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে অবশেষে রওনা দিয়েছে তার ঘরের পথে। ব্রহ্মপুত্রের অপার্থিব প্রবাহ বেয়ে সে পৌঁছে যাবে অমরালোকের সেই বিহুর আসরে। এই পোড়া দেশের আর কেউ কখনও তার নাগাল পাবে না। রোশনও না। কারণ সে আর রক্ত মাংসের এক মেয়ে নয়। সে অমর কাহিনির কিংবদন্তি এক উপকথা। নাম তার জলবিহু!

*****

হয়তো ব্রহ্মপুত্র নিজেও ফিরে পেতে চাইত পার্বতীকে। আর তো কেউ তার মতো জলবিহু নাচত না গোটা অসম দেশে। তাই সেও বসেছিল পার্বতীর অপেক্ষায়। শেষে ধৈর্য হারিয়ে সে নিজেই মেঘের ভেলা ধরে চলে এসেছে তার খোঁজে। এই পারো দরিয়ার ওপরেই সাজিয়েছে তার জলবিহুর মঞ্চ। আর পার্বতীকে ডেকে নিয়েছে এক অনন্ত বিহুর আসরে যেখানে সে একাই শুধু নাচবে। কারণ গোটা দেশে এক পার্বতী ছাড়া আর কেউ নাচতে শেখেনি এই বিহু। তার একান্ত আপন জলবিহু।

অলংকরণ: সুব্রত চৌধুরী

পার্বণী অন্নভোজ

দেশের নানা পার্বণের অভিনব কিছু রাইস ডিশের খোঁজ দিলেন ফুড হিস্টোরিয়ান **তনুশ্রী ভৌমিক**। সংকলনে **উপমা মুখোপাধ্যায়**।

গোটা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রধান খাদ্য ভাত। জাত, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি নির্বিশেষে যা জীবন যাপন ও ধারণের মূল কান্ডারি, তার উপযোগিতা আর শুধুমাত্র খাদ্যগুণে সীমাবদ্ধ থাকে না। তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলে, 'অন্নমভৈপ্রাণহ্'। অর্থাৎ, সমস্ত প্রাণশক্তি আসে খাদ্য থেকে। ধান ও তা থেকে তৈরি ভাতের মৌলিক গুণাবলীর কারণে একে সমৃদ্ধি এবং উর্বরতার প্রতীক মানা হয়। নানাভাবে ব্যবহার করা হয় ধর্মীয় আচার, সামাজিক অনুষ্ঠানেও। চাল আর যব অথর্ববেদে বর্ণিত হয়েছে স্বর্গের দুই অমর পুত্র হিসেবে। এখানে 'ক্ষীরাওদান'-এর উল্লেখ আছে, যা





আসলে দুধে রাঁধা ভাত। উল্লেখ রয়েছে 'পুরাদাসা', অর্থাৎ চালের পিঠের। কথিত আছে এই 'পুরাদাসা' দেবতাদের নৈবেদ্য হিসাবে অর্পণ করা হয়। বৈদিক সাহিত্যেও ধান-ভিত্তিক পণ্যের উল্লেখ রয়েছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চাল না রেঁধেই ব্যবহারের রীতি, তবুও কোনও বিশেষ আচারের অঙ্গ হিসেবে তা রান্নাও হয়। হিন্দু ধর্মীয় পূজাপাঠে ব্যবহৃত হয় সিঁদুর আর হলুদ লেপা চাল। ধান থেকে ভাত হওয়ার সময়কে তুলনা করা হয় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কালের সঙ্গে। ঋতুর শুরুতে ধান বোনা থেকে ঘরে তোলা পর্যন্ত কৃষিচক্র উদযাপিত হয় প্রায় প্রতিটি প্রদেশে। মকর সংক্রান্তিতে, তামিলনাড়ুতে 'পোঙ্গল', গুজরাতে 'উত্তরায়ণ', পঞ্জাবে 'লোহরি', উত্তরপ্রদেশে 'খিচড়ি', কাশ্মীরে 'শিশুর সেনক্রাত', হিমাচলে 'মাঘা সাজি', অসমে 'মাঘ বিহু' এবং বাংলার 'পৌষ সংক্রান্তি' — সবগুলোই ফসল কাটার উৎসব। জানুয়ারিতে সূর্যের উত্তরায়ণের সময় এই উৎসবগুলির পর এপ্রিলে পঞ্জাবের 'বৈশাখী', বাংলার 'পয়লা বৈশাখ' বা অসমের 'রঙ্গালি বিহু' আসলে নতুন সূচনার আহ্বান, ফসল দেওয়ার জন্য চিরন্তনী শক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। কেরলে অগস্ট-সেপ্টেম্বরে 'ওনাম' পালিত হয়। ইতিহাস বলে, সেটি কিংবদন্তি সম্রাট মহাবলীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের উৎসব। আদতে এ-ও আর এক হারভেস্ট ফেস্টিভ্যাল। একই সময় অসমে ফসল রক্ষার কামনায় পালিত হয় 'কাটি বিহু'। নভেম্বরের কাছাকাছি বাঙালিরা 'নবান্ন' উদ্‌যাপন করে, ওড়িয়ারা পালন করে 'নুয়াখাই'। নভেম্বর-ডিসেম্বরে পালিত 'না-খুয়া ভুজ', অসমের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ফসল কাটার উৎসব।

'অন্ন' শুধু আহার্য নয়। রোজনামচার নামান্তর, আদিশক্তির আধার। ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে কখনও বিশেষ উৎসবে এমন ভোগ দেওয়া হয়, যার মূল উপকরণ চাল। কখনও চাল থেকে তৈরি ভোগ দেওয়া সেখানকার নিত্য আচার। এমনই কিছু পদের কাছাকাছি পদ রি-ক্রিয়েট করার চেষ্টা হল।



কেশরি ভাত

রাজস্থানের ছড়ভুজা মন্দিরে বিষ্ণু পূজিত হন ছড়ভুজা নাথজি রূপে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় তাঁর 'বিরাট' রূপের আদলে তৈরি এই মূর্তি। ভোর পাঁচটার মঙ্গলারতির সময় তাঁকে মাখন-মিছরি ভোগ দেওয়া হয়। আর কেশরি ভাত দেওয়া হয় দুপুর ১২টার 'রাজভোগ'এ। সঙ্গে মিষ্টি লস্যি, সাদা ভাত। ঠাকুরনাথজির ভোগঘরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিখ্যাত পদ হল এই কেশরি ভাত।

■ **উপকরণ:** কেশর ১ গ্রাম, বাসমতি চাল (ভিজিয়ে রাখা) ১ কাপ, ঘি ১ টেবলচামচ, কিশমিশ ২ টেবলচামচ, কাজুবাদাম ৭-৮টা, সুইটনার ৮ টেবলচামচ, এলাচ পাউডার ১/২ চা-চামচ, সুগার ক্রিস্টাল ২৫ গ্রাম।

■ **প্রণালী:** ১ টেবলচামচ গরম জল নিন। তাতে কিছুটা কেশর গুলে নিন। এবার কড়াইতে ঘি নিন। গরম হলে কাজু আর কিশমিশ দিয়ে নেড়েচেড়ে নিন। একটা পাত্রে সেগুলো রেখে দিয়ে ওই ঘি-তেই বাসমতি চাল দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। এরপর কড়াইতে দেড় কাপ ফুটন্ত জল দিন। সঙ্গে দিন কেশর-গোলা জল। চাল আধসেদ্ধ হলে সুইটনার দিন। জল শুকিয়ে চাল পুরোপুরি সেদ্ধ না হওয়া অবধি রান্না করুন। এলাচ পাউডার ছড়িয়ে ভালভাবে মিশিয়ে নিন। উপরে কাজুবাদাম, কিশমিশ আর সুগার ক্রিস্টাল ছড়িয়ে গার্নিশিং করলেই তৈরি কেশরি ভাত।

কাশ্মীরি তাহার

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের হাতে বানানো এই সুস্বাদু পদ 'তেহরি' ও 'নভিদ' নামেও পরিচিত। শুধু উৎসবের দিনেই নয়, জন্মদিনের মতো অনুষ্ঠানেও এটি রান্না করা হয় ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য। পুজো শেষের পরে হলুদ ভাতের ছোট মণ্ড তৈরি করে 'তাহারি মেট' নামে পরিবেশন করা হয়। খাওয়ার আগে সরিয়ে রাখা হয় পাখির খাওয়ার জন্য। জিভে জল আনা এই 'তাহার' কাশ্মিরী সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

■ **উপকরণ:** বাসমতি চাল ২ কাপ, হলুদ গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, নুন ১ চা-চামচ, সর্ষের তেল ১ টেবলচামচ, গোটা জিরে ১/৪ চা-চামচ, ছোট এলাচ ৪টে, দারচিনি ১ ইঞ্চি, লবঙ্গ ৪-৫টা, জল ২১/২ কাপ।

■ **প্রণালী:** ৪ কাপ জল নিন। তাতে বাসমতি চাল ১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। একটা তলা-ভারী পাত্রে চাল আর ২১/২ কাপ জল দিন। সঙ্গে দিন হলুদ আর নুন। ভালভাবে ঘেঁটে নিন। এবার পাত্রের ঢাকনা শক্ত করে বন্ধ করুন। চাল সেদ্ধ হয়ে আসা অবধি মাঝারি আঁচে রান্না করতে থাকুন। এবার ঢাকনা খুলে কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। দেখবেন, চালের লম্বা দানাগুলো যাতে ভেঙে না যায়। এরপর অন্য কড়াইতে সর্ষের তেল দিন। তেল গরম হলে তাতে গোটা জিরে, ছোট এলাচ, দারচিনি আর লবঙ্গ দিয়ে দিন। ওতে সেদ্ধ করা চাল দিয়ে অল্প নেড়েচেড়ে নিন। আলু বা পনিরের সাইড ডিশের সঙ্গে পরিবেশন করুন কাশ্মীরি তাহার।





একাবর্ণী

'বর্ণী' শব্দটির অর্থ পাত্র। 'একাবর্ণী' পদটি তাই রান্না হয় একটি পাত্রের মধ্যে। পুরী মন্দিরের জগন্নাথ দেবকে প্রতিদিন যে 'ছাপান্নভোগ' প্রদান করা হয়, তারই একটি হল এই 'একাবর্ণী'। রাঁধার সময়ে হাঁড়ির ভিতর খুন্তি জাতীয় কিছু দিয়ে নাড়াচাড়া না করাই রীতি। আয়ুর্বেদে ঋতুর পরিবর্তন অনুসারে খাওয়া-দাওয়া করার যে বিধান দেওয়া আছে, এই পদটির প্রণালী আর উপকরণ প্রস্তুত হয়েছে সেই বিধান মেনেই। সব সব্জির মধ্যে মুলো দেওয়াটা আবশ্যিক। শীত আসার আগের সময়টায় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যে যে শাক-সব্জি পাতে রাখা আবশ্যক, উপকরণ হিসেবে এখানে থাকে সেই সব কিছুই।

■ **উপকরণ:** গোবিন্দভোগ চাল ১ কাপ, মুগ ডাল ও ছোলার ডাল (মেশানো) ১/৪ কাপ, নারকেল (কুরনো) ১/২ কাপ, পটল, মুলো, ঝিঙে (মেশানো) ১ কাপ, আদা (ছেঁচে নেওয়া) ১ চা-চামচ, গোটা জিরে ১/২ চা-চামচ, হিং ১/৪ চা-চামচ, ঘি ৩ টেবলচামচ, কমলালেবুর রস ১/২ কাপ, সৈন্ধব লবণ স্বাদমতো।

■ **প্রণালী:** হাঁড়িতে (মাটির হলে ভাল হয়) গোবিন্দভোগ চাল, মুগ ডাল, ছোলার ডাল, কুরনো নারকেল, সব্জি আর মশলা দিয়ে দিন। এবার ৩ কাপ জল দিন। হাঁড়ির মুখটা ঢেকে দিন। চাল আর ডাল পুরোপুরি রান্না হওয়া অবধি ঢিমে আঁচে রান্না করুন। এরপর ঘি আর কমলালেবুর রস ছড়িয়ে ভালভাবে নেড়েচেড়ে নিন। আরও দু'মিনিট রান্না করে নামিয়ে নিন। গরম গরম পরিবেশন করুন।



মুনিয়াণ্ডি ভিলাস মাটন বিরিয়ানি

তামিলনাড়ুর মাদুরাই জেলার তিরুমঙ্গলম তালুকের একদম মাঝখানে অবস্থিত মুনিয়াণ্ডি স্বামী মন্দির। গত ৮৩ বছর ধরে এই মন্দির বহন করে চলেছে এক বিশেষ আচার, যা একাধারে খানিক অদ্ভুতও বটে! প্রসাদ বলতে যেখানে আমরা শুধু নিরামিষ পদই বুঝি, সেখানে এই মন্দিরে প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে তিনদিন ধরে চলে 'মাটন বিরিয়ানি ফেস্টিভ্যাল'। সারা রাত রান্নার পর ভোর ৪টেয় ভোগ হিসেবে ঠাকুরকে নিবেদন করা হয়। শুধুমাত্র ভক্তদের জন্য নয়, যাঁরাই ভাদাক্কামপট্টিতে আসেন তাঁদের সকলকেই প্রসাদ হিসেবে দেওয়া হয় এই বিরিয়ানি।

■ **উপকরণ:** মাটন ৫০০ গ্রাম, জিরাগা সাম্বা চাল ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ (জুলিয়েন করে কাটা) ১টা, টমেটো (ছোট, কুচনো) ১টা, রসুন ৩ কোয়া, লবঙ্গ ১-২টো, আদা ২ টুকরো, পুদিনাপাতা ১/২ গোছা, ধনেপাতা ১/৪ গোছা, কাঁচালঙ্কা ৪টে, লঙ্কা গুঁড়ো ১১/২ চা-চামচ, ধনে গুঁড়ো ১ চা-চামচ, রিফাইন্ড ভেজিটেবল অয়েল ১/৪ কাপ, নারকেলের দুধ ১/২ কাপ। **ম্যারিনেট করার জন্য:** দই ১/৪ কাপ, লেবুর রস ১/২ টেবলচামচ, কাঁচা পেঁপে (পেস্ট করা) ১ টুকরো, হলুদ ১/২ চা-চামচ। **ড্রাই রোস্ট করার জন্য:** তেজপাতা ১টা, দারচিনি ১ ইঞ্চি, লবঙ্গ ৪টে, মৌরি ১/২ চা চামচ, গোলমরিচ ১/৪ চা-চামচ, জিরে ১/২ চা-চামচ।

■ **প্রণালী:** প্রথমে মাটন ভাল করে ধুয়ে নিন। তার সঙ্গে দই, লেবুর রস, কাঁচা পেঁপের পেস্ট, হলুদ এবং সামান্য নুন মিশিয়ে নিন। এবার কিছু ক্ষণ ম্যারিনেট করে রাখুন। কমপক্ষে ৪ ঘণ্টা বা সম্ভব হলে সারারাত ওইভাবে রেখে দিন। অন্যদিকে চাল ধুয়ে নিন। চালের মধ্যে যাতে জল ঢুকতে পারে, সে জন্য ওই অবস্থায় কমপক্ষে ২০ মিনিট রেখে দিন। এরপর জল ঝরিয়ে নিয়ে চালগুলোকে একটা প্লেটে ভাল করে ছড়িয়ে দিন। এর ফলে চাল তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে। এবার কড়াইতে তেল না দিয়ে শুকনো খোলায় তেজপাতা, দারচিনি, লবঙ্গ, মৌরি, গোলমরিচ আর জিরে কিছু ক্ষণ নেড়েচেড়ে ভেজে নিন। হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। ঘরে রেখে মিশ্রণটি স্বাভাবিক তাপমাত্রায় নিয়ে আসুন। এবার শুকনো মশলার এই মিশ্রণটি শিলনোড়ায় গুঁড়ো করে নিন। তারপর মশলাটিকে এয়ারটাইট জারে রেখে দিন। এবার একটা বড় কড়াইতে ১/৪ কাপ তেল দিন। তেল গরম হলে তাতে জুলিয়েন করা পেঁয়াজ দিয়ে দিন। যত ক্ষণ না তাতে বাদামি রং আসে, তত ক্ষণ অবধি ভাজুন। একটা চামচ দিয়ে ভাজা পেঁয়াজের অর্ধেকটা অন্য একটা প্লেটে সরিয়ে রাখুন। এরপর গ্রাইন্ডারে কিছুটা পুদিনা, ধনে, রসুন, আদা এবং চারটে কাঁচালঙ্কার সঙ্গে অল্প জল দিয়ে ভালভাবে পেস্ট করে নিন। এবার কড়াইয়ে রাখা বাকি পেঁয়াজ ভাজায় তৈরি করা পেস্টটা দিয়ে দিন। গুঁড়ো করে নেওয়া মশলায় বাকি থাকা কাঁচালঙ্কা আর টমেটো কুচি দিয়ে দিন। টুকরোগুলো নরম হয়ে আসা অবধি নাড়তে থাকুন। এবার এতে ম্যারিনেট করা মাটন দিয়ে দিন। সঙ্গে দিন দই, লেবুর রস, কাঁচা পেঁপের পেস্ট আর হলুদ। মাঝারি আঁচে ভাজতে থাকুন, যতক্ষণ না মাংস হালকা সোনালি বাদামি রঙের হয়। এরপর ২ কাপ জল ও নারকেল দুধ দিয়ে দিন। স্বাদমতো নুন দিন। কড়াইয়ের মুখটা ঢাকনা দিয়ে শক্ত করে ঢেকে দিন। মাঝারি থেকে ঢিমে আঁচে রান্না করুন যত ক্ষণ না ভাত ৭০% সেদ্ধ হয়ে আসে। এবার এতে আগে থেকে সরিয়ে রাখা ভাজা পেঁয়াজ দিয়ে দিন। সঙ্গে দিন পুদিনাপাতা। ঢাকনাটা আবার আটকে দিন। এরপর একটা ভারী তাওয়া আঁচে বসান। গরম হলে তার উপরে ভাত সহ কড়াইটা বসিয়ে দিন। কম থেকে মাঝারি আঁচে এক ঘণ্টা রান্না করুন। আঁচ বন্ধ করে আরও ১০ মিনিট রাখুন। গরম গরম পরিবেশন করুন।





মকর চাউল

প্রতি বছর ১৪ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তি পালিত হয় দেশজুড়ে। শীতের শেষদিকে ওই সময়টায় ঘর ভরে ওঠে নতুন ধানে। আচার-অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে এই দিনে ওড়িশার প্রতিটি ঘরে ঘরে তৈরি হয় ঐতিহ্যবাহী 'মকর চাউল'। নতুন ধান ভেনে পাওয়া কাঁচা চালের সঙ্গে গুড়, দুধ, ছানা, কলা আর আখ দিয়ে তৈরি হয় সুস্বাদু এই পদ। 'টেসু পুজো'র নৈবেদ্য হিসেবে ঠাকুরের পায়ে অর্পণ করা হয়। সদ্য ঘরে তোলা ধানের উৎসব আর সেই উৎসবের অভিনব পদ, দুইয়ে মিলে নতুনের আহ্বান হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ।

■ **উপকরণ:** গোবিন্দভোগ চাল ১ কাপ, দুধ ১ ১/২ কাপ, নারকেল (কুরনো) ৩/৪ কাপ, পাকা কলা ৩টে, আপেল (টুকরো করা) ১/৪ কাপ, আখ (টুকরো করা) ১/৩ কাপ, চিনি ৩/৪ কাপ, ছানা ১ কাপ, বেদানা ২ টেবলচামচ, এলাচ পাউডার ১ চা-চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, আদা (ছেঁচে নেওয়া) ১ চা-চামচ।

■ **প্রণালী:** চাল ভিজিয়ে রাখুন। ২ ঘন্টা রেখে শুকিয়ে নিন। এবার ওতে কুরনো নারকেল আর অল্প দুধ দিয়ে বেটে নিন। আপেল কুচি, ছানা, চিনি, বেদানা, গোলমরিচ গুঁড়ো, আদা দিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে ১০ মিনিট রাখুন। পরিবেশনের আগে পাকা কলা যোগ করলে এই নির্ঝঞ্ঝাট পদের স্বাদ বাড়বে আরও।

পাঁচমেওয়া খিচুড়ি

খিচুড়ি নাকি রাধাবল্লভের সবচেয়ে প্রিয় খাবার। গোটা পৌষ মাস ধরে প্রতিদিন মঙ্গলারতির পরে এই পাঁচমেওয়া খিচুড়ি শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ দেওয়া হয়। বৃন্দাবনের রাধাবল্লভ মন্দিরের এই 'খিচুড়ি মহোৎসব' শুরু হয় ৩০০ বছর আগে, মহারাজা কমল নয়নের হাত ধরে। বৈষ্ণব পুরাণেও রাধার পাঁচমেওয়া খিচুড়ি রান্নার বর্ণনা রয়েছে। বৃন্দাবন মন্দিরের বিভিন্ন রীতিনীতির অন্যতম এক অঙ্গ হয়ে উঠেছে এই বিশেষ রন্ধন প্রক্রিয়াটি।

■ **উপকরণ:** বাসমতি চাল ১ কাপ, মুগ ডাল ১/৪ কাপ, ছোলার ডাল ১/৪ কাপ, কাজুবাদাম, আখরোট, পেস্তা, আমন্ড, সাদা তিল, কিশমিশ, পাইন নাট, চারমগজ (মেশানো) ১১/২ কাপ, ঘি ১/২ কাপ, হলুদ গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, জায়ফল ও জয়িত্রী ১/৪ চা-চামচ, এলাচ পাউডার ১/৪ চা-চামচ, ছোট এলাচ (গোটা) ৪টে, দারচিনি স্টিক ১ ইঞ্চি, গোটা লবঙ্গ ৪-৫টা, গোটা জিরে ১/৪ চা-চামচ, গোটা গোলমরিচ ৪-৫টা,
নুন স্বাদমতো।

■ **প্রণালী:** প্রথমে চাল আর ডাল ধুয়ে নিয়ে জল ফেলে দিন। একটা তলাভারী পাত্রে ১/৪ কাপ ঘি দিন। গরম হলে আঁচ কমিয়ে চাল আর ডাল দিয়ে দিন। ৪ থেকে ৫ মিনিট ভাজুন। হলুদ দিয়ে নেড়েচেড়ে নিন। ৩ কাপ জল আর নুন দিয়ে পাত্রের মুখ ঢেকে দিন। পুরোপুরি রান্না হওয়া অবধি ঢিমে আঁচে রান্না করুন। মাঝেমধ্যে একটু ঘেঁটে নিন যাতে পুড়ে না যায়। এবার অন্য কড়াইতে বাকি ঘি দিয়ে তাতে গোটা মশলাগুলো দিয়ে দিন। কিছু ক্ষণ নেড়েচেড়ে নিয়ে বাদামের মিশ্রণটি দিয়ে দিন। শেষে দিন সাদা তিল আর পাইন নাট। বাদামি হয়ে আসা অবধি ভাজতে থাকুন। এবার খিচুড়িতে ভাজা বাদাম, কিশমিশ আর ঘি দিন। উপরে হলুদ গুঁড়ো আর এলাচ পাউডার ছড়িয়ে ৫ মিনিট রান্না করলেই তৈরি পাঁচমেওয়া খিচুড়ি। সঙ্গে দিতে পারেন আচার, পাঁপড়, তিলের নাড়ু বা ক্ষীর।



রেসিপি সৌজন্যে: শেফ প্রদীপ রোজ়ারিও
যোগাযোগ: ০৩৩-২৩২০৩৪৪৪
ছবি: শুভেন্দু চাকী





যেভাবে হল কুমোরটুলি

ঐতিহ্যের মিলন বা ঠাকুর দেখার হিড়িক, কোনওদিক থেকেই পিছিয়ে নেই কুমোরটুলি। কীভাবে গড়ে উঠল আজকের কুমোরটুলি? খোঁজার চেষ্টায় **অনিকেত গুহ**।

উত্তর কলকাতার গ্যালিফ স্ট্রিট ক্রসিং থেকে ডান দিকে ট্রাম লাইন বরাবর যে রাস্তাটা চলে গিয়েছে এককালে তারই নাম ছিল চিৎপুর রোড, বর্তমানে যাকে আমরা রবীন্দ্র সরণি নামে জানি। উত্তর কলকাতার বহু স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই রাস্তার দু'ধারে। বাগবাজার মায়ের ঘাট। আরও একটু এগোলে কাশী মিত্র ঘাট। এবং তারপরই ভেজা মাটির গন্ধ আর কাঠের টুকটাক শব্দ আপনাকে যখন ব্যাকুল করে তুলবে, বুঝবেন আপনি এসে পড়েছেন কুমোরটুলিতে, যেখানে মাটির প্রলেপ, বাঁশের কাঠামো আর মানুষের অক্লান্ত ভালবাসায় প্রাণ পায় বাঙালির বারো মাসের পার্বণ। উত্তর কলকাতার যে অঞ্চলে আজকের কুমোরটুলির অবস্থান অতীতে তার পরিসর ছিল আরও বড়। যখন কলকাতা বলতে শুধুই গোবিন্দপুর ও সুতানুটি বোঝাত, যখন এ শহর সেভাবে 'তিলোত্তমা' হয়ে ওঠেনি, কুমোরটুলি









গড়ে ওঠার শুরুটা ঠিক সেই সময়ের। সঙ্গে জড়িয়ে কত ঘটনাপ্রবাহ, কত রোমাঞ্চকর কাহিনি! শোনা যায়, আঠারো শতকে ফরাসি, ব্রিটিশ থেকে ওলন্দাজ, সব জাহাজই এসে উঠত কলকাতার এই অঞ্চলের গঙ্গার ঘাটগুলোতে। আজও গঙ্গার ধারের ভগ্নপ্রায় ফলকগুলো সেই ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে।

সাদা কলকাতা, কালো কলকাতা!

কুমোরটুলির অন্দরে প্রবেশের আগে পুরনো কলকাতা নিয়ে একটা মজার ঘটনা শেয়ার করি। এখন যেমন দুর্গাপুজোর সময় জোর টক্কর চলে উত্তর আর দক্ষিণে, ইতিহাস বলছে সে কালে এই শহর উত্তর বা দক্ষিণ নয়, বরং বিভক্ত ছিল সাদা ও কালোতে। ব্যাপারটা ঠিক কী? আসলে কলকাতায় আঠেরো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ব্রিটিশদের বসতি বাড়তে থাকে। তারা সাহেব-সুবো মানুষ। ঘিঞ্জি অঞ্চল তাদের মোটেই পছন্দ নয়! তাই কলকাতার অপেক্ষাকৃত ফাঁকা ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় তৈরি হতে থাকে তাদের ঘরবাড়ি। এসপ্লানেড, পার্ক স্ট্রিট বা থিয়েটার রোড সংলগ্ন এলাকাগুলো হয়ে ওঠে সাহেবদের পছন্দের জায়গা। ক্রমে কলকাতার এই অংশই হয়ে ওঠে 'হোয়াইট টাউন'। অন্যদিকে, শহরের উত্তরে থাকতেন এখানকার আদি বাসিন্দারা। তুলনায় ঘিঞ্জি ও লোকসংখ্যা বেশি। কলকাতার এই অঞ্চলকে ব্রিটিশরা বলত 'ব্ল্যাক টাউন'।

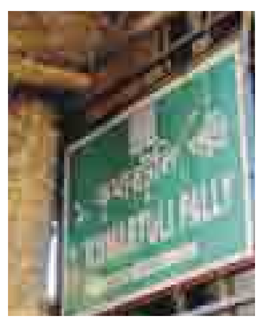
আস্তে আস্তে এই অঞ্চলগুলোয় বিভিন্ন পেশার মানুষ ভিড় করতে থাকে। রাতারাতি একপ্রকার নামও হয়ে যায় জায়গাগুলোর। এই যেমন ধরুন, যেখানে গোয়ালা অর্থাৎ আহিরদের বসবাস ছিল সেই জায়গায় নাম হল আহিরীটোলা (বাংলা অভিধান অনুযায়ী 'টুলি' শব্দের অর্থ পল্লী বা ছোট জায়গা। অন্যদিকে 'টোলা' হল অপেক্ষাকৃত বড় জায়গা), যেখানে দর্জিদের বাস তার নাম হল দর্জিপাড়া, যেখানে তেলের ব্যবসাদাররা (কলু) থাকতেন সেই স্থান হল কলুটোলা আর যেখানে কুমোরদের স্বর্গরাজ্য সেই জায়গার নাম হল কুমোরটুলি। তাহলে ভেবে দেখুন, আজকের কুমোরটুলি, যেখানে বহু কেতাদুরস্ত শিল্পীর যাতায়াত, দিনরাত লোকের সমাগম, ব্রিটিশ ভারতে সেটাই ছিল কি না ব্ল্যাক টাউনের অংশ!



শুরুটা যেমন...

প্রথমেই বলেছি আজকে কুমোরটুলি বলতে আমরা যে জায়গাটা বুঝি, অতীতে তার বাউন্ডারি ছিল আরও বড়। প্রাচীন কলকাতার গোবিন্দপুরের প্রায় বেশিরভাগ অংশ নিয়েই ছিল এই কুমোরদের বাস। যদিও বর্তমানে কুমোরটুলির অবস্থান একেবারে গঙ্গার পাড় বরাবর। ষোলো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সরস্বতী নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হতে থাকে। এককালে বাংলার ব্যবসার কেন্দ্র সপ্তগ্রাম বন্দর তার জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। ফলে সপ্তগ্রামের বাসিন্দারা এই গোবিন্দপুর অঞ্চলে নতুন করে ঘরবাড়ি তৈরি করতে থাকে। প্রথমেই আসে সুতো কাপড়ের ব্যবসায়ীরা। তার পিছু পিছু আসে কিছু মৃৎশিল্পীর পরিবার। যদিও প্রথমদিকে তারা হাঁড়ি, কলসি তৈরিতেই ব্যস্ত থাকত। সেকালের গোঁড়া হিন্দুদের মাটির বাসনের চাহিদাও ছিল বিস্তর। ধীরে ধীরে এই মৃৎশিল্পীদের ব্যবসা বাড়তে থাকে। সঙ্গে বাড়তে থাকে পরিবারও। কিন্তু তাল কাটল ১৭৫৯ সালে এসে। পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজের চরম পরাজয়ের পর রবার্ট ক্লাইভ কোম্পানির পক্ষ থেকে এক ফরমান জারি করলেন। তাতে বলা হল, কলকাতা শহরের পুর্নগঠনের জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের গোবিন্দপুর ছাড়তে হবে। অগত্যা সেখানকার মৃৎশিল্পীরা চলে আসলেন কলকাতার আরও উত্তরে, বাগবাজার ও বিডন স্ট্রিটের মাঝামাঝি একটা অঞ্চলে। কালক্রমে সেই জায়গাই

পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজের চরম পরাজয়ের পর রবার্ট ক্লাইভ কোম্পানির পক্ষ থেকে এক ফরমান জারি করলেন। তাতে বলা হল, কলকাতা শহরের পুর্নগঠনের জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের গোবিন্দপুর ছাড়তে হবে। অগত্যা সেখানকার মৃৎশিল্পীরা চলে আসলেন কলকাতার আরও উত্তরের দিকে।



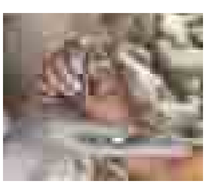


কুমোরটুলির গঙ্গাপ্রসাদ ভবনের সেই প্রস্তরফলক

এক থেকে দুই, দুই থেকে দশ

সময়টা ১৭২০-র কিছু পর। উত্তর কলকাতায় তখন নামজাদা বনেদি পরিবারের বাস। পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ বাড়ি, হাটখোলার দত্ত বাড়ি, কুমোরটুলির মিত্র বাড়ি আরও কত কী! এই মিত্র বাড়ির প্রথম পুরুষ গোবিন্দরাম মিত্র তাঁর বিখ্যাত নবরত্ন মন্দিরের কাজ শুরু করলেন। তখনকার সময়ে দাঁড়িয়ে এই মন্দির ছিল এক বিস্ময় স্থাপত্য। উইলিয়াম হিকি সাহেবের আঁকাতেও উল্লেখ রয়েছে এই মন্দিরের। একে মন্দির, তায় এত উঁচু! দেখে চোখ কপালে উঠেছিল তৎকালীন ব্রিটিশদেরও। তারা এর নাম দিল 'ব্ল্যাক প্যাগোডা'। পলাশীর যুদ্ধের পর গোবিন্দরাম মিত্র উত্তর কলকাতার বুকে তৈরি করলেন এক সুবিশাল অট্টালিকা। এবং তার জন্য তিনি প্রায় ৫০ বিঘা জঙ্গল কেটে সাফ করলেন। এই বিস্তৃত অঞ্চলেই ধীরে ধীরে মৃৎশিল্পীরা আসতে থাকেন। প্রথমে আসেন গোবিন্দপুরের শিল্পীরা। পরে হুগলি, নদিয়া, কৃষ্ণনগর থেকে দলে দলে মৃৎশিল্পীরা এখানে এসে বসতি গড়ে তোলেন। আগেই বলা হয়েছে, এই স্থানে বহু বনেদি পরিবারের বাস। ফি-বছর সেই বাড়িগুলোতে ঘটা করে পালিত হত দুর্গাপুজো। কার বাড়ির ঠাকুর বেশি বড়, কোন বাড়ির জাঁকজমকই বা বেশি, এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে রীতিমতো রেষারেষি চলত। প্রতিমা তৈরির বরাত যেত কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ বা শান্তিপুরের শিল্পীদের কাছে। তাঁরা পুজোর কয়েক মাস আগে থেকে সপরিবারে আসতেন। প্রতিমা তৈরি করে, পুজো কাটিয়ে আবার চলে যেতেন। কিন্তু বনেদি বাড়ির ঠাঁটবাট-ই যে আলাদা! তাই শুধু দুর্গাপুজো নয়, ধীরে ধীরে কালী বা সরস্বতী পুজোতেও ডাক পড়ত এই মৃৎশিল্পীদের। কালক্রমে কাজের সুবিধের জন্য এই মৃৎশিল্পীরা কুমোরটুলি অঞ্চলেই স্থায়ী বসবাস শুরু করে। এভাবে বাড়তে থাকে কুমোরদের বাসস্থান। আর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই কুমোরটুলি হয়ে ওঠে কলকাতার মৃৎশিল্পের আঁতুড় ঘর।

কার বাড়ির ঠাকুর বেশি বড়, কোন বাড়ির জাঁকজমকই বা বেশি, এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে রীতিমতো রেষারেষি চলত। প্রতিমা তৈরির বরাত যেত কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ বা শান্তিপুরের শিল্পীদের কাছে।



স্মৃতির সরণি বেয়ে...

শোনা যায়, কুমোরটুলি অঞ্চলে সর্বপ্রথম বসবাস শুরু করেন শিল্পী মধু পাল ও তাঁর পরিবার। কুমোরটুলিতে আজও রয়েছে তাঁর নামাঙ্কিত একটা রাস্তা। এছাড়াও এই অঞ্চলের প্রথমদিকের শিল্পীদের মধ্যে মধুসূদন পাল, বাঞ্ছারাম পালের নাম আসে। আজকালকার ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্টের যুগেও কুমোরটুলি অঞ্চলের বেশ কিছু পুরনো বনেদি বাড়ি সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গঙ্গাপ্রসাদ সেনের বাড়ি। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সময়ের এক মস্ত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক। তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল স্বয়ং রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে। চিকিৎসার জন্য তাঁর কাছে আসতেন বহু বিলিতি মানুষও। সেই গৌরব গাথার স্মৃতি বহন করে চলেছে কুমোরটুলি অঞ্চলের এই পেল্লায় বাড়িটি। সেই গঙ্গাপ্রসাদ সেনের-ই চতুর্থ পুরুষ শক্তি প্রসন্ন সেন-এর (বা বাদল সেন) সঙ্গে কথা বলেছিলাম আমরা। কুমোরটুলির অন্যতম পুরনো একটি পরিবারের সদস্য হিসেবে তিনি এই অঞ্চলের বিবর্তনের সাক্ষী। জানালেন, "সময়ের সঙ্গে সবই বদলায়। কুমোরটুলিও বদলেছে। আমার জন্ম এখানেই। সেই সূত্রে কুমোরটুলির একটা দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন দেখতে পাই। তখন পটুয়ারা ঠাকুর গড়তেন নিজের মতো করে। একটা অদ্ভুত সুন্দর রীতি মেনে একচালা, দোচালা বা তিনচালার ঠাকুর তৈরি হত। এখন আর্ট কলেজের স্টুডেন্টরা এসে প্রতিমা বানান। বহু প্রতিমাই তৈরি হয় থিমের আঙ্গিকে। কলকাতায় প্রতি বছরই বাড়ছে পুজোর সংখ্যা। তাই প্রতিমা তৈরির জায়গাও বাড়ন্ত। স্থানের


গঙ্গাপ্রসাদ ভবনের অন্দর, নাটমন্দির ও ঠাকুরদালান

অভাবে অনেক মৃৎশিল্পীই চলে গিয়েছেন চিৎপুর, বরানগরের দিকে। মাটির মূর্তির পাশাপাশি ফাইবারের মূর্তির চল বেড়েছে। তবে একটা বিষয় অনস্বীকার্য, যে প্রত্যেক পটুয়া আজও তাঁদের হাতের কাজেই শিল্প সৃষ্টি করে চলেছেন। এবং বংশ পরম্পরায় চলে আসছে সেই রীতি। সেই পদ্ধতি, সেই ঐতিহ্যে কোনও পরিবর্তন আসেনি।” কথায় কথায় আরও বললেন, “আমাদের পূর্বপুরুষের আদি বাড়ি ছিল ঢাকা, বিক্রমপুরে। গঙ্গাপ্রসাদ সেনের বাবা নীলাম্বর সেন-ও ছিলেন ওই অঞ্চলের এক খ্যাতনামা কবিরাজ। পরবর্তীকালে তাঁরা বাংলার এই কুমোরটুলি অঞ্চলে আসেন। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় ভূয়সী নামডাকের পর গঙ্গাপ্রসাদ সেন এই গৃহ নির্মাণ করেন। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবকে তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল। এই বাড়ির প্রবেশ দ্বারের পাশেই সেই স্মৃতি বিজড়িত একটি ফলক খোদিত রয়েছে।”

সত্যি, পুরনো কলকাতার গল্প যেন ফুরোতেই চায় না! আজকের কুমোরটুলি বারো মাস মুখর হয়ে থাকে হাজারো মানুষের ভিড়ে। ইদানীং ফোটোগ্রাফারদের কাছেও বেশ জনপ্রিয় এই এলাকা। কুমোরটুলি ঘাটের দিকে পা বাড়ালেই দেখবেন, ভেসে রয়েছে কত কাঠামো! বর্তমানে গঙ্গাদূষণ রোধের জন্য করা হয়েছে আলাদা ঘাট। পটুয়াদের জন্য করা হয়েছে আলাদা ঘর, তাঁদের নিজস্ব স্টুডিয়ো, আরও কত কী! পুজোর কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই হইহই করে ঠাকুর বের হয় মণ্ডপের উদ্দেশে। কুমোরটুলি জুড়ে তখন চূড়ান্ত ব্যস্ততা। তারপর কিছু দিনের বিরতি। আবার পরের বছরের প্রস্তুতি শুরু। এটাই কুমোরটুলির পরম্পরা। যা কয়েকশো বছর আগেও ছিল, আজও আছে।

তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা আর্কাইভ

ছবি সৌজন্যে:
আনন্দবাজার আর্কাইভ ও আইস্টক
দ্বিতীয় পাতার ছবি, তৃতীয় পাতার শেষ ছবি ও শেষ দু’পাতার ছবি: লেখক

ভিন্ন স্বাদের মাটন স্টার্টার

অনুষ্ঠান বাড়ি হোক বা সন্ধের ঘরোয়া খাবার, স্টার্টার যদি হয় মাটন-ময় লোভ সামলানো যায় কি? তবে সেই কাবাব-রেসিপি নয়, ছক ভাঙা কিছু মাটনের স্টার্টার রাঁধলেন ফুড কলামনিস্ট **রুকমা দাক্ষী**। স্বাদে মজলেন **অনিকেত গুহ**।

মাটন চিজ় পাফ

■ **উপকরণ:** মাংসের টুকরো (রান্না করা) ৫-৬টা, কাসুন্দি ১ চা-চামচ, টমেটো সস ১ চা-চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, ধনেপাতা কুচি ২ টেবলচামচ, মাখন ২ টেবলচামচ, মেয়নিজ় ২ টেবলচামচ, চিজ় (কুরনো) ১/৪ কাপ, ডিম ২টো, কর্নফ্লাওয়ার ১ চা-চামচ, ব্রেড ৮ পিস, চিলি ফ্লেক্স ও নুন।

■ **প্রণালী:** দুটো করে ব্রেড স্লাইস নিন। একটা বাটি বসিয়ে গোলাকারে কেটে নিন। উপরের ব্রেড পিসে একটা ছোট গর্ত বা ফুটো করুন। ব্রেডের ভিতরে ভালভাবে মাখন লাগিয়ে নিন। রান্না করা মাংসের টুকরো থেকে মাংস ছাড়িয়ে তাতে ধনেপাতা কুচি, কাসুন্দি, টমেটো সস, গোলমরিচ গুঁড়ো, মেয়নিজ় ও চিলি ফ্লেক্স মিশিয়ে নিন। অন্য পাত্রে, কুরনো চিজ়, কর্নফ্লাওয়ার, সামান্য নুন ও ফেটিয়া রাখা ডিম একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। তৈরি করে রাখা ব্রেডের ভিতরে মাংসের পুর ভরুন। উপর থেকে চিজ়-কর্নফ্লাওয়ারের মিশ্রণ ভালভাবে ছড়িয়ে দিন। ১৮০ ডিগ্রি প্রি-হিটেড আভেনে দিয়ে মিনিট ২০ বেক করলেই রেডি মাটন চিজ় পাফ।



মাটন চিজ় পাফ

স্পাইসি মিট বল

উপকরণ: মাংসের কিমা ৩০০ গ্রাম, কাঁচালঙ্কা কুচি ১ টেবলচামচ, রসুনের কোয়া ৭-৮টা, পেঁয়াজ কুচি $^{১}/_{২}$ কাপ, বড় এলাচ ১টা, ছোট এলাচ ৩টে, আদা ১ইঞ্চি, গোলমরিচ গুঁড়ো ২ চা-চামচ, পুদিনা পাতা $^{১}/_{৪}$ কাপ, ধনেপাতা ১ আঁটি, বেসন ২ টেবলচামচ, ঘি ১ টেবলচামচ, লেবুর রস ১ টেবলচামচ, সাদা তেল ও নুন পরিমাণমতো।



স্পাইসি মিট বল

প্রণালী: মাংসের কিমা ধুয়ে ভালভাবে শুকিয়ে নিন। মিক্সিং বোলে কিমার টুকরো, রসুনের কোয়া, ছোট এলাচ, বড় এলাচ, পুদিনা পাতা, গোলমরিচ গুঁড়ো, বেসন, ঘি ও সামান্য নুন দিন। ভালভাবে মিশিয়ে নিন। তৈরি হওয়া কিমার মিশ্রণ একটা পাত্রে ঢেলে তাতে পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি, কাঁচালঙ্কা কুচি ও লেবুর রস মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি মিনিট ১৫ ঢেকে রাখুন। এর পর মিশ্রণ থেকে ছোট ছোট মিট বল বানিয়ে ছাঁকা তেলে লাল করে ভাজুন। রেডি মুচমুচে স্পাইসি মিট বল।

মাটন ব্রেড পকেট

■ **উপকরণ:** মাংসের কিমা ২৫০ গ্রাম, পাউরুটি ৮ পিস, সেদ্ধ আলু ২টো, পেঁয়াজ কুচি ১০ গ্রাম, রসুন কুচি ১ চা-চামচ, পার্সলেপাতা কুচি ৫ গ্রাম, কাঁচালঙ্কা বাটা ২ চা-চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, মাখন ১৫ গ্রাম, ডিম ২টো, লেবুর রস ১ চা-চামচ, ব্রেড ক্রাম ১ কাপ, সাদা তেল ও নুন।

■ **প্রণালী:** প্যানে তেল গরম করে তাতে রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি, পার্সলেপাতা কুচি, কাঁচালঙ্কা বাটা, গোলমরিচ গুঁড়ো, নুন, সেদ্ধ আলু ও লেবুর রস দিন। পুর রেডি। দুটো ব্রেড উপর-নীচে রেখে বাটি বসিয়ে গোলাকারে কেটে নিন। ফেটিয়ে রাখা ডিমে চুবিয়ে ও ব্রেড ক্রামে কোট করে ছাঁকা তেলে ভাজুন। লুচির মতো ফুলে উঠলে মাঝবরাবর কেটে নিন। এই অংশে তৈরি করা পুর ভরে সার্ভ করুন।



মাটন ব্রেড পকেট



মাংসের ঝুড়া

মাংসের ঝুরা

■ **উপকরণ:** মাংস ৩০০ গ্রাম, আদা বাটা ২ চা-চামচ, রসুন বাটা ২ চা-চামচ, কাশ্মীরিলঙ্কা গুঁড়ো $^1/_2$ চা-চামচ, জিরে গুঁড়ো ১ চা-চামচ, গরমমশলা গুঁড়ো ১ চা-চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, চিনি ১ চা-চামচ, তেতুলের ক্বাথ ১ চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি ১০ গ্রাম, রসুন কুচি ৫ গ্রাম, ধনেপাতা কুচি ১ আঁটি, সাদা তেল সামান্য, ভাজার জন্য তেল ৪ চা-চামচ।

■ **প্রণালী:** মাংসের টুকরোগুলো পাত্রে নিন। তাতে আদা বাটা, রসুন বাটা, নুন, চিনি তেঁতুলের কাঁথ ও অল্প তেল দিয়ে মাখিয়ে নিন। প্রেশার কুকারে মাংস রেঁধে নিন। হাড় থেকে মাংস আলাদা করুন ও ঝুড়া বানিয়ে নিন। প্যানে তেল দিয়ে তাতে পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি ও মাংসের ঝুড়া দিন। মিশ্রণের রং কালচে না হওয়া পর্যন্ত নাড়াচাড়া করুন। শেষে নুন ও চিনি দিন। ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিলেই রেডি মাংসের ঝুরা।

মাটন রোল সামোসা

■ **উপকরণ: ময়দার খোল তৈরির জন্য:** ময়দা ১ কাপ, নুন ¼ চা-চামচ, জোয়ান ১ চা-চামচ, বেকিং পাউডার ½ চা-চামচ, ঘি ২ টেবলচামচ; **পুর তৈরির জন্য:** মাংসের কিমা (সেদ্ধ করা) ২০০ গ্রাম, সেদ্ধ আলু ১টা, পেঁয়াজ (কুচনো) ১টা, রসুন কুচি ১ চা-চামচ, কিশমিশ ২ চা-চামচ, আদা বাটা ২ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা বাটা ২ চা-চামচ, চিনি ½ চা-চামচ, গরমমশলা গুঁড়ো ১ চা-চামচ, সাদা তেল ৪ টেবলচামচ।

■ **প্রণালী:** ময়দার খোল তৈরির সব উপকরণ একসঙ্গে মেখে মণ্ড তৈরি করে ৩০ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন। প্যানে তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, মাংসের কিমা, আদা বাটা, কাঁচালঙ্কা কুচি, গরমমশলা গুঁড়ো ও কিশমিশ দিন। এরপর মেখে রাখা সেদ্ধ আলু, নুন ও চিনি দিয়ে আরও কিছু ক্ষণ রান্না করুন। প্যান থেকে নামিয়ে পুর ঠান্ডা করুন। ময়দার তৈরি মণ্ড থেকে তিনটে বড় লেচি কাটুন। একটা লেচি থেকে পাতলা রুটি তৈরি করুন। ছুরি দিয়ে ৮ ভাগে কেটে (রুটিতে শুধু কাটার দাগ থাকবে) নিন। তৈরি করা পুর নিন। প্রথমে রুটির চারদিকে পুর মাখান। তারপর প্রতিটা ভাগ শেষের দিক থেকে টাইট করে মুড়ুন। সামান্য জল দিয়ে রুটির মুখ আটকে দিন। বাকি (দুটো) রুটিতেও একই প্রসেসে সামোসার আকার দিন। হালকা আঁচে ছাঁকা তেলে লাল করে ভাজুন ও গরম গরম পরিবেশন করুন।



মাটন রোল সামোসা



মরিচ মাংস ভাজা

মরিচ মাংস ভাজা

উপকরণ: মাংস ৫০০ গ্রাম, গোলমরিচ গুঁড়ো সামান্য, রসুন বাটা ৫ গ্রাম, পেঁয়াজ বাটা ৫ গ্রাম, কাঁচালঙ্কা ৮টা, ছাঁচি পেঁয়াজ (কুচনো) কিছুটা, ভিনিগার ১ টেবলচামচ, দারচিনি (থেঁতো করা) ২টো, ছোট এলাচ (থেঁতো করা) ৪টে, লেবুর রস ১ চা-চামচ, মাখন ৫০ গ্রাম, সাদা তেল ৪ টেবলচামচ ও নুন স্বাদমতো।

প্রণালী: মাংসের টুকরো ধুয়ে কুকারে দিন। সঙ্গে দিন গোলমরিচ গুঁড়ো, পেঁয়াজ বাটা, নুন, ভিনিগার ও ছোট এলাচ। $^3/_4$ কাপ জল দিয়ে মাংস সেদ্ধ করে নিন। অতিরিক্ত জল শুকিয়ে নিন। একটা প্যানে মাখন ও সাদা তেল গরম করে তাতে রসুন বাটা, অবশিষ্ট গোলমরিচ গুঁড়ো ও ছাঁচি পেঁয়াজ কুচি দিন। হালকা ভেজে নিয়ে তাতে সেদ্ধ করা মাংস দিন। এপিঠ-ওপিঠ করে মিশিয়ে নিন। উপর থেকে লেবুর রস ও সামান্য মাখন ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।



চিলি মাটন ড্রাই

আলু মাংসের ঝাল ফ্রাই

■ **উপকরণ:** বোনলেস মাংসের বটি (ছোট টুকরো) ৩০০ গ্রাম, আলু সেদ্ধ (অর্ধেক করা) ১০টা, পেঁয়াজ বাটা $^{1}/_{2}$ কাপ, রসুন বাটা ৫ গ্রাম, আদা বাটা ২ চা-চামচ, হলুদ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, কাশ্মীরিলঙ্কা গুঁড়ো ১ চা-চামচ, গরমমশলা গুঁড়ো ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা কুচি সামান্য, তেঁতুল গোলা সামান্য, বেসন সামান্য, সাদা তেল $^{1}/_{4}$ কাপ, নুন স্বাদমতো ও চিনি পরিমাণমতো।



আলু মাংসের ঝাল ফ্রাই

■ **প্রণালী:** অল্প বেসন যোগ করে প্যানে তেল গরম করুন। তাতে আলু দিয়ে ভাজুন। ওই তেলেই মাংস ভাজে নিন। এবার তাতে একে একে পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরিলঙ্কা গুঁড়ো, গরমমশলা গুঁড়ো ও স্বাদমতো নুন দিন। রান্না থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে কুকারে মাংস-সহ মশলা দিন। সেদ্ধ হয়ে এলে প্যানে ঢেলে তাতে চিনি, কাঁচালঙ্কা কুচি ও তেঁতুল গোলা দিন। ভেজে রাখা আলু, নুন, চিনি ও গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে ড্রাই করুন। শেষে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। রেডি আলু মাংসের ঝাল ফ্রাই।



চিলি মাটন ড্রাই

■ **উপকরণ:** বোনলেস মাংস ৩০০ গ্রাম, আদা বাটা ১ চা-চামচ, রসুন বাটা ১ চা-চামচ, সাদা তেল, পেঁয়াজ (কুচনো) ১টা, ক্যাপসিকাম কুচি অল্প, কাঁচালঙ্কা ২-৩টে, রসুন কুচি ২ চা-চামচ, চিনি সামান্য, ডার্ক সয়া সস ১ চা-চামচ, লাইট সয়া সস ৩ চা-চামচ, ভিনিগার ৫ গ্রাম, কর্নফ্লাওয়ার ১০ গ্রাম, শা-মরিচ গুঁড়ো ও নুন।

■ **প্রণালী:** মাংসের টুকরো ধুয়ে নিন। কুকারে আদা বাটা, রসুন বাটা, ভিনিগার, $^{1}/_{4}$ কাপ জল ও মাংসের টুকরো দিয়ে সেদ্ধ করুন। জল শুকিয়ে এলে মাংস নামিয়ে একটা ছড়ানো পাত্রে রাখুন। কর্নফ্লাওয়ার মাখান। একটা কাপে চিনি, ডার্ক সয়া সস, লাইট সয়া সস, ভিনিগার, শা-মরিচ গুঁড়ো ও নুন একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। প্যানে তেল গরম করে মাংসের টুকরো ও রসুন কুচি দিন। ১ মিনিট পর, কাপে তৈরি মিশ্রণটি প্যানে দিন। ডুমো করে কাটা পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম ও চেরা কাঁচালঙ্কা দিয়ে নামিয়ে নিন। সম্পূর্ণ পদটি আপনারা সয়াবিনের সাহায্যেও করতে পারেন।

গল্প ১

সমুদ্রযাত্রা

নন্দিতা বাগচী



এক নামী ইনস্টিটিউট থেকে হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টে গ্র্যাজুয়েট হয়েছি আমি বছর দুয়েক আগে। ক্যাম্পাস ইন্টারভিউতে কলকাতারই একটা ফোর স্টার হোটেলের গেস্ট সার্ভিসে চাকরি পেয়েছিলাম। কিন্তু সারা মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর মাত্র কুড়ি হাজার টাকায় মন ভরত না আমার। তাই দেশে-বিদেশে চাকরি খুঁজে বেড়াতাম।

হঠাৎ করেই একটা অনলাইন ইন্টারভিউতে ডাক পেলাম আমি। প্রসঙ্গত বলে রাখি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াও আর একটি অস্ত্র আছে আমার ঝুলিতে। সেটি হল আমার সৌন্দর্য। পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি উচ্চতা ছাড়াও গায়ের রং ফরসা আমার। লাবণ্যে ভরা চোখ-মুখ আর কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা চুলেও নাকি অদ্ভুত আবেদন। আর কে না জানে, 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র'। তাই চাকরিটা পেয়ে গেলাম আমি।

বাবা-মায়ের আপত্তি ছিল। অত দূর দেশ। তার উপরে চব্বিশ ঘণ্টাই সমুদ্রে ভেসে থাকা। কিন্তু টাকার অঙ্কটা সম্ভবত তাঁদের মনকেও গলিয়ে দিল। মাসে দু'হাজার ডলার মানে দেড় লাখের কিছু উপরে। তার উপরে থাকা-খাওয়া ফ্রি। তাই আট মাসের কনট্র্যাক্টে সই করে দিলাম আমি। যদি ভাল সার্ভিস দিই, তবে মাসদুয়েকের ছুটির পরে আবারও নতুন কনট্র্যাক্ট পেতে পারি। আট মাস কাজ করে দশ-বারো লাখ টাকা জমিয়ে ফেলা আমার কল্পনার বাইরে। হ্যাঁ, কিছু ট্যাক্স দিতে হবে হয়তো আমাকে। তবে শুনেছি ছয় মাসের উপরে দেশের বাইরে কাজ করলে, ট্যাক্স দিতে হয় না।

কলকাতা থেকে সানফ্রান্সিসকো এসে পৌঁছলাম আমি। মাসখানেকের একটা ফর্ম্যাল ট্রেনিংয়ের পর সানফ্রান্সিসকোর সাতাশ নম্বর জেটি থেকে বিকেল চারটেয় ছাড়ল আমাদের জাহাজ। গন্তব্য, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এবং ফিরে আসা। মোট পনেরো দিনের জলযাত্রা। এই কোম্পানির জাহাজগুলোর এটাই জলপথ।

আমার পোস্টটার একটা গালভরা নাম আছে। গেস্ট সার্ভিস ম্যানেজার। আমার মতো আরও কয়েকজন গেস্ট সার্ভিস ম্যানেজার আছে এই জাহাজে। জাহাজের ফ্রন্ট ডেস্ক সামলানো, গেস্টদের সঙ্গে হেসে কথা বলা, তাঁদের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ-খবর নেওয়াই আমাদের মূল কাজ। তবে গেস্টদের খুশি করার জন্য এক্সট্রা সার্ভিসও দিতে হয়। বুড়ো সাহেবগুলোর সঙ্গে একটু-আধটু ফ্লার্টও করতে হয়। ব্যস, ওইটুকুই। সাদা চামড়ার লোকগুলোর তেমন ছোঁকছোঁকানি নেই। সোজাসাপটা কথা বলেন, প্রেম নিবেদনও করেন সোজাসুজি।

তবে গেস্টদের নিজেদের মধ্যে কিংবা ক্রু-দের মধ্যে প্রেমের খেলা চলে প্রায়ই। দু'তরফের সম্মতি থাকলে একজন আর একজনের কেবিনেও ঢুকে পড়েন। আর কেবিনের বন্ধ দরজার আড়ালে কে কী করছেন, সেটা দেখা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

এখন পাঁচ দিন জলে ভেসে থাকবে জাহাজ। ষষ্ঠ দিনে হাওয়াই দ্বীপের মাটি ছোঁবে। তাই এই পাঁচ দিন গেস্টদের নানা বিনোদনে ব্যস্ত রাখা আমাদের কর্তব্য। আমাদের জাহাজে এক হাজারের কিছু বেশি যাত্রী আছেন। আমি আর এমা আমাদের ফ্লোর সামলাই। এমা আমেরিকান মেয়ে। ট্রেনিংয়ের সময় থেকেই তার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে। ও নেভাদা রাজ্যের মেয়ে। আগে লাস ভেগাসের একটা হোটেলে কাজ করত।

এ ছাড়াও বারটেন্ডার জেনিফার আর ওয়েট্রেস কিম্বার্লির সঙ্গেও বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে, কেন না রাতে এক কেবিনে থাকি আমরা। দুটো বাঙ্ক বেড আছে আমাদের কেবিনে। ওদের সবই ভাল, তবে বড় বেশি গায়ে পড়া। টিপসের আশায় ফ্লার্ট করে পুরুষদের সঙ্গে। তবে জাহাজের গেস্টদের সঙ্গে রাত কাটাতে পারে না। এ সব নিয়ম স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল ট্রেনিংয়ের সময়।

দু'দিন ধরে একজন বয়স্ক মহিলাকে লক্ষ করছি। ভদ্রমহিলা একাই ডেকে বসে থাকেন সারাদিন। হাতে একটা বই থাকে তাঁর। হয় তিনি বইটা পড়ায় মগ্ন থাকেন, নয়তো দূরে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকেন। অন্য গেস্টদের মতো সুইমিং পুলে ঝাঁপাঝাঁপি করেন না, কিংবা অন্য কোনও বিনোদনেও অংশগ্রহণ করেন না। লাঞ্চের আগে একটা বিয়ারের ক্যান নিয়ে আসেন, ঘণ্টা খানেক ধরে সেটা পান করেন।

আজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। কেন যেন মনে হল ভদ্রমহিলা একাকিত্বের শিকার। ক্রুজ় শিপে মানুষ আসেন আনন্দ-ফুর্তি করতে। তবে কেন এমন একা একা বসে থাকেন উনি! জাহাজের অতিথিদের আনন্দে রাখা আমাদের কর্তব্য।

তাই এগিয়ে গিয়ে বললাম, "হাই, আয়্যাম নির্ঝরিণী, ইউ ক্যান কল মি নিনি। হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ ম্যাম?"

ভদ্রমহিলা একটু নড়েচড়ে বসলেন। হাতের বইটার যে পাতাটা পড়ছিলেন, সেখানে একটা টিসু পেপার ভাঁজ করে রেখে, আমার দিকে তাকালেন। অল্প হেসে ডানহাতটা এগিয়ে

দিয়ে বললেন, "কল মি লিয়ান।"
করমর্দন শেষে বললেন, "আমার জন্য কিচ্ছু করার প্রয়োজন নেই নিনি। আমি নিজেই নিজেকে বিনোদিত করতে জানি।"
কথাগুলো শেষ করেই হাতের বইখানা দেখিয়ে বললেন, "এই জাহাজটার লাইব্রেরিতে এত বই আছে যে, আমি সারা জীবনেও পড়ে শেষ করতে পারব না।"
আমি মনে মনে বলি, বই পড়াই যদি তোমার হবি হয় বাপু, তবে তো বাড়িতে বসে থাকলেই পারতে। দিব্যি পাড়ার লাইব্রেরি থেকে বই আনিয়ে পড়তে পারতে! এত খরচ করে ক্রুজ় শিপে এসেছ কেন?
ভদ্রমহিলা বোধহয় আমার মনের কথা পড়ে ফেললেন। বললেন, "এই জাহাজেই আছি তো, তোমার সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে ধীরে ধীরে। বাই দ্য ওয়ে, তুমি কি ইন্ডিয়ান?"
"হ্যাঁ তো। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?" খুশি হয়ে বললাম।
"তোমার চেহারা দেখে। আর ওই লম্বা নামটার অর্থ কী?"
"আমাদের মাতৃভাষায় ওটার অর্থ নদী।"
ভদ্রমহিলা একটু যেন বিস্মিত হলেন। বললেন, "আশ্চর্য! আমার নামটার অর্থ কী, জানো?"

তবে এটা তো একটা জগা-খিচুড়ির দেশ, ওঁর কোনও পূর্বপুরুষ হয়তো ইউরোপিয়ান ছিলেন। গোল্ড রাশের সময় যেমন অসংখ্য চিন দেশের মানুষ এসেছিলেন, তেমনই ইউরোপের নানা দেশের মানুষও তো এসেছিলেন।

২

আজ সন্ধ্যায় একটা সার্কাস শো ছিল। বেশিরভাগ অতিথিই বাচ্চাদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমার সার্কাস দেখতে ভাল লাগে না। তা ছাড়া সারাদিনের ছুটোছুটিতে ক্লান্তও লাগছিল খুব। তাই ডেকে গিয়ে দাঁড়ালাম। মাঝ সমুদ্রে আলোকদূষণহীন ঘন কালো আকাশ আর সেই পটভূমিতে হিরের কুচির মতো তারাগুলো দেখতে ভারী ভাল লাগে আমার!
ডেকে এসেই দেখি, লিয়ান বসে আছেন অন্ধকার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। হাতে একটা ওয়াইনের গ্লাস। আমাকে দেখেই হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। আমি কাছে গিয়ে বললাম, "আপনারও কি আমার মতো আকাশের তারা দেখতে ভাল লাগে?"
উনি উদাস সুরে বললেন, "উঁহু, আমি সমুদ্রের ঢেউ দেখি।



ভদ্রমহিলা বেশ বাক্যবাগীশ। তা ছাড়া বয়স হলে বেশি কথা বলেন মানুষ। হয়তো শোনার লোক পান না বলে। যে একটু শোনার আগ্রহ দেখায়, তার কাছেই ঝুলি খুলে বসেন। তাই ডেকের অন্য প্রান্তে এগিয়ে যাই আমি। হাজার অতিথির হাজার চাহিদার দিকে নজর রাখতে হয় আমাকে। তবে একটা শব্দ আমার মনের ভিতরে গুনগুন করতে থাকে। ম্যান্ডারিন।

"কী?" উত্তেজনা ফুটে ওঠে আমার গলার স্বরেও।
"পদ্মফুল। ম্যান্ডারিন ভাষায় লিয়ান মানে পদ্মফুল। তাহলে আমরা দু'জনে সম্পর্কিত, বলো?"
আমি হেসে ফেললাম। বললাম, "ওই জন্যই তো আপনি আকর্ষণ করলেন আমাকে! তবে আপনি হলেন জলে ভেসে থাকা ফুল, আর আমি বহতা নদী।"
ভদ্রমহিলা মৃদু হেসে বললেন, "বেশ বললে কিন্তু কথাটা। আমার নিয়তিই বোধহয় জলে ভেসে থাকা ..."
ভদ্রমহিলা বেশ বাক্যবাগীশ। তা ছাড়া বয়স হলে বেশি কথা বলেন মানুষ। হয়তো শোনার লোক পান না বলে। যে একটু শোনার আগ্রহ দেখায়, তার কাছেই ঝুলি খুলে বসেন। তাই ডেকের অন্য প্রান্তে এগিয়ে যাই আমি। হাজার অতিথির হাজার চাহিদার দিকে নজর রাখতে হয় আমাকে। তবে একটা শব্দ আমার মনের ভিতরে গুনগুন করতে থাকে। ম্যান্ডারিন। ওটা তো চিন দেশের ভাষা। কিন্তু ভদ্রমহিলাকে দেখে তো মনে হল না! বেশ ইউরোপিয়ানদের মতো দেখতে তো উনি! শুধু চোখ দুটো ছোট ছোট।

আজ বোধহয় পূর্ণিমা। দ্যাখো তো, ঢেউগুলো কেমন ঝলমল করে উঠছে চাঁদের আলোর ছোঁয়া লেগে।"
আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আজ সার্কাস দেখতে গেলেন না?"
"নাহ্, ওই সব হইচই আমার ভাল লাগে না।"
"আপনি কি সারাদিন এখানেই বসে থাকেন?"
"কী করব বলো? আমার কেবিনটা ভিতরের দিকে। সেখানে কোনও পোর্টহোল বা ব্যালকনি নেই যে! জল দেখা যায় না একেবারেই।"
"জল এত ভাল লাগে আপনার?"
ভদ্রমহিলা চুপ করে থেকে কিছু ভাবলেন। তারপর হেসে বললেন, "আমার জন্মই যে জলে। আমি তো জলপদ্ম।"
তারপর ফিসফিস করে বললেন, "আসল কারণটা তা নয়। আমার রুমমেট ভদ্রমহিলা খুব লাউড। যত ক্ষণ কেবিনে থাকেন, হয় জোরে টিভি চালিয়ে দেন, নয়তো হাই ভলিউমে গান শোনেন। তাই আমি ডেকে চলে আসি। এত আওয়াজ আমার সহ্য হয় না। তুমি আবার সাতকান কোরো না যেন কথাটা।"

ডিনারের পর অতিথিরা যার যার কেবিনে ঢুকে গিয়েছেন। এখন শুধু বার আর নাইট ক্লাবগুলো থেকে হইহল্লা ভেসে আসছে।
আমি ডিনার করে, পুরো জাহাজের তলা টহল দিয়ে, নিজেদের কেবিনে ঢুকে পড়লাম। হতক্লান্ত অবস্থা। ডে ডিউটি থাকলে আমার দিন শুরু হয় সকাল আটটায়, আর ডিউটি শেষ হয় রাত দশটা নাগাদ। যদিও খাতায়-কলমে লেখা আছে বারো ঘণ্টা ডিউটি। কিন্তু সেটা ইলাস্টিকের মতো বেড়ে চোদ্দো-পনেরোতে পৌঁছে যায় রোজই।
আমাদের স্টাফ কেবিনগুলো জাহাজের খোলে। সারি সারি কেবিন। চারজন করে থাকতে হয় আমাদের। একটা করে অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম। তাই শোওয়ার আর স্নান করার সময়টুকু ছাড়া পারতপক্ষে আসি না এখানে। জেনিফার আর কিম্বার্লির প্রায়ই নাইট ডিউটি থাকে। তখন রাতভর জেগে থাকতে হয় ওদের। তবে ওরা ওভারটাইম পায়, টিপসও পায় ভালই। এখন রাতের শিফটের স্টাফরা আর সিকিউরিটির লোকেরা ডিউটি দিচ্ছে।
এমা একজন ডেক অফিসারের সঙ্গে প্রেম করছে। সেকেন্ড অফিসার হেনরি বিবাহিত। একটা বাচ্চাও আছে তার। কিন্তু এমন উপরি পাওনা ছাড়ে কে? এমা আর হেনরির ডিউটি শিফট যদি ম্যাচ করে যায়, তবে ওরা একসঙ্গে ডিনার করে। নাইট ক্লাবে গিয়ে ড্রিঙ্ক করে, ডান্স করে। এমার ধারণা, আগের বউকে ডিভোর্স করে ওকে বিয়ে করবে হেনরি। আর তখন এমা একটা বড় কেবিনে রানির মতো থাকবে। চাকরি করবে না আর।
এমা কেবিনে এল সকাল সাতটায়। ইউনিফর্ম পরে ডিউটির জন্য তৈরি হচ্ছিলাম আমি। সারারাত হেনরির সঙ্গে তার কেবিনে ফুর্তি করেছে এমা। স্নানও সেরে এসেছে হেনরির সুন্দর বাথরুম থেকে। দামি সাবান-শ্যাম্পুর সুগন্ধে ভুরভুর করছে তার শরীর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "রাতটা কেমন কাটালে এমা?"
এক চোখ টিপে সে জবাব দিল, "অসাম!"
তারপরই সারা মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে বলল, "তুমি সকাল-সন্ধে ওই চিনে বুড়িটার সঙ্গে বকবক করো কেন? কোনও ডেক-ক্রু-এর সঙ্গে ডেটে যেতে পারো না?"
আমি বলি, "তোমার মতো সাহস নেই আমার। তারপর চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিক আর কী!"
"কেন, বরখাস্ত করবে কেন? তোমার ডিউটি আওয়ারে তো যাচ্ছ না! একটু বুদ্ধি করে চলতে হয়। তুমি তো কাউকে খুন করছ না, প্রেম করছ শুধু। প্রেমের মতো পবিত্র আর কী আছে?"
আমি মনে মনে বলি, সারারাত ধরে হেনরির সঙ্গে যা করে এলে, সেটা বুঝি পবিত্র ব্যাপার? মুখে বলি, "কেন, লিয়ানকে এত অপছন্দ কেন তোমার?"
এমা বলে, "পছন্দ-অপছন্দের কথা নয়, ওই চিনে বুড়িটা তো প্রত্যেকটা ভয়েজেই এই জাহাজে থাকে।"
"মানে?" আশ্চর্য আমি।
"মানে জানি না, তবে শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস দেখি ওকে। তুমি নতুন এসেছ তো, তাই জানো না। থাকো কয়েক মাস, ওই এক মুখ দেখে দেখে বোর হয়ে যাবে।"
ডিউটির সময় হয়ে গিয়েছে। তাই আর কথা হয় না আমাদের।

৩

আজও সন্ধের পর ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ডেকে। সেই একই ভঙ্গিমায় এক গ্লাস ওয়াইন নিয়ে বসে আছেন তিনি।
আজ আমার নাইট শিফট, তাই সন্ধের পর একটা রাউন্ড দিচ্ছিলাম। এ সময় ডেকগুলো ফাঁকা থাকে। বেশিরভাগ অতিথিই এই সময়ে বারে থাকেন, কিংবা কোনও শো দেখতে যান বাচ্চাদের নিয়ে। তারপর থাকবে ডিনারের ব্যস্ততা। কিন্তু এই ভদ্রমহিলার যেন কোনও ব্যস্ততাই নেই!
আমি তাঁর পাশের চেয়ারটায় বসে বললাম, "আজ সন্ধেয় আপনি কেমন আছেন লিয়ান?" এমনই গতে বাঁধা রীতি এখানকার। যেন প্রতিটি সকাল-সন্ধেয় আলাদা রকমের ভাল বা মন্দ থাকেন মানুষ।
লিয়ান বললেন, "ভাল আছি, রোজই ভাল থাকি আমি।"
আমি বলি, "এভাবে একা বসে থাকতে আপনার বোর লাগে না? এমনিতেই মাঝ সমুদ্রে কোনও বৈচিত্র নেই, শুধু জল আর জল। গাছপালা-পাহাড়-মাটি কিছুই দেখা যায় না।"
"তোমাকে তো আগেই বলেছি, জল আমার খুব ভাল লাগে। আমি এখানে বসে ঢেউ গুনি।"
বলব কি বলব না করে বলেই ফেললাম কথাটা, "আমার রুমমেট এমা বলছিল, আপনি নাকি প্রত্যেকটি ভয়েজেই এই জাহাজে থাকেন?"
ভদ্রমহিলা হেসে ফেললেন। বললেন, "জানো তো, জাহাজের লোকেরা খুব পরচর্চা করতে ভালবাসে। আসলে একটা ছোট পরিসরে অনেকগুলো দিন কাটাতে হয় তো! তাই এই পরচর্চাটাও বিনোদন তাদের কাছে।"
"সরি," বলে আমি চুপ করে যাই। কেন না আমিও তো প্রশ্নটা করে ফেলে সেই পরচর্চারই ভাগী হয়ে গেলাম! তবে ভদ্রমহিলা বুদ্ধিমতী। আমাকে সেই অপরাধবোধ থেকে মুক্ত করার জন্য বললেন, "তুমি কেন সরি বলছ? তুমি তো অন্য কাউকে গিয়ে আমার সম্বন্ধে বলছ না! আমাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেছ।"
আমি চুপ করে থেকে, ওঁকে বলার সুযোগ দিই। উনি বলেন, "হ্যাঁ, আমি জাহাজে জাহাজেই দিন কাটাই। কেন না জল আমাকে আকর্ষণ করে। এর পিছনে আমার নামটার কোনও তাৎপর্য আছে কিনা জানি না, তবে আমার মেয়ের নামটার তাৎপর্য অবশ্যই আছে। সেদিন তোমাকে বলিনি কথাটা।"
আমি তৎপর হয়ে প্রশ্ন করে ফেলি, "কী আপনার মেয়ের

নাম?"
"জিয়াং, আমার মেয়ের নাম ছিল জিয়াং। ম্যান্ডারিন ভাষায় যার অর্থ ছিল নদী। তার মানে তুমি আর আমার মেয়ে সমনামী।"
"ছিল বলছেন কেন?" আবারও তাঁর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে ফেলি।
"কেন না সে নেই।"
"সরি।"
"তোমার সরি বলার কিছু নেই, সেটা আমার দুর্ভাগ্য।" একটু চুপ করে থেকে ভদ্রমহিলা বললেন, "আমার মতোই জল ভালবাসত সে, আর সেটাই কাল হল।"
আমি ডিউটিতে আছি। একজন অতিথির কাছে বসে এতটা সময় কাটানো উচিত নয়, অনেক কাজ পড়ে আছে। কিন্তু ওঁর এমন একটা আবেগপূর্ণ স্মৃতিতে ঘা দিয়ে ফেলেছি যে, কৃতকর্মের ফল ভোগ করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না আমার।
গলা খাঁকারি দিয়ে লিয়ান বলে উঠলেন, "কলেজে পড়ার সময়ে জিয়াং আর তার বয়ফ্রেন্ড সানফ্রান্সিসকো বে-তে বোটিং করত। প্রত্যেক উইকএন্ডেই ওরা দু'জনে একটা ছোট বোট ভাড়া করে বেরিয়ে পড়ত। একদিন ওরা আর ফিরল না। গোল্ডেন গেট ব্রিজের তলায় ডুবে গেল ওদের

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের নানা দ্বীপে ঘোরাঘুরি করবে আমাদের জাহাজ। তারপর, নবম দিনে ফিরতি যাত্রা। পাঁচদিনের সমুদ্র সফর শেষে আমেরিকা ছোঁওয়া মেক্সিকোর ইনসুনাডা সৈকতে এক রাত কাটিয়ে, পনেরো দিনের মাথায় সানফ্রান্সিসকোতে ফিরব আমরা।
আজ সন্ধেয় ডেকে গিয়ে দেখি, লিয়ান নেই সেখানে। একটু অবাকই হই আমি। ভাবলাম, হয়তো কাল তাঁর মনে খুঁচিয়ে ঘা করেছি আমি। হয়তো মন খারাপ করে তিনি কেবিনেই শুয়ে আছেন।
আবার অপরাধবোধে আক্রান্ত হই আমি। তবে আবেগপ্রবণ হয়ে বসে থাকলে তো আমার চলবে না, তাই টহল দিতে বেরোই। যদি কোনও অতিথির কোনও প্রয়োজন থাকে, সেটা মেটাতে হবে। যদি কারও কোনও সমস্যা থাকে, তার সমাধান করতে হবে।
এভাবে ফ্রন্ট ডেস্ক, বার, নাইট ক্লাব, ডান্স ফ্লোর, সিনেমা হল, বুটিকে টহল মেরে, ক্যাসিনোতে গিয়ে হাজির হই। অবাক হয়ে দেখি, সেখানে পোকার খেলায় মত্ত হয়ে রয়েছেন লিয়ান। আমাকে দেখেই হাতছানি দিয়ে ডেকে বললেন, "দু'মিনিট দাঁড়াও। আমি অনেকগুলো ডলার জিতে গিয়েছি। আজ আমি তোমাকে ওয়াইন খাওয়াব।"



সেই একই ভঙ্গিমায় এক গ্লাস ওয়াইন নিয়ে বসে আছেন তিনি। আজ আমার নাইট শিফট, তাই সন্ধের পর একটা রাউন্ড দিচ্ছিলাম। এ সময় ডেকগুলো ফাঁকা থাকে। বেশিরভাগ অতিথিই এই সময়ে বারে থাকেন, কিংবা কোনও শো দেখতে যান বাচ্চাদের নিয়ে। তারপর থাকবে ডিনারের ব্যস্ততা। কিন্তু এই ভদ্রমহিলার যেন কোনও ব্যস্ততাই নেই!

বোট। খুব কুয়াশা ছিল সেদিন। ন্যাভিগেট করতে পারেনি ওরা। আর সানফ্রান্সিসকোর কুয়াশা তো জানোই কেমন হয়।"
এরপর আর কথা বলতে পারেন না তিনি। আমি উঠে দাঁড়িয়ে, তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে দিই কিছুক্ষণ। তারপর ফ্রন্ট ডেস্কের দিকে এগিয়ে যাই।

৪

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এগিয়ে আসছে। আর একটা রাত পরেই হিলোর মাটি ছোঁবে আমাদের জাহাজ। যাত্রীরা তো বটেই, আমিও কম উত্তেজিত নই। কোনওদিন কি ভেবেছিলাম যে, প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যিখানের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সক্রিয় আগ্নেয়গিরিগুলো দেখার সৌভাগ্য হবে আমার?
হিলোর পরে মাউই ও হনলুলুতে যাওয়া হবে। তিনদিন

তারপর টাকা-পয়সা গুছিয়ে নিয়ে, বারের দিকে যেতে যেতে বললেন, "আজ আমার রুমমেট আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল পোকার খেলার জন্য। সে তো জানে না, আমি আর আমার হাজ়ব্যান্ড পোকারে চ্যাম্পিয়ন ছিলাম! যাই হোক, শেষ পর্যন্ত 'হেডস্-আপ' খেললাম দু'জনে। আমি আড়াইশো ডলার জিতেছি। চলো চলো, ওয়াইন নিয়ে ডেকে বসব।"
আমি বললাম, "আমি তো এখন ডিউটিতে আছি, ড্রিঙ্ক করতে পারব না।"
"কত ক্ষণ চলবে তোমার ডিউটি? আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।"
আমি আতান্তরে পড়ি। রাত আটটা অবধি অফিশিয়াল ডিউটি আমার। তারপর আরও দু'-তিন ঘণ্টা লেগেই যায় কাজ গুছিয়ে উঠতে। কিন্তু লিয়ান কোনও কথাই শুনতে চাইলেন না। বললেন, "আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।"

উপায়ন্তর না দেখে আমি বললাম, "তবে আপনি সময় মতো ডিনারটা খেয়ে নিন, আমিও ডিনার খেয়ে রাত দশটা নাগাদ আসব।"

রাত দশটা নাগাদ দু'হাতে দু'গ্লাস মোসকাটো হোয়াইট ওয়াইন নিয়ে ডেক-এ আসি আমি। কথায় কথায় লিয়ান একদিন বলেছিলেন, মিষ্টি ওয়াইন পান করতে ভালবাসেন উনি। তবে আমাকে দেখেই হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "এ কী, তুমি কেন এনেছ ওয়াইন? আমি খাওয়াব তো তোমাকে!"

আমি বললাম, "আর একদিন না হয় আপনি খাওয়াবেন। এখনও দিনদশেক রোজ দেখা হবে আমাদের।"

ভদ্রমহিলা হা হা করে হেসে বললেন, "দিন দশেক কেন, যত দিন তুমি এই জাহাজে আছ, তত দিনই দেখা হবে। এখন তো তুমি জানোই যে এই জাহাজের পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট আমি!"

আমি কিন্তু কিন্তু করে বলি, "একটা প্রশ্ন করব আপনাকে?"

"অবশ্যই করবে। হাজারটা প্রশ্ন করবে। তুমি আমার বন্ধু এখন। যদিও আমার মেয়ের বয়সি তুমি। তবে আমি বিশ্বাস করি, বন্ধুত্বে বয়সটা কোনও বাধা নয়। বন্ধুত্ব তখনই হয়, যখন একজন আর একজনের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে এবং সমবেদনা পোষণ করে। কী, ঠিক কিনা?"

আমি বলি, "একদম ঠিক বলেছেন।"

"তবে দেরি কিসের? প্রশ্নটা করেই ফেলো।"

"না, মানে, আপনার বাড়িতে কে থাকে? আসলে আপনি যদি সারা বছর জাহাজেই থাকেন, তবে আপনার বাড়িঘরের দেখাশুনো কে করে?"

ভদ্রমহিলা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার কোনও বাড়িঘর নেই।"

"মানে?" অত্যাশ্চর্য আমি।

"মানে, নেই। সানফ্রান্সিসকোতে একটা বাড়ির কত দাম জানো? একটা স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করতেও হাজারদুয়েক ডলার লাগে। তারপর আছে যাতায়াতের খরচা। গাড়ি কিনলে তার মাসিক কিস্তি, পেট্রোল, পার্কিং, ইনশিয়োরেন্স মিলিয়ে হাজারখানেক ডলার লাগে। আছে পার্সোনাল ইনশিয়োরেন্স, হেলথ কেয়ারও। সেখানেও হাজারখানেক ডলার। খাওয়াদাওয়াতে কম করে হলেও পাঁচ-ছ'শো ডলার লাগেই। আছে ফোন, ইন্টারনেট, ইলেকট্রিক বিল, প্রপার্টি ট্যাক্স। মাসে দু'-একদিন কি মুভি দেখতে বা রেস্তরাঁতে খেতে ইচ্ছে করে না? তার মানে এই শহর বা শহরতলিতে একটু ভদ্রভাবে বেঁচে থাকতে গেলে মাসে পাঁচ-ছয় হাজার ডলার লাগেই। আমার হাজ়ব্যান্ড যত দিন বেঁচে ছিলেন, জীবনটাকে উপভোগ করেছি আমরা।"

আমি থই পাই না। সানফ্রান্সিসকো শহর বা শহরতলিতে একজন মানুষের ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার সঙ্গে এই সমুদ্রযাত্রার কী সম্পর্ক? তবে আমাকে বেশি ভাবতে হল না। ভদ্রমহিলা নিজেই খোলসা করে দিলেন ব্যাপারটা। বললেন, "এই জাহাজে যদি আমি একটা ভিতরের দিকের কেবিন কারও সঙ্গে শেয়ার করি, তবে আমাকে দিনপ্রতি পঞ্চাশ ডলার দিতে হয়। তার মানে মাসে দেড় হাজার ডলার। যেখানে আমার খাবারের দাম দিতে হয় না, উপরন্তু বিনামূল্যে সিনেমা-থিয়েটার দেখতে পারি, ডাক্তার বা ওষুধের খরচা দেয় আমার ট্র্যাভেল ইনশিয়োরেন্স কোম্পানি। টিকিট কেনার সময়ই ট্র্যাভেল ইনশিয়োরেন্সটা করিয়ে নিই আমি। শুধু দু'বেলা দুটো ড্রিঙ্ক কিনি আমি। তা-ও হিসেব করে। লাঞ্চের আগে এক ক্যান বিয়ার কিনি সাত ডলার দিয়ে, আর ডিনারের আগে এক গ্লাস ওয়াইন দশ ডলার দিয়ে। অর্থাৎ আড়াই থেকে তিন হাজার ডলারের মধ্যে আমি একটা বিলাসবহুল জীবন যাপন করতে পারি। হ্যাঁ, জাহাজের ভিতরের দিকে ঘর নেওয়ার জন্য কোনও পোর্টহোল বা ব্যালকনি থাকে না ঘরটার। সেটুকুই যা কষ্টের। তবে এত বড় খোলামেলা ডেকটা রয়েছে কী করতে? এটাই আমার সব কষ্ট লাঘব করে দেয়।"

আমার মুখটা হাঁ হয়ে গিয়েছে। হোটেলে চাকরি করার সময় নানা ধরনের জীবন কাহিনি শুনেছি। কিন্তু এমন অদ্ভুত এক চলমান জীবনযাপনের কথা শুনিনি কখনও!

তবে এক গ্লাস ওয়াইনের পর আমিও প্রগলভ হয়ে উঠি। বলে ফেলি, "তাহলে জলের প্রতি আকর্ষিত হয়ে আপনি সমুদ্রযাত্রা করেন না কিংবা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকেন না। আসলে আপনি নিরুপায়।"

লিয়ান বলেন, "নিরুপায় তো বটেই! তবে কী জানো, এই প্রশান্ত মহাসাগরের জলই আমার মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়েছে। তাই তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে থাকি। মনে হয়, যেন আমার মেয়েকেই ছুঁয়ে আছি। তার দেহটাও তো শেষবার দেখতে পাইনি আমি। মনে হয়, সে যদি একদিন ভেসে ওঠে মৎসকন্যার মতো! তাই তো আমি তাকিয়ে থাকি ঢেউগুলোর দিকে।"

ভদ্রমহিলার মুখের উপরে ঘূর্ণায়মান সার্চ লাইটটা এসে পড়ল ক্ষণিকের জন্য। তাঁর মুখের পেশিগুলো বেঁকেচুরে যাচ্ছে। এক অব্যক্ত যন্ত্রণা যেন আক্রোশ হয়ে ফুটে উঠছে সেখানে।

ভোর হয়ে আসছে। দিগন্তে হিলোর আভাস। সেখানকার আগ্নেয়গিরিগুলোও আক্রোশে জ্বলে উঠে অগ্ন্যুদ্গার করছে। সেই গলিত লাভাস্রোত সমুদ্রের জলে পড়ে হিসহিসিয়ে উঠছে। তারাও যেন নিরুপায়। যেন সমুদ্রযাত্রা ছাড়া গতি নেই তাদেরও।

কেবিনের দিকে যেতে যেতে আমি ভাবি, এই যাপনচিত্রগুলো দেখার জন্যই কি নিয়তি এখানে টেনে এনেছিল আমাকে? নাকি স্বাভাবিক নিয়মেই বাহিত হয়ে এসেছিলাম? নির্ঝরিণীদের অন্তিম গন্তব্যও তো সমুদ্রই!

অলংকরণ: অসীম হালদার

ইউরোপীয় স্বাদ-সমাচার



পর্তুগাল থেকে ইংল্যান্ড—ইউরোপের দশটা দেশের, বারোটা অথেনটিক রেসিপি। রাঁধলেন শেফ **দেবজিৎ মজুমদার**। শোনালেন তার গল্পও। সংকলনে **পৃথা বসু**।

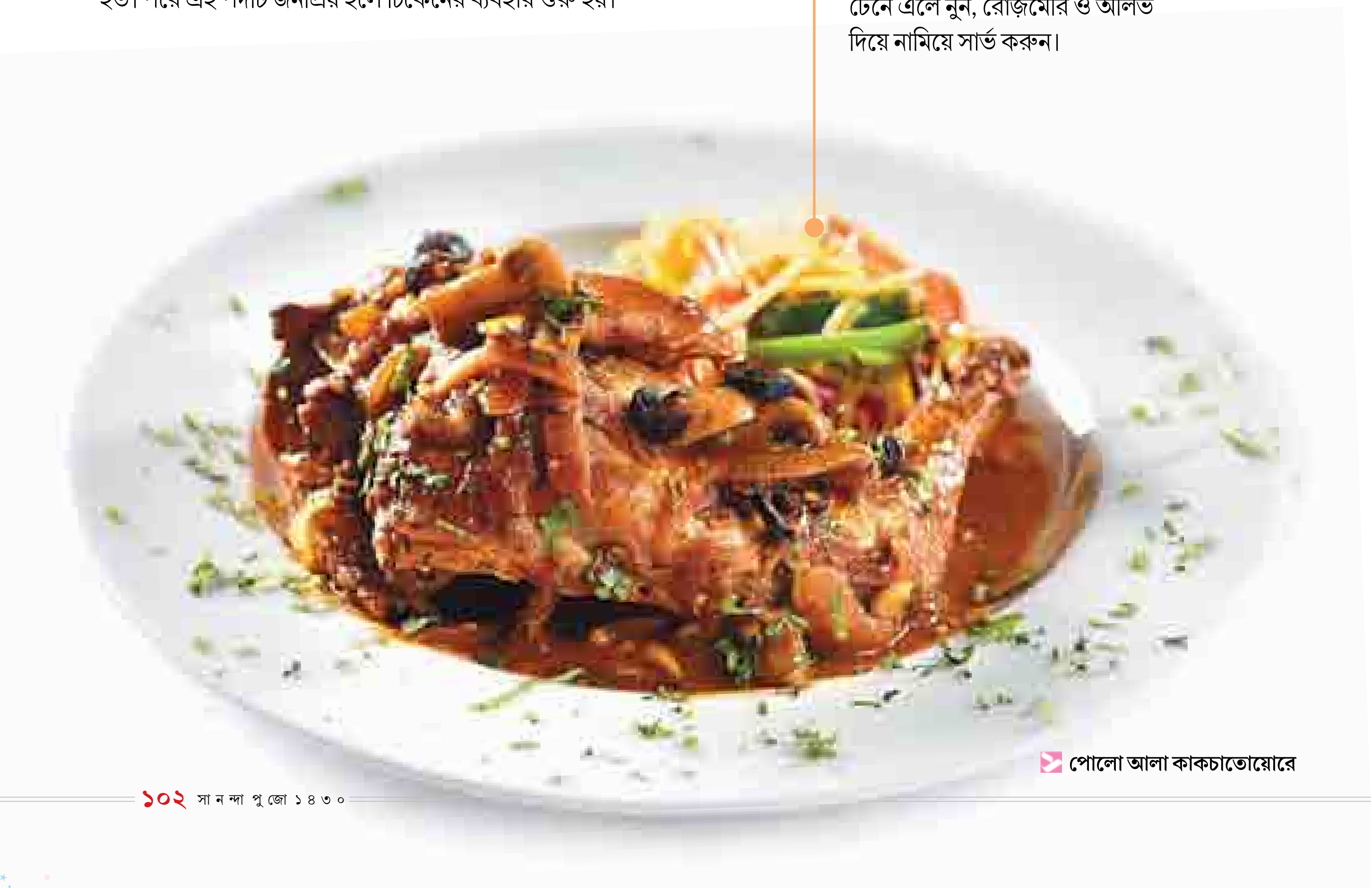
ইতালীয় ভাষায় ‘পোলো’ কথার অর্থ চিকেন এবং ‘ক্যাসিয়াতোরা’-র অর্থ শিকারি। এই পদ যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন তা তৈরি করা হত খরগোশের মাংস দিয়ে। অর্থাৎ যে পশু-পাখিগুলো শিকার করা হত, তা-ই দিয়েই তৈরি করা হত। পরে এই পদটি জনপ্রিয় হলে চিকেনের ব্যবহার শুরু হয়।

পোলো আলা কাকচাতোয়োরে

(Pollo Alla Cacciatori), **ইতালি**

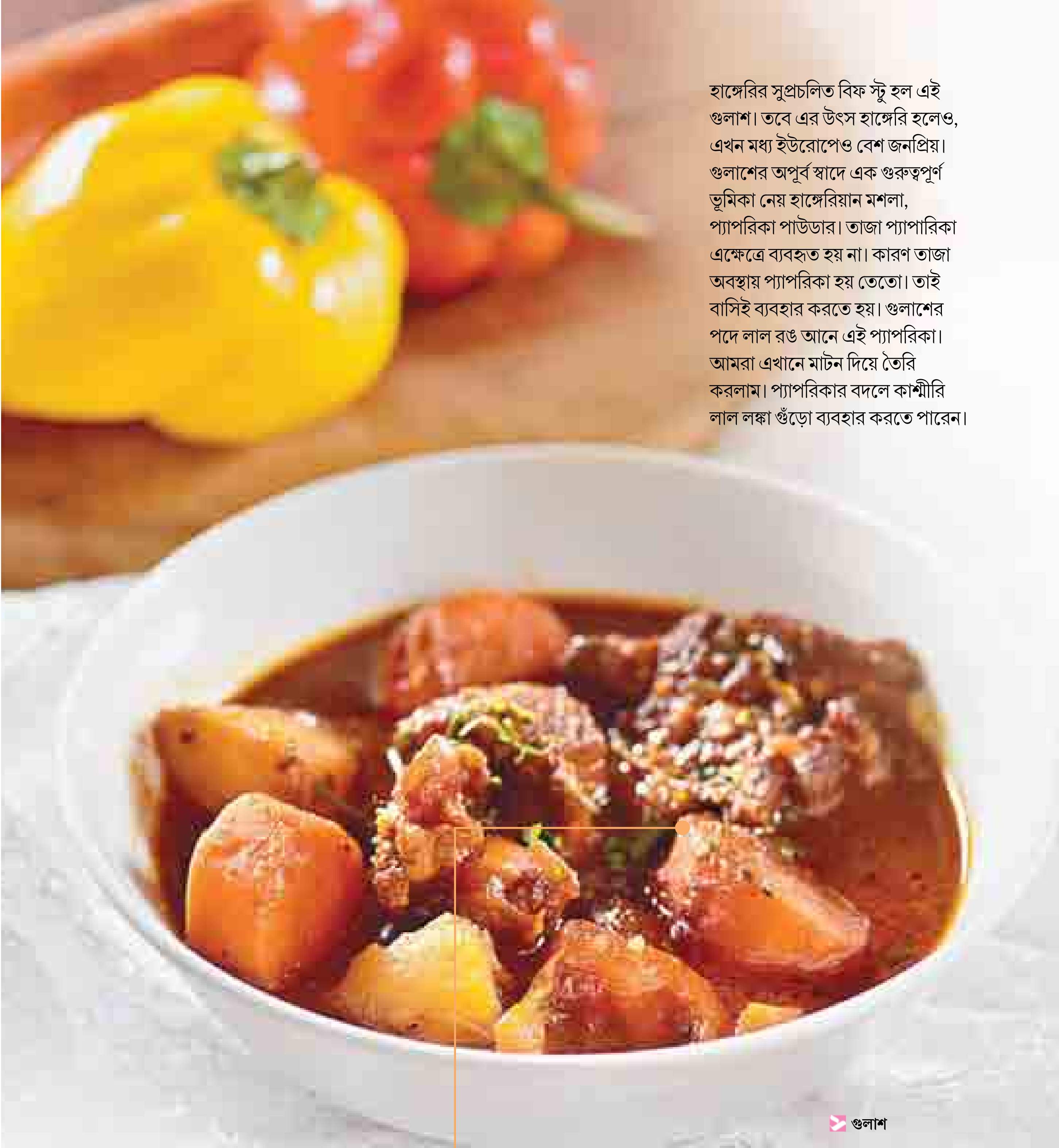
■ **উপকরণ:** ইংলিশ ড্রেসড চিকেন অর্ধেক অংশ, অলিভ অয়েল ২০ মিলি, হোয়াইট ম্যারিনেশন লিকার ৭০ মিলি, রসুন কুচি ২ টেবলচামচ, গাজর কুচি ১ টেবলচামচ, পেঁয়াজ কুচি ৩ টেবলচামচ, সেলেরি পাতা কুচি ১ টেবলচামচ, টমেটো কুচি ২টো, মাশরুম ৬-৮টা, চিকেন স্টক পরিমাণমতো, রেড ওয়াইন ২০ মিলি, রোজ়মেরি স্বাদমতো,অলিভ ৬-৮টা, নুন স্বাদমতো।

■ **প্রণালী:** হোয়াইট ম্যারিনেশন লিকারে (হোয়াইট ওয়াইন, সর্ষে, স্বাদমতো নুন, শা-মরিচের মিশ্রণ) চিকেন ২-৩ ঘণ্টা ম্যারিনেট করে সতে করে রেখে দিন। তেল গরম করে সেলেরি পাতা, রসুন, গাজর, পেঁয়াজ, মাশরুম, টমেটো ও চিকেন দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। স্টক দিয়ে অল্প ফুটিয়ে, দিন রেড ওয়াইন। কিছুটা টেনে এলে নুন, রোজ়মেরি ও অলিভ দিয়ে নামিয়ে সার্ভ করুন।



পোলো আলা কাকচাতোয়োরে

হাঙ্গেরির সুপ্রচলিত বিফ স্টু হল এই গুলাশ। তবে এর উৎস হাঙ্গেরি হলেও, এখন মধ্য ইউরোপেও বেশ জনপ্রিয়। গুলাশের অপূর্ব স্বাদে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় হাঙ্গেরিয়ান মশলা, প্যাপরিকা পাউডার। তাজা প্যাপারিকা এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। কারণ তাজা অবস্থায় প্যাপরিকা হয় তেতো। তাই বাসিই ব্যবহার করতে হয়। গুলাশের পদে লাল রঙ আনে এই প্যাপরিকা। আমরা এখানে মাটন দিয়ে তৈরি করলাম। প্যাপরিকার বদলে কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন।



গুলাশ

গুলাশ (Goulash), হাঙ্গেরি

■ **উপকরণ:** মাটন ৫০০ গ্রাম, রাইস ব্র্যান অয়েল ৩০ মিলি, মাখন ১০ গ্রাম, সেলেরি কুচি ১ টেবলচামচ, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবলচামচ, রসুন কুচি ১ টেবলচামচ, গাজর ২টো, বেলপেপার ২টো, আলু ২টো, স্টক, টমেটো পিউরি $^{১}/_{২}$ কাপ, প্যাপরিকা ১ টেবলচামচ, নুন, শা-মরিচ, পার্সলেপাতা কুচি।

■ **প্রণালী:** প্যানে তেল ও মাখন একসঙ্গে গরম করে, তাতে সেলেরি পাতা, রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। এবার গাজরের টুকরো, আলুর টুকরো দিয়ে রান্না করুন। এরপর দিন মাটন ও টমেটো পিউরি। প্যাপরিকা দিয়ে যোগ করুন মাটন স্টক। অল্প আঁচে রান্না হতে দিন। সেদ্ধ হয়ে এলে স্বাদমতো নুন ও শা-মরিচ দিন। নামানোর আগে যোগ করুন মাখন। তারপর পার্সলে পাতা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

এই পদের উল্লেখ পাওয়া যায় আঠারো শতকের গোড়ার দিকে। শাউডারের উৎপত্তি আয়ারল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলের ডিঙ্গল উপদ্বীপে। বলা হয়, স্থানীয় জেলেরা এই রেসিপিটি উদ্ভাবন করেন।

সিফুড চাওডার (Seafood Chowder), আয়ারল্যান্ড

■ **উপকরণ:** শ্রিম্প (খোলস সহ) ১০০ গ্রাম, কাঁকড়ার মাংস ১০০ গ্রাম, স্যামন মাছ ১৫০ গ্রাম, অলিভ অয়েল ২০ মিলি, লিক পাতা কুচি ২ চা-চামচ, সেলেরি পাতা কুচি ১ চা-চামচ, পার্সলে পাতার ডাঁটি কুচি ১ চা-চামচ, হলুদ পেঁয়াজ কুচি ২ টেবলচামচ, রসুন কুচি ১ টেবলচামচ, আলু (চৌকো করে কাটা) ২টো, আমেরিকান কর্ন ৩০ গ্রাম, ফিশ স্টক পরিমাণমতো, দুধের সর ১/২ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার ১/২ কাপ, নুন স্বাদমতো, শা-মরিচ স্বাদমতো, রসুন পাতা পরিমাণমতো, সাজানোর জন্য পার্সলে পাতা।

■ **প্রণালী:** প্রথমে প্যানে অলিভ অয়েল গরম করুন। তাতে লিক পাতা, সেলেরি পাতা ও পার্সলে পাতার ডাঁটি দিয়ে নেড়েচেড়ে নিন। এবার তাতে পেঁয়াজ, রসুন দিয়ে হালকা হাতে নেড়ে একে একে যোগ করুন স্যামন, শ্রিম্প ও কাঁকড়া। তারপর আলু, কর্ন ও স্টক দিয়ে অল্প আঁচে ফুটিয়ে নিন। রান্না হয়ে এলে পরিমাণমতো দুধের সর ও কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ঘন করে নিন। স্বাদমতো যোগ করুন নুন ও শা-মরিচ। উপর থেকে রসুন পাতা ছড়িয়ে, পার্সলে কুচি দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করন।



সিফুড চাওডার



অ্যালপারম্যাগরোনেন

উনিশ শতকের শেষে উত্তর সুইজ়ারল্যান্ডে পাস্তা দারুণ জনপ্রিয় হয়। বিশেষ করে পশুপালকদের মধ্যে। কারণ পাস্তা সহজেই সংরক্ষণ করা যেত। অ্যালপাইনের পশুপালকদের বলা হত 'অ্যালপার'। 'ম্যাগরোনেন' শব্দটির অর্থ ম্যাকারনি। তাই অনেকে এই পদকে অ্যালপানি ম্যাকারনিও বলেন।

অ্যালপারম্যাগরোনেন (Alpermagronen), সুইজ়ারল্যান্ড

■ **উপকরণ:** ম্যাকারনি বা পেনে পাস্তা ৩৫০ গ্রাম, অলিভ অয়েল ২০ মিলি, মাখন ১০ গ্রাম, প্রসেসড চিজ় ৫০ গ্রাম, সেদ্ধ আলু ২টো, দুধ ৩০০ মিলি, ক্রিম ১০০ মিলি, জায়ফল গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, বেকন ৪ স্লাইস, পেঁয়াজ ২টো, নুন, শা-মরিচ, সেদ্ধ আপেল ২টো, চিনি।

■ **প্রণালী:** তেল গরম করে বেকন ভেজে তুলে নিন। পেঁয়াজের বেরেস্তা করুন। সেদ্ধ আপেল ম্যাশ করে মাখন, নুন ও চিনি দিয়ে আপেল সস তৈরি করুন। পাস্তায় অলিভ অয়েল ছিটিয়ে ব্লাঞ্চ করুন। গরম দুধে পাস্তা ও সেদ্ধ আলু দিন। ক্রিম দিয়ে ভাল করে নাড়ুন। চিজ়, নুন, শা-মরিচ দিয়ে নামিয়ে নিন। জায়ফল গুঁড়ো, পেঁয়াজের বেরেস্তা ও বেকন দিয়ে সার্ভ করুন। সঙ্গে দিন আপেল সস।

ইংল্যান্ডের অত্যন্ত ট্র্যাডিশনাল ডেজ়ার্ট রেসিপি হল এই ব্রেড অ্যান্ড বাটার পুডিং। ইউরোপে এগারো এবং বারো শতকের প্রথম দিকে এবং ইংল্যান্ডে তেরো শতক থেকে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল পুডিং। তখন প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই থাকত পুডিং বোল, যাতে জমা করা হত বাসি পাউরুটির টুকরো। চিনি-মশলা মিশ্রিত গরম জলে পাউরুটির টুকরো ভিজিয়ে তৈরি করা হত পুডিং।

ব্রেড অ্যান্ড বাটার পুডিং (Bread & Butter Pudding), ইংল্যান্ড

■ **উপকরণ:** পাউরুটি ১০-১২টা, মাখন ১২৫ গ্রাম, কিশমিশ ৫০-৬০ গ্রাম, সুলতানা (বড় কিশমিশ) ৫০ গ্রাম, দুধ ১ লিটার, ডিমের কুসুম ৪টে, চিনি ৫০ গ্রাম, ভ্যানিলা এসেন্স ১০ মিলি, জায়ফল গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ।

■ **প্রণালী:** পাউরুটির প্রত্যেক পাশে ভাল করে মাখন লাগিয়ে কোণাকুণি করে কেটে নিন। এবার পাই ডিশে পাউরুটির টুকরোগুলো সাজান। তারপর দুধ, ডিমের কুসুম, চিনি, ভ্যানিলা এসেন্স ও জায়ফল গুঁড়ো একসঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে তৈরি করে নিন কাস্টার্ড মিক্সচার। উপর থেকে ছড়িয়ে দিন কিশমিশ ও সুলতানা। এবার তা পাউরুটির টুকরোগুলোর উপর ঢেলে দিন। ১০-১৫ মিনিট রেখে প্রি-হিটেড আভেনে ২০ মিনিট মতো বেক করুন। বেক হলে আলাদা আলাদা করে কেটে কোকো পাউডার বা গ্রেটেড চকোলেট দিয়ে পরিবেশন করুন।



ব্রেড অ্যান্ড বাটার পুডিং



ক্যালডেরাডা

ক্যালডেরাডা হল পর্তুগালের ফিশ স্টু। তবে আঞ্চলিক ভেদে আলাদা আলাদা উপকরণও ব্যবহৃত হয়। কোথাও প্রন দিয়ে তৈরি করা হয়, কোথাও বা ব্যবহৃত হয় কড। অনেকেই এই পদকে বলেন 'ফিশারম্যান স্টু'। চাইলে ভেটকি, চিংড়ি, বাসা, এমনকি আড় মাছ দিয়েও করতে পারেন।

ক্যালডেরাডা (Caldeirada), পর্তুগাল

■ **উপকরণ:** ভেটকি মাছ (টুকরো) ৩০০ গ্রাম, জল, নুন, লেবু, হোয়াইট ওয়াইন ৪০ মিলি, শা-মরিচ, সানফ্লাওয়ার অয়েল ২৫ মিলি, লিক পাতা কুচি ১ টেবলচামচ, সেলেরি পাতা কুচি ১ টেবলচামচ, পার্সেলে পাতার ডাঁটি কুচি ২ টেবলচামচ, রসুন কুচি ১ টেবলচামচ, টমেটো কুচি ১ টেবলচামচ, পেঁয়াজ কুচি ৪ টেবলচামচ, বড় আলু (ব্লাঞ্চ ও টুকরো করা) ২টো, গাজর ১টা, স্টক, সাজানোর জন্য পার্সলে পাতা কুচি।

■ **প্রণালী:** জলে লেবুর রস ও নুন দিয়ে মাছ আধঘণ্টা ডুবিয়ে রাখুন। তারপর জল ঝরিয়ে মাছে হোয়াইট ওয়াইন, নুন ও শা-মরিচ দিয়ে ম্যারিনেট করুন। তেল গরম করে দিন লিক পাতা, সেলেরি পাতা, পার্সলের ডাঁটি। এবার এতে পেঁয়াজ, রসুন যোগ করে রান্না হতে দিন। টমেটো দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করুন। এবার দিন আলু আর গাজর। সতে করুন। দিন মাছ ও পরিমাণমতো জল। অল্প আঁচে রান্না হতে দিন। নুন ও শা-মরিচ দিয়ে হোয়াইট ওয়াইন যোগ করুন। পার্সলে কুচি দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

ফ্রান্সের এক ক্লাসিক বিস্ত্রো রাস্টিক ডিশ হল এই 'কক ও ভ্যাঁ'। শোনা যায়, এই পদটির আবিষ্কর্তা নাকি রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজ়ার। যদিও এর তেমন কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

কক ও ভ্যাঁ (Coq Au Vin), ফ্রান্স

■ **উপকরণ:** ইংলিশ ড্রেসড চিকেন ৮০০ গ্রাম, মাখন ১৫০ গ্রাম, ছাঁচি পেঁয়াজ ১০০ গ্রাম, বাটন মাশরুম ৬০ গ্রাম, বেকন ২-৩ স্লাইস, গোটা রসুন ১টা, বোকে গার্নি (একগুচ্ছ অ্যারোম্যাটিক হার্ব) ১ আঁটি, রেড ওয়াইন ৫০০ মিলি, ময়দা ৫০ গ্রাম, নুন ও শা-মরিচ স্বাদমতো, স্টক পরিমাণমতো, সাজানোর জন্য পার্সলে পাতা, ক্রুটন।

■ **প্রণালী:** চিকেনে রেড ওয়াইন, নুন ও শা-মরিচ দিয়ে সারা রাত ম্যারিনেট করে নিন। প্যানে মাখন গরম করে, তাতে বেকনের স্লাইস দিয়ে সতে করে নামিয়ে নিন। এবার পেঁয়াজ ও মাশরুম বাদামি করে ভেজে তুলে নিন। এবার বোকে গার্নি ও রসুন দিয়ে চিকেন অল্প আঁচে ফুটিয়ে নিন। প্রয়োজন হলে চিকেন স্টক যোগ করতে পারেন। মাংস মোটামুটি সেদ্ধ হয়ে এলে, ঘন করার জন্য তাতে দিন বো মান্‌য়ে (সম পরিমাণ ময়দা ও মাখন দিয়ে তৈরি পেস্ট)। স্বাদমতো নুন ও শা-মরিচ দিয়ে নামিয়ে নিন। পার্সলে পাতা, ক্রুটন দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।



কক ও ভ্যাঁ

আঠারো শতকের শুরুতে এই পদটি আবিষ্কৃত হয়। তখন সারা দেশেই প্রায় খাবারের অনটন। তাই ইংল্যান্ডের গৃহিণীরা চেষ্টা করতেন, যাতে কোনও খাবারই নষ্ট না হয়। আগের দিনের বেঁচে যাওয়া খাবার দিয়েই তাঁরা নতুন নতুন পদ তৈরি করতেন। সেখান থেকেই সুস্বাদু এই 'শেফার্ড'স পাই'-এর উৎপত্তি।

শেপার্ড'স পাই (Shepherd's Pie), ইংল্যান্ড ■ **উপকরণ:** ল্যাম্ব বা মাটন কিমা ৫০০ গ্রাম, রাইস ব্র্যান অয়েল ৩০ মিলি, পেঁয়াজ কুচি ৩ টেবলচামচ, গাজর কুচি ৩ টেবলচামচ, সেলেরি কুচি ১ টেবলচামচ, উরস্টারশায়ার সস ১ টেবলচামচ,স্টক ৩০০ মিলি, সেদ্ধ করা আলু ৫০০ গ্রাম, দুধ ৫০ মিলি, মাখন ৭৫ গ্রাম, নুন ও শা-মরিচ স্বাদমতো।

■ **প্রণালী:** প্রথমে তেল গরম করে মিহি করে কুচনো পেঁয়াজ, গাজর, সেলেরি সতে করে নিন। তাতে ল্যাম্ব বা মাটনের কিমা দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে স্টক ও সস যোগ করে খানিকক্ষণ ফুটতে দিন। স্বাদমতো নুন দিয়ে নামিয়ে নিন। এবার সেদ্ধ আলুগুলোর সঙ্গে পরিমাণমতো নুন, শা-মরিচ, মাখন ও দুধ মিশিয়ে ম্যাশ করুন। একটা পাই ডিশে ভাল করে মাখন ব্রাশ করে, তাতে আগে থেকে তৈরি করা মাটন বা ল্যাম্বের কিমা ডিশ জুড়ে বসান। তার উপর ম্যাশ করা সেদ্ধ আলুর স্তর তৈরি করুন। তাতে আবার ভাল করে মাখন ব্রাশ করে প্রি-হিটেড আভেনে দিন। কিছু ক্ষণ পর বের করে, তাতে আবার মাখন ব্রাশ করে আভেনে দিন। বাদামি রং এলে, বের করে পরিবেশন করুন।



শেপার্ড'স পাই

পর্ক শ্নিৎজ়েল (Pork Schnitzel), জার্মানি

উপকরণ: পর্ক ৬০০ গ্রাম, ময়দা ২০০ গ্রাম, নুন ও শা-মরিচ স্বাদমতো, ডিম ২টো, ব্রেড ক্রাম, সাদা তেল পরিমাণমতো, লেবু ১টা, পার্সলে পাতা ১ আঁটি।

প্রণালী: প্রথমে কাটলেট প্যাডের সাহায্যে মাংসটি পাতলা টুকরো করে কেটে নিন। ডিম দুটো ফেটিয়ে আলাদা রাখুন। এবার মাংসের টুকরোতে নুন ও শা-মরিচ মেশানো ময়দা রেখা ফেটানো ডিমে ডোবান। তারপর ব্রেড ক্রাম দিয়ে কোট করুন। এবার প্যানে তেল গরম করে, কোট করা মাংসগুলো ডুবো তেলে ভাজুন, যত ক্ষণ না সোনালি রং আসে। লেবুর টুকরো, পার্সলে পাতা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন। চাইলে সঙ্গে বাঁধাকপির স্যালাডও সার্ভ করতে পারেন।

‘শ্নিৎজ়েল’ কথাটা এসেছে ‘স্নিৎজ়’ থেকে, যার অর্থ হল কাটা। জার্মানির অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং ন্যাশনাল ডিশের মধ্যে অন্যতম হল এই পর্ক স্নিৎজ়েল। এই পদকে বলা যেতে পারে একরকম জার্মান কাটলেট। শুধু পর্ক নয়, চাইলে চিকেন দিয়েও তৈরি করতে পারেন।



পর্ক শ্নিৎজ়েল

এই পদটির
আবিষ্কার স্পেনে।
যদিও এই মুহূর্তে
অ্যালবনদিগাস
সবচেয়ে জনপ্রিয়
মেক্সিকোতে।



অ্যালবনদিগাস

অ্যালবনদিগাস (Albondigas), স্পেন

■ **উপকরণ:** মাটন কিমা ২০০ গ্রাম, ব্রেড ক্রাম, দুধ সামান্য, নুন ও শা-মরিচ স্বাদমতো, সয়াবিন অয়েল ১৫ মিলি, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবলচামচ, রসুন কুচি ১ টেবলচামচ, গাজর (গোল করে কাটা) ১টা, আলু (চৌকো করে কাটা) ২টো, টমেটো সালসা ১ কাপ, মাটন স্টক পরিমাণমতো, সাজানোর জন্য ধনেপাতা।

■ **প্রণালী:** প্রথমে মাটন কিমার সঙ্গে স্বাদমতো নুন, শা-মরিচ ও সামান্য দুধ মিশিয়ে বলের আকারে গড়ে নিন। এবার সসপ্যানে তেল গরম করে তাতে রসুন ও পেঁয়াজ দিয়ে সতে করুন। এবার সালসা দিয়ে হালকা হাতে নাড়াচাড়া করুন। এরপর যোগ করুন গাজর ও আলু। মাটন স্টক দিয়ে অল্প আঁচে ফোটান। এবার তাতে মাটনের বলগুলো দিয়ে রান্না হতে দিন। নামিয়ে নিয়ে ধনেপাতা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

গ্রিলড স্যামন উইথ ডিল সস (Grilled salmon with dill sauce), নরওয়ে

■ **উপকরণ:** স্যামন মাছ ৫০০ গ্রাম, লেবু ১টা, জল, নুন, হোয়াইট ওয়াইন ৫০ মিলি, সর্ষে গুঁড়ো ১ টেবলচামচ, রসুন কুচি ১ টেবলচামচ, শা-মরিচ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, অলিভ অয়েল পরিমাণমতো। **ডিল সস তৈরির জন্য:** মেয়নিজ়, ব্রাউন সুগার ১ টেবলচামচ, ডিল পাতা (কুচনো) ১০ গ্রাম, সাজানোর জন্য অ্যাসপারাগাস।

■ **প্রণালী:** প্রথমে মাছের টুকরো নুন ও লেবুর রস দিয়ে খানিক ক্ষণ জলে ডুবিয়ে রাখুন। জল ঝেড়ে মাছের টুকরোগুলোকে হোয়াইট ওয়াইন, নুন, শা-মরিচ, সর্ষে গুঁড়ো ও রসুন কুচি দিয়ে অন্তত ১ ঘণ্টা ম্যারিনেট করুন। অন্যদিকে অ্যাসপারাগাসের টুকরো করে ব্লাঞ্চ করে নিন। প্যানে অল্প মাখন দিয়ে হালকা হাতে নেড়ে প্লেটে সাজিয়ে রাখুন। মাছের ম্যারিনেশন হলে অলিভ অয়েল দিয়ে গ্রিল করুন। রাখুন সাজানো অ্যাসপারাগাসের উপর। এবার মেয়নিজ়ের সঙ্গে ব্রাউন সুগার, কুচনো ডিল পাতা ভাল করে মিশিয়ে ডিল সস তৈরি করে নিন। গ্রিল করা মাছের উপর ডিল সস দিয়ে পরিবেশন করুন।

এটি নরওয়ের খুবই জনপ্রিয় একটি পদ। নরওয়ের যে কোনও ট্র্যাডিশনাল খাবারেই সামুদ্রিক মাছের একটা প্রাধান্য থাকে। যেমন এতেও রয়েছে। এখানকার রেসিপির সঙ্গে নর্ডিক দেশগুলোর বিভিন্ন রেসিপির মিল পাওয়া যায়।



গ্রিলড সামন উইথ ডিল সস



পিয়ার্স বেল হেলেন

১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এই ডেজ়ার্ট আবিষ্কার করেছিলেন ফ্রান্সের বিখ্যাত শেফ অগাস্তা এশকফিয়ার। উনি ‘বেলহেলেন’ নামে এক অপেরা দেখার পর এই ডেজ়ার্টটা তৈরি করেন। আর নামও দেন অপেরা শোয়ের নামেই।

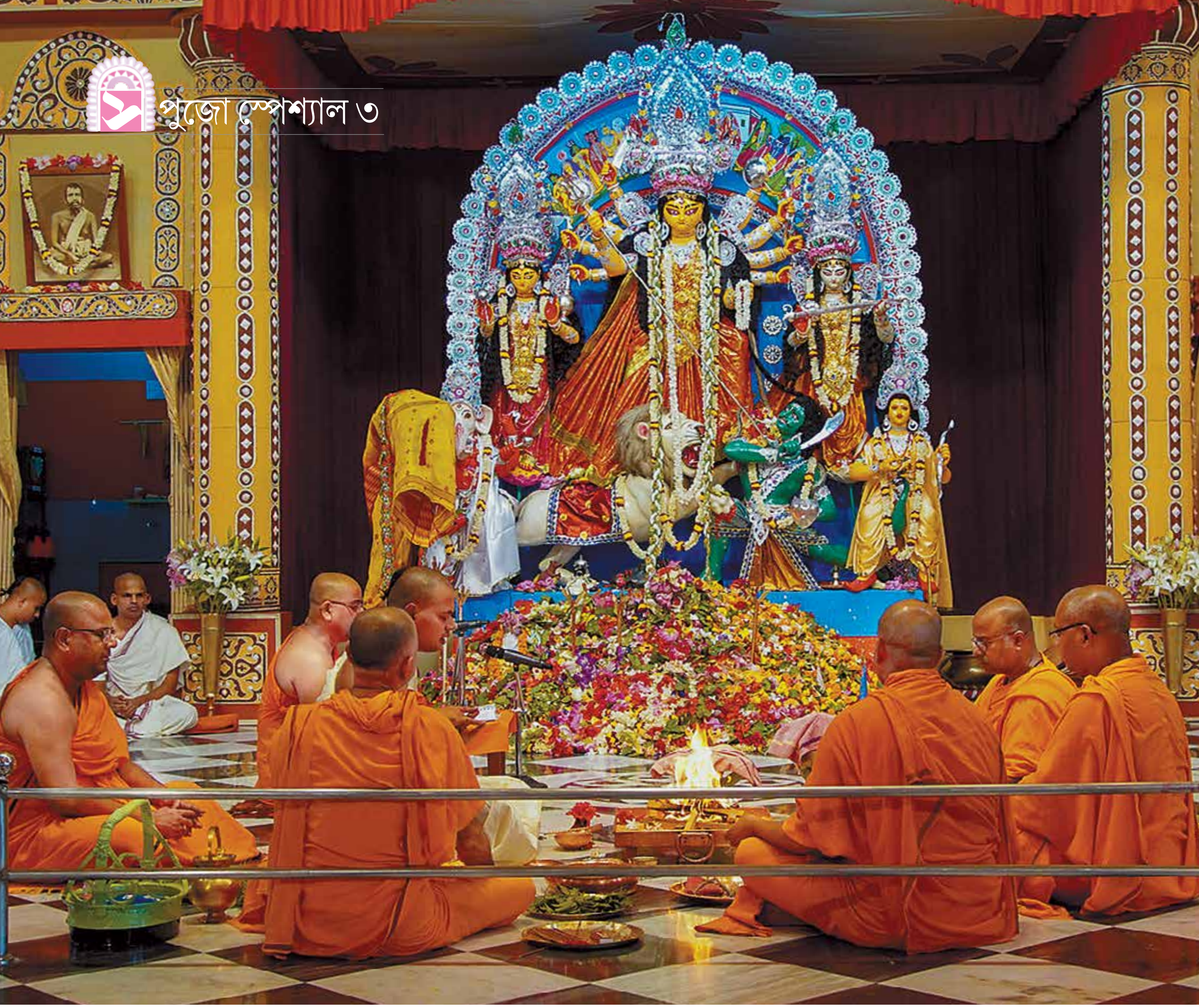
পিয়ার্স বেল হেলেন

(Pears Belle Helen), ফ্রান্স

■ **উপকরণ:** নাশপাতি ২টো, চিনির সিরা (ঘন), ভ্যানিলা পড বা ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা-চামচ, চকোলেট ফাজ বা ঘন চকোলেট সিরাপ ১ কাপ, ব্র্যান্ডি সামান্য, ভ্যানিলা আইসক্রিম ২ স্কুপ, সাজানোর জন্য পুদিনা পাতা।

■ **প্রণালী:** প্রথমে নাশপাতির খোসা ছাড়িয়ে নিন। নীচের অংশটা সমান করে কাটুন, যাতে ভালভাবে বসে। চিনির সিরা তৈরি করে নিন। সুগার সিরাপের মধ্যে খোসা ছাড়ানো নাশপাতি দুটো বসান। তাতে যোগ করুন ভ্যানিলা পড অথবা ভ্যানিলা এসেন্স এবং সামান্য ব্র্যান্ডি। অল্প ঠান্ডা হলে ফ্রিজে রাখুন অন্তত ৪-৫ ঘণ্টা। পরিবেশনের আগে গরম চকোলেট ফাজ বা ঘন চকোলেট সিরাপে ভাল করে ডুবিয়ে নিন। ভ্যানিলা স্কুপ সহযোগে ও পুদিনা পাতা দিয়ে সাজিয়ে সার্ভ করুন।

যোগাযোগ: ৯৮৩০০৯১৯৫৫
ছবি: শুভেন্দু চাকী, **রূপায়ণে:** অসীম হালদার
লোকেশন: রেড কিচেন অ্যান্ড লাউঞ্জ, ডায়মন্ড প্লাজ়া



মঠ নিবাসীর মাতৃ-বোধন

বেলুড়ের দুর্গাপুজো বাঙালিদের জীবনে এক বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। কীভাবে? উত্তর খুঁজলেন **উপমা মুখোপাধ্যায়।**

উত্তরের সাবেক পুজো হোক বা দক্ষিণের ঝলমলে থিমপুজো, উন্মাদনা থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে দশভুজার আরাধনা করছে গঙ্গাপারের বেলুড় মঠ। প্রতি বছর এখানকার পুজো দেখতে লাখ লাখ ভক্ত সমাগম হয়। স্বামী বিবেকানন্দের হাত ধরে গোড়াপত্তন হওয়া এই পুজোর নেপথ্যে রয়েছে কিছু ইতিহাস, কিছু রোমাঞ্চ। শুধু পুজো ঘিরেই নয়, পুজোর ভোগেও রয়েছে হাজার একটা রীতি। গল্পকথা, মিথ, আধ্যাত্মিকতা সঙ্গী তারও।

গোড়াপত্তনের গোড়ার কথা

১৯০১-এর শুরুর দিকে বাংলাদেশ আর অসম ঘুরে ফেরার পর স্বামীজি একদিন শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে রঘুনন্দনের 'অষ্টবিংশতি-তত্ত্ব' বইটি নিয়ে আসার কথা বললেন, দুর্গাপুজোর নিয়ম নীতি পড়বেন বলে। তিনি নাকি ভাবচক্ষে দেখেছেন, এই বছর মঠে প্রতিমায় দুর্গাপুজো হচ্ছে। পুজোর অনুমতি চেয়ে স্বামী প্রেমানন্দকে পাঠালেন মা সারদার কাছে। মা সারদা তাঁর প্রিয় নরেনের আবদার ফেললেন না। তাঁর অনুমতি পাওয়ার পর স্বামীজি গেলেন মিশনের



তদানীন্দন প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে। এদিকে তিনিও জানালেন, দিনকতক আগে গঙ্গার ধারে বসে তিনি মা দুর্গার অবয়ব দেখতে পেয়েছেন। এক লালপেড়ে শাড়ির মেয়ে যেন দক্ষিণেশ্বরের দিক দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে মঠের বেলতলায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁদের দু'জনের এইসব কথায় মঠে হইচই পড়ে গেল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে প্রতিমাই বা পাওয়া যাবে কোথায়? ব্রহ্মানন্দ তখন কৃষ্ণলালকে পাঠালেন কুমোরটুলি। তখন এত বেশি পুজো হত না। আগে থেকে অর্ডার না করা থাকলে কুমোরটুলিতে প্রতিমা পাওয়া দুষ্কর হত। কিন্তু সেখানে পৌঁছনোর পর আশ্চর্যজনকভাবে দেখা যায়, একটিমাত্র প্রতিমাই পড়ে রয়েছে। যাঁদের সেই প্রতিমা বায়না করা ছিল, তাঁরা কোনও কারণে আর নিতে আসেননি। বোধনের দুই দিন আগে কৃষ্ণলাল, নির্ভয়ানন্দ ও আরও কয়েকজন সন্ন্যাসী মিলে নৌকায় করে প্রতিমাটি নিয়ে আসেন। সেই প্রতিমাতেই বেলুড় মঠের প্রথম দুর্গাপুজো সম্পন্ন হয়। এরপর ভক্তদের থেকে পাওয়া সামান্য দানে পুজোর ব্যবস্থা হল। স্বামীজির ইচ্ছায় ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলালই পুজোর ভার নিলেন, তন্ত্রধারক হলেন ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী। কিন্তু মূর্তিপুজো করতে গিয়ে স্বামীজি তাঁর জ্যান্ত দুর্গাকে কী করে ভুলে যাবেন? মনস্থির করলেন, একই সঙ্গে পুজো হবে মা সারদারও। বোধনের আগের দিন তাঁকে নিয়ে আসা হল বেলুড়ে, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। পুজোর সংকল্পও হল শ্রীমায়ের নামেই। স্বামীজির প্রিয় বেলতলাতেই হল সপ্তমী পুজোর অধিবাস। পুজো শেষে মা ঠাকরুণের হাত দিয়ে যজ্ঞদক্ষিণান্ত করানো হল। দুঃস্থদের নারায়ণ জ্ঞানে খাওয়ানো হল। অষ্টমীর দিন স্বামীজির তীব্র অসুস্থতা সত্ত্বেও নবমী নিশি মাতোয়ারা হল তাঁর প্রাণঢালা গানে। তাঁর কণ্ঠে শোনা গেল সেই সব গান, যা এক কালে গাইতেন রামকৃষ্ণদেব স্বয়ং। বেলুড়ের দুর্গাপুজোয় স্বামীজির উপস্থিতি সেইবারই প্রথম, সেইবারই শেষ। কারণ পরের বছরই তিনি স্থূলদেহ ত্যাগ করেন।



অষ্টমীর কুমারী পুজো

বোধন থেকে বিসর্জন

দুর্গাপুজোর দিন ক্ষণ স্থির করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে দুটি পঞ্জিকা মেনে চলা হয়। একটি দৃকসিদ্ধ বা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত, অপরটি গুপ্ত প্রেস বা প্রচলিত সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয়টিই বাঙালি হিন্দু সমাজে সব শুভ অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শুরুর দিন থেকে আজ পর্যন্ত বেলুড়ে পুজো হয় বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মেনেই। এই পত্রিকাটি খানিক বিজ্ঞান নির্ভর। স্বামীজির বিজ্ঞানমনস্কতাই এর কারণ বলে মনে করা হয়। এর ফলে মাঝেমধ্যেই মঠের পুজোয় দিন ক্ষণের হেরফের হয়। ১৯০১-এর পর থেকে নানা কারণে বেলুড়ে দুর্গাপুজো করা সম্ভব হয়নি। নিয়মিত পুজো শুরু হয় ১৯১৩ থেকে। প্রতি বছর প্রথা মেনে পঞ্চমীর দিন বোধন হয়। সংকল্প হয় মা সারদার

কিন্তু মূর্তিপুজো করতে গিয়ে স্বামীজি তাঁর জ্যান্ত দুর্গাকে কী করে ভুলে যাবেন? মনস্থির করলেন, একই সঙ্গে পুজো হবে মা সারদারও।



বোধনের কল্পারম্ভ

নামেই। বোধনের সময় দেবী ও বেলগাছের পুজোর পর ছাব্বিশটি 'মাঙ্গলিক দ্রব্যের' শুদ্ধিকরণ করা হয়। ষষ্ঠীর দিন সকালে দেবীর স্নান, সপ্তমী থেকে শুরু হয় সন্ধ্যারতি। প্রথম বছর ষষ্ঠীর দিন স্বামীজি আগমনি গান গেয়ে পুজোর আনুষ্ঠানিক সুচনা করেছিলেন। এখনও এ প্রথার অন্যথা হয় না। অষ্টমী ও নবমীতে অনুষ্ঠিত হয় মহাস্নান ও ষোড়শোপচারপূজা। অষ্টমীর পুজোয় নয়টি ছোট ঘট প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাতে দেওয়া হয় আলাদা আলাদা রঙের পতাকা। নয় শক্তিকে আহ্বান করা হয় ওই ঘটগুলির মধ্যে। তারপর প্রথমে চৌষট্টি জন, পরে এক কোটি যোগিনীর আরাধনা করা হয়। এরপর দুর্গার নয়টি রূপের পুজো হয়। এখানকার পুজোর আর একটি বৈশিষ্ট্য হল অষ্টমীর কুমারী পুজো। সেই ১৯০১ থেকেই এই প্রথা চালু রয়েছে। প্রথম বছরে এখানে নয় জন কুমারী মেয়ের পুজো হয়। তাদের মধ্যে একজনকে পুজো করেন বিবেকানন্দ স্বয়ং। পৃথিবীর সকল নারীই জগন্মাতা, এই ধারণা থেকেই কুমারী পুজোর প্রবর্তন হয়। কুমারী পুজো আর সন্ধি পুজো দেখার জন্য বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর মানুষ ভিড় করেন। আগে পুজো হত নাটমন্দিরে। পরে ভক্তদের জন্য তা মন্দিরের পশ্চিম দিকের বারান্দায় নিয়ে আসা হয়। শাস্ত্রমতে, এক থেকে ষোলো বছর বয়সি মেয়েরা কুমারী হিসেবে নির্বাচিত হতে পারে। এই বিষয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। এক এক বয়সি মেয়েদের এক এক রকম নাম। এক বছরের পুজিতা কুমারীর নাম 'সন্ধ্যা', দুই বছরের কুমারী হলে 'সরস্বতী', তিন বছরের কুমারী হলে 'ত্রিধামূর্তি', চার বছরের হলে 'কালিকা', পাঁচ বছরের হলে 'সুভগা', ছয় বছরের হলে 'উমা', সাত বছরের হলে 'মালিনী', আট বছরের হলে 'কুব্জিকা', নয় বছরের হলে 'কালসন্দর্ভা', দশ বছরের হলে 'অপরাজিতা', এগারো বছরের হলে 'রুদ্রাণী', বারো বছরের হলে 'ভৈরবী', তেরো বছরের হলে 'মহালক্ষ্মী', চোদ্দ বছরের হলে 'পীঠনায়িকা', পনেরো বছরের হলে 'ক্ষেত্রজ্ঞা', ষোল বছরের হলে 'অম্বিকা'। শোনা যায়, স্বামীজি প্রথম বছর পশুবলি দিতেও চেয়েছিলেন। অবশেষে মা সারদার নিষেধে ক্ষান্ত দেন। এখন বলি দেওয়া হয় চালকুমড়ো, শশা আর আখের। বিসর্জনের পুজো শেষ হওয়ার পর প্রতিমাকে বরণ, মিষ্টিমুখ করানো হয়। সম্পন্ন হয় কনকাঞ্জলিও। মা সারদার মন্দিরের সামনের গঙ্গার ঘাটেই প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়।

প্রথম বছর ষষ্ঠীর দিন স্বামীজি আগমনি গান গেয়ে পুজোর আনুষ্ঠানিক সুচনা করেছিলেন। এখনও এ প্রথার অন্যথা হয় না।

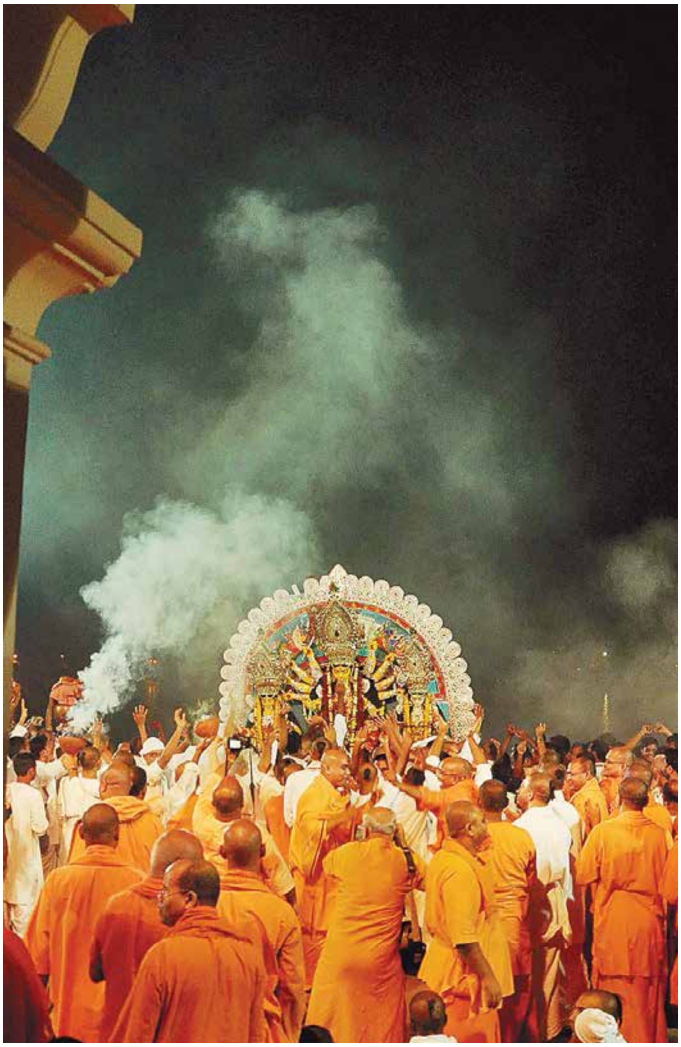
'মা শতমুখে খান...'

বেলুড় মঠে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভোগ নিবেদন করার রীতি রয়েছে। পিতলের এক বড় হাঁড়ি খিচুড়ি আর ভাজা মশলা দিয়ে ইলিশ মাছ সমেত এই বিশেষ ভোগের নাম 'বাল্যভোগ'। খিচুড়ি রান্নার জন্য ঘুসুড়ি থেকে বরাত দিয়ে আনানো হয় ঘনশ্যাম শালকিয়াকে। সঙ্গে থাকে তাঁর তেত্রিশ জন সহযোগী। তাদের নিয়ে প্রসাদ বিতরণের আগের দিন রাত ন'টা থেকে শুরু হয় সব্জি ভাজা, রান্না শুরু হয় রাত দু'টো থেকে। ৪০জন ব্রহ্মচারী আর ৪০জন স্বেচ্ছাসেবক

শুধুমাত্র তরকারি কাটার কাজে নিয়োজিত থাকেন। ছ'টা কড়াইতে একসঙ্গে রান্না হয়। এখনও বেলুড়ের অষ্টমীর খিচুড়ি প্রসাদের জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি একটুও। দেবীকে সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত আমিষ ভোগ দেওয়ার চল রয়েছে। খিচুড়ির সঙ্গে দেওয়া হয় গোটা ইলিশ মাছ ভাজা। মোট দশটি থালার মধ্যে আটটিতে থাকে আমিষ ভোগ। দুটি নিরামিষের থালা শিব ও নারায়ণের জন্য। চাল-ডালের প্রসাদী খিচুড়িতে দেওয়া হয় সমপরিমাণ সব্জি। সঙ্গে থাকে টমেটো, আমড়া ও কুমড়ো দিয়ে সুস্বাদু চাটনি। মাকে নিবেদন করার অষ্টমী দ্বিপ্রাহরিক ভোগ সাজানো হয় ভাত, ডাল, শুক্তো, মাছ, পাঁচ রকমের ভাজা এবং পাঁচ রকমের মিষ্টি দিয়ে। তমলুক থেকে আনানো হয় গয়না বড়ি। ভোগ বিতরণ চলে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভক্ত আসেন অবশ্যই অষ্টমীর দিন। দশমীর সকালে 'শীতল ভোগ' অর্থাৎ ঠান্ডা করা রান্না খাবার ভোগ দেওয়া হয়। বিকেলে বিসর্জনের পর চিঁড়ে, দই, নানা রকম ফল, নাড়ু, কাজুবাদাম, সন্দেশ সহযোগে দধিকর্মা ভোগ দেওয়া হয়। বিজয়ার পর দেওয়া হয় প্রসাদী গজা দিয়ে।

গল্প বাকি আরও

তবে কি বেলুড়ে দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল শুধু ইচ্ছের বশেই? আজ্ঞে না! শোনা যায়, এই সিদ্ধান্তের পিছনে বিবেকানন্দের এক গভীর দেশাত্মবোধও জড়িয়ে রয়েছে। তখন চলছে বাঙালির নিজস্ব ইতিহাস পুনরুদ্ধারের কাজ। সাহিত্যিক, ধর্মসংস্কারক, সমাজসংস্কারকরা নিরন্তর চেষ্টা চালাচ্ছেন আগ্রাসী ইউরোপীয়ান সংস্কৃতির বিপ্রতীপে বাংলার সংস্কৃতিকে প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে নিয়ে আসার। দেশমাতাকে স্বাধীন করার জন্য যে শৌর্য, বীরত্ব ও ত্যাগের প্রয়োজন, শক্তির আরাধনাকে মান্যতা দিয়ে বিবেকানন্দ বাঙালি জাতির কাছে পৌঁছতে চেয়েছিলেন সেই বার্তাই। এদিকে ঠিক চার বছর আগে (১৯৮৭) স্বামীজি দেশে ফিরেছেন। শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় বক্তৃতা দিয়ে জিতে নিয়েছেন গোটা বিশ্ববাসীর মন। দেশে ফিরে তাঁর এই ধারণা বদ্ধমূল হল যে, নারীদের যথাযথ সম্মান না দেওয়াই প্রাচ্যের দেশগুলোর পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ। ইউরোপ ভ্রমণ এই ধারণা আরও দৃঢ় করে তুলেছিল ততদিনে। আবার অন্য সমস্যাও ছিল। নিজেরই শহরের গোঁড়া হিন্দুরা তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন। বেলুড়ের সন্ন্যাস জীবন, জাত, বর্ণ, শ্রেণি নিয়ে ছুঁতমার্গ না থাকা — ভাল চোখে দেখছিলেন না তাঁরা। বালি, বেলুড়ের ব্রাহ্মণসমাজের অশ্রদ্ধার ভাব ছিল মঠের প্রতি। ঠিক সেই সময়ে



সারদা ঘাটে বিসর্জন

বেলুড়ে দুর্গাপুজোর প্রবর্তন সন্ন্যাসীদের জীবন সম্পর্কে ভুল ধারণার অবসান ঘটাল। স্বামীজির নিমন্ত্রণে যখন আশেপাশের সকলে এসে শাস্ত্রীয় মতে পুজো দেখলেন, তা খানিক সেতুবন্ধনের কাজ করল মঠ ও জনসাধারণের মধ্যে। ঔপনিবেশিক বাংলার পটভূমিতে এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর দুর্গাপুজোর প্রচলন গোটা বাংলায় নিঃসন্দেহে নজির সৃষ্টি করেছিল। বেলুড় মঠের সাংগাঠনিক ভিত শক্ত হয়েছিল। সব পেরিয়ে দুর্গোৎসব যে সর্বজনীন, তা প্রমাণ হয়েছিল আবার। একশো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বেলুড় মঠের পুজো তাই ঐতিহ্যে অটুট।

স্বামীজি প্রথম বছর পশুবলি দিতেও চেয়েছিলেন। অবশেষে মা সারদার নিষেধে ক্ষান্ত দেন।

তথ্যসূত্র: ১. আনন্দবাজার পত্রিকা আর্কাইভ
২. স্বামী-শিষ্য সংবাদ: শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
৩. https://belurmath.org

ছবি সৌজন্যে: ইন্টারনেট ও আইস্টক



■ পেপটাইড, রেটিনল, ভিটামিন সি, ভিটামিন ই, সেরামাইড ইত্যাদি ত্বকের বয়স ধরে রাখার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অ্যাকটিভ উপাদান।



■ ভিটামিন সি, নিয়াসিনামাইড, আলফা হাইড্রক্সি অ্যাসিড, অ্যালোভেরা, সিয়া বাটার ইত্যাদি ত্বকের উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে সাহায্য করে।

রূপকথার চিকিৎসা

কসমেসিউটিক্‌ল রূপচর্চা ও মেডিক্যাল ফেশিয়াল নিয়ে বিশদে জানাচ্ছেন ডার্মাটোলজিস্ট **ডা. শচীন ভার্মা** ও এস্থেথেটিক ফিজ়িশিয়ান **ডা. দেবশ্রী বণিক**। কথা বলে লিখছেন **দেবলীনা অধিকারী**।

সৌন্দর্যের যাত্রা আজকের নয়। সভ্যতার আদি লগ্নেই শুরু হয়ে গিয়েছিল এই যাত্রা। মিশরের সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা হোক বা ভারতের অন্তঃপুর, আরও ‘সুন্দর’ হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা ছিল সর্বত্র। স্থান-কাল-পাত্রে সুন্দরের সংজ্ঞা বদলালেও তার চলা অটুট থেকেছে। এই যাত্রাপথে প্রথমে এসেছিল প্রাকৃতিক দ্রব্যের ব্যবহার। কিন্তু পরবর্তীকালে কেমিক্যাল সমৃদ্ধ প্রডাক্ট বাজারে আসে। সুন্দর হয়ে ওঠার লড়াইয়ে ত্বক নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে উঠতে থাকে। বর্তমানে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা ও সুন্দর হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া দুয়েরই সচেতনতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। রূপকথায় এসেছে মেডিক্যাল টাচ। কসমেটিক দুনিয়াও ওষুধের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। দুইয়ের সন্ধিতে তৈরি হয়েছে নতুন শব্দ-বন্ধনী ‘কসমেসিউটিক্‌ল’।

‘কসমেসিউটিক্‌ল’এর সংজ্ঞা

প্রতিদিনের ত্বকের যত্নে সি টি এমের প্রয়োজনীয়তার কথা আজ তো সবাই জানে। কসমেসিউটিক্‌লের ক্ষেত্রে এই সিটিএমের সঙ্গে যুক্ত হয় ওষুধের





ডা. শচীন ভার্মা

এই ধরনের মিশ্র প্রডাক্টে কসমেটিকের সঙ্গে অ্যাকটিভ ইনগ্রেডিয়েন্টস মেশানো হয়।

গুণ। এই ধরনের মিশ্র প্রডাক্টে কসমেটিকের সঙ্গে অ্যাকটিভ ইনগ্রেডিয়েন্টস মেশানো হয়। ধরা যাক, সাধারণ কোল্ডক্রিমের সঙ্গে ভিটামিন সি মেশানো হল। এ ক্ষেত্রে সাধারণ কসমেটিকসের মধ্যে নিয়ে আনা হল অ্যাকটিভ ইনগ্রেডিয়েন্টের গুণ। বেশিরভাগ কসমেটিক স্কিন কেয়ার ত্বকের নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান করতে পারে না, ত্বকের খেয়াল রাখে কেবল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার প্রডাক্টে উপস্থিত থাকা কেমিক্যাল ত্বককে ক্ষতিও করে। অন্যদিকে কসমেসিউটিক্‌ল প্রডাক্ট স্কিন কেয়ারে অ্যাকটিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট ব্যবহার করে। ফলে ত্বকের নির্দিষ্ট সমস্যা দূর হয়। সাল ১৯৮৪। 'কসমেসিউটিক্‌ল' শব্দটির জন্ম হল। বিজ্ঞানী আলবার্ট ক্লিংমেন এই শব্দের জন্মদাতা। তারপর থেকে ধীরে ধীরে এই শব্দের জনপ্রিয়তা কসমেটিক দুনিয়ায় বাড়তে লাগল। 'অ্যাকটিভ ইনগ্রেডিয়েন্টস' বিউটি ইন্ডাস্ট্রিতে ও কসমেটিকসের জগতে বর্তমানে বড় চেনা নাম। সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়ায় এই শব্দটি এসে পৌঁছেছে আমাদের ড্রেসিংটেবলেও। কিন্তু এই গালভরা নামের মানেটা ঠিক কী? আসলে ত্বকের চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল সায়েন্স বেশ কিছু উপাদান ব্যবহার করে। এই উপাদানগুলো ত্বকের নির্দিষ্ট সমস্যার উপর কাজ করে। যা অল্প পরিমাণে সাধারণ কসমেটিকসে মেশানো হয়। তৈরি হয় কসমেসিউটিক্‌ল প্রডাক্ট। বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ও পরিচিত অ্যাকটিভ ইনগ্রেডিয়েন্টের নাম— ভিটামিন সি, ভিটামিন ই, গ্লাইকলিক অ্যাসিড, রেটিনল, স্যালিসিলিক অ্যাসিড। এছাড়া কিছু আয়ুর্বেদিক ও ভেষজ এক্সট্র্যাক্টও ব্যবহার করা হয়, যেমন— হলুদ,





ত্বক খুব বেশি অ্যাকনে প্রবণ হয়ে গেলে, সে ক্ষেত্রে মাইল্ড স্কিন কেয়ার ব্যবহার করে, ত্বকের সেনসিটিভিটি আগে কমিয়ে বা স্যালিসিলিক অথবা নিয়াসিনামাইড ব্যবহার করা যেতে পারে।

টমেটো, স্ট্রবেরি, টি-ট্রি প্রভৃতি। যে ধরনের ভেষজ উপাদান ভিটামিন ও মিনারেলসে সমৃদ্ধ, সেগুলোই প্রধাণত কসমেসিউটিক্‌লসে ব্যবহৃত হয়। উপাদান তো জানা গেল, কিন্তু যেহেতু এগুলো ত্বকের নির্দিষ্ট সমস্যাকে সমাধান করে, তাই কেবল সংজ্ঞা জেনে তো লাভ নেই। রইল ত্বকের সমস্যায় এমনই কিছু উপাদান খোঁজ ও তার ব্যবহার।

ত্বকের উজ্জ্বলতা ধরে রাখার জন্য: ভিটামিন সি, নিয়াসিনামাইড, আলফা হাইড্রক্সি অ্যাসিড, অ্যালো ভেরা, শিয়া বাটার ইত্যাদি
অ্যাকনের যুক্ত ত্বকের জন্য: স্যালিসিলিক অ্যাসিড, গ্লাইকলিক অ্যাসিড, টি-ট্রি অয়েল, বেনজ়ল প্যারক্সাইড ইত্যাদি
অ্যান্টি এজিংয়ের জন্য: পেপটাইড, রেটিনল, ভিটামিন সি, ভিটামিন ই, সেরামাইড ইত্যাদি
হাইপারপিগমেনটেশন: অ্যাজ়েলিক অ্যাসিড, ভিটামিন সি, কজিক অ্যাসিড, নিয়াসিনামাইড, আরবিউটিন প্রভৃতি
ওপেন পোরসের জন্য: হায়ালুরোনিক অ্যাসিড, গ্লাইকলিক অ্যাসিড, ভিটামিন সি ইত্যাদি।
সান ড্যামেজের হাত থেকে রক্ষার জন্য: জ়িঙ্ক অক্সাইড, টাইটানিয়াম ডি অক্সাইড, অক্সিবেনজ়োন ইত্যাদি।

ত্বক যখন সংবেদনশীল

সানস্ক্রিন ব্যবহার না করলে, দূষণের ফলে, সঠিক স্কিন কেয়ার রুটিনের অভাবে, হরমোনাল সমস্যার কারণে বা বয়সজনিত কারণে ত্বকের উপরের স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ত্বক সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে যে কোনও ধরনের অ্যাকটিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট ব্যবহার করবেন না। সেনসিটিভ ত্বকে এই ধরনের উপাদান অনেক বেশি প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। সে ক্ষেত্রে উচিত প্রথমে মাইল্ড স্কিন কেয়ার ব্যবহার করে ত্বকের সংবেদনশীলতাকে দূর করা। তারপর স্কিনের সমস্যা দূর করতে প্রয়োজনীয় অ্যাকটিভ উপাদান ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, ত্বক খুব বেশি অ্যাকনে প্রবণ হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে স্কিনের সেনসিটিভিটি কমিয়ে তারপর স্যালিসিলিক অ্যাসিড বা নিয়াসিনামাইড ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্লাস ও মাইনাস

যে কোনও কিছু বেছে নেওয়ার আগে এই দুটোই থাকে চেনার মাপকাঠি। এর প্লাস পয়েন্ট রইল সারা প্রতিবেদন জুড়ে। আরও একবার না হয় ঝালাই করে নেওয়া যাক। যেহেতু কসমেটিকের সঙ্গে মেশানো হয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান, তাই সাধারণ স্কিনকেয়ার প্রডাক্টের থেকে এগুলো ত্বককে ও ত্বকের সমস্যাকে অনেক বেশি ভাল





ফেশিয়ালে মেডিক্যাল টাচ

পুজো আসছে। তার মানেই তো ডায়েট-ফিটনেস রুটিনে এক্সট্রা কেয়ার! সেখানে সাধারণ স্কিন কেয়ারে মন ভরবেই বা কেন? তাই উইকএন্ডে সালঁতে থাকে লম্বা লাইন। ত্বকের বাড়তি যত্নে ফেশিয়াল তো তখন চাই-ই। কিন্তু এখন সময় বদলেছে। সৌন্দর্যের এই চিরায়ত যাত্রায় ত্বকের বাড়তি যত্নেও লেগেছে ওষুধের স্পর্শ। ফলে সাধারণ চেনা ফেশিয়ালের সঙ্গে মিশেছে অ্যাকটিভ ইনগ্রেডিয়েন্টের গুণ। অনেক সময় সাধারণ ফেশিয়ালে ত্বকে ইরিটেশন হয়। এছাড়া এই ফেশিয়াল ত্বকের উপরের স্তরেই কাজ করতে পারে। ফলে ত্বকের সমস্যার এই ধরনের ফেশিয়ালের কাছে তেমন কোনও সমাধান থাকে না। এর প্রভাবও খুবই ক্ষণস্থায়ী। এখানেই মেডিক্যাল ফেশিয়ালের প্রাসঙ্গিকতা। এই ফেশিয়ালে অ্যাকটিভ ইনগ্রেডিয়েন্টকে ত্বকের অভ্যন্তরীণ লেয়ারে প্রবেশ করানো হয়। তাছাড়া কসমেসিউটিক্‌ল প্রয়োগের মাধ্যমে এই ধরনের ফেশিয়াল ত্বকের নানা ধরনের সমস্যার সমাধান করে। এমনই কিছু মেডিক্যাল ফেশিয়ালের কথা বললেন ডা. দেবশ্রী বণিক—

ও টু ডারম ফেশিয়াল: দূষণের ফলে ত্বকে রেডনেস, অ্যাকনে, ফ্রি র‍্যাডিকাল দেখা দেখা যায়। সেক্ষেত্রে এই ফেশিয়াল ব্যবহার করা যায়। মাস্ক ব্যবহার করে মেশিনের মাধ্যমে হাই কনসেনট্রেটেড(৯০%) অক্সিজেন দেওয়া হয়। এর ফলে ত্বকের পি এইচ ব্যালান্স ঠিক থাকে, ক্ষতিগ্রস্ত কোষ মেরামত হয়। ত্বকের বয়স কমে।

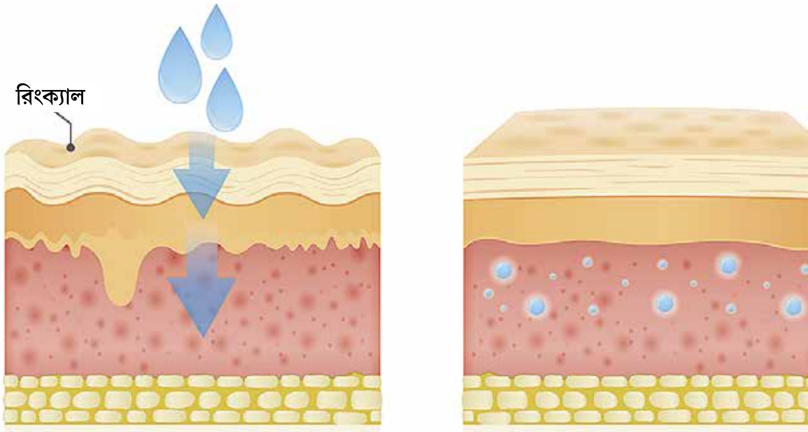


মনে রাখবেন একটা সিটিংয়েই কিছু হবার নয়। এও তো চিকিৎসা। তাই ত্বকের অসুখ সারতেও কিন্তু সময় লাগবে।



ডা. দেবশ্রী বণিক

রাখে এবং তার সমাধান করে। কিন্তু শুধুই কি ভাল দিক! খারাপ কী কি কিছুই নেই? আছে। যদি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ না নিয়ে বিজ্ঞাপনের মোহে অন্ধ হয়ে এই ধরনের অ্যাকটিভ ইনগ্রেডিয়েন্টস ব্যবহার করা হয় তাহলে। কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই প্রডাক্ট সম্পর্কে যে দাবি করা হয় তা অতিরঞ্জিত। আর দ্বিতীয়ত আমাদের শরীরের মতো আমাদের স্কিনও আলাদা হয়। তাই প্রত্যেকের জন্য আলাদা ইনগ্রেডিয়েন্টের দরকার হয়। উপাদান ও প্রডাক্ট নির্বাচন ঠিকমতো না হলে অ্যালার্জিক রিয়্যাকশনও হতে পারে। তাই এই ধরনের স্কিন কেয়ার রেজ়িমে যাওয়ার আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। আরও একটা সমস্যা, এই ধরনের স্কিন কেয়ারের দাম সাধারণ কসমেটিকের তুলনায় বেশি, যা কেনার ক্ষমতা অনেকেরই সাধ্যের বাইরে।



গোল্ড টোনিং উইথ হলিউড স্পেকট্রা: এর ফলে অ্যাকনের দাগ, সার্জিক্যাল স্কারস, হাইপারপিগমেন্টেশন দূর হয়।
হাইড্রা ফেশিয়াল: মেশিনের মাধ্যমে মুখের মৃত কোষ সরিয়ে ফেলা হয়। ত্বকের সমস্যা অনুযায়ী গ্লাইকোলিক অ্যাসিড সহ নানা অ্যাকটিভ উপাদান সেরামের মাধ্যমে ত্বকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো হয়।

এছাড়াও মিরাপিল ফেশিয়াল সহ আরও অনেক মেডিকেটেড ফেশিয়াল রয়েছে। তবে সাধারণ সালঁর পরিবর্তে কোনও বিশেষজ্ঞের কাছে যান। তিনি আপনার ত্বককে পরীক্ষা করে, সেই অনুযায়ী ফেশিয়াল চিকিৎসা শুরু করবেন। মনে রাখবেন একটা সিটিংয়েই কিছু হবার নয়। এও তো চিকিৎসা। তাই ত্বকের অসুখ সারতে সময় লাগবে। ধৈর্য ধরতে হবে।

তাহলে এবারের পুজোয় ত্বকের আরও একটু বাড়তি যত্নে আপনার স্কিন কেয়ার না হয় হাত মেলাল ওষুধের উপকারিতার সঙ্গে! তবে নিজে থেকে নয়, চিকিৎসকের সঠিক পরামর্শ মেনে।

যোগাযোগ:
শচীন ভার্মা, ৯৮৩০২০২৩৯৫
দেবশ্রী বণিক, ৭০৪৪৬৪৬৯৯০

মডেল: মধুরিমা, ইতু, অদ্রিজা, ঋত্বিজা,
মেক-আপ ও হেয়ার: সজল দেবনাথ
ফোন: ৮২৯৬৪৬১৩৩২
সহযোগী: রাখি সাহা
পোশাক: অরণ্য
ফোন: ৯৮৭৪১৬০২৭০
লোকেশন: ক্লাব ভর্দে ভিস্তা,
ফোন: ০৩৩ ২৪২৩৯৯০০
ছবি: শুভদীপ ধর, **সহযোগী:** অয়ন সাধুখাঁ

রূপায়ণে: মহেশ্বর মণ্ডল







Festive ফিউশন

সারা বছর অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন চরিত্রে সাজতে হলেও পুজোর পাঁচদিনে চাই গ্ল্যামারাস, এলিগ্যান্ট সাজ। উৎসবের সাজে ফ্যাশন ডিজ়াইনার জ্যোতি খৈতান-এর ফেস্টিভ কালেকশন বেছে নিলেন অভিনেত্রী উষসী রায়। ফ্যাশন ফাইল পরিকল্পনায় মৌমিতা সরকার।

■ মেরুন ও হোয়াইট ফ্লোরাল প্রিন্টেড লং সাইড স্লিটেড ড্রেস। লো বান, হেয়ার স্টাইলিংয়ে মেরুন বো। ফেস্টিভ সিজনে ডে-আউটের পারফেক্ট আউটফিট।



■ শুধু সাবেকি সাজ নয়, পুজোর লুকবুকে ইন্দো ওয়েস্টার্নও পোশাক বেশ পছন্দ অভিনেত্রীর। তাই পরেছেন ইন্ডিগো ব্লু ও সাদার স্ট্রাইপড ফ্লোয়ি লং ড্রেস। আপার বডিতে সাদা সিকুইনের প্যাচওয়র্ক। বিচ ওয়েভ হেয়ার স্টাইল ও মিনিমাল গয়নায় স্মার্ট লুক।



অ্যাসিমেট্রিক্যাল কাটের বেজ রঙের স্যাটিন ফ্যাব্রিকের লং স্কার্ট। সঙ্গে টিমআপ করা হয়েছে ডার্ক পিচ রঙ ক্রপ টপ। জাঙ্ক জুয়েলরির সঙ্গতে গ্ল্যাম লুক।



■ পুজোয় ইভনিং লুকে চাই ব্রাইট অ্যান্ড বোল্ড ফিউশন কালেকশন। উজ্জ্বল লাল ড্রেপড স্কার্ট। সঙ্গে ওয়ান লং স্লিভ স্টাইলের টপ। কার্লি হেয়ার ও স্মাজ আই মেক-আপে গ্ল্যামারাস সাজ।

ইয়ারিং: কুশল'স ফ্যাশন জুয়েলরি, **ফোন:** ৯৫৯১৩২১৬৯৬



শাড়ি পরতে
ভালবাসেন উষসী।
কিন্তু পুজোয় একটু
অন্যরকম ড্রেপড
শাড়ি হলে মন্দ কী!
তাই বেছে নিয়েছেন
ড্রেপড শিবোরি শাড়ি।
সঙ্গে নীল সিকুইন
টপ। কোমরে স্টোনের
কাজ করা বেল্ট।



■ সাদা-কালো ফ্লোরাল প্রিন্টেড হল্টার নেক ও কাট-আউট স্টাইলের ধোতি প্যাটার্ন জাম্পসুট। হেমলাইন ও কাট-আউটে নজর টানছে লাল রং। নিউট্রাল মেক-আপে কুল লুক!

পোশাক: জ্যোতি খৈতান, **ফোন:** ৭৪৩৯৬৪৮৫৯৪, **ছবি:** সোমনাথ রায়, **মেক-আপ:** কাজু গুহ, **ফোন:** ৮০১৭৯৪২৬৫১, **হেয়ার:** আম্রপালি, **ফোন:** ৯০৭৩৮০৮০৬০, **স্টাইলিং:** তানিয়া, **ফোন:** ৯৬৭৭২৮৫১২৯, **লোকেশন ও হসপিটালিটি পার্টনার:** ফেয়ারফিল্ড বাই ম্যারিয়ট, সিবি ব্লক, নিউটাউন, **ফোন:** ০৩৩ ৬৬৬৬৪৪৪৪, **রূপায়ণে:** মহেশ্বর মণ্ডল



জিয়োংয়ের অ্যাকাডেমি

কলকাতা-কোরিয়া 'কানেকশন'

কলকাতায় থাকা কোরিয়ানরা কতটা মিশতে পেরেছেন বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে? 'কে-কালচার'-এর জনপ্রিয়তাই বা কতটা প্রভাবিত করছে বাঙালিদের?

কলকাতায় কোরিয়ানদের সংখ্যা ভারতের অন্য রাজ্যের তুলনায় নগণ্যই। কিন্তু 'কে কালচার'এর সাম্প্রতিককালে যা জনপ্রিয়তা এখানে, তা থেকে স্পষ্ট যে বাঙালিরা কোরিয়ান সংস্কৃতির খোঁজখবর রাখছেন। আর কোরিয়ানরা? নিজের দেশ ছেড়ে এখানে এসে কেমন আছেন তাঁরা?

তাইকোন্ডো শেখাতে কলকাতায়...

সপ্তাহান্তে সকাল-সকাল গিয়ে হাজির হয়েছিলাম সল্টলেকের এক তাইকোন্ডো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। প্রশিক্ষক এক কোরিয়ান ভদ্রলোক, সিয়োং কুক জিয়োং। সুদূর দক্ষিণ কোরিয়া থেকে পরিবার-পরিজনসহ যাঁরা কলকাতায় বসবাস করছেন, জিয়োং তাঁদের অন্যতম। নিজে এইটথ দান ব্ল্যাক বেল্ট ও আন্তর্জাতিক রেফারি। কোরিয়ান হলে কী হবে, শুরুতেই বলে দিলেন বাংলাতে কথা বলবেন! সেইমতো জিয়োং ভাঙা-ভাঙা বাংলায় জানালেন, ''কোরিয়াতে প্রায় ১৫ বছর ধরে তাইকোন্ডো শিখিয়েছি। ভারতে



প্রথম এসেছিলাম বেঙ্গালুরুতে। সেখানেও বাচ্চাদের তাইকোন্ডো শেখাতাম। এক বন্ধুর সুবাদে কলকাতায় আসা। নিউটাউনে থাকতাম, সোসাইটির বাচ্চাদের শেখাতাম। কলকাতায় বাচ্চাদের ও সব বয়সি মানুষদের উৎসাহ দেখে মনে হয়েছিল অ্যাকাডেমি খোলা যাক। আমার অ্যাকাডেমি শুরু হয় ২০১৬-তে। মনে হয়, কোরিয়ায় ঘরে-ঘরে শেখানো হয় এই খেলা, সেই খেলাকেই যদি কলকাতাতেও ছড়িয়ে দিতে পারি। এ দেশে আমিই একমাত্র এইট্থ দান ব্ল্যাক বেল্ট (8th Dan black belt)। এখানে প্রায় ৬০জন শিখছে এখন।'' জিয়োংয়ের ছেলে-মেয়ে কলকাতায় পড়াশোনা করছে। তাঁর পুরো পরিবারই তাইকোন্ডোর। স্ত্রী (সিয়োন ক্যুং হান), ছেলে, মেয়ে সকলেই প্রশিক্ষিত খেলোয়াড়। শুধু বাংলা ভাষা শেখাই নয়, বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছেন তাঁরা। ''নিয়মিত না হলেও বাড়িতে বাঙালি খাবার খাই। ভাত আর চিকেন কারি তৈরি করতে পারে আমার স্ত্রী (হাসি)। আমার বাংলা শেখা এক বন্ধুর থেকে,'' বললেন তিনি। কলকাতায় কোরিয়ান জনগোষ্ঠীর মানুষেরা গড়ে তুলেছেন কোরিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ কলকাতা। জিয়োং সেই সংস্থার অন্যতম সদস্য। ''মোটামুটি ১২০জন কোরিয়ান থাকেন এখানে। এখানে যাঁরা থাকেন, তাঁরা মূলত বিভিন্ন রেস্তরাঁ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এছাড়াও বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থায়, গাড়ি কোম্পানিতে চাকরি করছেন তাঁরা,''



দেবাঞ্জলি, আরশিয়া ও ঐশ্বর্য

জানালেন তিনি। তাঁর ইনস্টিটিউটেই আলাপ হল মা-মেয়ে জুটি দেবাঞ্জলি ও আরশিয়ার সঙ্গে। দেবাঞ্জলি পেশায় সেলস ম্যানেজার। মেয়ের জন্য অ্যাকাডেমি খুঁজতে গিয়ে তিনিও ভর্তি হয়ে যান। প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর ধরে মা-মেয়ে একসঙ্গে শিখছেন। আবার বেঙ্গালুরুর একটি কোম্পানিতে কাজ করেন ঐশ্বর্য। কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময়ে সময় পেতেন না, এখন ওয়র্ক ফ্রম হোম হওয়ায় তিন বছর ধরে তাইকোন্ডো শিখছেন তিনি। কোভিডে ব্যক্তিগত নানা সমস্যা কাটিয়ে উঠতে তাঁকে সাহায্য করেছিল এই মার্শাল আর্ট।

কোরিয়ান খাবারের চাহিদা

বাংলা-কোরিয়ার সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনের অন্যতম উপাদানই হল খাবার। দক্ষিণ কলকাতার সন্তোষপুরের কাছে একটি কোরিয়ান রেস্তরাঁয়

জিয়োং ভাঙা-ভাঙা বাংলায় জানালেন, ''কোরিয়াতে প্রায় ১৫ বছর ধরে তাইকোয়ান্ডো শিখিয়েছি। কলকাতায় মানুষের উৎসাহ দেখে মনে হল অ্যাকাডেমি খোলা যাক।''

হোসিয়া কিম জানান, ''১০ বছর আগে সস্ত্রীক কলকাতায় এসেছিলাম। এখানে এসে বুঝেছিলাম স্থানীয় ভাষা না শিখলে কাজকর্মে অসুবিধে হবে।''





কোরিয়ান পদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় টোফু স্টেক (উপরের ছবি)। এছাড়া s,Omlrice-ও পছন্দ কলকাতার মানুষদের। চিকেন, সবজি ও স্টার ফ্রায়েড রাইস ডিমের ওমলেট দিয়ে ঢাকা। কিমচি সসে মেশানো থাকে।

পৌঁছে দেখা হল কর্ণধার হোসিয়া কিম-এর সঙ্গে। তাঁর স্ত্রী ওকসো ইম ছুটিতে সিওল গিয়েছেন। মাঝবয়সি কোরিয়ান ভদ্রলোক ভাঙা-ভাঙা বাংলায় বললেন, ''১০ বছর আগে সস্ত্রীক কলকাতায় এসেছিলাম। এখানে এসে বুঝেছিলাম স্থানীয় ভাষা না শিখলে কাজকর্মে অসুবিধে হবে। তাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করি। বাংলা ও হিন্দি দুটোই শিখি। প্রথমে ছোট ছোট ব্যবসা করতাম। একটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ক্যান্টিনে কাজ করতাম। তারপর ভাবি খাবারের ব্যবসা শুরু করার কথা। কোভিডের পর চেষ্টা করে রেস্তরাঁ খুলি। গত বছরের এপ্রিল-মে নাগাদ এই রেস্তরাঁ খুলেছে।'' হোসিয়ার দুই ছেলে, কলকাতার স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। তাঁর বড় ছেলে কোরিয়া চলে গিয়েছেন, আর্মিতে যোগ দিতে। কারণ, দেশে নিয়ম আছে পরিবারের বড় ছেলেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সেনাবাহিনীতে থাকতে হবে। কিন্তু নিজের দেশ ছেড়ে অচেনা দেশে এলেন কেন? খানিক হেসে হোসিয়ার জবাব, ''এদেশে টেনশন অনেক কম। কোরিয়াতে জীবনযাপনের অনেক টেনশন। এখানে অনেক শান্তিতে আছি। জীবনযাপনও অনেক সস্তা। কলকাতায় অনেকে আমাকে সাহায্য করেছেন। আমার স্ত্রী রন্ধনপটিয়সী। বাঙালি খাবারও বানাতে পারেন... চিকেন, মাছ সব। আমি আড়, কাতলা মাছ খুব ভালবাসি। তবে বাঙালি খাবার কিমচির সঙ্গে খেলে ভাল লাগে বেশি। আর বাঙালি খাবারে অনেক তেল (হাসি)। আপনারা ভাবেন, কোরিয়ান খাবার মানেই ঝাল। ট্র্যাডিশনাল কোরিয়ান খাবার কিন্তু অত স্পাইসি হয় না।'' কথা বলতে বলতে কিছু সিগনেচার কোরিয়ান খাবারও সাজিয়ে দিলেন সামনে। কিমবাপ, র‍্যামেন, বিবিমবাপ থেকে শুরু করে কোরিয়ান ফ্রায়েড চিকেন বা কিমচি ফ্রায়েড রাইস... বাঙালির স্বাদ-কোরককে এগুলো ক্রমেই জায়গা করে নিচ্ছে। চালু হয়েছে কোরিয়ান পপ ব্যান্ড বিটিএস-এর থিমে রেস্তরাঁও। বোবা টি, কোরিয়ান স্টাইল কর্ন ডগ, বুলডাক নুডলস তো আছেই, সঙ্গে একই রেস্তরাঁয় পেয়ে যাবেন কে-পপ ফ্যান আর্ট, পোস্টার ও নানা মার্চেনডাইজ়।



ডাকগাংইয়ং (Dakgangjeong)

'বিটিএস' থেকে ভাষা...কলকাতা-কোরিয়ার আদান-প্রদান

কোভিডের সময় কলকাতার মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কোরিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ কলকাতার তরফে প্রায় ৩ লাখ টাকার অর্থ জোগাড় করা হয়। সেই টাকায় চাল, ডাল, বিস্কিট ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনে বিলি করেন সদস্যরা। রিলিফ ক্যাম্পও করেছিলেন তাঁরা (তথ্যসূত্র: দ্য টেলিগ্রাফ)। কলকাতার



কোরিয়ান ভাষার ক্লাস



কেভিডে সাহায্যের হাত (ছবি: দ্য টেলিগ্রাফ)

মানুষরাও যে কোরিয়ান কুইজ়িন, কে-পপের কম ভক্ত নন! অনেকেই শিখছেন কোরিয়ান ভাষাও। কলকাতার একটি ভাষাশিক্ষা ইনস্টিটিউটের কোরিয়ান ভাষার প্রশিক্ষক শীর্ষা সিংহ জানালেন, ‘‘মোটামুটি ২০১৬ সাল থেকে কে-ড্রামার জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগল। ভারতীয় টেলিভিশনেও ডাবড কোরিয়ান শো দেখানো হত। তখন থেকেই কোরিয়ান শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। ২০১৭-১৮ নাগাদ ‘বিটিএস’ও জনপ্রিয় হতে শুরু করে। তার আগে অবধি কেরিয়ারের প্রয়োজনেই কোরিয়ান ভাষা শিখতেন মানুষ। এখন নিছক হবির বশে শেখার প্রবণতা বেড়েছে। একটি কারণ অবশ্যই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে কে-ড্রামার জনপ্রিয়তা। TOPIK বলে কোরিয়ান ভাষার পরীক্ষা হয়, এখন অনেকেই জানেন সে ব্যাপারে। স্কলারশিপের সুবিধে পাওয়ার জন্য ভাষা জানা প্রয়োজন। কলকাতায় কোরিয়ান সংস্কৃতির জনপ্রিয়তার একটি কারণ হল খাবার। তবে ভারতের অন্য শহরের তুলনায় এখানে কোরিয়ান সংস্কৃতির এক্সপোজ়ার কম। ব্যক্তিগতভাবে স্কুলে পড়ার সময়ে আমার দিদি পেন ড্রাইভে করে কে-ড্রামা নিয়ে আসত বাড়িতে, তারপর থেকে আমিও ফ্যান হয়ে যাই। বাড়িতে কোরিয়ান টিভি চ্যানেল ছিল, সব অনুষ্ঠান সেখানে ইংরেজিতে হলেও কোরিয়ান সংস্কৃতির সঙ্গে আলাপ হয়। বাবা-মা তখন বলেন, কোনও দেশের সংস্কৃতিকে ভালবাসলে সেই ভাষাও শেখা উচিত। সেভাবেই শুরু।’’

কলকাতার কোরিয়ানদের কেমন দেখছেন? উত্তরে তিনি জানান, ‘‘কোরিয়ায় ‘পাল্লি পাল্লি’ সংস্কৃতির প্রভাব বেশি। অর্থাৎ, সবকিছু খুব দ্রুত করতে হয়। কলকাতায় ধীরেসুস্থে কাজ হয়। কিছু কোরিয়ানের এতে খানিক অসুবিধে হয়। আবার ব্যবসার জন্য লাইসেন্স বা ম্যানপাওয়ার পেতেও অসুবিধে হয়। তবে ভাষার সমস্যা হয় না। ওঁরা এসেই বাংলা শিখতে শুরু করেন। বেশিরভাগ মানুষই ১০-২০ বছর ধরে আছেন। কেউ বছর তিরিশেকও কাটিয়ে দিয়েছেন।’’

কোরিয়ান সংস্কৃতির জনপ্রিয়তার অন্যতম বাহক ‘বিটিএস’-এর ফ্যান তরুণদের মধ্যে অনেকেই। তাঁদের একজন ক্লাস নাইনের ছাত্রী শুভযাত্রী চৌধুরী। জানালেন, ‘‘২০২০-তে ক্লাস সিক্সে পড়তাম। তখন কে-পপ-এর গান শুনতে শুরু করি। সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডিকশন বেড়ে গিয়েছিল তখন। ওদের গানের কথাগুলো বেশ ভাল লাগে। কোরিয়ান সংস্কৃতির প্রতি খুব একটা আগ্রহ নেই, তবে গান ভাল লাগে। ‘স্প্রিং ডে’, ‘ফর ইয়ুথ’ আমার প্রিয় গান। আমার স্কুলেও প্রচুর বন্ধুবান্ধব বিটিএস আর কে-পপের ফ্যান।’’ সবমিলিয়ে কলকাতায় কোরিয়ান সংস্কৃতির চাহিদা খানিকটা হলেও বাড়ছে।

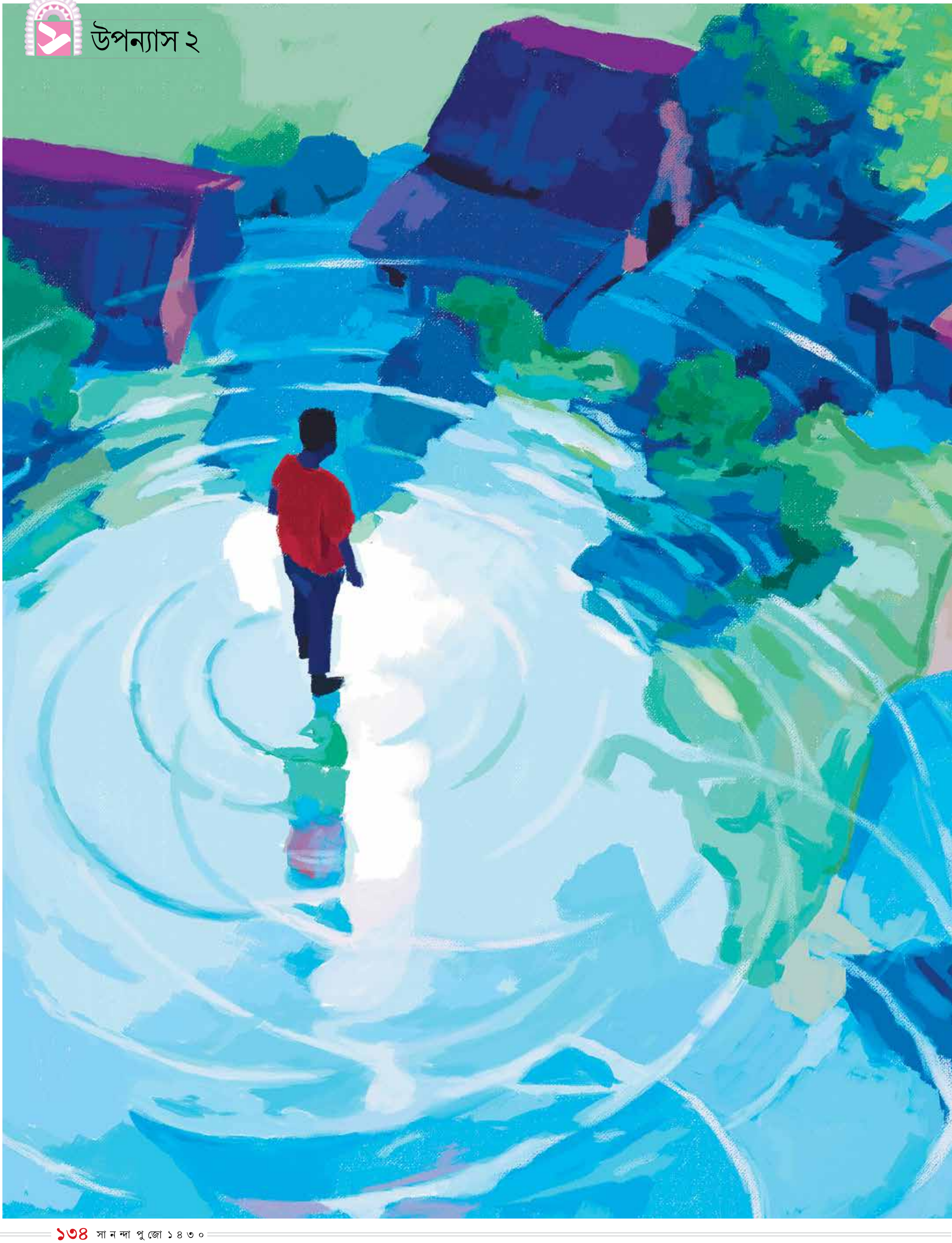
লেখা: মধুরিমা সিংহ রায়

রেসিপি সৌজন্যে: হোসিয়া কিম, কাফে টৌভ
১-৩ নম্বর পাতার ছবি: জয় চক্রবর্তী

২০১৭-১৮ নাগাদ ‘বিটিএস’ও জনপ্রিয় হতে শুরু করে। তার আগে কেরিয়ারের প্রয়োজনে কোরিয়ান ভাষা শিখতেন মানুষ। এখন হবির বশেও শিখছেন অনেকে।



শীর্ষা সিংহ





মৎস্য কন্যার ঘাট

মহুয়া চৌধুরী

গোরার সমস্ত ছেলেবেলা জুড়ে বার বার ছুটে যেত সেই অশ্বারোহী। তার মনে আছে, ঝমঝমে বর্ষার দুপুরে মা তাকে পাশে শুইয়ে ঘুম পাড়াতে গিয়ে নিজেই ঘুমিয়ে পড়তেন এক সময়। বাইরের দিকে চেয়ে জেগে থাকত সে। একটানা জলের শব্দ।

তার চোখের সামনে ভেসে উঠত দিগন্ত-ছোঁয়া এক তেপান্তরের মাঠ। ও প্রান্ত থেকে তির বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসত সেই অশ্বারোহী পুরুষ। লালবিহারী রায়চৌধুরী নাম ছিল যাঁর। গোরার বুড়ো ঠাকুরদাদা। সিপাহি বিদ্রোহের সময় তখন। সে আমলে ভাল ইংরেজি জানতেন লালবিহারী। রায়চৌধুরী বংশের প্রথম চাকরি করতে যাওয়া লোক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নেক নজরে ছিলেন। কানপুর রেসিডেন্সিতে সুপারভাইজ়ারের পদে বসিয়েছিল তাঁকে সাহেবরা। সিপাহি বিদ্রোহের ঝড় উঠল। সাহেব আগে থাকতে তার আঁচ পেয়ে বলল, "বাঁচতে চাও তো নিজের গাঁয়ে ফিরে যাও।" সেই গভীর রাতে কানপুরের বাসা ছেড়ে বেরিয়েছিলেন লালবিহারী। তালবেড়েতে পৌঁছতে সময় লেগেছিল এক মাস। "কত ক্রোশ পথ এক নাগাড়ে হেঁটে, শেষ পর্যন্ত তালবেড়েতে পৌঁছে, ভোর রাত্তিরে পুকুর পাড়ে অত দিনের ধকলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন ওই সাজোয়ান মানুষটা। অমন দশাসই চেহারা শুকিয়ে কাঠিসার হয়ে গিয়েছিল। ভোর বেলা পুকুর ঘাটে চান করতে গিয়ে তাঁর মায়ের নজরে পড়ে। তিনি সে দিশ্য দেখে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলেন, সেই কান্নার শব্দে বাড়ির লোকে ছুটে এসে দ্যাখে..." ঠাকুমা এমন করে গল্প বলতেন, যেন সব নিজের চোখে দেখা। শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যেত গোরা। কত কী ভাবনা জাল বিছিয়ে যেত মগজে! কাউকে বুঝিয়ে বলা যায় না। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে, ঠাকুমা আবার বলতে শুরু করতেন, "তালবেড়ের বাড়িতে তাঁর ছবি টাঙানো থাকত বৈঠকখানা ঘরে। সেবার পুজোর সময় গিয়ে, তোর দাদু দেখলেন বাড়ির ছাদ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে ছবিতে স্যাঁতা ধরছে। দড়ি পচে দেওয়ালের গায়ে বেঁকে ঝুলে আছে ছবি। খুলে নিয়ে এলেন। নতুন করে বাঁধিয়ে টাঙালেন এ বাড়িতে।" লালবিহারীর সেই বিরাট অয়েল পেন্টিং তাদের বাড়ির দালানে সিঁড়ির মুখে টাঙানো থাকতে দেখেছে গোরা ছেলেবেলা থেকে। লম্বা-চওড়া চেহারার মানুষ। বড় টানা টানা চোখ। খাড়া নাক। পাকানো গোঁফ। খুব জোর

ছিল নাকি গায়ে। কুস্তিতে কেউ এঁটে উঠতে পারত না। লোহার রড বাঁকাতে পারতেন। গোরার মনে হত, দূরের সেই তালবেড়েই তার আসল জায়গা। রায়চৌধুরীরা নাকি সে গ্রামে আটশো বছরের বাসিন্দা। রাজা খেতাব ছিল। রাজপুত্তুর হয়ে ওঠার সে কী মাদকতা! গরমের ছুটির তেতে ওঠা দুপুরে, পুরী থেকে কিনে আনা কাঠের রঙিন ছড়িটা হত তার তলোয়ার। গুটিগুটি পায়ে ছাদে উঠে যেত সে। মানসনয়নে দিব্যি দেখতে পেত, চিলেকোঠা ঘেঁষে ঘোর জঙ্গল। আকাশছোঁয়া মস্ত মস্ত কত গাছ আছে সেখানে। তারই একটার মগডালে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির বাসা। রে রে করে তেড়ে আসছে রাক্ষস। অবশ্য তার সঙ্গে কি আর পারে? তার তলোয়ারের ঘা খেয়ে কান-টান কেটে একাকার। ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি লাল চোখ মেলে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে এত ক্ষণ দেখছিল রাজপুত্তুর আর রাক্ষসের লড়াই। হাঁফ ছেড়ে বাঁচে তারা।

মনুকাকা প্রায়ই আসে ছুটির দিনে। বিরক্ত হয়ে বলে, "উফ, যেদিন থেকে এই পায়রা বাসা বেঁধেছে, এতটুকু শান্তি নেই! সারা ক্ষণ গুবগুব করে ডাকছে আর চতুর্দিক নোংরা করছে!" মনুকাকার কথা শেষ হওয়ার আগেই নোনাদা ধুয়ো ধরত, "হেগে হেগে আন্ডিল করে রেখেচে দ্যাকো না!"

বাবারও ছেলেবেলায় নাকি এসেছিল নোনাদা এ বাড়িতে। বাবার সঙ্গে খেলাধুলো করে তাকে ভুলিয়ে রাখতে। তার নিজের বয়সই তখন বছর বারো। কোন গাঁয়ের বাপ-মা মরা ছেলে। সেই থেকে এখানেই থেকে গিয়েছিল। গোরা যবে থেকে দেখছে, কী প্রতাপ তার! বাবাকে খোকাবাবু বলে ডাকে এখনও। ছাদের বাঁ দিকের কোণটা আসলে নীল পাহাড়, টপকালে দুষ্টু রাজার দেশ। গোরার রাজ্য কেড়ে নিতে চুপিচুপি এগিয়ে আসে সে, নীল পাহাড় পেরিয়ে। তির ছোড়ে, তলোয়ারের ঘায়ে কেটে দু'খানা করে দেয় গোরা।

এই দুর্ধর্ষ ক্লাইম্যাক্সের মুহূর্তেই নীচে সিঁড়ির কাছ থেকে রাগত স্বরে ডাক আসে, "কী হচ্ছে কী ছাদে? ডাকাত পড়েছে নাকি? অত আওয়াজ কিসের? চলে এসো বলছি! এক্ষুনি চলে এসো ঘরে!"

এই ডাকের সামনে বীরপুরুষ গোরা রাজা নেহাতই কুঁকড়ে যায়। গুটিগুটি পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যেতেই হয় তখন তাকে। মা ধমক দেন, "এই দুপুর রোদ্দুরে ছাদে কী করছিলে? মুখ টকটকে লাল, ঘেমেনেয়ে একেবারে একশা হয়ে গিয়েছ যে! ঘাম বসে সর্দিজ্বর হলে বুঝবে মজা! বোসো বলছি চুপটি করে পাখার নীচে! জামাটা খুলে ফেলো।" গামছা এনে গা-মাথা মুছিয়ে দিতেন তার। জামা বদলে দিতেন। মুখ গোঁজ করে চুপচাপ বকুনি শুনত সে। জানত, মাকে আসল ব্যাপার বোঝাবার চেষ্টা বৃথা। মায়ের পাশটিতে শুয়ে তারপর অন্য কথা পাড়ত সে।

"মা, আমরা আসলে রাজা না?"

"ঠাকুমা বলেছেন বুঝি?" মা মুচকি হাসতেন, "লোকের মুখে মুখে অমন কত গল্পগাথা তৈরি হয়! কী সত্যি, কী মিথ্যে তার ঠিক নেই। আর সত্যি হলেই বা কী? তুমি আবার স্কুলে বন্ধুদের কাছে ও সব নিয়ে জাঁক কোরো না যেন!" বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে যেতেন মা, "কে কোন বংশে জন্মাবে, তাতে আর বাহাদুরি কিসের? সে কি কারও হাতে থাকে? লেখাপড়া শিখে, ভাল কাজ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, তবে না!"

তালবেড়ের আদি বাড়িতে তখনও দুর্গাপুজো হত। সেখানকার কথা কিছু কিছু মনে পড়ে। খুব ছেলেবেলায় ষষ্ঠীর দিন তারা নিজেদের অ্যাম্বাসাডর গাড়ি চড়ে যেত। মনসাতলার পর থেকে কাঁচা রাস্তা। সেখানে নীলমণি সাহার শেডের নীচে গাড়ি রেখে, সারি বেঁধে সাইকেল রিকশা চড়ে যাওয়া। পুজোর ক'দিন ওই বাড়িতে কাটিয়ে, বিজয়ার পর সন্ধেবেলা ফেরা। ওদের পরিবারের আরও অনেকেই যেতেন। তখনই সে প্রকাণ্ড বাড়ির একটা অংশ একেবারে ভগ্নস্তূপ! পাঁচ বিঘে জায়গা নিয়ে রায়চৌধুরীদের গড় ছিল বুঝি এক কালে! শেষ প্রান্তে বিরাট দিঘি। বাবা তালবেড়ে গেলেই তুতো ভাইয়েদের সঙ্গে মিলে মাছ ধরতে যেতেন সেখানে। সাইকেল রিকশা চড়ে আসবার সময় গাছের ঘেরের ফাঁক দিয়ে তার চওড়া ঘাট দেখা যেত।

পুজোর ছুটির পরে স্কুল খুললেই অ্যানুয়াল পরীক্ষা। অঙ্কে তার বড় ভয়। লক্ষ্মীপুজোর পর বিজয়ার পর্ব সারা, এমন এক ঝলমলে শরতের সকালে অঙ্ক কষছিল সে। দশমিক-টশমিক দেওয়া সে এক বড় ঝঞ্ঝাটের অঙ্ক। বইয়ের শেষ দিকের পাতা খুলে দেখল, উত্তর মেলেনি। অমনই ভয়ে গা-হাত ঠান্ডা হয়ে গেল তার। স্কুল খুলতে বাকি আর ক'টা দিনই বা! তার পরেই পরীক্ষা শুরু। তক্ষুনি অন্য এক রকমের আশা জেগে উঠল মনে তার। ডুবে যেতে থাকা মানুষের খড়কুটো আঁকড়ানোর চেষ্টার মতো। দৌড়ে গেল সে একতলায়, মায়ের কাছে। মা কুটনো কুটতে বসেছিলেন রান্নাঘরের দালানে।

"মা!" আর্ত স্বরে চিৎকার করে উঠল সে।

"কী রে?" চমকে গিয়েছেন মা। আর একটু হলেই আঙুল কেটে যেত বঁটিতে। হাঁফাতে হাঁফাতে সে নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছে মনে মনে, "আচ্ছা মা, দুগ্‌গা ঠাকুরকে যদি খুউব করে বলি, আমাকে অঙ্কে একশোয় একশো পাইয়ে দাও... দুগ্‌গা ঠাকুর তাই দেবে? বলো না মা," আশায় আশায় চেয়ে থাকে গোরা।

মা হাসি মুখে তার চোখে চোখ রেখেছেন। মায়ের ফর্সা কপালে সিঁদুরের টিপ, তা থেকে গুঁড়ো ঝরে পড়েছে নাকে। হলুদ



যা করার, তাকে নিজেকেই করতে হবে তাহলে। কিন্তু মায়ের মুখের ওই হাসি যেন চুপিচুপি বলে, মানুষ সব পারে! মানুষই পারে শুধু!

জমির তাঁতের শাড়ি যেন মিশে গিয়েছে গায়ের রঙের সঙ্গে, "দেবেন বইকি! নিশ্চয়ই দেবেন মা দুগ্‌গা।"
একটু থেমে মা আবার বলেন, "দ্যাখো, তোমায় তিনি মাথায় বুদ্ধি দিয়েছেন। হাত, পা, চোখ দিয়েছেন। সে সব ঠিক করে কাজে লাগালে নিশ্চয়ই জেনো, যে কাজই করবে, তা-ই ভাল হবে। নয়তো তুমি খাটবে না খুটবে না... আর এদিকে মা দুগ্‌গার কাছে আবদার করবে হেন দাও তেন দাও বলে... তা তো হবে না বাবা," মায়ের সুন্দর মুখে আলোর মতো হাসি। গোরা ফিরে যায়। বুকচাপা পাহাড়ের মতো এক ভয় ঘনিয়ে আসে সামনে। নিজেকে কেন যেন একলা মনে হয়। কেউ নেই তার। কেউ তুলে দেবে না কিছু মুখের কাছে। যা করার, তাকে নিজেকেই করতে হবে তাহলে। কিন্তু মায়ের মুখের ওই হাসি যেন চুপিচুপি বলে, মানুষ সব পারে! মানুষই পারে শুধু! হয়তো সেই দিনটিই ছিল গোরার অঙ্কের ভয়কে হারিয়ে দেওয়ার শুরু। বি.কম পড়ার সময় কমার্শিয়াল ম্যাথস বিষয়টা অসুবিধেয় ফেলতে পারেনি তাকে।
গোরা যে ছেলেবেলায় কাকে বেশি ভালবাসত, ঠাকুমাকে না মাকে... বলতে পারে না আজও। এক জীর্ণ ছায়াচ্ছন্ন অট্টালিকা হয়ে ঠাকুমা যেন আশ্রয় দিয়েছিলেন তাকে। অস্তরাগের আভা মাখা কত রাজকাহিনি! বট-অশ্বত্থের ডালপালা মেলা অর্ধ ইতিহাস যত। মা বলতেন দেশ-বিদেশের মানুষের গল্প। মানুষের চেষ্টা আর সাফল্যের গল্প। বিদ্যা, শ্রম আর মানবতার গল্প। সেই ছেলেবেলাতেই গোরা বুঝত, মা তালবেড়ের বাড়ি যেতে পছন্দ করেন না। ঠাকুমার ও সব বড়লোকিয়ানার গল্পও নয়। ছোটদের বিশেষ এক অনুভব ক্ষমতা থাকে। অনেক কিছু বুঝে নেয় তারা।
আরও একটু বড় হওয়ার পরে, একটি দিনের কথা গোরার খুব মনে পড়ে। বড়দিনের ছুটি তখন। তাদের দক্ষিণের বারান্দায় শেষ বিকেলের রোদ এসে পড়েছে। রেলিঙের ধার ঘেঁষে রাখা টবগুলোতে মায়ের যত্নে সেজে ওঠা লাল, হলুদ, বেগুনি মরসুমি ফুলের বাহার। বারান্দার এক দিক ঘিরে ছোট্ট নিজস্ব রান্নাঘর তৈরি করে নিয়েছিলেন মা। নতুন নতুন কত জলখাবার তৈরি করতেন। কেক, প্যাটি, গ্রিলড স্যান্ডউইচ আবার শিঙাড়া, কচুরি, চন্দ্রপুলিও। ইংরেজি, বাংলা অনেক রান্নার বই ছিল মায়ের। সে সব পড়ে পড়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালাতেন। মায়ের বাবা বাড়িতে মেমসাহেব রেখে ভাল ইংরেজি শিখিয়েছিলেন মেয়েকে। তবু কেন যে ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত পড়ে, পরীক্ষা দেওয়ার আগেই পনেরো বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর!
সেদিন আভেনে চকোলেট কেক বেক করছিলেন মা। ডিম, দুধ, কোকোর মিলিত সুঘ্রাণে ম-ম করছিল শীতের হাওয়া। ওই গন্ধটা বার বার টেনে আনছিল গোরাকে। "ও মা, আর কত ক্ষণ লাগবে?" থেকে থেকে ঘুরেফিরে এসে জিজ্ঞেস করছিল সে।
"দাঁড়া, সবুরে মেওয়া ফলে জানিস না বুঝি?" মা হাসছিলেন তার অধৈর্যপনা দেখে।
"মা, সেই লালবিহারী হলে এত ক্ষণ অপেক্ষা করতেন? নাকি রাঁধুনির গর্দান নিতেন—ঘ্যাচাং?" হাসতে হাসতে গোরা হাতের ভঙ্গি করে। মা অল্প হেসে আবার গম্ভীর হয়ে যান। ছেলের চোখে চোখ রেখে, তাকিয়ে থাকেন একটুখানি।
"বংশগৌরব, বংশমর্যাদা বড় ভয়ঙ্কর জিনিস বুঝলি? কোনও পরিবারে কেউ একজন কিছু সুখ্যেতের কাজ করলে, তার উত্তরপুরুষরা নিজেরা কিছু করার চেষ্টা করে না আর। কেবল সেই কবেকার মরে ভূত হয়ে যাওয়া মানুষটির নামের সঙ্গে নিজেদের নাম জড়িয়ে, অহঙ্কারে ফুটিফাটা হতে থাকে। লালবিহারী অনেক টাকা রোজগার করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু..."
মা একটু থেমে গিয়েছিলেন। ছেলে কতটা বড় হয়েছে, তাকে কতটা বলা উচিত, এ দুয়ের মধ্যে ব্যালেন্স করছিলেন সম্ভবত। তারপর খুব দৃঢ় স্বরে বলে উঠেছিলেন, "তিনি মানুষ ভাল ছিলেন না। বিদ্যা, বুদ্ধি থাকলেই মানুষ উন্নত চরিত্রের হয় না সব সময়। লালবিহারী গরিব প্রজাদের উপর অত্যাচার করতেন। খাজনা দিতে না পারলে তাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছেন কত বার! লেঠেলের দল ছিল তাঁর। এমনকি..." ছেলের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে বাইরের খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে বাক্য শেষ করেছিলেন। "এমনকি গরিব চাষি বাড়ির মেয়ে-বৌদেরও ধরে এনে, তাদেরও মারধর করতেন তিনি!" এভাবেই মা 'সত্যের' সঙ্গে 'সারল্যের' সমঝোতা ঘটিয়ে বালক পুত্রের কাছে যত দূর সম্ভব মসৃণভাবে তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। গোরা শুনে উলটে পড়ে যায় আর কী! ছেলেবেলা থেকে মায়ের মুখে শুনে আসছে, মেয়েদের গায়ে কখনও হাত তুলতে হয় না। একবার ছেলেবেলায় পিসতুতো বোন স্বাতী তার জন্মদিনে পাওয়া নতুন বই ছিঁড়ে ফেলেছিল। সে খালি আলতো করে পিঠে একটা চাপড় কষিয়েছিল কেবল। স্বাতী এমন ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কান্না জুড়ল যে, মা তখনই উপরতলা থেকে 'কী হয়েছে, কী হয়েছে' বলে ছুটে এলেন। তাঁকে দেখেই স্বাতীর কান্না আরও উথলে উঠল। নাকি সুরে দশখানা করে নালিশ, "ওঁ মাঁমি, দ্যাঁখো নাঁ! মাঁরল আঁমাকে! দাঁদাঁভাঁই মাঁরল," মায়ের মুখ লাল হয়ে উঠল। বড় বড় চোখ করে ছেলের দিকে তাকালেন একবার।
"স্বাতীকে মেরেছ তুমি?" তার খুব কাছে এসে চাপা শক্ত গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন মা।
"মা, ও তো আগে আমার...," উত্তেজিত হয়ে বলতে চায় গোরা।
"চুপ। যা জিজ্ঞেস করছি, তার উত্তর দাও।" উপায় না দেখে গোরা ঘাড় নাড়ল কেবল। পিসিমণি তার সপক্ষে কিছু বলতে চাইছিলেন। কানেই নিলেন না মা। ছাদের চিলেকোঠার ঘরে তাকে ঢুকিয়ে, বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ধুলো, ঝুল আর মাকড়সার জালে ভরা আধো-অন্ধকার সেই চিলেকোঠা। তাতে থোড়াই কেয়ার করে গোরা। কিন্তু সকলের সামনে কী অপমান! চোখে জল এসে গিয়েছিল তার। ঘণ্টাখানেক পরে দরজা খুলে, তাকে ডেকে নিলেন মা। কঠিন স্বরে বললেন, "দ্বিতীয় দিন যেন না শুনি কোনও মেয়ের গায়ে হাত তুলেছ তুমি। যদি আর কখনও তেমন হয়, তবে জেনে রেখো, সেদিন থেকে আর তুমি আমার ছেলে নও।" দু'বছর আগের সেই ঘটনা মনে পড়ে

যাচ্ছিল গোরার। আর ভয়ানক অবাক হয়েছিল। সেই সঙ্গে ভারী কষ্টও হচ্ছিল। লালবিহারী এমন মানুষ ছিলেন, কেউ বলেনি তো তাকে আগে!

এখন এই পরিণত বয়সে সেদিনের কথা ভাবলে হাসি পায় গোরার। মা খুব আস্তে আস্তে তাকে সেদিন শেখাতে চাইছিলেন যে, জীবন আসলে খুব কঠিন। তত দিনে লালবিহারীর মস্ত অয়েলপেন্টিংটা সরিয়ে দিয়েছিলেন মা। সেখানে দেশি শিল্পীদের আঁকা সব ছবি টাঙিয়েছিলেন।

তবু ছেলেবেলায় কাঁচা মনের মাটিতে যে ছাপ পড়ে, তা সময়ের নিয়মে ফিকে হয়ে গেলেও মোছে না হয়তো শেষ পর্যন্ত। তাই গভীর ঘুমের মধ্যে আজও কখনও কখনও ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনেন সত্তর পেরিয়ে যাওয়া গোরা। কী স্পষ্ট!

তারপর ঘোর ভাঙে মৃদু এক চেনা শব্দে। কত কাল ধরে যে শব্দ শুনে আসছেন তিনি। অপর্ণা চিত হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। মুখটা সামান্য হাঁ হয়ে আছে। ফুলে ফুলে উঠছে নাকের পাটা। শব্দটা আসছে ওখান থেকে। অনেকদিন পরে খুব মনোযোগ দিয়ে গোরা তাকিয়ে দেখেন স্ত্রীর মুখখানা। তারপর তাকান দেওয়ালে টাঙানো তাঁদের বিয়ের দিন তোলা সাদা-কালো ছবিটার দিকে।

অপর্ণা সুন্দরী ছিলেন না কখনওই। কিন্তু তারুণ্য শরীরকে যে স্বাভাবিক মর্যাদাটুকু দেয়, তার চিহ্ন আঁকা আছে ওই ছবিতে। অনেক মেয়ে পরিচর্যায় যৌবনকে ধরে রাখে দীর্ঘ দিন ধরে। অপর্ণার তেমন মন ছিল না সেদিকে। তা ছাড়া রোগ বড় তাড়াতাড়ি জীর্ণ করে দিয়েছিল তাকে। মূত্রনালির এক ক্রনিক অসুখ। বহু চিকিৎসা হয়েছে। তিরিশ বছরের বেশি সময় ধরে একটা দিনের জন্যও সুস্থ থাকেননি অপর্ণা। তাঁদের স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন শেষ হয়ে গিয়েছে কবেই!

আজকের প্রৌঢ় গোরা স্ত্রীর দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অপর্ণা অন্য এক জগতের মানুষ। তাঁর মনের দুনিয়া থেকেও অনেক দূরের। অনেক কষ্ট করেছে কম বয়স থেকে। নিজের বাবার অকালমৃত্যুর পরে, ছোট ভাইবোনকে মানুষ করার ভার নিয়ে লড়াই করতে হয়েছিল বাইরের নিষ্ঠুর দুনিয়ার সঙ্গে। তাঁদের বিয়েটা প্রকৃত প্রস্তাবে ছিল বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে দুটি পোড় খাওয়া মানুষের মধ্যে কেজো এক চুক্তি। আর তার বছর দুয়েকের মধ্যেই রোগ ধরা পড়ল। চিরসঙ্গী হয়ে রয়ে গেল। অপর্ণার জীবন দুর্ভাগ্যের দিকেই পাল্লা ঝুঁকিয়েছে। অপর্ণার নিজের ছোট বোন পলা বলে, "জানি অনেক কষ্ট তোর বড়দি, কিন্তু গোরাদার মতো একটা মানুষকে পাওয়া যে কত বড় ভাগ্য..."

কিন্তু প্রতিদিনের জীবন যাপন যে বড় কঠিন। গোরা বুঝতে পারছিলেন, এই মুহূর্তে অন্তত তাঁর মধ্যে কোনও মমতার বোধ কাজ করছিল না। মমতা, ভালবাসা, দায়িত্ববোধ সব কিছুরই পরিসর আলাদা আলাদা। ব্যক্তিমানুষকে নিজের মনের অনেকখানি লুকিয়ে রাখতে হয়। নয়তো ভেঙে যায় সমাজ।

গোরার মনে হয়, বড় শ্রান্ত তিনি। দমচাপা এই জীবনে একটু টাটকা হাওয়ার চাহিদা প্রকট হয়ে ওঠে নিজের কাছে।

২

"মোসসোকোন্না মোসসোকোন্না মোসসোকোন্না," হাঁকছে কনডাক্টর। বুঝতে একটু দেরি হল। তার পরেই মনে পড়ে গেল সায়নদেবের। স্টপটার নাম তো আসলে 'মৎসকন্যার ঘাট'। আর হলটার নাম 'মৎস্যকন্যা ভবন'। নেমন্তন্নের চিঠিতেই লেখা আছে। 'কথাকলি'র সব সদস্যের প্রতিভূ হিসেবে সায়নদেবের হাতেই কার্ড দিয়েছিল প্রতীক, "না বললে কিন্তু সুনবো না সায়নদা। দূর থেকে অনেকে আসবে তো, তাই দিনের বেলাতেই অনুস্‌ঠানটা করছি আমরা।"

কার্ডটা দেখতে দেখতে সায়নের মনে যেন এক চিলতে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠেছিল। বিরাট বড়সড় মাপের টকটকে লাল ভেলভেটের কার্ডের উপর পুরোটা জুড়ে পাখা মেলে আছে চুমকি জ়রির প্রজাপতি। 'স'-এর দোষওয়ালা অর্থবান লোকেরা যেমন ধরনের অপশিল্প পছন্দ করে, তারই নমুনা আর কী!

"কেমন হয়েছে কার্ড?" গদগদ হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল প্রতীক।

"দিব্যি তো," খোঁচা দেওয়ার ব্যাপারে এক্সপার্ট হলেও, সে লোভটা সায়নকে সামলে রাখতেই হয় এ ক্ষেত্রে। প্রতীক টাকা কম ঢালে না। আজ গল্প পাঠের আসর, তো কাল কবি সম্মিলনী, পরশু নদীবক্ষে ভ্রাম্যমাণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। "সোরমিলা পছন্দ করেছে, বুঝলে," হাসি মাখা মুখে বলেছিল প্রতীক।

কার্ড খুলে সায়ন বলেছিল, "বাহ্ দারুণ রোম্যান্টিক নাম তো! মৎস্যকন্যার ঘাট? এমন কখনও শুনিনি।"

প্রতীক তখন ওই নামকরণের গল্পটা বলেছিল। ওখানে এক দিঘি ছিল। তখন পুরো জায়গাটা পাড়াগাঁ। জমিদার বাড়িতে মদের আসর বসত। চাঁদনি রাতে মাঝেমধ্যে সেই আড্ডা ফেরত লোকজন নাকি ও দিঘিতে মৎস্যকন্যা দেখতে পেত। কোমর পর্যন্ত মানুষের মতো। নীচে মাছের পাখনা। ঝিলমিলে জল তোলপাড় করে সাঁতার কেটে জলের মধ্যে তলিয়ে যেত আবার।

"যেদিন যাব, সেদিন ও দিঘি দেখতে হবে তো!" সায়ন বলতেই, ঠোঁট চেটে প্রতীক বলল, "আরে, কত কালের কথা! ও দিঘি তো ইয়ে এখন আর..."

"মানে? পুকুর চুরি হয়েছে বলতে চাইছিস নাকি?" সায়ন অবাক।

প্রতীককে সামান্য নার্ভাস দেখাচ্ছিল। একটুখানি ফ্যাকাসে হাসি হাসে সে। জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, "পুকুরটা আগে সুনেছি অনেক বড় ছিল। ইদানীং ইয়ে... হেজেটেজে... কচুরিপানার জঙ্গল... মানে খুব মসা... সন্ধে হওয়া মাত্র প্যানপ্যান আওয়াজ... জানলাটানলা সব বন্ধ করে ফেলতে হয় মসার জ্বালায়... ম্যালেরিয়া... আর ইয়ে ডেঙ্গি টেঙ্গি..."

সায়নদেবের অ্যান্টেনা দারুণ পাওয়ারফুল। নিমেষের মধ্যে আঁচ পেয়ে গিয়েছিল, ও আসলে কী ঢাকতে চাইছে। জঞ্জাল ফেলে ফেলে ও পুকুর ক্রমশ বুজিয়ে ফেলার প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল তার মানে। স্রেফ নিজেদের নির্মাণ ব্যবসার বাড়বাড়ন্তের কল্যাণে। তারপর সে জমি অনায়াসে গাপ করে ফেলা। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা মাফিক। টাকায় কী না হয়! হাসি পাচ্ছিল তার খুব। তবে এগুলো দিনপনেরো

আগেকার কথা। সায়নদেব ভুলেই গিয়েছিল ইতিমধ্যে। এবার ওই নামটা মনে পড়ে গেল। মৎস্যকন্যার ঘাট।
খানিক স্বস্তি পেল সে। যাক, পৌঁছনো গেল তবে। পুরো রাস্তাটা সে দাঁড়িয়েছিল বাসে। পাক্কা আধঘণ্টা ধরে। সায়নদেবের জন্য দলের অন্যরা বিব্রত হচ্ছিল— ঋতিকা, অনল, সাগ্নিক, তিয়াশা, মুন্নি। তাদের এখনও চল্লিশ পেরোতে দেরি। সায়নদেব ষাটোর্ধ্ব। এক-একটা স্টপে লোক নামার পরে, তাদের অনুরোধের ঝড় বইছিল, "এই যে খালি হয়েছে, বসে পড়ো, বসে পড়ো সায়নদা।" দাঁড়িয়ে থাকার সমস্ত অস্বস্তি মেনে নিতে রাজি সায়ন। কিন্তু ওদের ওই সহৃদয় চেঁচানিতে ভারী বিরক্ত লাগে তার।
বাস পুরো থামার ঠিক আগের মুহূর্তে নেমে সামনের দিকে দু'পা ছুটে ব্যালান্স বজায় রাখল সে। অন্যরাও নেমে এল। সামনে একটা এঁদো, কিন্তু বেশ বড়সড় হোটেলঘর। তেলচিটে দেওয়াল তার। অনেকগুলো বেঞ্চ পাতা। তাতে বসে টিপিকাল ছ্যাৎলা ধরা চেহারার কিছু লোকজন খাচ্ছে। বাইরে বড় বড় হরফে লেখা— অন্নপূর্ণা ভোজনালয়। তার নীচে ব্র্যাকেটে লেখা— সর্ব প্রকার উৎসব-অনুষ্ঠানে ন্যায্য মূল্যে অত্যুচ্চমানের খাদ্য সরবরাহ করিয়া থাকি।
এটা ল্যান্ডমার্ক। প্রতীকের কার্ডে লেখা নির্দেশ অনুযায়ী, ওই হোটেলের পাশের গলি দিয়ে কয়েক মিনিট হাঁটলেই নেমন্তন্ন বাড়ি।
সায়নদেব লেখাটা দেখে নাক দিয়ে একটু হাসল, "এখান থেকেই ওই অত্যুচ্চমানের খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে নাকি প্রতীক? এমনিতে লোকদেখানি চাল মারলেও, ভিতরে ভিতরে কঞ্জুস আছে ব্যাটা।"
"দূর, কী যে বলো সায়নদা! এখানকার সবচেয়ে সফিস্টিকেটেড অনুষ্ঠান বাড়ি ওটা। ওই মৎস্যকন্যা ভবন। এটা ওদেরই প্রপার্টি। আর আহ্বান কেটারারকে আনিয়েছে নাকি। আগের দিন তুমি যা তাড়াতাড়ি কেটে পড়লে! তার পরে খুব ঘ্যাম নিয়ে মেনুসুদ্ধু শুনিয়ে দিয়েছিল প্রতীক। প্রন কাটলেট, শামি কাবাব, আসল ভেটকির পাতুরি, ছ'রকমের আইসক্রিম... যাক, পা চালাও। খেতে আসা... বুঝলে না? খেয়েই কাটব। এত ক্ষণ বাসের ঝাঁকানিতে নাড়িভুঁড়ি বিলকুল হজম। পেটের মধ্যে ছুঁচো লাফাচ্ছে মাইরি। ওর ব্যাপারই আলাদা! দু'হাতে কামায়। কালো টাকাগুলোর গতি করতে হবে তো!" সাগ্নিক বলল।
এত ক্ষণ টানা দাঁড়িয়ে থেকে, কোমর আর পা-দুটো টাটিয়ে উঠেছিল সায়নের। তাড়াতাড়ি বসার জায়গা চাইছিল ও।
বড় রাস্তাটা আজ এই রোববার দুপুরের বাজারেও বেশ কোলাহলমুখর। ঠেলা, ভ্যানগাড়ি, সাইকেল রিকশা, ভিখিরি, কী নেই! অন্নপূর্ণা ভোজনালয়ের পাশ দিয়ে এঁদো নোংরা গলিতে ঢুকল ওরা। পাশে কচুরিপানা বোঝাই একটা ডোবা। তার ওপারে অনেকখানি পোড়ো জমি। ঋতিকা আর তিয়াশা আজ খুব কায়দার ব্লাউজের সঙ্গে শাড়ি পরেছে। চার পাশের আবর্জনার মধ্যে সাবধানে শাড়ির কুঁচি তুলে ধরে হাঁটছিল ওরা। চড়া ভলিউমে মাইকের গান ভেসে আসছিল। উৎসব বাড়ি থেকেই যে, তা আর কাউকে বলে দিতে হবে না। গলিটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেই মৎস্যকন্যা ভবনের আধখোলা গেট। তাতে লাল গোলাপের পাপড়ি দিয়ে তৈরি এক পেল্লায় হৃদয়-চিহ্ন। চ্যাঁচারির তির বেঁধা। ভিতরে ঢুকতেই ওরা তাজ্জব বনে গেল। চমৎকার বাগানের মাঝখানে বিশাল এক শ্বেতপাথরের ফোয়ারা। যদিও তার উপর বসে থাকা সবুজ কাঁচুলি পরা লাস্যময়ী মৎস্যকন্যাটিকে দেখে হাসি পেল সায়নের। চারদিকে গোলাপ আর মরসুমি ফুলের ছড়াছড়ি। বাগানের পরে চার-পাঁচ ধাপ লম্বা সিঁড়ি দিয়ে উঠে, সাদা পাথর মোড়া বারান্দা পেরিয়ে হল। সিঁড়িতে পা দিতে না দিতেই রঙিন ধুতি আর জরি কাজের পাঞ্জাবি পরা প্রতীক ওদের দেখতে পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। কবি সায়নদেব হল তার মুকুটের একটা ঝলমলে পালক। ফোটোগ্রাফারকে ইশারা করে প্রতীক জড়িয়ে ধরল সায়নকে। তারপর কাঁধ জড়িয়ে রেখেই তাকে ভিতরে নিয়ে চলল। সায়ন খেয়াল করল না, একটি ছিপছিপে চেহারার মেয়ে সামান্য চিন্তিত মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কিছু মনে করতে চেষ্টা করছে যেন। মেয়েটির গায়ের রং চাপা। মসৃণ ত্বক। খুব উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। একহারা পাতলা গড়ন। হঠাৎ দেখলে মনে হয় তরুণী, কিন্তু আসলে সে এখন পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই। সে প্রতীকের স্ত্রী শর্মিলার সঙ্গে কিছুটা কেজো পরিচয়ের সূত্রে এসেছে। আগে এসে তাড়াতাড়ি ফিরে যাবে, এমন পরিকল্পনা ছিল তার। সায়ন যখন ঢুকছিল, সে তখন বেরোচ্ছে। বেরনোর সময় তার এই লোকটিকে দেখে খুব চেনা মনে হল। কোথায় যেন সে দেখেছে এই মুখ! আর যেই প্রতীক, "এসো সায়নদা," বলে এগিয়ে গেল, তক্ষুনি মনে পড়ল তার। আচ্ছা, এই তাহলে কবি সায়নদেব! বহু কীর্তির নায়ক।
নিজের অজান্তেই তার মুখে এক তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠল। চার দিকের হইচইয়ের মধ্যে চুপচাপ বেরিয়ে এল সে।

৩

জিতা বারান্দায় বসেছিল বেতের চেয়ারে। ন'টা বেজে গিয়েছে। হাতে সকালের খাবারের প্লেট। সামনে মানি প্ল্যান্টের লতা, বাইরের রাস্তা থেকে আড়াল দেয় ওকে। অবশ্য ওদের এই অভিজাত গলি সাধারণত শুনশানই থাকে। দু'পাশে নিস্তব্ধ, বৈভবময় সব বাড়ি। গত শতকের গোড়ার দিকে তৈরি হয়েছিল ওগুলো। সাহেবি প্যাটার্নের। অনেক বাড়িরই সামনে লন। বাড়িগুলো পুরনো দিনের হলেও তাদের ধাঁচ এখনও বদলায়নি। বদলেছে কেবল মালিকানা। বাঙালির বদলে অবাঙালির দখলদারি বেশির ভাগ বাড়ির।
এ গলিতে নতুন বলতে জিতার বাড়িটাই শুধু। তা-ও নয় নয় করে পঁচিশ বছরের উপর হয়ে গেল। ওর ছেলেবেলায় এখানে একতলা লম্বাটে গড়নের বাংলো ছিল একটা। জিতার বাবার বড় শখের ছোট্ট বাগানবাড়ি। সামনে-পিছনের অল্প জমিতে ফুল আর সবজি বাগান। রবিবার সকালে প্রায়ই আসত তারা গাড়িতে দল বেঁধে। মেরুন, লাল, হলুদ বড় বড় ডালিয়া ফুটত শীতকালে। বাঁধাকপি, ফুলকপি, মটরশুঁটি, বেগুন ফলাত ওড়িশার মালি রঘু, একটুখানি জায়গার মধ্যে। গাছ থেকে সদ্য তুলে রান্না হত বেগুন ভাজা, কপির ঘণ্ট। কী স্বাদ সে সব সবজির! এখনও যেন মুখে

লেগে আছে জিতার।
সে সব ফুলবাগান, সবজিবাগান লোপাট করে, পুরনো বাংলো ভেঙে এখানে জিতার জন্য চমৎকার দোতলা বাড়ি করিয়ে দিয়েছেন বাবা। আশ্চর্য প্রায়শ্চিত্ত! নাকি ভুলের কিনার থেকে তারই আরও একটু গভীরে ডুব দেওয়া? জিতার মুখে এক চিলতে তেতো হাসি ফুটে উঠল। ভয় এক রিপু বইকি! শাস্ত্রে লেখা থাকুক আর না থাকুক। তার বাবা সুধারঞ্জন দত্ত, পুরোপুরি সেই সপ্তম রিপুর বশীভূত হয়ে শেষ পর্যন্ত অনেক নিচু করে ফেলেছিলেন নিজেকে। গতকাল বাবার চলে যাওয়ার কুড়ি বছর পূর্ণ হল। জিতার এমনিতে খেয়াল থাকে না। কখনও হঠাৎই মনে পড়ে যায়। তার শোবার ঘরের দেওয়াল সাদা, ফাঁকা। বাবা, মা কারও ছবি রাখেনি সে সেখানে।
জিতা অনিচ্ছা সত্ত্বেও খেতে শুরু করল। বেশি করে নুন-মরিচ ছড়ানো একটা সিদ্ধ ডিম, দু'টুকরো কাঁচা পাউরুটিতে পুরু মাখন লাগানো। পাশে এক দলা তেলের আচার। এ সব কখনওই তার প্রিয় খাবার নয়, তবু গত দু'মাস ধরে এই খাবারই সে প্রতি দিন খেয়ে যাচ্ছে।
মাসদুয়েক আগে জিতার হঠাৎ খুব সর্দি-কাশি হয়েছিল। প্রথমটা যথারীতি পাত্তা দেয়নি। ক্রমশ বাড়াবাড়ি হচ্ছিল। তখন আদা চা, মধু, কাঁচা তুলসীপাতা চিবিয়ে খাওয়া। নাম জানা একটা অ্যান্টিবায়োটিক পর্যন্ত। কিচ্ছু কাজ দেয়নি। এক রাতে শুতে পারে না। বুক চাপা দম বন্ধ ভাব। অপুকেও কিছু বলেনি সে। নিজেই পর দিন সকালে ডাক্তার সেনকে ফোন করেছিল। তিনি এসে দেখলেন, প্রচন্ড কনজেশন। প্রেশারটাও উঁচুর দিকে। বললেন, “এ তো এক দিনে হয়নি! নেগলেক্ট করেছেন নির্ঘাত।” বলা বাহুল্য, নিজের ডাক্তারির কথা চেপে জিতা বেমালুম বোবা কালা। খসখস করে ডাক্তারজনোচিত দুষ্পাঠ্য হাতের লেখায় ওষুধপত্তর লিখে দিলেন। সেই সঙ্গে অনেকগুলো টেস্টও।
“প্রেশারটা রেগুলার চেক করাবেন ম্যাডাম। আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই টেস্টগুলো করে আনুন। কাঁচা নুন খাবেন না। এগ হোয়াইট চলতে পারে, ইয়েলো পোর্শন বাদ দিয়ে। আসলে বয়সটা খারাপ ম্যাডাম, জানেনই তো! এই মেনোপজ়ের পর থেকেই মেয়েদের যাবতীয় সমস্যার শুরু, বুঝলেন কিনা...”
আরও কী সব যেন বলে গিয়েছিলেন ডাক্তার সেন। মুখে খুব মনোযোগী ভাব ফুটিয়ে তুলে, শুনে যাচ্ছিল জিতা। অপুকে দিয়ে ওষুধ আনিয়েই প্রেসক্রিপশনটা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে গোল্লা পাকিয়ে, ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে না ফেলে স্বভাববিরুদ্ধ ভাবে রাস্তায় ছুড়ে দিয়েছিল সে। ওষুধ শুরুর দেড় দিনের মধ্যেই উন্নতি টের পাওয়া গেল। আর সেরে ওঠার পর থেকে জিতার এই ব্রেকফাস্টের মেনু চলছে। ভাগ্যিস নীনা জানতে পারেনি। তাহলে আর রক্ষে রাখত না। চেঁচিয়ে মেচিয়ে একাকার করত!
‘ভেবেছিস কী তুই? ভেবেছিস কী? অ্যাঁ? মরতে চাস? সব টেস্ট করাতে যেতেই হবে তোকে। তোর ঘাড় যাবে’— নীনার সে সব সম্ভাব্য চিৎকার খুব স্পষ্ট শুনতে পায় যেন জিতা। একটা নরম স্নিগ্ধতা নেমে আসে কোন মহাশূন্য থেকে। জীবন কাউকেই একেবারে খালি হাতে ফেরায় না। অপু আর নীনা ওর তেমন কিছু প্রাপ্তি। বড় মূল্যবান।
অপুকে লেখাপড়া শেখানোর অনেক চেষ্টা করেছিল জিতা। কিন্তু নমো নমো করে অক্ষর পরিচয় শেষ করেই অপু ইস্তফা দিয়েছিল। একগাল হেসে বলেছিল, “ও পড়ালেখায় আমার ‘নেক’ নেই গো বৌদিমণি। ছাগল দিয়ে কি আর যব মাড়ানো চলে গা! আমার যত ‘নেক’ এই রান্নাবান্নায়। ‘হেডিরিটি’ না কী যেন বলে? আমার ঠাকুদ্দা, বাপ সব ছিল জাত রাঁধুনি। গাঁয়ের যজ্ঞিবাড়িতে লোকে সেধে ডেকে নিয়ে যেত। তা সে রক্ত যাবে কোথা!”
তার আত্মোপলব্ধির ব্যাখ্যা শুনে জিতা স্তম্ভিত! খুব প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল সেই মুহূর্তেই। বিদ্যুৎ চমকের মতো নতুন একটা ভাবনা এসেছিল মাথায়। অপুকে কষে উদ্দীপ্ত করেছিল। অনেকের সঙ্গে কথা বলে, নানা রকমভাবে ব্যবস্থা নিয়েছিল। তবে অপুর মুখের কথাটা যে স্রেফ ফাঁকা আওয়াজ ছিল না, তা টের পাওয়া গিয়েছিল ক্রমশ। তার হোম ডেলিভারি সংস্থা ‘সুখাহার’ দিব্যি চলছে আজ বছর কুড়ি ধরে। তখনও খানিকটা উৎসাহ বাকি ছিল জিতার মধ্যে।
সেই সময় একদিন অদ্ভুত একটা ব্যঙ্গোক্তি কানে এসেছিল, “আহা, আমাদের অপুর সাক্ষাৎ দুগ্‌গাদিদি!” কী আশ্চর্য! উক্তিটা করেছিল পুরোপুরি মুখোশ খসে যাওয়া একটা লোক। বৌয়ের টাকা যার জীবনে তখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাগের চেয়ে বেশি অবাক লেগেছিল জিতার। তারা তখন এ বাড়িতে চলে এসেছে। জিতার শ্বশুরবাড়ি, অর্থাৎ ওই লোকটার নিজের বাড়ি দেনার দায়ে বিকিয়ে গিয়েছে। তবু কোন মাটিতে ভর দিয়ে কেউ এমন বলতে পারে? জিতা পরে ভেবে দেখেছে, আসলে কোনও ভারতীয় মেয়ের কাছে স্বামী, শ্বশুরবাড়ি— এই শব্দগুলো জীবনের অনেক অনেক গভীরে শিকড় নামিয়ে দিয়েছে কোন কাল থেকে। সেই বিশ্বাস থেকেই কি উল্টোপাল্টা কথা বলার জোর পেয়েছিল লোকটা? মুখে কোনও উত্তর দিত না জিতা। ঘেন্নার চোখে তাকাত কেবল।
অপুর কোনও দায় নেই, তবু এখানে রান্নার কাজটায় নিজেকে বহাল রেখেছে এখনও নিজের ইচ্ছেতেই। সকালবেলা এক ফাঁকে এসে করে দিয়ে যায়। কিছুতেই ছাড়তে চায়নি। আজকের চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই অপুকে প্রতিষ্ঠিত দেখে, জিতার কোথাও এক গভীর তৃপ্তির বোধ জেগে ওঠে। নিজের মধ্যে এক ধরনের সফলতার খোঁজ পায় যেন! অনেকখানি ভরসাও।
অনেক অনেকদিন আগে, বিয়ের দু'মাসের মধ্যেই যখন জিতার সামনে থেকে রঙিন পর্দার আড়ালটা সরে গিয়েছিল, তখনকার এক নির্জন দুপুরের কথা কখনও ভুলবে না সে। ক্ষতবিক্ষত হয়ে থাকত সে সারা ক্ষণ। শাশুড়ির খুব কড়া কিছু নির্দেশ ছিল, যা অমান্য করার কথা সে ভাবতেই পারত না তখনও। দুপুরবেলা দরজা বন্ধ করার নিয়ম ছিল না ওখানে।
পর্দা টেনে রেখেছিল। একলা ঘরে শক্ত করে হাত চাপা দিয়ে রেখেছিল নিজের মুখে, যাতে আওয়াজ না বেরোয়। ওর সুন্দর মুখটা ভেসে যাচ্ছিল চোখের জলে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে নেমে ভিজে উঠেছিল

ওর পুরো হাতের পাতা।
'বৌদিদিমণি', খুব আস্তে ডেকেছিল কেউ। চমকে তাকিয়েছিল জিতা। অপু তখন টিঙটিঙে, ময়লা একটা ছেলে। খালি গায়ে বুকের পাঁজরাগুলো গোনা যায়। সারা দিন ফাই-ফরমাস খাটা যার কাজ। আর কথায় কথায় ধমকানি খাওয়া। কাঁটা হয়ে থাকত সমস্ত ক্ষণ। বড় বড় ভিতু চোখদুটো। রোগা ডানহাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। কাগজে মোড়া ছোট্ট কিছু জিনিস ধরে রেখেছে।
"এটা নাও বৌদিদিমণি, খুব ভাল খেতে। লজেনচুস। টক মিষ্টি... ন্যাপাদার দোকানে আছে..." কোনও মতে ঠেকে ঠেকে বলছিল। কিন্তু উদগ্রীব গলার স্বর।
"কী রে?" সেই মুহূর্তে তীব্র বিষাদ ভুলে অসম্ভব অবাক হয়ে তাকিয়েছিল জিতা। নিজের কান্না ভেজা মুখটার জন্য অপ্রস্তুতও। পর্দা সরিয়ে একেবারে ভিতরে চলে এসেছে। ছেলেটাকে তেমন খেয়াল করে দেখেনি কখনও। কথা বলারই দরকার পড়েনি।
যেন নিজেকে জোর করে খাড়া রেখেছে, এই রকম মরিয়াভাবে ছেলেটা বলল, "তোমার জন্য এনেছি। খুব ভাল লজেনচুস। খাও। কেঁদো না।" এইটুকু বলেই কাছে এগিয়ে এসে, জিতার কোলের উপর কাগজ মোড়া জিনিসটা ফেলে দিয়েই পিছন ফিরে দে দৌড়। জিতা খুলে দেখল, কমলা রঙের একটা সস্তা দামের লজেন্স। সেটা আঙুলে তুলে তাকিয়ে রইল কিছু ক্ষণ। তার পরেই আবার এক কান্নার দমক এল। অন্য এক কান্না।
খুব অল্প কয়েকটা মুহূর্তকে মানুষ নিজের অজান্তেই আজীবন বয়ে চলে। সেই রকম একটা মুহূর্ত সেদিন হাতের মুঠোয় পেয়ে গিয়েছিল জিতা। লজেন্সটা কেমন খেতে ছিল, এমনকি সেটা সত্যিই খেয়েছিল কিনা, আজ মনে নেই আর।
জিতাকে কম বয়সে লোকে সুন্দরী বলত। গমের মতো রং। টানা চোখ। সাজানো দাঁতের সারি। কিন্তু কতদিন হয়ে গেল সে আয়নায় ফিরেও দেখে না নিজেকে। খুব তাড়াতাড়ি তার চেহারার জৌলুস ফিকে হয়ে গিয়েছে। জিতা একমাত্র সন্তান। কিন্তু মাসি-পিসিরা গত হলেও এ শহরেই ওর বেশ কয়েকজন তুতো ভাইবোন আছে। কারও সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ রাখে না। জিতা তাদের সকলের চেয়ে বয়সে বড়। তাদের খুব প্রিয় ছিল। কিন্তু এখন সে কাউকে আসতে বলে না নিজের বাড়িতে। এ নিয়ে অভিযোগ আছে তাদের। কখনও কখনও অবশ্য জিতা তাদের কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে যায়। সে আর সায়ন দু'জনেই, একসঙ্গে। অনুষ্ঠান বাড়িতে পৌঁছে সহজ মুখে কথা বলে সকলের সঙ্গে। তবু জিতার আত্মীয়রা বোঝে, এক অদৃশ্য ঘেরাটোপে নিজেকে ঘিরে রেখেছে সে। অনেকদিন হয়ে গেল, উচ্ছ্বাস ব্যাপারটাই কেমন যেন শুকিয়ে এসেছে তার ভিতর থেকে। কারও কোনও খবর পাওয়ার জন্য সে আর আগ্রহ বোধ করে না।
বরং সায়ন খুব হইচই করে। সক্কলের সঙ্গে আড্ডা জমিয়ে নেয় চট করে। জিতার আত্মীয়রা খুব পছন্দ করে তাকে। আর জিতা খুব ভাল করে ভেবে এখন নিঃসন্দেহ হয়ে গিয়েছে যে, জনপ্রিয় হতে গেলে বিশেষ কিছু দরকার হয় না। ভাল চেহারা, নানা বিষয়ে খানিকটা অগভীর জ্ঞান, বাস্তব বুদ্ধি, চটকদার কথা বলার ক্ষমতা। ব্যস।
যখন সেই ভয়ানক অপ্রীতিকর ঘটনাটা মোটামুটি ভাবে জনসমক্ষে এসেছিল এবং তাই নিয়ে চার পাশে এক চাপা তোলপাড় শুরু হয়েছিল, তখন জিতার এ সব ভাইবোনেরা ছোট। সকলেই অনেক পরে কিছুটা জেনেছিল। বেশির ভাগটাই জানেনি। ও সব ঘটনা এখন তাদের কাছে প্রায় খবরের কাগজের ফিচারের মতো। বহু দূরের ব্যাপার।
জিতার ধারণাতেই নেই যে, তাকে নিয়ে কথা উঠলে ওরা নিজেদের মধ্যে বলে, "আরে বাবা, ও সব তো কোন যুগের কথা! কম বয়সে অমন একটু-আধটু হয়েই যায়, তা বলে এভাবে ও সব চির কাল মনে রেখে সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে রেখে লাভ কী? সায়নদা মানুষ হিসেবে সত্যিই তো খারাপ কিছু নয়। করে ফেলেছিল একটা ভুল। শুধরেও তো নিয়েছে। জিতাদি কিন্তু মেন্টাল পেশেন্ট করে তুলছে নিজেই নিজেকে। সক্কলের সঙ্গে ডিসট্যান্স এসে গিয়েছে ওর। কেমন একটা আনহেলদি অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করে রাখে নিজের চার দিকে।"
তবে জিতার এক মাসতুতো বোন রমিতার সঙ্গে সায়নের আজকাল বিশেষ দহরম মহরম হয়েছে। কারণ দস্যু মোহনের স্টাইলে 'কী করিয়া কী হইয়া গেল, এক প্রভাতে নিদ্রা ভঙ্গের পর সকলে দেখিল রমিতা আচমকা কবি হইয়া উঠিয়াছে'। বহু লিটল এবং কমার্শিয়াল পত্রিকায় নিয়মিত তার কবিতা বেরোয়। সেই সূত্রেই এখন সায়নের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা। সাহিত্য জগতের অনেক তাবড় তাবড় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সায়ন পরিচয় করিয়ে দিয়েছে তার। রমিতা তাকে 'আমার ফেভারিট জামাইবাবু' বলে উল্লেখ করে নাকি সব জায়গায়।
জিতার সঙ্গেও মাখামাখির চেষ্টা করেছিল রমিতা মাঝখানে। প্রায়ই ফোন করত। একবার খুব আগ্রহ সহকারে স্বরচিত কবিতা শুনিয়েছিল। জিতার মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। ও কবিতার মানে জিজ্ঞেস করেনি, তবে বিশেষ উৎসাহসূচক বাক্যও কিছু শোনাতে পারেনি বোধহয়। রমিতা মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল নির্ঘাৎ। সেই থেকে আর ফোন করে না।
পরে একবার আত্মীয়মহলে নাকি সে বলেছিল, "আসলে ব্যাপারটা কী জানো তো? মানুষ সব সময় অন্যকে দোষী করে একটা খুব সূক্ষ্ম তৃপ্তি পায়। ঠিক সেই কারণেই জিতাদি ওই সব পুরনো স্মৃতিকে ভুলতে চায় না।"
বলা বাহুল্য, এমন মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ জিতার কানে পৌঁছয়নি। তবে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সে অনেক খবর জানতে পারে। মাঝে মাঝে অলসভাবে দেখে যায়। নিজে কখনও মন্তব্য করে না। একটা কথা কেউই জানে না। প্রায়ই সে ফ্রেয়া মুলার নামে এক বিদেশিনীর প্রোফাইলে ঢোকে। নির্লিপ্ত মুখে সার্চ করে যায়। অথচ রোজ রোজ কিছুই দেখার থাকে না সেখানে। মধ্যবয়সি এই মহিলা সোশ্যাল মিডিয়ায় তেমন অ্যাক্টিভ নয়। তার স্কুল, কলেজ, কর্মস্থল কিছুই দেখায়নি সে। তবে জিতা জানে, হাই স্কুলে ঢোকেইনি কখনও ফ্রেয়া। ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতে পারে। এক সময় একটা ঝরঝরে গাড়ি চালিয়ে পরিচারিকার কাজ করতে যেত, কিছু পেইং গেস্ট হয়ে থাকা ছাত্রদের ফ্ল্যাটে। তার

পরিবার-পরিজন সম্পর্কে কোনও খবর নেই। দু'চারবার রেস্তরাঁয়, সমুদ্র সৈকতে কয়েকজন নারী-পুরুষের সঙ্গে কিছু ছবি পোস্ট করতে দেখেছিল। লালচে গায়ের রং। লাল চুল। সারা মুখে ব্রণ। মোটাসোটা। কিন্তু খুব ছোট, কাটা গলার পোশাক পরে। যৌন আবেদনের কোনও গল্পই আর অবশিষ্ট নেই। তবু তার বিভাজিকা দেখা যায়। খুব স্পষ্ট। প্রায়ই তার ফ্রেন্ড লিস্ট চেক করে জিতা। কেন যে, তা নিজেও বোঝে না। ফ্রেয়ার বন্ধুর সংখ্যা মোটে ছেচল্লিশ। স্বাভাবিকভাবেই একজনও মিউচুয়াল ফ্রেন্ড নেই। জিতার পরিচিতও কেউ নেই। তবু তার জন্মদিন মনে থাকে জিতার। বাইশে সেপ্টেম্বর। কী আশ্চর্যভাবে মিলে গিয়েছে একটি জন্মদিনের সঙ্গে এক মৃত্যুর দিন! না শুধু মৃত্যু নয়, ভয়ঙ্কর ধ্বংসেরও দিন।

জিতার খাওয়া শেষ হতে, বেল বাজল। সে জানে, অপু এসেছে। আই হোলে না দেখেই দরজা খুলে দেয় সব সময়। সায়ন একদিন এ নিয়ে বলতে গিয়েছিল। জিতা ঠান্ডা চোখে এক ঝলক তাকিয়ে বুকশেলফের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল।

"আজ নুরজাহানি চিকেন করব বৌদিমণি। নতুন রেসিপি। সাদা তিল, কাজু, চারমগজ দিয়ে। তিল কিনে এনেছি। তাহলে এ মাসে তোমার যা দেওয়া আছে, এখনও পর্যন্ত তার হিসেব হল গে..."

"ও সব হিসেবের খুঁটিনাটি শোনাতে আসিসনি তো আমাকে! তুই-ই তো বাড়ির গিন্নি রে, আমি কোন কালে রিজ়াইন করেছি। টাকা ফুরোলে আবার চেয়ে নিবি।"

দিনের মধ্যে দু'একবার এমন সহজ ভাবে কথা বলতে পেরে, সহজ হাসি হাসতে পেরে জিতার বড় আরাম হয়। নিজের ঘরে যেতে যেতে জিতা অপুর শিলনোড়ার ঘসর ঘসর শুনতে পায়। 'যন্তরে' পেষা মশলায় রান্না খোলতাই হয় না বুঝি! স্বাদের হেরফেরের সঙ্গে সমঝোতা করার 'পাত্তর' নয় অপূর্ব চন্দর বারিক।

মোবাইল বেজে ওঠে এমন সময়। নাম দেখে একই সঙ্গে খুশি আর অবাক হল জিতা। এই সময় সাধারণত নীনা খুব ব্যস্ত থাকে।

৪

"কী চাই?" গোরাকে ঘরে ঢুকতে দেখে গম্ভীর মুখে মা জিজ্ঞেস করলেন। কেমন ফাঁকা দৃষ্টি মায়ের চোখে। গোরা দেখছে, ক'দিন হল মা খুব অন্যমনস্ক। কিছু নিয়ে যেন দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন। এমনকি তার সঙ্গে বিশেষ কথাও বলছেন না। তবে কি মা জানতে পেরেছেন গত শনিবারের ওই ঘটনাটা? ভয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায় গোরার।



স্কুল ছুটির ঘণ্টা বাজে। বেরিয়ে আসে সে শুকনো মুখে। ড্রাইভার হরেনদাদা অপেক্ষা করছে বাইরে। এইটুকু রাস্তাও গাড়িতে আসে বলে অন্য ছেলেরা খেপায়।

শনিবার লাস্ট পিরিয়ডে মণিস্যারের ড্রইং ক্লাস থাকে। স্যার ঘষঘষ করে বোর্ডের উপর চক দিয়ে একটা গ্লাস, কি ঘড়া, কিংবা হাঁড়ি, কিছু এঁকে দেন। তারপর সেটা দেখে ছেলেদের কপি করতে বলেন। নিজে বারান্দায় গিয়ে, অন্য স্যারেদের সঙ্গে আড্ডা দেন নিচু গলায়।

সেদিন ক্লাসে অনেক কম ছেলে এসেছিল। প্রভাত তার দলবল নিয়ে হল্লা জুড়েছিল। গোরা বোর্ড থেকে দেখে দেখে ফুলদানিটা আঁকছিল মন দিয়ে। হঠাৎ কাঁধে হাত রাখল কেউ। গোরা ঘুরে দেখল প্রভাত।

"কী রে ভাল ছেলে? এঁকে মোক্ষ লাভ করতে চাস?" বাঁকা হাসি তার মুখে। প্রভাত ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে বড়। প্রতি ক্লাসে দু'বছর বাঁধা। প্রভাত নাকি সিগারেটও খায়! শুনে শিউরে উঠেছিল গোরা। তার বাবা-মা সকলে সিগারেট আর মদ খাওয়াকে খুব ঘৃণা করেন। তাই প্রভাতের সঙ্গে বেশি কথাবার্তা বলে না গোরা। ওদের নিজেদের কয়েকজনের একটা দল আছে।

"আমায় একটা জিনিস এঁকে দিতে পারবি ভাল করে?"

একটু অবাক হল গোরা, "কী?"

"এই যে, কাগজ নে। এই কথাটা লিখবি মাঝখানে বড় বড় করে, তাপ্পর তার চারদিক ঘিরে নকশা করে দিতে হবে," প্রভাত উচ্চারণ করল সেই অদ্ভুত শব্দটা। শুনে ভুরু কুঁচকে গিয়েছে গোরার। কত গল্পের বই পড়েছে সে, কিন্তু শব্দটা পায়নি তো কোথাও! "কী মানে ওর?" ভারী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে গোরা।

"খুব সুন্দর দেখতে হয় যারা, তাদের বলে।"

"কোন ভাষায়?"

"পাতি বাংলা রে বেওকুফ। শুনিসনি কখনও? এই তুই লেখাপড়া করিস?" নাক সিঁটকোয় প্রভাত। বড়ই হীনম্মন্যতাবোধে আক্রান্ত হয় গোরা। তার পরেই নিপাট ভালমানুষী স্বর প্রভাতের গলায়, "নে, লেখ এবার।"

"কী করবে তুমি ও নিয়ে?"

"যদি খুব ভাল করে লিখতে পারিস, ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙাব বাড়ির দেওয়ালে," একগাল হেসে প্রভাতের উত্তর।

গোরা একটু ভাবে। আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে ও দেওয়ালে ঝুলতে দেখেছে বটে সেলাই করে লেখা 'পতি পরম গুরু' কিংবা 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'।

রং পেন্সিল বার করে খুব যত্ন করে, ধরে ধরে লেখে সে অজানা শব্দটা। মুখ তুলতেই প্রভাত তারিফের ভঙ্গিতে বলে, "বাহ্, খাসা হয়েছে! এবার নাম সই কর ছবির নীচে।"

"নাম সই? কেন?"

"আরে কোথাকার ক্যালানে তুই? জানিস না, বড় বড় আর্টিস্টরা ছবি এঁকে তলায় নিজের পুরো নাম সই করে দেয়!"

বেশ গৌরবান্বিত লাগে তার। মা, বাবাকে বলে তার নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে

দিয়েছেন। পাছে না মেলে, তাই সে খুব যত্ন নিয়ে রপ্ত করেছে নিজের সই। সুন্দরভাবে সই করে দিল সে কাগজের নীচের দিকে। অমনি কাগজটা তার হাত থেকে নিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ে প্রভাত। ব্যাগে ঢুকিয়ে বলে, "যা লিখলি, সত্যি মানে জানতে চাস তার? শোন..." কানের কাছে মুখ এনে উচ্চারণ করে শব্দটা। গোরার বিমূঢ় মুখের ভাব দেখতে দেখতে, কেটে কেটে বলে, "কী রে ভাল ছেলে, তুই লিখলি তালে নিজের হাতে। সই করেছিস, না বললে কেউ মানবে না। এটা রইল আমাদের কাছে। ভাল চাস তো সোমবার আমাদের ঘুগনি আর আইসক্রিম খাওয়াবি। নয়তো..."

চোখ টিপে জিভ দিয়ে চকাস চকাস আওয়াজ করে সে। প্রথমে রাগে আর ঘেন্নায় সারা শরীর রি রি করে ওঠে গোরার! মেরে ধামসে দিতে ইচ্ছে করে প্রভাতকে। সে নিয়মিত ব্যায়াম করে, কুস্তি শিখছে। কিন্তু কখনও মারামারি করেনি কারও সঙ্গে। তাই কী করবে, ভেবে পায় না।

স্কুল ছুটির ঘণ্টা বাজে। বেরিয়ে আসে সে শুকনো মুখে। ড্রাইভার হরেনদাদা অপেক্ষা করছে বাইরে। এইটুকু রাস্তাও গাড়িতে আসে বলে অন্য ছেলেরা খেপায়। বাড়ি ফেরে সে। বরফের মতো ঠান্ডা এক ভয় চেপে বসে তার উপর। মা তার সঙ্গে বন্ধুর মতো নানা বিষয়ে কথা বলেন। কিন্তু সে বোঝে, এ কথা মা-বাবাকে বলার নয়। সে কী নির্বোধের মতো নিজের মৃত্যুবাণ তুলে দিয়েছে প্রভাতের হাতে! কে বিশ্বাস করবে, আসলে কী হয়েছিল?

ভিতু চোখে মায়ের দিকে তাকায় গোরা। কী বলবে, হঠাৎ ভেবে না পেয়ে আলমারির উপর দিকে আঙুল দেখায়, "কী বই মা ওগুলো? ওই উপরে? পাড়ছি আমি।" মা যেন ঘোর ভেঙে জেগে উঠলেন, "নাহ্‌ হাত দিয়ো না! ও সব বই পড়বে না এখন তুমি। আগে বড় হও।"

তার পরেই মা একটু চিন্তিত মুখে বলেন, "বোসো, একটা কথা বলছি। ঠিকমতো একলা একলা স্কুল যেতে পারবে তুমি?" সে উদগ্রীব হয়ে ওঠে, "কেন পারব না? একটুখানি রাস্তা তো, হেঁটেই চলে যাব।"

"তাহলে কাল থেকে তাই যাবে। ষাঁড়েশ্বরতলার মোড়টাতে হঠাৎ করে বাস এসে যায়। ভাল করে দু'দিক দেখে রাস্তা পেরোবে। হরেন সঙ্গে যাবে কদিন, তারপর অভ্যেস হয়ে গেলে... পরের মাস থেকে তো আর..." মা কথা শেষ না করে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপেন। চাউনিতে যেন কেমন শূন্যতা। সে ঠিক বোঝে না।

কিন্তু হঠাৎই গত ক'দিনের দুশ্চিন্তা খসে পড়ে এক মুহূর্তে। আচমকা স্বাধীনতা পাওয়ার আনন্দ জ্বলে ওঠে দপ করে। কতদিন ধরে মাকে বলছে, সে একলা যেতে চায়। মা রাজি হলেও, বাবার খুব আপত্তি ছিল এতদিন। এবার সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, "না মা না, হরেনদাদাকে একদিনও যেতে হবে না। ওরা তো সক্কলে একলা হেঁটে যায়। রাজেন, তীর্থ, তপু সক্কলে। আমি ঠিক পারব।"

সেই রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় তার। বাবা-মায়ের ঘর থেকে তাঁদের কথার চাপা আওয়াজ ভেসে আসছে। শব্দগুলো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। নিঃশব্দে টর্চ জ্বালিয়ে, ঘড়ি দেখে গোরা। রাত দেড়টা। সে ধীরে ধীরে উঠে, দু'ঘরের মাঝের বন্ধ দরজায় কান পাতে। রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে নিচু স্বরে বলা কথাগুলো শুনতে পায় সে এবার।

"আমি বলেছিলাম, এমন দিন চিরকাল থাকবে না। তুমি গ্রাহ্যও করোনি তখন। চোখ বুজে মনুর কথা বিশ্বাস করেছ। বার বার বলেছি, ফিক্সড ডিপোজিট করো, ভাল শেয়ার কেনো... সঞ্চয় যে কত জরুরি! তুমি ব্যঙ্গ করেছ তখন, এগুলো নাকি পাতি মধ্যবিত্ত মানসিকতার পরিচয়। শুধু লোক দেখানোর জন্য দু'হাতে টাকা উড়িয়েছ..."

"ওহ্‌, এখন শোধ নিচ্ছ তার? ভাল... খুব ভাল! পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে বড্ড আনন্দ পাচ্ছ..." বাবার গলায় কেমন অসহায় এক রাগ।

"কার উপর শোধ নেব?" মা অল্প হাসলেন যেন। "অবশ্য এই মুহূর্তে খুব চিন্তার কিছু নেই। আমার গয়নাগুলো তো রয়েইছে। এখন বেশ কিছুদিন..."

"ছিঃ! বাড়ির বৌয়ের গয়নায় হাত পড়লে সর্বনাশের আর কীই বা বাকি থাকে?"

"ও সব সেন্টিমেন্টাল কথাবার্তা রাখো। মাটিতে পা দিয়ে চলতে শিখতে হবে এবার। নিতান্ত যেটুকু প্রয়োজন, তার বাইরে এখন আর কিচ্ছু নয়। সামনের রোববার থেকে দাবার আড্ডা বন্ধ করো। কলকাতা থেকে গুচ্ছের খরচা করে, কেক, প্যাটিজ় আনিয়ে... বেহিসেবি কাণ্ড যত!"

"এতকাল ধরে যা হয়ে এসেছে, হুট করে অমন বন্ধ করা যায় না তা," বাবার গলায় অচেনা এক কাতরতা।

"ওদের খোলাখুলি বলো, এখন পরিস্থিতি অন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সব আর পেরে উঠবে না তুমি।"

কেমন এক আশঙ্কায় বুক কাঁপছিল গোরার। কী যেন ভেঙে পড়ছে চারপাশ থেকে।

পরদিন থেকেই গোরা হেঁটে স্কুলে যাওয়া আসা শুরু করেছে। ড্রাইভার হরেনদাদাকে আর দেখতে পেত না। গাড়ি পড়ে থাকত গ্যারাজে। বাবা তখন আর বেরোতেন না বিশেষ। একদিন স্কুল থেকে ফিরে গোরা দেখল, গাড়িটা নেই আর। বাবা অবাক ছেলের প্রশ্নের জবাবে খুব অস্বস্তি-মাখানো গলায় বললেন, খারাপ হয়েছে। কারখানায় দেওয়া হয়েছে তাই।

"কবে ফেরত দেবে বাবা ওরা?" উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করল সে। ছেলের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে সত্যবাদী বাবা, শেষ বিকেলের বারান্দায় এসে পড়া মলিন রোদের ফালির দিকে চেয়ে বলেছিলেন, "মেরামত করবে তো ভাল করে! সময় লাগবে অনেক।"

গোরার মনে পড়ে সেই মুহূর্তটি থেকে তার বিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল। প্রাণতোষ রায়চৌধুরী নামের হেরে যাওয়া মানুষটার বাবা হয়ে উঠতে শুরু করেছিল সে, নিজেরই অজান্তে।

তার চোখের সামনে ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছিল তাদের বাড়ি। রেবাদিদি, অতুলদা আর আসত না। পৈতেধারী ধবধবে ফর্সা মৈথিলি ঠাকুরকেও আসতে বারণ করে দিলেন মা একদিন। শুধু রয়ে গেল নোনাদা। বয়স হচ্ছে। যতটুকু পারে করে। তবু রেলিঙের খাঁজে, সিঁড়ির ধারে রাখা ছবিতে, মূর্তিতে ধুলো জমে থাকত। দেওয়ালে ঝুল। মায়ের মুখে ও দেখতে পেত অনভ্যস্ত পরিশ্রমের শ্রান্তি। খেয়াল হয়েছিল, মনুকাকা অনেকদিন আসছে না। জিজ্ঞেস করে



ফেলল গোরা একদিন। বাবাও ছিলেন সেখানে। মায়ের মুখ লাল হয়ে উঠল, “খুব খারাপ লোক মনু। তোমার বাবা বুঝতে ভুল করেছিলেন ওকে। বড্ড বেশি বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু ব্যবসার অনেক টাকা ঠকিয়ে নিয়েছে ও। ওর সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক নেই আমাদের।”
বাবা খুব কাতর গলায় বলেছিলেন, “থাক না মণিকা! ছেলেমানুষের সামনে অমন সব কথা কেন আর?”
মা তীব্রভাবে বলেছিলেন, “কেন থাকবে? ছেলেমানুষির যুগ শেষ হয়েছে ওর। এবার বড় হয়ে উঠতে হবে।”
এক রাত্রে খেতে বসেছিল ওরা। কাঁসার বড় থালায় মা বন্ধ কৌটো থেকে গরম রুটি তুলে দিচ্ছিলেন। পাশের বাটিতে পটলের ডালনা। গোরার মনে হচ্ছিল, অত বড় থালাটা যেন খাঁ খাঁ করছে। বাবা এক গরাস মুখে দিয়ে বললেন, “নুন হয়নি যেন।”
মা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে, নুনের বাটিটা এগিয়ে দিলেন। বাবা একটু ইতস্তত করে বললেন, “আর কিছু নেই? একটু বেগুন ভাজা-টাজা, কি...” বাবার কথা কেটে নির্লিপ্ত গলায় মা বললেন, “গুড় দিচ্ছি। খেয়ে নাও।”
দালানের ও প্রান্তে ভাঁড়ার ঘর। সেখান থেকে গুড় নিয়ে আসতে মা যেন বড্ড দেরি করলেন। গোরা দেখেছিল, মায়ের শক্ত চোয়াল। দু’চোখ লাল। গুড়ের পাত্রটা রেখে, চোখে আঙুল ঘষতে ঘষতে বললেন, “কী যে পড়ল চোখে, এমন করকর করছে!” বাবা উত্তর দিলেন না। গোরা কেমন কাঠ হয়ে গেল।
কিন্তু আরও কিছুদিন দাবার আড্ডা চলেছিল। হয়তো বা বাবার ব্যাকুলতার কথা ভেবেই, মা ওই ব্যাপারটায় বিশেষ বাধা দেননি আর। তাদের আচমকা থমথমে হয়ে যাওয়া বাড়িটা শুধু রবিবারেই যেন প্রাণ ফিরে পেত। নোনাদার মধ্যে পর্যন্ত সংক্রামিত হত সেই উৎসাহ। ভোর থেকে উঠে যত দূর সম্ভব, ঝেড়েঝুড়ে সাফ করে ফেলতে চেষ্টা করত চতুর্দিক। ডালপুরি-আলুর দম, ডিমের কচুরি এমন কিছু মুখরোচক জলখাবার তৈরি করতেন মা। কেনা খাবার আসা বন্ধ হয়েছিল। দাবার আড্ডার বন্ধুরা এসে পড়তেন সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে। তারপর হইচই, উত্তেজনা তুঙ্গে চড়ত। তারই মধ্যে নোনাদাকে বার বার চায়ের ফরমাস। মুখে গজগজানি লেগেই থাকত, তবু করে আনত নোনাদা। মায়ের তৈরি খাবার খেয়ে পরেশকাকা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠতেন, “ওফ বৌদি, সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখা উচিত হাত দু’খানা আপনার।”
কিন্তু একদিন ভয়ঙ্কর এক ঘটনা ঘটল। আর তারপর থেকে চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেল ওই জমায়েত।
আগের রাতে মা খাননি কিছু। বলেছিলেন, খিদে নেই। পরদিন সকালে পেটের ডান দিকে ঘিনঘিনে ব্যথা। উঠতেই পারেননি। নোনাদা অন্য কাজকর্ম জানলেও, রান্নাবান্নায় ডবল এমএ। তবু ডাল, ভাতটা নামিয়ে দিয়েছিল কোনওমতে। বাবা মায়ের বিছানার কাছে এসে কাঁচুমাচু হয়ে বলেছিলেন, “ইয়ে, ওরা আসছে তো... তাহলে নোনাকে দিয়ে তুমি বরং পরেশের দোকান থেকেই কিছু খাবারদাবার আনিয়ে নাও।”

যথারীতি বন্ধুরা এসেছিল। মায়ের শরীর খারাপ শুনে মৃদু আক্ষেপোক্তি সকলের। নোনাদা ট্রে সাজিয়ে চা আর নিমকি নিয়ে ঢুকল।
বাবার চোখ ছানাবড়া, "শুধু এই শুকনো নিমকি? আর কী এনেছিস?"
"আবার কী আনব? যা আগুন দাম সব! হাত দিলে ছ্যাঁকা লাগে," নোনাদার সতেজে উত্তর।
বাবা চটে কাঁই। লজ্জিতও বন্ধুদের সামনে। "তোকে কে বলেছে অত সদ্দারি করতে? যা, আবার যা! শিঙাড়া, সরভাজা, জলভরা সন্দেশ— যা ভাল পাবি, নিয়ে আয় গে আবার।"
বন্ধুরা হাঁ হাঁ করে উঠেছেন, "কী মুশকিল! বৌদি অসুস্থ... এর মধ্যে এ সব কী বাড়াবাড়ি শুরু করলে?" কিন্তু বাবা তাদের কথায় দৃকপাত না করে গর্জন করে উঠলেন।
"তোর পয়সা? যে অমন কঞ্জুসিপনা করেছিস? যা বলছি! নিয়ে আয় এক্ষুনি।"
ঘাড় বেঁকিয়ে বুনো ঘোড়ার মতো তাকিয়েছিল নোনাদা।
"হুঁহ্‌! মাসের শেষ... বৌদিদি যা পয়সা দিয়েছে, তাতে আর কী হবে? শনির দশা পড়লে মানুষের বুদ্ধিনাশ হয়। আজ আসিনি আমি, চড়াই-উতরাই সবই তো দেকচি নিজের চক্ষে! যখনকার যেমন তেমনি না চললে..." নোনাদা যেন উগরে দিচ্ছিল গত ক'দিন ধরে জমে থাকা ক্ষোভ। এই রায়চৌধুরী বাড়ির বাইরে তার তো আর কোনও অস্তিত্ব ছিল না।
ঠিক তখনই ঘটে গেল সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা। ফরাস থেকে উঠে এলেন গোরার চিরকালের ভদ্র, শান্ত, মিষ্টভাষী বাবা। মুখ লাল। জ্বলছে দু'চোখ। সপাটে চড় কষালেন নোনাদার গালে।

৫

ভোরবেলা প্রতিমাদির হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার খবরটা পেয়েছিল নীনা। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল। অ্যাম্বুলেন্সে প্রতিমাদিকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিল চটপট। হঠাৎ প্রেশার ফল করেই হয়েছিল বুঝি অমন। তবু দু'দিন ওখানে থেকে গিয়ে কিছু ইনভেস্টিগেশনের দরকার নাকি। আজকের প্ল্যান ক্যানসেল করতে হল তাই নীনাকে।
নীনা বাড়ি ফিরে প্রথমেই মনে মনে মস্ত একটা ধন্যবাদ দিল প্রতিমাদিকে। তারপর স্নান সেরে, পুরনো নাইটিটা পরে ফেলল। মাঝে মাঝে যখন এমন এক একটা আচমকা আলসেমির দিন এসে যায়, তখন তার ষোলো তলার শুনশান ফ্ল্যাটে এইটা পরে সে গড়াগড়ি দেয় নিজের বিছানায়। বাইরের ব্যালকনির দিকে তাকিয়ে চড়াই পাখিদের ওড়াউড়ি দেখে। গুনগুন করে গান গায় আপন মনে। বয়সের সঙ্গে গলার আগের মিষ্টতা চলে গেলেও সে এখনও বেশ সুরেই গায়। কিন্তু বাড়ির লোকেদের হাজার অনুরোধেও কখনও শিখতে রাজি হয়নি। আসলে ছেলেবেলা থেকেই তার নিজের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকার মানুষ নয় সে। সায়েন্স স্ট্রিমে ছিল, এইচএস-এ যথেষ্ট ভাল মার্কস। কিন্তু শুধুই ইচ্ছে করল না বলে শেষ পর্যন্ত বাংলা অনার্স নিয়ে ভর্তি হল, বাড়ির হাজার আপত্তি সত্ত্বেও। আশেপাশের লোকেরা ধরেই নিয়েছিল, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলে বস্তুটি নেই তার ভিতরে। নির্ঘাত বিয়ে করে ফেলে, পায়ের উপর পা তুলে আরামসে জীবন কাটাতে চায়। নীনা শেষে খোলাখুলি অতনুর কথা বলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তখন চুটিয়ে প্রেম করছিল সে অতনুর সঙ্গে। তার জীবনের বেশ গুরুত্বপূর্ণ, অথচ ছোট্ট একটা এপিসোড।
কিন্তু অতনু হঠাৎ একদিন ভুরু কুঁচকে, তর্জনী উঁচিয়ে বলেছিল, "তোমার ওই কলেজ লাইফের স্যার এখনও এত ফোন করে কেন? যেদিনই আসি, ফোন বাজছে— আর প্রতিবারই শুনি ওই এইচ ডি এম স্যার! অ্যায়াম টেলিং ইউ নীনা, হি ইজ় প্লেয়িং উইথ ইউ," ঠিক সেদিনই ওই 'হব-হব' বিয়ের ফাঁসটা খুলে বেরিয়ে এসেছিল সে। তখন সে সবে বাইশ। নীনা যখন বুঝে গিয়েছিল টাকা রোজগার না করলেও তার অসুবিধে হবে না, তখনই ঠিক করে ফেলেছিল, তার জীবনে অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিনকে এনট্রি দেবে না কিছুতেই। মা গত হওয়ার পর, তার কোনও পারিবারিক বন্ধন নেই। অবশ্য এখনও সে প্রচুর পড়াশোনা করে। যখন যা দরকার বলে মনে হয় তার। সে ফ্রেঞ্চ আর জার্মান শিখেছে। নানা বিষয়ে কোর্স করেছে। মায় বিউটিশিয়ান কোর্স পর্যন্ত। তার পনেরোশো স্কোয়্যার ফিটের এই ফ্ল্যাট জুড়ে শুধু অজস্র রকমের বই আর বই। এত বইয়ের দেখভাল করার পিছনে সময় ও খাটনি আর দিতে পারছে না নীনা। তাই তাকে এখন ই-বুক পড়ার ছোট্ট যন্ত্রটির দ্বারস্থ হতে হয়েছে। ইদানীং অনেক বাংলা বইও রাখছে ওরা।
একটু খুঁজতেই যা চাইছিল, পেয়ে গেল নীনা। আগে কখনও সায়নদেব ঘোষের কোনও লেখা পড়েনি। কিন্তু এখন 'মরসুমি ফুলের শীৎকার' বইটা খুঁজে পেল সে। প্রথম কবিতার গোড়ার কটা লাইন পড়েই হোঁচট খেল সে। আচ্ছা, এই মহান কবি নামধারীটি নিজেই কি এই স্বরচিত কবিতার মানে বলতে পারবে? নীনা এ-ও জানে, কেউই জিজ্ঞেস করবে না তাকে। শুনে শুনে লোকটার সম্বন্ধে যেমনটা ভেবেছিল, একদম ঠিক তা-ই লোকটা। দেখনদারি আর ফাঁকা আওয়াজ। কিন্তু ভাগ্য বড় বেয়াড়া চিজ়! লোকটাকে অনবরত সঙ্গ দিয়ে চলেছে দেখ কেমন।
রেগেমেগে জিতাকে ফোন লাগাল। অবশ্য সায়নদেবকে দেখার কথা বলল না। জিতা খুব শক্ত, ঠান্ডা ব্যবহার করে লোকটার সামনে, কিন্তু নীনা জানে, ভিতরে ভিতরে প্রতি মুহূর্তে সে ক্ষয়ে যাচ্ছে। আদালতের কড়া শাস্তি পাওনা ছিল লোকটার। কিন্তু জিতার মনে 'ডিভোর্স' শব্দটা নিয়ে সংস্কারের চোরা স্রোত কি বয়ে চলেছে আজও? নীনার প্রায়ই মনে হয়, জিতা যদিও তার চেয়ে কয়েক বছর আগে জন্মেছে, কিন্তু আসলে সে জিতার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। সেইমতোই ব্যবহার করে ও জিতার সঙ্গে। তবে কথাটা জিতাকে খুলে বলতে হবে খুব শিগগির। কিন্তু সামনাসামনি বসে। ও আশা করছে, সেই মুহূর্তটা জিতার জীবনের এক টার্নিং পয়েন্ট হয়ে উঠবে।
আবোলতাবোল অনেক গল্প করে গেল তারা দু'জনে। ফোনালাপ শেষ হতে নীনা হাত-পা এলিয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

জিতাকে এই নির্মল সময়টুকু দিতে পেরে বড় ভাল লাগল তার।
আবার মোবাইল বাজল এমন সময়। কী কাণ্ড! লোকটা গন্ধ পায় নাকি রে বাবা! কাজের সময় কখনও ফোন করে না। হাসতে হাসতে নীনা জিজ্ঞেস করল, "কী করে জানলে আমি এখন কুঁড়েমি করছি?" কমল শার্লক হোমসীয় কেতায় জবাব দিল, "ইউ নো মাই মেথডস ওয়াটসন! সোমবার সকাল দশটায় নলিনীমালা চাটুজ্যে হোয়াটসঅ্যাপলগ্না হয়ে রয়েছেন, এ তো হয় না! এনিওয়ে, আজ কত ক্ষণ ফ্রি?" ঠাকুমার বড় আহ্লাদ করে দেওয়া সেই নামটা কবেই ছেঁটে ফেলে সে নিজেকে নীনা করে নিয়েছে! আজ কবেকার পুরনো গন্ধ ভেসে এল। ফুরফুরে মেজাজে উত্তর দিল নীনা, "আজ পুরো দিনটাই, কালকেও। রেডলাইট এরিয়ায় এই দু'দিনের যে প্রজেক্টটা ছিল, আপাতত পোস্টপন্ড। কারণ আমাদের টিম লিডার প্রতিমাদির হঠাৎ আজই সকালে..."
"হ্যাং ইয়োর 'কারণ'। অতএব কালকের দিনটা নিশ্চয়ই আমরা একসঙ্গে কাটাব। লং ড্রাইভে যাব। কী চমৎকারভাবে মিলে গেল। ফিনল্যান্ড যাওয়ার আগে, এমন কৃপা করে মনের ইচ্ছে মিটিয়ে দিলে মা! বুঝলে নীনা, একজনের সঙ্গে ছোট্ট একটুখানি কাজ। তাপ্পর ওয়েসাইড ধাবায় গরম গরম তড়কা রুটি। পাক্কা।" সামনের সপ্তাহে ফিনল্যান্ড যাচ্ছে কমল। মেয়ের কাছে। দু'মাস থাকবে সেখানে। এমন হঠাৎ করে একটা দিন একসঙ্গে কাটাতে নীনাও এক পায়ে খাড়া। তবু জিজ্ঞেস করল, "কার সঙ্গে কাজ? কোথায়? তোমার কাজের সময় আমিই বা কী করব?"
"ধীরে নলিনী ধীরে। আমার এক দাদার বাড়ি যাব। বৈষয়িক কাজ। মিনিটপাঁচেকের ব্যাপার। জাস্ট একটা-দুটো জিনিস জেনে নেব, ব্যস।"
"কী অদ্ভুত কথা বলো কমল! তোমার দাদা, আমি চিনি না, জানি না, তাঁর বাড়িতে..."
"আরে আমিও কি ছাই চিনি নাকি? কাল প্রথম দেখব। আমার থার্ড কাজ়িন। ওঁর আর আমার গ্রেট গ্র্যান্ডফাদাররা নিজের ভাই ছিলেন। মোবাইলে যেচেপড়ে আলাপ করলাম।"
"তার মানে?"
পুরো ব্যাপারটা খোলসা করে কমল। বর্ধমানের এক গ্রামে ওদের আদি বাড়ি এখনও দাঁড়িয়ে আছে ভগ্নদশায়। জানলা, দরজা, সিঁড়ি, কড়িকাঠ— সব খুলে নিয়ে গিয়েছে স্থানীয় লোকজন। বাড়ির লাগোয়া অনেকটা জমি জবরদখল হয়ে গিয়েছে। এ বাড়ির কথা বাবার মুখে শুনেছে কমল, কিন্তু যায়নি কখনও। মাথাও ঘামায়নি। কিন্তু এতদিন পরে, কমলের চেনা এক উকিল খবরটা এনেছে হঠাৎই। ল্যান্ড রেভিনিউ অফিসে পড়চা ঘেঁটে জানা গিয়েছে, এখনও যা আছে, তার ল্যান্ড ভ্যালু কয়েক কোটি। সব মরেঝরে ওয়ারিশন দাঁড়িয়েছে মোটে দুই। কমল নিজের চোখে সে সব কাগজপত্তর দেখেছে। ওই উকিল সেই থেকে লেগে আছে পিছনে। ভাল বায়ার রেডি আছে নাকি তার হাতে। তবে কাল কমল যাচ্ছে তার এই দাদার সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় করতে।
"তোমার দাদার কাছে কী বলে পরিচয় দেবে আমার?"
"আরে! জানো না, 'ভাল বন্ধু' শব্দটা এখন পাবলিক খুব খাচ্ছে। প্রাচীনপন্থী লোকেরা পর্যন্ত এ সব শুনলে ইদানীং স্মিত মুখে তাকিয়ে থাকে। তাপ্পর আড়ালে পাড়াপড়শির কাছে কী বলে-না বলে তাতে আমার কাঁচকলা!" নীনা শুনে কথা খুঁজে পায়নি। কমল আবার বলে, "ও ভাল কথা নীনা, ও বুড়োর আন্ডাবাচ্চা কিস্যু নেই বুঝলে! টেঁসে গেলে আমিই সোল ওনার। বৌ আছে বলেও মনে হল না। ফুটে গিয়েছে হয়তো!"
"আশ্চর্য তো! বৌ আছে কি নেই, মনে হওয়াহওয়ির ব্যাপার আসছে কী করে? মোবাইলে খানিক কথা হয়েছে মোটে। তোমাকে তো আর বলেননি যে, উনি ব্যাচেলর বা বিপত্নীক।"
"আহা, বুঝছ না? যেরকম বিন্দাস টাইপ, ঘাড়ের উপর একখানা আস্ত বৌ থাকলে অমন হওয়ার কথা নয়। এই যতকাল স্বাগতা ছিল, ততদিন আমার হাবভাব, চলনবলন, সব ছিল বাঁধা গরু প্যাটার্নের— চরতে মাঠে যেতাম, ঘাস চিবোতাম কিন্তু খুঁটিতে বাঁধা। ও যখন শেষে রবিন দত্তর প্রেমে পড়ে দিওয়ানা হয়ে গেল, আমি যেন হাতে চাঁদ পেলাম..."
"ঠিক আছে, বহুবার শুনেছি ও সব। থামো।"
এমনটাই ধরন কমলের। যাবতীয় হতাশা আর মনখারাপকে বুঝি ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে চায়। এই মানুষকে ছেড়ে চলে গিয়েছে ওর বৌ। 'কমপ্যাটিবিলিটি'র অভাব ছিল নাকি, ওয়েভলেংথে মেলেনি। "কী সভ্যভব্য ছিল গো সে বৌ, জানো তো! চেঁচামেচি, কাচের গেলাস ভাঙাভাঙি ও সব পিকচারেই ছিল না। চোখে মাসকারা লাগিয়ে, লিপস্টিক পরে স্রেফ বেরিয়ে গিয়েছিল, ব্যাগ গুছিয়ে। এমনকি ঠাকুরঘরে পেন্নাম ঠুকেছিল পর্যন্ত বেরোবার আগে। আমাকে 'ভাল থেকো' বলেও গিয়েছিল। হেব্বি ডিউটিফুল! আমিও সেই থেকে জানতে পারলাম, কত মেয়ে, কত মেয়ে চারদিকে। আর মরেছে ব্যাটা রবিন দত্ত। ক্লাবেটাবে আচমকা মুখোমুখি হয়ে গেলে, আমার মুন্ডু টপকে উঁচু দরজার কাচের নকশা দেখার ভান করে। আজকাল অবশ্য আর দেখি না তাকে। বাইপাস সার্জারি হয়েছে শুনলাম। নি রিপ্লেসমেন্টও। বেচারা," রবিন দত্তর দুঃখে মুখ দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করেছিল কমল। ওদের মেয়ে ফুচির সেই ঘটনার সময় ক্লাস এইট। সাইকোলজিকাল প্রবলেম হয়েছিল নাকি ফুচির তখন! লাগাতার কাউন্সেলিং করাতে হয়েছিল মেয়েটাকে।
কমলের অনেক ভিতরে, বিবর্ণ ঘরটার বন্ধ দরজা দেখতে পেয়ে গিয়েছিল নীনা। যার খবর কাউকে দিতে চায় না কমল। ওই দরজাটা ছুঁতে পেরেই কি সে ভালবেসে ফেলেছিল কমলকে? সে সব চুকেবুকে যাওয়ার পর নীনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ওদের। ফুচির তখন বাইরে যাওয়ার তোড়জোড় চলছিল উচ্চশিক্ষার্থে। আট বছর কেটে গিয়েছে তারপর। ফুচি এখন ফিনল্যান্ডের এক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে দায়িত্বপূর্ণ পদে আছে। হাসিখুশি আর ভারী সহজ মনের একটা মেয়ে হয়ে উঠেছে। নীনার সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক। কমল যে সেই লড়াইটা জিতে গিয়েছে, ভেবে খুব অহঙ্কার হয় নীনার। শুধু ভালবাসাই যে অহঙ্কার দিতে পারে।
কথার মাঝখানে কমল হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলে

ওঠে, "এই নীনা, ধরো তো একটু। আবার কেন ফোন করছে কে জানে! তোমায় হোল্ডে রাখছি—লাইনে থাকো।"
কে ফোন করছে জিজ্ঞেস করার আগেই হোল্ডে চলে গেল ও। মিনিট দুয়েক পরে ফিরে যে প্রস্তাবটা পেশ করল, তাই শুনে নীনার চক্ষু চড়কগাছ! ওদের দুপুরে খেতে অনুরোধ করেছেন নাকি কমলের ওই দাদা। নীনা বকাবকি করল বিস্তর। কমলের মোক্ষম যুক্তি, "আহা বুঝছ না, পরের পয়সায় খ্যাঁটন জুটলে 'না' করতে নেই। মা লক্ষ্মী পাপ দেন। তা-ও ভদ্রতা করে প্রচুর 'না না' করেছিলাম, বিশ্বাস করো। কানেই নিলেন না।"

৬

"ওই চড়টা তুমি আসলে আমাকে মারলে," মা-এর গলার স্বরে ভয়ানক উত্তেজনা। ব্যথায় ক্লিষ্ট মুখে কাঠিন্য। বাবা মাথা নিচু করে চেয়ারে বসা।
খানিক আগে নোনাদার দু'হাত ধরে বহু অনুনয় করেছিলেন বাবা। তবু গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। শুকনো মুখে হতভম্ব চাউনি। শেষে মা উঠে এসে, হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছিলেন, "দুর্ভাবনায় তোমার দাদাবাবুর মাথার ঠিক নেই নোনা। আমি ওঁর হয়ে মাফ চাইছি তোমার কাছে। তুমি না খেলে এ সংসারের অকল্যাণ হবে। আমার কচি ছেলেটা কী দোষ করেছে বলো... তুমি না ওকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছ," মায়ের গলা কেঁপে গিয়েছিল।
তখন হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল নোনাদা। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, "অকল্যেনের আর বাকি কী আচে গো বৌদিদিমণি? দাদাবাবুকে ভালমানুষ পেয়ে তোমাদের ওই মনু সব্যস্ব ঠকিয়ে নিল যে, তবু দাদাবাবুর হুঁশপব্ব নেই কো! অমন লোকদ্যাখানি বাবুয়ানির নিকুচি করেচে! তবে ভেবো না বৌদিদিমণি— এই আমি বলে গেনু, আমার গোরাভাই কালেদিনে এ সংসারের লক্ষ্মীঠাকরুণকে আবার ফিরিয়ে আনবে গো, আর ওই মনু পচে মরবে... মাথার উপরে ধম্মো আছে ঠিক, মিলিয়ে নিয়ো সেদিন বুড়োর কতাটা," চোখের জল গড়িয়ে পড়ে ভিজে গিয়েছিল নোনাদার খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা মুখটা।
গোরার মনে স্পষ্ট হয়ে থেকে গিয়েছে সেই ছবিটা। বাবার মধ্যে সে দেখেছিল পুরোপুরি ভেঙে পড়া এক মানুষকে। আর জেনে গিয়েছিল, তার নিজের জীবনের অন্য একটা অধ্যায় শুরু হয়ে গিয়েছে। এ বাড়ির দায়িত্ব নিতে তৈরি হতে হবে তাকেই। প্রস্তুতি নিতে হবে সে জন্য। মন দিয়ে লেখাপড়া। তারপর ভাল কোনও চাকরি। মাস গেলে নিশ্চিত টাকা আসবে যাতে। সে কখনও ব্যবসা করবে না। উদ্বেগ, আশঙ্কা... আবার সেই সঙ্গে এক ধরনের উত্তেজনা বুড়বুড়ি কাটছিল ভিতরে তার।
সকালের চা খাওয়ার পর মা একটু ইতস্তত করে বাবাকে বললেন, "আমার অলকের সঙ্গে কথা হয়েছে। ওকে বলেছি, নীচের তলায় ভাড়াটে বসাব আমরা। হারু, কৃষ্ণাদি ওদেরও বলে রেখেছি, খোঁজ পেলে জানায় যেন। ঘরগুলো বন্ধ ফেলে রেখে লাভ কী বলো? মানুষ বাস করলে তবু তো..." মা যেন কুণ্ঠিত স্বরে কৈফিয়ত দিচ্ছেন।
"ওদের বলার আগে তুমি একবারও আমাকে জানালে না?" বিশ ওয়াট বাল্বের টিমটিমে আলোর মতো ম্লান পৌরুষের আস্ফালন বাবার গলায়।
"এই তো জানালাম। ভেবে দ্যাখো, ঘরগুলো পড়েই থাকে তালাবন্ধ। শুধু শুধু ধুলো জমে কেবল। তার চেয়ে..." নরমভাবে বললেন মা। মৃদু হাসলেনও। করুণ হাসি। কতগুলো বছর ধরে বড় গভীর মায়ায় জীবন জড়িয়ে গিয়েছে এ মানুষটার সঙ্গে। সৎ, পরোপকারী, আদর্শবাদী। কত লোকের বিপদে আগুপিছু না ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছেন। টাকা ধার নিয়েছে লোকে। তারপর দিব্যি মুখ মুছে সরে পড়েছে। মণিকা রাগারাগি করলে, একটাই জবাব হাসিমুখে, "আরে ছাড়ো তো! ও ক'টা টাকা মেরে প্রাণতোষ রায়চৌধুরীকে ফতুর করার সাধ্যি আছে কার?" এর মধ্যে চাপা অহঙ্কারও ছিল না কি? মণিকা কতবার বলেছেন, "মনুর উপর অতখানি ভরসা কোরো না। কথায় বলে পরচিত্ত অন্ধকার।" অবাক শিশুর সরলতায় উত্তর দিয়েছেন প্রাণতোষ, "কী বলছ মণিকা? ও আমার আপন মামাতো ভাই! যে মামি নিজের পেটের ছেলের চেয়ে আলাদা ভাবেননি আমাকে, তাঁরই রক্ত বইছে ওর দেহে।" এমন সব অর্থহীন কথায় যার মগজ ভরে আছে, কে পথ দেখাতে পারে তাকে?
ভাড়াটে পাওয়া গেল এক সময়। মা তার আগে মিস্ত্রি ডাকিয়ে একতলার ঘর আর বাথরুম চুনকাম করালেন। নতুন রঙের গন্ধ বাড়ি জুড়ে। বাবার মুখ অন্ধকার। নিজের ঘরটির মধ্যেই গুটিয়ে রেখেছিলেন নিজেকে।
একদিন লম্বাচওড়া মিশকালো একটি লোক ও তাঁর বেঁটেখাটো গোলগাল স্ত্রী ঘর দেখতে এলেন। ঠাকুমা মারা যাওয়ার পরে মা বাড়ির সব টয়লেটে কমোড করিয়ে নিয়েছিলেন সুবিধের জন্য। মহিলা তাই দেখে নাক সিঁটকোলেন, "বাবা, এ যে দেখি সায়েবি কেতা! ছোঁয়ান্যাপা করে সব্বস্ব একাকার!"
স্বামী বললেন, "হাজার হোক, আমরা ছাপোষা লোক... সত্যি বলতে কী, এমন কলঘরে হেগেমুতে সুখ হবে না বৌদিদি!"
নিজের রসিকতায় চোখ টিপে জোরে হেসে উঠলেন। মায়ের লাল হয়ে যাওয়া মুখখানা দেখে গোরার তীব্র এক ধিক্কার জন্মাল নিজের উপর। একদম মুখচোরা, নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকা চোদ্দো বছরের গোরা, লোকটির চোখে চোখ রেখে খুব শান্ত গলায় বলে উঠল, "এ বাড়িতে সবই কমোড সিস্টেম। আপনাদের অসুবিধে হলে, অন্য কোথাও দেখুন বরং।"
সেই রাতটার কথা গোরা কোনও দিন ভুলবে না। এগারোটা বেজে গিয়েছে তখন। পরের দিন ছিল সাপ্তাহিক ভূগোল পরীক্ষা। অ্যাটলাস খুলে ম্যাপ পয়েন্টিং সড়গড় করছিল সে। হালকা শব্দে ফিরে তাকিয়ে দেখল, মা!
"তুমি ঘুমোওনি কেন এখনও?" ভুরু কুঁচকে তাকাল গোরা। ডাক্তার বলেছেন, মায়ের গ্যাসট্রাইটিসের ব্যথা। খাওয়া, ঘুমের অনিয়ম চলবে না।
মা সে কথার উত্তর দিলেন না। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে তার মাথায় হাত রাখলেন। ঘেঁটে দিলেন চুলগুলো। তারপর, কতদিন পরে তার চিবুকে হাত রেখে চুমু খেলেন মা। টানা টানা দু'চোখে জলের পর্দা। কোনও

কথা বললেন না। আবার ফিরে গেলেন। গোরা খোলা বইয়ের পাতায় চোখ রেখে বসেছিল। কিন্তু কত ক্ষণ পর্যন্ত একটা অক্ষরও মাথায় ঢুকছিল না। ছেলেদের কাঁদতে নেই। দাঁত দিয়ে প্রাণপণে ঠোঁট কামড়ে রেখেছিল সে।
পাঁজির শুভদিন বুঝে সেই কর্তা-গিন্নি, তিনটি ডাগরডোগর মেয়ে সমেত তাদের বাড়ির একতলার বাঁ দিকের অংশে এসে ওঠেন। পিঠোপিঠি বোন তারা। তিনজনেই বড় গোরার চেয়ে। হেনাদি, মীনাদি আর শঙ্কুদি। ‘কাকিমা’ ‘কাকিমা’ করে ডেকে প্রায়ই উঠে আসত উপরে। গায়ে পড়ে নিজেদের সংসারের হাজার খবর দিত মাকে। কথায় কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ত। মা কোথাও একটা দূরত্ব বজায় রাখতেন। খুব যেন পছন্দ করতেন না তাদের অনবরত আসাযাওয়া। গোরার চোখে শঙ্কুদিকে সবচেয়ে সুন্দরী লাগত। একটু বেশি রোগা। ফর্সা। পানপাতার মতো মুখ। কী চমৎকার ছিল তার হাসির ভঙ্গি! বারবার চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করত গোরার। আবার কেমন লজ্জাও করত। কিন্তু সে তাদের গল্পের জায়গায় এসে বসলেই মা রূঢ়ভাবে বলতেন, “যাও, উপরের ঘরে গিয়ে অঙ্কগুলো করে ফেলো। মেয়েলি গল্পে এত উৎসাহ কিসের?” গোরা লক্ষ্য করত, ওরা মায়ের বিরক্তি বুঝে নিজেদের মধ্যে চোখ টিপে হাসত।



বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করে জিতা। তখনই মনে পড়ে গেল, আজ ওর বিয়ের তারিখ। অন্ধকারে অমনি হিংস্র হয়ে উঠল চোখের চাহনি।

এবার বাড়িতে মিস্ত্রি লাগল যখন, মা ছাদের চিলেকোঠাটা সাফ করিয়ে ওর পড়ার ঘর করে দিয়েছেন। লোভনীয় গল্পের আড্ডা ছেড়ে উঠে আসতেই হত ওকে। একটাও অঙ্ক কষত না অবশ্য। খাতার পিছনের পাতায় হিজিবিজি কাটত ফাউন্টেন পেন দিয়ে। ফুল, কল্কা, প্রজাপতি, মেয়ের মুখ। সে মুখে শঙ্কুদির আদল ফোটানোর ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যেত।
মোবাইল বাজছে। গোরা নামের বর্ষীয়ান মানুষটি অতীত থেকে ফিরে এলেন। এই কলটার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন তিনি সকাল থেকে। স্নিগ্ধভাবে বললেন, “হ্যাঁ, বলো। কদ্দুর পৌঁছোলে?”
“গুগ্‌ল ম্যাপের মেমসায়েব এত ক্ষণ ডাইরেকশান দিয়ে দিয়ে এবার ফেল মেরে গিয়েছেন দাদা। বাঁড়ুজ্যেপুকুর... তারপর শিবমন্দিরের পাশের দাশগুপ্ত লন্ড্রিটা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তার পরে তো আর...” টগবগে তাজা গলা।
“ব্যস ব্যস, এসেই পড়েছ। ওই লন্ড্রির ধারে গাড়িটা সাইড করে পার্ক করো। আসছি আমি এক্ষুনি, মুখে বলতে গেলে একটু কনফিউজ়িং হবে।”
অনেকদিন পরে যেন অন্য রকম একটা দিন গোরার জীবনে। লালবিহারীর রক্ত বইছে আর একটা মানুষের শরীরে। তার সঙ্গে দেখা হবে এক্ষুনি।
উত্তেজনা চাপা দিয়ে, জোর পায়ে এগোন তিনি মন্দিরতলার দিকে। পুরো দু’মিনিটেরও রাস্তা নয়। কিন্তু চক্রবর্তীদের বাড়ি ভাঙা হচ্ছে। জায়গাটা ঘিরে রাখা হয়েছে। নতুন লোকের পক্ষে হদিস পাওয়া মুশকিল।
স্টিল গ্রে গাড়ি। এইট ওয়ান নাইন নাইন। তাঁকে দেখেই বুঝতে পেরেছে। ছেলেটি বেরিয়ে আসে। ওপাশে বসে থাকা মেয়েটিকে খেয়ালই করেন না গোরা প্রথমে। একই বংশের মানুষজনের চেহারার একটা ধাঁচ থাকে। গোরা নিজের বাবার সঙ্গে এই অবসরপ্রাপ্ত এঞ্জিনিয়ার কমল কিশোর রায়চৌধুরীর মুখের একটা ক্ষীণ আদল খুঁজে পেলেন। হয়তো আরও একটু লম্বা। অতটা ফর্সা নয়। তবু...
“হ্যালো, গৌরাঙ্গদা তো? আমি কমল,” হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিল সে। গোরা দেখলেনও না। কাছে এসে স্বভাবছাড়া আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাকে।
“ইউ মে কল মি গোরাদা। অনেক ইনফরমাল লাগবে তাহলে। ওটাই আমার নিক নেম।”

৭

অন্ধকার ঘরে জেগে উঠে জিতা বুঝতে পারছে, ঘুমের ওষুধের ডোজ় বাড়াতেই হবে এবার। তিনটে-সাড়ে তিনটের মধ্যে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে রোজ। তারপর সারাদিন ধরে শরীরে ম্যাজমেজে ভাব!
বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করে জিতা। তখনই মনে পড়ে গেল, আজ ওর বিয়ের তারিখ। অন্ধকারে অমনি হিংস্র হয়ে উঠল চোখের চাহনি। যা আদৌ নেই, তাকে বয়ে চলা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্ত কাজ।
সায়নদেব নামটা খুব পছন্দ হয়েছিল তার। কী সুন্দর ঝকঝকে চেহারা! এঞ্জিনিয়ার হয়ে এসেছে জার্মানি থেকে। এখানে টেগার্ট অ্যান্ড স্মিথ কোম্পানিতে জয়েন করেছে। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। জিতার মামাতো দিদির জায়ের সূত্রে সম্বন্ধ এসেছিল। বনেদি ঘর। অবস্থা ভাল। বাবা নেই। একমাত্র সন্তান। মা-ছেলের ছিমছাম সংসার। চেনাজানা সকলেই প্রশংসা করেছে এ পরিবারের। সামান্য চাপা ফিসফাস আছে কেবল যে, সায়নের মা বৈধব্যের আচার মানেন না। রঙিন শাড়ি, সাজগোজ, মাছ-মাংস খাওয়া— সবই করেন। তবে পরিমিত সবই। কোনও উগ্রতা নেই। ভারী শালীন ব্যবহার। জিতার বাবা, মা একে খুব স্বাভাবিক হিসেবেই নিয়েছেন।
অতএব পাত্র হিসেবে সে যে প্রথম শ্রেণির, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না কারও। বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পর, দু’বাড়ির অনুমোদন সাপেক্ষে তাকে বেঙ্গল স্কাই হোটেলের নতুন কফিশপে নিয়ে গিয়েছিল সায়নদেব। নম্র সুন্দর কথা, চমৎকার ম্যানার্স। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে। জিতার ওঠানামার সময় আগেই গাড়ির দরজা খুলে ধরছিল। তার প্লেটে স্ন্যাকস তুলে দিচ্ছিল। তাদের বাড়িতে

সাবেকি ব্যাপারস্যাপার। চেনাজানা কোনও পুরুষকে জীবনে এমন করতে দেখেনি সে। থ্যাঙ্কিউ বলা উচিত ছিল যে, তখন তা মনেও পড়েনি জিতার। পরে আফসোস হয়েছিল। সায়ন হয়তো ওকে মুখ্যু গাঁইয়া ভাবল! অবশ্য ভাবভঙ্গি দেখে তেমন মনে হয়নি একেবারেই। সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করলেও, কবিতা পড়তে খুব ভালবাসে সায়ন। নিজেও লেখে নাকি একটুআধটু। জিতা অবাক। তেমনি খুশিও। পরে একদিন শোনাবে বলেছে। ওইটুকু সময়ের মধ্যেই কবিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। রবি ঠাকুর, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে। আবার শেলি, কিটস। আর... আর উঠে আসার আগে সেই আশ্চর্য কথাটা বলেছিল, যা তার আঠারো বছরের জীবনে কেউ কোনও দিনও বলেনি তাকে। তার ডান হাতটি নিজের হাতের পাতায় তুলে ধরে বলেছিল, "ইউ আর লাইক আ ফ্রেশ ফ্লাওয়ার।" প্রথমে দু'এক সেকেন্ড হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল সে। জবাবে কিছু বলতেই পারেনি। তারপর কোত্থেকে যেন রাশি রাশি অচিন ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়তে লাগল চারপাশ ঘিরে! 'প্রেম' নামের সেই অলৌকিক শব্দটাকে ও ছুঁয়েছিল সেদিন।
'ইউ আর লাইক আ ফ্রেশ ফ্লাওয়ার', 'ইউ আর লাইক আ ফ্রেশ ফ্লাওয়ার'— যেন একটা বীভৎস ক্লাউন অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে নাচছে, আর ভেংচি কেটে কেটে ফিরিয়ে দিচ্ছে ওই শব্দগুলোকে। ছটফট করে উঠে বসে জিতা। হাঁপাচ্ছে। নীনাকে খুব মনে পড়ছে এখন।
"যতবার ও সব পুরনো কথা মনে পড়ে কষ্ট পাচ্ছিস তুই, ততবারই ও লোকটা জিতে যাচ্ছে আসলে। অতীতকে বদলানো যায় না। বর্তমান ভবিষ্যৎকে তৈরি করে। নিজেকে নষ্ট করে ফেলিস না," নীনা বলেছিল।
আজ মাসের পয়লা। নির্লজ্জ লোকটা চুপচাপ এসে দাঁড়াবে। জিতা কোনও কথা বলবে না। হাতখরচের টাকাগুলো তুলে দেবে ওর হাতে। ভাবলেশহীন মুখে। প্রতি মাসের মতোই। ইদানীং ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার আর অনলাইন পেমেন্টের জমানায় নগদ টাকার ব্যবহার কমে গিয়েছে, তবু ক্যাশ যাকে যতটুকু দিতে হয়, জিতা সেই টাকা খামে ভরে তবে দেয়। সূক্ষ্ম এক শালীনতা। কিন্তু সায়নদেবকে ওই টাকা ক'টা ইচ্ছে করেই কখনও খামে ভরে দেয় না সে। জিতা জানে, ওর নিজস্ব রোজগার বলতে স্বল্প সঞ্চয়ের সুদ। বৌয়ের হোটেলে থাকা-খাওয়ার খরচা নেই অবশ্য! টাকা নিয়ে নির্লজ্জ লোকটা চলে যাবে। তাদের কোনও কথা হবে না। কিন্তু টাকাটা অবহেলায় ওর হাতে তুলে দিয়ে খুব তৃপ্তি হয় জিতার। প্রতিশোধ নেওয়ার আনন্দ। এটাই যেন জিতার বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন।
বিয়ের পরদিন চলে আসার সময়, বাবা কেঁদে ফেলেছিলেন। মা, মাসি, পিসি কারও চোখই শুকনো ছিল না। কান্নায় ভিজে তার মুখে লেপে গিয়েছিল নতুন সিঁদুর আর কাজল। তখন আলতো করে তার হাতে চাপ দিয়েছিল সায়ন, সকলের অলক্ষ্যে। এত বোকা ছিল যে সে জানতই না, মুখোশ বলে আসলে কিছু আছে। চুপিচুপি গভীর এক প্রত্যাশা তৈরি হচ্ছিল তার বুকের ভিতর।
উৎসব বাড়ির এক মাদকতা আছে। আর এই উৎসবের কেন্দ্রবিন্দুতে সে নিজে, এমন নতুনত্বের মোহ আচ্ছন্ন করেছিল তাকে। কালরাত্রিতে সায়নের মা আর ভাগলপুর থেকে আসা কাকিমার সঙ্গে শুয়েছিল সে। হাসিখুশি সুন্দরী শাশুড়ি তার। বয়স বেশি নয়। খুব রুচিসম্মত সাজগোজ। সকলে বলে, সায়নদেবের মুখ তার মায়ের মতো। শাশুড়ি হেসে বলেছিলেন, "বাব্বা, আর চিন্তা নেই। ছেলের বিয়ে দিয়ে মনে হচ্ছে যেন বোঝা নামল ঘাড় থেকে! এখন থেকে তোমার বরের সব দায়িত্ব তোমারই জিতা।" কাকিমা বললেন, "জানলে জিতা, সায়ন বিয়ে করতে বেরোবার সময় চামেলিমাসি বলছিল, বল, মা তোমার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি। তা আমি বললাম, ছিঃ, ও সব কী বিশ্রী কথা আজকালকার দিনে! বরং বল, মা, তোমার জন্য বন্ধু আনতে যাচ্ছি। সায়ন তখন তাই বলল।" তিনজনে মিলে হাসল।
নতুন তাঁতের শাড়ি, মাথার কাছে রাখা ফুলের মালার গন্ধের মধ্যে জিতা ভরভরন্ত শান্তি নিয়ে কখন যেন ঘুমে ঢলে পড়ল। স্বপ্নের মতো কেটে গেল কয়েকটা দিন। আত্মীয়স্বজন ফিরে গেলেন। তারা হানিমুনে যাবে ঠিক ছিল। বেরোবার আগে সায়নদেবের মা আদর করে জিতাকে বললেন, "আনন্দ করে এসো।"
সিমলায় সেই আশ্চর্য সুন্দর স্বপ্নের দিনগুলো কাটিয়ে ফিরে এল তারা। কিন্তু বাড়িতে পা দিয়েই ওর মনে হল, কোথায় কী একটা বদলে গিয়েছে। সায়নের মাকে অন্য রকম লাগছিল। খুব গম্ভীর যেন। বিশেষ কথা বললেন না।
"তোমার কি শরীর খারাপ, মামণি?" জিতা জিজ্ঞেস করল। প্রশ্নটাকে তেমন পাত্তা না দিয়ে, যেন একটু বিরক্ত হয়েই না-সূচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি। খুব অবাক হল জিতা। সায়ন বলল, "আরে ছাড়ো তো! এক এক সময় ডিপ্রেশনে ভোগে মা। ক'দিন পরে আবার ঠিক হয়ে যাবে। সেক্স স্টার্ভড না? ভেবে দ্যাখো, বাবা মাত্র ছেচল্লিশেই মারা গেছে।"
"ছিঃ, কী বলছ? তোমার মা না?" বিস্ময়ে, আতঙ্কে বড় বড় চোখে বলেছিল সে।
হেসে অস্থির সায়ন, "কী মুশকিল! সেক্স শব্দটা মুখে বললেই দোষ হয়ে গেল? একটা বেসিক ইনস্টিংক্ট। নিজে কী করো? খারাপ লাগে বলে তো মনে হয় না হাবভাব দেখে। আর সেক্স ছাড়া কোনও মহিলা মা হবেটা কী করে, অ্যাঁ?" চকাস করে একটা চুমু খেয়ে অফিসে বেরিয়ে গেল সায়ন।
জিতা কী এক তাড়নায় জল, সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে মুখ ধুয়ে ফেলল সায়নের স্পর্শ মুছে ফেলতে। এই প্রথম। চেনা মানুষ এমন অচেনা হয়ে যায়? নাকি কোনও ভুল ছিল তার চেনায়? সমস্ত মন আকুল হয়ে উঠল নিজের ফেলে আসা বাড়ির জন্য। পাশাপাশি বসে দুপুরের খাবার খেল সে শাশুড়ির সঙ্গে। তিনি একটাও কথা বললেন না। জিতার গলা দিয়ে ভাতের গরাস নামছিল না। "কী যে ফেলে ছড়িয়ে খাও!" কর্কশ গলায় বলে, উঠে দাঁড়ালেন। জিতা ওই সাধারণ কথাগুলো থেকে চিনে নিল এক চাপা আক্রোশকে। কিন্তু কেন? এ কী হচ্ছে? তটস্থ হয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল সে। হু হু করে কেঁদে ফেলল। আচমকা কী গভীর দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে তার চারপাশ!



একটু পরে দরজায় ধাক্কা। খুলে দেখল, শাশুড়ি দাঁড়িয়ে আছেন। "দুপুরবেলা আবার দোর বন্ধ কিসের জন্য? একলাই তো রয়েছ? অমন নিয়ম নেই এ বাড়িতে," বলেই ফিরে গেলেন তিনি।
ঘরের সামনের বারান্দায় রাখা কালো ফোন বেজে উঠল। সে একটু ইতস্তত করছিল। এখনও পর্যন্ত এ বাড়িতে ফোন বাজলে কখনও ধরতে হয়নি তাকে। শাশুড়ি বা সায়ন কাছাকাছি ছিল প্রতিবারই। কিন্তু শাশুড়ির ঘর বারান্দার ও প্রান্তে। পর্দা ঝোলানো। তিনি বেরোচ্ছেন না। সে এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল। তার 'হ্যালো' শুনে ওধার থেকে সাহানা বলল, "যাক, আমি ভাবছিলাম তুইই ধরবি কিনা! কেমন আছিস?"
"ভাল। অনুমিতা, পর্ণা, তন্দ্রা ওদের সব কী খবর?"
"তুই কবে থেকে কলেজে আসবি?"
"এই তো সামনের মাসের প্রথম সোমবার থেকেই।"
"তোর বর কোথায়? বাড়ি আছে?"
"না রে, অফিসে।"
"ও, আচ্ছা।" একটু চুপ করে রইল সাহানা। "ঠিক আছে, রাখছি। কলেজে এলে দেখা হবে।"
সাহানার মধ্যে স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের খুব অভাব। জিতার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলল, সাহানা কিছু জানাতে চায় তাকে। কিন্তু দ্বিধা করছে যেন! পরের দিন দুপুরে হিসেব করে সে ফোন করল সাহানার বাড়িতে। এত ক্ষণে বাড়ি ফিরে আসার কথা ওর। সাহানাই ফোন ধরল।
"তুই কি কাল কিছু বলার জন্য ফোন করেছিলি?" চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল জিতা। সে ভাবতে পারেনি শাশুড়ি জেগে আছেন। বেরিয়ে এলেন নিজের ঘর থেকে। কাছাকাছি এসে, একটা চেয়ারে বসে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন তার দিকে।
"নাহ্, তেমন কিছু না। তবে... আচ্ছা, তুই তোর বরের কাছে ওর ইয়ে... বলছি কী, কোনও বন্ধুর নাম শুনেছিস?" ওদিক থেকে ছাড়া-ছাড়াভাবে বলে সাহানা।
"তার মানে? কে? অনেকেই আছে তো," জিতার মুখে ওর শাশুড়ির চাহনি কাঁটার মতো ফুটে আছে। অস্বস্তি হচ্ছে।
"না, এই বলছি আর কী..." ঢোঁক গেলে সাহানা। "রাখছি রে। আসলে দাদা টিউশনে যাবে, চা চাইছে। পরে কথা বলব," সাহানা ফোন ছেড়ে দিল। শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে হাসি হাসল জিতা।
"একটা কথা বলার ছিল। সবে তো এলে এ বাড়িতে! ফোন করার আগে একবার আমাকে জিজ্ঞেস করে নিলে পারতে। কিছুই নয়। সামান্য ভদ্রতা আর কী!" একটু শব্দ করে হেসে, উঠে চলে গেলেন। জিতা বুঝতে পারল, তার কান গরম হয়ে উঠেছে।
কয়েক দিন কেটে গেল। এখন প্রায়ই সন্ধেবেলা দু'পক্ষের আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়ি নিমন্ত্রণ থাকে তাদের। অনেক সময় সায়নের মা-ও যান। আবার কখন থেকে যেন স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছেন তিনি! শুধু জিতার মনে হয়, কাজের লোকেদের সঙ্গে অকারণে বা সামান্য কিছু কারণে বড্ড বকাবকি করেন। এখনও পর্যন্ত এ বাড়িতে তার কোনও কাজের দায়িত্ব নেই। ও নিয়ে অত মাথা ঘামায় না সে।
সায়ন খুব আদরে কাছে টানে। তবে অফিসে কাজের ব্যস্ততা লেগে আছে। একটু উদ্বিগ্ন মনে হয় মাঝে মাঝে। এরই

মধ্যে দু'দিন বাপের বাড়ি থেকে ঘুরে এল জিতা। রাত কাটায়নি। সে না থাকলে সায়নের খুব মনখারাপ লাগে নাকি! জিতা মুখে বলে, "ইস, বোলো না আর! যত্ত আদিখ্যেতা," কিন্তু বেশ একটুখানি গর্বের সঙ্গে মেনেও নেয়। মাঝের কয়েক দিনের সময়টাকে ভুলেই গিয়েছে প্রায়। খালি সাহানা... সাহানা... ছোট্ট একটা খোঁচ কোথায় যেন! আর কথা হয়নি ওর সঙ্গে।
"পরশু থেকে কলেজ তো আমার। মনে আছে?" ড্রেসিং টেবলের সামনে বসে, মুখে ক্রিম মাখতে মাখতে জিতা বলল। সে ইদানীং রূপচর্চার ব্যাপারে বেশ ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছে। অনেক রাত এখন। আজ সায়নের সুনীলমামার বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল তাদের। মামণিও গিয়েছিলেন। নিজের মামা নন। মামণির খুড়তুতো ভাই। কিন্তু খুব ঘনিষ্ঠতা তাঁদের পরিবারের সঙ্গে। সায়নের বাবা মারা যাবার পর থেকে অভিভাবকের মতো পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। কত আদর যত্ন করলেন মামিমা তাদের! বড় সুন্দর করে কথা বলেন তিনি। জিতার মনে হচ্ছিল, যেন কতদিনের চেনা।
কিন্তু আজ অফিস থেকে ফিরে পর্যন্ত খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল সায়নকে। ওখানেও চুপচাপই ছিল। এখন বিছানায় বসে অ্যাটাচি থেকে কী সব কাগজ বের করে মন দিয়ে দেখছিল। জিতার কথা কানে ঢুকল বলে মনে হল না।
"অ্যাই, শুনছ কী বললুম?"
"অ্যাঁ?" মুখ তুলে তাকাল সায়ন। ফাঁকা চাউনি। জিতা হেসে কিছু বলতে যাচ্ছিল। তখনই বারান্দায় ফোন বেজে উঠল। ধড়ফড় করে উঠে, প্রায় ছুটে গেল সায়ন। পিছনে জিতাও। অমন সময় কেন কেউ ফোন করবে? খারাপ কিছু খবর নিশ্চয়ই! নিজের বাবা আর মায়ের মুখদুটো ভেসে উঠেছিল জিতার চোখের সামনে। ভয়ানক ভয় করছিল তার। বাবার হাই প্রেশার আছে। ফোন ধরল সায়ন। হাত নেড়ে তাকে আশ্বস্ত করল। অফিসের ফোন। জিতা শুনেছে, সায়নদের কোম্পানির ব্রাঞ্চ অফিস সারা পৃথিবীর অনেক জায়গায় রয়েছে। মনে পড়ল, আগে আরও একবার এমন সময় ফোন এসেছিল। সে যখন ফিরে যাচ্ছে, তখনই শাশুড়ি বেরিয়ে এলেন নিজের ঘর থেকে।
জিতা ক্লান্ত শরীরে শুয়ে পড়েছিল। চাপা গলায় কথা বলছিল সায়ন। রাত্রির নৈঃশব্দ্যের মধ্যে তবু কানে আসছিল শব্দগুলো। ইংরেজি নয় তো, অন্য কী ভাষা! সায়ন আরও কোনও বিদেশি ভাষা জানে তার মানে? কথা বোঝা যায় না। কিন্তু রাগ করছে যেন। আবার নরম গলায় কী সব বলছে। কত কী সমস্যা হয় যে অফিসে! কী-ই বা বোঝে সে? যা-ই হোক, সায়ন নিশ্চয়ই সামলে নিতে পারবে। বরের উপর খুব কনফিডেন্স জিতার। গর্বও হচ্ছে। এটা জার্মান ভাষা নিশ্চয়ই। ওখানেই ছিল তো। কত্ত কী জানে লোকটা! বলেনি তো আগে কখনও! জেগে থাকার চেষ্টা সত্ত্বেও জড়িয়ে যাচ্ছে তার দু'চোখ।
পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙেই, পোড়া গন্ধ পেল জিতা। পাশ ফিরে দেখল, সায়ন বসে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। অ্যাশ-ট্রে উপচে আছে সিগারেটের টুকরোয়। এত খায় না এমনিতে। দিনে বড়জোর দুটো। লাল চোখ সায়নের। এমনই সমস্যা যে সারারাত ঘুমোয়নি লোকটা! তখনই চমকে উঠে বসল জিতা, "কী হয়েছে?"
ভয়ঙ্কর উদ্বেগ সায়নের মুখে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে আছে, "ভয়ানক খারাপ সিচুয়েশন। অফিস পলিটিক্স কত সাংঘাতিক হয়, বুঝবে না। কতগুলো মিথ্যে কথার জেরে একটা মানুষের লাইফ রুইন করে দেওয়া যেতে পারে। সব জেলাসি..."
ওই অসংলগ্ন কথাগুলো থেকে জোড়াতালি দিয়ে জিতা আধচেনা এক ঘটনা দেখতে পেল। কেউ নিশ্চয়ই উপর মহলে মিথ্যে কথা বলে সায়নের নিন্দে করেছে। নিমেষে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল জিতার। কিন্তু পরের মুহূর্তেই সামনে এসে সে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল বরকে। নিজের সরল দু'চোখ তার মুখের উপর রেখে বলল, "ভয় পেও না। তুমি তো আর কোনও অন্যায় করোনি! ভগবান সব দেখছেন। যা সত্যি, তা এক সময় জানতে পারবেই লোকে।"
জিতা টের পেল, তার হাতের বাঁধনের মধ্যে সামান্য কেঁপে উঠল লোকটা। তারপর রূঢ়ভাবে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "যা বোঝো না, তা নিয়ে পটর পটর করে কথা বলতে এসো না।"
রাগ হয়নি। জিতা বুঝতে পারছিল, কী অসম্ভব বিপর্যস্ত হয়ে রয়েছে সায়ন।
সারাদিন থমথমে হয়ে রইল বাড়ির আবহাওয়া। সায়ন তার মায়ের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। অনেক ক্ষণ ধরে মায়ে-ছেলেতে কী কথা হল, জানতে পারল না জিতা। অভিমান হল এবার খুব। সায়ন তবে তাকে নিজের লোক বলে মনে করতে পারেনি আজও? তাই নিজের বিপদের সময় পাশে থাকার অধিকার দিল না। কেন ডেকে নিল না তাকেও?
বেলার দিকে সায়ন বেরোল। শুকনো মুখে একলা বসে রইল জিতা। তার শাশুড়ি এক সময় তাদের ঘরে এলেন। হাঁপাচ্ছেন। মরিয়া চাহনি তাঁর চোখে। আচমকা জিতাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "যে যা-ই বলুক, কারও কথা বিশ্বাস করিস না মা! আমি জানি আমার ছেলে সোনার মতো খাঁটি!" এই প্রথম তিনি জিতাকে 'তুই' সম্বোধন করলেন। তাঁর কাঁধে মাথা রেখে হু হু করে কেঁদে ফেলল সে। এক অদ্ভুত মিশ্র অনুভূতি তখন তার। উদ্বেগের মধ্যেও মনের জোর জেগে উঠল যেন। গৌরবের বোধও। বিপদের মুখোমুখি হয়ে কী আশ্চর্য গভীরভাবে সে মিলেমিশে এক হয়ে গেল এ পরিবারের সঙ্গে!
সায়ন যখন ফিরল, বেশ নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছিল তাকে। সকলে দুপুরের খাবার খেল। ঘরে এসে জিতা অস্থিরভাবে বলল, "কেন সব কথা বলছ না আমাকে? আমি কি কেউ নই? কিসের সমস্যা তোমার?"
সায়ন সুন্দর খোলা হাসি হাসল। তাকে জাপটে ধরে অনেকগুলো চুমু খেল। তারপর বলল, "আমার কাজ দেখে আমাকে একটা স্পেশাল ট্রেনিঙে জার্মানিতে পাঠানোর কথা ভেবেছিল অফিসের হায়ার লেভেল থেকে, কিন্তু তা নিয়ে অনেকের জেলাসি! উল্টোপাল্টা অনেক কিছু বলছে আমার নামে। ব্যাপারটা কেঁচে যেতে পারে।"
জিতা চিন্তিত মুখে তাকাল। স্পেশাল ট্রেনিংয়ের জন্য বিদেশ যাওয়া না হয় না-ই হল। কিন্তু কেউ মিথ্যে নিন্দে করলে, সেটা অপবাদ হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে পরিচিত সমাজে। কারও সম্পর্কে খারাপ কথা বিশ্বাস করতে ভালবাসে মানুষ। তক্ষুনি মনে

পড়ে গেল, সাহানা বলেছিল না, সায়নের কোনও বন্ধুর কথা! বন্ধু কিংবা মুখোশ পরা শত্রু। সাহানা নিশ্চয়ই কিছু জানে। কিন্তু আর ফোন করেনি সে এর মধ্যে। শাশুড়ির সেই অনুমতি নিতে বলার আদেশটা সমস্ত স্বাভাবিকতার মধ্যেও কাঁটার মতো বিঁধে আছে কোথাও। সে-ও সেদিনের পর আর কাউকে ফোন করেনি।
“শোনো, কাল আমাকে কলেজে যেতে হবে।” সায়ন শুনে একটু চমকাল। তারপর আমতা আমতা করে বলল, “কিন্তু এখন... এই রকম সময়... আসলে...”
অনুনয়ের সুরে জিতা বলল, “শুধু কালকের দিনটা। তুমি অমত কোরো না গো। কালকের পর থেকে আমি বাড়িতেই থাকব। তোমার যখন যা দরকার হবে... আসলে... আসলে কতগুলো নোটস খুব দরকার,” জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটল জিতা। তার মনে হল, সে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্যভাবে মিথ্যে বলতে পারে না।



তক্ষুনি মনে পড়ে গেল, সাহানা বলেছিল না, সায়নের কোনও বন্ধুর কথা! বন্ধু কিংবা মুখোশ পরা শত্রু। সাহানা নিশ্চয়ই কিছু জানে।

কিন্তু সাহানার সঙ্গে দেখা হওয়াটা যে খুব জরুরি!
পরদিন কলেজে বন্ধুরা ছেঁকে ধরল জিতাকে। সাহানা একটু দূরে ছিল। একগাদা ভয়ানক কৌতূহলী প্রশ্ন ছুটে এল। বেশ আপত্তিকর সে প্রশ্নমালা। ছাড়বার পাত্রী নয় কেউ। সে খালি হাসতে লাগল। উত্তর দিল না। শরীর কেমন খারাপ লাগছিল তার। ক'দিন ভাল করে খেতে পারেনি, তাই কি?
অফ পিরিয়ডে কমনরুমের পাশের বারান্দায় সে সাহানাকে একলা ধরতে পারল, “ওর কোন বন্ধুর কথা বলেছিলি তুই?” সাহানার ভয়ার্ত চাহনি। তার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে জিতা। অসহ্য বমির বেগ উঠে আসছে। সাহানা আর চেপে রাখতে না পেরে ফিসফিসে স্বরেই যেন আর্তনাদ করে উঠল, “ফ্রেয়া, ফ্রেয়া মুলার। আমি কিছু জানি না! বিশ্বাস কর... কাকিমা বলছিল মাকে...”

৮

গরমের ছুটি পড়ে গিয়েছে। দুপুরবেলা উপরতলাটা পুরো ফাঁকা। হঠাৎ খবর এল, গোরার বড়মামা মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছেন। নিঃসন্তান বড়মামা তার মায়ের কাছে পিতৃতুল্য। বাবা-মা তখনই বেরিয়ে গেলেন। নোনাদা খাওয়ার পরে রোজকার মতো হীরেন মিস্তিরির ডেরায় তাস খেলতে চলে গিয়েছে।
গোরার আজ বড়মামার জন্য কোনও দুশ্চিন্তা হল না। সদর দরজা বন্ধ করেই উদগ্রীব হয়ে এসে সে ঢুকল মায়ের ঘরে। আলমারির উপর থেকে পেড়ে নিল ধুলো মাখা বইয়ের স্তূপ। শরৎচন্দ্রের ‘গৃহদাহ’, ‘শেষ প্রশ্ন’ আর ‘আরব্য রজনী’। শরৎচন্দ্রের ‘রামের সুমতি’, ‘বিন্দুর ছেলে’, ‘মেজদিদি’ ইতিমধ্যে পড়েছে সে। আর ‘আরব্য রজনী’ তো স্কুলের লাইব্রেরি থেকে নিয়েছিল। ‘আলাদিন’ ‘আলিবাবা’র গল্প প্রায় মুখস্থই হয়ে গিয়েছে। একেই বুঝি বড়দের বই বলেছিলেন মা? হেসে ফেলল সে মনে মনে।
তবে এই ‘আরব্য রজনী’টা খুব মোটা আর বড়। নিশ্চয়ই আরও বেশি গল্প আছে। ফাঁকে ফাঁকে অনেক ছবি। কিন্তু পাতা ওল্টাতেই যে ছবিটা বেরিয়ে এল, সেটা যেন চাবুকের মতো আঘাত করল তাকে! একটি সুন্দরী মেয়ে হাসিমুখে নাচের ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে! তার শরীরে এমন পাতলা একটা আচ্ছাদনের ধাঁচ আঁকা রয়েছে, যে সেটা না থাকলেও কোন ক্ষতি ছিল না। বুক ধড়ফড় করতে লাগল তার। মনে হল, নিজের মধ্যে কিছু একটা বদল হচ্ছে যেন! ভয়ানক পাপবোধে কেঁপে উঠল গোরা। সে কি তবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে?
বেশ রাত করে বাবা ফিরে এলেন একলাই। প্রেশার খুব বেড়ে গিয়েছে বলে বড়মামাকে হাসপাতালে দিতে হয়েছে। বড়মামিমা নিজেই হাঁপানির রোগী। আপন লোক বলতে আর কেউ নেই। মায়ের এখন কিছুদিন ওখানে থেকে যাওয়া ছাড়া উপায় কি আর? বাবা আসা যাওয়া করবেন। পরে ফোনে মা কথা বললেন গোরার সঙ্গে।
“সব কিছু একটু মানিয়ে নিয়ে থেকো বাবা। বড় হয়েছ। এদিকের অবস্থা বুঝছ তো? বৌদিকে এভাবে একলা ফেলে যাই কী করে? নোনাদা যা পারে করবে। খাওয়া নিয়ে ঝামেলা কোরো না যেন!” মায়ের স্বরে দোটানা।
গোরার হঠাৎ খুব আনন্দ হল। এই প্রথম মায়ের নজরদারির বাইরে কয়েকটা দিন কাটাতে পারবে সে। খুব উৎসাহিত হয়ে বলল, “একটুও ভেবো না তুমি। আমি ঠিক পারব।”
মা সামান্য ইতস্তত করে বললেন, “তোমার বাবা নোনাদাকে বলে দেবেন, দুপুরে তোমাকে একা রেখে না বেরোয়। আর... একতলার মেয়েরা উপরে না আসে যেন।”
গোরা হতভম্ব, “ওরা এলে আমি কী বলব?”
মা খানিক চুপ। তারপর বললেন, “বলবে, আমি এখন কথা বলতে পারব না। আমার পড়া আছে। আর সত্যিই সময় নষ্ট করবে না। মন দিয়ে লেখাপড়া করতেই হবে। উঁচু ক্লাসে উঠছ। আর শোনো গোরা, বড় হয়েছ। মেয়েদের সঙ্গে একলা বাড়িতে গল্প করা ভাল দেখায় না এখন আর। কোনও সভ্য বাড়ির ছেলে অমন করে না,” মায়ের স্বরে কাঠিন্য।
বাবাকে হাসপাতালে যেতে হবে। ছেলের উদ্দেশে কিছু নিয়মমাফিক সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বেরিয়ে গেলেন তিনি পরের দিন সকালে। নোনাদা কাজে ব্যস্ত। এই সদ্য পাওয়া স্বাধীনতা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল সে। বাঁধনহীন উল্লাসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নানা কোণ থেকে নিজেকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। সকলে তার সুগঠিত চেহারার প্রশংসা করে। দেখলে তাকে নাকি কলেজে পড়া ছেলে

মনে হয়। হঠাৎ একটু দুশ্চিন্তা হল তার। আসলে ক্লাস এইটে পড়ে শুনলে লোকে যদি ভাবে, সে অনেকবার ফেল করেছে?
"নেয়ে নাও গে, ভাত বাড়ছি," নোনাদা হাঁক পাড়ল এক সময়।
এমন ফাঁকা বাড়ি পেয়ে, হঠাৎ করে সে নিজেই নিজের অভিভাবক হয়ে উঠেছে। বলল, "তুমিও খেয়ে নাও নোনাদা। তারপর তোমাকে আর থাকতে হবে না। তুমি যেমন বেরোও, চলে যেয়ো," মায়ের নির্দেশ অমান্য করে ভারী নিষিদ্ধ তৃপ্তি পেল সে।
"কিন্তু বৌদিদিমণি যে বলেছে তোমায় একা রেখে না যেতে..." একটু দোনামোনা করে নোনাদা। যদিও নিত্য দিনের তাসের আড্ডার লোভ সামলানো বড়ই শক্ত তার পক্ষে।
"কী আবার হবে তুমি বেরোলে?" ব্যায়াম করা শক্ত হাতের গুলি ফোলাল গোরা, "চোর-ডাকাত এলে তুমি আমায় বাঁচাবে, নাকি আমি তোমায়?" রোগা ক্ষয়াটে নোনাদার দিকে চেয়ে হেসে ফেলল গোরা। মনে মনে বলল, 'মায়ের যেমন কাণ্ড!'
দুপুরের শুনশান বাড়িতে সদর দরজা বন্ধ করে উপরে আসার সময় গোরা ভাবল, ওদের দিকটাও আজ খুব চুপচাপ যেন! ওখানে মাঝে মাঝেই বেশ চিৎকার-চেঁচামেচি হয় বোনেদের মধ্যে। আবার থেমে ভাবও হয়ে যায় এক সময়। খুব হাসাহাসি তখন। গোরা বোঝে, মা খুব বিরক্ত ওদের উপর। ঝগড়া শুনলেও ভুরু কুঁচকে যায় মায়ের। হাসাহাসি শুনলেও তাই। গোরা কৌতূহলী হয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলে বলেন, "আহ্, ওদের কথা দিয়ে তোমার কী দরকার? নিজের কাজ করো গে যাও।" ওদের সঙ্গে এমনিতে দেখা হয় না গোরার। কারণ দালানের দরজা তালাবন্ধ করে, সিঁড়ির পাশ থেকে ওদের অংশটা একেবারে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে প্রথম থেকেই। খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে পাশের গলি ধরে আসাযাওয়া করে ওরা। উপরে আসতে গেলে রাস্তায় বেরিয়ে সদর দরজা দিয়েই আসতে হয় ওদের।
নোনাদা চারটের আগে ফিরবে না। মায়ের ঘরে গেল গোরা। সবে নামিয়েছে বইখানা, তক্ষুনি নীচের কড়া নড়ে উঠল। কে আবার! ব্যাজার মুখে নীচে নামল সে। "কে?" বন্ধ দরজার এপার থেকে চেঁচাল গোরা।
"আমি, শঙ্কুদি। খোল," নীচু স্বর। অবাক হয়ে দরজা খুলল গোরা। চট করে ঢুকে এল শঙ্কুদি। তিন বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। স্কুল পাশ করে গিয়েছে, কিন্তু কলেজে যায় না। আজ টাইট সালোয়ার কামিজ পরেছে। কোমর পর্যন্ত খোলা চুল, সামনে লাল হেয়ার ব্যান্ড দিয়ে আটকানো। ঠোঁট এমনিতে এত লাল নয়। লিপস্টিক দিয়েছে তার মানে। কিন্তু কোথা থেকে বেড়িয়ে ফিরল শঙ্কুদি?
"সর," বলে নিজেই দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। যেন ওরই বাড়ি। একবার মুখ ফিরিয়ে গোরাকে বলল, "হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? আয়।"
হতভম্ব হয়ে গোরা ওর পিছু পিছু উঠে এল। "মানে... তোমার কিছু দরকার? মা নেই কিন্তু..." উত্তর না দিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল শঙ্কুদি। সোজা মায়ের ঘরে ঢুকে বিছানায় বসল। বাইরের লোকের বিছানায় বসা মা খুব অপছন্দ করেন। তখনই ওর মনে পড়ল মায়ের বলা কথাগুলো। কিন্তু এভাবে কি বলা যায় কাউকে, যে তুমি যাও, আমি এখন পড়তে বসব! আর বইটা... বইটা যে দেরাজের উপর পড়ে আছে! মলাট দেওয়া যদিও, তবু...
বালিশে হেলান দিয়ে ভাল করে বসল শঙ্কুদি। 'ঠিক হচ্ছে না এটা। মোটেই ঠিক হচ্ছে না,' মনে মনে বলল গোরা। কিন্তু আজ কী আশ্চর্য ভাল দেখাচ্ছে শঙ্কুদিকে!
"ওরা সক্কলে নেমন্তন্নয় গিয়েছে। আমার পিসতুতো দিদির সাধ। সাধ কী জানিস, গাধা? মেয়েদের বাচ্চা হওয়ার আগে যে খাওনদাওন হয়," বলেই খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল। তারপর গোরার চোখে চোখ। "আমার শরীর খারাপ বলে যাইনি," শঙ্কুদি কেটে কেটে বলল।
"কী হয়েছে তোমার?"
"বোকা ছেলে কোথাকার," শঙ্কুদি বিছানা থেকে নেমে ওর কাছে এগিয়ে আসে। ওর নাকটা নেড়ে দেয় দু'আঙুলে। "জানিস না, মেয়েরা শরীর খারাপ বললে, কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতে নেই?"
ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে যায় গোরা। জীবনে এমন কিছু শোনেনি সে।
"কেন?" আড়ষ্টভাবে বলে সে। শঙ্কুদি বড্ড কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। হাসতে হাসতে ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে। সরে যায় গোরা।
"কী করছিলি একা একা?"
"পড়ছিলাম," মিথ্যে করে বলে সে। এবং এত ক্ষণ যা ভয় করছিল, ঠিক তাই হয়। শঙ্কুদি দেরাজের উপর থেকে তুলে নেয় বইটা। পাতা ওল্টানো মাত্র চোখ গোল্লা হয়ে যায়, "এই তোর পড়া? তুই এই বই পড়ছিলি?" গলার মধ্যে উল্লাস আর বিস্ময়ের অব্যক্ত শব্দ করে সে।
"বা বা! দেখে তো মনে হয়, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। কিন্তু তলে তলে ছেলের যে দেখি ইতিমধ্যে..." চাপা হাসির মধ্যে জড়িয়ে যায় তারপরের কথাগুলো। গোরা বুঝতে পারে না।"আয়, দু'জনে একসঙ্গে পড়ি!" হাসছে শঙ্কুদি। কী সুন্দর সাজানো দাঁত ওর! সে এগিয়ে আসে বিছানার দিকে। শঙ্কুদি হাত ধরে পাশে বসায়। কোলের উপর খোলা 'আরব্য রজনী'। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। কাঁধে হাত দিয়ে টেনে নেয় তাকে শঙ্কুদি। তাদের শরীর লেগে আছে পরস্পরের সঙ্গে। এক হাতে তাকে পিঠের দিক থেকে জড়িয়ে রেখেছে শঙ্কুদি। অন্য হাতে বিছানার চাদরটা খামচাচ্ছে সরু লম্বা আঙুলে। তারপর দু'হাতে ওর একটা হাত তুলে নিয়ে, মুখের কাছে নিয়ে চুমু খায়। বিদ্যুতের মতো তীব্র এক ঝলকানি! সামান্য কাঁপা হাতে সে শঙ্কুদির গালে হাত রাখে। আর শঙ্কুদি সেই হাতটাকে টেনে নিয়ে, নিজের কামিজের গলার সীমানায় চেপে রাখে কত ক্ষণ! তারপর দু'হাতে খামচে খামচে ধরে তার সারা শরীর। চাইলেই ওই ছিপছিপে মেয়েটাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সে বসে থাকে। পুরোপুরি প্রতিরোধহীন। নিজের মধ্যে এই মুহূর্তে ভর করেছে যে অন্য কেউ, তাকে গোরা খানিক চেনে। খানিক চেনে না।
আর তখনই ঘরের কোণে রাখা ফোন বেজে ওঠে। খান খান হয়ে ভেঙে পড়ে দুপুরের নিস্তব্ধতা। শঙ্কুদি বিষম চমকে ওঠে! হাত সরিয়ে নেয়, মুখে ভয়ের ছাপ। ব্যাকুল হয়ে তাকে ফোন ধরতে বারণ করে ইশারায়। এই পরিস্থিতিতেও হাসি পায়

তার। শঙ্কুদি কি ভাবছে ফোনে কানেকশন না হলেও, ওপারের কেউ তার কথা শুনতে পাবে? সে এগিয়ে রিসিভার তুলে নেয়।
“কী করছিলে?” মা জানতে চাইছেন।
“এই তো ঘরের মধ্যে,” গোরা সতর্ক ভঙ্গিতে বলে। ভীষণ ভয় নিজের ভিতরে।
“ওরা কেউ এসেছিল? নীচের ওরা?”
“নাহ্‌,” শঙ্কুদির দিকে তাকিয়ে কোনওমতে গোরা বলে।
“নোনা বাড়ি আছে তো?”
“হ্যাঁ,” নিজের বুকের ধড়াস ধড়াস শব্দ শুনতে পাচ্ছে গোরা স্পষ্ট।
“দরজা বন্ধ থাকে যেন সব সময়। খেয়াল রেখো। দিনকাল ভাল নয়। তোমার বাবা সন্ধের মধ্যেই ফিরে যাবেন।”
“হ্যাঁ, ঠিক আছে।”
এরপর মায়ের স্বর বদলে যায়, “হ্যাঁ রে, তুই তো একবারও জিজ্ঞেস করিস না যে বড়মামা কেমন আছে? এত ভালবাসে তোকে যে মানুষটা...”
অস্বস্তি হয়। সত্যিই মনে হয়নি তার বড়মামার কথা। ফোন রেখে কেমন ঘোরের মধ্যে থেকে উঠে আসার মতো সে শঙ্কুদিকে বলে, “বাবা এক্ষুনি ফিরে আসছেন।”
শঙ্কুদি ছুটে নেমে যায়, পালাচ্ছে যেন। নীচে গিয়ে দরজা বন্ধ করার আগেই উধাও হয়ে যায়। গোরা প্রথমেই ‘আরব্য রজনী’খানা তুলে দেয় নিরাপদ জায়গায়। মায়ের বিছানা হাত দিয়ে টেনে টেনে ঠিক করতে থাকে। গোয়েন্দা গল্পে পড়া অপরাধীর মতো সমস্ত প্রমাণ লোপের চেষ্টা কি এ তার? কিন্তু এত কষ্ট হচ্ছে কেন? জীবনে এই প্রথম সে একদিনে এতগুলো মিথ্যে কথা বলল। তবু ওই ভয়ের সঙ্গে ক্রমাগত এক ভাললাগার অনুভব জোর ধাক্কা দিতে লাগল তার বুকের মধ্যে। সে এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বদলে গিয়েছিল। তাই নোনাদা ফিরলে অত্যন্ত সহজ গলায় বলতে পারল, “মা ফোন করেছিল। আমি বলেছি তুমি বেরোওনি।”
ওই উঁচু ছাদওয়ালা, সুন্দর লাল সিমেন্টের মেঝে সমেত বাড়িটা এখন আর নেই। তার ইট-কাঠের সব চিহ্ন লোপাট হয়ে গিয়েছে। শুধু আরও কিছুদিন স্মৃতি হয়ে জেগে থাকবে এক কিশোরের নির্দোষ কিছু মিথ্যে বলার কাহিনি। এক সময় তা-ও মুছে যাবে, যেমন করে এ পৃথিবীর বুক থেকে সমস্তই মুছে যায়।

৯

“বুড়ো ভাম যা প্যাকনা চমকিয়ে এয়েছিল, বুইলি? সাঁটালও কম না। আমার থেকেই তো তিনবার চিংড়ি চেয়ে চেয়ে খেল! আমায় চিনতে পারেনি।”
“হুঁহ্‌, যাত্রাপালার ফোতো নবাব। রাংতার মটুক, পরচুলোই সার। অত সাজের বাহার, লপচপানি, সব বৌয়ের ট্যাঁকশালের জোরে,” দমকে দমকে ব্যঙ্গের হাসি হাসে অপু। ভগ্নিপোত অনন্তর সঙ্গে খুব পটে তার। অনন্ত নামকরা এক কেটারিং সার্ভিসের বাঁধা বেয়ারা। ক’দিন আগে তার নিজেরই পৈতৃক বাড়ির কাছে, এক মালদার পার্টির কাজ করে এসেছিল। ওখানে সকলে জানে ওই প্রোমোটারকে। খুব রেলা। তাদেরই বিবাহবার্ষিকীর অনুষ্ঠান। সেখানে হঠাৎ ওই শয়তানকে দেখেই চিনেছে। কেন যে ওই হোমরাচোমরা প্রোমোটার ব্যাটা অত ত্যালাচ্ছিল তাকে? পয়সার মা-বাপ নেই যার, সে যে ওই হতভাগার কাছে কিসের কড়ি ধারে, কিছুতেই তখন ভেবে পায়নি অনন্ত। আজ অপুদার মুখে শুনল, লোকটা নাকি ‘কোবতে’ লেখে। তাই অত খাতির। শুনে থুম মেরে গিয়েছিল অনন্ত। ওই হাড়-বজ্জাত লোক কবিতা লেখে? কী দিনকালই এল! কই, রবি ঠাকুরের মতো লিখে দেখাক দিকি। সেই যে ‘আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে’। ক্লাস ফোরে পড়েছিল। এখনও মনে আছে।
অপুদা’র সঙ্গে গিয়েছিল ও বাড়িতে একবার। তাদের বিয়েতে ওই বৌদি প্রচুর দেওয়াথোওয়া করেছিল। তাই বিয়ে সাঙ্গ হতে বোন-বোনাইকে জোড়ে নিয়ে গিয়েছিল বৌদিকে দেখাতে। তখনই দেখেছিল ও লোকটাকেও। কথা কয়নি অবিশ্যি। অপুদা পরিচয় করিয়ে দিতে একটা ‘হুঁহ্‌’ আওয়াজ দিয়ে ঘরে ঢুকে দোর ভেজিয়ে দিয়েছিল।
তার আচমকা এমন দেখা পাওয়া থেকেই পেট ফুলছে অনন্তর। তবে আজ অফ ডে বলে অপুদাকে মোবাইলে কথাটা বলার সময় পেল সে। রসিয়ে না বলতে পারলে আর সুখ কিসের!
সে নিভৃত আলোচনায় অপু বাছা বাছা আরও যে সব শব্দ প্রয়োগ করল, সুধীজনের মতে তা অপভাষা হতে পারে। কিন্তু উদোম মনের ভাব প্রকাশ করতে তাদের জুড়ি নেই। বৌদিমণি অবশ্যি ভাবতেই পারে না যে, সে এমন সব কথা বলতে পারে। আসলে ঘেন্না কিংবা প্রতিহিংসার ইচ্ছে বড় অদ্ভুত জিনিস। ঠিক যেন জাদুকরের জল ঢালার ভোজবাজি! উগরে দিতে দিতে মনে হয়, ফুরিয়ে গেল বুঝি বা। কিন্তু না। আবার কখন চেগে ওঠে ভিতরে! আবার নিজেকে উগরে দেওয়ার ফাঁকতাল খোঁজে।
একবার ছেলেবেলায় অপু একটা কাচের গেলাস ভেঙে ফেলেছিল। লোকটা লাল চোখে তাকিয়ে হাঁকার দিয়ে উঠেছিল, “কেন ভাঙলি? বল, কেন ভাঙলি?” একই কথা পাঁচবার করে। “বল, বল বলছি কেন ভাঙলি?” আরে, সে কি ইচ্ছে করে ভেঙেছে, যে ‘কেন’র জবাব দেবে? অপু ভয়ে কেঁচো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লোকটা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছিল খুব কাছে। তারপর তার হাড় বের করা পেটের কাছের খানিকটা চামড়া দু’আঙুলে টেনে ধরে মোচড়াতে শুরু করেছিল। কী ভীষণ যন্ত্রণা! মুখ বেঁকে গিয়েছিল, কিন্তু ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ। আওয়াজটুকু পর্যন্ত বেরোয়নি। সেদিনের সেই ভয়ই কখন যেন ঘেন্না হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখনও বৌদিমণির সঙ্গে বিয়ে হয়নি। সবে বিলেত থেকে ফিরেছে। তখনও অবধি তার কেলেঙ্কারি কাণ্ড জানাজানি হয়নি। এক মেমবেটির সঙ্গে শুয়ে এসেছিল সে, এত দূর আস্পদ্দা! তার ছেলেও জন্মে গিয়েছিল নাকি। দেশে ফিরে সব চেপে গিয়েছিল, মুখ মুছে দিব্যি বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিল টাকার লোভে। হেব্বি বড়লোক ছিল বৌদিমণির বাপ। তা সে মেমও তো ছাড়বার পাত্তর নয়! খুব গন্ডগোল হয়েছিল নাকি! সে তখন ছেলেমানুষ। কিন্তু হারুদা, ফেনিপিসি, বাতাসিদিরা রান্নাঘরে দুকুরবেলা বসে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত। সব মনে নেই, তবে সে মেম বুঝি এই কলকাতায়

এসে হাজির হয়েছিল। 'কোটকাছারি' ঠেকাতে গিয়ে এত টাকা জরিমানা দিতে হয়েছিল, যে ও বাড়ি বেচেও ফতুর হয়ে গিয়েছিল মা-ব্যাটা। তার উপর বৌদিমণির বাপ নাকি ওর আপিসের বড় কর্তার কাছে চুপিচুপি নালিশ করে চাকরি খেয়ে দিয়েছিল জামাইয়ের। মরার আগে মেয়ের জন্য এ বাড়ি বানিয়ে দিয়েছিল। টাকাকড়ি সবই মেয়ের নামে। বুড়ো কম ঘুঘু ছিল না! জামাইকে একেবারে মেয়ের হাততোলায় রাখার ব্যবস্থা করে তবে ছেড়েছিল।
বৌদিমণি যে ফি-মাসে হাতখরচা দেয় বরকে, তা অপুর নিজের চোখে দেখা। এককালে সে নিজে ওই লোকটার চাকর ছিল। আর আজ ও লোকটা নিজেই বৌয়ের চাকর। যা হয়েছে, বেশ হয়েছে। তবে কোন মুখে যে সে বৌয়ের দয়ার টাকা নেয়! গা ঘিনঘিন করে অপুর ভাবলেই। বৌদিদিমণির কিন্তু তুলনা হয় না। নিজের ভাইয়ের সমান ভাবে তাকে। তার আয়পয়, নিজের ব্যবসা তো সবই বৌদির কৃপায়! সে অবশ্য মাসে মাসে সব দেনা শোধ করে দিয়েছে। তবু, হাড়মুখ্যু হয়েও অপু বোঝে, দেনা আসলে রয়েই গিয়েছে।
ফেনিপিসি, বাতাসিদিদিরা বলত, বৌদিমণি নাকি পোয়াতি হয়ে গিয়েছিল তত দিনে। তা এক বৌ থাকতে সে বাচ্চা জন্মালে তার বাপের পরিচয় হবে না বলে, দিশেহারা হয়ে তড়িঘড়ি নষ্ট করা হয়েছিল। ওরা হা-হুতাশ করত তাই নিয়ে। কিন্তু অপু ভাবে, এই মানুষেরই তো বীজ! 'জন্মালে' কোন মূর্তি ধরত কালে-দিনে, কে বলতে পারে? তখন বৌদিদির হাঁড়ির হাল করে ছাড়ত হয়তো! তা বৌদিদির বাপ বুড়ো এত সব করল, আর একমাত্তর মেয়েটার এ বিয়ে কাটান-ছেঁড়ান করে আবার বিয়ে দিল না কেন? দু'জনের ঘর আলাদা। কিন্তু শুদুমুদু কেন পোষে তাকে বৌদিমণি আজও?
একটা ফোন আসছে। অনন্তকে বলে, ছেড়ে দিল অপু। হালদার কাকিমা আজও তিনটে ফিশ মিল নেবেন। রাঁধুনি কামাই করেছে। এমন ঘরোয়া রান্না আর কোথাও মেলে না। ঠাকুরের উপর পুরো ছাড়ে না অপু, নজর রাখে। সাঁতলানো, ফোড়নের মশলা এ সবের নিজস্ব কিছু কারিকুরিও আছে। তাই তার খাবারের স্বাদ অমন। তেল-মশলার বাড়াবাড়ি নেই। পাকা মাছ কেনে নিজে দেখে। পুরুষ্টু দেখে মুরগি কেনে, দিশি মুরগি এখন অনেকেই চায়। বাজারে অপুর চেনা লোক ফিট করা আছে। ভাল জিনিস ছাড়া দেয় না। তার 'সুখাহার হোম ডেলিভারি'র খদ্দের বাড়ছেই দিনে দিনে।
বৌদিমণির বন্ধু নীনাদিদির অনেক চেনাজানা। সমাজসেবা করে সে। বৃদ্ধাশ্রম, অনাথ আশ্রম, গরিব ছেলেপুলের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত— হরেক কাজ-কারবার তাদের সংস্থার। অপুর ছেলেটাকে হাফ পয়সায় ভাল ইস্কুলে পড়ানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। নীনাদিদির সুবাদে অনেক অর্ডার পায় অপু। তাদেরই কারও কারও সঙ্গে বেশ পরিচয় হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যাদের ভালর জন্য খেটে মরে নীনাদিদি, তাদের অনেকেই আবার আড়ালে নিন্দেমন্দ করতে ছাড়ে না তার নামে। নাকি স্বভাব চরিত্তির সুবিধের নয়। বিয়ে না করেই ঘুরতে যায় একটা লোকের সঙ্গে। রাত্তির কাটায় অবধি। সে লোকের আবার নিজের বৌয়ের সঙ্গে ফারখত হয়ে গিয়েছে। একটা বড় মেয়ে আছে। শুনে শুনে সব মুখস্থ হয়ে গিয়েছে অপুর। নীনাদিদির দোষ দেখে না অপু। তবু মনে একটু খচখচানি... বিয়েটা করে নিলেই তো পারে বাপু! এমন বুদ্ধিমান মানুষ হয়েও কেন বোঝে না যে, লোকের মুখে তালাচাবি দেবার ওই হল উপায়! তবে অপুর নিজের একটি গোপন বাসনা আছে। বৌদিদি ওই লোকটার পিছনে লাথি মেরে বের করে দিক। আর ভাল দেখে একটা কাউকে বিয়ে করে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকুক। বয়স হয়েছে তো কী? আজকাল কেউ অতশত মানে না। একা থাকার দিন বড় ম্যাড়মেড়ে। এই তো এত ঝগড়াঝাঁটি হয়, তবু বিপাশা ক'দিন বাপের ঘরে গেলেই সে বোঝে। ভাবই বলো আর ঝগড়াই বলো, মানুষের যে সকল সময় মানুষকেই চাই! বৌদিদি মোবাইল ঘাঁটে, বই পড়ে— কিন্তু দিনের শেষে সুখ-দুঃখের কথা জমে জমে যে পাথর হয়ে যায় বুক, তা কি আর অপু জানে না? অপুর বাঁধা খদ্দেরের মধ্যে বৌ-মরা কি বৌ ছাড়া আধবয়সি পুরুষ আছে গোটা কয়েক। কিন্তু তাদের কাউকেই সে বৌদিদির নখের 'যুগ্যি' বলেও মনে করতে পারে না।

১০

কোথায় সে ঘরটা ছিল? স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘর। জানলার একটা কাচ ভাঙা। এক ধারে পুরনো খবরের কাগজ ডাঁই করে রাখা। কোণে মাকড়শার জাল। ভোরবেলা বেরিয়ে হাইওয়ে দিয়ে তাদের গাড়ি চলেছিল। সে জানত না, কোথায় যাচ্ছে তারা। যদিও কেন যাচ্ছে তা জেনেছিল। মা আগের রাতে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। অনেক বোঝাচ্ছিলেন। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও উপায় নেই নাকি! বাবার মুখে কালচে ছোপ। মা কথা বলতে বলতে কাঁদছিলেন। সে-ও কাঁদছিল। সারা রাতে ছেঁড়া ছেঁড়া তন্দ্রার মধ্যে জিতার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। তবু জল খেতে ওঠেনি। বাবা নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তাদের সঙ্গে ছিলেন লেডি ডাক্তার লতিকাপিসি। তখন আর সে কাঁদছিল না। রাস্তার দু'পাশের শস্য তুলে নেওয়া খেতের মতোই ধু-ধু করছিল বুকের মধ্যেটা। সারা পথ সে কোনও কথা বলেনি। কারও মুখের দিকে তাকায়ওনি। মাথার মধ্যে রাগী অথচ অসহায়ভাবে বন্দি বোলতার মতো ভনভন করছিল গত ক'দিন ধরে শোনা শব্দগুলো। তার সন্তানের আইনসঙ্গত কোনও বাবা থাকবে না। সাতপাক ঘোরা, সিঁদুর দান, হোম— সব কিছুর পরেও বিয়েটা আসলে হয়ইনি তার। কারণ এক বিদেশিনীকে বিয়ে করে এসেছে সায়ন। ছেলে আছে তার। আর সেটাই আসল বিয়ে। এক বৌ থাকতে দ্বিতীয়বার বিয়ে হয় না।
রাতের অন্ধকারে, একলা ঘরে নিঃশব্দে ভয়ঙ্কর চিৎকার করে ওঠে পঞ্চাশ পেরনো জিতা। বাবা, মা, লতিকাপিসি, সক্কলের কাছে জানতে চায়— কোথায়? কোথায় ফেলে দিয়ে এসেছিলে তোমরা ওকে? আর তারপরেও জিতাকে কেন বেঁধে রাখা হল ওই লোকটার সঙ্গে, যার সঙ্গে তখনও পর্যন্ত তার বিয়েই হয়নি আসলে? কেন? কেন? কেন?
অবশেষে সে একদিন বুঝে যায় নিজের শরীরী অবস্থানের ইতিকথা। বুঝে যায় দাঁড়কাকে যে ফল ঠুকরে যায়, তা আর

কাউকে দেওয়া যায় না। এমনি ফেলে রাখাও যায় না। সেই কাকটাকে ডেকে এনে, তার মুখের সামনেই ধরে দিতে হয় আবার। নয়তো বড় নিন্দে করে লোকে। সে নিন্দেকে ভয় পেতে হয়।
শেষে তাকে দিয়ে কাগজে সই করে বিয়ে দেওয়া হল। আসল বিয়ের সেই কাগজে অনেক কিছু লেখা ছিল। পড়েও দেখেনি জিতা। তার বাবা অবশ্য তাকে আর সায়নদেবের পৈতৃক বাড়িতে পাঠাননি। সায়নদেব আসত প্রায়ই। তার অফিসের কাজ চলে গিয়েছিল! জিতা দেখা করত না। মা ক্রমশ সহজ হয়ে আসছিলেন তার সঙ্গে। এমনকি জিতাকেও সায়নের সঙ্গে দেখা করার জন্য বোঝাতেন। বাড়ির কাজের লোকেদের সামনে জামাইকে অপমান করা হয় তা না হলে।
বাবা গোড়ায় কড়াভাবে কথা বলতেন। কিন্তু তিনি বাস্তববাদী মানুষ। সামাজিক সত্যকে এড়াতে পারেন না। বিয়ের পরে মেয়ে খুব বেশি দিন বাপের বাড়িতে থাকলে ভাল দেখায় না। বিবাহিত মেয়ে স্বামীর সঙ্গে না থাকলে ভাল দেখায় না। তাই একদিন নতুন বাড়িতে চলে যেতে হল তাকে। তার নিজস্ব বাড়ি। দলিলে তার নিজের নাম। সায়নদেবের বাড়ি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। তার শাশুড়ি, তাঁর দূর সম্পর্কের দাদা সেই সুনীলমামার বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। জিতা বুঝতে পারেনি যে, সে যদি আগের মতো উচ্ছল, সরল মেয়েটি হয়েই থাকত, তেমনই হাসিখুশি আর মিশুক, তবে লোকে আরও একটু তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে পারত মাঝের অধ্যায়গুলো। কিন্তু ক্রমশ এক চিরস্থায়ী শৈত্য জেগে উঠল তার মধ্যে। কুড়ি বছর বয়সের মধ্যে সে খুব বড় হয়ে গিয়েছিল। এতটাই বড় যে, জীবনের তিক্ততা সম্বন্ধে তার পাকাপোক্ত বিশ্বাস তৈরি হয়ে গিয়েছিল। শুধু দিনের যে সময় সে অপুর সঙ্গে কথা বলত, তখনই তার মধ্যেকার অবশিষ্ট স্বল্প ছেলেমানুষিটুকু বেরিয়ে আসত। সে বাবার মারফত সায়নকে জানিয়েছিল, অপুকে সে তার নতুন বাড়িতে চায়। এই ভাবেই শর্ত স্থির করার ব্যক্তিত্ব নিজের অজান্তেই জেগে উঠছিল তার মধ্যে।
এখানে এসে পর্যন্ত আলাদা ঘরে সে শুত। সায়নের সঙ্গে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা ছিল না। অনেক অনুনয়েও নরম হয়নি। সায়ন একবার বলেছিল, “মাকে একদিন নিয়ে আসব এখানে।” জিতা খুব মৃদু আর স্পষ্ট স্বরে বলেছিল, “উনি এসে কোনও আনন্দ পাবেন না।” আরও বছরখানেক পরে শাশুড়ি যখন আচমকা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন, তখনও তার ও কথা বলার জন্য কোনও অনুতাপ হয়নি।

১১

“খেয়ে দ্যাখো। আমাদের পারিবারিক রেসিপি, বুঝলে? ঠাকুমা তাঁর শাশুড়ির কাছে শিখেছিলেন। পরে মা-ও, ঠাকুমার কাছ থেকে। বারো ঘণ্টা ম্যারিনেট করার পর মাংস হাঁড়িতে রেখে, আটা মেখে ঢাকনির সঙ্গে এঁটে, মুখ বন্ধ করে চাপিয়ে দেওয়া কয়লা উনুনে, ঢিমে আঁচে। ওস্তাদ রাঁধুনি কান খাড়া করে ফোটার শব্দ শুনে বুঝে যেতেন, কখন নামাতে হবে। ইদানীং অবশ্য কিছু মডিউলেশন হয়েছে। কয়লার উনুন আর কোথায় পাব? তাই গ্যাস সিমে রেখে... তা ছাড়া শিলনোড়ার পাটও উঠে গিয়েছে। মিক্সিতে বাটা মশলায় টেস্টের সামান্য এদিক-ওদিক হয় বইকি। আমি ঠিক বুঝতে পারি,” ওদের দিকে তাকিয়ে খুশিয়াল ভঙ্গিতে বললেন গোরা। “কিশমিশ আর তিন রকম বাদাম বাটা মাস্ট। নামানোর আগে ঘিয়ের যথেচ্ছাচার। রান্নার শখ আমার বরাবরই। মায়ের থেকে পাওয়া হয়তো। খুব প্রোগ্রেসিভ ছিলেন। ছেলেকে রান্না না শেখানোর কোনও কুযুক্তি খাড়া করেননি। তখনকার দিনেও বিশ্বাস করতেন, সব কাজ সকলের জন্য,” বহুদিন পরে প্রাণখোলা একটা হাসি হেসে উঠলেন গোরা।
“ফ্যান্টাটিক দাদা, ফ্যাবুলাস। ভাগ্যিস শিখেছিলেন আপনি! আমার না-দেখা সেই জ্যাঠাইমাকে কুরনিশ জানাচ্ছি,” কমল আঙুল চেটেপুটে নেয়। “বহুদিন পর এত তৃপ্তি করে খেলাম।”
নীনা হাসছে। ঘিয়ের বাড়াবাড়ি শুনেও, শরীর সচেতন নীনারও মনে হচ্ছে, স্বাদকোষগুলোকে একটুখানি প্রশ্রয় দেওয়াই হোক না হয় একদিন! তিনজনে বসেছে ছোট ডাইনিং টেবলে। গোরাদা খুব যত্ন করে খাওয়াচ্ছেন। কত কাল পরে কেউ নীনাকে জিজ্ঞেস করল, সে কী খেতে ভালবাসে! জোর করে খাবার তুলে দিল পাতে। ছলছলে এক আবেগের ঢেউ ভিতরে। নীনা নিজের খুব গভীরে ভাবছিল, স্বাধীনচেতা মেয়েদের উপর যত্ন করে জোর ফলানোর মতো কেউ থাকে না।
কমলের মেয়ে ফোন করেছিল সেদিন, “ওহ্ নীনা আন্টি, আমার প্রায়ই মনে পড়ে ‘সাউন্ড অফ মিউজ়িক’-এর ওই সিনটা, যেখানে মারিয়া আর লিজ়া কথা বলছে। আমি খুব রিলেট করতে পারি নিজের সঙ্গে জানো... আমার ভীষণ ভীষণ ইচ্ছে করে ওই ক্যাপ্টেন ভন ট্র্যাপ আর মারিয়ার মতো তোমরাও... বিয়ে করো। অন গড, ভীষণ ইচ্ছে করে,” হেসে কুটিপাটি হয়েছিল প্রথমে, তারপর বলেছিল, “আমি এই রকম করে কথা বলি বলে তুমি বিশ্বাস করছ না, বাট আয়্যাম সিরিয়াস।”
নীনা বলেছিল, “শেষের কবিতা পড়েছিস?”
“উম, না। কিন্তু জিস্টটা জানি। বাবা টোল্ড মি দ্য স্টোরি, বাট ইউ নো বাংলাটা উইক বলে... নিজে পড়ে ঠিক, মানে...”
“ তা বাবার গল্প থেকে কী বুঝেছিস?”
“আই নো, রবি ঠাকুর বলেছেন একসঙ্গে দুটো লোক থাকতে থাকতে ডে-টু-ডে কনস্ট্যান্ট ইন্টারঅ্যাকশানে অনেক বিটারনেস ফর্ম করে আর...”
“তবে? এই তো বুঝেছিস,” নীনা হেসেছিল। স্বাধীনতার ভাবনা আসলে এতগুলো বছর ধরে মাকড়শার জালের মতো আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তা ছাড়াও মনে মনে বলেছিল, ‘বোকা মেয়ে! এখন বুঝবি না। আইনের বাঁধনের মধ্যে এসে গেলেই কত যে জটিলতা তৈরি হয়! অনেক কষ্টে একটা মানুষ পেয়েছি যাকে বিশ্বাস করতে পারি, ভরসা করতে পারি। তুই কত ভালবাসিস আমাকে! কিন্তু সময় কীভাবে যে আচমকা বদলে যায়! মন কীভাবে বদলে যায়, কেউ বলতে পারে না রে! ভালবাসার উপর ভার চাপাতে বড্ড ভয় করে তাই।’
কিন্তু পারিবারিক সম্পর্কের এক চোরা তেষ্টা যে জেগে থাকেই ছেলেবেলার হাজার স্মৃতির সঙ্গে মিলেমিশে!

"দাদা," ডাকটা গোরার দিকে তাকিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারণ করতে পারল সে। অমনি কী স্বাদু এক অনুভব সারা মন জুড়ে! সত্তর পার করা মানুষটার মধ্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সঙ্গে নরম অনুভব। দেখে অবাক লেগেছিল নীনার। খুব বেশি দেখেনি সে এমন। তার সঙ্গে কমলের সম্পর্কটা গোড়াতেই স্পষ্ট করে দিয়েছিল কমল নিজে। তখন এই সত্যিকারের আধুনিক মানুষটির চোখে দেখেছিল সম্মান আর অভিনন্দন। কথা আর হাসির মধ্যে, তাঁর আন্তরিকতাটুকু পড়ে নিতে পারছিল নীনা।

এই ছোট ফ্ল্যাটের মলিন ঘর, প্লাস্টিকের চেয়ার, সস্তার কাউচ, তাঁর চির রুগ্ণ স্ত্রীর বিছানা থেকে ভেসে আসা মালিশের ওষুধের গন্ধ... সব যেন ফিকে হয়ে যাচ্ছিল ওই উজ্জ্বল মানুষটির নিজস্ব আলোয়। গোরাদার সঙ্গে কিছু ক্ষণ কথা বলে ও বুঝতে পারছে, তাঁর মধ্যে ক্রমাগত জেগে রয়েছে এক অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ। নিজেকে আপগ্রেড করতে চাওয়ার ব্যাকুলতা। সামান্য কথাবার্তা থেকে বোঝা গিয়েছে জীবন খুব বেশি কিছু দেয়নি এ মানুষকে, যা প্রাপ্য ছিল তাঁর। অথচ আক্ষেপের প্রকাশ নেই। নিজের দুর্ভাগ্যকে উড়িয়ে দেওয়াও তিনি যেন অভ্যাস করে নিয়েছেন। কিন্তু সামান্য সময়ের পরিচয়ে তাঁর সম্পর্কে এই ভাবনা কি নীনা নির্মাণ করছে নিজের কোনও অপূর্ণ আবেগের পিপাসা মেটাতে? ছোট বসার ঘরের অনেকখানি জুড়ে দুটো বেমানান ঢাউস আলমারি। উপচে পড়ছে বইতে। পাশে একটা ট্রাঙ্ক। তার উপর চাদর চাপা দিয়ে বসার এক 'মেক-শিফট' ব্যবস্থা। বললেন, সেটাও নাকি বইয়ে বোঝাই। ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন। বাংলা, ইংরেজি দুই ভাষাতেই। নবীন-প্রবীণ লেখকদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব নেই। আলমারির সামনে থেকে খুঁটিয়ে দেখছিল নীনা।

"সাধারণ বিকম গ্র্যাজুয়েট। কিন্তু শিক্ষিত হতে চেষ্টা করে যাচ্ছি আজও, বুঝলে নীনা। ওই একটাই শখ। নিজের বাজার খরচ থেকে নিজেই মেরে, সে পয়সা জমিয়ে জমিয়ে শেষে..." হা হা করে হাসলেন গোরাদা।

নীনা অনেক কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটুখানি ফিকে হাসি হাসতে পারল কেবল। কারণ সেই প্রায় ভুলে যাওয়া অনুভবটা দলা পাকাচ্ছিল তার গলার কাছে।

"আমাদের এখানের বাড়িটা রাখা যায়নি শেষ পর্যন্ত। এই একই প্রোমোটার নিয়েছিল। এখন ওটা ভেঙে শপিং মল। পোস্ট-অফিসের পাশ দিয়ে আসার সময় চোখে পড়েছে নিশ্চয়ই। আট কাঠার উপর জমি নিয়ে ছিল ও বাড়ি। সামনে বাগান। পরে নীচের তলার পুরোটাই ক্রমশ ভাড়া দিতে হয়েছিল বাবার ব্যবসা পড়ে যেতে, বেশ কয়েক ঘর ভাড়াটে। তাই দাম যা পাওয়ার কথা, তার ওয়ান টেনথও পাইনি বোধহয়। তবে তালবেড়ের স্মৃতি এখনও জেগে আছে। নিজের কিছু দেখা, আর ঠাকুমার মুখের কত যে গল্প! ওর যদি কিছু সুরাহা করা যায়, ভালই। আমার কাছে কোনও দলিলপত্র নেই কোনওকালেই। বাবা ছিলেন কাছাখোলা লোক। বৈষয়িক বুদ্ধির ঘরে প্রকাণ্ড একখানা শূন্য! তারই কিছুটা আমিও ইনহেরিট করেছি," আবার হেসে উঠেছিলেন গোরাদা।

"সে তালবেড়ে আমার কাছেও আদ্যিকালের গল্প হয়েই ছিল এতকাল। আপনি তো দাদা তবু নিজের চোখে দেখেছেন। সেটলমেন্ট অফিসে গিয়ে কাগজ-টাগজ দেখেশুনে আমার চক্ষু ছানাবড়া! জবরদখল যা হয়েছে সব বাদ দিয়েও, যেটুকু পড়ে আছে— ভাবিইনি এত মার্কেট প্রাইস হতে পারে তার! আসলে হাইওয়ে তৈরি হয়ে যেতে দামও বেড়েছে চড়চড় করে। নষ্ট হতে দেওয়া ঠিক নয় দাদা। ঘুষঘাষ দিতেই হবে সেটলমেন্ট অফিসে। তোলাবাজদের ব্যাপারটাও ওরাই সামলাবে। অনেকটাই মাইনাস হবে বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই, তবু প্রফিট কম নয়, পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা বলতে পারেন! বেশি দেরি করলে ওটুকুরও কী দশা হবে, কেউ জানে না। একবার নিজেদের যেতে হবে। সামনের দু'মাস থাকছি না কলকাতায়। তারপরে..." কমল বলল।

"যেদিন বলবে। আমাকে কেবল একটুখানি সময় দিয়ো। কাজের মেয়েটিকে সারাদিনের মতো থাকতে বলতে হবে। তোমাদের বৌদির কাছে সব সময় কাউকে না কাউকে থাকতে হয়ই। প্রায় বেডরিডন তো মানুষটা। কোনও রোববার যেতে চাইছ কি?"

"আরে আমি দাদা রিটায়ার্ড ম্যান, আমার এখন রোব সোম সব সমান। শালগ্রামশিলার ওঠা-বসা আর কী! তবে এই বিজ়ি লেডিও যেতে চাইবেনই কিনা আউটিঙের লোভে, তাই রোববারই ভাল," নিপাট ভালমানুষি গলায় নির্ভেজাল মিছে কথাটা বলল কমল। নীনার দিকে তাকালও না। অগত্যা নীনার চোখ পাকানো স্রেফ মাঠে মারা গেল!

"প্রোমোটার মহোদয় ওই অঞ্চলেই থাকেন। সেদিন প্রাথমিক স্তরের কিছু আলোচনা সেরে নেওয়া যেতে পারে ওঁর সঙ্গে। আগে থেকে জানিয়ে রাখব এজেন্টের মারফত।"

"আমি এখনও মিট করিনি ও প্রোমোটারকে। কথাবার্তা যা কিছু হয়েছে, এই এজেন্ট উকিলের সঙ্গেই।"

"খুব কিছু মিস করোনি। সাক্ষাৎ 'সামবাজারের সসীবাবু' ওই প্রতীক মণ্ডল।"

"প্রতীক মণ্ডল... আচ্ছা, ওর বৌয়ের নাম কি শর্মিলা? রিসেন্টলি পঁচিশ বছর হল ওদের বিয়ের?" আচমকা বিস্ময়ের অভিঘাতে বলে উঠল নীনা। আর বলেও বুঝতে পারল না, খুব বোকা বোকা হয়ে গিয়েছে প্রশ্নটা।

"বলতে পারব না। ওর ফ্যামিলি নিয়ে তেমন কথা হয়নি কখনও। তবে ওখানকার অনেক কালের বাসিন্দা ওরা, এটুকু বলেছে। আমাদের পরিবারের সঙ্গে জানাচেনা ছিল বুঝি," গোরাদা বলেন। "অবশ্য তালবেড়ে নামটা এখন মিউনিসিপ্যালিটির আগেকার নথিপত্রেই আছে। পুরনো মানুষজন হয়তো জানে। অফিশিয়ালি জায়গাটার নাম হয়ে গিয়েছে ওখানকার একটা পুকুরের নামে, মৎস্যকন্যার ঘাট। মুখে মুখে শুধুই মৎস্যকন্যা। আমাদেরই ছিল ও পুকুর। শুনেছি পুরো গ্রামটাই আগে রায়চৌধুরীদের ছিল বলতে গেলে... আবছা আবছা মনে পড়ে। আমরা পুজোর সময় গেলে বাবা তাঁর তুতো ভাইদের সঙ্গে মিলে মাছ ধরতে যেতেন। অনেক গল্প শুনেছি। ঠাকুমা বলতেন নাকি চাঁদনি রাতে মৎস্যকন্যাদের দেখা মিলত। যদিও সে



পুকুরের অস্তিত্বই নেই আর। পুকুরটুকুর বুজিয়ে ওই ধান্দাবাজ প্রোমোটারই দিব্যি সব গাপ করেছে। ব্যক্তিগত লোকসানের কথা যদি ছেড়েই দাও, গোটা পৃথিবীকেই সর্বনাশের পথে ঠেলা মারছে এই লোকগুলো,” গোরাদার গলায় আক্ষেপ।
“কী অদ্ভুতভাবে আমরা অন্যায়ের সঙ্গে সমঝোতা করতে শিখে যাচ্ছি তাই না গোরাদা?” খুব বিচলিতভাবে বলে নীনা।
“এগজ্যাক্টলি সো।”
কমল কিছু বলে না। নীনার উত্তেজিত মুখটার দিকে তাকিয়ে শুধু ভাবে, আসলে ওই চাপা আবেগটা ওর টনিক। ওকে হরেক বাধা টপকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যায় বার বার।
নীনা হঠাৎ কমলের চোখে চোখ রেখে তাকায়। “খুব দরকার কি ওই কয়েক কোটি টাকা?” চাবুকের মতো বলে ওঠে। “ওই চূড়ান্ত ডিজ়অনেস্ট প্রোমোটারকে কেন বেচে দেবে নিজেদের জমি? কত ইতিহাস জড়িয়ে আছে ওই গ্রামের সঙ্গে! তোমাদের বংশের কত গৌরবের স্মৃতি... তার চেয়ে নিজেরা কিছু করতে পারা যায় না?”
গোরা ভারী বিস্মিত হয়ে তাকান নীনার দিকে। মেয়েটা সোশ্যাল ওয়র্ক করে শুনেছিলেন। বিশেষ গুরুত্ব দেননি তখন। কিন্তু ওর মুখের এই জ্বলজ্বলে আবেগ কি সত্যি? অনেকবার পিতলকে সোনা ভেবেছেন। বিশ্বাস করতে একটু দ্বিধা হয় তাই।
কমল বিরক্ত হয়ে উঠেছে। নীনা এমন ভাবে বলছে, যেন দোকান থেকে কুমড়োর বদলে পটল কিনতে চাইছে। বড্ড বেশি বুকিশ! কোথায় থামতে হয় জানে না। বিরক্তি চাপতে চেষ্টা করেও পুরোটা পেরে ওঠে না কমল, “নীনা তুমি যা বললে, একদম ঠিক। আবার একই সঙ্গে একেবারে ভুল। সমঝোতা মানুষের জীবনের মস্ত বড় ট্র্যাজেডি। যাদের বিবেক সম্পূর্ণ মৃত নয়, তাদের জন্য তো বটেই। কিন্তু আমরা কয়েক কোটি টাকা ছেড়ে দিলেই কোনও অন্যায় বন্ধ হবে না। টাকা আর ক্ষমতা যাদের হাতে থাকে, তারা দিনকে রাত করতে পারে। আমরা যদি ওই প্রোমোটারকে বিক্রি না করি, ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে জানো? সাপও মরবে না, অথচ লাঠিও ভাঙবে। এখানে নিজেরা কাজ করতে চাইলে আমাদের কোনও নিরাপত্তা থাকবে না। বেকার খুন হয়ে যাব। ওদের হাত কত লম্বা, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। আমরা খুব সাধারণ মানুষ নীনা। স্যাক্রিফাইস যদি বা করি, একটা ভয়ংকর বিপদকে যেচে ঘাড়ে নেব কেন বলতে পার? এদিকে আমাদের স্যাক্রিফাইসে প্রোমোটার ছাড়া কারও কোনও লাভ হবে না। তবে খামোখা নিজেদের পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা ছেড়েই বা দেব কেন? আর নীনা, তুমি যে এ সব প্রশ্নের উত্তর জানো না, এমনটাও তো নয়। এ পৃথিবীতে সদ্য আগমন হয়নি তোমার,” শেষকালে একটু হেসে বিরক্তির প্রকাশটা হালকা করে দিল কমল।
আহত চোখে তাকাল নীনা। সে বোকা নয়। পথের সামনে নিরেট পাথরের দেওয়ালটা সে স্পষ্ট দেখতে পায়। কিন্তু মানতে চায় না। পাতলা ঠোঁট দুটো টিপে চুপ হয়ে রইল। আর সেদিকে তাকিয়ে, গোরা নীনার ঠোঁটের ভাঁজে, চোখের কোণে খুব স্পষ্ট দেখতে পেলেন একটা লড়াকু মেয়েকে। শেষ পর্যন্ত এই মাটির পৃথিবীতে হেরেই যেতে হয় যাদের। অমনি নিজের বুকের মধ্যে কী গভীর এক মমতার ক্ষরণ টের পেলেন! সমমনস্ক মানুষের সঙ্গই মানুষের সুখভূমি— চিরকাল এই

বিশ্বাসকে বয়ে বেড়িয়েছেন গোরা নিজের মধ্যে। কিন্তু মানুষ চিনতে ভুল হয়ে গিয়েছে বার বার।
"একটা কথা বলি?" খুব স্নিগ্ধভাবে বললেন তিনি, "ওই প্রোমোটার, এজেন্ট ও সব পরের কথা। কমল ফিরে এলে, গোড়ায় এদের বাদ দিয়ে যদি জাস্ট একটা আউটিঙে যাই আমরা একদিন? ওই তালবেড়ে? আলাদাভাবে দেখেশুনে আসা... কত স্মৃতি... কত গল্প যে জমে আছে! আর কিছু নয়, ছেলেবেলার স্মৃতির সঙ্গে খানিক মিলিয়ে দেখা। সেই বাড়ি... পুরনো ইতিহাস..." গলাটা বুজে আসে যেন। ওদের কাছ থেকে সেটা ঢাকতে কাশির ভান করেন গোরা। আলমারির পিছনে কাগজ মুড়ে পড়ে থাকা লালবিহারীর অয়েল পেন্টিংটা জীবন্ত হয়ে ওঠে বুঝি কত কাল পরে!
"গ্রেট আইডিয়া!" থাম্‌স আপ দেখায় কমল। থমথমে পরিবেশটা খানিক হালকা হয়ে যায়। নীনা সামলে নেয় নিজেকে। বেশ খানিকটা সময় কাটিয়ে, সন্ধের আগে উঠে পড়ে ওরা।
অনেক রাত অবধি জেগে থাকেন গোরা। কেমন এক খুশি ছড়িয়ে যাচ্ছিল তাঁর আকাশে। কী চমৎকার কাটল আজকের দিনটা! তাঁর গতানুগতিকতার জীবন থেকে পুরো আলাদা। হঠাৎ অনন্যাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করল। এখন কেমন দেখতে হয়েছে তাকে? কপালে বলিরেখা? আলগা হয়ে গিয়েছে গ্রীবার পেশি? তবু নিশ্চয়ই আজও ভাল দেখতে লাগে তাকে! ভিতর থেকেও কি বদলেছে সে? নাকি আগেরই মতো ভয়ের ঘেরাটোপে রয়ে গিয়েছে আজও? কোন ভয় থেকে তাঁর হাত ছেড়ে দিয়েছিল সে? সত্যিই বাবার ভয়ে? নাকি টানাটানির জীবন কাটানোর ভয়কে নিজেই চিনতে পেরেছিল সে? অনেকদিন পর্যন্ত প্রশ্নগুলো চাবুকের মতো আছড়ে পড়ত তাঁর উপরে। আজ গোরার কানের কাছে আচমকা অনন্যা আবার আর্তনাদ করে ওঠে, "আমি বলেছিলাম বাবাকে। সব বলেছিলাম। কিন্তু বাবা ভয়ানক রাগ করছেন। এ বিয়ে মেনে নেবেন না কিছুতেই। বলছেন... বলছেন... তোমার হাত ধরে যদি বেরোই, তবে যেন আর কোনও দিন ফিরে এ বাড়ির চৌকাঠ না মাড়াই... এমনকি তিনি মারা যাওয়ার পরেও না! বোনটা কাঁদছে শুধু। ওর তো আর কেউ নেই আমি ছাড়া! কী করব বলো? আমার উপায় নেই, বিশ্বাস করো। তুমি আর কোনও দিন এসো না এ বাড়িতে। কেন মিছিমিছি অপমানিত হবে?" অনন্যা কাঁদছে। মাথা থেকে আগুনের হলকা বেরিয়ে আসছিল গোরার।
"কী বলছেন তোমার বাবা? সামান্য একটা স্কুল মাস্টার তাঁর মেয়ের যোগ্য নয়?"
"ভুল বুঝো না আমাকে প্লিজ়... আমার... আমার কিছু করার নেই..."
অনন্যা কাঁদছিল। গলায় অনুনয়। গোরার মনে হচ্ছিল, অনন্যার স্বরে কী গভীর ভয়!
"পরের বারের প্রেমটা বাবার অনুমতি নিয়েই তবে কোরো," বলে ফোন কেটে দিয়েছিলেন সেদিন। কতদিন চলে গিয়েছে! সে সব তীব্র প্রতিক্রিয়ার তলানিটুকুও আর পড়ে নেই হয়তো। তবু আজ বহুদিন পরে, কেন যেন অনন্যার খোঁজ পেতে চাইছিলেন গোরা! আসলে প্রেম দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আহাম্মকি। অন্ধকারের মধ্যে মুখ টিপে অল্প হাসলেন তিনি।

১২

'ইস্কুল মাস্টার'। নিতান্ত হেলাফেলার পরিচিতি। "রায়চৌধুরী বাড়ির ছেলে কিনা দু'পয়সার ইস্কুল মাস্টারি করতে চলল!" তার নিজের বাবাই তো বলেছিলেন, চাকরি পাওয়ার খবর শুনেছিলেন যখন। সেই মুহূর্তে ফেটে পড়েছিল গোরা। সারা কৈশোর জুড়ে সে বঞ্চিত থেকে গিয়েছে। খুব সাধারণ ইচ্ছেগুলোকেও চেপে রাখতে হয়েছিল তাকে। সে বঞ্চনা তো এই মানুষটারই নির্বুদ্ধিতার ফসল! তার এত দিনের জমে থাকা ক্ষোভ, রাগ বেরিয়ে এসেছিল হুড়মুড় করে। ওই একটাই দিন। মা শান্ত করেছিলেন তাকে অনেক কষ্টে। প্রাণতোষ রায়চৌধুরী সে সব কথার উত্তর দিতে পারেননি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিলেন চিরদিনের শান্ত, বাধ্য ছেলের মুখের দিকে।
পরে মায়া হয়েছিল গোরার। ঘটা করে ক্ষমা চায়নি অবশ্য। কারণ সে জানত, তার কথাগুলো ভুল ছিল না। বলার ধরনটা রূঢ় ছিল কেবল। প্রাণতোষ সেদিন থেকে আরও বেশি করে চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। অনুতাপ না গ্লানি কিসের থেকে, জানে না গোরা।
তাদের বাড়িতে এক দিকে ছিলেন মা, সে নিজে আর নোনাদা। এই স্কুল মাস্টারির কম হলেও একটা নিশ্চিত অর্থাগম যাদের নিরাপত্তা দিয়েছিল। গর্বিতও করেছিল। অন্য দিকে বাবা। অসংখ্য জটিল আত্মবিরোধিতার মধ্যে ডুবে থাকা মানুষ এক।
সে চাকরি পাওয়ার আগে ছোট্ট ঘটনা ঘটেছিল একটা, যা সে কখনও ভুলবে না। কয়েক বছর হল তাদের বাড়িতে বিশেষ কেউ আসত না। তারাও যেত না কোথাও। প্রায় সব সামাজিক অনুষ্ঠানই কোনও না কোনও ছুতো দেখিয়ে এড়িয়ে যেত। সেই সময় একদিন হঠাৎ মাধুরীপিসি এসেছিলেন। মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ইস, কী চেহারা হয়েছে গো নতুন বৌদি! সে সোনার মতো রঙের আর কিচ্ছুটি নেই যে! জানি, বড্ড খাটুনি পড়ে ইদানীং— আহা, তোমার কি ওব্যেস আছে কোনও দিন? এখন ওই বুড়ো নোনাই তো সম্বল তোমার বলতে গেলে।"
গোরা বুঝতে পারছিল, মাধুরীপিসির গলায় কেমন তৃপ্তির সুর!
এভাবেই সে তথাকথিত আত্মীয়দের ভিতরের মুখগুলো চিনতে শিখে গিয়েছিল। এই তুচ্ছ কথাগুলো খুব বড় একটা ধাক্কা দিয়েছিল তাকে। সে দুটো টিউশন করত। আরও বাড়ানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল সেদিন থেকে। সে বুঝেছিল, দারিদ্র অপরাধ নয়। আসল অপরাধ হল, তাকে লজ্জা পেয়ে আড়াল করতে চাওয়াটা। "আমার টাকা রোজগার করা দরকার। টিউশন পেলে আমি খুব উপকৃত হব," সমস্ত অস্বস্তি দমিয়ে রেখে, এই কথাগুলো বলতে শিখেছিল সে পরিচিত, অর্ধপরিচিতদের।
ফেব্রুয়ারির এক রবিবারের সকালে ঘুম ভেঙেছিল গোরার। একটু ঠান্ডার আমেজ তখনও হাওয়ায় লেগেছিল। মাঝরাতের পর থেকেই পাখা লাগে না আর। সে তো ওই সময় অঘোর ঘুমে। মা বলেন, সে কুঁকড়ে শুয়ে থাকে নাকি! তবু ঘুম ভাঙে না। কিন্তু

সকালে জেগে উঠে গায়ে হালকা চাদরটা রয়েছে দেখতে পায়। সব মায়ের কাণ্ড! তিনি কখন এসে পাখা বন্ধ করে, মশারি তুলে তাকে ঢেকে দিয়ে যান, সে টেরও পায় না। চাদরটা সরাতে সরাতে তার মুখে হালকা একটু হাসি ফুটে উঠল। মা তাকে এখনও বাচ্চা মনে করেন, যদিও সে একজন চাকুরে মানুষ হয়ে উঠেছে। সে এখন রাজচন্দ্র বিদ্যালয়ের অঙ্কের শিক্ষক। অবশ্য ক্লাস এইট পর্যন্ত সব বিষয়ই তাকে পড়াতে হয়। কমার্সের ছাত্র হলেও সবচেয়ে ভাল লাগে তার ইতিহাস পড়াতে। স্কুলের প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকগুলোতে কেন যে ইতিহাসকে এমন একপেশে ভাবে দেগে দেওয়া হয়? সাদা আর কালো! কিন্তু নিরপেক্ষ আর নির্লিপ্ত পর্যবেক্ষণ খুব জরুরি। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কোনও জায়গাই নেই সেখানে। কথাগুলো সে ছোট ছেলেদের মগজে ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করে।

আজকাল সে যখন বাড়ি থেকে বেরোয়, ভাড়াটেদের অংশের দিকে চোখ যায় অদ্ভুতভাবে। প্রতিদিনই তার মনে পড়ে শঙ্কুদির কথা। শঙ্কুদির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল হেনাদি, মীনাদিকে টপকে। তার কয়েক মাস পরেই। সেই দুপুরের পর থেকে শঙ্কুদি আর উপরে আসেনি অবশ্য। কিন্তু পথে কখনও তাকে দেখতে পেলেই অন্য দিকে বাঁক নিত গোরা। ক্রমশ শঙ্কুদির নামে অনেক খারাপ কথা তার কানে আসত। ন'পাড়া বস্তির এক কলের মিস্তিরির সঙ্গে বুঝি খুব ভাব হয়েছে তার। তাদের দু'জনকে গঙ্গার ধারে সিমেন্টের বেঞ্চে বসে থাকতে দেখেছে লোকে সন্ধেবেলায়। হেসে ঢলে পড়ছে এ-ওর গায়ে।

একদিন চাপা গলার তর্জন-গর্জন উপরতলা থেকে কিছু কিছু শোনা যাচ্ছিল। কাঠ হয়ে ছিল সে। তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। মা নির্লিপ্ত শক্ত মুখে তরকারি কুটছিলেন। নোনাদা একবার উসখুস করে কিছু বলতে গেল তাঁকে। মা মুখ তুলে চাইলেন শুধু একবার। চোখের চাউনিতে আগুন। নোনাদা আর কিছু বলতে সাহস পেল না। মা এবার ছেলের দিকে তাকালেন। তীব্র গলায় বললেন, "কী হচ্ছে না হচ্ছে, মাথা ঘামাবে না তাই নিয়ে। কারও সঙ্গে আলোচনাও করবে না।" মাকে গোরার খুব নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল সেই মুহূর্তে।

শঙ্কুদিকে তারপর থেকে আর বাইরে বেরোতে দেখেনি সে। বোনেদের ঝগড়া বা হাসাহাসিও শোনা যেত না। কী রকম থমথমে ভাব। একদিন স্কুল থেকে ফিরে নোনাদার মুখে শুনল, ওরা সব কোথায় যেন বেড়াতে গিয়েছে। গোরা শুনে ফেলেছিল, একদিন মা খুব রাগের গলায় বাবাকে বলছিলেন, "ওরা উঠে গেলে বাঁচা যায়! ছেলে বড় হচ্ছে। কত আর আগলে আগলে রাখব? চতুর্দিকে ঢি ঢি পড়ে গিয়েছে।" বাবা কেমন এক শ্লেষের হাসি হেসেছিলেন, "আমাকে বলছ কেন? তুমিই তো মহা উদ্যোগ করে ভাড়াটে বসিয়েছিলে তখন। এক কাজ কোরো। ভাড়াটের ক্যারেকটার সার্টিফিকেট দেখতে চেয়ো এবার থেকে।"

সপ্তাহদুয়েক পরে কাকা-কাকিমা ফিরে এলেন। তিন বোনের কেউ এল না। কাকিমা উপরে এলেন। হাতে হলুদের দাগ দেওয়া বিয়ের চিঠি। একগাল হাসি। মায়ের হাতে চিঠি দিয়ে বললেন, "ও দিদি, কী বলব, আপনাদের আশীর্বাদে শঙ্কুর আমার খুব ভাল বিয়ের ঠিক হয়ে গেল যে হঠাৎ। আমার বোনের মামাতো ননদের ভাগ্নে হয়। ওরা কিচ্ছু চায়নি, শুধু সুন্দর মেয়ে খুঁজছিল। নিজেরাই যেচেপড়ে বলল। একটু মন খুঁতখুঁত করছিল বটে যে, বড় বড় দিদিরা পড়ে রইল... তা যাচা সম্বন্ধ ফেরাতে বারণ করল আমার বোন-ভগ্নিপোত। বিয়ে ওই আমার বোনের বাড়ি বসনহাটি থেকেই হবে। আপনাদের অবিশ্যি করে পায়ের ধুলো দিতে হবে কিন্তু— আপনি, দাদা, আমাদের গোরাবাবা," কাকিমার গলায় উচ্ছ্বাস।

মা অবশ্য সে উচ্ছ্বাসের ধার দিয়ে গেলেন না। ঠান্ডাভাবে বললেন, "খুব ভাল খবর, কিন্তু আমাদের যাওয়া তো সম্ভব হবে না।"

উঠে পাশের ঘরে গিয়ে আলমারি খুললেন। আগে কখনও নিজেরই জন্য কিনে রাখা একখানি নতুন শাড়ি বের করে এনে কাকিমার হাতে দিয়ে বললেন, "আমার আশীর্বাদ রইল।" একটু গলা খাঁকারি দিয়ে এদিক-ওদিক তাকালেন। ইঙ্গিতটা অশালীন নয়, কিন্তু খুব শীতল আর স্পষ্ট। যেন ওঁদের সঙ্গে এই সামাজিক যোগাযোগের পুরো ব্যাপারটা মা এভাবেই শেষ করে দিতে চাইছেন।

শঙ্কুদি তারপর থেকে আর কখনও আসেনি এখানে। আরও মাসখানেকের মধ্যে কাকাবাবু বদলি হয়ে অন্য কোথায় যেন চলে গেলেন। আর কখনও সে দেখেনি তাদের কাউকে। গোরা এখনও শঙ্কুদির কথা যখনই ভাবে, তখনই এক চাপা আত্মতুষ্টি জেগে ওঠে। শঙ্কুদির জন্য মনখারাপও হয় তার। এখন পুরো নীচের তলাটা জুড়েই বেশ কয়েকটি ভাড়াটে পরিবার। নীচে একটাই কলঘর। সেটা এজমালি। কাজেই তার ভাগ নিয়ে একতলার বাসিন্দাদের মধ্যে প্রায়ই বচসা লেগে থাকে। সকাল থেকে কয়েকটা উনুনে কয়লার আঁচ পড়ে। ধোঁয়ার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে চার দিকে। গোরা জানে, তারা সকলেই সময় মতো ভাড়া দেয় না। কিন্তু বাবা, মা কেউই তাগাদা করতে পারেন না তা নিয়ে। নোনাদার এখন অনেক বয়স হয়ে গিয়েছে। কাজকর্ম বিশেষ কিছু পেরে ওঠে না আর। তবে গলার জোরটি বজায় আছে পুরোপুরি। গোরা চাকরি পাওয়ার পর থেকে আরও বেড়েছে তার দাপট। কারণ তার স্থির বিশ্বাস, গোরার এই চাকরির পরের ধাপ উকিল হয়ে ওঠা। আর এই হাড় বজ্জাত ভাড়াটেগুলোকে উৎখাত করা।

মশারি থেকে বাইরে এল গোরা। জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। নরম রোদ এসে পড়েছে বাগানের আমগাছের উপর দিয়ে। রকমারি পাখিদের কিচিরমিচির। একটু পরেই নীচের তলার কয়লার উনুনগুলোতে আঁচ পড়বে। ধোঁয়ার গন্ধে ভরে উঠবে চারদিক। জানলা বন্ধ করলেও ধোঁয়ার গন্ধ খানিক ঢুকে আসবেই ঘরের ভিতর। কলঘরের ভাগ নিয়ে ঝগড়া শুরু হবে। তখনই মরে যাবে এই স্নিগ্ধ ভোরবেলাটা। এই অনিশ্চিত ভাড়ার টাকাগুলোর আর প্রয়োজন থাকবে না তাদের শিগগিরি। কিন্তু এই সব ভাড়াটেদের কখনও তোলা যাবে কি? বাবার বন্ধু উকিল নিরঞ্জনবাবুর মুখে সে শুনেছে, ভাড়াটে তোলা খুব শক্ত। যাবতীয় আইনই তাদের পক্ষে। তবু হয়তো সম্ভব হবে তা-ও। আজকাল তার মন খুব আশাবাদী হয়ে থাকে।

এরই মধ্যে একদিন শঙ্কর এল। বলল, "পড়াবি? আমার মামার বন্ধুর বাড়ি। সন্ধেবেলা। তোর স্কুলের সঙ্গে ক্ল্যাশ করবে

না। একটা খাসা মাল আছে বস ওখানে। তাকে নয় অবিশ্যি, বাংলা পড়াতে হবে তার ছোট বোনকে। বিচ্ছু নাম্বার ওয়ান ছোটটা। কিন্তু এমনিতে ভাল। ছেলেবেলা থেকে চিনি ওদের।"

"তা সেই খাসা মালের সঙ্গে ইন্টুমিন্টু হয়নি তোর?"

"আরে গুরু, আমি তো তাকে নাকে পোঁটা পড়া দশা থেকে দেখে আসছি। তার চকোলেট কেড়ে নিলে গোড়ায় খিমচি কাটত। তারপর হাঁ হাঁ করে কাঁদত। মাঝখানে যোগাযোগ ছিল না। ওরা দিল্লি চলে গিয়েছিল। ওদের মা মারা যাওয়ার পর, আর্লি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে এখানেই ফিরে এসেছে ভদ্রলোক। একটু খিটকেল পাবলিক। মানুষ খারাপ নয়, কিন্তু পুরো ট্যাঁশ মার্কা বুঝলি? ট্যাংরা মাছের ঝাল দিয়ে ভাত খাওয়াকে লাঞ্চ বলে। কাজের মধ্যে এখন রোজ কলকাতায় যাওয়া। ক্লাবে বন্ধুদের সঙ্গে মোলাকাত। মাপ মতো ঢুকুঢুকু চলে। বিস্তর কামিয়েছে এক কালে। বাড়ির ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। সব সামলায় বড় মেয়ে। ওর সঙ্গে ফেঁসে না গেলে আমার নামে কুকুর পুষিস! এখন হেব্বি ব্যক্তিত্ব হয়েছে তার। ডাম্ বিউটি হলে তোর পোষাত না জানি!"

প্রথম দিন সে যখন ঠিকানা খুঁজে খুঁজে মহিমপুরের পোস্ট অফিসের পাশের বাগানওয়ালা দোতলা বাড়িটার সামনে গিয়ে পৌঁছল, তখন এগারোটা বাজতে পনেরো। সুন্দর নতুন বাড়ি। হাতঘড়িতে সময় দেখে, একটু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। এই পনেরো মিনিট সে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে কাটাবে।

ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা বাজতে, বাইরের দরজার কড়া নাড়ল।

খানিকক্ষণ পরে কাজের লোক এসে দরজা খুলে দিল। সাহেবি কেতায় সাজানো বসার ঘর। ভারী পর্দা। মফস্সল অঞ্চলের আর পাঁচটা বাড়ির চেয়ে একেবারেই আলাদা। আগে থেকে শঙ্করের বর্ণনা শুনেছিল বলে তার বুঝতে অসুবিধে হল না যে, ইনিই বিনয়বাবু। শঙ্করের মামার বন্ধু। "নাটা, টাকলু, নোয়াপাতি ভুঁড়ি," শঙ্কর অঙ্গভঙ্গিসহকারে বলে রেখেছিল। কোনও মতে হাসি চাপল গোরা। সে আশা করেছিল, উনি তার সময়ানুবর্তিতার প্রশংসা করবেন। অথচ কিচ্ছু বললেন না তিনি। একটু মুষড়ে পড়েছিল গোরা। সে ছেলেবেলা থেকে নানা ব্যাপারে প্রশংসা এত শুনেছে, যে না পেলে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে রইলেন বিনয়বাবু। মেপে নিচ্ছিলেন যেন গোরাকে। বললেন, "শঙ্কর আপনার কথা বলছিল, ভাল স্টুডেন্ট নাকি!"

"আমাকে 'আপনি' বলবেন না স্যর," গোরা নম্রভাবে বলতে চেষ্টা করল।

বিনয়বাবু পাত্তাই দিলেন না। মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিলেন, "আমার ছোট মেয়েটা গোড়া থেকেই বাংলায় কাঁচা। ওর দিদি বলছিল, টিউটর লাগবে। অবশ্য বাংলা ভাষাটা জীবনে কোনও কাজেই আসে না। তবু সেকেন্ড ল্যাঙ্গোয়েজে ফেল করলে আবার মুশকিল! হপ্তায় তিনদিন আসার কথা শঙ্কর আপনাকে বলেছে নিশ্চয়ই। রেমুনারেশনের কথাও জানিয়েছিলাম। তাহলে পরশু থেকেই শুরু করে দিন। সিক্সটিনথ অফ দ্য মান্থ। টাকাটা ন্যাচারালি এ মাসে হাফ। আই হোপ ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। আজ পরিচয় করে নিন।" একটু গলা তুললেন। রামধন নামক ভৃত্যটিকে ডেকে যখন তিনি 'ছোট মিসিবাবা'-কে খবর দিতে বললেন, বড্ড হাসি পেয়ে গেল গোরার।

কিছু কিছু মানুষ সব বিষয়ে শেষ কথা বলে থাকেন। গোরা বুঝতে পারছিল, বিনয়বাবু তেমনই একজন। সেই সময় খুব মামুলি একটা ঘটনা ঘটল। একটি কমবয়সি মেয়ে, পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল এসে। হাতে ট্রে-র উপর কাচের গ্লাসে জল। সাধারণ একটা ছাপা শাড়ি পরনে। ছিপছিপে, লম্বা। মুখের ভাব বড় কমনীয়। টানা টানা চোখের পল্লবগুলো খুব ঘন আর লম্বা। গ্লাসটা টেবলের উপর নামিয়ে রেখে, গোরার দিকে তাকিয়ে সৌজন্যের হাসি হাসল সে। হাতজোড় করে নমস্কার করল, "আমি অনন্যা। আমার ছোটবোনকেই পড়াবেন আপনি।" গোরা চমকে উঠল। মনে হল, এত মিষ্টি গলার স্বর আগে শোনেনি সে। এই নিতান্ত সাধারণ ঘটনাটা ভূমিকম্পের মতো তাকে ভিতর থেকে নাড়িয়ে দিয়েছিল আচমকা। কী আশ্চর্য! আগে হয়নি কখনও এমন। একজন মহিলাকে দেখলে উঠে দাঁড়ানোর যে শিক্ষা ছেলেবেলা থেকে মা শিখিয়েছিলেন, তা মনে পড়তে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল সেদিন তার।

প্রাথমিক কথা শেষ হতে, হবু ছাত্রীর সঙ্গে আলাপ সেরে বেরিয়ে এসেছিল সে। বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে তর সয়নি। পাবলিক বুথে ঢুকে শঙ্করের বাড়ির নম্বর ডায়াল করল। বাড়ি থাকলে ও-ই ফোন ধরে। গোরা খুব গম্ভীর গলায় বলল, "তোকে একটা কথা জানাতে ফোন করছি— নিশ্চিন্ত হ। তোর নামে কুকুর পোষার দরকার পড়বে না।" ওধারে দু'এক সেকেন্ড সময় লাগল শঙ্করের বুঝতে। তারপরই অট্টহাসির ঝড়। কী সহজে, প্রশ্নহীনভাবে সম্পর্কটা তৈরি হয়ে গিয়েছিল! অল্প কয়েকটা আলো-আলো দিন।

শঙ্কর বলে রেখেছিল, "ছোটটা কিন্তু অতি ডেঁপো। ভিজে বেড়ালের মতো মুখ করে থাকে। এদিকে চোখ-কান সব দিকে।" খুব তাড়াতাড়ি টের পেল গোরা।

"গোরাদা, আপনি শরৎচন্দ্রের নভেল পড়েছেন?" আরাধনা জিজ্ঞেস করল একদিন। সরল মুখের ভাব।

"নিশ্চয়ই। বাঙালি হয়ে জন্মেছি যখন।"

"দিদি বলছিল, ওখানে হিরোইনরা সব গ্রেট কুক। তাই না?"

"দিদি বলছিল কেন? তুমি পড়োনি?"

"সিলেবাসে নেই তো," কাঁচুমাচু মুখ করে আরাধনার জবাব। মুহূর্তের মধ্যে আর একটা মন্তব্য। "আর ওরা লাভড ওয়ানকে নিজেরা রান্না করে, সার্ভ করে, দিদি বলছিল। দিদিও তো গ্রেট কুক।"

পুরোপুরি বোল্ড আউট গোরা। কী বলবে ভেবে পেল না। তক্ষুনি পর্দাটা নড়ে উঠল। গোরা তাকালও না সেদিকে। একটা নিটোল হাত চা আর খাবারের ট্রে টেবলে নামিয়ে রাখল। সোনার সরু, ঝিকমিকে দু'গাছা চুড়ি কবজির প্রান্ত অবধি গড়িয়ে নেমে এল। আর আরাধনা ফিচেল হেসে উঠে দাঁড়াল, "এক্সকিউজ় মি, জল খেয়ে আসছি গোরাদা। দু'মিনিট? ওক্কে?" গোরা ভাবলেশহীন মুখে অল্প মাথা হেলাল। আজ কালচে লাল শাড়ি। সোজাসুজি না তাকিয়েও চোখের কোণ দিয়ে দেখে

নিয়েছে। তার মুখ দেখে কেউ বুঝতেই পারবে না, বুকের মধ্যে কী উদ্দাম বেগে রক্তের নাচানাচি চলছে। অনন্যা যান্ত্রিক গলায় বলল, "এগ স্যান্ডউইচ। মেয়নিজ় আর অলিভ কুচি। নিউমার্কেট ছাড়া পাওয়া যায় না। মরিচটা ফ্রেশ গুঁড়ো করে নিয়েছি, কারণ বেটার টেস্ট হয়। খেতে বেশি দেরি করলে পাখার হাওয়ার নীচে শুকিয়ে শক্ত হয়ে যাবে।"

"কুকিং ক্লাসের দিদিমণি?" গোরার মুখ গম্ভীর। চোখে চোখ রেখে তাকিয়েছে। অনন্যা এবার খিলখিল করে হেসে ফেলল, "অ্যাকটিং হবে না তোমার দ্বারা, বুঝলে? পাতালপ্রবেশ দৃশ্যে সীতার রোল করতে দিলে অডিয়েন্স বুঝতেই পারবে না, আদৌ ব্যাপারটা ট্র্যাজেডি ছিল, না কমেডি।" গোরা গভীর হতাশায় মাথা নাড়ল দু'দিকে। অনন্যা আর সামলাতে পারছে না নিজেকে। হাসির দমকে বসে পড়ল আরাধনার খালি চেয়ারটাতে।



একটু মুষড়ে পড়েছিল গোরা। সে ছেলেবেলা থেকে নানা ব্যাপারে প্রশংসা এত শুনেছে, যে না পেলে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে রইলেন বিনয়বাবু।

কয়েকটা নিঃশব্দ মুহূর্ত। ডান হাতখানা এগিয়ে দিল। পরিচ্ছন্ন, ফিকে গোলাপি হাতের পাতা। হাওয়ায় অলীক মায়ার মতো কয়েকটা শব্দ ভেসে এল, "আমাকে ছুঁয়ে বলো, কোনও দিন আমার এই হাত ছাড়বে না? কোনও দিনও নয়?" গোরা দেখল, কেউ যেন ইরেজ়ার দিয়ে নিমেষের মধ্যে ওর মুখ থেকে ঘষে তুলে দিয়েছে হালকা মজাটুকু। টানা টানা দু'চোখে আকুতি। গোরা কিছুতেই সামলাতে পারছে না নিজেকে। দু'হাতের পাতায় তার মুখখানা ধরে, কী এক গভীর তাগিদে টেনে নিল নিজের খুব কাছে। বাধাহীন। তখনই মিশে গেল ওদের দু'জোড়া ঠোঁট। সেই প্রথম। সুগন্ধি এক অন্ধকার ঘিরে রইল গোরাকে। গোরা এই মুহূর্তে জানে না, সেই চুম্বন সময়ের স্রোতে ভেসে, মাত্র দু'বছর পরেই তীক্ষ্ণ কাঁটা হয়ে যাবে। ক্ষতবিক্ষত করবে তাকে। রক্তাক্ত।

ওই দিনগুলো, সময়গুলো সত্যিই কি এসেছিল কখনও? প্রৌঢ় গোরা ভাবেন। কী আশ্চর্য! কে কবে চিনেছে মানুষের মনকে? প্রেম শুধু এক অলীক বিশ্বাস নাকি? অনন্যা হারিয়ে গিয়েছে এই বিশাল পৃথিবীতে। গোরা শুনেছেন, ইদানীং হারিয়ে যাওয়া কাউকে খুঁজে পাওয়া নাকি খুব সোজা হয়ে গিয়েছে সামাজিক মাধ্যমের কল্যাণে। বাজে কথা। অত সহজে যে হারিয়ে যেতে পারে, তাকে আর কোনও দিনই খুঁজে পাওয়া যায় না। শঙ্কর এখন অ্যালজ়াইমার্সের পেশেন্ট। সেই আমুদে ছেলেটা। জীবন তাকে অনেক কিছু দিয়েছিল— অর্থ, প্রতিষ্ঠা, সম্মান। সুন্দরী স্ত্রী, দু'টি কৃতী সন্তান। ছেলেবেলার অসফল বন্ধুকে ভোলেনি সে কিন্তু। প্রায়ই ফোনে কথা হত। রিটায়ার করার পর কানপুরে বাড়ি কিনেছিল শঙ্কর। মাঝখানে অনেকদিন চুপচাপ। শেষে গোরা ফোন করেছিলেন একবার।

অনেক ক্ষণ বাজার পর শঙ্করের স্ত্রী ধরল। শঙ্করের অসুস্থতার খবর দিয়েছিল খুব সংক্ষেপে। গোড়ায় অল্পস্বল্প লক্ষণ। ইদানীং খুব বেড়ে গিয়েছে। কোনও ওষুধ নেই এ রোগের। গোরা হতবাক হয়ে বসেছিলেন কত ক্ষণ! সে-ও তো বছর তিনেক হয়ে গেল। কোনও অমোঘ নিয়মে সম্পর্কগুলোতে কী আশ্চর্যভাবে দাঁড়ি পড়ে যায়! ধ্বসে পড়ে নির্ভরতার পাঁচিল যত। কী থাকে তবে? কী থাকে আর! জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছড়ানো এক বিষাদ যোগ কেবল। জগতের যে চিরন্তন বিষাদের কথা শাস্ত্র বলে বার বার। চেতনা আর বিষাদ কি আগুন আর তাপের মতোই জড়িয়ে থাকে পরস্পরের সঙ্গে? গোরার কিন্তু কমল আর নীনা নামের ওই ছেলে-মেয়েদুটোর সঙ্গে পরিচয়ের পরে আশা করতে বড় ইচ্ছে করে। একটি মানুষের 'মানুষ' হয়ে উঠতে খুব বেশি কিছু লাগে না। স্বচ্ছ খানিকটা ভাবনা কেবল। সকলে তার খোঁজ পায় না। ওরা বুঝি ছুঁতে পেরেছে সে ভাবনাকে। পারবে কি ছুঁয়ে থাকতে আজীবন?

"কী ভাবছ গো? তখন থেকে ডাকছি যে!" চমকে তাকালেন গোরা। অপর্ণা চেয়ে আছেন তাঁর দিকে। নিষ্প্রাণ চোখের চাহনি, "ইশবগুল আনতে হবে। প্রায় ফুরিয়ে এল।"

গোরার ঘোর ভাঙে, অনেক দূর থেকে ফিরে আসেন। "আনব আনব। ভুল হতে দেখেছ কোনওদিন?" নীরস স্বর গোরার গলায়।

"স্টক রেখে দিতে হয় সব সময়। দোকানে কখন কোন জিনিসটা ফুরিয়ে যায়, ঠিক থাকে তার?" অনেকদিন থেকেই বড় নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন অপর্ণা। পাশে থাকা একমাত্র মানুষটার সমস্ত মনোযোগ আঁকড়ে ধরে থাকতে চান প্রতি মুহূর্তে। গোরা তাঁর চোখেমুখে দেখতে পেলেন নিশ্ছিদ্র সেই অসহায়তা। তবু মমতা আসে না আর। বড় ক্লান্ত তিনি।

১৩

কমলের ফিনল্যান্ড থেকে ফেরার সময় হয়ে এল। প্রায়ই ভিডিয়ো কলে কথা হয়। ফুচি কী সুন্দর সাজিয়েছে ওর ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট! ঝকঝকে ওপেন কিচেন দেখে নীনা মুগ্ধ। কমল বলছিল, ইউটিউব দেখে অ্যায়সা মুগের ডাল করেছিল ব্রকোলির টুকরো দিয়ে, যে খাওয়ার পর থেকে আর বয়স বাড়েনি কমলের। ফুচির দুঃখ, যে লুচি গোল হয় না। নীনা হেসে অস্থির, "ওরে, তাবৎ বঙ্গনারীর বেসিক প্রবলেম এ! আমার ঠাম্মার মোক্ষম সলিউশন আছে একটা। প্রথমে যেমন খুশি বড় করে ময়দা বেল। তাপ্পর শার্প এজের মেটাল কৌটোর ঢাকনি দিয়ে কেটে নে।" ফুচি পরখ করে আহ্লাদে আটখানা, "দ্যাট'স গ্রেট!" প্রত্যেকটা স্টেপ ভিডিয়ো করে পাঠিয়েছে। উইকএন্ডে খুব ঘোরে বাপ-বেটিতে। "একটুও সময় নষ্ট কোরো না। আনন্দ করো... খুব আনন্দ

করো। পরের মুহূর্তের কথা কেউ জানি না আমরা,” বার বার বলে নীনা।
তবে নীনার স্ক্রিপ্ট লেখার কথা কমলই জানে একমাত্র। এবারের কাজটা সারা হয়ে গিয়েছে নিঃশব্দে। শুনে কমল মহা খুশি, “দ্যাট’স লাইক আ গুড গার্ল! সাউন্ডস ইন্টারেস্টিং!” যেমন মজার ছলে বলে, তেমন করেই বলেছে। কিন্তু নীনা জানে, ভিতর থেকে ও কতটা সংবেদনশীল। সেই সঙ্গে ব্যালান্সড। আগেও আরও কতবার স্ক্রিপ্ট লিখেছে সে। সবগুলো কাজে লাগেনি।
তবু লেখা থামায় না নীনা। এই সময় পজ়িটিভ এক ভাইভ তাকে ঘিরে থাকে যেন। এই দু’মাসে গোরার সঙ্গে কয়েকবার কথা হয়েছে নীনার। অনেক আলোচনা। মানুষটির জানার ব্যাপ্তি বেশ বড়সড়। তাঁর কাছ থেকে কিছু তথ্য পেয়েছে সে। আর নিজের মতো কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।
“বুঝলেন গোরাদা, হতাশা মানায় না আপনাকে। হতাশা আসলে ঝুরো বালির মতো। সামান্য টোকা দিলে ঝরে পড়বে। আসলে খুব ভাল কিছু, এখনও না ঘটা কোনও আশ্চর্য ভাল কিছু অপেক্ষা করে আছে আপনার জন্য। আমার ইনটিউশন বলে জানেন,” নীনা বলল একদিন। সেদিনই একটু পরে মেসেজ পেল, ‘একদিন দেখা হলে খুব ভাল লাগবে’। হোয়াটসঅ্যাপে বাংলায় লিখতে গোরাদাকে ও-ই শিখিয়ে দিয়েছে। কাজের ব্যস্ততার ফাঁকেও মাঝে মাঝে ফোন করে সে তাঁকে।
এই দু’মাসের পরিচয়েই নীনার মধ্যে তিনি এক ভরসা করার, বিশ্বাস করার মতো মানুষকে খুঁজে পেয়েছেন। কাউকে না-বলা কত কথাই যে বলেন তাকে! তখন খুব গর্ব হয় নীনার। কারও সত্যিকারের বিশ্বাস পাওয়ার মধ্যে এক অদ্ভুত তৃপ্তি থাকে।
অনেক ভেবেছে নীনা এর মধ্যে। সে খুব হিসেবি। কোনও রকম অপচয় সহ্য করতে পারে না— অর্থ, খাদ্য, প্রতিভা, প্রাণ, সময় যা-ই হোক না কেন। একজন কীভাবে নষ্ট করে দিতে পারে অন্য মানুষের সীমিত এই জীবনের দামি সময়টুকু?
সায়নদেবের মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। চাবকাতে ইচ্ছে হয় লোকটাকে। তখন নিজেকে শান্ত করতে ডিপ ব্রিদ করে ও। মোবাইলটা তুলেও বোতাম টিপল না। তার চেয়ে সামনাসামনি বলা ভাল, কয়েক মাস ধরে যা বলতে চাইছে ও জিতাকে। অদ্ভুত কিছু যোগাযোগের সূত্রে জীবনকে চেনার আখ্যান। ছোট চুলে দু’বার ব্রাশ চালিয়ে, বেরিয়ে
পড়ে নীনা।
“কিন্তু যাবি না কেন আমাদের সঙ্গে? কারণটা তো বলবি!”
“আমার ভাল লাগে না রে। তোদের দু’জনের মধ্যে ওভাবে... এতদিন পরে কমল ফিরছে। কাবাব মে হাড্ডি... কমলের মনে মনে হয়তো অস্বস্তি হবে, মুখে কিছু বলতে পারবে না। এত ভদ্র ও, কিন্তু...” সংকুচিতভাবে জিতা কথা শেষ করে না।
“উফ, ঢের ন্যাকামি হয়েছে,” জিতাকে মাঝপথে থামিয়ে ঝংকার দেয় নীনা। “দু’জন আবার কী? আমাদের আরও বন্ধুরা যাবে। দেখবি ভাল লাগবে তোর,” ধাঁ করে নিরীহ অর্ধ সত্যটি বলে ফেলে নীনা।
জিতার ভুরু কুঁচকে গিয়েছে তত ক্ষণে, “তোদের বন্ধুবান্ধবও? একগাদা অচেনা লোকের মধ্যে কী করব আমি গিয়ে?”
“আরে বাবা, ছুটির দিনে একটা আউটিং। ঠিকঠাক লোক। মিশলে দেখবি ভাল লাগবে। বাড়ি থেকে বেরো জিতা, একটু বেরো। তোর এই সুন্দর, ঠান্ডা, ন্যাতানো পশ লোক্যালিটির বাড়িটার বাইরেও খুব বড় জীবন আছে জিতা। অজস্র মানুষ, কত রকমের দুঃখ, সুখ, সমস্যা... আর সেই সব সমস্যার সমাধান... কত কী!”
জিতা হেসে ফেলল, “ওই শুরু হয়ে গেল। তোর বক্তিমে বেশি ক্ষণ শুনলেই মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে। তার চেয়ে বোধহয় যাওয়া ভাল।”
“তাহলে যাচ্ছিস পাক্কা তো?”
“একটু ভাবতে দে নীনা প্লিজ়... এবারটা থাক না, বরং পরে কোনও দিন,” জিতা ক্লান্ত গলায় বলে। তার এখন খুব সামান্য বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়। নীনা-কমলের বন্ধুবান্ধবের গ্রুপে জিতা কখনও যায়নি। তাকে ঘিরে অনেকগুলো চেনা-অচেনা মুখ, হয়তো বা অনেক প্রশ্ন, অনেক কৌতূহল— এই ভাবনা বড় অস্বস্তি দেয় তাকে।
আর নীনার মনে হয়, এটাই সঠিক মুহূর্ত। জিতার চোখে চোখ রাখে।
“কেন নিজেকে এভাবে সব কিছু থেকে গুটিয়ে রাখছিস তুই? চরম বোকামি! একজনের পাপের শাস্তি নিজেকে দিয়ে এলি এতদিন ধরে,” জ্বালা ধরা গলায় নীনা বলে। তারপর একটু থেমে, খুব শান্ত আর শক্তভাবে, কেটে কেটে বলে, “আর একজন কিন্তু দুর্ভাগ্যকে এক তিলও মাটি ছাড়েনি। ভাবতে পারবি না, তোর চেয়ে কত বেশি ঝড়ঝাপটা এসেছিল তার উপর। তোর মতো এত বছর ধরে শোকে ডুবে থাকার সুযোগই পায়নি ও। হ্যাঁ আমি ফ্রেয়া— ফ্রেয়া মুলারের কথা বলছি।”
জিতা কথা বলতে পারে না। হাতুড়ির আচমকা ঘায়ের মতো বিস্ময় অসাড় করে দিয়েছে ওকে। অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে জিতার মনে হয়, নীনার গলায় কেমন বুনো এক হিংস্রতা। নীনাকে চিনতে পারছে না জিতা।
তবু আচমকা ডুবে যাওয়ার মুহূর্তে খড়কুটো ধরতে চায় বুঝি সে। অচেনা হয়ে যাওয়া মানুষটাকেই আচমকা জাপটে ধরে। গোঙানির মতো শব্দ বেরোতে থাকে তার গলা দিয়ে। তার পরই কত মুহূর্তের জমাট কান্নায় ফেটে পড়ে তার চারপাশের বাতাস।
নীনার ঘাড়ে মাথা গুঁজে আছে জিতা। কান্নার বেগে কাঁপছে ওর কতদিন ধরে অসম্মানিত শরীর! ওর অপমানিত মন! নীনার কামিজের কাঁধ ভিজে যাচ্ছে। পাতলা দুটো ঠোঁটে সামান্য হাসি। নির্মম অথচ সহৃদয় মানুষরাই শুধু এমন হাসি হাসতে পারে।
“তোর সব আছে জিতা। ফ্রেয়ার উগ্র একটা বাঁচার জেদ ছাড়া আর কিচ্ছু ছিল না কখনও। ব্রোকেন ফ্যামিলিতে বড় হওয়া। নিতান্তই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার। নিজের বাবার মুখটাও মনে পড়ে না। ফ্রেয়ার তিন বছর বয়সে লোকটা ওর মাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে। মা এক ভেন্ডারকে বিয়ে করেছিল। তার আবার আগের বৌয়ের ছেলে ছিল একটা। ফ্রেয়ার চেয়ে অনেকটাই বড়।

সেই হাফ ব্রাদার অত্যাচার করেছে ওকে বার বার। শি ওয়জ় আ ব্রাইট স্টুডেন্ট। কিন্তু ওর মা মারা যাওয়ার সময় ওর বয়স ছিল মাত্র পনেরো। আর লেখাপড়া হয়নি। ভেবে দেখ, তখন থেকে দুনিয়ায় এক্কেবারে একলা একটা মেয়ে! মেডের কাজ করে পেট চালিয়েছে। ও সামনে দেখেছিল একজন প্রিন্স চার্মিংকে। ইন্ডিয়ার কোনও রাজপরিবারের উত্তরসূরি নাকি। প্যালেশিয়াল বিল্ডিং, মার্বল ফ্লোরিং, ফিটন গাড়ি, সিলভার কাটলারি, ডায়মন্ড নেকলেস, গ্র্যান্ড ওয়েডিং— গল্প শুনে শুনে ও নিজেকে এক আশ্চর্য উৎসবের কেন্দ্রবিন্দুতে দেখতে পাচ্ছিল। আর সেই দেখাটাকে বিশ্বাস করেছিল। ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছিল। তুই একবারটি নিজেকে ফ্রেয়ার জায়গায় রাখ জিতা। ওর নিরাপত্তার চাহিদা কি খুব অন্যায় ছিল সেদিন?”

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে জিতা। কঠিন ঘৃণা আড়াল করে দেয় অনেক বাস্তবকে। একটি কাহিনির অন্য দিক, যা নিয়ে কখনওই ভাবেনি, তাকে ও যেন সামান্য ধরতে পারছে।

বরফের মতো ঠান্ডা নীনার স্বর, “শোন তারপর। জীবন পিটিয়ে পিটিয়ে গড়েছিল মেয়েটাকে। ওকে যে ঠকানো হয়েছিল, সেটা বুঝতেও ওর বেশ কিছুদিন কেটে গিয়েছিল। এক সময় জানতে পারল যে ও কনসিভ করেছে। বুঝতেই পারছিস, ওই অবস্থায় ওর পক্ষে ইন্ডিয়ায় আসা, ঘেন্নার লড়াইটাকে নিজের মতো করে লড়া কতখানি শক্ত ছিল! কিন্তু ও স্কাউন্ড্রেলটাকে খানিকটা শাস্তি দিতে পেরেছিল শেষ পর্যন্ত। তখন ও ফাইন্যানশিয়ালি স্টেবল, কিন্তু স্থিতি আসেনি জীবনে। সিঙ্গল পেরেন্ট হিসেবে ছেলেটাকে বড় করছিল। ছেলেটা কিন্তু হাইস্কুলে যাওয়ার আগে থেকেই একেবারে ডিট্যাচড হয়ে যাচ্ছিল মায়ের থেকে। খুব রাউডি। ফ্রেয়ার বিশ্বাস, ড্রাগ নিতে শুরু করেছিল লুকিয়ে। আঠারো বছর বয়সে ছেলেটা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। হেড ইনজুরি। স্পট ডেড। তখন ফ্রেয়া ভয়ঙ্কর ডিপ্রেশনে চলে গিয়েছিল। বাট শি ইজ় আ বর্ন ফাইটার। একটা সময়ের পর ও নিজের মধ্যে ফিরে আসছিল। বুঝেছিল, ওকে বাঁচতে হবে। কাউন্সেলিং করাত নিয়মিত। ক্রমশ অনেক সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজ়েশন, এনজিও-র সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। সেই সূত্রে আমাদের পরিচয়। সায়নদেবের মুখটাই ও এখন ভুলে গিয়েছে। ঘৃণাকে বদলে নিয়েছে চূড়ান্ত উপেক্ষায়। জানিস, ফ্রেয়া বলেছে, ও প্রতিদিন ঘুম ভেঙে নিজেকে বলে, ‘ফ্রেয়া, আজ তোমার জীবনের শেষ দিন। ডোন্ট ওয়েস্ট ইট। তুমি যখন থাকবে না, তখনও এ পৃথিবীটা থাকবে। সেই আগামীর জন্য ভাল কিছু রেখে যাও ফ্রেয়া।’ আর তুই? তুই কী করছিস জিতা? নিজেকে প্রতিদিন নষ্ট করছিস কী অবহেলায়?” নীনা নিজের উচ্চারণের মধ্যে তীব্র ধিক্কার আনে।

জিতাকে কখনও কাঁদতে দেখেনি নীনা। আজ জিতা কাঁদছে। এত জল ছিল ওর মধ্যে? নীনা ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছে না। শুধু চিন্তিত মুখে তাকিয়ে আছে। জিতার এই আকস্মিক আবেগ কি সাময়িক? না ও কোনও স্থির ভূমিতে পৌঁছতে পারবে কখনও? কোনও নিশ্চয়তার আবহে? মনে মনে খুব নরম সুরে নীনা বলে, ‘আয়নার দিকে খোলা চোখে তাকানো অভ্যেস কর জিতা। একদিন অনেক অনেক মুখ দেখতে পাবি নিজের মুখে। অতীতকে কেউ কখনও বদলাতে পারেনি। আত্মকেন্দ্রিকতার ফাঁস দুঃখ হয়ে, আলসেমি হয়ে, হতাশা হয়ে চেপে বসছে তোর উপর প্রতিদিন। আরও শক্ত হচ্ছে ক্রমশ। ছিঁড়ে ফেল ওটা। এখনও সময় আছে। মরবি নয়তো...’

তীব্র ইচ্ছাশক্তি দিয়ে বলে চলে নিঃশব্দে। ওই মনোতরঙ্গ কি ছুঁতে পারছে জিতাকে? জিতা কি শুনতে পাচ্ছে ওই নিরুচ্চার শব্দধারা?

১৪

দেড়দিন হল ফিরেছে কমল। ওখানেই খবর পেয়ে, নীনাকে ভিডিয়ো কল করেছিল হেলসিঙ্কি এয়ারপোর্ট থেকে। চক্ষু ছানাবড়া, “আরে, তালবেড়ের সে প্রোমোটার ব্যাটা তো ফেঁসে গিয়েছে! মোবাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে আচমকা দেখি কী কাণ্ড!”

“হ্যাঁ, তাই তো দেখছি,” ভালমানুষের মতো উত্তর দিয়েছে নীনা। কমল ফোন ছাড়তে, হেসে গড়িয়েছে।

এখন ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে কমল। জেটল্যাগ পুরো কাটেনি। তবে কাল তালবেড়ে যাওয়ার প্ল্যান হয়ে রয়েছে। নীনা আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়াল ওর ঠোঁটে। একটুখানি উসখুস করল কমল। আবার তলিয়ে গেল ঘুমের মধ্যে।

নীনা পাশ থেকে উঠে বারান্দায় চলে এল। হাতে মোবাইল। গোরাদার মেসেজটা দেখল সে, ‘কাল দেখা হবে ভেবে খুব মজা লাগছে’। নীনা একটা হাসিমুখের ইমোজি পাঠিয়ে দিল।

মোটে সাড়ে এগারোটা। অপু বলেছিল, অনন্তর আজ ডিউটি আছে। কিন্তু যতই রাত হোক, নীনাদিদিকে ঠিক ফোন করবে।

নীনা সময় কাটাতে ইউটিউবে একটা ভৌতিক ভিডিয়ো খুলে বসল। যাচ্ছেতাই রকমের হাস্যকর! দেখতে দেখতে যেই তিন নম্বর হাইটা তুলেছে, তক্ষুনি অনন্তর ফোন এল। গলায় চাপা উত্তেজনা। নাচা-গানার শব্দ পিছনে। তার মানে তুমুল পার্টি চলছে এখনও। ডিউটির মধ্যিখানেই ফোন করেছে সে।

“পুকুর বুজিয়ে অবৈধ নির্মাণ করেছে বলে থানায় জয়েন্ট পিটিশন দিয়েছে দিদি ওখানকার লোকজন। দেবে না তো কী? মণ্ডলের পোয়ের উপর খচে ব্যোম হয়ে আছে সকলে। আগের মাসে অর্ধেক তৈরি ফেলাট ভেঙে সেই একটা লোক মোলো না? আর একজনের কোমরের হাড় ভাঙল? থানার বড়কত্তাকে আগেভাগে কত লাখ যেন খাইয়ে এসেছিল, ধামাচাপা দিল তারা। তা লোকের মুখ বন্ধ করবে কী করে? সকলে বলছে, কেলায়েন্টের পয়সা মেরে দু’নম্বরি মাল দিয়ে তৈরি ও সব। ইদিকে মণ্ডলের সব দিক থেকেই শনির দশা। পরিবারের সঙ্গে ফারখত হব-হব। সে বৌ বাপের বাড়ি গিয়ে উঠেছে। বধূ নির্যাতনের মামলা এনেছে। হাটে হাঁড়ি ভেঙে গিয়েছে বজ্জাতটার। তাবড় তাবড় লোক উঠে পড়ে লেগেছে ব্যাটাচ্ছেলেটার

মুখোশ খুলে দিতে। ক্যাম্প করে মাইকে বলছে সেই অবৈধ নির্মাণের কথা। ওই যে মৎস্যকন্যা ভবন গো! থানার সে ঘুষখোর বড়কত্তা সাসপেন হয়ে গ্যাচে। হাজতে যাবেই, আজ নয় কাল।"

নীনা কিছুই বলেনি। কিন্তু আগ বাড়িয়ে অনন্ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে ফোন রাখল— প্রতীক মণ্ডল গ্রেফতার হওয়া মাত্র খবর জানাবে সে দিদিকে। নীনা দেখল, গোরাদা তখনও অনলাইন। উত্তেজনায় ঘুমোতে পারছে না বুঝি বুড়ো? ফোন লাগাল সে।

"বলো হে নলিনীবালা..."

"বালা নয় মালা," শুধরে দিল নীনা। তারপর বলল, "একটা কথা বলতে চাই। যদি অনুমতি দেন।"

"নলিনী দেবী সংকুচিত? এবার দেখছি আল্পস পর্বতের গুহায় গুহায় ফজলি আমের চাষ হবে!"

নীনা কান দেয় না, "গোরাদা, নিজেই নিজেকে কতকাল আর মহত্ত্বের সিংহাসনে সমাসীন করে রাখতে চান?"

"হোয়াট ডু ইউ মিন?" তীক্ষ্ণ ক্রোধ টের পাচ্ছে নীনা। হাসি চাপল সে।

"গোরাদা, আপনি কখনও ভালবাসেননি বৌদিকে। আপনাদের মানসিক স্তর পুরোপুরি আলাদা। দুটি নারী-পুরুষ পাশাপাশি থাকলে একটা স্বাভাবিক রসায়ন কাজ করে। আপনাদের সম্পর্কটা একটা সময় অবধি এর বেশি আর কিছু হয়ে উঠতে পারেনি। দুটো মানুষ অনেকদিন একসঙ্গে থাকলে, প্রতিদিনের দেওয়া-নেওয়া জড়িয়ে এক ধরনের টান তৈরি হয়। সেভাবে সেই টানও কিন্তু নেই, অন্তত আপনার দিক থেকে। বহুদিন ধরে বৌদি অসুস্থ। আপনি ক্লান্ত সেই অসুখের ভার বইতে বইতে। মমত্ববোধও তেমন নেই আর। শুধুই দায়িত্ব। আসলে আপনি একজন হৃদয়বান স্বামীর চরিত্রে অভিনয় করে চলেছেন।"

"ইউ আর গোয়িং টু ফার নীনা। আমি কী এমন কথা বলেছি তোমাকে, যে তুমি এভাবে..." গোরাদা গলার স্বরে কাঠিন্য আনতে চেষ্টা করছেন।

নীনা জানে, বড় অসহায়তা তাঁর মধ্যে। তাই শান্তভাবে সে বলে, "আয়্যাম আ ভোরেশাস রিডার। পড়তে পড়তে এমন এক অভ্যেস তৈরি হয়েছে যে, বিটুইন দ্য লাইনস অদৃশ্য হরফগুলো অনেক সময়ই দেখতে পাই আমি। সমমনস্ক দু'জন মানুষের মধ্যে সম্পর্কে অনেক মিল থাকে, অমিলও থাকে প্রচুর। রাগ, অভিমান, কষ্ট সবই থাকে, কিন্তু তার পরেও এক আশ্রয়ও থাকে। সেই নিতান্ত দরকারি জিনিসটা আপনার নেই গোরাদা। অনেক কাল ধরে ক্রমাগত দিয়ে দিয়ে, মনের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স এখন তলানিতে। জমার ঘরে কিছু না থাকলে কেউ দিতে পারে না।"

"গোরাদা," এবার একটু নরম সুরে নীনা বলে, "বৌদির জন্য আপনি যা কিছু করছেন, প্রতি মুহূর্তের বিরক্তি জড়িয়ে থাকছে তার সঙ্গে। বৌদির পক্ষে কি এতে কোনও সম্মান আছে বলুন? ভয়ঙ্কর তিক্ততা। বার বার ঠকেছেন— ভাগ্যের কাছে, মানুষের কাছেও। লোকে ব্যবহার করেছে আপনাকে বার বার। আপনার জীবনের একমাত্র সুখ এখন নিজেকে ক্রমাগত মহান ভাবতে থাকা। কিন্তু গোরাদা, কোনও স্বাস্থ্যকর সুখ নয় এ। কর্তব্য থেকে ছুটি নিতে পারে না কেউ। কিন্তু ভেবে দেখুন, যদি কর্তব্যের সঙ্গে খুশিকে মেলানোর ম্যাজিক জানতেন! একমাত্র মানুষই তো জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শিখেই চলে। আপনার নিজের হাতে কিছু থাকলে, তবেই আপনি কাউকে দিতে পারেন। গোরাদা, আমি শুধু মানুষকে চিনেছি। আমি জেনেছি সুখ কী! সীমিত এই কয়েকটা বছরের জীবন আলো হয়ে ওঠে শুধু বন্ধুতা পেলে," শক্ত মেয়ে নীনার গলা কেঁপে যায়। নিজেকে সামলে নিয়ে আবার শুরু করে সে।

"জানেন গোরাদা, আগে আমি অনেক বেশি জাজমেন্টাল ছিলাম। কখনও ইনসেনসেটিভ। বদরাগী, অসহিষ্ণু। ইদানীং আমি ক্ষমা করতে পারি। সহ্য করতে পারি। অপছন্দের কর্তব্যগুলোও করে ফেলতে পারি অনেক সহজে। শুধু একটাই কারণে। দেরি বলে কিছু নেই এ জীবনে। আমৃত্যু সময় থাকে বন্ধু পাওয়ার... ওকে, কাল দেখা হবে।"

এই শহুরে আবাসনের কত উঁচু তলার আধুনিক ফ্ল্যাটের বিছানায় শুয়ে নীনা শুনতে পাচ্ছিল, কত দূরে কোথায় যেন বালি ছাওয়া তিরভূমিতে সমুদ্রের ঢেউ সরে যাচ্ছে। আবার ফিরে আসছে হইহই করে। সেই আসা-যাওয়ার শব্দ শুনতে শুনতে নীনার মগজের গহিনে তন্দ্রা নেমে আসছিল। একটু একটু করে মুছে যাচ্ছিল চারপাশ। হঠাৎ খুব আস্তে 'টিং' করে শব্দ মোবাইলে। মেসেজ ঢুকল। ঘুম-জড়ানো চোখে নামটা দেখে নিয়ে, নিশ্চিন্ত হল নীনা। কিন্তু খুলে আর পড়ল না এখন। নীনাদের সংস্থা থেকে পথশিশুদের জন্য একটা স্কুল তৈরির তোড়জোড় চলছে। পৃথিবীর অন্য গোলার্ধ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে সে কাজের ব্যস্ততা। ফ্রেয়া তার স্পনশরশিপের ব্যাপারে আশার খবরই দিয়েছে নিশ্চয়ই। সব সময় আশার খবরই দেয় ও। কাল দেখলেই চলবে।

এবার ঘুমোতে হবে। কাল খুব ভোরে ওঠা। ড্রাইভিঙে কমলের তুমুল উৎসাহ! জিতাকে সকাল সাতটায় রেডি থাকতে বলেছে সে নিজেই। তার কোনও আপত্তি গ্রাহ্য করা হয়নি।

নীনার তন্দ্রা জুড়ে, হাজার মানুষ হুঙ্কার দেয়। ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে যায় একটা গভীর অপরাধ। পৃথিবীর প্রাণ রসকে নষ্ট করে, সাদা পাথরে মুড়ে বানিয়ে তোলা ঝাঁ-চকচকে সেই আমোদ ভবন। ছিটকে ছিটকে পড়ে নুড়ি পাথরগুলো। কোন অতল থেকে আবার জেগে ওঠে তালবেড়ের সেই নেই-দিঘি!

রাশি রাশি শাপলা ফুল ফুটে ওঠে। ঝিলিমিলি আলোয় মৎস্যকন্যারা খেলা করে। দিঘির ঘাটে অচিন রাত নেমে আসে। সারি বেঁধে হেঁটে যায় জিতা, ফ্রেয়া, গোরাদা। আরও কত চেনা-অচেনারা। নীনা স্ক্রিপ্ট লেখে আর লেখে... লিখেই চলে... শেষ নেই যার... কমল পুরোটা শুনলে ব্যোমকে যাবে একেবারে। হুঁ হুঁ বাবা, সে হল নলিনীমালা চাটুজ্যে! ভাবা মাত্র ঘুম পেড়ে ফেলল তাকে। টেরও পেল না নীনা।

অলংকরণ: বৈশালী সরকার



Coffee কথা

জন্মলগ্ন থেকে যৌবন... কফির এই যাত্রাপথ কম রোমাঞ্চকর নয়! উৎপাদন থেকে নানা পদ্ধতি পেরিয়ে কফি তৈরির গল্প বিশ্লেষণে **মধুরিমা সিংহ রায়**।

টার্কিশ কফি



ম্যানুয়াল ব্রিউয়িংয়ের নানা পদ্ধতি

ঘন কফি-গাছের সারি। সেখান থেকেই বিশেষ কিছু পদ্ধতি পেরিয়ে যে পানীয়টিতে আপনি চুমুক দেবেন, তা এক কথায় আপনার শরীর-মনের প্রশান্তির অনুঘটক। কীভাবে তৈরি হয় কফি? ম্যানুয়াল ব্রিউয়িংই বা কী? কফি তেতো হবে না মিষ্টি, তা নির্ধারণ করে কে? যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যাক...

কফি তৈরির যাবতীয় টেকনিক নিয়ে বিশদ আলোচনায় কলকাতার এক জনপ্রিয় কাফের সহ-কর্ণধার ও রোস্টার **অভিনব কুমার**। আর ম্যানুয়াল ব্রিউয়িং বোঝালেন সেখানকার অপারেশন হেড **উত্তম ঘোষ**।

কফির জন্মলগ্ন ও শৈশব

কফি মূলত বছরে একবার উৎপাদিত শস্য, অর্থাৎ সিঙ্গল ক্রপ। নভেম্বর থেকে ফলন শুরু হয় কফির। ‘অ্যারাবিকা’ আর ‘রোবাস্টা’, এই দু’ধরনের কফিগাছের মধ্যে রোবাস্টা উচ্চতায় একটু বেশিই লম্বা হয়। অ্যারাবিকা অনেকটা গুল্মের মতো দেখতে। একটি কফি চেরি (কফি বিন যার ভিতরে থাকে, ফলের মতো দেখতে) কাঁচা অবস্থায় বাইরে থেকে সবুজ রঙের, সাদা মাংসল অংশ ও ভিতরে কফি বিন...এমনই দেখতে। চেরি পাকতে শুরু করলে লালচে হয়। তখন শুরু হয় ‘প্লাকিং’ বা ফসল তোলা। এরপরে করা হয় ‘গ্রেডিং’, যেখানে অ-পরিপক্ব চেরি বা ছোট চেরি ফেলে দিয়ে পরিপুষ্ট চেরিগুলিকে বেছে নেওয়া হয়। ধুয়ে, চেরিগুলিকে ‘ডি-পাল্প’ করা হয়। অর্থাৎ, ওয়াটার ক্রাশারের মাধ্যমে চেরি থেকে কফি বিন আলাদা করা হয়। আর চেরির স্কিন বা ছাল পরিণত হয় ‘কাস্কারা’য়। রোদে শুকিয়ে নিলে এটিই ‘র কাস্কারা’। আলাদা করে রাখা বিনগুলিকে দু’ভাগে ভাগ করা যায়: সান ড্রায়েড বিনস (রোদে শুকিয়ে নেওয়া) ও হানি সান ড্রায়েড বিন (কফি বিনের উপরে একটু মাংসল অংশ রেখে দেওয়া হয়)। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কফি বিনের স্বাদে একটু মিষ্টত্ব থাকে। এই বিনকে রোস্ট করলে কফিতে ফলের স্বাদ পাবেন।

কফি বিনের জন্ম হওয়ার পরে বিভিন্ন প্লান্টেশন সেন্টার থেকে তা চলে যায় বিভিন্ন প্রান্তে। সরাসরি রোস্টারদের কাছে পাঠালে, কাঁচা কফি বিনই পাঠানো হয়। আর বাকিদের ‘প্রসেসড কফি’



বালিতে তৈরি হচ্ছে টার্কিশ কফি



ক্র্যানবেরি লাইম কফি টনিক

কোল্ড ব্রিউয়ের চাহিদা কাফেগুলিতে বেশ বেশি। রোস্টেড কফি, ঠান্ডা জল, বরফ আর ফলের রসের মিশ্রণে তৈরি ফিউশন কফি এককথায় রিফ্রেশিং।

পাঠানো হয়। প্রসেসিংয়ের পদ্ধতি কীরকম? কফি বিনগুলিকে সাধারণত পাটের বস্তায় ভরে রাখা হয়, প্লাস্টিকের লাইনিং থাকে তাতে। কারণ, কফি খুব দ্রুত আর্দ্রতা ধরে নেয় নিজের মধ্যে। ফলে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই, প্লান্টেশনের সময়ে সবুজ কফি বিনগুলিকে 'ফারমেন্ট' করা হয়। বুঝতেই পারছেন, কফির জন্মলগ্নেই যদি তার মধ্যে অতিরিক্ত গুণ ভরে দেওয়া যায়, তাহলে বিক্রয়মূল্যও ভাল পাওয়া যাবে। আর ফ্লেভারও উন্নত হবে। 'ইস্ট ফারমেন্টেশন', 'কার্বনিক ফারমেন্টেশন' বা স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেও কিছু দিন ধরে ফারমেন্ট করা হয়।

রোস্টিংয়ের খুঁটিনাটি

এবার আসি রোস্টিংয়ের কথায়। 'রোস্ট প্রোফাইল' অনুযায়ী স্থানীয় রোস্টাররা কফি রোস্টিং করেন। যেমন ধরুন, কলকাতায় মানুষ একটু ফ্লেভারড কফি পছন্দ করেন। দক্ষিণের মানুষ অনেক বেশি তেতো কফি পছন্দ করেন। অ্যারাবিকা একটু বেশিই স্বাদু, ফ্লেভারফুল। রোবাস্টা অনেক বেশি 'বোল্ড'! রোস্টিং মেশিন মূলত দু'ধরনের: ম্যানুয়াল রোস্টিং মেশিন (যদি বাড়িতে অল্প পরিমাণে রোস্ট করেন) ও কমার্শিয়াল রোস্টিং মেশিন। সেমি অটোমেটিক কমার্শিয়াল মেশিনের জন্য গ্যাস সিলিন্ডার ও বিদ্যুৎ সংযোগ জরুরি। মিডিয়াম,



অভিনব কুমার ও উত্তম ঘোষ

''আমরা মূলত নান্দিপুরা ও রিওয়াড়া-র কফি ব্যবহার করি। হারভেস্টিং, গ্রেডিং থেকে শুরু করে প্রোমোশন... সবেতেই আমরা তাদের সঙ্গে থাকি। যে রাজ্য থেকে আপনার কফি আসছে, সে রাজ্যেরও তো প্রচার প্রাপ্য! আমরা নিজেরাই রোস্টার, তাই গ্রাহকের পছন্দমতো রোস্ট প্রোফাইল ঠিক করি আমরা। ডেনমার্ক থেকে আনা রোস্টিং মেশিন আছে আমাদের।''



পোর ওভার টেকনিক



রোস্টিংয়ের প্রক্রিয়া



ব্লেন্ডিং

প্রায় তিন শতক ধরে কফি উৎপাদক রাজ্য হিসেবে কর্নাটকের চিকমাগলুর বিখ্যাত। সেখানকার রিওয়াড়া এস্টেটের কফি বিন সিঙ্গল ওরিজিন, যত্ন নিয়ে বাছাই করা। নান্দিপুরা এস্টেটের বিনে ফলের স্বাদ।



চিকমাগলুরের কফি চেরি উৎপাদন

ডার্ক না লাইট রোস্ট...কী চাইছেন তা আগে ঠিক করে নিতে হয়। সেই অনুযায়ী যন্ত্রটি তাপমাত্রা ও সময় নির্ধারণ করে নেয়। সাধারণত ১৫-১৮ মিনিট লাগে কফি রোস্ট হতে। রোস্টেড কফি এক মাসের মধ্যে খেয়ে নিলেই ভাল। নয়তো তার সুগন্ধ কমতে থাকে।

অ্যারাবিকা-রোবাস্টার মিশ্রণ

ঠিক কী পরিমাণে অ্যারাবিকা ও রোবাস্টা মিশিয়ে আপনার ব্ল্যাক বা মিল্ক কফি তৈরি করবেন, তা নির্ভর করে ‘ব্লেন্ডিং’য়ের প্রক্রিয়ার উপর। ম্যানুয়াল ব্রিউয়িংয়ের ক্ষেত্রে অনেকেই ১০০ শতাংশ অ্যারাবিকা ব্যবহার করেন। কাপুচিনো, লাতে, আইসড ফ্রাপের মতো দুধ-কফি তৈরি করতে গেলে দু’ধরনের কফির মিশ্রণ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শুধু অ্যারাবিকা গ্রাইন্ড করলে কিন্তু দুধের স্বাদ পাবেন, কফির স্বাদ পাবেন না! তবে দু’টিকে ঠিক কী অনুপাতে মেশাবেন, তার কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। অ্যারাবিকার দাম সাধারণত রোবাস্টার তুলনায় বেশি। আবার এক এক জায়গায় ক্রেতাদের জিভের স্বাদও আলাদা। তাই, বিভিন্ন কাফেতে ব্লেন্ডিং টেকনিকও আলাদা। তবে ম্যানুয়াল ব্রিউয়িংয়ে শুধুই অ্যারাবিকা লাগে, কারণ যাঁরা এরকম কফি খেতে চান তাঁরা কফির স্বাদ-গন্ধ পুরোপুরি উপভোগ করতে চান। আর এমন মানুষও আছেন, যাঁরা একশো শতাংশ (খুব স্ট্রং) রোবাস্টা কফি খেতে চান। ব্লেন্ডিংয়ের পরের



অ্যারোপ্রেস



কফিকে গ্রাইন্ডারে দেওয়া হয়।

ঠান্ডা কফির নেপথ্যে

গুঁড়ো কফিকে কোল্ড টেকনিকের মাধ্যমে ধূমায়িত (ব্রিউ) করা হয়। কাফেতে যে ফিউশন কফি খান, তা এভাবেই তৈরি। আপনার গুঁড়ো কফিতে ব্রিউয়িং মেশিনের গরম জল পড়লে তা এসপ্রেসো। এবার এই এসপ্রেসো ব্লেন্ড দিয়ে আমেরিকানো, কাপুচিনো সবই বানাতে পারবেন। কোল্ড ব্রিউ-এর ক্ষেত্রে লাইট রোস্ট করা গুঁড়ো কফিকে ঠান্ডা জল ও বরফের মিশ্রণে ডুবিয়ে রাখা হয়। ছেঁকে নিলে কোল্ড ব্রিউ তৈরি। এ ধরনের কফি অ্যাসিডিক হয় কম, কাফেনও কম। আমেরিকানো বা কাপুচিনো দু'কাপ খেলে পেট ভরে যায়, কারণ ব্লোটিং হয়। ফলের রসও মেশানো যেতে পারে কোল্ড ব্রিউতে।

ম্যানুয়াল ব্রিউয়িং ও স্বাদের পার্থক্য

সব ম্যানুয়াল ব্রিউয়িং ব্ল্যাক কফির জন্য। কিন্তু পদ্ধতিগত পার্থক্যের ফলে, কফির স্বাদে-গন্ধে তারতম্য হয়। অ্যারোপ্রেস, ফ্রেঞ্চ প্রেস, পোর ওভার, সাইফন হল নানা রকমের ব্রিউয়িং পদ্ধতি। পোর ওভারের ক্ষেত্রে বিশেষ যন্ত্রের মধ্যে ফিল্টার পেপার রেখে তাতে গুঁড়ো কফি দেওয়া হয়, গরম জল ঢালা হয়। কফি খুব একটা স্ট্রং হয় না এক্ষেত্রে। অ্যারোপ্রেস অনেক বেশি বোল্ড, আবার ফ্রেঞ্চ প্রেসে কফির গন্ধ তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে বিশেষ যন্ত্রে কফি গুঁড়ো ও জল ভরে উপর থেকে হাত দিয়ে চাপ দেওয়া হয়।

কেমেক্স

সাইফন হল বিজ্ঞানসম্মত টেকনিক, নীচের ফানেলের তলায় আগুন জ্বালানো হয়। তাতেই গরম হয় কফি। নীচের ফানেলের উষ্ণতা বাড়লে উপরের ফানেলটি তৈরি কফিতে পরিপূর্ণ হতে থাকে। রয়েছে টার্কিশ কফি। তুর্কির রাজারা বালিতে কফি গরম করতেন! এখন বিশেষ ব্রিউয়িং মেশিনের উপরে বালি ছড়িয়ে তার উপর অল্প অল্প করে কফি ও গরম জল দিয়ে ফোটানো হয়। বালিতেই ভাপে কফি।

নানা ধরনের অফবিট কফির ব্যাপারে জানালেন আর এক কাফের কর্ণধার **সোনিকা দে।**



সোনিকা দে

''আমাদের এখানেই রোস্টার আছে। লাইট, মিডিয়াম ও ডার্ক, তিন ধরনের রোস্টই করি। আমার এখানে যাঁরা আসেন, তাঁরা মিডিয়াম টু ডার্ক রোস্ট পছন্দ করেন। একটু তেতো কফি পছন্দ করেন! কোল্ড ব্রিউ ও সাইফন বেশ জনপ্রিয়।''

কফি মানেই কি শুধু চেনা কাপুচিনো, লাতে, আমেরিকানো বা এসপ্রেসো শট? এর বাইরেও নানা পদ্ধতিতে তৈরি হওয়া কফির জনপ্রিয়তা বাড়ছে এ শহরে:

মোকাপট: কনসেনট্রেটেড কফি তৈরির পদ্ধতি। এসপ্রেসো আর ড্রিপিং পদ্ধতিতে তৈরি কফির মাঝামাঝি এই পদ্ধতি। সকালের স্ট্রং কফি চাইলে, এই পট কিনে বানাতে পারেন কফি।

সাইফন: এটি একধরনের ব্রিউয়িং পদ্ধতি যাতে কফি ও ফুটন্ত জল মিশিয়ে বিশেষ যন্ত্রে ঢালা হয়। নীচের আগুনের বাষ্পে কফি গিয়ে জমে উপরের ফানেলে।

কেমেক্স: এটি একধরনের পোর-ওভার পদ্ধতি। কফি পটের মধ্যে ফিল্টার পেপার রেখে তাতে কফি গুঁড়ো ও গরম জল ঢালা হয়।

কাস্কারা: সান ড্রায়েড কফি চেরিকে ঠান্ডা জলে ব্রিউ করা হয়। প্রায় ২৪ ঘণ্টা রাখার পরে অ্যাপল সাইডার মেশানো হয়। মানে, কাস্কারাতে একটু অভিনবত্ব আনা, অ্যাপল সাইডার কাস্কারা।

তিরামিসু কাপুচিনো: সাধারণ কাপুচিনোতে তিরামিসু ফ্লেভার মেশালে তার স্বাদ বেড়ে যায় বহুগুণ।

তাহলে গরম বা ঠান্ডা...এক কাপ কফি হয়ে যাক?

যোগাযোগ:
অভিনব কুমার ও উত্তম ঘোষ, 'ক্রাফট কফি এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার': ৯১৪৭০৯৭৭৮০
(প্রথম চার পাতার ছবি ও শেষে ফ্লেভারড কফি)
সোনিকা দে, 'বুনাফিল' : ৮৮২০২৩১৫৬৩ (বাকি ছবি)

ছবি: চিরঞ্জীব বণিক
সহযোগী: দ্যুতিমান রায়



অ্যাপল সাইডার কাস্কারা

অ্যাপে ফিটনেস চর্চা

ফিজ়িক্যালি অ্যাক্টিভ থাকুন ফিটনেস অ্যাপের সাহায্যে। আলোচনায় ফিটনেস ট্রেনার ও ইনফ্লুয়েন্সর **সঞ্জনা দত্ত গুপ্ত**। লিখছেন **পৃথা বসু**।



আজকের ব্যস্ত জীবনে নিজেদের যত্ন অনেক সময়ই থাকে ব্যাকফুটে। এই সমস্যার সমাধান নিয়েই হাজির ফিটনেস অ্যাপ। বিশেষ করে যাঁরা দিনের বেশিরভাগ সময়টা ঘরেই কাটান, তাঁদের জন্য এই অ্যাপগুলো অত্যন্ত উপকারী। অতিমারির পর এই অ্যাপগুলোর জনপ্রিয়তা আরও বেড়েছে। নিয়মিত ফিজ়িক্যাল অ্যাক্টিভিটির মধ্যে থাকলে স্ট্যামিনা বাড়বে। যার ফলে বাড়বে ইমিউনিটি। আর এখানেই রয়েছে ফিটনেস অ্যাপগুলোর ভূমিকা।

ফিটনেস অ্যাপ ও ট্র্যাকার

ফিটনেস অ্যাপগুলোর মূল কাজ, আপনাকে সারাদিন অ্যাক্টিভ থাকতে সাহায্য করা। যদি আপনি নিয়মিত তা করতে পারেন, তাহলে একদিকে যেমন কার্ডিয়ো ভাসকুলার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, অন্যদিকে ঘামের মাধ্যমে অনেকাংশেই দূর হবে টক্সিন। যার ফলে ত্বকও সতেজ হয়ে উঠবে। ঝিমুনিভাব আসবে না। সারা দিন থাকবেন এনার্জেটিক। আগের ফিটনেস অ্যাপ বা গ্যাজেটগুলো শুধু স্টেপসের হিসেব রাখত। এখন এগুলোর কার্যকারিতা আরও প্রসারিত হয়েছে। স্টেপসের পাশাপাশি সারাদিনে আপনি কী কী অ্যাক্টিভিটি করছেন, তার হিসেবও থাকে অ্যাপগুলোয়। 'বিটফিট', 'গারমিন'— এই অ্যাপগুলো এক্ষেত্রে খুবই ভাল। সাধারণ স্মার্ট ফোনের জন্য 'স্ট্রাভা' ভাল। অন্য যে কোনও ফিটনেস অ্যাপের মতো এতেও রয়েছে জিপিএস। এরপর আপনি দৌড়ন, সাইক্লিং করুন বা হাঁটুন, অ্যাপ তার ট্র্যাক রাখবে। এমনকি আপনি কোথায়, কত দূর সাইক্লিং বা সুইমিং করলেন, তাও বলে দেবে। যোগ ব্যায়াম ও মেডিটেশনের জন্যও রয়েছে নানা ধরনের অ্যাপ।

নিউট্রিশন ও হাইড্রেশন অ্যাপ

কথায় বলে 'অ্যাবস আর মেড ইন দ্য কিচেন'। অর্থাৎ সুস্থ শরীর পেতে এক্সারসাইজ়ের পাশাপাশি সঠিক ডায়েটও জরুরি। রয়েছে 'বডি ফাস্ট অ্যাপ', 'প্লেটজয়'-এর মতো বিভিন্ন ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং অ্যাপ ও নিউট্রিশন অ্যাপ। আপনার বডি মাস ইনডেক্স অনুযায়ী আপনাকে নিউট্রিশন





■ পেট ভর্তি অবস্থাতেও এক্সারসাইজ় করবেন না, আবার একেবারে খালি পেটেও ওয়র্কআউট করবেন না। এক্সারসাইজ়ের আগে এক মুঠো বাদাম, দুটো খেঁজুর বা একটা কলা খেতে পারেন।

■ ফিটনেস অ্যাপগুলোয় নিজের সঠিক তথ্য দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর উপরই নির্ভর করছে সমগ্র প্রক্রিয়াটি।

বিএমআই অনুযায়ী নিউট্রিশন অ্যাপগুলো বলে দেবে, আপনার শরীরে কতটা ক্যালরি কমানো বা বাড়ানো প্রয়োজন। এমনকি কিছু কিছু অ্যাপ বলে দেবে রেসিপিও।

অ্যাপগুলো বলে দেবে, আপনার শরীরে কোন উপাদানের অভাব রয়েছে এবং তার জন্য কতটা ক্যালরি কমানো বা বাড়ানো প্রয়োজন। এমনকি কিছু কিছু অ্যাপ বলে দেবে রেসিপিও। কত পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট বা প্রোটিন গ্রহণ করলেন, তারও ট্র্যাক রাখবে। প্রাপ্তবয়স্কদের দিনে অন্তত ৩-৪ লিটার জল খাওয়া উচিত। রয়েছে হাইড্রেশন অ্যাপ, যা একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর আপনাকে মনে করিয়ে দেবে, এখন জল খাওয়া প্রয়োজন। যেমন 'ওয়াটার লামা', 'ওয়াটার মাইন্ডার'।

স্লিপ মনিটরিং অ্যাপ

কতখানি ঘুমোলেন, আরও কতখানি দরকার, সেই হিসেব দেয় স্লিপ কাউন্টিং অ্যাপ। ঘুমোতে যাওয়ার ও ঘুম থেকে ওঠার সময় সেট করে দিন অ্যাপে। সেই সময় আপনার ঘুমের প্যাটার্ন কখন কীরকম ছিল, বলে দেবে এই অ্যাপ। রেস্টিং হার্ট রেটও পরিমাপ করবে এটি। তবে এর জন্য প্রয়োজন স্মার্ট ওয়াচ। 'স্লিপ স্কোর', 'স্লিপ সাইকেল' এক্ষেত্রে খুবই ভাল।

NEAT প্রসঙ্গ

দিনের কিছু সময় এক্সারসাইজ় ছাড়াই ক্যালরি বার্ন হয়, তাকে বলে NEAT বা নন এক্সারসাইজ় অ্যাক্টিভিটি থার্মোজেনেসিস। ফিটনেস অ্যাপগুলোয় এক্ষেত্রেও অ্যালার্ম সেট করা যায়। এর মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট সময় পর আপনি জানবেন, এই নিট টাইম দীর্ঘতর হচ্ছে। কাজেই আপনার এবার কিছু অ্যাক্টিভিটি করা প্রয়োজন। এবং সেটা আপনার গোটা দিনের জন্য নির্ধারিত অ্যাক্টিভিটির নিরিখেই। অর্থাৎ ধরা যাক, সারা দিনে আপনার ৮০০ স্টেপ কমপ্লিট করার কথা। শেষ হতে আর হয়তো ২০০ স্টেপ বাকি। দীর্ঘ ক্ষণ নিট টাইমের শেষে অ্যালার্মের মারফত আপনাকে সেই কথাই জানান দেবে অ্যাপ।

অ্যাক্টিভিটি সংক্রান্ত

শুরুর আগে: অ্যাক্টিভিটি শুরুর আগে ওয়ার্ম আপ এবং শেষে কুল ডাউন ও স্ট্রেচিং— এই তিনটে বিষয় যেন কোনওভাবেই বাদ না যায়। নিয়মিত ব্রিদিং এক্সারসাইজ় অভ্যেস করুন।

খাওয়াদাওয়া: দিনে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল খেতেই হবে। খেতে পারেন ফ্লুইডও। সকালবেলা প্ল্যান বেসড প্রোটিন পাউডার বা বিসিএএ জলে গুলে খেতে পারেন। এতে শরীরে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সঠিক মাত্রা বজায় থাকবে। স্বাস্থ্যকর ও সুষম খাবার খান। জাঙ্ক ফুড এড়িয়ে চলুন।

নির্ভুল তথ্য: ফিটনেস অ্যাপগুলোয় নিজের সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন উচ্চতা, ওজন, শারীরিক কোনও অসুস্থতা থাকলে সেই সম্পর্কিত বিবরণ ইত্যাদি। এর উপরই নির্ভর করছে সমগ্র প্রক্রিয়াটি। কার্ডিয়ো ভাসকুলার এনডিয়োরেন্স, মাসকিউলার এনডিয়োরেন্স, স্ট্যামিনা এনডিয়োরেন্স, ফ্লেক্সিবিলিটি এবং মাসল এনডিয়োরেন্স— এইগুলোর উপরই নির্ভর করে আপনার ফিটনেসের মাত্রা। সেই অনুসারেই অ্যাপ নির্ধারণ করবে অ্যাক্টিভিটি রুটিন।

ওয়েট লিফটিং: অনেক মহিলাই ওয়েট লিফটিং এড়িয়ে চলেন। একটা বয়সের পর ট্রাইসেপসের মাসল আলগা হয়ে ঝুলে পড়ে। মা হওয়ার পর অনেকের তলপেটের অংশ বা ব্রেস্ট ফ্ল্যাবি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ওয়েট লিফটিং কার্যকরী। শরীরের যে অংশ টোনড করতে চান, সেই তথ্য অ্যাপে লিখলে ওয়েট লিফটিংয়ের পরামর্শ দেওয়া হয় অনেক সময়। আপনার কাছে যদি ওয়েট লিফটের উপযুক্ত সামগ্রী না থাকে, তাহলে দুটো এক লিটারের ভর্তি বোতল নিয়েও ওয়েট লিফট করতে পারেন।





ফাংশনাল ট্রেনিং: এক্সারসাইজ় করার সময় একান্তই না পেলে বেছে নিতে পারেন ফাংশনাল ট্রেনিং। রোজকার কাজে যে বডি মাসলগুলো ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর নিয়মিত অভ্যেসই হল ফাংশনাল ট্রেনিং। নিজের ঘর পরিষ্কার করাও কিন্তু এর মধ্যেই পড়ে।

'সবে মিলি...': একা একা এক্সারসাইজ় করার বদলে যদি একসঙ্গে অনেকে মিলে করা যায়, তবে তা নিঃসন্দেহে আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। অ্যাপে তো বটেই, ইউটিউবেও অনেক গ্রুপ অ্যাক্টিভিটি বা ডান্সের ভিডিয়ো থাকে। ব্যবহার করতে পারেন সেগুলোও।

মাইন্ডফুলি করুন: যেহেতু আপনি গোটাটাই অ্যাপ দেখে নিজে নিজে করছেন, তাই যোগব্যায়াম বা এক্সারসাইজ়ের সময় সঠিক পশ্চার হচ্ছে কিনা, খেয়াল রাখুন। হুজুগে পড়ে প্রথম দিনই অনেক এক্সারসাইজ় করে ফেললেন, এমনটা করবেন না। এতে কিন্তু হিতে বিপরীত হতে হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

মনে রাখুন কয়েকটা বিষয়

- অ্যাপ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। রিভিউ, রেটিং দেখে বাছুন। মাইন্ডফুলি অ্যাপকে কাজে লাগান।
- আপনার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সব সমস্যা অ্যাপের মাধ্যমে সমাধান হবে না। তাই প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
- পেট ভর্তি অবস্থায় এক্সারসাইজ় করবেন না। আবার খালি পেটেও এক্সারসাইজ় করবেন না।
- ওয়র্কআউটের পর পর্যাপ্ত জল ও প্রোটিন ইনটেক করা জরুরি। সাধারণত ওজনের দ্বিগুণ পরিমাণ প্রোটিন আমাদের শরীরে দরকার হয়।
- এক্সারসাইজ়ের সঠিক পশ্চার ও টেকনিক একান্ত জরুরি।
- পর্যাপ্ত ঘুম প্রয়োজনীয়। রাত্রে খাওয়ার অন্তত আড়াই-তিন ঘণ্টা পর ঘুমোতে যান। এতে অবাঞ্ছিত মেদ অনেকটাই এড়ানো যাবে।
- অ্যাপ কেবল আপনাকে গাইড করবে। আসল কাজ কিন্তু আপনারই।
- সর্বোপরি জরুরি সুশৃঙ্খল জীবন যাপন।

নিজেকে অ্যাক্টিভ রাখুন আজ থেকেই। মনে রাখতে হবে, ফিটনেস কোনও গন্তব্য নয়, এটা একটা জার্নি। আর এই জার্নিই সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে এই অ্যাপগুলি।

যোগাযোগ: fitreatby_sanjana
ছবি সৌজন্যে: আইস্টক

ফিটনেস অ্যাপ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। রিভিউ, রেটিং দেখে বাছুন। মাইন্ডফুলি অ্যাপকে কাজে লাগান।



পুজোর খাওয়াদাওয়ায় মাছ থাকবে না— এমন অদ্ভুত কথা বাংলায় কি আর শোনা যায়! ভারতের দক্ষিণ ও উপকূল অঞ্চলেও মাছের রেসিপি খুব একটা কম নেই। বরং পশ্চিমবাংলা, বিহার, ওড়িশার পাশাপাশি দক্ষিণ ও উপকূলীয় অঞ্চল মাছের ভিন্ন স্বাদের রেসিপির জন্য সব সময়ই বিখ্যাত। কোস্টাল এলাকায় ব্যাঙ্গদিয়াচে আমবাত কালোয়ান, মালবানি ফিশ কারি, পত্রানি মচ্ছি উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণের মীন কুলাম্বু, চেট্টিনাড় ফিশ কারি, মীন মইলি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এবারের পুজোয় এই রেসিপি চেখে দেখতেই পারেন।

নানা রাজ্যের মাছের স্বাদ...

দক্ষিণ ভারত ও কোস্টাল এলাকার ভিন্ন স্বাদের মাছের রেসিপি তৈরি করলেন **হোমশেফ দেবারতি রায়** ও **রিনিমা পাল**। সংকলনে **দেবলীনা অধিকারী**।

প্রন বালচাও (গোয়া)

■ **উপকরণ:** চিংড়ি ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ২টো (কুচি), টমেটো ২টো, আদা-রসুন বাটা, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, সর্ষে গুঁড়ো (সব মশলা ১ চা-চামচ করে), দারচিনি ১টা (ইঞ্চি), লবঙ্গ ৩টে, আখের গুঁড়ো ১ চা-চামচ, হলুদ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, তেল পরিমাণমতো।

■ **প্রণালী:** চিংড়ি ধুয়ে, খোসা ছাড়ান। নুন, হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরিলঙ্কা গুঁড়ো মাখিয়ে রেখে দিন। শুকনো মশলাগুলো তাওয়ায় ভেজে নিন। তাতে আদা, রসুন, শুকনো লঙ্কা ও ভিনিগার মিশিয়ে বেটে নিন। প্যানে চিংড়ি হালকা নাড়াচাড়া করে করে পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি ও মশলা বাটা দিয়ে কষিয়ে নিন। রুটি, ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।



প্রন বালচাও

ব্যাঙ্গদিয়াচে আমবাত কালোয়ান(মহারাষ্ট্র)

উপকরণ: কাতলা মাছ ৪টে, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, হলুদ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, নুন, তেঁতুল পাল্প ২ টেবল চামচ, কাশ্মীরি লঙ্কা ৮-১০টা, গোটা ধনে ২ টেবলচামচ, আদা ১টা (১ইঞ্চি), নারকেল কোরা ১০০ গ্রাম।



প্রণালী: প্যানে তেল দিয়ে পেঁয়াজ কুচি মাঝারি আঁচে ভাজুন। আগে থেকে জলে ভেজানো কাশ্মীরি লঙ্কা, নারকেল কোরা, আদা, ধনে বেটে নিন। প্যানে তেল দিয়ে মশলাটা কষে তেঁতুল জল ঢেলে মাছ দিন। কম আঁচে ঢাকা দিয়ে ফোটান। উপর থেকে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিন।

ব্যাঙ্গদিয়াচে আমবাত কালোয়ান

মালবানি ফিশকারি(মহারাষ্ট্র)

■ **উপকরণ:** রুই ১ কেজি, নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, শুকনো লঙ্কা ৩টে, কাশ্মীরি লঙ্কা ২টো, গোটা ধনে ১ চা-চামচ, গোটা জিরে ১ চা-চামচ, নারকেল কোরা ২ টেবলচামচ, পেঁয়াজ কুচি ১টা, রসুন কুচি ১১/২ টেবলচামচ, নুন পরিমাণমতো, হলুদ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, জল, তেল ৩ টেবলচামচ, ধনেপাতা।

■ **প্রণালী:** মাছ ধুয়ে নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো মাখিয়ে পনেরো মিনিট রাখুন। শুকনোলঙ্কা, কাশ্মীরিলঙ্কা, ধনে, জিরে, নারকেল কোরা, গোলমরিচ গুঁড়ো ও এক কাপ জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন। পেঁয়াজ ও রসুন কুচি দিয়ে মশলা বেটে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে একটা পেঁয়াজ কুচি করে কেটে ভেজে নিন। তাতে নুন ও তৈরি করা মশলা দিয়ে মাঝারি আঁচে ৫-৭ মিনিট ঢাকা দিয়ে রান্না করুন। তারপর ঢাকা খুলে, ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিন।



মালবানি ফিশকারি



কোলাপুরি ফিশ(মহারাষ্ট্র)

■ **উপকরণ:** ভেটকি মাছ ৩টে, টক দই ১/২ কাপ, হলুদ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা-চামচ, রসুন বাটা ১ টেবলচামচ, লেবুর রস ১ চা-চামচ, নারকেল কোরা ২ টেবলচামচ, গোলমরিচ ১, নুন পরিমাণমতো, তেজপাতা ১টা, দারচিনি ১টা (১ ইঞ্চি), লবঙ্গ ৪টে, তেল, কোকাম ৩-৪টে।

■ **প্রণালী:** মাছ টুকরো করে, ধুয়ে একটা পাত্রে হলুদ-লঙ্কা গুঁড়ো, রসুন বাটা, লেবুর রস, নুন মাখিয়ে রাখুন। প্যানে তেল গরম করে তেজপাতা, লবঙ্গ, দারচিনি, গোলমরিচ গুঁড়ো, পেঁয়াজ কুচি ও নারকেল কোরা দিয়ে ভাজুন। নামিয়ে ঠান্ডা করে কোকাম ভেজানো জল দিয়ে ভাজা মশলা ঠান্ডা করে বেটে নিন। মাছের গায়ে মাখিয়ে ভাজুন। আধ কাপ জল ঢেলে ঢাকা দিয়ে কম আঁচে রান্না করুন। ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

কোলাপুরি ফিশ



পত্রানি মচ্ছি(মহারাষ্ট্র)

■ **উপকরণ:** পমফ্রেট মাছ ৪টে, নারকেল কোরা ১/২ কাপ, ধনেপাতা ১ আঁটি, রসুনের কোয়া ৮-৯ টা, আদা ১টা (১ ইঞ্চি), কাঁচালঙ্কা ৭-৮টা, লেবুর রস ২ চা-চামচ, জল ১ কাপ, তেল ২ টেবল চামচ (সয়াবিন তেলও ব্যবহার করতে পারেন)।

■ **প্রণালী:** নারকেল, ধনেপাতা, রসুন, আদা, লঙ্কা, তেল ও জল দিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নিন। পমফ্রেট মাছ ভাল করে ধুয়ে মাছের মধ্যে মিশ্রণটা মাখিয়ে রাখুন। কলাপাতা ধুয়ে নিন। তারপর ভাল করে মুছে পাতার দু'দিকে সেঁকে নিন। সেঁকে নিলে পাতা ফেটে যাবে না। এবার মাছগুলো পাতায় রেখে সামান্য তেল (সয়া তেলও ব্যবহার করা যেতে পারে) দিয়ে পাতা ফোল্ড করে নিন। ৭-৮ মিনিট স্টিমারে দিয়ে ভাপিয়ে নিন।

রেসিপি সৌজন্যে: দেবারতি রায়
যোগাযোগ: ৯৪৩২৩৭০৩৫৭

পত্রানি মচ্ছি

মীন কোলাম্বু (তামিলনাড়ু)

উপকরণ: ফ্রেশ মশলার জন্য: ছোট পেঁয়াজ ৮টা, রসুনের কোয়া ২টো, টমেটো কুচি ২ টেবলচামচ, হলুদ ১ চা-চামচ,কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো ১ টেবলচামচ, কোলাম্বু গুঁড়ো ৩ টেবলচামচ, নারকেল $^{১}/_{২}$ কাপ (কুরনো), সর্ষের তেল $^{১}/_{২}$ টেবলচামচ, গোলমরিচ $^{১}/_{২}$ চা-চামচ, কারিপাতা কয়েকটা। **কোলাম্বু তৈরির জন্য:** পমফ্রেট মাছ ১ কেজি (টুকরো করা), ছোট পেঁয়াজ $^{১}/_{৪}$ কাপ (মিহি করে), আদা ১টা (থেঁতো করা), আম ৫টা (টুকরো করা), তেঁতুলের পাল্প ৪ টেবলচামচ, কাঁচা লঙ্কা ৩টে, সৈন্ধব লবণ $^{১}/_{২}$ চামচ, ফোড়নের জন্য তেল ১ টেবলচামচ, গোটা সর্ষে $^{১}/_{২}$ চা-চামচ, শুকনো লঙ্কা ৪টে, কারিপাতা কয়েকটা।

প্রণালী: মাছ প্রথমে পরিষ্কার করে নিন। মাছের গায়ে নুন ও হলুদ মাখান। তেঁতুলের পাল্প গরম জলে কিছু ক্ষণ রেখে দিন। এবার প্যানে ভাল করে তেল গরম করে নিন। তাতে গোলমরিচ দিয়ে নেড়েচেড়ে নিন। তারপর প্যানে পেঁয়াজ, রসুন, হলুদ, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা, নারকেল কোরা, মাঝারি আঁচে দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। কোলাম্বু তৈরির জন্য নেওয়া উপকরণগুলো মিশিয়ে আরও কিছু ক্ষণ ভাজতে থাকুন। মশলা শুকিয়ে এলে তাতে কিছুটা জল দিন। তেঁতুলের পাল্প, নুন, কাঁচা আম দিয়ে পরিমাণমতো জল ও মাছগুলো দিয়ে দিন। কিছু ক্ষণ অল্প আঁচে ফুটিয়ে নামিয়ে ফেলুন। শুকনো শুকনো পরিবেশন করুন।



মীন কোলাম্বু

চেট্টিনাড় ফিশ কারি (অন্ধ্র প্রদেশ)

■ **উপকরণ:** ভেটকি ৪টে, তেল ১ চা-চামচ, ধনে ১ চা-চামচ, গোলমরিচ ১ চা-চামচ, জিরে গুঁড়ো ১/২ টেবলচামচ, কারিপাতা কয়েকটা, ছোট পেঁয়াজ ৩টে (মিহি করে কাটা), শুকনো লঙ্কা ৫টা। **ফোড়নের জন্য:** তিল তেল ৩ টেবলচামচ, সর্ষের তেল ১/২ চা-চামচ, কারিপাতা কয়েকটা, কাঁচা আম ২টো, শুকনো লাল লঙ্কা ২টো। **চেট্টিনাড় তৈরির জন্য:** তেঁতুল ১/২ টেবলচামচ, ছোট পেঁয়াজ ৫টা (মিহি করে কাটা), রসুনের কোয়া ৭টা, আদা-রসুন বাটা ১/৪ কাপ, টমেটো (কুচি করা) ১টা, হলুদ গুঁড়ো, সৈন্ধব নুন ১/২ টেবলচামচ, নারকেলের দুধ ১/২ কাপ।

■ **প্রণালী:** চেট্টিনাড়ের জন্য নেওয়া ফ্রেশ মশলাগুলো একটা প্যানে তেল দিয়ে নাড়াচাড়া করে, মিক্সিতে পেস্ট করে নিন। এবার একটা মাটির হাঁড়িতে তেল গরম করে ফোড়ন দেওয়ার উপকরণগুলো একে একে দিয়ে সতে করে নিন। তেঁতুলের পাল্প ও জল মেশান। কিছু ক্ষণ ফুটিয়ে নিয়ে তাতে মাছ দিন। তারপর একে একে নারকেলের দুধ, কাঁচা আম দিয়ে ৫ মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে দিন। বেশি নাড়াচাড়া করবেন না। ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন এই দক্ষিণের রেসিপি।



চেট্টিনাড় ফিশ কারি

মীন মইলি (কেরল)

উপকরণ: ভেটকি বা বাসা মাছ ৫০০ গ্রাম নারকেল তেল ১ টেবলচামচ, কালো সর্ষে ১ চা-চামচ, কলাইয়ের ডাল ২ চা-চামচ, কারিপাতা ১ চা-চামচ, আদা ২ টেবলচামচ (জুলিয়েন করে কাটা), কাঁচা লঙ্কা ১ টেবলচামচ, পেঁয়াজ ১ চা-চামচ, নারকেলের দুধ ১০ টেবলচামচ, টমেটো পিউরি ৭০০ গ্রাম, মাছ ৪০০ গ্রাম, ধনেপাতা ২ টেবলচামচ, আদা ১ চিমটে, নুন পরিমাণমতো।

প্রণালী: একটা প্যানে নারকেল তেল দিয়ে তাতে কালো সর্ষে, কলাইয়ের ডাল ভাজুন। কারিপাতা, কাঁচা লঙ্কা, আদা, পেঁয়াজ দিয়ে ভেজে নিন। সোনালি হয়ে এলে হলুদ গুঁড়ো, নারকেলের দুধ দিয়ে অল্প আঁচে ২-৩ মিনিট রেখে দিন। তাতে একটা টমেটো দিয়ে মাছগুলো দিন। ফুটে গেলে উপর থেকে ধনেপাতা ছড়িয়ে দিন। তৈরি কেরালার মীন মইলি।



মীন মইলি

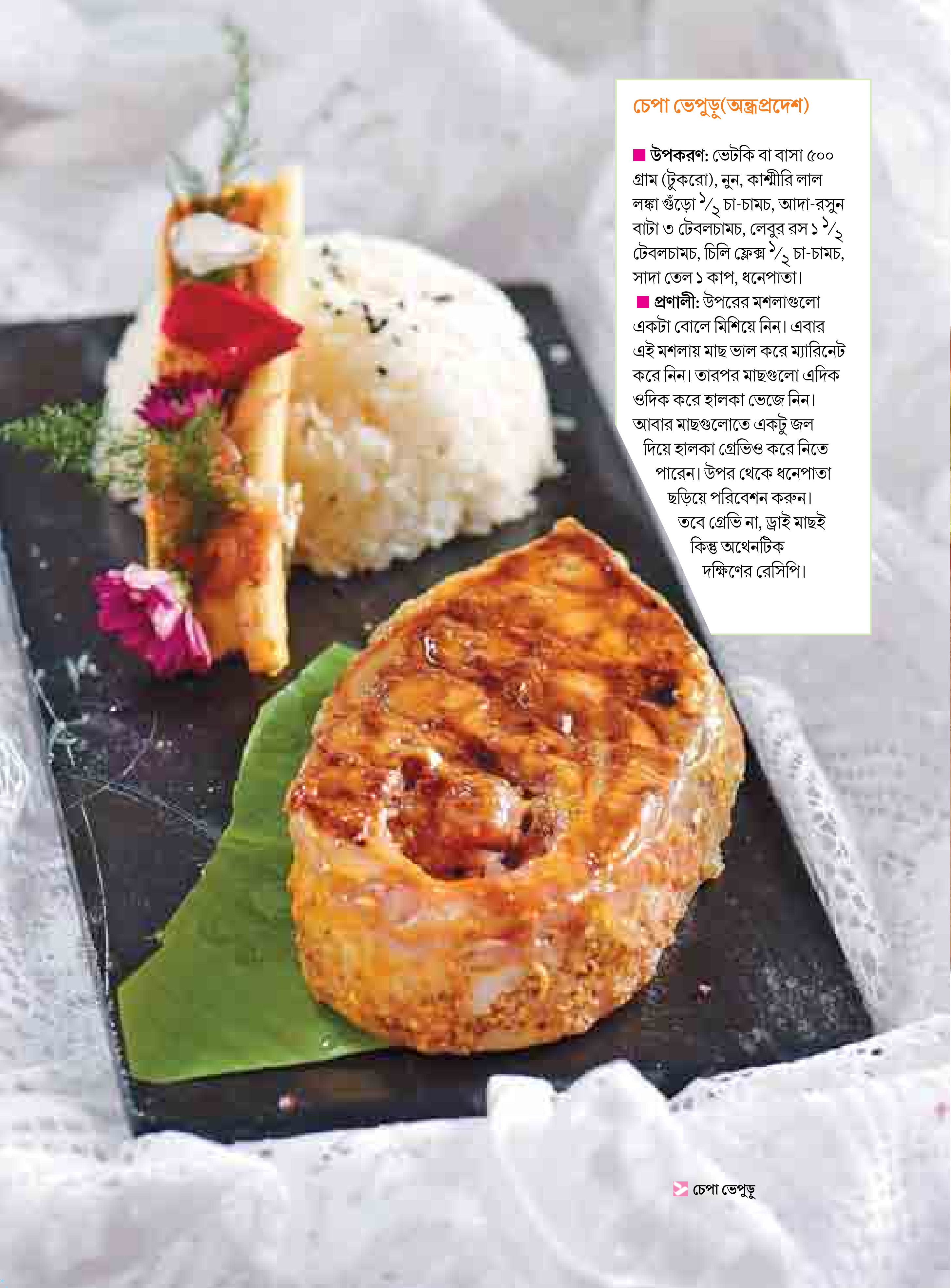


নেইমীন কারি

নেইমীন কারি (কেরল)

উপকরণ: ম্যাকারেল ৫০০ গ্রাম (টুকরো), কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো ১/২ টেবলচামচ, ধনে গুঁড়ো, রসুনের কোয়া ৮ (কুচি), আদা ১টা (কুচি), কাঁচা লঙ্কা ২টো (চেরা), গোটা সর্ষে ১ চা-চামচ, কারি পাতা কয়েকটা, নারকেল তেল ১/২ কাপ, নুন পরিমাণমতো, টমেটো ১টা।

প্রণালী: মাছ ধুয়ে রাখুন। প্যানে ঘি গরম করে, গোটা সর্ষে দিন। আদা-রসুন কুচি দিয়ে নেড়েচেড়ে কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, হলুদ মিশিয়ে অল্প আঁচে ভাজুন। জল দিয়ে ফুটতে দিন। মাছ, কারিপাতা দিন। টমেটো দিয়ে অল্প আঁচে ঢাকা দিয়ে ৪৫ মিনিট রাখলেই তৈরি কেরলের রেসিপি।



চেপা ভেপুড়ু(অন্ধ্রপ্রদেশ)

উপকরণ: ভেটকি বা বাসা ৫০০ গ্রাম (টুকরো), নুন, কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, আদা-রসুন বাটা ৩ টেবলচামচ, লেবুর রস ১ ১/২ টেবলচামচ, চিলি ফ্লেক্স ১/২ চা-চামচ, সাদা তেল ১ কাপ, ধনেপাতা।

প্রণালী: উপরের মশলাগুলো একটা বোলে মিশিয়ে নিন। এবার এই মশলায় মাছ ভাল করে ম্যারিনেট করে নিন। তারপর মাছগুলো এদিক ওদিক করে হালকা ভেজে নিন। আবার মাছগুলোতে একটু জল দিয়ে হালকা গ্রেভিও করে নিতে পারেন। উপর থেকে ধনেপাতা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। তবে গ্রেভি না, ড্রাই মাছই কিন্তু অথেনটিক দক্ষিণের রেসিপি।

চেপা ভেপুড়ু



কারিমীন পলিচেদু (কেরল)

■ **উপকরণ:** কারিমীন বা পমফ্রেট ৪টে, কাঁচা লঙ্কা ৪টে, আদা ১টা (কুচি), হলুদ গুঁড়ো ½ চা-চামচ, লাল লঙ্কা গুঁড়ো ১ টেবলচামচ, পেঁয়াজ ৫টা (কুচি), কারিপাতা ২টো, নারকেল তেল ½ কাপ, নারকেল ৩ কাপ (কুরনো), নুন, লেবুর রস।

■ **প্রণালী:** পমফ্রেট ধুয়ে, তাতে লেবুর রস ও নুন মাখান। নারকেল ও জল মিশিয়ে ছেঁকে নিয়ে নারকেলের দুধ তৈরি করে আলাদা করে রাখুন। একটা মাটির হাঁড়িতে লাল লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা ও নুন মেশান। এবার তাতে মাছ দিয়ে দিন। একটা কলাপাতায় তেল ব্রাশ করে নিন। তার মধ্যে মাছের মিশ্রণটা দিয়ে মুড়িয়ে নিন। তারপর একটা একটা করে পাতুরির মতো স্টাইলে স্টিম করে নিন। তৈরি কারিমীন পলিচেদু।

বাকি রেসিপি সৌজন্যে: রিনিমা পাল
যোগাযোগ: ৮৯৬১৮৩৫০৯৫
ছবি: শুভেন্দু চাকী
রূপায়ণ: পিয়ালী বালা

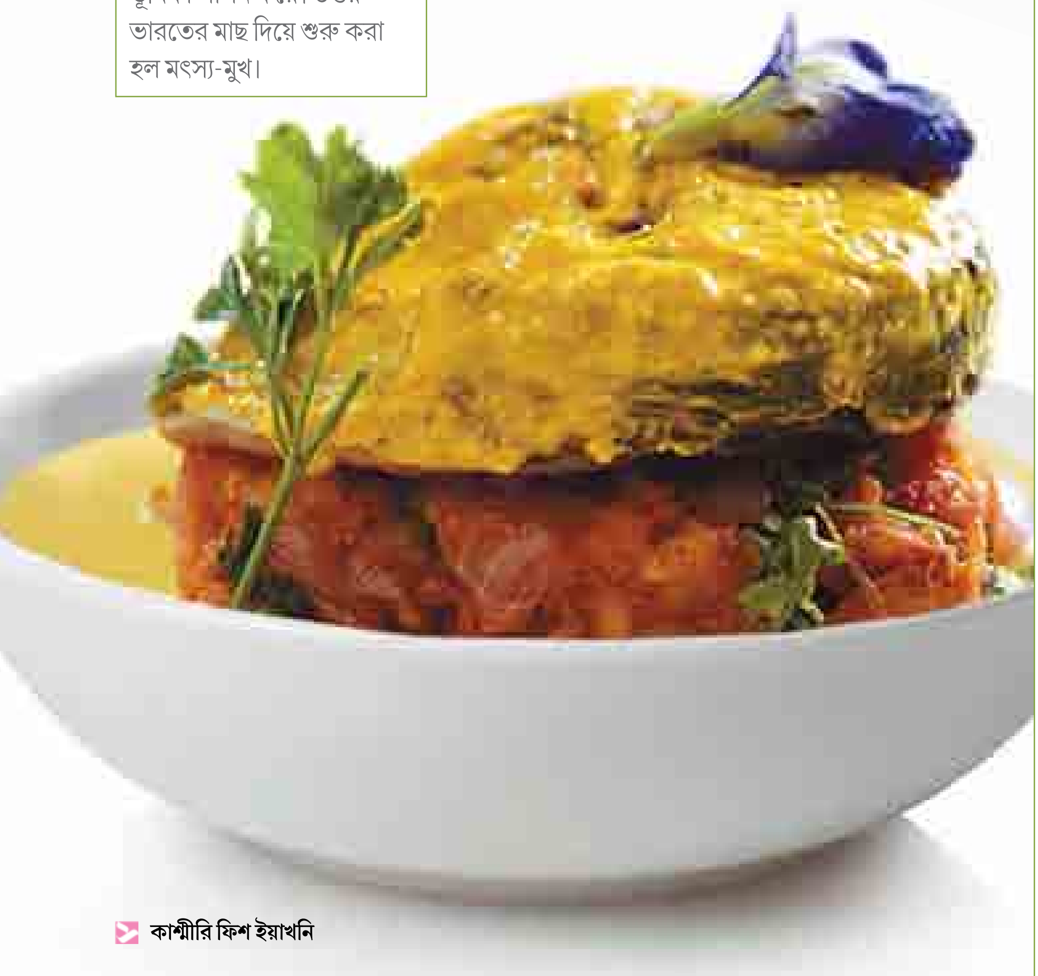
কারিমীন পলিচেদু

দুর্গাপুজো হোক বা যে কোনও উৎসবে মাছ ছাড়া বাঙালির ভোজ সম্পূর্ণ হওয়ার নয়। কড়াইয়ে ছ্যাঁক-ছ্যাঁক তেলের আওয়াজ আর মাছ ভাজার সুগন্ধ এই হল বাঙালি বাড়ির উৎসব। তবে 'মাছে ভাতে বাঙালি' বললেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ যে মাছের স্বাদ থেকে বঞ্চিত এমন ভাবার কারণ নেই। তবে সেগুলো ভিন্ন তাঁদের রন্ধনের ধরনে, স্বাদে। ভারতের উত্তরে মাছের রেসিপিতে থাকে কেশরের ছোঁয়া, হরেক রকম মশলার স্বাদ। নর্থ-ইস্টার্ন মাছ রান্নায় শুঁটকি এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। উত্তর-ভারতের মাছ দিয়ে শুরু করা হল মৎস্য-মুখ।

মাছে ভাতে...



প্রবাদ বাক্যটা অতি ব্যবহারে ক্লিশে হয়েও সত্য। তবে বাংলার বাইরে উত্তর ও উত্তর-পূর্বের মাছের রেসিপি কেমন জানালেন **হোমশেফ রিনিমা পাল ও পৃথা দত্ত**। চেখে দেখলেন **দেবলীনা অধিকারী**।



কাশ্মীরি ফিশ ইয়াখনি

কাশ্মীরি ফিশ ইয়াখনি(কাশ্মীর)

■ **উপকরণ:** ক্যাটফিশ মাছ ৫০০ গ্রাম, দই ৩৫০ গ্রাম, এলাচ ৫টা, লবঙ্গ ৩টে, দারচিনি, তেজপাতা ১টা, নুন, শুকনো লঙ্কা ২টো, লঙ্কা গুঁড়ো ২ চা-চামচ, আদা বাটা ২ চা-চামচ, হলুদ, কেশর ১ চিমটে, দুধ ৪ চা-চামচ।

■ **প্রণালী:** প্যানে ঘি গরম করে তেজপাতা, দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, শুকনো লঙ্কা দিয়ে নেড়েচেড়ে নিন। মাছগুলো ধুয়ে হলুদ, নুন, দই, শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, আদা বাটা দিয়ে ম্যারিনেট করুন। এবার প্যানে অল্প আঁচে মাছগুলো দিয়ে দিন। অল্প জল দিন। শুকনো লঙ্কা, কেশর ও দুধ মিশিয়ে কিছু ক্ষণ রান্না করে নিন।



অমৃতসরি ফিশ

পাতিয়ালা ফিশ তাওয়া (পঞ্জাব)

■ উপকরণ: টুনা মাছ ৫০০ গ্রাম, নুন পরিমাণমতো, সর্ষের তেল ১ টেবল চামচ, আদা-রসুন বাটা ১ টেবলচামচ, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, ভাজা জিরে গুঁড়ো ১ চা-চামচ, হলুদ গুঁড়ো ১ চিমটে, এলাচ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, জোয়ান ১ চা-চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, তেল পরিমাণমতো, দই ১ কাপ, বেসন ১/২ কাপ, চালের গুঁড়ো ১/২ কাপ, গরম মশলা ১/৪ টেবলচামচ, চাটমশলা ২ চা-চামচ, লেবুর রস ২ টেবলচামচ।

■ প্রণালী: শুকনো মশলার সঙ্গে মাছ ভাল করে ম্যারিনেট করে ৩০ মিনিট রেখে দিন। এবার একটা বোলের মধ্যে দই, বেসন, চালের গুঁড়ো, গরমমশলা গুঁড়ো, চাটমশলা, লেবুর রস নিন। তার মধ্যে মাছগুলো দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। এবার ম্যারিনেটেড মাছকে ফ্রেশ ক্রামে এদিক ওদিক করে নিন। একটা প্যানে কিছুটা তেল গরম করে হালকা করে ভেজে নিন।

অমৃতসরি ফিশ (পঞ্জাব)

■ উপকরণ: বাসা মাছের ফিলে ৫০০ গ্রাম (কাঁটা ছাড়িয়ে লম্বা-লম্বা বা চৌকো-চৌকো করে কেটে নেওয়া), নুন পরিমাণমতো, হিং এক চিমটে, জোয়ান ১ চা-চামচ, লেবুর রস ২ টেবলচামচ, আদা-রসুন বাটা ১/২ টেবলচামচ, দই ১ কাপ, শুকনোলঙ্কা গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, কাশ্মীরিলঙ্কা গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, ময়দা ১/২ কাপ, বেসন ১ কাপ, চাট মশলা পরিমাণমতো, ডিম ১টা, সাদা তেল পরিমাণমতো।

■ প্রণালী: প্রথমে মাছগুলোকে নুন, হলুদ, লেবুর রস মিশিয়ে আধঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখুন। তারপর আরও একটা পাত্রে ময়দা, দই, হিং, নুন, দু'রকম চিলি পাউডার এবং জোয়ান একসঙ্গে মিশিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নিন। ব্যাটারের মধ্যে ম্যারিনেট করে রাখা মাছগুলো একটা একটা করে ডুবিয়ে ছাঁকা তেলে ভেজে রাখুন। চাটমশলা ও পুদিনা পাতার সঙ্গে পরিবেশন করুন।



পাতিয়ালা ফিশ তাওয়া



পঞ্জাবি ফিশ কারি (পঞ্জাব)

■ উপকরণ: ভেটকির ফিলে ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ৩টে (কুচি), টমেটো ২টো, আদা-রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা ২ টেবলচামচ, জিরে ১ টেবলচামচ, হলুদ, ধনে গুঁড়ো, কাশ্মীরিলঙ্কা গুঁড়ো ১ টেবলচামচ, ভেজিটেবল অয়েল।

■ প্রণালী: মাছগুলোকে প্রথমে নুন-হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রাখুন। প্যানে তেল গরম করে মাঝারি আঁচে জিরে, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে সোনালি করে ভেজে নিন। আদা-রসুন বাটা ভেজে ঠান্ডা করে ব্লেন্ড করে দিন। মিশ্রণটা প্যানে নাড়াচাড়া করুন। টমেটো, কাশ্মীরিলঙ্কা ও ধনে গুঁড়ো একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন। এবার প্যানে টমেটোর মিশ্রণ দিন। তার সঙ্গে ধনে, কাশ্মীরিলঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে জল দিন। শেষে মাছগুলো দিয়ে ঢাকা দিয়ে কিছু ক্ষণ রান্না করুন।

পঞ্জাবি ফিশ কারি

পাহাড়ে ঘেরা সবুজ এই অঞ্চল। তবে বহু ক্ষেত্রেই এই প্রদেশের নিজস্বতা এত বেশি যে একে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে অনেকটাই আলাদা করে চেনা যায়। এঁদের যাপন যেমন অনেকটাই মিস্টিক, তেমনই এঁদের খাবারের স্বাদও একটু আলাদা। রুই বা ইলিশের ব্যবহার হলেও, শুঁটকি মাছের চল এই উত্তর-পূর্ব অঞ্চল জুড়ে অনেকটাই বেশি। রইল এমনই কিছু রেসিপির সন্ধান।



গুদক

গুদক (ত্রিপুরা)

উপকরণ: শিদল শুঁটকি ২টো, ফ্রেশ ব্যাম্বু শুটস ১ কাপ (কুচি), বরবটি ১টা, কাঁঠালের বীজ ১ কাপ (অর্ধেক করা), আলু ২টো (কিউব করা), রসুনের কোয়া ২টো, কাঁচালঙ্কা ৪-৫টা, নুন পরিমাণমতো, জল ৩ কাপ, ধনেপাতা, তেল পরিমাণমতো, মিক্স মশলা পরিমাণমতো।

প্রণালী: প্রথমে শিদল শুঁটকি পুড়িয়ে নিন। একটা পাত্রে ব্যাম্বু শুটস, বরবটি, কাঁঠাল বীজ, আলু, রসুন ও কাঁচালঙ্কা নিন। পোড়া শিদল মাছ গুঁড়ো করে নিন। প্রায় ৩০ মিনিট ঢাকা দিয়ে রান্না করুন। সব্জিগুলো সেদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। স্টক ছেঁকে আলাদা করে নিয়ে সব্জিগুলো একসঙ্গে ম্যাশ করে নিন। সব্জিতে যতটা ঘনত্ব পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী একটু একটু করে জল নিন। স্বাদ করে দেখে নিন নুন-ঝাল ও মশলার পরিমাণ সব ঠিক আছে কি না। যদি না থাকে, তাহলে স্বাদমতো নুন ঝাল মিষ্টি মিশিয়ে নিন। তারপর আরও পাঁচ মিনিট সব্জি রান্না করে নিন। রান্না হয়ে গেলে সাজানোর জন্য উপর থেকে ধনেপাতা ছড়িয়ে দিন। তবে অথেনটিক গুদকে মিক্স মশলা ব্যবহার করা না গেলেও স্বাদ বৃদ্ধির জন্য দিলে কিন্তু মন্দ হয় না।



ইলিশা বা প্যান গা থোংবা (মণিপুর)

■ **উপকরণ:** ইলিশ মাছ ৪ (টুকরো), মুখি কচু ২০০ গ্রাম, কাঁচা লঙ্কা ৫-৬টা (চেরা), রসুন পাতা ১ কাপ, সাতকরা লেবু ১টা (৪ টুকরো করে কাটা), হলুদ গুঁড়ো, পাঁচফোড়ন, জিরে গুঁড়ো ১ চা-চামচ করে, ধনে গুঁড়ো $^1/_2$ চা-চামচ, সর্ষের তেল $^1/_2$ কাপ, নুন।

■ **প্রণালী:** নুন ও হলুদ গুঁড়ো দিয়ে ইলিশ ম্যারিনেট করে রাখুন। প্যানে তেল গরম করে মাছগুলো হালকা করে ভাজুন। তেলে কাঁচালঙ্কা ও পাঁচফোড়ন দিন। অর্ধেক রসুন পাতা দিয়ে ২ মিনিট ভেজে মুখি কচু দিন। তাতে নুন ও হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো ও জিরে গুঁড়ো দিন। কিছু ক্ষণ নেড়েচেড়ে নিয়ে জল দিন। ঢাকা দিয়ে মাঝারি আঁচে কিছু ক্ষণ রাখুন। কচু সেদ্ধ হয়ে এলে ভেজে রাখা ইলিশ মাছ ও রসুন পাতাগুলো দিয়ে দিন। প্রয়োজনমতো জল দিয়ে ১০ মিনিট রান্নাটা রাখুন। নামিয়ে সাতকরা লেবুর (কমলা লেবুর জ়েস্ট দিতে পারেন) টুকরো মিশিয়ে রান্নাটিকে ১০ মিনিট ঢেকে রাখুন।

ইলিশা বা প্যান গা থোংবা

সানপিয়াউ (মিজ়োরাম)

■ **উপকরণ:** জেসমিন রাইস ১০০ গ্রাম, জল ৫ কাপ, শুঁটকি মাছ পুড়িয়ে গুঁড়ো করা (শিদল) ২ টেবলচামচ, চিকেন ১০০ গ্রাম, লেমন গ্রাস ২-৩টে কাঠি ,আদা বাটা ১ চা-চামচ, গোলমরিচ ১ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো। **সঙ্গে খাওয়ার জন্য মশলা:** চিলি গার্লিক অয়েল ২ টেবলচামচ, পেঁয়াজ ১টা (স্লাইসড ও চিলি পেস্টের সঙ্গে টস করা), কাঁচালঙ্কা ১ টেবলচামচ (কুচনো), প্রন পাঁপড় ৪টে, ডিম ১টা (সেদ্ধ বা ভেজে টুকরো করা), ধনেপাতা কুচি, রসুনপাতা কুচি, লেবু ১টা (টুকরো করা)।

■ **প্রণালী:** চাল ২ ঘণ্টার জন্য জলে রেখে দিন। তারপর ভাল করে ধুয়ে পাত্রে রাখুন। সানপিয়াউর জন্য নেওয়া সমস্ত উপাদান চালের সঙ্গে মেশান। একেবারে কম আঁচে রান্না করতে থাকুন। রান্নার ঘনত্ব কন্‌জির মতো হয়ে এলে নামিয়ে ফেলুন। এবার চিকেনের স্কিন ও হাড় ছাড়িয়ে নিন। খাওয়ার জন্য তৈরি করা মশলা, চিকেনের কুচো ও প্রন পাঁপড়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন।



সানপিয়াউ



কন বিলাহি দি মাসর টেঙ্গা

কন বিলাহি দি মাসর টেঙ্গা (অসম)

■ **উপকরণ:** রুই মাছ বা কাতলা মাছ ৪টে (হলুদ ও নুন দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখা), চেরি টমেটো ১০০ গ্রাম, আলু ২টো, মেথি সিডস ১/২ চা-চামচ, হলুদ গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, সর্ষের তেল ২ টেবলচামচ, ধনেপাতা কুচি এক মুঠো, সবুজ লঙ্কা ২-৩টে (চেরা), লেবু ১টা (রস), নুন পরিমাণমতো, জল ৩ কাপ।

■ **প্রণালী:** প্রথমে প্যানে ভাল করে তেল গরম করে মাছগুলোকে ভেজে নিন। ভাজা হয়ে গেলে মাছগুলোকে তুলে আলাদা করে রেখে দিন। এবার বাকি থাকা তেলে মেথি সিডস দিয়ে কিছু ক্ষণ নেড়েচেড়ে নিন। আলু, হলুদ গুঁড়ো দিয়ে পাঁচমিনিট ভাজুন। তারপর তাতে চেরি টমেটো দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। পরিমাণমতো জল নুন দিন। এবার রুই মাছ, চেরা কাঁচা লঙ্কা ও চেরি টমেটো দিয়ে ঢেকে রাখুন। অল্প আঁচে কিছু ক্ষণ রান্না করুন। ধনেপাতা কুচি দিয়ে গ্যাস বন্ধ করুন। শেষে লেবুর রস মিশিয়ে পরিবেশন করুন গরম ভাতের সঙ্গে। যদিও অসমে মাছই ব্যবহার করা হয়, তবে মাছের বদলে মাংস ব্যবহার করেন, তাহলে মিট মশলা ব্যবহার করতে পারেন।



মেনে লুকতির

মেনে লুকতির (অরুণাচল প্রদেশ)

উপকরণ: চারাপোনা ২টো, আদা ১ টেবলচামচ (জুলিয়েন করে কাটা), রসুন ১ টেবলচামচ (থেঁতো করা), লেবুর রস ১ টেবলচামচ, নুন পরিমাণমতো, লুকতির ২ টেবলচামচ (ফার্মেন্টেড ও শুকনো ব্যাম্বু শুটস, কালো তিল, শুকনো রাজা মিরচি গুঁড়ো ও সৈন্ধব লবণ একসঙ্গে মেশানো)।

প্রণালী: লুকতির জন্য নেওয়া উপকরণ ছাড়া অন্য উপকরণগুলো মাখিয়ে মাছগুলোকে আধঘণ্টার মতো ম্যারিনেট করে রাখুন। এরপর ২০ মিনিট ম্যারিনেট করা মাছগুলোকে সেদ্ধ করতে দিন। ভাল করে সেদ্ধ হয়ে গেলে লুকতির সহকারে মাছগুলোকে পরিবেশন করুন।

গরই মাস পুরা পিটিকা (অসম)

উপকরণ: গরই মাছ বা ল্যাটা ৪টে, সর্ষের তেল ৩ টেবলচামচ, বড় পেঁয়াজ ১টা (মিহি করে কাটা), হলুদ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, লেবু ১টা (রস), কাঁচালঙ্কা ৪-৫টা (মিহি করে কাটা), নুন স্বাদমতো, বড় টমেটো ১টা (মিহি করে কাটা), ধনে পাতা ১/২ কাপ (মিহি করে কুচনো), গরমমশলা গুঁড়ো পরিমাণমতো।

প্রণালী: প্রথমে মাছে নুন, হলুদ, সর্ষের তেল, লেবুর রস মাখান। মাছগুলোকে ভাল করে চারগ্রিল করুন। হয়ে এলে তারপর নামিয়ে নিন। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ঠান্ডা হতে দিন। মাছের কাঁটা ছাড়িয়ে নিন। মাছের উপরের অংশ খুব বেশি কালো হয়ে গেলে তুলে চটকে নিন। এবার সমস্ত কেটে রাখা সব্জিগুলো একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। তাতে বাকি থাকা নুন ও সর্ষের তেল, গরমমশলা গুঁড়ো একসঙ্গে মিশিয়ে নিন।



গরই মাস পুরা পিটিকা

ডি-হাইড্রেটেড মোয়া মাস পিকল (মেঘালয়)

■ **উপকরণ:** মৌরলা মাছের শুঁটকি ১০০ গ্রাম, সর্ষের তেল ২৫০গ্রাম, ভূত জলোকিয়া ৪টে (পুড়িয়ে গুঁড়ো করা), রেড চিলি ফ্লেক্স ২ টেবলচামচ, আদা-রসুন বাটা ২ টেবলচামচ, লেবুর রস ২ টেবলচামচ, নুন।

■ **প্রণালী:** একঘণ্টার জন্য মাছগুলোকে জলে রেখে ধুয়ে দিন। প্রায় ৭-৮ বার ধুয়ে জল ছেঁকে গরম জল ঢালুন। মাছগুলোকে শুকিয়ে প্লেটে ছড়িয়ে ফ্যানের তলায় রেখে দিন। নুন ও লেবুর রস মিশিয়ে টস করুন। কড়াইয়ের তেলে সোনালি করে ভাজুন। এবার অল্প আঁচে আদা-রসুন বাটা ও নুন মিশিয়ে ভেজে নিন। ভূত জলোকিয়া ও রেড চিলি ফ্লেক্স মিশিয়ে দিয়েই গ্যাস বন্ধ করে দিন। ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নিন।



ডি-হাইড্রেটেড মোয়া মাস পিকল



স্টিম ফিশ উইথ আকুনি

স্টিম ফিশ উইথ আকুনি (নাগাল্যান্ড)

■ **উপকরণ:** চারাপোনা ২টো, আকুনি (ফার্মেন্টেড সয়াবিনস পেস্ট) ১ টেবলচামচ, ভূত জলোকিয়া ১টা (থেঁতো করা), রসুন পাতা $^1/_2$ কাপ (কুচনো), লেবুর রস, নুন।

■ **প্রণালী:** মাছ লেবুর রস ও নুন দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখুন। এবার আকুনি অর্থাৎ ফার্মেন্টেড সয়াবিনস পেস্ট, ভূত জলোকিয়া, রসুন পাতা, বাকি থাকা লেবুর রস, প্রয়োজনমতো নুন ও জল দিয়ে ভাপিয়ে দিন। এবার এর মধ্যে ম্যারিনেট করা মাছগুলোও দিয়ে দিন। তারপর প্রায় ৩০ মিনিট ধরে ভাল করে সেদ্ধ করে নিন। মাছ ও রসুন পাতা ঠিক করে সেদ্ধ হয়ে এলে নামিয়ে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন। একদিন রেখে দিলে এর স্বাদ আরও বৃদ্ধি পায়।

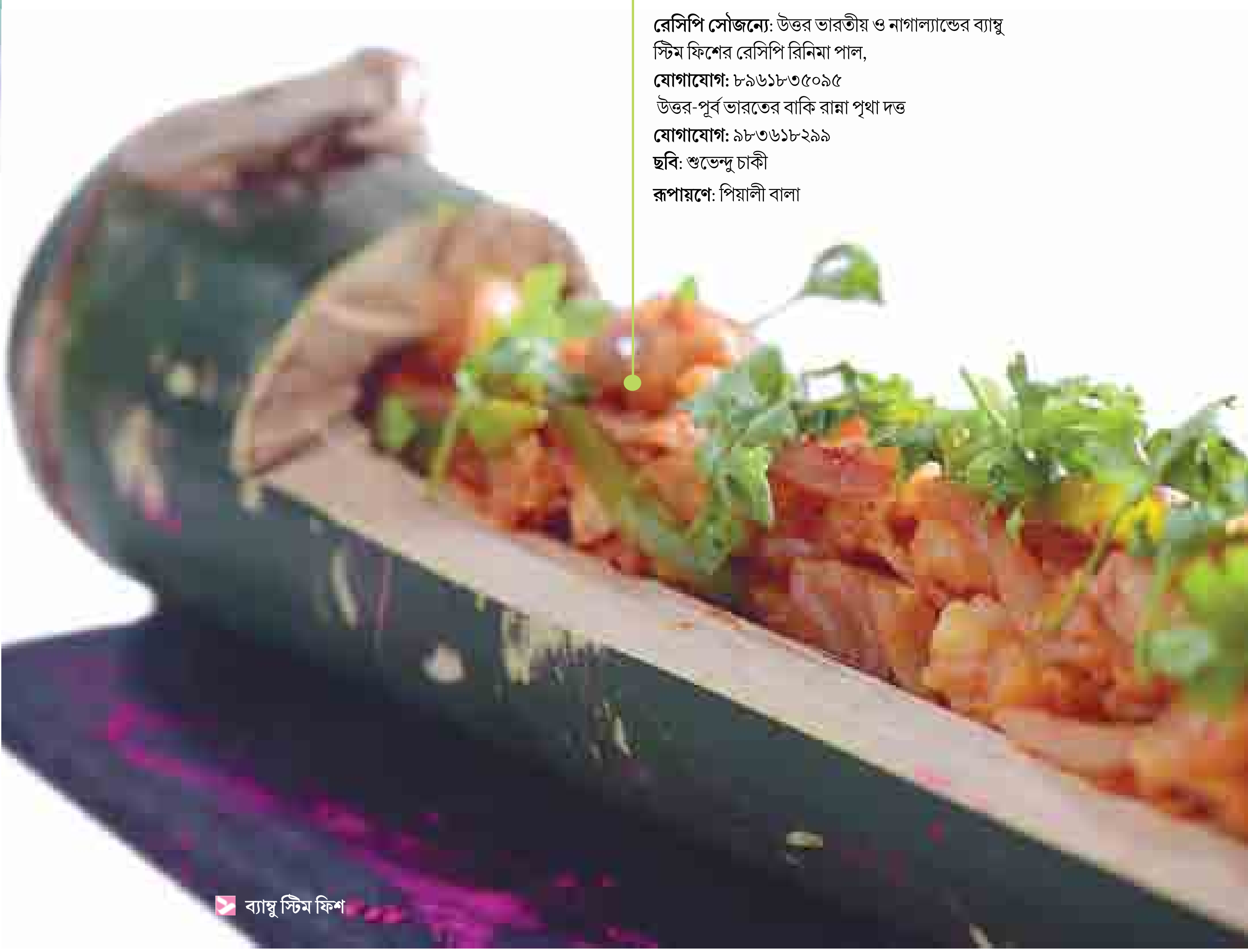
ব্যাম্বু স্টিম ফিশ (নাগাল্যান্ড)

■ **উপকরণ:** রুই মাছ ৫০০ গ্রাম, কাঁচালঙ্কা ৮-৯টা, রসুন ৮-১০ কোয়া, আদা ১টা (২ ইঞ্চি ও কুচনো), টমেটো ২টো (কুচি), ব্যাম্বু শুটস ২ টেবলচামচ, নুন, ধনেপাতা, লাল লঙ্কার গুঁড়ো ১/২ টেবলচামচ, যে কোনও তেল ১/২ কাপ।

■ **প্রণালী:** মাছগুলোকে ছোট ছোট করে টুকরো করে নিন। কাঁচালঙ্কা, রসুনের কোয়া, আদা, টমেটো, ব্যাম্বু শুটস, নুন একসঙ্গে ব্লেন্ডারে পেস্ট করে নিন। তারপর একটা পাত্রে তেল, মাছ, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, ধনেপাতা ও তৈরি করে রাখা মশলার মিশ্রণ একসঙ্গে মিশিয়ে আধঘণ্টা ঢাকা দিয়ে রাখুন। এবার একটা বাঁশ মাঝখান থেকে কেটে নিন। তারপর সেটাকে তেল দিয়ে গ্রিজ় করে নিন। তাতে মিশ্রণটা দিয়ে দিন। এবার স্টিম করুন, যত ক্ষণ রান্নাটা পুরোপরি সেদ্ধ হয়ে না যায়। রান্না পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। সাজানোর জন্য উপর থেকে ধনেপাতা ছড়িয়ে দিন। গরম গরম পরিবেশন করুন উত্তর-পূর্বের ব্যাম্বু স্টিম ফিশ।

উত্তর ও উত্তর-পূর্বের এক ঝাঁক মাছের রেসিপি রইল পুজোয়। খানিক চেনা-অচেনা এই রেসিপিগুলো বানিয়ে ফেললে এবারের বাংলার শারদীয়া উৎসবে পেয়ে যেতে পারেন প্যান-ইন্ডিয়ান স্বাদ।

রেসিপি সৌজন্যে: উত্তর ভারতীয় ও নাগাল্যান্ডের ব্যাম্বু স্টিম ফিশের রেসিপি রিনিমা পাল,
যোগাযোগ: ৮৯৬১৮৩৫০৯৫
উত্তর-পূর্ব ভারতের বাকি রান্না পৃথা দত্ত
যোগাযোগ: ৯৮৩৬১৮২৯৯
ছবি: শুভেন্দু চাকী
রূপায়ণে: পিয়ালী বালা



ব্যাম্বু স্টিম ফিশ











অপরিহার্য চরিত্রাভিনেতারা

বাংলা ছবির এমন অনেক অভিনেতা আছেন, যাঁরা তথাকথিত মুখ্য চরিত্র না হয়েও ইন্ডাস্ট্রির সম্পদ। এমনই পাঁচজনের সঙ্গে কথা বললেন **মধুরিমা সিংহ রায়**।

খরাজ মুখোপাধ্যায়

অভিনয়ে শুরু কীভাবে: সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ১০০ বছরে এক অধ্যাপক মারা গিয়েছিলেন। কন্ডোলেন্স মিটিংয়ে ‘আছে দুঃখ আছে মৃত্যু’ গানটি গাইবার সুযোগ পাই। ওরকম অনুষ্ঠানে কেউ হাততালি দেন না। কিন্তু অর্থনীতির অধ্যাপক জীমূতবাহন সেনগুপ্ত হাততালি দিয়েছিলেন। পরে এক বন্ধু ওঁর মুখে আমার প্রশংসা শুনে আমাকে ওঁর কাছে নিয়ে যায়। আমার বন্ধুই বলে ফেলে যে ‘ও ভাল অভিনয়ও করে।’ ওই অধ্যাপকই আমাকে সিনেমার প্রস্তাব দেন। ওঁরা তিন বন্ধু মিলে প্রযোজনা করছিলেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের ছবি। সেই সূত্রে প্রথম এনটিওয়ান স্টুডিয়োয় ঢোকা। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় লতায়-পাতায় আমার দাদু হন, কিন্তু তা তখন জানতাম না। বাছাই পর্বের শেষে



খরাজ মুখোপাধ্যায়

আটজন অভিনেতা নির্বাচিত হই। স্ক্রিপ্ট পড়তে শুরু করব, মহুয়া রায়চৌধুরী হাজির! অত গ্ল্যামারাস নায়িকাকে অত কাছ থেকে প্রথম দেখলাম। উনিই পারফরম্যান্স দেখে আমাকে সিলেক্ট করেন। ১৯৮২-৮৩ নাগাদ 'হুলস্থুল' ছবিতে আত্মপ্রকাশ। তারপর থিয়েটার করতাম। 'তেরো পার্বণ'-এ বেণুদার লিপে আমার প্লেব্যাকও ছিল, অভিনয়ের পাশাপাশি। টেলিফিল্মের বেশ কিছু পর্বে লিড রোল করেছি। তারপর সব ছেড়ে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভে চাকরি করতে যাই। আবার ১৯৮৯ নাগাদ 'রাজেশ্বরী' ধারাবাহিকে কাজ করি।

নানা মাধ্যমে কাজ: থিয়েটার, সিনেমা, সিরিয়াল, ওটিটি, যাত্রা সব করেছি। আগের চেয়ে কর্মপদ্ধতি বদলে গিয়েছে। এখনকার সব কিছুই খারাপ তা বলছি না। কিন্তু কিছু প্রজেক্টে একাধিক সহ-পরিচালক থাকা সত্ত্বেও কন্টিনিউয়িটির ভুল হয়। সকাল দশটায় শিল্পীকে ডেকে দুপুর দুটোয় ফ্লোরে ডাকা হয়। কিছুদিন আগে, একটি ছবিতে আমি মেক-আপ ভ্যানে ঢুকতে না ঢুকতেই একজন এসে বলল রেডি হয়ে নিতে। হরদা (হরনাথ চক্রবর্তী) বললেন, এত তাড়ার কী আছে! শট রেডি হওয়ার আগে বলবেন। আসলে উনি আগের ওয়র্ক কালচারে অভ্যস্ত। আমি কখনও মনিটরে দেখিই না শট দেওয়ার



মজার চরিত্রে

পরে। তবে এও বলব যে, আমি নতুন-পুরনো সব পরিচালকের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী। নতুনারও নিজেদের প্রমাণ করেছেন।

চরিত্রাভিনেতা হওয়ার সুবিধে: হ্যাঁ, সুবিধে তো বটেই। বিভিন্ন চরিত্রে কাজ করা যায়, এটা ভাল লাগার ব্যাপার। আমি হয়তো কমেডি চরিত্রে অফার পেয়েছি অনেক। তবে, এর বাইরেও তো কত কী করেছি! যেমন 'মুক্তধারা'য় লক্ষ্মণ পাণ্ডে। বিভিন্ন শেডসের চরিত্র করেছি।

নায়কের চেয়ে চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ: 'ব্রাউন'এ কাজ করলাম। কিন্তু সেখানে করিশ্মা কপূর একেবারেই ডি গ্ল্যাম, ভিন্ন চরিত্রে। আমি একজন অফিশিয়াল লোকের চরিত্রে, যিনি ল্যাবরেটরির কাজ বোঝেন। অবসরের মুখে রয়েছেন তিনি। নানা শেডস রয়েছে।

''বিভিন্ন চরিত্রে কাজ করা যায়, এটা ভাল লাগার ব্যাপার। কমেডি চরিত্রের বাইরেও তো কত কী করেছি! যেমন 'মুক্তধারা'য় লক্ষ্মণ পাণ্ডে'': খরাজ মুখোপাধ্যায়



রজতাভ দত্ত

রমাপ্রসাদ বণিক আমাকে শিখিয়েছিলেন, কিছু কাজ ছাড়তে হয়। শুভাশিসদার মতো অভিনেতা দিনের পর দিন নিজেকে ওয়েস্ট করলেন...মাঝে হয়তো একবার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বা হারবার্ট করলেন। ইন্ডাস্ট্রি আমাদের স্টিরিওটাইপ করেও দেয় খানিকটা। আমিও প্রচুর কপিক্যাট ছবিতে অভিনয় করেছি। কিন্তু আমাকে 'বেলাশেষে'র চরিত্র দেওয়া হলে সেটাই করব।

সাম্প্রতিক কাজ: 'লকরবগ্গা'য় ছোট কিন্তু ইন্টারেস্টিং চরিত্র করেছি। 'টুথপরী'তেও তাই। অক্ষয় কুমারের সঙ্গে 'ক্যাপসুল গিল' করলাম। সেখানে ছবির প্রথম দৃশ্যেই আমি। ধ্রুব মুখোপাধ্যায়ের 'বগলা মামা যুগ যুগ জিও'তে কাজ করলাম। 'বুমেরাং', 'প্রধান' আসছে।

রজতাভ দত্ত

অভিনয়ে কীভাবে শুরু: পেশাদার অভিনেতা হওয়ার কোনওরকম স্বপ্ন ছিল না। ছোটবেলায় গান শিখতাম। একবার আমার কিছু বন্ধু আমাকে ধরেবেঁধে থিয়েটারের মহড়া দেখাতে নিয়ে যায়। সৌমিত্র বসুর সেই নাট্যদলে নতুন সদস্য হিসেবে ঘর ঝাঁট দিতাম, চা দিতাম। এরপরে 'দুই আর দুয়ে' বলে একটি কল্পবিজ্ঞানের প্রডাকশনে মিনিট দশেকের একটি চরিত্রে সুযোগ পাই। আমার চেহারার সঙ্গে মানানসই হবে চরিত্রটি, তাই সুযোগটা পাই। তখন মোটেও ভাল অভিনেতা ছিলাম না, উচ্চারণ অস্পষ্ট হওয়ায় অনেকবার বাতিলও হয়েছিলাম। যা-ই হোক, কাজ করতে করতে অন্য নাটকের দলে ডাক পাই। সেখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র করি। গ্র্যাজুয়েশনের পর বছর তিনেক চাকরি করি। কিন্তু দমবন্ধ লাগত, তাই চাকরি ছেড়ে দিই। চাকরি ছাড়লে তো উপার্জনের একটা রাস্তা বের করতে হবে! তাই, টেলিভিশন ও সিনেমায় জুনিয়র আর্টিস্টের



ভিন্ন ধাঁচের চরিত্রে

ভূমিকায় কাজ শুরু করি। তপন সিনহা একদিন নাটক দেখতে এসেছিলেন। ওঁর চোখে পড়ে যাই। তারপরই ১৯৯৫-তে 'আজব গাঁয়ের আজব কথা'-য় বড় চরিত্রে অভিনয় করি। তবে প্রথম সাফল্য 'পারমিতার একদিন', তা প্রায় চাকরি ছাড়ার সাত বছর পরে। ২০০২ অবধি সিরিয়াস চরিত্রেই কাজ করেছি।

নেগেটিভ চরিত্রে স্টিরিওটাইপড?: এরপর থেকে ১২-১৪ বছরের এক দীর্ঘ জার্নি, যেখানে বাণিজ্যিক ছবিতে মূলত নেগেটিভ চরিত্রেই আমাকে কাস্ট করা হয়। তাতে সাফল্যও আসে। কিন্তু একইরকম চরিত্রে টাইপকাস্ট হয়ে গেলেও আমি কখনও বোরড হয়ে যাইনি। কারণ, পাশাপাশি থিয়েটার করতাম। ২০০৯ অবধি টেলিভিশনে কাজ করেছি। তখন প্রচুর টেলিফিল্ম হত। ৩০টা মতো টেলিফিল্মে কেন্দ্রীয় চরিত্র করেছি। আর



তনিমা সেন

২০১৪-র পর থেকে বিভিন্ন ধারার ছবি হতে শুরু করে। মঞ্চ, সিনেমা, টেলিভিশন, ওটিটি... আলাদা আলাদা মাধ্যমের বিজ্ঞান আলাদা। প্রায় ৩০ বছর ধরে কাজ করছি। প্রযুক্তির পাশাপাশি কাজের ধরনও বদলেছে।

চরিত্রাভিনেতা হওয়ার সুবিধে: সে তো আছেই! আর নায়কের গঠন ও সংজ্ঞাও সারা পৃথিবীতে বদলে যাচ্ছে এখন। তথাকথিত 'লার্জার দ্যান লাইফ' নায়ক-নায়িকার বাইরে বেরিয়ে নানা কনটেন্ট পাচ্ছি আমরা। রণবীর সিংহও 'গালি বয়'-এর মতো চরিত্র করছেন। আজ থেকে ২০-৩০ বছর আগে তা ভাবাই যেত না। হ্যাঁ, চরিত্রাভিনেতাদের কাছে এই সুযোগ আরও আগে এসেছে বলতে পারেন। মানে, আমরা ২০ আগে যে সুযোগ পেয়েছি, নায়করা এখন তা পাচ্ছেন। একজন যখন অভিনেতা হিসেবে আসেন, তখন যেমন 'লার্জার দ্যান লাইফ' চরিত্রে কাজ করতে চান, তেমনই ভাল চরিত্রে অভিনয় করার খিদেও থাকে। তবে প্রথমটির সুযোগ কিন্তু নতুন ছেলেমেয়েদের কাছে তুলনায় কমে গিয়েছে। অমিতাভ বচ্চন বা শাহরুখ খান ভবিষ্যতে আর হওয়া মুশকিল।

সাম্প্রতিক কোন চরিত্র মনে থেকে যাবে: পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বগলামামা'। এখনও মুক্তি পায়নি যদিও। সোনাদা সিরিজের তিনটি ছবির মধ্যে দু'টি ছবিতেই আমি ছিলাম। 'কর্ণসুবর্ণের গুপ্তধন' ও 'গুপ্তধনের সন্ধানে'। একই চরিত্রকে নতুন করে নিয়ে আসার আলাদা চ্যালেঞ্জ আছে। একটা সময়ে বাণিজ্যিক অন্তত প্রায় ১৭টি ছবিতে আমি প্রতিরক্ষামন্ত্রীই হয়েছি। বাকি টিমও এক। সেখানে একই ধাঁচের চরিত্রকে আলাদা করে উপস্থাপন করা কঠিন কাজ। নিজের মধ্যেই ওয়র্কশপ চলত।

আগামী কাজ: কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের 'একটু সরে বসুন' আর 'আমি আমার মতো' আসছে। 'বগলা মামা যুগ যুগ জিও' আসছে। জিৎ-রুক্মিণীর সঙ্গে 'বুমেরাং' আসবে। একটি সায়েন্স ফিকশন ছবিও করলাম।



ধারাবাহিকের সেটে

তনিমা সেন

অভিনয়ে শুরু কীভাবে: পাড়ার নাটক থেকে প্রফেশনাল বোর্ডের নাটক করতাম। একদিন চিরঞ্জিতের সঙ্গে 'ঘর জামাই' দেখতে আসেন তরুণ মজুমদার। উনি আমাকে পছন্দ করে ছবিতে সুযোগ দেন। এটা ১৯৮৯ সালের কথা। শুরুতে দু'-চারটে সিনেমা করার পর ইন্ডাস্ট্রি থেকে সরে আসি। কম বয়স ছিল, দেখতেও ভাল বলত সকলে। তখন কিছু আপত্তিকর ঘটনা ঘটে, কিছু মানুষের 'মিষ্টি চোখের দৃষ্টি'তে পড়েছিলাম আর কী! বিরতি নিয়ে সংসারে মন দিই। তারপর ১৯৯৬ নাগাদ 'জন্মভূমি' দিয়ে ধারাবাহিকের জগতে পা। মাঝের বছরগুলো নাটক করেছি ধৈর্য ধরে।

বিভিন্ন মাধ্যমে কাজের অভিজ্ঞতা: সিনেমা, মঞ্চ, সিরিয়াল সবই করেছি। 'ঘর জামাই'এর

''লার্জার দ্যান লাইফ' নায়ক-নায়িকার বাইরে বেরিয়ে নানা কনটেন্ট পাচ্ছি আমরা। রণবীর সিংহও 'গালি বয়'-এর মতো চরিত্র করছেন'': রজতাভ দত্ত



অম্বরীশ ভট্টাচার্য

প্রচুর শো করেছি চিরঞ্জিতের সঙ্গে। চিরঞ্জিতেরই পরিচালনা ছিল, ও বলল 'তনিমা ছাড়া আর কাউকে দিয়ে ওই চরিত্র করাব না।' আসলে, তখন কাজের বাইরেও আন্তরিকতার পরিবেশ ছিল।

চরিত্রাভিনেতা হওয়ার সুবিধে: সুবিধে তো আছেই। আমাদের সময়ে নায়িকা মানেই আঙুলে আঁচল জড়িয়ে গান গাইতেন। আমার গলায় এমনিও সুর নেই (হাসি)। চরিত্রাভিনেতা হলে অনেক বেশি কাজের সুযোগ। অনিন্দ্য সরকারের 'রামকৃষ্ণ'-তে ভৈরবীর চরিত্র করেছিলাম। ভাবতেই পারিনি, অমন চরিত্র আমার জীবনে আসতে পারে। স্বাধীনতার ৫০ বছর উপলক্ষে দিল্লি দূরদর্শন থেকে মাতঙ্গিনী হাজরার ভূমিকায় অভিনয় করতে বলা হয়। আমি হিন্দি জানি না ভাল। ওঁরা বললেন ডাবিং করিয়ে নেওয়া হবে। কিন্তু শেষে ডাবিং হয়নি, আমার কণ্ঠই রাখা হয়েছিল। মাতঙ্গিনী তো বাঙালি ছিলেন, তাই ওই ভাঙা উচ্চারণই রাখা হয়েছিল। অনেক পুরস্কারও পাই ওই চরিত্রের জন্য। বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করেছিলাম। রাজেশ শর্মাও ছিলেন প্রজেক্টে। এক টেকে অভিনয় করতে হয়েছিল। এছাড়া বলব, 'লাবণ্যর সংসার'-এর কথা। কত সাধারণ মহিলা যে তাঁদের পরিবারের মা-মাসিদের সঙ্গে চরিত্রটা রিলেট করতে পেরেছিলেন। 'ধ্যাত্তেরিকা'র পঁচিশ পাগলি খুব জনপ্রিয় হয়। এখনও এই দুটো কাজের কথা মানুষ বলেন।

নায়কের চেয়ে চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ: চরিত্র গুরুত্ব পাওয়া সব সময়ই ভাল দিক। আর একটা কথা বলি। যাঁরা স্বপ্ন দেখে অভিনয় করতে এসেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই প্রতিভা থাকে কিছু না কিছু। হয়তো, যে ট্রলি সেট করছে সে খুব ভাল মিমিক্রি করে। আমি বলি, তোমরা কেন জুনিয়র আর্টিস্ট হয়ে আছ? ওরা বলে, জুনিয়র আর্টিস্ট হিসেবে নিয়মিত কাজ পায়,

> ''চরিত্রাভিনেতা হলে কাজের সুযোগ বেশি। অনিন্দ্য সরকারের 'রামকৃষ্ণ'-তে ভৈরবীর চরিত্র করেছিলাম। ভাবতেই পারিনি, অমন চরিত্র আসতে পারে'': তনিমা সেন



আগে একটা সময়ে আমরা শিল্পীরাই জুনিয়র আর্টিস্টদের মধ্যে থেকে অনেককে সুযোগ দিতাম। এখন আর সে নিয়ম চলে না।

আগামী প্রজেক্ট: সদ্য শেষ করলাম ‘আবার অরণ্যের দিনরাত্রি’। আমি এতটাই ঘরকুনো, সংসারী যে কেরিয়ারে এই নিয়ে মাত্র দু’বার আউটডোর গেলাম! কেরিয়ারের শুরুর দিকে তরুণ মজুমদারের ছবির জন্য গিয়েছিলাম, ওই ছবিটা মুক্তি পায়নি। তারপর এই গেলাম আবার উত্তরবঙ্গে। মাঝে টুকটাক গিয়েছি কিন্তু সেভাবে লম্বা শিডিউল করিনি। ‘লাড্ডু’ বলে একটি ছবি আসছে। একজন স্পেশ্যাল চাইল্ডের ঠাকুরমা আমি।

সংসার ও কেরিয়ার: ব্যালান্স করতে অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। একসময়ে প্রচুর কাজ করেছি। তখন রীতিমতো বাড়ির কাজ করে শুটিংয়ে যেতাম। এবং করতে ভালই লাগত।

অম্বরীশ ভট্টাচার্য

অভিনয়ে কীভাবে শুরু: কেতকী দত্তর কাছে থিয়েটারের গান শিখতাম। ওঁর সঙ্গে দেশের বিভিন্ন জায়গায় থিয়েটারের গানের শো-ও করেছি। অভিনয় সংক্রান্ত নানা কথাবার্তা আদান-প্রদান হত ওঁর সঙ্গে। ১৯৯৭-২০০২ অবধি এরকম চলে। কেতকীদি চলে যাওয়ার পরে আমি বিভিন্ন দলের হয়ে নাটক করি, নাটকের গান নিয়ে গবেষণাও করি। অরুণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও কাজ করেছি। তবে দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের ‘সংসৃতি’ নাট্যদলে যোগ দেওয়ার পর সিরিয়াসলি অভিনয় শুরু করি, ‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’-এর হাত ধরে। বছর তিনেক পরে দেবেশদা-ই আমাকে টিভিতে অডিশনের খোঁজ দেন। আসলে, আমি একটু গা-ছাড়া বোহেমিয়ান টাইপের ছিলাম বলে সিনেমা বা টিভিতে কাজের ব্যাপারে একটু সংশয়ও ছিল। ২০০৬ সাল নাগাদ ভাল ভাল ধারাবাহিক হলেও আমার একটু নাক উঁচু ছিল। তবে তখন এখনকার মতো সিরিয়ালের মান পড়ে যায়নি। যা-ই হোক প্রথম অডিশন দিয়ে নির্বাচিত হই, ‘রাজা গজা’য়।

নানা মাধ্যমে কাজ: থিয়েটার, যাত্রা, সিনেমা, টেলিভিশন, ওটিটি... এতগুলো মাধ্যমের দর্শক আলাদা। ওটিটি আর টেলিভিশনের দর্শক আলাদা ধাঁচের অভিনয় পছন্দ করেন। অভিনয়ের স্কেল ও টেকনিক বদলাতে হয়। মানে, একটা গান পাঁচ রকম স্কেলে গাইলে যেমন হয় আর কী! আবার যাত্রাতে ১২-১৩ হাজার দর্শক থাকেন। শেষ রো-তে বসা দর্শকের কাছে আমার অভিনয় পৌঁছচ্ছে সংলাপের মাধ্যমে। ওই টেকনিক আয়ত্ত

“ওটিটি আর টিভির দর্শক আলাদা ধাঁচের অভিনয় পছন্দ করেন। অভিনয়ের স্কেল ও টেকনিক বদলাতে হয়। মানে, একটা গান পাঁচরকম স্কেলে গাইলে যেমন হয় আর কী”: অম্বরীশ ভট্টাচার্য

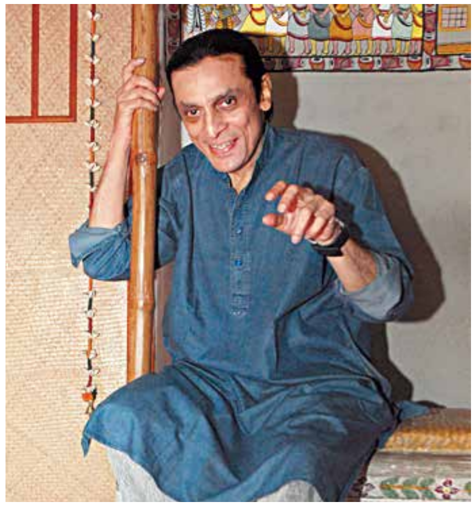


মানসী সিনহা









রাজেশ শর্মা, শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ বসু, লাবণী সরকার, অনসূয়া মজুমদার, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তীর মতো আরও অনেকেই উল্লেখ্য

''নায়িকারা যে সুন্দর সুন্দর নায়ক পায়। নাচগান করার সুযোগ পায়। সেসব তো আমি পাই না (হাসি)। আসলে, অভিনয় যে ভালবাসে, তার কাছে সবই সমান'': মানসী সিনহা

করা বেশ পরিশ্রমের ছিল। দু'বছর মতো যাত্রা করেছি। তবে আমার সুইচ অন-সুইচ অফ করতে অসুবিধে হয় না। এমনও হয়েছে একদিনে দু'টি মাধ্যমে শুটিং করেছি। ১৭-১৮ বছর হয়ে গিয়েছে তো, এখন আর অসুবিধে হয় না। আমি মেথড অ্যাক্টিংয়ে বিশ্বাস করি না। পরিচালক যেমনভাবে নির্দেশ দেবেন, আমি তা আজ্ঞাবহের মতো পালন করে যাব।

চরিত্রাভিনেতা হওয়ার সুবিধে: অনেক। তথাকথিত নায়কেরা কিছু স্টিরিওটাইপে আবদ্ধ। তাঁকে 'ভাল' হতে হয়, সুন্দর দেখতে হতে হয়... কিন্তু চরিত্রাভিনেতা নানা শেডের জীবন বাঁচতে পারেন।

নায়কের চেয়ে চরিত্রের গুরুত্ব: গত কয়েক বছরে দর্শকের সামনে গোটা পৃথিবীর দরজা খুলে গিয়েছে। যে ছেলেটা আমার বাড়ির পাশে হোটেলে চাকরি করে, তার কাছেও আমেরিকা বা কোরিয়ার কনটেন্ট সহজলভ্য। বিশ্বায়ন ও ইন্টারনেটের দৌলতে দর্শকের রুচি বদলাচ্ছে। হয়তো সেই কারণেই এখন তিন মাসেও সিরিয়াল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

নানা চরিত্রের স্মৃতি: একটা সময়ে আমাকে শুধু কৌতুক অভিনয়ের জন্যই কাস্টিং করা হত। মাঝে অন্য চরিত্র করলেও, তা কম। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লক্ষ্মীছেলে'র পরে ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই জানলেন, আমি সিরিয়াস চরিত্রেও অভিনয় করতে পারি। এরপরে উনি 'কাবেরী অন্তর্ধান', 'অর্ধাঙ্গিনী' ও 'অসুখ-বিসুখ'-এ কাস্ট করেন। আসলে এখানে নির্মাতারা দর্শকদের খানিকটা বোকা ভাবেন। তাই অভিনেতাদের স্টিরিওটাইপ করে দেওয়ার প্রবণতা আছে। 'ব্যোমকেশ ও দুর্গরহস্য'-এর সাফল্য প্রমাণ করে দিয়েছে দর্শক অন্যরকম অজিত দেখতেও প্রস্তুত।

আগামী কাজ: জিতের সঙ্গে 'বুমেরাং', দেব ও পরাণদার (বন্দ্যোপাধ্যায়) 'প্রধান', 'কুমুদিনী ভবন' ওয়েব সিরিজ় আছে। 'কুমুদিনী...'তে আমিই লিড কাস্ট। থিয়েটার গান নতুন করে শুরু করেছি নান্দীকারের সঙ্গে।



সিরিয়ালের সেটে

মানসী সিনহা

অভিনয়ে কীভাবে শুরু: আড়াই বছর বয়সে শুরু। মায়ের হাত ধরে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের থিয়েটারে হাতেখড়ি। মায়েরই ছেলের চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। ক্লাস সেভেনে 'সমীক্ষণ' বলে একটি নাট্যগোষ্ঠীতে পাঠিয়ে দিলেন। পঙ্কজ মুন্সিই আমার প্রথম নাট্যগুরু। নানা দলে কাজ করতে করতে মনে হল, এবার একটু পয়সাও রোজগার করতে হবে। মায়ের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছেও ছিল। অল্পবয়সি নায়িকার ভূমিকায় অফিস ক্লাবে অভিনয় করতাম। 'গান্ধারীর চারদুয়ার' দেখে তরুণ মজুমদার আমাকে নির্বাচন করেন 'আলো'র জন্য। লোকে সিরিয়াল হয়ে সিনেমায় আসেন। আমি সিনেমা থেকে সিরিয়ালে আসি। এর আগে তরুণ মজুমদারের 'কালপুরুষ'-এ অভিনয় করি, কিন্তু তা মুক্তি পায়নি। টেলিভিশনের শুরুতেও আমাকে 'আলোর মানসী' বলেই চিনত।

নানা মাধ্যমে কাজ: আকাশবাণী-কেও বাদ দেবেন না। নানা মাধ্যমে যেটা শেষমেষ করতে হয়, তা হল অভিনয়ই। এবার অডিও মাধ্যমে যে অভিনয় করতে হয়, তা নিশ্চয়ই ক্যামেরার সামনে বা স্টেজে করব না! স্টেজে যেমন ফুলশয্যার কথা শেষ রো-এর দর্শককে শোনাতে হয়। এই ধরনগুলো আমাকে আয়ত্ত করতে হয়েছে। আর যাঁদের সঙ্গে কাজ করেছি তাঁরা হাতে ধরে শিখিয়েছেন। দুয়ে মিলে ব্যাটে-বলে হয়েছিল।

চরিত্রাভিনেতা হওয়ার সুবিধে: চরিত্রাভিনেতা হয়ে নানা ধরনের চরিত্র করতে পারছি ঠিকই। কিন্তু নায়িকারা যে সুন্দর সুন্দর নায়ক পায়। নাচগান করার সুযোগ পায়। সেসব তো আমি পাই না (হাসি)। আসলে, অভিনয় যে ভালবাসে, তার কাছে সবই সমান। আমার পছন্দের চরিত্র ছাড়া করিও না। আর সহকর্মীরাও ম্যাটার করে আমার কাছে।

টিভিতে মেয়েদের চরিত্রায়ণ: টেলিভিশনের দর্শকদের মধ্যে বরাবরই মেয়েরা বেশি। সাধারণ মেয়েরা যা হতে চায়, যা হতে পারেনি, সে সবকেই পরদায় তুলে ধরে সিরিয়াল। অ্যাসপিরেশন তৈরি করে। অনেক না-পাওয়ার উত্তর তাঁরা খুঁজে পান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তো চরিত্রের ধরন পাল্টাচ্ছে।

মনে রাখার চরিত্র: 'ধ্যাত্তেরিকা' আমার প্রথম সিরিয়াল খুবই মেমোরেবল। আমাকে পরিচিতি দিয়েছে ওটি।

আগামী কাজ: আপাতত একটি ধারাবাহিক করছি 'রাঙা বউ'। নিজের গল্প ও পরিচালনায় একটা ছবি করছি, 'এটা আমাদের গল্প'। পোস্ট প্রডাকশন চলছে। কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের 'একটু সরে বসুন' শেষ করলাম। নাটক লিখে পরিচালনা করলাম, 'এই আমি মাধবীলতা' বলে।

পরিবারকে সময়: কাজ হয়ে গেলেই বাড়ি চলে যাই। আমার স্বামী সংসারটা খুব ভালভাবে ধরে রেখেছে। ছেলেমেয়ে তো ধরেই নিয়েছে আমি উড়নচণ্ডী (হাসি)। মেয়ে গান শেখে, ছেলে ভীষণ ড্রামাটিক। আমি বলি, তোর অভিনয়ে আসা উচিত (হাসি)।



নানা রঙের নিশিযাপন...

মন কেমনের রং

অ্যামস্টারড্যামের অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে রয়েছে যত রং, তত গল্প। স্মৃতির সরণি বেয়ে, সে সব গল্পের পাতা ওল্টালেন ভিশুয়াল আর্টিস্ট অনিকেত মিত্র।





অ্যামস্টারড্যামের রাত, রেড লাইট ডিস্ট্রিক্ট

দাদার প্রতি থিওর ভালবাসা দেখে মুগ্ধ হন জোহানা। থিওর সঙ্গে জোট বেঁধে, ভিনসেন্টের ছবি বিক্রিতে সাহায্য করতে শুরু করেন।



জোহানা গেজিনা বঙ্গার

গোলাপি চাঁদ

রেড লাইট সিক্রেটস মিউজ়িয়াম, অ্যামস্টারড্যাম

অ্যামস্টারড্যামের এক গলির ভিতর এক কফিশপে বসে আছি। রাস্তার মাঝ দিয়ে ‘ওডেজিজস ভোরবুর্গওয়াল’ ক্যানেল গিয়েছে শহরের পশ্চিম দিকে। একজন বছর তিরিশের যুবক ক্যানেলের ধারে একটা সবুজ কাঠের বেঞ্চে বসে স্যাক্সোফোন বাজাচ্ছে। তার সুরের মূর্চ্ছনায় ক্যানেলের দুই ধারের রাস্তায় গোলাপি আলোর কাচগুলো যেন অপার্থিব বলে মনে হচ্ছে! ভালবাসার শহরে কাচের জানালার ওপার থেকে শরীরী হাতছানি, পথিকের মন চুরি করছে সেই সুরে। তিনদিন হল আমরা এসেছি। যার অদম্য টানে বাধ্য হয়ে আজ এই নিষিদ্ধ পল্লির পাথুরে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি, তার নাম ‘অ্যানি মারিয়া জেন্টভেল্ড’। তার সৌন্দর্যে এশিয়ান বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতির জন্য, কেউ কেউ তাকে ‘চাইনিজ় অ্যানি’ বলেও ডাকত। অ্যামস্টারড্যামের এই নিষিদ্ধ পল্লিতেই ১৯৫৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর। বছর শেষের রাত। অ্যানির বন্ধুরা তাকে খুঁজে পায় মৃত অবস্থায় তার শয়নকক্ষে। তাকে খুন করা হয়েছিল। পুলিশের রেকর্ড অনুযায়ী, অ্যানিকে হত্যা করে তার শেষ ‘খদ্দের’। আজও সেই খুনি অধরাই রয়ে গিয়েছে। এই রাস্তার উপরেই রয়েছে ‘রেড লাইট সিক্রেটস মিউজ়িয়াম’। দোতলার একটি ঘরে আজও সাজানো আছে হাসিখুশি অ্যানির স্মৃতিসৌধ। সেখানে মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখলাম। অডিও ফোনে গাইড বলছেন, ‘‘এই রাস্তার প্রতিটি বাড়িতে মুহূর্তের ভালবাসা বিক্রি হয়।’’ শুরু হয় এক ‘কানকাটা’ রাজার গল্প— প্রেয়সীকে প্যারিসের এমনই এক পল্লিতে উপহার পাঠিয়েছিলেন নিজের একটা কান! বিষণ্ণ সূর্যমুখীর দেশের সেই রাজার নাম? ভিনসেন্ট ভ্যান গখ।

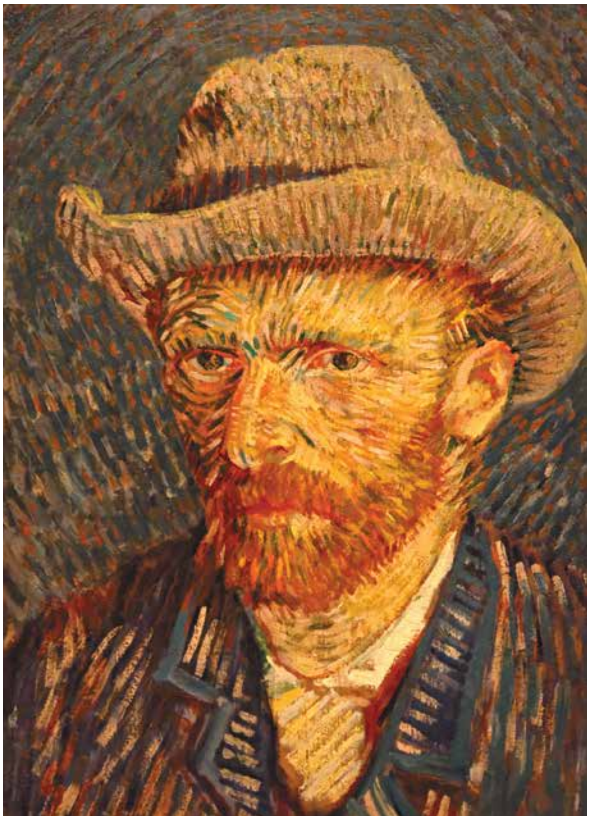
বিষণ্ণ রাজার গল্প

ভ্যান গখ মিউজ়িয়াম, অ্যামস্টারড্যাম

নিজের পোর্ট্রেট, মরা হলুদ আলোর সূর্যমুখীর ছবি, হল্যান্ডের সবুজ ল্যান্ডস্কেপ, সাধারণ কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনের গান, আর একরাশ মন খারাপ যেন শিল্পী সাজিয়ে তুলেছেন সারা জীবন ধরে। বিষণ্ণতার আকাশে, থিও ভ্যান গখ যেন ভিনসেন্টের জীবনে এক প্রদীপ্ত ধ্রুবতারা! অস্থির জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে, অনুজ থিওর শান্ত, স্নিগ্ধ উপস্থিতিকে বারবার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ভিনসেন্ট তার প্রতিটি চিঠিতে। ভাই ও দাদার প্রতি ভালবাসা ও তার শিল্পীসত্তার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। মানসিক উদ্বেগ ও বিষণ্ণতার সঙ্গে লড়ছেন ভিনসেন্ট। আর্থিক অনটন ও আইনি জটিলতায় বিপর্যস্ত ভাই থিও চেষ্টা করছেন দাদার সব রকম খেয়াল রাখতে। সর্বস্ব উজাড় করে



আলোর মালায় সাজানো...



ভ্যান গখের আত্মপ্রতিকৃতি

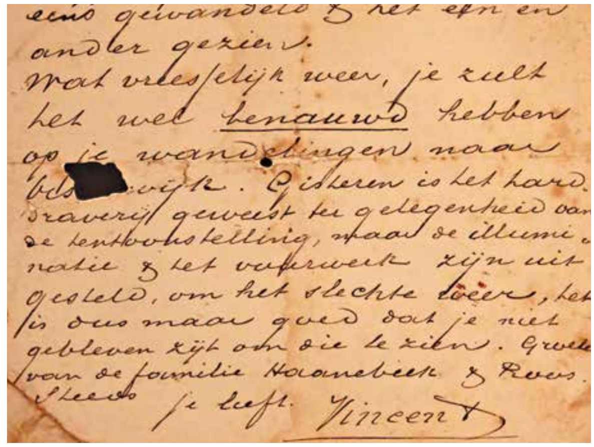
দাদাকে লিখছেন, ''ছবি আঁকাটা থামিও না!'' ছোট ভাইয়ের উৎসাহে ভিনসেন্ট আপ্রাণ চেষ্টা করছেন মানসিক যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে ক্যানভাসকে রঙের প্রাচুর্যে ভরিয়ে দিতে।

১৮৮৯ সালের ১৭ এপ্রিল অ্যামস্টারড্যামের গির্জায় থিও ভ্যান গখের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন জোহানা গেজিনা বঙ্গার। দাদার প্রতি থিওর ভালবাসা দেখে মুগ্ধ হন জোহানা। থিওর সঙ্গে জোট বেঁধে, ভিনসেন্টের ছবি বিক্রিতে সাহায্য করতে শুরু করেন। সেই অর্থ দিয়ে ভিনসেন্টের দৈনন্দিন জীবন ও রং তুলি ক্যানভাসের খরচ তুলতেন স্বামী-স্ত্রী। বিয়ের এক বছর পর থিও এবং জোহানার কোল আলো করে জন্ম নেয় তাঁদের একমাত্র পুত্র। দাদা ভিনসেন্টের নামেই সন্তানের নাম রাখেন থিও ও জোহানা। ভিনসেন্ট উইলিয়াম ভ্যান গখ! গ্যালারির শেষ প্রান্তে দেওয়াল জুড়ে আলো করে রয়েছে একটি পেন্টিং। ভাইপো উইলিয়ামের জন্য আঁকা ভিনসেন্টের সেই ছবির নাম 'আমন্ড ব্লসম্‌স'। নীল আকাশের প্রেক্ষাপটে বাদাম গাছের সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলগুলি বসন্তের আগমনের গান গাইছে যেন। জাপানি প্রিন্টমেকিংয়ের আদলে আঁকা ছবি নতুন জীবনের প্রতীক।

এর কয়েক মাস পরে, ফ্রান্সের একটি ছোট্ট গ্রামে

ছোট ভাইয়ের উৎসাহে ভিনসেন্ট আপ্রাণ চেষ্টা করছেন মানসিক যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে ক্যানভাসকে রঙের প্রাচুর্যে ভরিয়ে দিতে।





eens gewandeld & het een en
ander gezien.
Wat vreeselijk weer, je zult
het wel benauwd hebben
op je wandelingen naar
Bl[illegible]wijk. Gisteren is het hard-
draverij geweest ter gelegenheid van
de tentoonstelling, maar de illumi-
natie & het vuurwerk zijn uit
gesteld, om het slechte weer, het
is dus maar goed dat je niet
gebleven zijt om die te zien. Groete
van de familie Haanebeek & Roos.
Steeds je liefh. Vincent



(উপরে, বাঁদিকে) আমন্ড ব্লসম্‌স, (ডানদিকে) ভ্যান গখের লেখা চিঠি, (নীচে) তাঁর আঁকা ল্যান্ডস্কেপ

রয়ে যায় তাঁর সূর্যমুখীর দেশ, নিস্তব্ধ হাওয়াকল, আর সম্রাটহীন শূন্য সিংহাসন আঁকড়ে থিও ভ্যান গখ।

১৮৯০ সালের ২৯ জুলাইয়ের এক নিরিবিলি দুপুর। ডাক্তার পল গ্যাচেটের খামারবাড়িতে ভিনসেন্ট চিকিৎসাধীন। মানসিক উদ্বেগ আরও বেড়েছে। পল নিজে শিল্পের সমঝদার ও ভিনসেন্টের অনুরাগী। তাই তাঁর কাছে দাদাকে চিকিৎসা করার জন্য পাঠাতে দ্বিতীয়বার ভাবেননি থিও। সেদিন দুপুরে খামারবাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটা গম ক্ষেতে নিজের বুকে গুলি চালান ভিনসেন্ট ভ্যান গখ। মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে। রয়ে যায় তাঁর সূর্যমুখীর দেশ, নিস্তব্ধ হাওয়াকল, আর সম্রাটহীন শূন্য সিংহাসন আঁকড়ে থিও ভ্যান গখ। ভিনসেন্টের মৃত্যুর পর থিও আর জোহানা আরও জোর কদমে কাজ শুরু করে দেন। ভিনসেন্টের শিল্পের কথা যেন পৃথিবীর প্রতিটা মানুষ জানতে পারে তার জন্যই কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন দু'জনে। কিন্তু থিওর শরীর হঠাৎ খারাপ হতে শুরু করে। ভিনসেন্টের মৃত্যুর ছ'মাস পর, ১৮৯১ সালের ২৫ জানুয়ারির সকালে চিরনিদ্রায় তলিয়ে যায় থিও। তখন বয়স মাত্র তেত্রিশ। বিখ্যাত ফরাসি ভাস্কর ওসিপ জাডকিনের তৈরি ভাস্কর্য, 'স্ট্যাচু অফ ভিনসেন্ট অ্যান্ড থিও' নেদারল্যান্ডের জ্যান্ডার্ট শহরে ভ্যান গখ চার্চের সামনে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভিনসেন্ট এবং থিওর মৃত্যুর পর জীবনের শেষ দিন অবধি জোহানা তাঁর কর্তব্যে অবিচল থেকেছেন। আজ পৃথিবীর মানুষ ভিনসেন্ট ভ্যান গখের শিল্পসৃষ্টির যতটুকু স্বাদ আস্বাদন করতে পারছে তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব এই নারীর। কুর্নিশ তোমায়, 'জো'!

ভালবাসার বাড়ি

দ্য রেমব্রান্ট হাউজ় মিউজ়িয়াম, অ্যামস্টারড্যাম

হোটেল থেকে চেক আউট বেলা এগারোটায়। রিসেপশনিস্টের কাছে ঘরের চাবি ফেরত দিয়ে মালপত্র ওদের জিম্মায় রেখে রাস্তায় এসে যখন নামলাম, মনে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা। অ্যামস্টারড্যাম থেকে আমাদের ব্রাসেলসের ট্রেন দুপুর তিনটেয়। সময় কম। এর মধ্যে খুঁজে বের করতে হবে বাড়িটা। রেমব্রান্ট হারমেনজ়ন ভন রেইন্‌-এর বসত ভিটে। রেমব্রান্ট আর সাসকিয়ার, 'ভালবাসার বাড়ি'! অ্যামস্টারড্যামের প্রাণকেন্দ্রে চার নম্বর জডেনব্রিস্তাতের এই অট্টালিকা একবার দেখেই পছন্দ হয়ে গেল তরুণ প্রতিভাবান ডাচ শিল্পী রেমব্রান্টের। তখন ১৬৩৯ সাল। সদ্য বিবাহিতা



'ভিনসেন্ট অ্যান্ড থিও'



শিল্পীর ঘর...



সানফ্লাওয়ারস, ভ্যান গখ

স্ত্রী সাসকিয়া ভান উইলেনবার্গকে নিয়ে এই বাড়িতে উঠলেন রেমব্রান্ট।

রেমব্রান্টের খ্যাতি তখন হল্যান্ডের রাজপরিবার ও বিত্তবানদের মুখে মুখে ঘুরছে। এই বাড়ির নীচে এসে হত্যে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত অগুনতি ধনী, রাজা-উজির। সকলের একটাই অনুরোধ, রেমব্রান্টকে দিয়ে নিজের পোর্ট্রেট আঁকাবেন। ধনী পরিবারের মেয়ে সাসকিয়াও বিয়ের যৌতুকে পৈতৃক অনেক সম্পত্তি নিয়ে অ্যামস্টারড্যামের এই বাড়িতে এসেছিলেন। রেমব্রান্টের শিল্পী জীবনে তখন ভরা বসন্ত। অস্বাভাবিক বিলাসবহুল জীবনে ক্রমশ তিনি অভ্যস্ত হয়ে গেলেন। এঁকে চলেছেন সব অমর সৃষ্টি। 'দ্য নাইট ওয়াচ'-এর মতো বিখ্যাত ছবি এই বাড়িতেই আঁকা হয়েছিল। ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীর সব দুষ্প্রাপ্য দুর্মূল্য বস্তু সংগ্রহের নেশা তখন রেমব্রান্টকে পেয়ে বসেছে।

স্বামীর সাফল্যে গর্বিত সাসকিয়া রেমব্রান্টের জীবন ভালবাসায়, প্রেমে ভরিয়ে দিতে লাগলেন। সাসকিয়াকে সাবজেক্ট করে রেমব্রান্ট যে কত ছবি এঁকেছেন, তার হিসেব নেই। 'সাসকিয়া এজ ফ্লোরা', 'দ্য জিউইশ ব্রাইড'-এর মতো বিখ্যাত সব ছবি আজও সেই বাড়ির দেওয়ালে ঝুলছে। সাসকিয়ার চোখের মণিতে রেমব্রান্টের প্রতি তাঁর অনুরাগ স্পষ্ট ধরা পড়ে এই অয়েল পেন্টিংগুলোতে। সাসকিয়ার রূপের মাধুরীতে স্নিগ্ধতার ছোঁয়া পেয়েছিলেন রেমব্রান্ট। রেমব্রান্ট ও সাসকিয়ার প্রথম তিনজন সন্তান জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই মারা যায়। শোকে বিহ্বল দম্পতির তখন বেঁচে থাকার একমাত্র আশ্রয়, একে অপরের প্রতি গভীর ভালবাসা। সাসকিয়াকে রেমব্রান্ট কতটা ভালবাসতেন, সে উল্লেখ পরবর্তীকালে অনেক ছবি, লেখায় পাওয়া যায়।

ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীর সব দুষ্প্রাপ্য দুর্মূল্য বস্তু সংগ্রহের নেশা তখন রেমব্রান্টকে পেয়ে বসেছে।





(উপরে, বাঁদিকে) রেমব্রান্টের স্টাডি, (ডানদিকে) তাঁর আঁকা ছবি, (নীচে) তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ

একদিকে প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুশোক। অন্যদিকে ডাচ শিল্পজগতের আচমকা ছন্দপতন। ক্রমশ কাজ হারাতে থাকলেন রেমব্রান্ট।

১৬৪১ সালে সাসকিয়া জন্ম দেন চতুর্থ সন্তানের। রেমব্রান্ট ও সাসকিয়া তাঁদের এক বোনের নামের সঙ্গে মিলিয়ে পুত্রের নাম রাখেন 'টাইটাস'। কিন্তু টাইটাসের জন্মের পর থেকেই সাসকিয়ার শরীর অসম্ভব ভেঙে পড়ে। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে সাসকিয়া মারা যান। রেমব্রান্টের জীবনের করুণ অধ্যায়ের সূচনা তখন থেকেই।

একদিকে প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুশোক। অন্যদিকে ডাচ শিল্পজগতের আচমকা ছন্দপতন। ক্রমশ কাজ হারাতে থাকলেন রেমব্রান্ট। ধীরে ধীরে দেনায় ডুবে যেতে থাকলেন। তাও বাড়িতে ছাত্রদের কাজ শিখিয়েছেন, ছবি এঁকেছেন, প্রিন্ট মেকিংয়ের কাজ করেছেন। রেমব্রান্ট জীবদ্দশায় প্রায় তিনশোটি অয়েল পেন্টিং এঁকেছিলেন। এচিংয়ের কাজ করেছেন প্রায় দুশো নব্বইটি। তার অধিকাংশ এচিং এখন এই মিউজ়িয়ামে রয়েছে। এ ছাড়াও



রয়েছে অনেক ফ্রি হ্যান্ড ড্রইং ও স্কেচ। সাসকিয়ার মৃত্যুর পর শিশু টাইটাসের দেখাশোনা করার জন্য এক পরিচারিকা এই বাড়িতে এসে ওঠেন। গিরজি ডির্কস। গিরজির সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন রেমব্রান্ট। গিরজি রেমব্রান্টকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। তাঁকে স্ত্রীর স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন শিল্পী। এরপরই গিরজির সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন রেমব্রান্ট। শুরু হয় আইনি যুদ্ধ। গিরজি বিশাল অঙ্কের খোরপোষ দাবি করেন। রেমব্রান্ট আর্থিকভাবে আরও বিপন্ন হয়ে ওঠেন। যে বাড়ির নীচে এক সময় রাজাদের জুড়িগাড়ি এসে থামত, সেখানে এখন প্রতিদিন ভিড় করতে শুরু করল পাওনাদারেরা। কিন্তু এমনই সময় রেমব্রান্টের জীবনের কালো মেঘের ছায়া সরিয়ে, নতুন করে



সাবজেক্ট যখন সাসকিয়া...



রেমব্রান্টের স্টুডিও

প্রেম আসে। হেনরিকে স্টোফেলস। রেমব্রান্টের বাড়ির দেখভালের দায়িত্বে আসা হেনরিকের প্রেমে পড়েন রেমব্রান্ট। জীবনের শেষদিন অবধি হেনরিকে রেমব্রান্টের পাশে ছিলেন তাঁর সঙ্গিনী হয়ে। হেনরিকের গর্ভে জন্ম হয় কর্নেয়ার। 'দ্য চার্চ কাউন্সিল' হেনরিকেকে দেহোপজীবী হওয়ার অপবাদে দোষী সাব্যস্ত করে। তাঁর আচরণকে সমাজ বহির্ভূত বলে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়। যদিও রেমব্রান্ট এই সময় হেনরিকের হাত ছাড়েননি। হেনরিকের সঙ্গে রেমব্রান্টের কোনওদিন বিবাহ হল না চার্চের আদেশে। এমন সময় রেমব্রান্টের দারিদ্র্য চরম সীমায় পৌঁছয়। সাসকিয়া ও রেমব্রান্টের সাধের বাড়ি, রেমব্রান্টের যাবতীয় মূল্যবান সংগ্রহ, তাঁর আঁকা ছবি, নিলামে উঠল। কোর্ট রেমব্রান্টের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল। টাইটাস তখন সদ্য কিশোর। কন্যা কর্নেলিয়াকে কোলে নিয়ে হেনরিকের হাত ধরে, সতেরো বছরের পুত্র টাইটাসকে নিয়ে পথে নামতে হল ডাচল্যান্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পসাধক রেমব্রান্টকে।

জীবনের দীর্ঘ উনিশটি বছর রেমব্রান্ট এই বাড়িতে থেকেছিলেন। স্ত্রী সাসকিয়ার ভালবাসায় ঋদ্ধ রেমব্রান্টের প্রিয় ঘরটায় আজও সাজিয়ে রাখা আছে ইজেল ক্যানভাস, তুলি আর প্যালেট। ঘরে ঢুকলে মনে হবে, ছবি আঁকতে আঁকতে শিল্পী এইমাত্র গিয়েছেন বিশ্রাম করতে। উত্তরের জানালা দিয়ে আজও রোদ্দুর এসে নিয়মিত আবেগে আবেশে মাখামাখি হয় ঘরের মেঝেতে, ফরাসে, রেমব্রান্টের প্রিয় আরাম কেদারায়। এই রোদ্দুরের খেলায় একদিন তাঁর পেন্টিংয়ে জন্ম নিয়েছিল আলোছায়ার সিগনেচার 'কিয়ারোস্কিউরো' স্টাইল। বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে চলা ক্যানালের দিকে তাকিয়ে আজও সেই শূন্য ক্যানভাসটা অপেক্ষায় রয়েছে। আবার কখন তাকে আলো-ছায়ায় ভরিয়ে দেবে, সাসকিয়া আর রেমব্রান্টের 'ভালবাসার বাড়ি'!

ছবি: লেখক

রোড ম্যাপ

কলকাতা থেকে মুম্বই বা দিল্লি হয়ে কানেক্টিং ফ্লাইট পাবেন।

যাতায়াতের জন্য সেরা মাধ্যম, ট্রাম। ভ্যান গখ মিউজ়িয়ামের কাছাকাছি স্টপ, ভ্যান বেরলেস্ট্রাট ও মিউজ়িয়ামপ্লাইন। রেড লাইট সিক্রেটস মিউজ়িয়ামের কাছে ড্যাম ট্রাম স্টপ। রেমব্রান্টুইসের কাছে, ওয়াটারলুপ্লাইন।



রেমব্রান্ট জীবদ্দশায় প্রায় তিনশোটি অয়েল পেন্টিং এঁকেছিলেন। এচিংয়ের কাজ করেছেন প্রায় দুশো নব্বইটি।



ডাক্তারবাবু

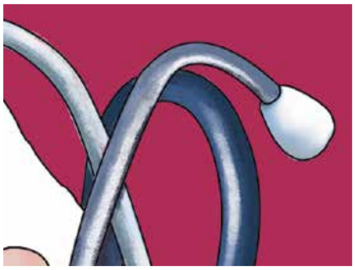
শেখর মুখোপাধ্যায়

“কেন যে ডাক্তারবাবু প্র্যাকটিস বন্ধ করে দিলেন!” আক্ষেপ করেন একজন,
“ওই ক্লিনিক্যাল আই আজকাল ক’টা ডাক্তারের থাকে!”
“উনি তো আজকের ডাক্তার নন। অনেক বয়স হয়েছে।”
“তাতে কী! শরীর শক্তপোক্তই আছে। প্র্যাকটিস করতে অসুবিধে কোথায়! না হয়, আগের চেয়ে কমই করলেন, কলে গেলেন না। চেম্বার একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার কী আছে! না, না। এ শুধু আমার কথা নয়, অনেকেই বলছে। বলবে না-ই বা কেন! আর কে পারে রুগিকে শুধু দেখে তার ভিতরের রোগ বুঝতে! সব ডাক্তারই তো আগে লিখবে হাজারটা টেস্ট। টেস্টের রিপোর্ট আসবে, তারপর শুরু হবে চিকিৎসা।”
“হ্যাঁ, ইনি ওষুধও দেন খুব কম। অন্যরা যেখানে দশটা ট্যাবলেট, সিরাপ গিলতে বলবেন, ইনি লিখবেন দু’টি-তিনটি অব্যর্থ ওষুধ।”
“ধন্বন্তরি! ধন্বন্তরি!”
ভোরবেলা পার্কে বয়স্ক প্রাতর্ভ্রমণকারীরা আলোচনা করছিলেন পাড়ার ডাক্তার শক্তিনাথ রুদ্রের বিষয়ে। ডাক্তারবাবুর বয়স আশির উপরে। বছর ত্রিশ হল কলকাতায় এই পাড়ায় বাড়ি করে বসবাস করছেন, সঙ্গে পাড়াতেই প্র্যাকটিস। তাঁর প্রেসক্রিপশনের মাথায় লেখা থাকে, ডা. এস এন রুদ্র, এমবিবিএস (ক্যাল), এমডি (জেনারেল মেডিসিন), রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার (এক্স, আমদাবাদ ডায়মন্ড হসপিটাল)।

সরাসরি শক্তিনাথকে কেউ কিছু বলতে পারেন না। তাঁর স্ত্রী অরুণাকে অনেকেই জিজ্ঞাসাবাদ করেন। অনুরোধ করেন, ডাক্তারবাবু যেন সকলের কথা ভেবে আবার রুগি দেখা শুরু করেন। অরুণা একদিন স্বামীকে বললেন, “চলো, আমরা অন্য কোথাও চলে যাই। না হয়, আসানসোলের বাড়িই যাই।”
“না, অরুণা!” শক্তিনাথ শূন্য দৃষ্টিতে চান, “বাবা আমাকে সে বাড়িতে প্রবেশের অধিকার দিয়ে যাননি। আর, এই বয়সে অন্য কোথাও নতুন করে ... নাহ্!”
অরুণাকে বিষণ্ণ দেখায়। শক্তিনাথের মনে পড়ে বাবার কথা। এলাকার মানুষ তাঁর ক্লিনিক্যাল আইয়ের কথা বলেন, তাঁর পিতৃদেবকে এঁরা দেখেননি, নামও শোনেননি। ডাক্তার জিতেন্দ্রলাল রুদ্র প্রয়াত হয়েছেন প্রায় সিকি শতক আগে, আজও আসানসোলে তাঁকে নিয়ে বহু কিংবদন্তি চালু আছে। বেশিরভাগই মুখে মুখে প্রচারিত, প্রসারিত, রঙিন, মশলাদার আষাঢ়ে গল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভিতরের কথাটা অবশ্য তাতে বদলায় না। ডক্টর জে এল রুদ্রকে মানুষ ভরসা করত, রুগিরা ঈশ্বর জ্ঞানে শ্রদ্ধা করত। বলত, ডাক্তারবাবু বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়ালেই রোগ ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালায়। তাঁকে দেখেই রুগির মনে আশার সঞ্চার হত, তুলনায় সুস্থ বোধ করত। ব্যস্ত ডাক্তার রুদ্রের আচরণে ব্যস্ততার ছাপ কেউ কখনও দেখেনি। রুগিরা কেউ দেখেনি তাঁকে চিন্তিত গম্ভীর, কিংবা ক্রোধে মেজাজ হারাতে। যদিও, ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ তাঁর কম ছিল না। দূর-দূরান্ত থেকে অনেক রুগিই আসত ব্যাধির একেবারে শেষ দশায়, সব চিকিৎসক জবাব দেওয়ার পর। ডাক্তারবাবু প্রথমে নীরবে রুগিকে দেখতেন, তার সব বক্তব্য শুনতেন, প্রয়োজনে আরও প্রশ্ন করতেন, তারপর প্রেসক্রিপশন লিখতেন, মুখ ছেয়ে থাকত প্রশান্ত হাসিতে। বলতেন, “চিন্তা করবেন না।”
বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে শক্তিনাথের ঠোঁটে। ডাক্তার জিতেন্দ্রলাল রুদ্রের চিকিৎসায় অনেক রুগি আরাম হয়েছে ঠিকই, তার কয়েক গুণ চিকিৎসাধীন ঢলেও পড়েছে মৃত্যুর মুখে। তবু, মানুষ তাঁকে মনে করত যমের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর বেশিরভাগ কলই আসত সেই সব বাড়ি থেকে, যেখানে নাকি যম তাঁর দলবল নিয়ে পৌঁছে গিয়েছেন। এমন দশটি বাড়ির দু’টিতেও যদি ডাক্তার রুগির প্রাণ বাঁচাতে সমর্থ হতেন, সেই কাহিনির ফুলেফেঁপে ওঠা প্রচারে বাকি আট বাড়িতে তাঁর ব্যর্থতার বৃত্তান্ত চাপা পড়ে যেত।
ডক্টর জে এল রুদ্র ছিলেন এমবি, সেকালের ব্যাচেলর অফ মেডিসিন। তখনও এমবিবিএস পাঠ্যক্রম চালু হয়নি। পাশ করে চাকরি শুরু করেছিলেন সরকারি হাসপাতালে। বদলি হয়ে আসেন আসানসোলে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ শুরু হয়। তাঁর ঊর্ধ্বতনরা ছিলেন আরও বড় ডিগ্রিধারী। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান ডাক্তার রুদ্র আরও বেশি ডিগ্রি অর্জন করায় সময় দিতে পারেননি, বিদেশ যাওয়াও সম্ভব হয়নি। বয়স ও অভিজ্ঞতায় তাঁর তুলনায় তরুণেরা উচ্চতর ডিগ্রির মর্যাদায় স্বভাবতই পদোন্নতিতে তাঁকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে থাকেন। কেউ এ বিষয়ে ইঙ্গিত করলে বলতেন, “কী আর করা যাবে! যে চাকরির যে নিয়ম। ওদের ডিগ্রি আছে, আমার নেই।” ডাক্তারবাবু অবশ্য হাসপাতালের চিকিৎসা প্রসঙ্গে প্রয়োজনে দ্বিমত প্রকাশে দ্বিধা করতেন না। এমন মাঝে মধ্যে হত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসার পরিণতিতে মনে হত, ডক্টর রুদ্রই ঠিক বলেছিলেন। যদিও, শুধুমাত্র পরিণতি প্রমাণ নয়। অন্তত, চিকিৎসা শাস্ত্রের পণ্ডিত মহলে নয়। কিন্তু, সাধারণ জনমানসে চিকিৎসকের বিষয়ে ধারণা

তৈরিতে এগুলি ছিল যথেষ্ট। একবার এক সত্তরোর্ধ্ব রোগী মূত্রাশয়ের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। উচ্চতর ডিগ্রিধারী ডাক্তার মতপ্রকাশ করলেন, অবিলম্বে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন। ডাক্তার রুদ্র বললেন, ঠিক ওষুধ ও পথ্যের জোরে রোগী আরও আট-দশ বছর বাঁচতে পারে, কিন্তু অস্ত্রোপচারের পর রোগীর বাঁচার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। উচ্চতর ডিগ্রিধারী খেপে উঠে বললেন, "মশায়, প্রমাণ করতে পারেন?"
ডাক্তার রুদ্র মাথা নাড়েন, "না। প্রমাণ পেতে অপেক্ষা করতে হবে। অন্তত কয়েক দিন, নইলে আট থেকে দশ বছর।"
দু'জনের মতদ্বৈধ জানাজানি হল। চিকিৎসা বিভাগের উপরমহল বিরক্তি প্রকাশ করে ডাক্তার রুদ্রকে তিরস্কার করলেন। রোগীর উপরে অস্ত্রোপচার হল। কয়েক দিনের মাথায় সে হাসপাতালেই মারা গেল। ডাক্তার জিতেন্দ্রলাল রুদ্রও সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আসানসোলেই প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করলেন।

শক্তিনাথ মনে করেন, তাঁর বহুচর্চিত ক্লিনিক্যাল আই পিতার কাছ থেকে রক্তের সূত্রেই পেয়েছেন। চিকিৎসাবিদ্যার প্রথম পাঠও তিনিই দিয়েছেন পুত্রকে। প্রতিদিন স্কুলের পড়াশোনার মধ্যেই সময় বের করে বাবার চেম্বারে যেতেন শক্তিনাথ। তাঁকে হাতের কাছে এটা-সেটা এগিয়ে দিতেন, তাঁর চিকিৎসাপদ্ধতি লক্ষ করতেন, সে-বিষয়ে পড়াশোনাও করতেন তাঁর তত্ত্বাবধানে। চিকিৎসাবিদ্যায় ছেলের আগ্রহ দেখে ডাক্তার রুদ্র খুশি হয়েছিলেন। শক্তিনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যখন ডাক্তারি পড়তে শুরু করেন, তখন সহপাঠীদের তুলনায় তিনি অনেক এগিয়ে তো বটেই, শিক্ষকদেরও কারও কারও জ্ঞানের বিষয়ে তাঁর সন্দেহ জাগে। শক্তিনাথের প্রশ্নের মুখে বিরক্ত, অসহায়, ক্রুদ্ধ দেখাত তাঁদের। ছুটিছাটায় বাড়ি ফিরে বাবাকে এ সব কথা জানাতেন। ডাক্তার রুদ্র বলতেন, "তুমি শিক্ষার্থী, শিক্ষকদের জ্ঞানের বিষয়ে প্রশ্নবান না হয়ে বরং জ্ঞান আহরণের বিষয়ে যত্নবান হও। কার কাছ থেকে কখন কীভাবে কী তুমি পাবে, তা কেউ বলতে পারে না। বিদ্যার্থীর সবচেয়ে বড় সম্পদ তার বিনয়, আগ্রহ এবং শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা।"
শক্তিনাথ তর্কের উদ্যোগ করতেন, "তাই বলে, যে কিছু জানে না তাকেও ..."
ডাক্তার রুদ্র পুত্রকে হাত তুলে থামিয়ে দিতেন। শক্তিনাথের আলোচনার উদ্যোগ সেদিন সেখানেই সমাপ্ত হত। কিন্তু, শক্তিনাথ বারংবার এ সব প্রসঙ্গ তুলতেন। এমনকি, জিতেন্দ্রলালের চিকিৎসা পদ্ধতির বিষয়েও মাঝে মধ্যে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগতে শুরু করল। শক্তিনাথ তখন ডাক্তারির চতুর্থ বর্ষের ছাত্র, ছুটিতে বাড়ি এসেছেন। রাত্রে ডাক্তার রুদ্র এক পুরনো রুগিকে দেখতে কলে যাবেন, শক্তিনাথ তাঁর সঙ্গী হলেন। ডাক্তার রুদ্র সেদিন রুগিকে এক রকম জবাব দিলেন। প্রশান্ত ধীর ভঙ্গিতে রুগির আত্মীয়দের বললেন, "আমার যা করার, আমি করেছি। আপনারা ওঁকে হাসপাতালে ভর্তি করুন। বড় ডাক্তাররা হয়তো কিছু ব্যবস্থাপত্র দিতে পারবেন।"
শক্তিনাথ ফেরার পথে জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা, বড় ডাক্তার কাদের বলছেন আপনি?"
ডাক্তার রুদ্র জবাব দেন, "যাঁরা চিকিৎসাশাস্ত্রের পণ্ডিত।"
"মানে, যার বড় ডিগ্রি আছে, সে বড় ডাক্তার?"
"তাই তো হওয়ার কথা।"
শক্তিনাথ কয়েক মুহূর্ত পরে বলেন, "বাবা, এই পেশেন্ট বাঁচবে না, সপ্তাহখানেকের মধ্যে মারা যাবে।"
"হয়তো।"
"তাহলে সেই কথাটা ওর বাড়ির লোকজনদের কেন বলে দিলেন না? হাসপাতালে ভর্তি করতে বললেন কেন?"
"চিকিৎসকের কর্তব্যের কারণে", ডাক্তার রুদ্র বলেন, "মানুষ যখন বিশ্বাস করে মৃত্যু নিশ্চিত, জীবনের আশা হারিয়ে যায়। তখন সে মৃত্যুর দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়। চিকিৎসক হিসেবে আমি তা হতে দিতে পারি না। ডাক্তার আর রোগী, দু'জনই মানুষ। দু'জনের সম্পর্কের মূল জায়গা হল জীবনের মূল্য। আমি কত বড় ডাক্তার আর রুগি কত দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, তার চেয়েও বড় কথা হল, জীবন আর মরণের মাঝখানে আমি চিকিৎসক মাত্র। জীবনের সীমানা নির্দেশ করার কে! চিকিৎসার শেষ নেই, চিকিৎসকেরও শেখার শেষ নেই।"
শক্তিনাথ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেন, "খামোখা ওদের আবার কতগুলো টাকা খরচ হবে। অন্য ডাক্তারদের সঙ্গে তফাত কী রইল তাহলে আপনার!"
"জানি না। শুধু জানি, ভুল সকলের হয়, আমারও হতে পারে।"
"সহজ কথাটা আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন, বাবা! বড় হাসপাতালের চিকিৎসায় যদি পেশেন্ট বাঁচে, প্রমাণ হয় আপনার চিকিৎসায় ভুল ছিল! আপনার ভুলের দাম রুগি কেন দেবে আরও টাকা খরচ করে?"
"কারণ, সে বাঁচতে চায়।"



শক্তিনাথ ডাক্তার হিসেবে নাম করেছেন। বহু জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে কলকাতায় এসে থিতু হয়েছেন। যেখানেই যখন থেকেছেন, চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কলকাতাতেও কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতাল তাঁকে সহযোগী চিকিৎসক হিসেবে চেয়েছে। শক্তিনাথ সে সব প্রস্তাব গ্রহণ করেননি।

"না," শক্তিনাথ ঘাড় নাড়েন, "আপনি আসলে জানেন, বড় হাসপাতালের বড় ডাক্তারও কিছু করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হবে আপনিই সেরা। আপনি যা করতে পারেন না, তা আর কেউ পারে না।"

ডাক্তার রুদ্র জবাব দেন না। বিস্মিত বিষণ্ণ মুখে দেখেন পুত্রকে। পরদিন শান্ত গম্ভীর স্বরে বলেন, "শক্তি, তুমি আপাতত আর এ বাড়িতে আসবে না। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে না। আমি তোমার কলকাতার ঠিকানায় টাকা পাঠিয়ে দেব। ডাক্তার হও, নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করো, জীবনে উন্নতি করো, সুখী হও। কিন্তু, আমার সামনে এসে দাঁড়ানোর কথা সেদিন ভাববে, যেদিন তোমার মনে অহঙ্কারের অবসান হবে। তুমি অত্যন্ত প্রতিভাবান। অনেক বড় ডাক্তার হবে। কিন্তু, তোমার আরও শিক্ষার প্রয়োজন আছে। আমি অবস্থাগতিকে পারিনি, তুমি আরও পড়াশোনা করো। ডিগ্রি অর্জন করো। বিদ্যার আর এক নাম বিনয়। একজন চিকিৎসক সত্যি কথাটা বলতে কখনও কুণ্ঠিত হবে না। কিন্তু, জ্ঞানের অহঙ্কার তাকে সাজে না। যেদিন অহং বর্জন করতে পারবে, তোমাকে আমি আবার পুত্র বলে মেনে নেব। আপাতত..."

শক্তিনাথ ডাক্তার হিসেবে নাম করেছেন। বহু জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে কলকাতায় এসে থিতু হয়েছেন। যেখানেই যখন থেকেছেন, চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কলকাতাতেও কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতাল তাঁকে সহযোগী চিকিৎসক হিসেবে চেয়েছে। শক্তিনাথ সে সব প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। হাসপাতালের বাণিজ্যিক কৌশল আর তাঁর ডাক্তারির নিয়ম মিলবে না।

তিনি বাড়ির একতলায় একটি ঘরে রুগি দেখেন। প্রয়োজনে, রুগির বাড়িতে কলেও যান, যা আজকাল প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারেরা এড়িয়ে চলতে চান। বছর পঁচিশ আগে ডাক্তার জিতেন্দ্রলাল রুদ্রের মৃত্যুর খবর পেলেও, শক্তিনাথ পিতার মৃতদেহ চাক্ষুষ করতে বা, দেহের সৎকার করতে আসানসোল যাননি। স্ত্রীকে বলেছিলেন, "বাবার জীবদ্দশায় আমাদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়নি। আজ কী প্রমাণ করতে আসানসোল যাব!"

ডাক্তার জিতেন্দ্রলাল রুদ্রের অ্যাটর্নি আসানসোলের বাড়ির চাবি আর সম্পত্তির দলিল পৌঁছে দিয়েছিলেন কলকাতায়। ডাক্তার রুদ্র সবই লেখাপড়া করে দান করেছেন তাঁর পুত্রবধূকে।

শক্তিনাথের একমাত্র সন্তান অনির্বাণও ডাক্তার হয়েছে, দেশ ও বিদেশ থেকে অনেকগুলি ডিগ্রি অর্জন করে মুম্বইয়ের এক বিখ্যাত হাসপাতালে কর্মরত। সে এ দেশে কর্কটরোগের প্রথম সারির বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত। দেশ জোড়া এই সুনাম শক্তিনাথ এবং তাঁর পিতা জিতেন্দ্রলাল অর্জন করতে পারেননি। পিতামহ এবং পিতার তুলনায় অনেক বেশি খ্যাতিমান ডক্টর অনির্বাণ রুদ্র। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বিকাশের ধারা হয়তো এমনই হওয়ার কথা।

প্রথম দিকে, যখন কলকাতায় কেউ শক্তিনাথকে চিনত না, তিনি কয়েকটি ওষুধের দোকানে বসতেন। ক্রমশ এলাকায় তাঁর সুনাম হতে, মেডিক্যাল রিপ্রেজ়েন্টেটিভরা ধর্না দিতে শুরু করল। এদের কোনও কালেই বিশেষ পছন্দ করেন না শক্তিনাথ। চিকিৎসাবিদ্যার কিছুই এরা বোঝে না। বোঝে শুধু কীভাবে ডাক্তারকে ভজিয়ে কোম্পানির ওষুধের বিক্রি বাড়ানো যায়। এদের সঙ্গে কথা যত কম বলা যায় তারই চেষ্টা করেন তিনি। তবু এরা যখন নির্লজ্জের মতো ঝুলোঝুলি করে, শক্তিনাথ বলতে বাধ্য হন, "দেখুন, আপনাদের ওষুধের তুলনায় অনেক কম দামে একই ওষুধ পাওয়া যায়। আমি কেন দামি ওষুধ লিখে পেশেন্টের খরচ বাড়াব!" কখনও বলেন, "আপনাদের এটা তিনটে ওষুধের কম্বিনেশন ড্রাগ। আমার পেশেন্টের লাগবে একটি ওষুধ, বাকি দু'টি সে গাঁটের কড়ি খসিয়ে কিনবে কেন? অদরকারি ওষুধ খাবেই বা কেন!"

মেডিক্যাল রিপ্রেজ়েন্টেটিভ সম্প্রদায় ডক্টর এস এন রুদ্রের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। বিরক্ত হন ওষুধের দোকানের মালিকও। ডাক্তারবাবুর পাশাপাশি তিনিও কিছু কমিশন পেতেন, সেটা বরবাদ হয়।

তার উপরে ডাক্তারবাবু ওষুধও খুব কম লেখেন। দোকানের ব্যবসা বাড়ে না। সর্বোপরি, ডাক্তারবাবু সেই ওষুধটিই লেখেন যেটি তিনি সর্বাপেক্ষা সুপ্রযোজ্য মনে করেন। সেই ওষুধটি হয়তো দোকানে নেই। কিন্তু, অন্য কোম্পানির একই ওষুধ দোকানে আছে। হয়তো দাম কিছু বেশি, হয়তো সেটি কম্বিনেশন ড্রাগ। ডাক্তারবাবু কিছুতেই লিখবেন না। এই দোকানে ডাক্তার দেখিয়ে রুগি চলে যায় অন্য দোকানে ওষুধ কিনতে। এই দোকানদার মনে মনে গাল পাড়েন তাঁর দেওয়া চেম্বারে বসা ডাক্তারকে।

মনের কথা বেশি দিন মনে থাকে না, সময়ে বিস্ফোরণ ঘটে। একদিন এক রুগি হাতে প্রেসক্রিপশন দুলিয়ে অন্য দোকানের উদ্দেশে রওনা হতেই এই দোকানের মালিক তেড়ে ঢুকে আসেন ডাক্তারের চেম্বারে। মুখে তোড়ে গালিগালাজ। ডাক্তারের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া না পেয়ে, মালিক আরও খেপে ওঠেন। ডাক্তারবাবুর কলার ধরে তাঁকে টেনে তোলেন চেয়ার থেকে। টানতে টানতে বাইরে আনেন। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন রাস্তায়, "শালার ডাক্তার! যদি আর কোনও দিন এখানে বসতে দিয়েছি! ভাগ শালা!"

প্রতীক্ষারত রুগির দল সবিস্ময়ে চেয়ে দ্যাখে ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়িয়ে, পোশাকের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে চলে যাচ্ছেন। দোকান মালিকের সঙ্গে তাদের বিতণ্ডা বাধে।

এই ঘটনার পর শক্তিনাথ নিজের বাড়ির একতলায় রুগি দেখতে শুরু করলেন। পসার আগেই জমছিল, আরও জমে উঠল। প্রায় ত্রিশ বছর ডাক্তারি করলেন কলকাতায়। ছেলে গত বছর নিষেধ করল। মুম্বই থেকে ক'দিনের ছুটিতে এসেছিল। বলল, "বাবা, আর নয়। অনেক বয়স হল, এবার এ সব বন্ধ করো।"

ডাক্তার পিতৃদেবের আদেশে ষাট বছর আগে বাড়ি ছেড়েছিলেন শক্তিনাথ। ডাক্তার সন্তানের নির্দেশে ডাক্তারি

ছেড়ে দিলেন। হয়ে গেল এক বছর।
আজ শক্তিনাথ বড় বিপদেই পড়েছেন। সকাল হতে-না-হতে এক রুগির বাড়ির লোক এসে তাঁর দরজায় বসে আছে। ডাক্তারবাবুকে ডাকাডাকি করছে। শক্তিনাথ তাকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, ডাক্তারি তিনি ছেড়ে দিয়েছেন, গত এক বছরে একজন রুগিরও চিকিৎসা করেননি, তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। কলকাতায় অনেক বড় ডাক্তার আছেন, রুগিকে তাঁদের দেখানো হোক। রুগির বাড়ির লোক কিছুতেই শুনবে না। সে একটানা হাউমাউ করে কেঁদে চলেছে। কাঁদতে কাঁদতে বলে চলেছে, রুগি এক কালে ডাক্তার শক্তিনাথ রুদ্রের কাছেই নিয়মিত চিকিৎসা করাত এবং ভাল ছিল। আজ সে মরণাপন্ন, সব হাসপাতাল জবাব দিয়েছে। রুগি মৃত্যুশয্যায় পড়ে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে চলেছে, ডাক্তারবাবু যেন একটিবার তাকে দেখতে আসেন।
ডাক্তার রুদ্রের প্রতিবেশীরা জানলা-দরজা হাট করে সব শুনছে। বাড়ির সামনে পথচলতি মানুষের ভিড় জমে যাচ্ছে। সকলে রুগির হয়ে সোচ্চার আর্জি জানাচ্ছে, ডাক্তার দয়া করে একটিবার দেখে আসুন এই রুগিকে।
ঘরে স্তব্ধ নতমস্তক বসে আছেন অশীতিপর ডাক্তার শক্তিনাথ রুদ্র। স্ত্রী অরুণা পাশে এসে বসেন, স্বামীর হাত ধরে বলেন,

শক্তিনাথ নির্বাক নতমস্তক বসে থাকেন। হয়তো হয়, কিন্তু... ছেলের কণ্ঠস্বর কানে বাজে, '...বাবা, অনেক হয়েছে। এবার এ সব বন্ধ করো। আমার মানসম্মানের কথাটা ভাবো। তোমাকে এলাকার বাইরে কেউ চেনে না। আমাকে যে গোটা দেশ চেনে! কী হবে, যদি সকলে জানতে পারে গ্রেট অঙ্কোলজিস্ট ডক্টর অনির্বাণ রুদ্রের বাবা... ছি ছি!'
"ডাক্তারবাবু!" কেঁদে ওঠে রুগির পরিজন।
"হ্যাঁ", নড়েচড়ে বসেন শক্তিনাথ, "এক টুকরো কাগজ আর একটা কলম দিন।"
'...বাবা, আমি খোঁজ নিয়েছি, আমদাবাদে ডায়মন্ড হসপিটালে ডক্টর শক্তিনাথ রুদ্র নামে কখনও কোনও রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন না...'
"নিন, ডাক্তারবাবু," শক্তিনাথের দিকে কাগজ আর কলম এগিয়ে দেয় কেউ।
'...বাবা, ডাক্তার হিসেবে তোমার রেজিস্ট্রেশন নম্বরই নেই। থাকার কথাও নয়। তুমি ডাক্তারি পাশ করনি। মা বলেছে, তুমি ডাক্তারি পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিয়েছিলে, ফাইনাল ইয়ারে পরীক্ষা দাওনি...'
শক্তিনাথ কাগজে ওষুধের নাম লিখতে শুরু করেন।
'...বাবা, তোমার কোনও অধিকার নেই। বাবা, তুমি ডাক্তার



আজ শক্তিনাথ বড় বিপদেই পড়েছেন। সকাল হতে-না-হতে এক রুগির বাড়ির লোক এসে তাঁর দরজায় বসে আছে। ডাক্তারবাবুকে ডাকাডাকি করছে। শক্তিনাথ তাকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, ডাক্তারি তিনি ছেড়ে দিয়েছেন, গত এক বছরে একজন রুগিরও চিকিৎসা করেননি, তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

"যাও, একবার দেখে এসো।"
শক্তিনাথ মুখ তোলেন, স্ত্রীর চোখে আকুল সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে জিজ্ঞেস করেন, "যাব?"
"যাও।"
"কিন্তু, খোকা যে ..."
"আমি ওকে বুঝিয়ে বলে দেব। বলব, উপায় ছিল না। আর এ তো রোজ হচ্ছে না। এক বছর পরে মাত্র একজনই তো এসেছে নাছোড়বান্দা হয়ে। যাও।"

শক্তিনাথ বসে আছেন অর্ধ-চেতন রুগির বিছানার পাশে। সে মৃত্যুর দুয়ারে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। শক্তিনাথের কিছু করার নেই। সে কথাই তিনি জানালেন রুগির পরিজনদের। রুগির বড় ছেলে, এ-ই গিয়েছিল শক্তিনাথকে ডাকতে, কেঁদে উঠল। বলল, "আগামী পরশু আমার ছোট মেয়ের জন্মদিন। ডাক্তারবাবু, কোনওভাবেই কি এমনটা হয় না, পরশু বাবা বিছানা থেকে উঠে আমার মেয়েটাকে আশীর্বাদ করলেন? তারপর না হয়..."

নও, তুমি, তুমি...'
শক্তিনাথ ওষুধের নাম লিখে, কাগজটা রুগির বড় ছেলের হাতে দেন।
'...বাবা, তুমি ভুয়ো ডাক্তার, বেসিক্যালি হাতুড়ে...'
"হ্যাঁ," শক্তিনাথ বুকে ব্যথা অনুভব করেন। রুগির বিছানার পাশ থেকে উঠতে উঠতে বলেন, "এর একটাই ডোজ়। আজ দুপুরে দেবেন।"

বাড়ি ফিরে শক্তিনাথ শুনলেন, অনির্বাণ ফোন করেছিল।
"কেন?" উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করেন অরুণাকে, "ও কি এর মধ্যেই জেনে গেল..."
"না," অরুণা সমধিক উদ্বিগ্ন স্বরে বলেন, "মুন্নি খুব অসুস্থ। হাসপাতালে আছে প্রায় এক সপ্তাহ, পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে না। খোকা বলছে, তুমি যেন একবার গিয়ে দ্যাখো।"
"আমি!"
"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ," অরুণা কেঁদে ওঠেন, "আর অভিমান করে বসে থেকো না।"

"অভিমান! না, না। চলো।"
অনির্বাণ মা-বাবার মুম্বই আসার বিমানের টিকিট অরুণার মোবাইল ফোনে পাঠিয়ে দিয়েছে। পত্রপাঠ রওনা হলেন শক্তিনাথ ও অরুণা।
মুন্নি অনির্বাণের একমাত্র সন্তান। পনেরো বছর বয়স। জ্বর, সর্দি, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা এবং পেটের গোলমাল নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। ঠাকুরদাকে দেখে ম্লান হাসল। শক্তিনাথ তার বিছানার পাশে বসে, তাকে অনেক ক্ষণ দেখলেন। ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, নাতনি কী খায়। অনির্বাণ আমতা আমতা করে জবাব দিল,
"ওর মা ভাল বলতে পারবে।"
শক্তিনাথের পুত্রবধূ প্রিয়াঙ্কা জানাল, "ওই পিৎজ়া, বার্গার, মোমো, স্যান্ডউইচ এই সবই খায়।"
"ভাত, ডাল, সবজি খায় না?"
"খায়, খুব কম।"
"সবজি কী খায়?"
"সবজি বলতে আলু ছাড়া তেমন কিছু খায় না। আলু ভাজা, আলু ভাতে..."
"কী রে," শক্তিনাথ নাতনিকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেন, "ফলটল খাস? নাকি..."
"ভাল্লাগে না," মিনমিন করে জবাব দেয় মুন্নি।
"ওকে বাড়ি নিয়ে চল। আর," এক চিলতে কাগজে কিছু লিখে ছেলের হাতে দিয়ে শক্তিনাথ বললেন, "বাজার থেকে এগুলো জোগাড় করে আন।"
"এত সবজি!" অনির্বাণ চোখ কপালে তুলে বলে, "কাঁচা আম! বাবা!"
শক্তিনাথ ছেলের চোখে চোখ রাখেন, "ডাক্তার হয়তো নই, খোকা। কিন্তু..."
"বাবা, ও সব কথা এখন থাক!"
"না রে, আজ স্বীকার করতে বাধা নেই, বাবা ঠিকই বলতেন। ভুল সকলেরই হয়। কারও জ্ঞানের অহঙ্কারে, কারও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের অভিমানে। এখানেও এরা ঠিক করছে না। হাসপাতালে মুন্নিকে রাজ্যের ওষুধ আর সিন্থেটিক ভিটামিন দিচ্ছে। ওর শরীর নিতে পারছে না। একবার আমার উপরে ভরসা রাখ। মুন্নিকে বাড়ি নিয়ে চল।"
"আচ্ছা," অনির্বাণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "বন্ড সই করে ওকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছি।"
বাড়ি এসে শক্তিনাথের নির্দেশে মুন্নির পথ্য দাঁড়াল ভাত, ডাল, সবজি আর কাঁচা আমের অম্বল। শক্তিনাথ বোঝালেন, "দিদি, ওষুধ মনে করেই না হয় খা।" দিন দুইয়ের মধ্যে মুন্নি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল।
কলকাতা থেকে ফোন পেলেন শক্তিনাথ। ও প্রান্তে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ বাজে, "ডাক্তারবাবু, বাবা উঠে বসেছেন, নাতনিকে আশীর্বাদ করেছেন..."
শক্তিনাথ ফোন কেটে দেন।
আরও কয়েক দিন পরে মুন্নি সম্পূর্ণ সুস্থ। কলকাতা থেকে আবার ফোন, "ডাক্তারবাবু, বাবা আর নেই।"
সপ্তাহ খানেক পরে অনির্বাণ বলে, "বাবা, আমাকে লোকে বড় ডাক্তার বলে। সেই অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে বসে থাকলে আমার মেয়ে বাঁচত না। আমি স্পেশ্যালিস্ট সার্জেন। ওর দরকার ছিল একজন ভাল জেনারেল ফিজ়িশিয়ান। কিন্তু, তুমি যেটা করলে সেটা চিকিৎসা নয়, টোটকা। হ্যাঁ, টোটকায় অনেক সময় কাজ হয়। এক কালে মা-মাসিরা টোটকা দিত, লোকে তাদের ডাক্তার বলত না। তুমি টোটকা দাও, ঠিক আছে। কিন্তু নিজেকে ডাক্তার বলে প্রায় পঞ্চাশ বছর প্রেসক্রিপশন লিখে চিকিৎসা করলে কোন যুক্তিতে! কত রুগি তোমার চিকিৎসায় মারা গিয়েছে, হিসেব রেখেছ? বুকে হাত রেখে বলতে পারো, তাদের অনেকেই ভাল ডাক্তারের চিকিৎসায় বেঁচে উঠত না?"
শক্তিনাথের বুকে বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো যন্ত্রণা জানান দেয়। কাতরে উঠে বলেন, "পারি না, বলতে পারি না, কেউ পারে না! কথাটা স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে আমাকে এখনই আসানসোল যেতে হবে।"
"কিন্তু," অনির্বাণ সবিস্ময়ে বলে, "সেখানে কেউই তো নেই!"
"বাবার পায়ের ধুলো আছে।"

অরুণা আসানসোলের বাড়ির কেয়ারটেকারকে ফোন করে জানিয়ে দিলেন, তাঁরা আসছেন। অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে আসানসোল যেতে যেতে শক্তিনাথের বুকের ব্যথা বেড়ে উঠতে থাকল। তিনি ধীরে ধীরে অরুণাকে বললেন,
"তোমাকে এখন কিছু দিন একা থাকতে হবে। আমার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে..."
অরুণা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন। শক্তিনাথ তাঁর ঠোঁটে আঙুল রেখে বলেন, "বাবা বলতেন, একজন ডাক্তার সত্যি কথাটা বলতে কখনও কুণ্ঠিত হবে না, কিন্তু জ্ঞানের অহঙ্কার তাকে সাজে না। আমি অহঙ্কারের বশে ডাক্তারি ডিগ্রি নিইনি। ঘরে বসে পড়াশোনা করেছি। হাতেকলমে চিকিৎসা করে হাত পাকিয়েছি। কাগজপত্র জাল করে ডাক্তারি করেছি। সারা জীবন ভেবেছি, বাবার সঙ্গে যুদ্ধে জিতে গেলাম। আসলে যে প্রতি মুহূর্তে বিদ্রুপ করেছি জীবনকে, তা বুঝছি আজ সামনে মৃত্যুকে দেখে।"
"প্লিজ়," অরুণা মিনতি করেন, "হাসপাতালে চলো..."
"অনেক আগেই আমার রোগ নির্ণয় করেছেন যিনি, তাঁর কাছে আমাকে আগে যেতে হবে।"
দু'জনে দুপুরে আসানসোলের বাড়িতে ঢুকলেন। বাইরের ঘরে ডাক্তার জিতেন্দ্রলাল রুদ্রের ছবি টাঙানো রয়েছে। ছবির সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ান শক্তিনাথ। ক্রমশ বুকের ব্যথা কমে আসে। মন শান্ত হয়। বিকেলে হাসপাতালে ভর্তি হন। চিকিৎসা শুরু হয়। সন্ধেয় দেখায় ঝরঝরে তাজা। নৈশভোজন সেরে, শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন শক্তিনাথ। মধ্যরাত্রি দেখল মৃত্যুর আগমন অভিভাবকের বেশে, ক্লান্ত ব্যথিত সন্তানকে স্নেহের স্পর্শে কোলে নিতে ঘুমের মধ্যে।

অলংকরণ: পিয়ালী বালা

দক্ষিণের শাড়ি-সংস্কৃতি

বাংলা ছাড়া দেশের আর যে জায়গা শাড়ি-বৈচিত্রে ঋদ্ধ, তা হল দক্ষিণ ভারত। তামিলনাড়ু, কর্নাটক, অন্ধ্র প্রদেশ, তেলেঙ্গানা ও কেরল...পাঁচ রাজ্যে অসংখ্য রকমের শাড়ি। তার নেপথ্যে নানা বুনন-কাহিনি। রয়েছে অনুষ্ঠানভেদে শাড়ি পরার নানা ধরন। চেনা কাঞ্জিভরম বা মঙ্গলগিরির মতো শাড়ির বাইরে ইল্কল, পাত্তেদা আঞ্চু, উপ্পাড়া, গোল্লাভামা, কাসুটি, পণ্ডুরু খাদি...পুজোয় যাঁদের শাড়ি কিনতেই হবে, তাঁদের বেছে নেওয়ার জন্য রইল দক্ষিণের বিস্তৃত শাড়ি-সম্ভার। ফ্যাশন-চিত্র তুলে ধরলেন মধুরিমা সিংহ রায়।

■ উত্তর কর্নাটকের কাসুটি সূচিশিল্পের শুরু প্রায় সাতের শতকে। ধারওয়াড় অঞ্চল থেকে তা বিস্তৃত হয় রাজ্যের অন্য গ্রামে। ধারওয়াড় খুন নামের শাড়িটি সমৃদ্ধ কাসুটি এমব্রয়ডারিতে। সঙ্গে কুর্গি ড্রেপিংয়ের প্রয়াস (ডানদিকের শাড়ি)। দক্ষিণ ভারতের হাতে বোনা সিল্ক শাড়ি। উইভিং প্যাটার্নে কোটা শাড়ির স্টাইল। জ়রি পাড়ে দক্ষিণের সংস্কৃতির ছোঁয়া (বাঁদিকের শাড়ি)।

(ডানদিকের শাড়ি): আলমিরা বুটিক, (বাঁদিকের শাড়ি): মাবেশা, ফোন: ০৩৩ ২৪৬৫১৮৬২, গয়না: আভামা জুয়েলার্স





■ কেরলের ট্র্যাডিশনাল অফ হোয়াইট সোনালি পাড়ের কাসাভু টিসু শাড়ি। আঁচলে কথাকলি নৃত্যের মুরাল পেন্টিং আলাদা আকর্ষণ যোগ করে।

শাড়ি: আলমিরা বুটিক
ফোন: ৯৪৩৩১২১৪৯৫
গয়না: ইন্ডিয়ান জেম অ্যান্ড জুয়েলরি ক্রিয়েশন
ফোন: ৮৯৮১০৮৯০০৮







■ অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীকাকুলামের একটি শহর পণ্ডুরু। সেখানেই বোনা হত এই খাদির শাড়ি। পণ্ডুরু পুনাস নামের পাহাড়ি কটন ব্যবহার করে তৈরি এই খাদির শাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বদেশি আন্দোলনের ইতিহাস। ট্র্যাডিশনাল এই শাড়িতে গোচি কটু ড্রেপিংয়ের প্রয়াস। সঙ্গে ভারী গয়নার সাজ।

শাড়ি: আলমিরা বুটিক, **গয়না:** ইন্ডিয়ান জেম অ্যান্ড জুয়েলারি ক্রিয়েশন





■ সিল্ক ও সুতির (সিকো) মিশ্রণে হাতে বোনা তেলঙ্গানার পোচমপল্লি। হলুদ রঙের জমি জুড়ে ইক্কত বুননশৈলী। ইক্কত ইন্দোনেশিয়া থেকে আসা এক ধরনের বুনন-পদ্ধতি। এক এক অঞ্চলে এক এক ধরনের ইক্কত পদ্ধতি ব্যবহার হয়। ওড়িশায় সম্বলপুরি, গুজরাতে পাটোলার মতো দক্ষিণে তার নাম পোচমপল্লি। উজ্জ্বল জরির কাজে মোড়া বেগুনি পাড় ও সোনার গয়না। পুজোর জমকালো সাজ।

শাড়ি: ইমাঙ্গ, **ফোন:** ৮৯১০১০৫৫৮৯, **গয়না:** ইন্ডিয়ান জেম অ্যান্ড জুয়েলরি ক্রিয়েশন



■ দক্ষিণের কাঞ্জিভরমে রয়েছে বৈচিত্র। তামিলনাড়ুর হাতে বোনা সুতির কাঞ্জিভরম শাড়িটিতে আইরাম বুট্টা ডিজ়াইন (হাজার বুটি)। জমিজুড়ে ময়িল চক্রম নকশা। বোট নেক ব্লাউজ় ও অক্সিডাইজ়ড রুপোর গয়নায় সাজ সম্পূর্ণ।

শাড়ি: ইমাঙ্গ (@myemaang)
ব্যাঙ্গলস: আলমিরা



তেলেঙ্গানার সিদ্দিপেটের গোল্লাভামা শাড়ি কারুশিল্পের গুণে ইউনেস্কোর তালিকায় স্থান পেয়েছে। ছাই ও কালো রঙের মিশেলে এই শাড়ির বিশেষত্ব হল গোল্লাভামা মোটিফ। প্রায় ৬০ বছর আগে শাড়ির প্রচলন শুরু। যাদব সম্প্রদায়ের মেয়েরা মূলত পরতেন এই শাড়ি।

শাড়ি ও গয়না: আলমিরা বুটিক







■ অন্ধ্র প্রদেশের পূর্ব গোদাবরী অঞ্চলের উপ্পাড়া কটন। উপ্পাড়া তাঁত বিখ্যাত তার অনন্য ডিজাইনের জন্য। ডার্ক গ্রিন ও উজ্জ্বল বেগুনি চওড়া পাড়ের সমন্বয়ে শাড়িটি অনুষ্ঠানের জন্য আজর্শ। সঙ্গে উজ্জ্বল রঙের ব্লাউজ় ও জমকালো গয়না।

শাড়ি: আলমিরা বুটিক, **গয়না:** ইন্ডিয়ান জেম অ্যান্ড জুয়েলরি ক্রিয়েশন







■ কর্নাটকের পাত্তেদা আঞ্চুর ইতিহাস বেশ প্রাচীন। দশম শতকেও বোনা হত এই শাড়ি, এখনও সেই ধারা চলে আসছে। একটা সময় শিবভক্ত লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের মানুষরা ইয়েলাম্মা দেবীর জন্য এই শাড়ি মন্দিরে নিয়ে যেতেন। ওই সম্প্রদায় থেকে আসা দেবদাসীরা তারপর এই শাড়ি পরতেন। আবার মেয়ের বিয়ের আগেও ওই মন্দিরে এই শাড়ি নিয়ে যাওয়া হত, দেবীর আশীর্বাদের জন্য। একটি শাড়ি বুনতে লাগে প্রায় ৪৫ দিন। চওড়া পাড় ও তাতে একরঙের সরলরেখা এর বৈশিষ্ট্য।

শাড়ি: ইমাঙ্গ, **গয়না:** আলমিরা বুটিক



■ ফুশিয়া রঙের তামিলনাড়ুর বানানা সিল্ক। সাধারণত, কলাগাছের কাণ্ডের ফাইবার সুতোর বিশেষ কায়দায় ঢেলে তৈরি এই শাড়ি (বাঁদিকের শাড়ি)। তামিলনাড়ুর নাগাপট্টিনামের শাড়ি নাগাপট্টু। হালকা সবুজ শাড়িজুড়ে সূক্ষ্ম কাজ, আঁচলও আকর্ষণীয় (ডানদিকের শাড়ি)।

শাড়ি: আলমিরা বুটিক,
গয়না: ইন্ডিয়ান জেম অ্যান্ড জুয়েলরি ক্রিয়েশন



■ হাতে বোনা তামিলনাড়ুর সিকো (সিল্ক-কটন) কাঞ্জিভরম। শাড়িজুড়ে বনাসিঙ্গারাম (জঙ্গলের ফুল-পাতা) মোটিফ ও গঙ্গা-যমুনা পাড়। উজ্জ্বল শাড়িটিতে ট্র্যাডিশনাল মাদিসেরু ড্রেপিংয়ের প্রয়াস।

ডান ও বাঁ পাতার শাড়ি: ইমাঙ্গ গয়না (বাঁ দিকের পাতা): ইমাঙ্গ গয়না(ডান দিকের পাতা): আভামা জুয়েলার্স: ৯৮৩০৩৯৯৪৬২







■ হাতে বোনা উজ্জ্বল মেরুন সুতির কাঞ্জিভরম। কিন্তু এর বিশেষত্ব হল, লক্ষদ্বীপম মোটিফ। সঙ্গে ছাইরঙা রেট্রো পেট্টু পাড় (ডাবল বর্ডার)। সোনার গয়না ও চুলে ফুলের সাজে স্নিগ্ধ রূপ।

মডেল: প্রিয়ঙ্কা মণ্ডল ও ডিম্পল আচার্য, **মেক-আপ ও হেয়ার:** অভিজিৎ চন্দ, **ফোন:** ৯৮৩০৬৮৮৮৯০, **সহযোগী:** রবি, **স্টাইলিং ও ব্লাউজ়:** নীল সাহা, **ফোন:** ৯৮৩৬৬৮২৯৩৩, **লোকেশন সৌজন্যে:** দ্য অ্যাস্টর, শেক্সপিয়র সরণি, **ফোন:** ০৩৩ ২২৮২ ৯৯৫৭, **ছবি:** দেবর্ষি সরকার, **সহযোগী:** জয় চক্রবর্তী, **শুটিং কোঅর্ডিনেশন:** মৌমিতা সরকার, **রূপায়ণে:** অসীম হালদার

নতুন ট্রেন্ড J Beauty

মাখন-মসৃণ ত্বক। জেল্লাদার চুল। জাপানের মেয়েদের ত্বক ও চুলের মখমলি গ্লো দেখলে অনেকেরই মনে হয়, এমনটা তাঁরা পান কী করে! হ্যাঁ, পরিবেশগত কিছু সুবিধে নিশ্চয়ই রয়েছে সে দেশের। আসলে, শুধু জাপান কেন... প্রতিটা দেশেরই আবহাওয়া, জলবায়ু ও ট্র্যাডিশনাল সাজগোজের ধারা অনেকটাই প্রভাবিত করে সে দেশের মানুষের ত্বক ও চুলকে। কিন্তু সেই আবহাওয়া-গত ফারাকটুকু সরিয়ে রাখলে, জাপানের ত্বকচর্চার বিশেষ কিছু নিয়ম নিজেদের মতো করে আত্মীকরণ করে নেওয়া যেতে পারে।

কোরিয়ান রূপচর্চার পাশাপাশি সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে 'জে বিউটি'। জাপানের রূপচর্চায় মূল কথাই হল মিনিম্যালিজ়ম ও প্রাকৃতিক উপাদানের উপর নির্ভরতা।

'জে বিউটি' কী?

কিছুদিন আগে অবধিও 'কে বিউটি' বা কোরিয়ান বিউটি রেজিম বেশ চর্চায় ছিল। এখনও তা আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু কোরিয়ার পাশাপাশি এশিয়ার যে দেশের রূপরুটিন বিশ্বজনীন জনপ্রিয়তা লাভ করছে তা হল জাপান। জাপানের রূপচর্চার কৌশলের পোশাকি নাম 'জে বিউটি'। কলকাতার একটি বিউটি ব্র্যান্ডের কর্ণধার ও অর্গানিক স্কিনকেয়ার ফর্মুলেশন এক্সপার্ট স্নেহা ভট্টাচার্য জানালেন, ''জে বিউটি-র মূল কথাই হল 'লেস ইজ় মোর'। এই রূপচর্চার দু'টি মূল বিষয় হল: মিনিম্যালিস্টিক ও ন্যাচরাল। অর্থাৎ, কম সংখ্যক উপাদান দিয়েই রূপচর্চা সম্ভব। আর উপাদানের পরিমাণ যত কমবে, তা প্রয়োগের সময়ও লাগবে কম। মানে, লেস প্রডাক্ট=লেস অ্যাপ্লিকেশন টাইম। জে বিউটি-তে বেশ কিছু প্রাকৃতিক উপাদান যেমন অ্যালো ভেরা, সি উইড, গ্রিন টি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় বেশি। জাপানের মেয়েদের ত্বক তুলনায় নরম ও একটু ফোলা হয়। জে বিউটি-র মূল উদ্দেশ্য হল 'মোচি হাদা'। এর অর্থ, 'রাইস কেক স্কিন'...অর্থাৎ পরিপুষ্ট, বলিরেখা-বিহীন বাউন্সি ত্বক পাওয়াই এই রূপচর্চার উদ্দেশ্য। যেহেতু খুবই সিম্পলিস্টিক রূপ-রুটিন, তাই সারা বিশ্বে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করছে এই ট্রেন্ড। জাপানি সংস্কৃতিতে পুরনো ঐতিহ্য ও অভ্যেসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গুরুত্ব যেমন রয়েছে, তেমনই তার সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তিকে গ্রহণ করার ইচ্ছেও রয়েছে তাঁদের। সেই ট্রেন্ড তাঁদের স্কিন কেয়ার ফর্মুলেশনেও দেখতে পাই আমরা। প্রাচীন স্কিন কেয়ার সিক্রেট আর আধুনিক ফর্মুলা, দুইয়ের মিশেলে ত্বকচর্চা করেন তাঁরা।'' বহুযুগ আগে 'ওয়াবি-সাবি' বলে একটি কনসেপ্ট ছিল জাপানে। এর অর্থ, 'আমরা প্রত্যেকেই পারফেক্টলি ইমপারফেক্ট'। এই ধারণার উপর নির্ভর করেই দাগ-ছোপমুক্ত ত্বক নয়, বরং হেলদি স্কিনকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এই ত্বকচর্চায়। ক্লেনজ়িং অয়েল, লাইটওয়েট লোশন ও ময়েশ্চারাইজ়ার, প্রাকৃতিক উপাদান এ সবের পাশাপাশি টেকনোলজি ও নতুন প্রযুক্তিকেও আপন করে নেন তাঁরা। কোরিয়ান রূপ-রুটিনে অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় স্কিন হাইড্রেশন ও





কিছু কিছু প্রডাক্ট আছে, যা কোরিয়ান ও জাপানি রূপচর্চার ক্ষেত্রে প্রায় একই। যেমন, চাল ও গ্রিন টি। জে বিউটি-তে ক্যামেলিয়া অয়েল, ইয়ুজু (সাইট্রাস ফ্রুট), চেরি ব্লসমের নির্যাস ব্যবহৃত হয়।

এক্সফোলিয়েশনের উপরে। সেখানে জে বিউটি বেশি গুরুত্ব দেয় সঠিক ক্লেনজ়িংয়ের উপর। তবে কিছু কিছু প্রডাক্ট আছে, যা কোরিয়ান ও জাপানি রূপচর্চার ক্ষেত্রে প্রায় একই। যেমন, চাল ও গ্রিন টি। এর বাইরে জে বিউটি-তে ক্যামেলিয়া অয়েল, ইয়ুজু (সাইট্রাস ফ্রুট), চেরি ব্লসমের নির্যাস ব্যবহৃত হয়। প্রডাক্ট প্যাকেজিংয়ের দিক থেকেও জাপান মিনিম্যাল। আড়ম্বর বা বাহুল্য নেই তাতে।

ধাপে ধাপে জাপানি রূপচর্চা

ডাবল ক্লেনজ়িং: মিনিম্যাল এই রূপরুটিনের অতি প্রয়োজনীয় ধাপগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ডাবল ক্লেনজ়িংয়ের কথা। সাধারণত, দু'বার ক্লেনজ়িংয়ের প্রথম ধাপে অয়েল বেসড ক্লেনজ়ার ব্যবহার করেন তাঁরা। মেক-আপ বা সানস্ক্রিন তোলার জন্য হোক বা ত্বকের যাবতীয় ধুলো-ময়লা দূর করার জন্য। পরের ধাপে ব্যবহৃত হয় ফোমিং ক্লেনজ়ার। ডিপ ক্লেনজ় হয় ত্বক, যেটুকু ধুলো-ময়লার আস্তরণ বাকি ছিল তাও ধুয়ে যায় এর মাধ্যমে। ত্বক নরম ও মসৃণ হয়।

ডাবল ময়শ্চারাইজ়িং: প্রথমে হালকা কোনও লিকুইড লোশন ত্বকে লাগাতে হবে। এতে ত্বক আরও বেশি আর্দ্র হবে। এরপর ধাপে ধাপে ময়েশ্চারাইজ়ার ও সানস্ক্রিন অ্যাপ্লাই করার পালা।

ডাবল ক্লেনজ়িং ও ডাবল ময়েশ্চারাইজ়িংয়ের ধারা কিন্তু জাপানে বহু পুরনো। সেই 'গেইশা'দের সময়ে, মেয়েরা তাঁদের ভারী মেক-আপ তোলার জন্য প্রথমে ত্বকে এমোলিয়েন্ট অয়েল মাসাজ করতেন। তারপর তা ধুয়ে ফেলে ফোমিং ক্লেনজ়ার ব্যবহার করতেন। শেষে হাইড্রেটিং লোশন ও ময়েশ্চারাইজ়ার।

কলকাতায় কতটা জনপ্রিয় এই ট্রেন্ড?

জাপানের মিনিম্যালিস্টিক ট্রেন্ডে এখনকার তরুণ প্রজন্মের অনেকেই কিন্তু মজেছেন বলা চলে। কলকাতারই এক সালঁয় শুরু হয়েছে জাপানিজ় ফেশিয়াল। সালঁর পক্ষ থেকে পলক গুপ্তা জানালেন, ''জাপানিজ় ফেশিয়াল ত্বকের





ছবি সৌজন্যে: আইস্টক

যাঁদের সংবেদনশীল ত্বক, তাঁদের জন্য জাপানিজ় ফেশিয়াল বিশেষ উপযোগী। জাপানিজ় ফেশিয়াল কোলাজেন প্রডাকশন বাড়ায় বলে তা বার্ধক্যের ছাপ রুখতেও কার্যকর।

দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখে। তা অনেক বেশি পার্সোনালাইজ়ড, জেন্টল টেকনিকের উপর নির্ভরশীল। জাপানিজ় ফেশিয়ালের উপাদানগুলি সিঙ্গল-ইউজ় মোনো কিট, অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে এই উপাদান ব্যবহার করা যাবে না। কৃত্রিম সুগন্ধীর বদলে প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি হয় কিট। যেমন, পেঁপে, স্টোন ফ্লাওয়ার, অ্যালো ভেরা, মার্শমেলো, জবাগাছের গোড়া ইত্যাদি। মাসাজ টেকনিকের মধ্যে রয়েছে 'টাচ থেরাপি'। ট্রেন্ড থেরাপিস্টরা এই পদ্ধতিতে রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে সাহায্য করেন, আকুপাংচার পয়েন্টে সঠিকভাবে চাপ দিয়ে। যাঁদের সংবেদনশীল ত্বক, তাঁদের জন্য জাপানিজ় ফেশিয়াল বিশেষ উপযোগী। জাপানিজ় ফেশিয়াল কোলাজেন প্রডাকশন বাড়ায় বলে তা বার্ধক্যের ছাপ রুখতেও কার্যকর। আবার পিগমেন্টেশনের সমস্যাও দূর হয় এতে। তবে কলকাতায় জাপানিজ় ফেশিয়াল অপেক্ষাকৃত নতুন। যত দিন যাবে, তত এর জনপ্রিয়তাও বাড়বে।'' তবে কলকাতায় এই ট্রেন্ড নিয়ে অন্য সুরও শোনা গেল। স্নেহা ভট্টাচার্য জানালেন, ''আমাদের আবহাওয়া ও খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী জাপানিদের মতো ত্বক পাওয়া হয়তো খানিকটা অবাস্তব ইচ্ছে। জে বিউটি মিনিমাম প্রডাক্ট ব্যবহার করার কথা বলে, আর তা দিয়েই সুস্থ ও হাইড্রেটেড ত্বক পাওয়ার কথা বলে। কিন্তু আমাদের এত বৈচিত্রের দেশে ক্রেতারা অনেকেই মাল্টিপল টার্গেট ওরিয়েন্টেড প্রডাক্ট ব্যবহার করতে চান।'' গ্লোবালি যে জে বিউটি বেশ জনপ্রিয় হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। পক্ষে-বিপক্ষে মত যা-ই থাকুক না কেন, জাপানের মিনিম্যালিস্টিক রূপ-রুটিনের নির্যাসটুকু তো আত্মীকরণ করাই যায়।

লেখা: মধুরিমা সিংহ রায়

যোগাযোগ: পলক গুপ্তা (পনি আপ সালঁ): ৯৮৩০৮৫৬৬৪৪
স্নেহা ভট্টাচার্য: www.missmaedelin.com, ৯৭৪৮৮৮১৪৩২

মডেল: ঐন্দ্রিলা, অদ্রিজা, **মেক-আপ ও হেয়ার:** সজল দেবনাথ, **ফোন:** ৮২৯৬৪৬১৩৩২, **সহযোগী:** রাখি সাহা **স্টাইলিং:** প্রলয় দাশগুপ্ত, **ফোন:** ৯১২৩৮৭০১২৯ **লোকেশন:** ক্লাব ভর্দে ভিস্তা, **ফোন:** ০৩৩ ২৪২৩৯৯০০ **ছবি:** শুভদীপ ধর, **সহযোগী:** অয়ন সাধুখাঁ




KUNAL



... এবং অপালা আত্রেয়ী

অঞ্জন সেনগুপ্ত

পুণ্যসলিলা সরস্বতী নদী প্রতিদিন ক্রমশই একটু একটু করে সরে যাচ্ছে! সাধারণ চোখে যে তা ধরা পড়ে, তা-ও নয়। যাঁদের দিব্যজ্যোতি রয়েছে তাঁরা সন্দেহ করছেন। কিছুটা অনুধাবন করার চেষ্টা করছেন। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে দিব্যদৃষ্টির ভয়াবহতা নিয়েও আলোচনা

করছেন। নিত্যদিন যাঁরা একেবারে উষাকালে তাঁদের শিষ্যদের সঙ্গে করে সরস্বতীর পুণ্যসলিলে অবগাহনের জন্য আসেন, তাঁদের চোখে। কিন্তু কেন! এই কেন-র উত্তর কারও পক্ষেই বিশ্লেষণ করা দুরূহ! সকলেই জানেন 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে'!

এই মুহূর্তে কোনও অপরিচিত ব্যক্তি নদীর তটভূমিতে এসে দাঁড়ালে দেখতে পাবেন যে এমন উষা লগ্নে অনেক ঋষি-মহর্ষি এবং তাঁদের শিষ্যেরা একবুক জলে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে সবিতার দিকে মুখ করে একসঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছেন। এতজনের মুখনিঃসৃত মন্ত্র আকাশ বাতাস মথিত করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। যারা গৃহে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত, তাদের কানেও যদি এই সূর্যবন্দনা গিয়ে পৌঁছোয় তা হলে তাঁরাও উচ্চারণ করেন, ''নমঃ জবাকুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম।'' সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মন ও শরীর যেন পাপমুক্ত হয়ে যায়। সবিতার প্রথম কিরণের ছটায় শরীরে বল পাওয়া যায়। অবগাহনের পরে নিজেদের ঘাট থেকে শিষ্যদের নিয়ে ঋষিরা সামগান ধরলে শিষ্যেরাও উদাত্ত কণ্ঠে গলা মেলায়,

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ
তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ঘ
ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ।।''

(হে সবিতা, তুমি অন্তরীক্ষ, জল, স্থল সকল কিছু সৃষ্টি করেছ। তুমি সকল ভূত, পশুপাখি, স্থাবর-জঙ্গম ইত্যাদিকে স্ব স্ব স্থানে রেখেছ।)

প্রভাতের প্রাক্কালে শিষ্যেরা গো-মাতাদের দোহন করে গো-বৎসদের মায়ের কাছে ছেড়ে দেয়। এর পর তাদের গোচারণে দিয়ে আসে। তার পরে দলবদ্ধভাবে গুরুদেবের সঙ্গে অবগাহনে যাওয়া। ওরা ফিরে আসার আগেই ঋষি-পত্নী এবং কন্যারা গৃহের প্রশস্ত আঙিনা পরিষ্কার করে তাতে গোময়ের ছড়া দিয়ে তা সুন্দর করে লেপন করে রাখেন। গৃহ সংলগ্ন বিশাল বৃক্ষমূলের নীচে খুব ভাল করে ঝাঁট দিয়ে তাকেও গোময় দিয়ে লেপন করেন। এখানেই নিত্যদিন শিষ্যেরা গুরুদেবের কাছে অধ্যয়ন করে থাকে। এর পরের কাজটি সময়সাপেক্ষ। পরপর

একটা বা দুটো গোশালা পরিষ্কার করা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। কোনও কোনও ঋষির একাধিক গোশালা। সবই রাজাদের দেওয়া উপঢৌকন। কাজেই প্রায় সকলেরই গোশালা উপচে পড়ছে গোমাতা ও তাদের বৎসে!
ঋষিরা তাঁদের শিষ্যদের নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে খিড়কি দুয়ার দিয়ে নারীরাও নদীর উদ্দেশে রওনা দেয়। এই মুহূর্তে পিতা ঋষি বাচকনু সদলবলে গৃহে ফিরে এলে অনূঢ়া, ব্রহ্মবাদিনী, বিদুষী কন্যা গার্গী হাতে শুদ্ধ কাপড় নিয়ে নদীর উদ্দেশে বেরিয়ে গেলেন। অনেক গাছগাছালির মধ্যে সরু পথ। এটি এঁকেবেঁকে নদীর তটভূমিতে গিয়ে শেষ হয়েছে। বিভিন্ন ঋষির গৃহের খিড়কি দুয়ার দিয়ে একে একে স্ত্রী-কন্যারা এ সময় বেরিয়ে আসেন। সকলের উদ্দেশ্যই নদী। প্রভাতের এই সময়টায় এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে অনেক নারীই নদীতে অবগাহনের জন্য আসেন। অনেকেই গৃহে ফিরে গিয়ে শুদ্ধাচারে আহ্নিক করেন। আবার অনেক বালিকা এবং মায়েরা সারা দিনের তাপে তপ্ত হয়ে যাওয়া শরীরটাকে কিছুটা শীতল করার জন্য দু'বেলাই নদীতে আসেন। অরণ্যের সরু পথের উপর রোদের কাটাকুটি খেলা চলছে। বিভিন্ন গাছের ডাল-পাতার ফাঁক গলে তারা যেন গার্গীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। যদিও আজ তাঁর চলার গতিতে কোনও উচ্ছলতা নেই! বরং প্রতিটি পদক্ষেপই চিন্তাচ্ছন্ন! খুব যে একটা গভীর চিন্তা, তেমনটা নয়। কেন যে বারবার বহুশ্রুত এবং প্রতিদিন প্রভাত-দ্বিপ্রহর এবং সন্ধ্যায় উচ্চারিত গায়ত্রী মন্ত্রের দেবীর কথা মনে পড়ছে, তা অবশ্য তিনি জানেন না! মাঝে মাঝে সব মানুষের মনেই এমন কিছু কথার উদয় হয় যার কোনও সঠিক উৎস খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন এই মুহূর্তে মনে ঢুকে পড়েছেন গায়ত্রীদেবী। বড় আশ্চর্য তাঁর আগমন! পিতার মুখে শোনা বহুশ্রুত গল্পটি আজ মনকে উদ্বেল করে তুলেছে! ভাগ্যবতী গোয়ালিনী কন্যার জন্য গার্গী যৎসামান্য হলেও ঈর্ষালু হয়ে পড়েন। জানেন এমনটা হওয়া উচিত নয়,তবু মনটা খচখচ করে ওঠে। তিনি মনটাকে এমন ভাবনা থেকে সরিয়ে নিয়ে মনে মনে গায়ত্রীদেবীকে প্রণাম করেন। আর মনে মনে বলেন, 'মা, এমন হীনম্মন্য ভাবনার জন্য ক্ষমা করে দিয়ো।'
গার্গীর মনের এমন অস্থিরতায় গায়ত্রীদেবী মনে মনে হাসেন। তিনি যে ভাগ্যবতী, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। তা না হলে তাঁর সঙ্গে স্বয়ং ব্রহ্মার হঠাৎ করে গন্ধর্ব মতে বিয়ে হবেই বা কেন! যেখানে সাবিত্রীর মতো অমন গুণবতী সুন্দরী স্ত্রী রয়েছেন, সেখানে তাঁর মতো একজন গোয়ালিনীর মধ্যে এমন কিছুই নেই যা কিনা ব্রহ্মার পত্নী হওয়ার উপযুক্ত। কাজেই এ যে গায়ত্রীদেবীর ভাগ্যলিখন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। গায়ত্রীদেবী সেদিন হঠাৎ শুধু চমকেই যাননি, যেদিন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সামনে প্রকট হয়েছিলেন! তিনি তখন রোজকার মতো গাভী দোহন করে বাবাকে সাহায্য করছিলেন। আর তখনই হঠাৎ করে ইন্দ্রের আবির্ভাব! একেবারে রাজকীয় পোশাকে সজ্জিত ছিলেন তিনি। ওঁর এখন মনে নেই, তিনি কতক্ষণ বিস্ফারিত চোখে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যখন গায়ত্রীদেবীর সম্বিত ফিরল, তখন দেখেন সামনে দাঁড়ানো দেবরাজ তাঁর দিকে নির্নিমিখ চোখে চেয়ে আছেন আর সারা মুখে ছড়িয়ে এক সুস্নিগ্ধ নির্মল হাসি! যেন গায়ত্রীকে ভয় পাইয়ে দেবরাজ বেশ মজাই পেয়েছেন। গায়ত্রীদেবী সঙ্গে সঙ্গে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেই দেবরাজ বললেন, ''কল্যাণমস্তু! আয়ুষ্মতী ভব।'' এমন সময় অন্তঃপুর থেকে পিতা বাইরে এসে স্বয়ং দেবরাজকে তাঁর দুয়ারে দেখে প্রথমে বিস্মিত হলেও সঙ্গে সঙ্গে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে দেবরাজের আসার কারণ জানতে চাইলে দেবরাজ যা বললেন, তাতে পিতা-পুত্রী উভয়েই অপার বিস্ময়ে বেশ কিছুক্ষণ স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন। ব্যাপারটা দেবরাজ ইন্দ্র বুঝতে পেরে মৃদু হেসে বললেন, ''আপনার কন্যা পরম ভাগ্যবতী যে স্বয়ং ব্রহ্মার কৃপাদৃষ্টি তাঁর উপরে পড়েছে। সাত জন্ম তপস্যা করলেও তাঁর কৃপা পাওয়া সহজ নয়। এ হল গায়ত্রীর পূর্ব জন্মের সুফল।''
এতক্ষণে গায়ত্রীদেবীর পিতা হাতজোড় করে অস্ফুট স্বরে বললেন, ''দেবরাজ, আপনি অধমের ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন। আমি যত দূর জানি, প্রভু ব্রহ্মার সাবিত্রী নাম্নী একজন পুণ্যবতী ও গুণবতী স্ত্রী রয়েছেন। তা হলে কেন তিনি আবার দার পরিগ্রহ করতে চাইছেন! এর যথার্থ কারণ আপনি ইচ্ছে করলে দিতেও পারেন আবার না-ও দিতে পারেন। কন্যার পিতা হিসেবে আমি জানতে চাইলাম!''
দেবরাজ ইন্দ্র মৃদু হেসে বললেন, ''গায়ত্রী আপনার একমাত্র দুহিতা। তাঁর ব্যাপারে যেমন আপনি সমস্ত সিদ্ধান্ত নেবেন তেমনই তাঁর ব্যাপারে সব কিছু জানার অধিকারও আপনার রয়েছে। যা ঘটতে চলেছে তা অবশ্যই আপনার জ্ঞাতসারেই ঘটবে। আপনার দ্বিমতকে অবশ্যই প্রাধান্য দেওয়া হবে। আপনি সঠিকভাবেই জ্ঞাত আছেন যে এই জীবকুলের স্রষ্টা ও পালক প্রজাপতি বিষ্ণু-মহেশ্বরের মতো দার পরিগ্রহ করেছেন। তাঁর ভার্যা মা সাবিত্রীদেবী। এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে একটা গোল দেখা দিয়েছে। এই গোল দেখা দিয়েছে স্বয়ং সাবিত্রীদেবীর দিক থেকেই। আপনারা তো জানেন যে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকতে হয়। স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে কোনও যজ্ঞই ফলপ্রসূ হয় না। কাজেই প্রভু প্রজাপতি স্ত্রী সাবিত্রীদেবীকে আসতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সাবিত্রীদেবী স্বামীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে স্বয়ং প্রজাপতি ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করতে চান। আর তাই প্রভুর ইচ্ছে পূরণের ভার পড়েছে আমার উপর। আপনার কন্যা বড়ই সুলক্ষণা, বড় গুণবতী, বড়ই নমনীয় স্বভাবের। তাই আপনার কাছে আসা। এবার আপনার মত জানতে পারলে প্রভু প্রজাপতিকে তা জানাতে পারি।''
''কিন্তু দেবরাজ, আপনি তো জানেন যে আমরা জাতিতে গোয়ালা। একেবারেই হীন বংশ জাত,'' গায়ত্রীদেবীর পিতা

করজোড়ে নিবেদন করলেন।
এমন কথা শুনে দেবরাজ স্মিত হেসে বললেন, ''জাত তো আপনারা, অর্থাৎ মানুষেরা, বিশেষ করে ব্রাহ্মণেরা নিজেদের কায়েমি স্বার্থের জন্য তৈরি করেছেন। আমরা তা মানি না। আমাদের কাছে সব মানুষই সমান। দেবতাদের আনুকূল্য কোনও উচ্চ বা নিম্ন জাতির বিচারে হয় না। আর যিনি এই জীবজগৎ তৈরি করেছেন তিনি স্বয়ং দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করতে ইচ্ছুক।"
''তবু একটা কিন্তু থেকে যায় দেবরাজ,'' গায়ত্রীর পিতা বলেন, ''আমার মতামতের চেয়েও বড় ব্যাপার, মেয়ের কাছে একবার তার মতামতটা জেনে নেওয়া উচিত।''
"ঠিক আছে, মেয়েকে ডেকে আমার সামনেই তাকে জিজ্ঞাসা করুন।''
গায়ত্রীকে ডেকে আনা হল। দেবরাজ ইন্দ্রের সামনেই তাকে বিস্তারিতভাবে ঘটনাপরম্পরা বলার পর জিজ্ঞাসা করা হল যে, সে প্রভু প্রজাপতিকে স্বামী হিসেবে স্বীকার করবে কিনা। পিতার এমন প্রশ্নে বালিকা গায়ত্রী কিছুক্ষণ বিমূঢ় দৃষ্টিতে একবার পিতা আর-একবার দেবরাজের দিকে তাকিয়ে এক ছুটে অন্দরমহলে চলে গেলে দেবরাজ সেই দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন।
গায়ত্রীর পিতা আবার হাতজোড় করে বললেন, ''দেবরাজ, গায়ত্রী আমার একমাত্র কন্যা। ওর বিবাহ আমি বেশ ধুমধাম করেই দিতে চাই। তাই আমার একটু সময়ের প্রয়োজন।''
ধীর অথচ জলদগম্ভীর কণ্ঠে দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, ''তা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। প্রভু প্রজাপতি বড় উদ্বিগ্ন হয়ে যজ্ঞের জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁর বিবাহ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত যজ্ঞ শুরু করা যাবে না। স্বয়ং প্রভু বিষ্ণু বলেছেন, এই বিবাহ হবে গন্ধর্ব মতে। এতে কোনও আয়োজন হবে না। শুধু মালা বদলের মধ্য দিয়ে এই বিবাহ সম্পন্ন হবে। সমস্ত দেবতা এই বিবাহ দেখে ধন্য হবেন। তাঁরা সবাই পুষ্পবৃষ্টি করবেন। ধন্য ধন্য করবেন। আপনার কন্যার কত বড় ভাগ্য ভাবুন তো! যান, অন্তঃপুর থেকে কন্যাকে নিয়ে আসুন। অহেতুক সময় অতিবাহিত হয়ে চলেছে।''
গায়ত্রীর পিতা এতটা কল্পনা করেননি। তিনি অন্তঃপুরে গিয়ে দেখেন, তাঁর বালিকা কন্যা গায়ত্রী ফুল সজ্জায় সজ্জিত হয়ে বসে আছে। আর তাঁকে ঘিরে রয়েছে পরিবারের পরিজনেরা। সকলেই অশ্রুপাত করে চলেছে। ঠিক যেমনটা বিবাহের পরে কন্যা বিদায়ের সময় হয়। এমন করুণাঘন দৃশ্যে পাষাণের হৃদয়ও বিগলিত হতে বাধ্য। অথচ বালিকা কন্যা গায়ত্রী স্থিতধী হয়ে বসে রয়েছে। দৃষ্টি স্থির! যেন সে আর এই জীবজগতের বাসিন্দা নয়! তখন তার সারা মুখমণ্ডল চন্দন চর্চিত। কণ্ঠে গুঞ্জা ফুলের মালা। দুই বাহুতে হাসনুহানার বাজুবন্ধ! কবরীতে কিংশুকের মালা জড়ানো। পিতাকে দেখে গায়ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করল। পিতা কন্যার মাথায় আলতো করে চুম্বন করে বললেন, ''আর দেরি নয় মা। দেবরাজ আর কালক্ষেপ করতে চাইছেন না। তুমি গেলে তোমাদের গন্ধর্ব মতে বিবাহ হবে। তার পর তোমরা স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে যজ্ঞে বসবে। ওখানেও হয়তো সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।''
অন্তঃপুর থেকে পিতার সঙ্গে গায়ত্রীদেবী যখন বাইরে এসে দাঁড়ালেন তখন তাঁকে দেখে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলেন না! এমনই অপরূপ সুন্দরী লাগছিল গায়ত্রীদেবীকে! তিনি দেবরাজের সামনে এসে নত মস্তকে তাঁকে প্রণাম করলেন। দেবরাজ আশীর্বাদ করে গায়ত্রীর পিতার উদ্দেশে বললেন, ''এবার আপনারা অনুমতি দিলে আমি কন্যাকে নিয়ে গিয়ে প্রভু ব্রহ্মার হস্তে নিবেদন করতে পারি।''
এই মুহূর্তে সমস্ত আত্মীয়স্বজন এবং জনপদবাসী ভেঙে পড়েছে গৃহ প্রাঙ্গণে। সকলেই বাকরুদ্ধ! কাজেই দেবরাজের কথার উত্তর দেওয়ার মতো কারও মানসিক অবস্থা নেই! এতক্ষণ গায়ত্রী যে কঠিন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল, শেষ মুহূর্তে সে আর নিজেকে সংবরণ করতে পারল না। হঠাৎ করেই দু'চোখে বান ডাকল। বড় নিঃশব্দে ভিজে যেতে লাগল পুষ্পভূষণ। চন্দনচর্চিত কপোল! এক সময় দেবরাজের রথ অপসৃয়মাণ হলে এতটা সময় ধরে চেপে রাখা কষ্টটা আগ্নেয়গিরির মতো হুহু করে বেরিয়ে এল। সেই সঙ্গে কান্নার আওয়াজ। কেউ কাউকে কোনও সান্ত্বনা দিল না। গোয়ালনন্দিনী গায়ত্রী চলে গেল প্রজাপতির ঘর করতে।
বনের সরু পথ ধরে যেতে যেতে এতক্ষণ গার্গী এ সব কথাই ভাবছিলেন। সবটাই পিতার কাছে শোনা। একা থাকলে এমন বহু শ্রুত ঘটনা মনের মধ্যে বুড়বুড়ি কাটে। অবগাহন শেষ করে গার্গী আগে সূর্যস্তব করে তাঁকে প্রণাম করলেন। কুটিরের দু'দিকে দুটো অশোক গাছ রয়েছে। গার্গী তাই নিজের এমন শান্ত-সুস্নিগ্ধ কুটিরকে আদর করে বলেন, 'বঞ্জুলনিকুঞ্জ'। এমন নামের কথা শুনে পিতা ঋষি বাচকনু মাথা নেড়ে মুচকি হাসেন। কন্যার বুদ্ধিমত্তার উপর তাঁর অগাধ আস্থা রয়েছে। তিনি জানেন এই অল্প বয়সেই কন্যা গার্গীর দর্শনশাস্ত্রের উপর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মেছে। আর তাই তো মিথিলার রাজা জনক প্রায়শই গার্গীকে তাঁর রাজসভায় ডেকে পাঠান। নিজেও দর্শন অধ্যয়ন করতে ভালবাসেন বলেই গার্গীকে এতটা স্নেহ করেন। কিন্তু ঋষি বাচকনু জানেন অন্য ঋষিরা গার্গীর মতো একজন ঋষিকার ব্যাপারে কিছুটা উন্নাসিক! কারণ একজন ব্রহ্মবাদিনী ঋষিকা তাঁদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসবে, এটা তাঁরা চট করে মেনে নিতে পারেন না। কিন্তু রাজা জনক এ সবে একেবারেই কান দিতে চান না। বরং তিনি এর উল্টোটাই ভাবেন। তিনি এ সবের তুল্যমূল্য বিচার করেন পাণ্ডিত্য দিয়ে। নারী-পুরুষ দিয়ে নয়।
আগে গার্গীর মাথায় অনেক ঘন চুল ছিল। কিন্তু এখন কেশ মুণ্ডন করার পরে শুধু সারা মাথায় ছোট ছোট চুল এবং সেই সঙ্গে কটিদেশ ছাড়ানো একটি পরিপুষ্ট শিখা। গার্গী ঘরের দরজায় অর্গল দিয়ে শিখা থেকে জল ঝেড়ে ফেলার প্রয়াস করছিলেন। এমন সময় বাইরে থেকে পিতা বাচকনুর কণ্ঠ ভেসে এল, "মা গার্গী, মাতা বুঝি গৃহে নাই?"
"না পিতা। মাতা তো বলিয়াছিলেন যে আজ জমিতে রোপানি করিবেন।''

“তুমি কি দুগ্ধ তপ্ত করিয়াছ?”
“আজ্ঞে পিতা।''
“তাহা হইলে শিষ্যদের পাত্রে তাহা বণ্টন করিয়া দাও। আর তোমার হইয়া গেলে তুমিও বৃক্ষমূলে চলিয়া আসো,'' বাচকনু আবার তাঁহার স্থানে ফিরে গেলেন। গার্গী তাড়াতাড়ি কাঁচুলি বেঁধে শাড়ির আঁচল বক্ষের উপর দিয়ে ডান কাঁধে ফেলে বৃক্ষমূলে গিয়ে হাজির হলেন। তিনি তাঁর স্থান গ্রহণ করলে পিতা বললেন, ''মা গার্গী, তোমার জন্য সুখবর আছে। কিয়ৎকাল পূর্বেই রাজা জনকের দূত আসিয়াছিল। তুমি তো জানো যে, আমাদের রাজা রাজসূয় যজ্ঞ করেছেন। সেই উপলক্ষেই তিনি আগামী কল্য একটি তর্কের আয়োজন করেছেন। বিষয় দর্শন। রাজা জনক সেই তর্কযুদ্ধে তোমাকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমার মনে হয় এ তোমার সৌভাগ্য। সবাই রাজার আনুকূল্য পায় না।''

গার্গী বারেক আড়চোখে শিষ্যভাইদের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে একবার ভেবে নিয়ে বলেন, ''পিতা, আপনি কি জানেন, ওই বিতর্কে কারা কারা উপস্থিত থাকছেন?”
মেয়ের কথায় বাচকনু বললেন, ''আমি এ কথা রাজদূতকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে মাত্র দু'জনের নাম বলতে পারল। শুনলাম মোট ন'জন ঋষি উপস্থিত থাকবেন। তুমি সপ্তম এবং একমাত্র ঋষিকা। তোমার পরে রয়েছেন যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু ঋষি উদ্দালক। কিন্তু মূলত দর্শন নিয়ে যাঁর সঙ্গে সকলের প্রশ্নোত্তর পর্ব হবে তিনি হলেন দর্শনশাস্ত্র বিশারদ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য। এই প্রথম তাঁর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবে। তাঁকে অবলোকন করাও চাট্টিখানি কথা নয় মা। কত বড় ভাগ্য হলে তবে তাঁর মতো একজন ঋষির বিরুদ্ধে তুমি লড়বে, তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করবে এবং তাঁর উত্তরে সন্তুষ্ট না হলে তাঁকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে কুণ্ঠিত হবে না। কারণ মনে রাখবে যখন তর্কযুদ্ধে নামবে তখন বিপরীতে যিনি থাকবেন তাঁকে যথাযথ সম্মান দিলেও তিনি তোমার বিরোধী পক্ষ। প্রতিটি প্রশ্নই সম্মানের সঙ্গে করবে। তোমার মনে দর্শন নিয়ে যত দুরূহ প্রশ্নের উত্তর আজও তোমাকে উদ্বেল করে, সেই সব উত্তর তুমি ওঁর কাছ থেকে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবে।''
“কিন্তু পিতা, শুধু আমি একজন ঋষিকা কেন! আরও তো রয়েছেন। বিশেষ করে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের বিদুষী পত্নী দেবী মৈত্রেয়ী স্বয়ং রয়েছেন। তিনি থাকলে আমার একাকিত্ব বোধ হত না,'' গার্গী বড় সঙ্কুচিত হয়ে বাচকনুকে বললেন।
“ভুলে যেয়ো না, তুমি একটি দর্শন বিষয়ক আলোচনাসভায় আমন্ত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছ। সেখানে কোনও ঋষিকা থাকলেন কি না থাকলেন সেটা বড় ব্যাপার নয়। তা ছাড়া রাজদূত আমাকে বলেনি আর কে কে উপস্থিত থাকছেন। হয়তো থাকতেই পারেন। সবটাই রাজার আমন্ত্রণ সাপেক্ষ ব্যাপার। নিঃসন্দেহে বিদুষী মৈত্রেয়ী দর্শনেও পারদর্শিনী। কিন্তু বিতর্কসভায় যিনি মূল বক্তা, তিনি ধর্মত মৈত্রেয়ীর স্বামী। শাস্ত্রমতে কোনও বিতর্কই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হওয়া উচিত নয়। আর স্বামী পরাজিত হলে তাতে উল্লাস করাও স্ত্রীর পক্ষে সমীচীন নয়। হয়তো বিচক্ষণ রাজন ইচ্ছে করেই বিদুষীকে আমন্ত্রণ জানাননি। উনি থাকলে হয়তো যাজ্ঞবল্ক্য অংশ গ্রহণ না-ও করতে চাইতেন,'' ঋষি বাচকনু দেখলেন তাঁর কন্যা গার্গী মাথা নিচু করে তাঁর কথাগুলো শুনছে। হঠাৎ তাঁর আর একটা কথা মনে পড়ায় তিনি আবার বললেন, ''ভাল কথা, তোমাকে তো বলাই হয়নি যে, রাজদূত আর একটা কথাও বলেছিল। তা হচ্ছে, রাজা জনক তোমার জন্য অশ্ব শকট পাঠাবেন। যাতে তোমার শ্রম লাঘব হয়। কাজেই আগামী কল্য প্রভাতেই তুমি শারীরিক এবং মানসিক ভাবে প্রস্তুত হয়ে থেকো। এখন অন্তঃপুরে প্রস্থান করতে পারো।''
গার্গী পিতা বাচকনুকে প্রণাম করে অন্তঃপুরের উদ্দেশে চলে গেলেন।
পরের দিন সময় মতোই একটি অশ্ব শকট এসে হাজির হল বাচকনু ঋষির বঞ্জুলনিকুঞ্জের সামনে।
রাজপ্রাসাদের সামনে শকট থেকে নেমে গার্গী সভাস্থলে প্রবেশ করতেই দেখলেন সেখানে অনেক মুনি-ঋষি উপস্থিত। তা হলে তো বক্তার সংখ্যাও প্রচুর। রাজদূত তাঁকে তাঁর উপবেশন স্থান পর্যন্ত নিয়ে গেলে গার্গী রাজা জনক ও বাকিদেরও নমস্কার করলেন।
গার্গী এই প্রথম কোনও রাজসভায় এলেন। তিনি তখন ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিশুর মতো বিস্ময়ে সব কিছু দেখছেন। এমন সময় একজন ঘণ্টাধ্বনি করলে গার্গী লজ্জা পেয়ে সচেতন হয়ে যান।
রাজা জনক বলেন, ''উপস্থিত সকলকেই আমার এবং সভা পারিষদদের পক্ষ থেকে নমস্কার। আজ আমার ভীষণ আনন্দের দিন। আপনারা যে নিজেদের ব্যস্ততার মধ্যেও আমার ডাকে সাড়া দিয়ে আমার রাজসভায় পায়ের ধুলো দিয়েছেন, তাতে আমি আনন্দ বোধ করছি। আজকের আলোচনার বিষয় হল ‘দর্শন’। আজ যিনি বিজয়ী হবেন তিনি পাবেন এক সহস্র গ্রাম এবং এক সহস্র গাভী। প্রত্যেক গাভীর শিং থাকবে সোনা দিয়ে বাঁধানো।''
রাজা জনকের এমন কথা শেষ হতে না-হতেই আলোচনা সভায় উপস্থিত সকলের মধ্যেই একটা অদ্ভুত চঞ্চলতা দেখা গেল! রাজা জনক উপস্থিত মুনি-ঋষিদের উদ্দেশে বললেন, ''আমি বরং আপনাদের থেকেই সাতজনকে নির্বাচন

কন্যার বুদ্ধিমত্তার উপর তাঁর অগাধ আস্থা রয়েছে। তিনি জানেন এই অল্প বয়সেই কন্যা গার্গীর দর্শনশাস্ত্রের উপর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মেছে।

করছি, যাঁরা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবেন। এবং যাজ্ঞবল্ক্য তাঁদের প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে প্রশ্নকর্তাদের কৌতূহল প্রশমিত করবেন। আপনাদের এতে আপত্তি নেই তো?”

রাজা জনকের প্রস্তাবে কারওই আপত্তি থাকার কথা নয়। তবু কেউ আগ বাড়িয়ে এগিয়ে না আসায় আবার রাজা জনক বললেন, ‘‘তা হলে শুরু হোক ঋষি অশ্বলকে দিয়ে। এর পরে এই বিতর্কে অংশ নেবেন জারৎকারব আর্তভাগ। তৃতীয় প্রশ্নকর্তা হবেন ভূজ্যু লাহ্যায়নি। চতুর্থ প্রশ্নকর্তা হবেন উষস্ত চাক্রায়ণ। পঞ্চম প্রশ্নকর্তা হবেন কহল কৌষীতকেয়। ষষ্ঠ প্রশ্নকর্তা হবেন উপস্থিত সকলের মধ্যে একমাত্র ঋষিকা। আর তিনি হলেন ঋষি ও সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ গর্গের পুত্র বাচকনুবীর সুকন্যা, ব্রহ্মবাদিনী, বিদুষী গার্গীদেবী। সব শেষে রয়েছেন প্রবীণ ঋষি উদ্দালক আরুণি। এ ছাড়াও বাকি সুপণ্ডিত কৌষীতকেয় এবং শাকল্য এই মহতী সভায় উপস্থিত রয়েছেন। পরবর্তীকালে যদি তাঁরা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চান তা হলে অবশ্যই তাঁরাও সুযোগ পাবেন।’’

রাজার নির্দেশ মতো একে একে সকলেই ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে দর্শনের বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নে জর্জরিত করতে লাগলেন। কিন্তু অতি ধীর মস্তিষ্কে তিনি প্রত্যেকের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে প্রশ্নকর্তাদের নিশ্চুপ করিয়ে দিচ্ছিলেন। ফলে প্রশ্নকর্তা দ্বিতীয় প্রশ্ন করার সাহস পাচ্ছিল না। যখন পরপর পাঁচজন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকের উদ্দেশে প্রশ্ন করেও তাঁকে পরাজিত করতে পারলেন না তখন রাজা জনক গার্গীদেবীর নাম ঘোষণা করলেন।

গার্গী আগে থেকেই মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। রাজা জনক তাঁর নাম ঘোষণা করলে গার্গী উঠে দাঁড়িয়ে রাজা জনক এবং উপস্থিত সমস্ত প্রবীণ মুনি-ঋষির উদ্দেশে প্রণাম করে বললেন, ‘‘আমি জ্ঞাত আছি যে ঋষিপ্রবর যাজ্ঞবল্ক্য ভূ-ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শনশাস্ত্র বিশারদ। তাই আমি পরাজিত হলে হাসিমুখেই যাজ্ঞবল্ক্যের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেব।’’

এমন কথা শুনে চারদিকে মৃদু গুঞ্জন উঠল। গার্গীদেবী সরাসরি আর-একবার প্রণাম করে বললেন, ‘‘হে ঋষিপ্রবর যাজ্ঞবল্ক্য, আমি আজ আপনাকে কিছু জাগতিক জগৎসম্পৃক্ত প্রশ্ন করব।’’

যাজ্ঞবল্ক্য স্মিত হেসে বললেন, ‘‘তথাস্তু ভদ্রে।’’

“হে ঋষিপ্রবর যাজ্ঞবল্ক্য, আমরা জানি এই বিশ্ব তৈরি হয়েছে বিভিন্ন উপাদানের একক একত্র করে। আমি জানতে চাই, জলের উপাদান বা একক কী, যা একত্র করেই সৃষ্টি হয়েছে জল?’’

যাজ্ঞবল্ক্য স্থির দৃষ্টিতে গার্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘‘হে ভদ্রে বিদুষী গার্গী, জলের একক হল বাতাস।’’

গার্গী তৈরিই ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ‘‘হে ঋষিপ্রবর, এবার তা হলে অনুগ্রহ করে বলুন, বাতাস কী দিয়ে তৈরি?”

যাজ্ঞবল্ক্য এবারও স্মিত হেসে বললেন, ‘‘হে ভদ্রে বিদুষী গার্গী, বাতাসের উপাদান হচ্ছে আকাশ।’’

“হে ঋষিপ্রবর, তা হলে এবার বলুন আকাশের একক কী?”

“ভদ্রে বিদুষী, আকাশের একক হল আদিত্য বা সূর্য।’’

“হে ঋষিপ্রবর যাজ্ঞবল্ক্য, তা হলে সূর্যের একক কী?”

স্মিত হেসে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, ‘‘হে ভদ্রে বিদুষী, সূর্যের একক হল চন্দ্র।’’

“হে ঋষিপ্রবর, আমি জানতে চাই তা হলে চন্দ্রেরও নিশ্চয়ই একক রয়েছে। সেটি কী?”

“হে ভদ্রে, চন্দ্রের একক হল নক্ষত্র।’’

“হে ঋষিপ্রবর, তা হলে নক্ষত্রেরও নিশ্চয়ই উপাদান আছে?”

“হে বিদুষী গার্গী, নিশ্চয়ই আছে। আর তা হল দেবতারা।’’

“আমি জানতে উৎসুক দেবতাদের উপাদান কী?’’

স্মিত হেসে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, ‘‘হে বিদুষী, দেবতাদের উপাদান হলেন ইন্দ্র।’’

গার্গী কিয়ৎ সময় চুপ করে থেকে বললেন, ‘‘হে ঋষিপ্রবর, এবার বলুন ইন্দ্রের উপাদান কী?”

এবারও যাজ্ঞবল্ক্যের ঠোঁটে হাসি ঝুলে থাকল। তিনি বললেন, ‘‘হে বিদুষী, ইন্দ্রের উপাদান হলেন প্রজাপতি।’’

“হে ঋষিপ্রবর যাজ্ঞবল্ক্য, তা হলে নিশ্চয়ই প্রজাপতিরও একক রয়েছে। সেটা কী বলুন?”

“হে ভদ্রে বিদুষী, প্রজাপতির একক হল পরম ব্রহ্ম।’’

গার্গীও বড় নাছোড়বান্দা। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, ‘‘হে ঋষিপ্রবর, আমি জানতে চাই এমন কোন কোন উপাদান একত্রিত করে ব্রহ্মের সৃষ্টি হয়েছে?”

যাজ্ঞবল্ক্য তখন এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গার্গীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন যে তাতেই গার্গী বুঝতে পারলেন যে এমন প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু এতে তাঁর কিছু করার নেই। এখানে তর্কযুদ্ধ হচ্ছে। প্রেম-ভালবাসার কথা হচ্ছে না। কাজেই যাজ্ঞবল্ক্যের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির পরিবর্তে গার্গীদেবীও তাঁর বিশাল আঁখিযুগলকে আরও বিস্ফারিত করে যাজ্ঞবল্ক্যের চোখে চোখ রাখলেন। তবে গার্গীদেবীর চোখের দৃষ্টিতে কোনও ক্রোধ ছিল না। বরং ছিল এক অপার আনন্দ। যাজ্ঞবল্ক্যকে ক্রোধান্বিত করতে পারার আনন্দ। তাঁকেও যে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা যায়, তা প্রমাণিত হয়ে গেল। যাজ্ঞবল্ক্যের দীপ্ত চোখদুটো তখনও আগুনের মতো জ্বলছে! গার্গীর স্পর্ধা ও ঔদ্ধত্যে তিনি প্রায় গর্জন করে বললেন, ‘‘এর পর আর কোনও প্রশ্ন করবেন না। আপনি স্তব্ধ হন ভদ্রে। আপনি কিন্তু বেদের নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। এর পর একটা প্রশ্ন করলেই আপনার মস্তক খসে পড়বে। আর সঙ্গে সঙ্গে আপনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবেন।’’

যাজ্ঞবল্ক্যের প্রজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রবল ঔদ্ধত্য ছিল। ঋষিদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য জ্ঞান করতেন। কেউ তাঁর কাছ থেকে কোনও রূপ বিনয় প্রত্যাশা করতেন না।

এবার রাজা জনকের আদেশে ঋষি উদ্দালক তর্কে অবতীর্ণ হলেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের গুরুদেব হলেও তাঁর স্থায়িত্বও বেশি ক্ষণ হতে পারেনি। তিনিও পরাজয় মেনে নেন। উদ্দালক বসে পড়তেই অসামান্য বেদজ্ঞানী গার্গীদেবী

ব্রাহ্মণদের বন্দনা করে বললেন, ''অনুমতি দিলে আমি ঋষিপ্রবরকে আরও দুটো প্রশ্ন করতে চাই।''
সভার সব পণ্ডিত এক বাক্যে অনুমতি দিলে গার্গী বললেন, ''হে ঋষিপ্রবর, যা এই দ্যুলোক এবং ভূলোকের মধ্যে, যা অতীত, যা বর্তমান, যা ভবিষ্যৎ রূপে বিরাজমান, বলুন তা কিসে ওতপ্রোত হয়ে আছে?"
যাজ্ঞবল্ক্য বড় নির্লিপ্ত গলায় বললেন, ''আকাশে।''
"আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, তা হলে এই আকাশ কিসে ওতপ্রোত হয়ে আছে?"
"ভদ্রে, যাঁকে কেউ দেখতে পান না, কিন্তু তিনি সবকিছুই অবলোকন করেন। যা কেউ শুনতে পান না, অথচ তিনি সবই শুনতে পান। কেউ যা জানতে পারেন না, অথচ তিনি সবই জ্ঞাত হন। আর সেই অক্ষয় বা শাশ্বতই আকাশের ভিত্তি, আর এতেই আকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই সঙ্গে এই অক্ষয়ই হচ্ছে পরম ব্রহ্ম। যার কোনও বর্ণ-গন্ধ-স্বাদ-আকার এবং অবয়ব কিছুই নেই। এই চির শাশ্বত বা অবিনশ্বর বা অক্ষয়ের নির্দেশেই চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। দীর্ঘ সাধনার পরেও যদি সেই পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি না করা যায় তা হলে সেই তপস্যা একেবারে বৃথা। এটাই কিন্তু চূড়ান্ত আর এখানেই জ্ঞানের শেষ।''
যাজ্ঞবল্ক্যের এমন কথা শুনে দেবী গার্গী সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, ''হে ঋষিপ্রবর যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ, আমাদের মধ্যে এমন আর কেউ নেই যিনি আপনাকে জয় করতে পারেন।''
বিতর্কসভা শেষের প্রাক্কালে রাজা জনক বললেন, ''দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে আজকের বিতর্কসভা সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বিশেষ করে ঋষিকা দেবী গার্গী যে সমস্ত যুক্তিজালে ঋষিপ্রবর যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গেলেন, তা অবিশ্বাস্য। যেখানে অন্যান্য পণ্ডিত ঋষিপ্রবর খুব একটা আস্থার সঙ্গে লড়তে পারেননি। আর তাই আবার প্রমাণিত হল যে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য সত্যিই একমেবাদ্বিতীয়ম। তাঁর পাণ্ডিত্যের তুলনা হয় না! আজকের দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা আমাকেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে। আমি ভীষণভাবেই প্রীত হয়েছি। আপনারা সকলেই মিথিলা রাজ্যের গর্ব। আমি যে দর্শনশাস্ত্র পিপাসু, তা আপনারা সকলেই জ্ঞাত আছেন। তাই আমি যদি মাঝে মাঝে ঋষি বাচকনুর আশ্রমে অশ্ব শকট প্রেরণ করি তা হলে কি দেবী গার্গীর পদধূলি আমার রাজসভায় পড়বে? আমি তা হলে আরও সমৃদ্ধ হতে পারব।''
দেবী গার্গী করজোড়ে বললেন, ''রাজন, আপনার সঙ্কোচের কোনও প্রয়োজন নেই। আপনার ইচ্ছেই আমার কাছে আদেশ। যখনই আমাকে প্রয়োজন হবে তখনই আমি উপস্থিত হয়ে যাব।''
উপস্থিত সকল ঋষিপ্রবর একসঙ্গে বলে উঠলেন, ''সাধু! সাধু!"
রাজসভা থেকে বেরিয়ে দেবী গার্গী অশ্ব শকটে উঠে পড়লেন। গার্গী জানেন পিতা বাচকনু বড় অস্থির হয়ে বারবার কুটিরের বাইরে পায়চারি করছেন। মেয়ে কোথাও গেলে তিনি কিছুতেই কুটিরে সুস্থির হয়ে থাকতে পারেন না। মনে মনে ছটফট করেন। ঠিক তা-ই। অশ্ব শকট কুটিরের কাছে পৌঁছোতেই বাচকনু হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। গার্গী পিতাকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, ''কল্যাণমস্তু!"
"পিতা, আমি পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে ঋষিপ্রবরকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছিলাম। উনি সবক'টি প্রশ্নের সুন্দর উত্তর দিয়েছেন। অনেকক্ষণ আমাদের মধ্যে প্রশ্নোত্তর পর্ব চলেছিল। কিন্তু একের পর-এক প্রশ্ন করায় উনি একেবারে শেষ মুহূর্তে ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে বলেন, 'আপনি স্তব্ধ হন ভদ্রে। আপনি বেদের নিয়ম লঙ্ঘন করছেন!' আমি তখন নিরুপায় হয়ে থেমে যাই। আসলে আমি ব্রহ্মের সৃষ্টির উপকরণ জানতে চেয়েছিলাম। এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।''
"কিন্তু এমন প্রশ্নে উনি ক্ষুব্ধ হলেন কেন! ওঁর তো না-জানার কথা নয়!"
"আসলে আমার পরে মনে হয়েছে, আমি অনেকগুলো প্রশ্ন একের পর এক করছিলাম। উনি তাতে হয়তো ক্লান্তি বোধ করতে পারেন। তবে আমি যখন দ্বিতীয়বার সকলের অনুমতি নিয়ে ঋষিপ্রবরকে প্রশ্ন করার সুযোগ পাই, তখন উনি বিস্তারিতভাবে বলেছেন।''
"উনি তোমার প্রশ্নের উত্তরে কী বললেন?" বাচকনু জানতে চাইলেন।
"যাঁকে কেউ জানতে পারে না অথচ উনি সবই জানতে পারেন। যাঁর কোনও বর্ণ-গন্ধ-স্বাদ-আকার নেই। এই শাশ্বত বা অবিনশ্বরই হলেন ব্রহ্ম। তবে আসার প্রাক্কালে রাজন বললেন যে তিনি মাঝে মাঝে আমাকে স্মরণ করতে পারেন, দর্শনশাস্ত্র আলোচনার জন্য। আমি আপত্তি করিনি।''
"ভালই করেছ। যাজ্ঞবল্ক্য তোমার দর্শনশাস্ত্রের গভীরতা বুঝতে পেরেই অত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তা না হলে অত প্রশ্নের উত্তর দিতেন বলে মনে হয় না। যাও, এবার তুমি অন্তঃপুরে যাও। মাতা তোমার জন্য যথেষ্ট উদ্বেগে রয়েছেন।''
গার্গী গৃহাভ্যন্তরে চলে গেলে বাচকনুও আবার শিষ্যদের অধ্যয়নে রত হলেন।

২

ঋষি মৈত্রীর সুকন্যা সুলভা মৈত্রেয়ী উন্মুখ হয়ে গৃহের মধ্যেই অনবরত পদচারণা করছিলেন। মনের মধ্যে একটা অস্থির অস্থির ভাব। যদিও ফলাফলের ব্যাপারে কোনও সংশয় নেই। তবু জনক রাজার ঘোষণার মূল্যই আলাদা। হয়তো এতক্ষণে তা ঘোষিত হয়ে গেছে। দর্শনশাস্ত্রে বিশারদ যাজ্ঞবল্ক্যকে আজও কেউ পরাজিত করতে পারেননি। তবু কেন জানি মনটা একটু খচখচ করে চলেছে। আসলে এই মিথিলা বা বিদেহ রাজ্যে যতজন মুনি-ঋষি বাস করেন, তাঁরা যাজ্ঞবল্ক্যকে রীতিমতো সমঝে চলেন। কিন্তু শোনা যায়, ঋষি গর্গের পৌত্রী, তথা রাজা জনকের মন্ত্রী ঋষি বাচকনুর চিরকুমারী কন্যা অদ্বৈতবাদী গার্গী দর্শনশাস্ত্রে যথেষ্ট পারঙ্গম। তিনি নাকি মাঝে মধ্যেই রাজার আমন্ত্রণে রাজসভায় গিয়ে রাজার সঙ্গে দর্শন

নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। ওঁকে খুব দেখার সাধ জাগে। ভগবন ঋষি এলে তাঁর কাছ থেকেই না হয় বিদুষীর বর্ণনা শ্রবণ করা যাবে। কারণ তিনি শুধু একজন ঋষিকা নন, তিনি একজন ব্রহ্মবাদিনীও বটে। এমন ঋষিকা ক'জনই বা আছে এই রাজ্যে। এমন সময় একজন শিষ্য এসে বললেন, ''মাতঃ আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আমাদের পরম গুরুদেব ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। এবং রাজা জনক তাঁর প্রতিজ্ঞানুযায়ী প্রভুকে এক সহস্র গ্রাম এবং এক সহস্র ধেনু দান করেছেন। আর প্রতিটি ধেনুর শিংদুটো সোনার পাতে আবৃত।''
সুলভা মৈত্রেয়ী উৎসুক হয়ে জনতে চাইলেন, ''কার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘক্ষণ বাগ্‌যুদ্ধ হল?"
শিষ্য সেই একই ভঙ্গিমায় নত মস্তকে বললেন, ''সব শ্রদ্ধেয় ঋষিই তো দু'-একটির অধিক প্রশ্ন করতে পারেননি। শুধু বিদুষী ঋষিকা গার্গীদেবী একের পর-এক পৃথিবীর সৃষ্টি তত্ত্বের উপর প্রশ্ন করছিলেন। আর প্রভু তার উত্তর দিচ্ছিলেন। কিন্তু দেবী গার্গীর প্রশ্নের যেন শেষই হচ্ছিল না। অত তত্ত্বের পাঠ আমাদের নেই। তাই সবটা খুব একটা বুঝতে না-পারলেও এটা বুঝতে পারছিলাম যে, দেবী গার্গী এক অদ্ভুত ক্রীড়ায় মেতে রয়েছেন। তিনি হয়তো বুঝতে পারছেন না, কোথায় তাঁর থামা উচিত। তাই এক সময় প্রভু তাঁকে স্তব্ধ হতে বললেন। আর তা না হলে বিদুষীর মস্তক নাকি খসে পড়বে। তখন গুরুদেবের চোখের দিকে তাকাতে ভয় করছিল। যেন অগ্নিকুণ্ডের মতো মনে হচ্ছিল! পরে গার্গীদেবী সকলের অনুমত্যানুসারে আরও দুটো কঠিন প্রশ্ন করেছিলেন। গুরুদেব সুষ্ঠুভাবে তারও উত্তর দিয়ে তাঁকে বাকরুদ্ধ করে দিয়েছেন। আর তাই গার্গীদেবী সর্বসমক্ষে স্বীকার করলেন যে শুধু এই রাজ্যেই নয়, সারা দেশে আমাদের গুরুদেবের মতো দর্শনশাস্ত্রে এমন পারদর্শী আর কেউ নেই। তবে মাতঃ, একটা কথা বলতেই হয় যে, দেবী গার্গীর সাহস আছে বটে। আর দর্শনশাস্ত্রকে উনিও খুব নিষ্ঠার সঙ্গেই অধ্যয়ন করেছেন। আমি প্রস্থান করি। প্রণাম।''
সুলভা মৈত্রেয়ী অভ্যাসবশত তাঁর ডান হাত উত্থিত করে বললেন, ''কল্যাণমস্তু।'' কিন্তু তাঁর মনে তখনও প্রগাঢ়ভাবে রেখাপাত করে রয়েছে এক অদৃশ্যময়ী বিদুষী ঋষিকার প্রতিচ্ছবি! সবটাই তাঁর মনের মুকুরে আঁকা! বড় সাধ হচ্ছে তাঁকে দেখতে। অথচ জানেন, তা হয়তো আপাতত সম্ভব নয়।
ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর বড় পত্নী কাত্যায়নী তাড়াতাড়ি জল এনে ঋষির ধূলিধূসরিত পদযুগল ভাল করে ধুয়ে দিলেন এবং প্রণাম করলেন। তিনি চলে যেতেই এলেন মৈত্রেয়ী। তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেন, ''ভগবন, আপনার শরীর উত্তম আছে তো?''
যাজ্ঞবল্ক্য মৃদু হেসে বললেন, ''আজ একটু ক্লান্তি বোধ করছি। আমি জানি তোমার মনে এখন অনেক প্রশ্নের উদয় হয়েছে। তোমার সব প্রশ্নেরই আমি উত্তর দেব। তবে অদ্য নহে। আমার শয্যা প্রস্তুত তো?"
"হ্যাঁ প্রভু, আপনি বিশ্রাম নিন। আমি আপনার ফলাহারের ব্যবস্থা করছি,'' মৈত্রেয়ী এ কথা বলে চলে গেলেন। স্বল্প সময় পরেই মৈত্রেয়ী একটি বড় পাত্রে ঘন দুধ এবং বেশ কিছু অমৃত ফল ও কয়েকটি কদলী এনে বললেন, ''ভগবন, গাত্রোত্থান করুন। দেখুন, আপনার ফলাহার নিয়ে এসেছি।''
পাকশাল থেকে আসার পথে মৈত্রেয়ী লক্ষ করেছেন যে অন্তরাল থেকে নিত্যদিনের মতোই আজও দু'জোড়া চোখ সবকিছু অবলোকন করে চলেছে। প্রথম প্রথম সেই চোখে চোখ পড়ে গেলে মৈত্রেয়ীর বেশ অস্বস্তি হত। ইদানীং সবই গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। মৈত্রেয়ী বুঝতে পারেন যে, কোনও নারীই চায় না বিয়ের পরে যার উপরে তার একার যে আধিপত্য বর্তেছে, সেই অধিকার দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাক। যদিও সামাজিক অনুশাসনে এমন ব্যবস্থার প্রথা থাকলেও যে কোনও সহধর্মিণীর পক্ষেই তা একেবারে কায়মনোবাক্যে মেনে নেওয়া কষ্টকর! তাই যেদিন ভগবন যাজ্ঞবল্ক্য দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করে তাঁর মতো একজন বিদুষী বেদজ্ঞানী মেয়েকে ঘরে নিয়ে এলেন তখন এর পূর্বাপর মৈত্রেয়ীর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। কারণ পিতৃগৃহে পরমপূজ্য পিতা ঋষি মৈত্রী তো শুধু তাঁর পিতাই ছিলেন না, সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন বিদেহ রাজ্যের রাজা জনকের একজন মন্ত্রী। সব সিদ্ধান্ত তিনি নিলেও তা পরিবারের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষেই হত।
কাজেই ভগবন যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়ার ব্যাপারে পিতা মৈত্রী যে পরিবারে স্ত্রী ও কন্যা সুলভার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন তা বলাই বাহুল্য। যদিও ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বয়সে কন্যার চেয়ে অনেকটাই বড় ছিলেন, কিন্তু তাঁর মতো বেদজ্ঞ তখন সারা রাজ্য তো দূরের কথা, ভারতবর্ষেও দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। আর কন্যা সুলভাও যেহেতু ক্রমশই বেদাগ্রহী হয়ে উঠছেন, সেহেতু এমন একজন প্রাজ্ঞ স্বামীর ঘর করলে কন্যার জ্ঞানের উন্মেষ খুব দ্রুতই বৃদ্ধি পাবে— তা ঋষি মৈত্রী অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এত সব সুলভাকে বলায় তিনিও পিতার মতের দ্বিরুক্তি করেননি। কিন্তু তখন তিনি কীভাবে জানবেন যে ভগবনের প্রথমা স্ত্রী কাত্যায়নী মানসিক দিক দিয়ে অতটা উদারচেতা ছিলেন না এবং তিনি হীনম্মন্যতায় ভোগেন। এর প্রধান কারণই হল সুলভা মৈত্রেয়ীর রূপ ও শিক্ষার সঙ্গে তাঁর কোনও তুলনাই হয় না। তিনি যেন একেবারেই একজন অতি সাধারণ গৃহবধূ বই অন্য কিছু নন। তবে এটাও ঠিক, আজ এই সংসারের মূল চাবিকাঠি কিন্তু তাঁরই হাতে। যদিও বিবাহের পরেই একদিন ঋষি তাঁর বালিকা বধূকে ডেকে তাঁর এই পর্ণকুটির থেকে শুরু করে সামান্য কয়েকটি গাভীর হিসেব দিয়ে বলেছিলেন যে, আজ থেকে এই গৃহস্থালির দায়িত্ব একান্তই কাত্যায়নীর। এবার তিনি বড় নিশ্চিন্ত হয়ে উপাসনা ও ছাত্রাধ্যায়নে মনোনিবেশ করতে চান। এ সবে কাত্যায়নীর আপত্তি করার কোনও কারণই ছিল না। কারণ

এর মধ্যে বেশ কয়েকবার তিনি স্বামীর সান্নিধ্যে এসেছেন এবং তাঁকে একটি পুত্রসন্তানও উপহার দিতে পেরেছেন। কাজেই এর থেকে আর বেশি কী-ই বা চাওয়ার থাকতে পারে। এতে যে-কোনও বিবাহিতা নারীর জীবন ধন্য হয়ে যাওয়ার কথা। অথচ সুলভার রূপ ও বিদ্যার কাছে পরাজিত হয়ে আজ তাঁর পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে এবং মনে একটা হীনম্মন্যতা জন্ম নিয়েছে। এটা যে কাত্যায়নী বোঝেন না, তা নয়। অথচ মন কিছুতেই বশে থাকতে চায় না। আগে যৎসামান্য ভূমির মালিক ছিলেন যাজ্ঞবল্ক্য। কিন্তু ইদানীং হাজার গ্রামের মালিকানা, সেই সঙ্গে প্রচুর ভূমির দেখভাল এবং হাজার গাভীর যত্ন করা, সবটাই সে এক হাতে সামলে চলেছে। এ ব্যাপারে তাঁর উপর কেউ কোনও কথা বলে না। তবু এত কাজের মধ্যেও বারবার সুলভার উপস্থিতি তাকে বিড়ম্বনায় ফেলে দিচ্ছে।



যাজ্ঞবল্ক্য তখন এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গার্গীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন যে তাতেই গার্গী বুঝতে পারলেন যে এমন প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

আর তখনই মনটা উচাটন হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে ঋষি আর সুলভার একসঙ্গে বাক্যালাপের সময়। তখন মনে হয় এক ছুটে গিয়ে সুলভাকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে সে নিজে দাঁড়িয়ে যাক। আর প্রাণ ভরে ঋষির সঙ্গে বাক্যালাপ করুক। যেমন এই মুহূর্তে সুলভা ঋষির সামনে বসে তাঁকে অতি যত্নে আহার করাচ্ছে। আর অনেক কথা বলে চলেছে। দিন দিন এ সব ভীষণ পীড়াদায়ক হয়ে চলেছে কাত্যায়নীর কাছে।

সুলভা মৈত্রেয়ী এই সংসারে দ্বিতীয়া পত্নী হয়ে আসার পর থেকে সবই জানেন-বোঝেন। তিনি মনে মনে একটু কষ্ট পেলেও এ সব বাহ্যিক ব্যাপার থেকে মনটাকে আলতো করে সরিয়ে রাখেন এবং বেশি করে বেদাধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের আহার শেষ হলে তিনি দুই পত্নীকে ডেকে নেন। এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটল। এত দীর্ঘ বছর এই গৃহে আসার পরে সুলভার মনে পড়ে না যে কোনওদিন ভগবন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর দুই পত্নীকে একসঙ্গে ডেকেছেন! তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে দুই সতীনের মধ্যে একটা তিক্ততা ফল্গু নদীর মতো বয়ে চলেছে। বিশেষ করে কাত্যায়নীর মনে। তা হলে তিনি কি চাইছেন এর একটা নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য এমনটা হলে মন্দ কী! অন্তত সুলভার দিক থেকে কোনও আপত্তি থাকার কথা নয়।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য দুই পত্নীর উদ্দেশে বললেন, ‘‘আমি দীর্ঘকাল ধরে একটি কথা ভেবে চলেছি। অথচ তা ব্যক্ত করার সঠিক সময় পাচ্ছিলাম না। আজ মনে হচ্ছে সেই শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে। আর তাই তোমাদের দু'জনকেই ডেকে পাঠানো। আমি এই মুহূর্তে তোমাদের মানসিক অবস্থা অনুধাবন করতে পারছি। আর বুঝতে পারছি, দীর্ঘদিন ধরে তোমাদের মনের টানাপোড়েনও! এতে আমি কিঞ্চিৎ হলেও ব্যথিত! অবশ্য সেই কারণেই যে আমি আজ তোমাদের ডেকেছি, তা কিন্তু নয়। ডেকেছি আমার মনের এক অভীপ্সা ব্যক্ত করার জন্য। আসলে আমি উপলব্ধি করেছি যে সংসারে থাকলে প্রতিনিয়তই কাজের পাহাড় জমতে থাকে। তা যত সামান্য কাজই হোক না কেন, তাকে একেবারে তাচ্ছিল্য করা যায় না। তাই অনেক তপস্বীর মতো আমারও মনে হচ্ছে, সংসার তপস্যার সঠিক স্থান নয়। মায়া মোহ মানুষকে কখনওই সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে না। একটা অপার্থিব শক্তি পিছু থেকে টেনে রাখে। আর তাই সঠিকভাবে উপাসনায় বারবার বিঘ্ন ঘটে চলেছে। তাই আমি ইচ্ছে করেছি যে যত শীঘ্র সম্ভব আমি সন্ন্যাস নেব। আর এ ব্যাপারেই তোমাদের ডাকা এবং তোমাদের মতামত জানা একান্তই আবশ্যক হয়ে পড়েছে।''

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য কাত্যায়নী এবং মৈত্রেয়ীর উদ্দেশে আবার বললেন, ‘‘এবার এ ব্যাপারে তোমাদের অভিমত বলতে পারো। কোনও দ্বিধা সঙ্কোচকে মনে ঠাঁই দিয়ো না।''

এমন কথা শোনার পরে দণ্ডায়মান দুই পত্নী একবার শুধু মুখ তুলে ভগবন যাজ্ঞবল্ক্যের দিকে তাকালেন বটে, কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না।

যাজ্ঞবল্ক্য বুঝতে পারলেন এই দু'জন নারী আরও বিশদে না শুনে নিজের নিজের মত জানাবে না। মৌনই যে সম্মতির লক্ষণ, তিনি তা বুঝতে পারলেন। তিনি তবু কিঞ্চিৎ সময় দিলেন। শেষে বললেন, ‘‘আমি যখন মনে মনে সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে এবার আমার সন্ন্যাস নেওয়ার সময় হয়েছে, তখন তোমাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই আমার সিদ্ধান্ত কিছুটা টলে গেল। বুঝতে পারছিলাম না সিদ্ধান্তটা সঠিক হবে কিনা। আর তাই আমার সিদ্ধান্তের কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়েছি। আর তা হচ্ছে, আমার যত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে আমি তা সমান ভাগ করে তোমাদের দু'জনের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে যেতে চাই। কারণ ভবিষ্যতে আমার অবর্তমানে তোমাদের মধ্যে যেন কোনও মনোমালিন্য না হয় এবং তোমরা কোনও অসুবিধায় না পড়ো। আর এ জন্যই তোমাদের দু'জনকে ডাকা।''

কিছুক্ষণ বিরতির পরে যাজ্ঞবল্ক্য আবার স্ত্রীদের দিকে তাকালেন। দেখলেন কাত্যায়নী তাঁর পায়ের নখ দিয়ে ক্রমান্বয়ে মৃত্তিকা খনন করে চলেছেন। এর অর্থ হচ্ছে তাঁর মন এখনও চঞ্চল। তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে এখনও উপনীত হতে পারেননি। আর তারই পাশে দাঁড়ানো সুলভা মৈত্রেয়ীর দৃষ্টি দূরগামী! তিনি আরও কোনও গভীর চিন্তায় ডুবে রয়েছেন। কিন্তু কী সেই চিন্তা! যিনি নিজে একজন শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ, তাঁর তো সামান্য কোনও

ঐহিক চিন্তায় নিমজ্জিত হওয়ার কথা নয়। তা হলে তাঁর নিজের মতামত জানাতে এত দেরি হচ্ছে কেন! এমন সময় সুলভার দৃষ্টির পরিবর্তন হল। তিনি এবার সরাসরি স্বামী ভগবন যাজ্ঞবল্ক্যের চোখে চোখ রেখে বললেন, ''ভগবন, এই সসাগরা পৃথিবীর সব সম্পদ যদি আমার হয় তা হলেও কি আমি অমরত্ব লাভ করতে পারব?"
যাজ্ঞবল্ক্য সুলভা মৈত্রেয়ীকে 'প্রিয়ে' সম্ভাষণ করে বললেন, ''না, এই বিপুলা পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তি পেলেও তুমি অমরত্ব লাভ করতে পারবে না। তবে ধনী ব্যক্তিরা যেভাবে তাঁদের জীবন অতিবাহিত করে থাকেন অর্থাৎ লৌকিক সুখভোগ যাপন করে থাকেন, তুমিও সেইভাবেই তোমার বাকি জীবন সুখের সাগরে নিমজ্জিত করে অতিবাহিত করে দিতে পারবে। আমি বুঝতে পারছি যে তোমার মনের মধ্যে পাহাড়প্রমাণ প্রশ্ন জমা হয়েছে। এসো, বসো। আমি তোমার কাছে আত্মার স্বরূপ কীর্তন করব।''
যাজ্ঞবল্ক্য ধ্যানে উপবেশন করার মতো ভঙ্গিমায় বসে বললেন, '''ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।' হে মৈত্রেয়ী, মনে রেখো পতির সুখের জন্য কোনও পত্নীই তাঁর পতিকে ভালবাসেন না। যতটুকু ভালবাসেন তা সবটাই হল নিজের সুখের জন্যই। শুনতে মন্দ মনে হলেও এটাই বাস্তব। অনুরূপভাবে পত্নীর সুখের জন্য পতি কখনওই তাঁকে ভালবাসেন না। তাঁকে ভালবাসেন শুধু নিজের সুখের জন্যই। পিতা যে তাঁর সন্তানকে ভালবাসেন তা সন্তানের সুখের জন্য নয়। নিজের সুখের জন্যই এই ভালবাসার জন্ম হয়ে থাকে। যেমন ধনের প্রয়োজনে কার্য সিদ্ধি হলেও কেউ ধনকে ভালবাসেন না। ধনকে সকলেই ভালবাসেন শুধু নিজের প্রয়োজনের স্বার্থে। রাজা তখনই প্রজাদের চোখে প্রীতিভাজন হয়ে থাকেন যখন তিনি প্রজাবৎসল হন। আবার ব্রাহ্মণের সুখের জন্য লোকে ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করেন না। লোকে ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য। দেবতাদের প্রীতির জন্য কেউ দেবতাকে ভক্তি বা পুজো করে না। সবটাই করে থাকে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। এমনকি মাতা যখন তাঁর সন্তানকে চুম্বন করেন তখন তা শিশুর ভাল লাগার জন্য নয়। তা হল মায়ের আত্মতৃপ্তির জন্য। কাজেই হে মৈত্রেয়ী, এর অধিক আর কী বলব। মানুষ স্ব-স্ব প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই সমস্ত কাজ করে থাকে। অতএব হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ী, পতি, পুত্র বা ধনের প্রতি যে প্রীতি তা কেবল মানুষের কপটতা বা বঞ্চনা মাত্র।''
সেই একই ভঙ্গিমায় বসে ধীরে ধীরে যাজ্ঞবল্ক্য চোখদুটো বন্ধ করে নিলেন। কথকতা শেষ হয়ে গেল! মৈত্রেয়ী বসা অবস্থায় সাষ্টাঙ্গে পরম প্রভু ভগবন যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রণাম করলেন।
এর কয়েকদিন পরেই ভগবন যাজ্ঞবল্ক্য সংসারের মোহজাল ছিন্ন করে চিরকালের মতো সন্ন্যাস নিয়ে অজানিত পথে যাত্রা করলেন। যাওয়ার প্রাক্কালে কাত্যায়নী আর সুলভা মৈত্রেয়ী ভগবনের পদধূলি গ্রহণ করলেন। সুলভা মৈত্রেয়ী স্বামীর উপদেশ আকণ্ঠ পান করে তৃপ্ত হয়ে মনস্থির করলেন যে তিনিও সংসারের মোহজাল ছিন্ন করে খুব শীঘ্রই সন্ন্যাস নেবেন।

৩

বিদর্ভের রাজার দীর্ঘদিন থেকেই রাজকার্যে কোনও মন নেই! রাজপ্রাসাদে গেলে মহারানির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বা চোখে চোখ পড়লেই নিজেকে ভীষণ অপরাধী বলে মনে হয়। অথচ তিনি যে চেষ্টার কোনও কসুর করেননি, তা বলাই বাহুল্য। যেখানে যত মন্দির রয়েছে সবখানেই তিনি রানিকে সঙ্গে নিয়ে হত্যে দিয়ে পড়ে থেকেছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বরং দিন দিন রানির শরীরের সেই জৌলুস কর্পূরের মতো উবে যাচ্ছে। রাজকবিরাজ বলেছেন এটা রানিমার মনের গভীরে অতৃপ্তির এক কঠিন অসুখ। এমন চলতে থাকলে একদিন তাকে ক্ষয় রোগে ধরতে পারে। এই অবস্থায় শুধু রাজাই নন, তাঁর সভাসদদেরও মনে শান্তি নেই। শেষে ঘোষণা করলেন যে এবার তিনি অরণ্যে গিয়ে কঠোর সাধনায় ব্রতী হবেন। রাজার এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা সারা রাজ্যে রাষ্ট্র হতে দেরি হয়নি। ঋষি অগস্ত্যের কানেও এই খবরটা যথাসময়েই পৌঁছে গেছে। এ সব কথা ভাবতে ভাবতেই ঋষি অগস্ত্য অরণ্যপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর হঠাৎ মনে হল তিনি কি পথ ভুল করেছেন! কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব! অরণ্যে তো একটিই মাত্র সরু পথ। এ তাঁর এতটাই চেনা পথ যে চোখ বন্ধ করে পথ চলতে কোনও অসুবিধা হয় না। তা হলে এমন বৃক্ষরাজি, সুবিশাল মহীরুহ এ সব কি এ অরণ্যেই এত দিন ছিল! তা হলে নজরে পড়েনি কেন! এমন সময় তিনি যা দেখলেন তাতে তাঁর মতো ভয়ডরহীন তপস্বীরও হৃৎকম্পন হল! পা যেন আঁকড়ে রয়েছে ভূমিতলকে! যারা এতক্ষণ চোখের সামনে দৃশ্যমান ছিল তারা আরও প্রকট হয়ে ক্রমশই দুলে দুলে কাঁদতে থাকল! তা শোনাচ্ছে একটা অদ্ভুত করুণ সুরে ঘ্যান ঘ্যান করে কান্নার মতো! অগস্ত্য হাতজোড় করে বললেন, ''আপনারা কে? আর আমার কাছেই বা কী চাইছেন!"
যারা এতক্ষণ ধরে গাছের ডালে নত মস্তকে বাদুড়ঝোলা হয়ে দুলছিল আর ঘ্যান ঘ্যান করে অবিরাম বৃষ্টির মতো কেঁদে চলছিল তারা সব্বাই এক সঙ্গেই বলে উঠল, ''আমরা সব্বাই তোমার পূর্বপুরুষ। আমরা অনন্তকাল থেকেই এভাবে ঝুলে রয়েছি। আমাদের আজও স্বর্গপ্রাপ্তি হয়নি! আর তার মূলে বৎস তুমি রয়েছ।''
অগস্ত্য হাতজোড় করে বললেন, "আমার দ্বারা যদি আপনাদের কষ্ট মোচন করা সম্ভব হয় তা হলে আমি যথাসাধ্য প্রয়াস করব।''
অগস্ত্যের এমন আশ্বাসে সকলের কান্নাই হঠাৎ করে থেমে গেল। তাঁরা বললেন, ''বৎস অগস্ত্য, তোমাকে দার পরিগ্রহ করতে হবে। আমরা জানি তুমি

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, কোনওদিন দার পরিগ্রহ করবে না। আর তোমার এই প্রতিজ্ঞাই হচ্ছে আমাদের কাছে কণ্টক। এমন কারণেই আমরা স্বর্গের কপাট লঙ্ঘন করতে পারছি না।"

এমন দুরবস্থায় এর আগে অগস্ত্যকে কোনওদিন পড়তে হয়নি। একদিকে পূর্বপুরুষদের মুক্তি আর অন্যদিকে নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা। ঠিক বুঝতে পারছেন না এর মধ্যে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বললেন, ''আপনারা আর কাঁদবেন না। এ আমি আর সহ্য করতে পারছি না।''

মনে মনে অগস্ত্য ঠিক করলেন, নিজের উপযুক্ত নারী তিনিই খুঁজে আনবেন। তিনি পূর্বপুরুষদের প্রণাম করে স্থান ত্যাগ করলেন।

এর কয়েকদিনের মধ্যে অগস্ত্য ঋষি তাঁর তপস্যাপীঠে উপবেশন করে একটি অতীব সুন্দরী কন্যার কল্পনা করে তাঁর চোখকে তৈরি করলেন হরিণীর চোখের ন্যায়। রাজকীয়তায় কল্পনা করলেন চিতাকে। তাল গাছের ন্যায় নারীর ক্ষীণকটি কল্পনা করলেন। রাজহংসের গ্রীবার ন্যায় কমনীয়তা দিয়ে তৈরি করলেন নারীর গ্রীবা। আর সর্বাঙ্গকে চাঁপা ফুলের গন্ধে ভরিয়ে দিলেন। কিন্তু এই কল্পনাময়ী নারীকে কোথায় প্রতিস্থাপন করবেন ভাবতে ভাবতেই তাঁর মনে পড়ল বিদর্ভরাজার কথা। তিনি তখনও সন্তান লাভের আশায় কঠোর তপস্যায় রত রয়েছেন। এই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে অগস্ত্য রানির গর্ভে প্রতিস্থাপন করলেন সেই কন্যাকে। সেই সঙ্গে রাজার কঠোর তপস্যা ভাঙিয়ে বললেন, ''মহারাজ, আপনার স্ত্রী একটি কন্যা প্রসব করবেন। তাঁর নাম দেবেন লোপামুদ্রা। তাঁকে সমস্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন। আপনি এবার সংসারে ফিরে যান।''বিদর্ভরাজ অগস্ত্য ঋষির কথা শিরোধার্য করে রাজকার্যে মনোনিবেশ করলেন। নির্দিষ্ট সময়ে বিদর্ভরানি এক অপরূপা কন্যা প্রসব করলে রাজা দীর্ঘক্ষণ মেয়েকে অবলোকন করে মনে মনে বললেন, 'মনসা চিন্তয়ামাস কস্মৈ দদ্যামিমাং সুতাম।''জানি না শেষ পর্যন্ত কার হাতে এমন স্বর্গের অপ্সরার থেকেও অপরূপা সুন্দরী মেয়েকে তুলে দিতে হবে।'

নিজের কর্মকাণ্ড শেষ করে একদিন অগস্ত্য তাঁর দেশ বিদর্ভ রাজ্যে ফিরে এলেন। সেই মাটিতে পা দিতেই তাঁর মনে পড়ে গেল তাঁর পূর্বপুরুষদের দুরবস্থার কথা। সেই ঝুলন্ত আত্মাগুলো আজও হয়তো কেঁদেই চলেছে। অথচ এত দিন এই কথাগুলো তিনি দিব্যি ভুলে গিয়েছিলেন! নিজের উপর তাঁর ভীষণ ক্ষোভ হল। তিনি রাজধানীর উদ্দেশে রওনা হলেন। হঠাৎ মনে পড়ল রাজকন্যার কথা। কী যেন নাম দিয়েছিলেন তিনি! হ্যাঁ, মনে পড়েছে। লোপামুদ্রা। রাজামশাই সেই নামটাই রেখেছেন কিনা কে জানে!

ঋষি অগস্ত্য অবশেষে রাজসভায় এসে উপস্থিত হলেন। বিদর্ভরাজা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সম্ভাষণ জানালেন ঋষি অগস্ত্যকে। কুশল বিনিময়ের পর অগস্ত্য বললেন, ''মহারাজ, আজ আমি আপনার কাছে একটি মূল্যবান জিনিস চাইতে এসেছি। আপনি দেবেন তো?"

মহারাজ হাতজোড় করে বললেন, ''আপনি যে কৃপা করে আমার কাছে কিছু চাইছেন তাতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আজ যে আপনার শ্রীচরণের ধূলিকণা আমার রাজসভায় পড়েছে তাতে শুধু এই রাজসভাই নয়, আমার রাজপ্রাসাদও পবিত্র হয়ে গেছে। তাই আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। আপনি একবার আপনার বাসনা ব্যক্ত করুন। আমার রাজকোষ আজ আপনার পদতলে হাজির করে দেব।''

বিদর্ভরাজার উদারতার আশ্বাস শুনে অগস্ত্য মনে মনে হাসছিলেন। এই মুহূর্তে রাজার মুখে ছড়িয়ে থাকা সমস্ত হাসি, ঔজ্জ্বল্য শেষ পর্যন্ত বজায় থাকবে তো! সন্দেহ আছে। অগস্ত্য ধীরে ধীরে বললেন, ''মহারাজ, বহুকাল আগে আমি একটি অমূল্য রত্ন আপনার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলাম। তবে তখন সে ব্যাপারে আপনাকে বিস্তারিতভাবে তেমন কোনও কিছুই ব্যক্ত করিনি বা বলতে পারেন তখন তার কোনও প্রয়োজনও বোধ করিনি। আজ সেই শুভদিন আগত। এবার আমার সেই অমূল্য মাণিক্য ফিরিয়ে দিন।''

বিদর্ভরাজা অগস্ত্যের কথা শুনছেন বটে, তবে মনে মনে খুঁজে চলেছেন তাঁর কথার গূঢ় অর্থ। উনি সত্যিই সঠিক কোন অমূল্য রত্নের কথা বলছেন তা এখনও রাজার কাছে স্পষ্ট নয়। অথচ ঋষিও তা ভেঙে বলছেন না। তা হলে কি তাঁর রত্নভাণ্ডার থেকে সব রত্ন এখানে এনে তাঁর পছন্দ মতো বেছে নিতে বলবেন? ব্যাপারটা কি সমীচীন হবে? নাকি তাঁকে আর একবার জিজ্ঞাসা করে জেনে নেওয়াই ভাল? আবার একই কথা বেশি জিজ্ঞাসা করাও যাবে না। মুনি-ঋষিরা মানুষের ভালও যেমন করেন ঠিক তেমনই একটু ক্ষুব্ধ হলেই অভিশাপও দিয়ে দেন। আর তা খণ্ডন করা খুবই দুষ্কর। একবার মুখনিঃসৃত কথা পরে তাঁরাও ফিরিয়ে নিতে পারেন না। তাই বিদর্ভরাজ বড় হালকা ছলে বললেন, ''আমি কি তা হলে কাঙ্ক্ষিত রত্নভাণ্ডার এনে হাজির করতে বলব ঋষিবর?"

অগস্ত্য একেবারে সরাসরি কিছু না-বলে শুধু বললেন, ''আপনি তো জানেন মহারাজ যে, সর্বত্যাগী নির্লোভ একজন ব্রহ্মবাদী দরিদ্র ঋষির অতি মূল্যবান রত্নের কোনও প্রয়োজন হয় না। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিনান্তে একবার যৎসামান্য ফলাহার-দুগ্ধ বা পায়েসান্ন হলেই নিজেকে অতি ভাগ্যবান মনে হয়। মহারাজা, আপনি আমার কথা খুব ভাল করে অনুধাবন করুন। আমি আপনার কাছে আমার গচ্ছিত অমূল্য রত্নটি ফেরত চাইতে এসেছি। আজ থেকে এক যুগেরও কিছু বৎসর আগে আমি আপনার পত্নীর গর্ভে একটি অতি মূল্যবান রত্ন কি গচ্ছিত রাখিনি? আজ তার খবর জানতে আগ্রহী।''

অগস্ত্যের এমন কথায় মহারাজ ভীষণ চমকে গেলেন। হঠাৎ করেই যেন তাঁর জিহ্বা জড়তায় আড়ষ্ট হয়ে গেল! তাঁর মুখ থেকে কোনও কথা চট করে বেরোল না। তিনি একটু সময় নিয়ে বললেন, ''আপনি যথার্থই বলেছেন ঋষিবর।

আমি সত্যই বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলাম। আমার কন্যা মা লোপামুদ্রা শুধু অপরূপাই নয়, সুশিক্ষিতা, বেদজ্ঞও বটে।''

"বাহ! তা আপনার কন্যা লোপামুদ্রাকে আসতে বলুন মহারাজ। আমি রাজকন্যা লোপামুদ্রাকে বিবাহ করব। আপনি কন্যাকে আমার হাতে সমর্পণ করুন। এটাই ওর ভবিতব্য। এই ভবিতব্যকে স্বীকার করে আমি আমার কৌমার্য ত্যাগ করব বলেই স্থির করেছি।''

"কিন্তু ঋষিপ্রবর, এ কী করে সম্ভব! আমার কন্যা মা লোপা তো প্রায় আপনার কন্যা তুল্য। এমতাবস্থায় আমি তার পিতা হয়ে কীভাবে তাকে আপনার হাতে দান করি বলুন! রাজ্যের প্রজারা কে কী বলবে সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, তার এখন সবে পূর্ণ যুবতী হওয়ার সময়। সে বিটপী লতার ন্যায় ক্রমশই বর্ধমান। তার রূপের তেজে চারদিক আলোকিত হয়ে ওঠে। তার পর সে জন্মের পর থেকেই প্রাচুর্যের মধ্যে বেড়ে উঠেছে। ওর সামান্য দুঃখ কষ্ট আমাদের বুকে ভীষণ ব্যথার উদ্রেক করে। আপনিই বলুন ঋষি, আপনি কি ওকে এত সুখে রাখতে পারবেন?"

রাজার গলা ক্রমশ রুদ্ধ হয়ে আসে। মৃদু হেসে অগস্ত্য বলেন, ''মহারাজ, মানুষের সুখ, ভাল লাগা মন্দ লাগা সবটাই হচ্ছে আপেক্ষিক। আপনি তো সম্যক ভাবে অবগত আছেন যে রাজার দুলাল রামচন্দ্র যে বৈভবের মধ্যে বড় হয়েছিলেন সেই তাঁকেই কিনা স্ত্রী সমেত চোদ্দোটি বছর কাটাতে হয়েছে বনে বনে। পূর্বে যেমন তাঁর কাছে সুখের ব্যাখ্যা ছিল সেই সুখ চোদ্দো বছরে পাল্টে গেছিল। তখন তাঁর রূপও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। কাজেই সুখ-দুঃখ দুটোই হচ্ছে আপেক্ষিক। দুটোই হচ্ছে ব্যক্তিনির্ভর। আপনারা পিতা-মাতা হিসেবে আপনাদের অভিমত জানালেন। আমি একবার আপনার কন্যার মুখ থেকে তার অভিমতটা শুনতে চাই।''

মহারাজা একেবারে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কন্যাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে সমস্ত ব্যাপারটাই বলা হল। তিনি আড়াল থেকে সবই শুনলেন। এর পর পিতা বিদর্ভরাজার প্রশ্নের উত্তরে লোপামুদ্রা সকলকে বিস্মিত করে ঋষি অগস্ত্যের মতের সঙ্গে সহমত জ্ঞাপন করলেন। এত দিন বিদর্ভরাজা ভাবছিলেন, 'মনসাচিন্তয়ামাস কস্মৈ দদ্যামিমাং সুতাম।' এমন আগুনের লেলিহান শিখার মতো যার রূপ, সেই মেয়েকে কার হাতে তুলে দেবেন! কিন্তু যাঁর অদৃষ্টে লেখা রয়েছে ঋষি অগস্ত্যের গৃহবধূ হওয়া, তা কে খণ্ডাবে! তাই এক সময় সকলকে কাঁদিয়ে লোপামুদ্রা ঋষিপত্নী হয়ে অগস্ত্যের সঙ্গে চলে গেলেন। কিন্তু রাজপুরী থেকে বের হওয়ার প্রাক্‌মুহূর্তে অগস্ত্য বললেন, ''প্রিয়ে লোপামুদ্রা, আমি দীনদরিদ্র তপস্বী। আমার বসনেও তার মলিন চিহ্ন প্রকট। এখন তুমি আর বিদর্ভরাজ কন্যা নও। 'মহাহাণুৎসৃজতানি বাসাংস্যভরণানি চ'- কাজেই তোমার পরনে রাজকীয় পোশাক আর শোভা পায় না। তুমি তা ত্যাগ করে চীরবাস, বল্কল এবং মৃগচর্ম পরিধান করো। 'ততশ্চীরাণি জগ্রাহ বল্লাল্যজিনানি চ-' এই পরিচ্ছদই হল উপযুক্ত বৈরাগ্যের সাধন।'' আর এভাবেই অগস্ত্য সদ্যবিবাহিতা পত্নী লোপামুদ্রাকে নিয়ে রাজপ্রাসাদ থেকে হরিদ্বার অভিমুখে রওনা দিলেন। সেখানে গঙ্গাতীরে কোনও এক উপযুক্ত শুদ্ধ স্থানে অনুবর্তিনী স্ত্রী লোপামুদ্রাকে নিয়ে তিনি কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। এই তপস্যায় ব্যাপৃত স্বামীর সেবা করাটাই ছিল স্ত্রী লোপামুদ্রার এক ধরনের সাধনার অঙ্গ। তিনি প্রতিদিন পরম যত্ন সহকারে স্বামীর সেবায় এতটাই নিমগ্ন থাকতেন যে একদিন তাঁর মধ্যেও এক অলৌকিক উজ্জ্বলতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। 'সা প্রীতা বহুমানাচ্চ পতিং পর্য্যচরত্তথা।' স্ত্রীর এমন সেবায় ঋষিও তাঁর উপর প্রীত ছিলেন, ভালওবাসতেন। কিন্তু শম-দমাদি-সাধনের জন্য অগস্ত্যের এই ভালবাসা ছিল বাহ্যিক। ফলে কোনও শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগেই তা নিষ্প্রভ হয়ে যেত। আর প্রতি রাতে লোপামুদ্রা তার বিক্ষত যৌবনের ভার বইতে বইতে ক্রমশই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। ধীরে ধীরে একদিন তা সহ্যাতীত হয়ে যায়। লোপামুদ্রা বিবাহের পর থেকে দীর্ঘ বছর স্বামীর সান্নিধ্য লাভ থেকে বঞ্চিত থাকায় তাঁর মনের কোণে অনেক অভিমান, আক্ষেপ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। একদিন তারই অভিব্যক্তি বেরিয়ে এল কবিতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু তার পরেও লোপামুদ্রা স্বামী অগস্ত্যর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেননি।

কিন্তু যেদিন লোপামুদ্রা ঋতুকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পর বসনমুক্ত হয়ে সরোবরে সাঁতার কাটছিলেন সেদিন তাকে ওইভাবে দেখতে পেয়ে স্বয়ং অগস্ত্য কামার্ত হয়ে পড়েন। ফলে এত দীর্ঘ বছর লোপামুদ্রার যে উপোসী শরীর অপেক্ষমাণ ছিল তার কাছে এসে অগস্ত্য তাঁর কামের ইচ্ছে ব্যক্ত করে বললেন, 'শিয়া রূপেন প্রীতো মৈথুনায়জুহাব তাম।' এমন মুক্ত আহ্বানে যা হওয়া উচিত তা কিন্তু হল না। লোপামুদ্রা সাদরে স্বামী অগস্ত্যকে আহ্বান করলেন না। যেখানে একজন যৌবনবতী রমণীর সাড়া দেওয়ার কথা সেখানে তাঁর মধ্যে দেখা গেল এক অদ্ভুত সংযম। লোপামুদ্রা দুঃখ মিশ্রিত ক্রোধের সঙ্গেই বললেন, 'পূর্বীরহং শরদঃ শশ্রমাণাঃ। দোষাবস্তোরুসসা জরয়ন্তী।' ''এতদিন আপনার সেবা করতে করতে আমি ক্লান্ত। আমার জীবনের অনেকগুলো শরৎ কেটে গেছে। প্রতিদিন সকালে আমি বুঝতে পারি যে আমি ক্রমশই বুড়িয়ে যাচ্ছি।'' এমন যার উপলব্ধি তিনি কিন্তু স্বামীর মৈথুনের আহ্বানে একেবারে উপোসী নারীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন না। বরং লজ্জাবনত মুখে বললেন, ''হে প্রাণপ্রিয় ঋষি, আমি জানি যে আপনি আমাকে পুত্রলাভের জন্যই গ্রহণ করেছেন। এতে অন্যায় কিছু না-থাকলেও, 'যা তু ত্বয়ি মম প্রীতিস্তামৃষে কর্তুমহসি।' পুত্রলাভের যান্ত্রিকতার চেয়েও নারীর আরও বেশি কিছু কাম্য আছে। আমার কিছু ভাল লাগা, মন্দ লাগা, ইচ্ছে-অনিচ্ছে জড়িয়ে রয়েছে।'' অগস্ত্য কিছুটা আহত হয়ে কামার্ত

দৃষ্টিতে লোপামুদ্রার দিকে তাকিয়ে রইলেন! আর মনে মনে ভাবছিলেন তিনি এতদিন কীভাবে এমন এক পীনপয়োধর রমণী, যার কদলী স্তম্ভের ন্যায় ঊরুদেশ আর আয়তলোচনা, বৃথাই তাঁকে অবহেলা করে তাঁর উন্নত যৌবনকে আহত করেছেন। কিন্তু এমতাবস্থায় সুন্দরী রমণী কী বলতে চাইছেন তা শোনা প্রয়োজন। এত অল্প বয়সে এক অনভিজ্ঞ নারীর মুখ নিঃসৃত কথা শুনে বিভিন্ন জ্ঞানে অভিজ্ঞ ঋষি অগস্ত্য প্রায় বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। স্ত্রী লোপামুদ্রা তখন স্বামীকে বলছিলেন, "হে প্রিয় ঋষি, বিবাহ মানেই এক চিরাচরিত যান্ত্রিক সঙ্গম নয়। এর পূর্বাপর এক প্রস্তুতি রয়েছে, যাকে অস্বীকার করা যায় না। যেমন আমার পিতৃগৃহে যে মহার্ঘ শয্যা ছিল, যা আমাকে সব সময় নিশ্চিত নিদ্রা দিয়েছে, আজ আমি চাই সেই শয্যাতেই আমাদের প্রথম মিলন হোক, 'তথাবিধে ত্বং শয়নে মামুপৈতুমিহাহসি।' আপনি জ্ঞাত আছেন কি না জানি না যে, পুরুষ-নারীর সঙ্গম পূর্বে শৃঙ্গারোচিত বেশে ভূষিত হওয়া প্রয়োজন। আমি চাই আপনি ঠিক সেইভাবে মালা চন্দন ও বিভিন্ন অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে আমাকে গ্রহণ করুন। আর অনুরূপভাবে আমিও নিজেকে সাজিয়ে তুলতে চাই। ফুল-চন্দনের গন্ধে যেন আমরা দু'জনেই আমোদিত হই। 'উপসতুং যথাকামং দিব্যাভরণ-ভূষিতা' এভাবেই আমি আপনাকে গ্রহণ করতে চাই। যদি ঠিক এভাবেই বিভিন্ন বস্তুতে সজ্জিত হয়ে উন্নত মানের শয্যায় আপনি আমার কাছে আসেন তা হলেই আমাদের মিলন সম্ভব, নতুবা আমাদের এমন জীর্ণ গৈরিক কৌপীন বস্ত্রে এ মিলন সম্ভব নয়, 'অন্যথা নোপতিষ্ঠেয়ং চীর-কাষায়বাসিনী।'''

লোপামুদ্রার এমন স্পষ্ট কথা বৈদিক যুগে একেবারে অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল না। তবু লোপামুদ্রা যেন একটু বেশিই স্পষ্টবক্তা। অগস্ত্য একজন ব্রহ্মবাদী প্রণম্য ঋষি হলেও তিনি যে এক নারীর স্বামী, তা দীর্ঘ তপস্যার চাপে হয়তো ভুলতে বসেছিলেন। তিনি হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন যে একজন রূপে-গুণে গুণান্বিতা এবং সুশিক্ষিতা এক নারীকে বিবাহ করা মানেই গার্হস্থ্য ধর্মে স্ত্রীকে পাশে শুইয়ে ঊর্ধ্বরেতা হয়ে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায় না। একজন স্ত্রীর যা যা প্রাপ্য, তার সবটাই পুরুষের দেওয়া উচিত। আর সে কারণেই অগস্ত্যের প্রতি তাঁর এমন প্রতিবাদ। লোপামুদ্রা ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে একটি অপ্রিয় সত্য কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, ''এত দিন আমি আপনার সহধর্মচারিণী হয়ে আপনার কোনও বাক্যকেই অমর্যাদা করিনি। যেমন পরিধান করেছি চীর-বল্কল। অবশ্যই এই বেশ পবিত্র। তেমনই মিলনেচ্ছু নর-নারীরও একটি পবিত্র বেশভূষা প্রয়োজন।'' এ অপবিত্র নয় বলেই লোপামুদ্রা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন, 'নৈবাপবিত্রো বিপ্রর্যে ভূষপণাহয়ং কথঞ্চন।'

দীর্ঘ বছর ধরে যে নারী স্বামীসেবাকে তপস্যারই একটি অঙ্গ হিসেবে দেখে এসেছে, সে যদি হঠাৎ করেই কিছু সত্যভাষণ করে ফেলে তা হলে স্বামী যেমন বিস্ময়ে তড়িতাহত হন, আজ অগস্ত্যেরও একই উপলব্ধি হয়েছে। তবে তিনি একেবারেই ক্রোধান্বিত হননি। বরং তিনি স্ত্রীর ব্যথায় সমব্যথী হয়েছেন। তাই কাতর গলায় বললেন, ''হে কল্যাণী লোপামুদ্রা, তুমি যে রাজকীয় আভূষণের কথা বলছ তা তো আমার সংগ্রহে নেই। তুমি ভাল করেই জানো যে আমারও যেমন নেই তেমনি তোমারও নেই, 'ন তে ধনানি বিদ্যন্তে লোপামুদ্রে তথা মম।'''

লোপামুদ্রা স্বামীর কথা শুনে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে আবার বললেন, ''হে তপস্বী আমার, আপনার অসাধ্য কিছু আছে কি? আপনি তপস্যার বলে এই ভুবনের সমস্ত ধন-সম্পদ নিজের করায়ত্ত করতে পারেন না কি!"

অগস্ত্য মৃদু হেসে বললেন, ''তা হয়তো পারি। কিন্তু এতে আমার লব্ধ শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। কমে যাবে আমার তেজ,'এবমেত যথার্থ ত্বং তপোব্যয়করন্তু তৎ।' বরং তুমি অন্য কোনও পন্থার কথা বলো যাতে তোমার আশাও পূরণ হয় আবার আমার তপস্যালব্ধ শক্তি নষ্টও না হয়।''

লোপামুদ্রা মৃদু হেসে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, '''ন চান্যথাহমিচ্ছামি ত্বমুপৈ্তুং কথঞ্চন।' আমার ইচ্ছে পূরণ না হলে আমি একই শয্যায় শয়ন করব না। আমি মিলনের পূর্বে যতটুকু উপকরণ চেয়েছি তা আপনাকে মেটাতেই হবে। কীভাবে করবেন তা আপনার ব্যাপার।''

অগস্ত্য চিন্তান্বিত মুখে অর্থ উপার্জনের আশায় বেরোলেন। তাঁর মনে হল তা হলে যারা গৃহী মানুষ তাদেরও কি প্রায়শই এমন বিড়ম্বনায় পড়তে হয়! তারা কীভাবে এমন বিড়ম্বনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পান তা অবশ্য অগস্ত্যের জানা নেই! অগস্ত্য অর্থ লাভের জন্য প্রথমে গেলেন রাজা শ্রুতর্বার কাছে। তিনি ঋষিকে যথাযথ সম্মান করলেন। কিন্তু অর্থ দেওয়ার ব্যাপারে তিনি অগস্ত্যকে শোনালেন তাঁর খাজনা লব্ধ আয়ের হিসেব। দেখা গেল তাঁর হিসেবানুযায়ী আয়-ব্যয় সমান সমান। কোনও উদ্বৃত্ত নেই। ঋষি অগস্ত্যকে অর্থসাহায্য করতে না-পেরে রাজা তাকে আর-একজন বন্ধু ব্রধশ্ব রাজার কাছে নিয়ে গেলেন। অথচ তিনিও রাজা শ্রুতর্বার মতো একই কথা বললেন। অগস্ত্য বুঝলেন যাদের আয়-ব্যয় সমান সমান, তাদের কাছ থেকে অর্থ নিলে সেটা প্রজার মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার শামিল হয়। তবে শেষাবধি একটি উপায় রাজারাই স্থির করলেন। রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ছিলেন দানব রাজা ইল। সকলে মিলে তাঁর কাছে গেলে দানব রাজা ঋষি অগস্ত্যকে অর্থসাহায্য করতে চাইলেন। তবে একটি শর্তের বিনিময়ে। অগস্ত্য সেই শর্ত কীভাবে পূরণ করেছিলেন তা ইল-বাতাপির গল্পের মধ্যেই নিহিত আছে। এবং সেই শর্ত পূরণের জন্য অগস্ত্য প্রচুর ধন-সম্পত্তি অর্জন করে গৃহে ফিরে এলেন। লোপামুদ্রা প্রীত হয়ে বললেন, ''স্বামী! আমি আপনাকে যে অর্থ উপার্জন করে আনার কথা বলেছিলাম আপনি তাতে কৃতকার্য হয়েছেন, 'কৃতবানসি তৎ সর্বং ভগবন মম কাঙ্ক্ষিত।' এবার আসুন আমরা মিলিত হই। আপনি এবার সম্ভোগে মিলিত হন এবং আমার গর্ভে অপত্য উৎপাদন করুন, 'উৎপাদয়

সকৃনমহ্যম অপত্যং বীর্যবত্তরম।'''
লোপামুদ্রার এমন কথায় ঋষি অগস্ত্য উৎসাহিত হয়ে বললেন, ''প্রিয়ে, তুমি বলো আমার কাছে দশটি উত্তম মানের সন্তান চাও, নাকি শত পুত্রের জননী হওয়ার মোহে শত পুত্র চাও। আজ তোমার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে।''
লোপামুদ্রা ছিলেন সুশিক্ষিতা বেদজ্ঞ এক নারী। তাই তাঁর উত্তর যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমনই হল। তিনি বললেন, ''প্রভু,আমি সহস্র পুত্রের ন্যায় একটিই বিদ্বান পুত্রসন্তান চাই।''
"মাত্র একটি সন্তান কেন?" অগস্ত্য মৃদু হেসে জানতে চাইলেন।
লোপামুদ্রা বললেন, ''অনেক মূর্খ অশিক্ষিত পুত্রের চেয়ে একটি মাত্র বিদ্বান পুত্র চাইছি আপনার কাছে, 'একো হি বহুভিঃ শ্রেয়ান বিদ্বান সাধুরসাধুভিঃ।'''
অগস্ত্য মৃদু হেসে বললেন, ''তথাস্তু! তবে তা-ই হোক। তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হোক।''
একজন দৃঢ়চেতা, বেদজ্ঞ নারীর এভাবেই মিলন সম্পন্ন হয়েছিল। এবং এর ফলস্বরূপ অগস্ত্য–লোপামুদ্রার যৌথ চাহিদায় যে সন্তান উৎপন্ন হয়েছিল সেই দৃঢ়স্যু ইধ্মবাহ নিজেও ছিলেন একজন মহাকবি।
ঋগ্বেদে ঋষিকা বেদজ্ঞ লোপামুদ্রার একটি শ্লোক রয়েছে। যেখানে ঋষি অগস্ত্য, লোপামুদ্রা এবং একজন শিষ্যের কিছু কথোপকথন বিধৃত রয়েছে। কিন্তু একজন প্রকৃত সর্বজ্ঞ বিদুষী রমণীর প্রজ্ঞাকে বিচার করতে গেলে তিনি কতগুলো স্তুতি বা ঋক রচনা করেছেন সেটিই বিচার্য বিষয় নয়। তাঁকে বিচার করা উচিত তাঁর মেধা, বিচারবুদ্ধি, সৌন্দর্যপ্রিয়তা এবং তাঁর শিক্ষা দিয়ে। এখানে একজন স্বামী ও স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্কের ঘটনার মধ্য দিয়ে লোপামুদ্রা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে শুধু শরীরপাত করে তপস্যা করলেই কৃতকার্য হওয়া বা ব্রহ্মত্ব লাভ হয় না। সংসারের মধ্যে থেকেও সংসারধর্ম পালন করে,স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক বজায় রেখেও তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করা যায়। এভাবেই তিনি অগস্ত্যকে সংসার জীবনের সারমর্ম বুঝিয়েছিলেন। তিনি শুধু বুদ্ধিমতী নারীই ছিলেন না, ছিলেন জ্ঞানঋদ্ধা নারী। কাজেই কঠোর তপস্যা করতে গেলেই যে একেবারে সংসারবিমুখ হতে হবে তার কোনও অর্থ নেই। সংসারধর্ম পালন করলে কখনও তা তপস্যায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। এমন কিছু ভ্রান্ত ধারণা লোপামুদ্রা সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

৪

ওঁ বেদাত্মনায় বিদ্মহে হিরণ্যগর্ভায়।
ধীমহি তন্নো ব্রহ্মা প্রচোদয়াৎ।।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পুরাণমতে ব্রহ্মাই সমস্ত সৃষ্টির মূলাধার। এই জগতে যা যা দৃশ্যমান তা ব্রহ্মার দ্বারা বা কৃপায় সৃষ্টি হয়েছে। আদিতে ব্রহ্মা তাঁর মুখ থেকে ঋষি অঙ্গিরাকে প্রকট করেন। নেত্র থেকে প্রকটিত হন ঋষি অত্রি। ব্রহ্মা তাঁর প্রাণ থেকে তৈরি করেন বশিষ্ঠ মুনিকে। মনের অন্তঃস্থল থেকে প্রকট করেন ঋষি মরীচিকে। ব্রহ্মের কর্ণ থেকে প্রকটিত হন ঋষি পুলস্ত্য। নাভিমূল থেকে প্রকটিত হয়েছিলেন ঋষি পুলহ এবং ব্রহ্মার বাহু থেকে ক্রতু ঋষি তৈরি হয়েছিলেন। আর এই সপ্ত ঋষিকেই পরবর্তীকালে মানুষ আকাশে সপ্ত ঋষির অবস্থান হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে।
এতেও ব্রহ্মা ক্ষান্ত হননি। তিনি তাঁর ত্বক এবং বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে তৈরি করেন যথাক্রমে ঋষি ভৃগু ও দক্ষরাজকে। এর পরে তিনি তাঁর মস্তক থেকে প্রকট করেন অর্ধনারীশ্বরকে। অতঃপর তিনি হয়তো সন্তুষ্ট হতে না পেরে সেই অর্ধনারীশ্বরকে দ্বিখণ্ডিত করেন। একদিকে পুরুষ এবং অন্যদিকে নারী পৃথক হয়ে যায়। সেই পুরুষ থেকেই সৃষ্টি হয় স্বয়ম্ভু মনুর। আর এই মনুই হচ্ছেন সমস্ত মানবজাতির পিতা। এমনই বলা আছে পুরাণে। আর দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ নারীর অংশ থেকে সৃষ্টি হয় শতরূপার। অর্থাৎ প্রকৃতির। আর এই প্রকৃতিই হলেন জগতের প্রথম নারী। তাঁর মাধ্যমেই এত কিছুর বিস্তার।
এ সবই ভাগবত পুরাণে বলে। কিন্তু এত সবের অবতারণার মূলে রয়েছেন পুলহ নামের ঋষি। যিনি ব্রহ্মার নাভিমূল থেকে প্রকটিত হয়েছিলেন। এই ঋষির পত্নী ছিলেন ক্ষমা। তাঁর গর্ভে জন্মেছিলেন তাঁর পিতার ন্যায় একজন প্রথিতযশা ঋষি। যাকে পুরাণে কর্দম বলা হয়েছে। কর্দম ঋষির দ্বিতীয় পত্নী ছিলেন স্বয়ম্ভু মনুর কন্যা দেবাহুতি। এখান থেকেই নতুন এক অজানিত গল্পের শুরু।
ঋষি কর্দম-দেবাহুতির বিয়ে সুসম্পন্ন হয়ে গেলে দেবাহুতি স্বামী কর্দমের সঙ্গে চলে গেলেন তাঁর আশ্রমের পর্ণকুটিরে। দেবাহুতির সাধন-ভজনের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না। তাই প্রথা মতো দেবাহুতিকে সংসারের সব কাজই নিজের কাঁধে তুলে নিতে হল। প্রত্যুষের প্রথম কুসুম আলোর আভা জনপদে ছড়িয়ে পড়ার আগেই শয্যা ত্যাগ করে গোশালায় প্রবেশ করেন দেবাহুতি। গো-বৎসদের বেঁধে রেখে গাভী দোহন করে তাদের গোচারণে পাঠিয়ে দেওয়া এবং গোশালা পরিষ্কার করা বেশ দুরূহ কাজ। সেই সময় প্রায় সব মুনি-ঋষির গোশালায় যথেষ্ট গাভী থাকত। এরাই ছিল তাদের সম্পদ। এর পরে কৃষিকাজের তদারকি করাও ছিল দৈনন্দিন কাজের মধ্যে। সেই সঙ্গে ছিল স্বামীসেবা করা। এখানে কোনও ত্রুটি ঘটলেই সাংঘাতিক অঘটন ঘটে যেতে পারত। সব সময় স্বামী নামক প্রভুদের জিহ্বাগ্রে যেন ঝুলে থাকত অভিশাপের বুলি! কাজেই মুনি-ঋষির পত্নীদের এ সব ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকতে হত। অবশ্য এমনটা সব মুনি-ঋষির ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল না। যেমন ছিল না ঋষি কর্দমের ক্ষেত্রে। তিনি বেশ শান্ত স্বভাবের ছিলেন। সেই সঙ্গে প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল দেবাহুতির প্রতি। তিনি যেমন গার্হস্থ্য জীবনকে উপভোগ করতে ভালবাসতেন, ঠিক একই ভাবে সাধন-ভজনেও কোনও খামতি ছিল না। শিষ্যরা যেন সঠিকভাবে অধ্যয়ন করে সেদিকেও তাঁর ছিল কঠোর দৃষ্টি। এভাবেই একসঙ্গে গার্হস্থ্য জীবনে ডুবে যাওয়া এবং অধ্যয়নে রত থাকার

ফলে ঋষি কর্দম দশ সন্তানের পিতা হয়েছিলেন। তাঁর দশজন সন্তানের মধ্যে কন্যাসন্তান ছিলেন নয় জন। আর মহর্ষি কপিল ছিলেন একমাত্র পুত্রসন্তান।
একদিন সরোবর থেকে স্নান করে গৃহে ফেরার পথে পিতার সঙ্গে সকলের মুখোমুখি দেখা। সকলেই সাষ্টাঙ্গে মহর্ষি কর্দমকে প্রণাম করলে কর্দম বললেন, ''বৎস কপিল ছাড়া সকলেই গৃহে যাও। আমার কপিলের সহিত কিছু জরুরি কথা আছে।''
কপিল তার সিক্ত বস্ত্র পরে মাথা নিচু করে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। পিতা কর্দম একটু সময় নিয়ে বললেন, ''প্রাতঃকালে আমার সময়াভাবে তোমার সঙ্গে কোনও বাক্যালাপই হয়ে ওঠে না। তাই ভাবছিলাম যেহেতু এখনও অধ্যয়ন শুরু হয়নি তাই প্রয়োজনীয় কথাটা তোমাকে বলার এটাই সুযোগ। জানতে চাইছিলাম তোমার ভগিনীদের অধ্যয়নের ব্যাপারে। তাদের নিশ্চয়ই ক্রমশ অগ্রগতি হচ্ছে। বৎস, এ ব্যাপারে তোমার মতামত জানতে ইচ্ছুক,'' মহর্ষি কর্দম বললেন।
কপিল ঠিক বুঝতে পারছে না সঠিক কথাটা বলা কতটা সমীচীন হবে। তাই মাথা নিচু করেই বলল, ''আপনাকে কোনওদিনই অসত্য বলিনি। তাই আজও তেমন কথা বলার প্রশ্ন নেই। আসলে পিতৃদেব, আমার ভগিনীদের মধ্যে একমাত্র অনসূয়া আর অরুন্ধতী ব্যতীত অন্য কারও অধ্যয়নে মতি নাই। তাহারা সহজ কিছুই স্মৃতিতে গ্রহণ করিতে পারে না। বরং তাহারা সংসারের কাজে যথেষ্ট পটু। অনসূয়া ভীষণই বুদ্ধিমতী। একবারেই সমস্ত পাঠ শেষ করিতে সক্ষম। তাই আমি মাতাকে বলেছি তিনি যেন অনসূয়া আর অরুন্ধতীকে সংসারের কাজে কম ব্যবহার করেন। উহারা যতক্ষণ অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকে ততই উহাদের মঙ্গল।''
"বেশ কহিয়াছ। আমারও তেমনটাই মত। যাহারা অধ্যয়নে নিজেদের নিয়োজিত করে রাখতে চায় তাদের অবশ্যই যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া উচিত। ঠিক আছে বৎস, তুমি এখন যাও,'' মহর্ষি কর্দম দ্রুত অধ্যয়নে রত শিষ্যদের কাছে চলে গেলেন।
কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক! যেমন কপিলের ভগিনীদের ব্যাপারে ঘটে চলেছে। বড় ভগিনীর তো আগেই বিবাহ হয়ে গিয়েছিল। এবার অনসূয়ার হওয়ার কথা। কিন্তু সে এই মুহূর্তে বেঁকে বসায় মাতা কিছুটা বিড়ম্বনায় পড়লে পিতৃদেব মহর্ষি নিজে স্ত্রী দেবাহুতিকে বুঝিয়ে বললেন, ''এভাবে জোর করে ওদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিবাহ দিলে জ্ঞানার্জনে তা বাধা সৃষ্টি করবে। তা আদৌ কাম্য নয়। তা ছাড়া বয়সানুক্রমে যে সবাইকে পরপর বিবাহ দিতেই হবে এমনটা কেনই বা হবে। তবে ওরা কেন এই মুহূর্তে বিবাহে রাজি নয় তা কি ওদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে?"
মহর্ষির এমন যুক্তি শুনে স্ত্রী দেবাহুতি কিছুটা বিস্মিত হয়ে বললেন, ''প্রভু, এ আপনার কেমন প্রশ্ন! মেয়েরা বিবাহযোগ্যা কিনা তা মায়েরা সবচেয়ে আগে বুঝতে পারেন। মেয়েকে জিজ্ঞাসা করার কোনও মানেই হয় না। তা ছাড়া ওরা তো কেউ বলেনি যে তারা আজীবন অনূঢ়া থেকে বেদ চর্চা করে কাটিয়ে দেবে। তেমনটা হলে না হয় ভেবে দেখতাম! কাজেই সময়ের কাজ সময়ে করা ভাল বলেই আমার মনে হয়। কিন্তু আপনার কেন মনে হল যে ওদের আরও সময় দেওয়া উচিত!"
মহর্ষি মৃদু হেসে বললেন, ''তোমাকে তো আগেই বললাম প্রিয়ে যে, ওদের অর্থাৎ অনসূয়া এবং অরুন্ধতীর সব বিষয়েই জানার আগ্রহটা অসীম। পিতা-মাতা হিসেবে আমাদের উচিত ওদের আগ্রহকে মান্যতা দেওয়া। সব সময় স্বামীর ঘরে তেমন সুযোগ-সুবিধা না-ও পেতে পারে। তখন মেয়েরা জানার আগ্রহে সারাটা জীবন ব্যাকুল হয়ে ছটফট করবে। আমি এটা উপলব্ধি করতে পারি,'' মহর্ষি কর্দম একবার সামনে দাঁড়ানো পুত্র কপিলের দিকে দৃষ্টিপাত করে আবার দেবাহুতির দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখের ভাব পড়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু স্ত্রীর মুখের রেখায় কোনও বিশেষ পরিবর্তন তাঁর নজরে পড়ল না। তিনি মনে মনে স্বস্তি অনুভব করলেন। এবং কপিলের মুখ দেখে অনুমান করতে পারলেন যে পুত্রও কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারল।
অনেক আগেই বড় মেয়ে কালাকে ঋষি মরীচির হাতে সমর্পণ করেছিলেন মহর্ষি কর্দম। তার পর তৃতীয় কন্যা শ্রদ্ধাকে ঋষি অঙ্গিরার হাতে তুলে দিয়েছেন। চতুর্থ কন্যা মানিনীকে দিয়েছেন ঋষি পুলস্ত্য এবং পঞ্চম কন্যা গীতাকে দিয়েছেন ঋষি পুলহের হাতে। এভাবে একে একে বাকিদের বিবাহও ঋষিদের সঙ্গেই দিয়েছেন। তবে এখনও বাকি রয়েছে দ্বিতীয় কন্যা অনসূয়া এবং সর্বকনিষ্ঠ কন্যার ঠিক আগের জন, অর্থাৎ অষ্টম কন্যা অরুন্ধতী। এরা দু'জনেই ভীষণ বুদ্ধিমতী। তাই মহর্ষি কর্দম এবং পত্নী দেবাহুতি চান না যে, শুধু সংসার করার জন্যই এদের বিবাহ হোক। তাই চতুর্দিকে ভাল পাত্রের খোঁজ শুরু হয়ে গেছে। অনেক মুনি-ঋষির খোঁজ পাওয়া গেছে। শেষে এল সেই শুভ সংবাদ। খবর এল ঋষি বশিষ্ঠ ও অত্রির। দু'জনেই পাত্র হিসেবে অতি উত্তম। তাঁদের সাধনালব্ধ জ্ঞানের কথা মুনি-ঋষি সমাজের সকলেই জানেন। এমনকি অনেক রাজা মহারাজাও তাঁদের রাজসভায় এঁদের সান্নিধ্য পেতে ইচ্ছুক। তাই মহর্ষি আর দেরি না করে মেয়েদের গুণাবলি এবং রূপ বর্ণনা করে ঋষিদের সন্নিকটে খবর পাঠালে তাঁরা দু'জনেই সম্মতি জানালেন। এক শুভ সময়ে ঋষি অত্রির সঙ্গে দ্বিতীয়া কন্যা অনসূয়া এবং অষ্টম কন্যা অরুন্ধতীর সঙ্গে ঋষি বশিষ্ঠের শুভপরিণয় সম্পন্ন করে ঋষি দম্পতি বড় নিশ্চিন্ত হলেন।
এক জীবন থেকে আর-এক অজানা জীবন। এই জীবনের সঙ্গে পিতৃগৃহের জীবনের প্রায় কোনও মিল নেই বললেই চলে। প্রথমে বোঝা যায় না, কোথায় অনুশাসনের শৃঙ্খল অধিক। আগের জীবনে পিতা-মাতার এক প্রকার অনুশাসন থাকে। পরবর্তীকালে তা শ্বশুরালয়ের নব অনুশাসনে রূপান্তরিত হয়। সমঝে চলতে হয় স্বামীর অনুচ্চারিত অনুশাসনকে। মনোনিবেশ করতে

হয় স্বামীসেবায়। এভাবেই স্বামী এবং সংসারটা একদিন সম্পূর্ণভাবে নিজের হয়ে যায়। এ সব কথা ভাবতে ভাবতেই অনসূয়া স্বামী অত্রি ঋষির সঙ্গে চললেন চিত্রকূট পর্বতের পাদদেশে, স্বামীর পর্ণকুটিরে। আর অন্যদিকে অরুন্ধতীও স্বামী বশিষ্ঠ ঋষির সঙ্গে যাত্রা করলেন সুদূর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর রাজ্যের উদ্দেশে। যেখানে তাঁর আসার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছে আর-এক পর্ণকুটির।

কন্যারা তাঁদের স্বামীদের হাত ধরে চলে যাওয়ার আরও কিছুদিন পরে মহর্ষি কর্দম ঘোষণা করলেন যে তিনি এবার বাণপ্রস্থ নেবেন। সেই মতো একদিন পিতা মহর্ষি কর্দম গৃহত্যাগ করার পর কপিল তাঁর মা দেবাহুতিকে যোগ ও বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা দেন। অবশ্য এতে দেবাহুতির মোক্ষলাভের পথও প্রশস্ত হয়ে যায়।

এর মধ্যে অযোধ্যার রাজা দশরথ এক কাণ্ড করে ফেলেছেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী কৈকেয়ীর সেবায় প্রীত হয়ে সে যা চাইবে তা-ই দেবেন এমনই এক প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছেন। চতুর মহিলা কৈকেয়ী নিজের সন্তানের জন্য চেয়ে বসেছেন অযোধ্যার রাজসিংহাসন। এবং সেই সঙ্গে জ্যেষ্ঠ পুত্রের চোদ্দো বৎসর বনবাস। এ কাহিনি সকলেরই জানা। কিন্তু এর পরবর্তী কাহিনি জেনে হয়তো অনেকেই বিস্মৃত হলেও হতে পারেন। সেদিকে আলোকপাত করতেই দেখতে পাই, সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ দু'জন বালক সঙ্গে একজন বালিকাকে নিয়ে প্রতিদিনই গভীর ভয়াল অরণ্যের মধ্য দিয়ে ক্রমশই এগিয়ে চলেছেন এক অজানিতের উদ্দেশে। কোথায় যে কুটির গড়ে তুলবেন তার উপযুক্ত স্থান খুঁজে পাচ্ছেন না। এমতাবস্থায় সুদূরে একটি কুটির দেখতে পেয়ে তারা চিত্রকূট পর্বতের পাদদেশে সেই কুটিরের উদ্দেশে রওনা দেন।

একেবারে কুটিরের সমীপে এসে রামচন্দ্র বড় মৃদু স্বরে হাঁক দিয়ে বলেন, ''গৃহস্বামী কি গৃহে অবস্থান করছেন? অথবা অন্য কোনও ব্যক্তি? আমরা পথশ্রমে ক্লান্ত। আমাদের একটু বিশ্রামের প্রয়োজন।''

কিছুক্ষণের অপেক্ষা। পর্ণকুটিরের পলকা বেড়া ঠেলে একজন ঋষি বাইরে বেরিয়ে এলেন। আগন্তুকেরা তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেই তিনি আশীর্বাদ করে বললেন, ''আয়ুষ্মান ভব। কল্যাণমস্তু! তোমরা আমার পর্ণকুটিরে এসে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করো।''

রাম-লক্ষ্মণ-সীতা কুটিরে প্রবেশ করে বুঝতে পারলেন যে এই কুটিরের সর্বত্রই অনাড়ম্বর জীবনের ছোঁয়া স্পষ্ট। চারদিকে একটা প্রগাঢ় শান্তি বিরাজ করছে। ঋষির দিকে দৃষ্টিপাত করতেই বোঝা গেল তিনি বড়ই সঙ্কোচ বোধ করছেন। রামচন্দ্র ঋষির দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ''প্রভুর নাম এখনও জ্ঞাত হইনি।''

"আমি অত্রি ঋষি। তোমরা আমার গৃহে অতিথি হওয়ায় আমরা ভীষণ প্রীত বোধ করছি। কিন্তু তোমাদের দেখে তো সাধারণ কেউ বলে মনে হচ্ছে না,'' অত্রির কণ্ঠ থেকে বিনয় ঝরে পড়ল।

"ঋষিবর, আমরা অযোধ্যা রাজ্য থেকে আসছি। রাজা দশরথ আমাদের পিতা। ইনি আমার স্ত্রী এবং জনক রাজার কন্যা, সীতা। আমাকেই মূলত চোদ্দো বৎসর বনবাস দেওয়া হয়েছে। তবে আমার ভাই লক্ষ্মণ ও পত্নী সীতা স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে এসেছেন। দীর্ঘদিন ভ্রমণ করেও কোনও উপযুক্ত স্থান পেলাম না যেখানে আমরা বসবাসের জন্য কুটির নির্মাণ করতে পারি। আপনি কি আমাদের তৃষ্ণা নিবারণের ব্যবস্থা করতে পারেন?"

রাম এবং অত্রির মধ্যে এমন বাক্যালাপ শুনে পত্নী অনসূয়া বাইরে বেরিয়ে এলেন। সকলে তাঁকেও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে তিনি খর্জুর পাতার আসন পেতে অতিথিদের বসতে দিলেন। সেই সঙ্গে ফলাহারের ব্যবস্থা করলেন। পথশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত রাম-লক্ষ্মণ-সীতা পরম তৃপ্তি সহকারে তা গ্রহণ করেছিলেন। অনসূয়া সীতার উদ্দেশে বলেছিলেন, ''হে জনক কন্যা জানকী, তুমি স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘ চোদ্দো বৎসর যত্রতত্র ঘুরে বেড়াবে। এতে তোমার ত্বকের সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হবে। রৌদ্র-বৃষ্টিতে এবং অযত্নে তোমার জৌলুস নষ্ট হতে পারে। তাই আমি তোমাকে একটি এমন উপলেপ দেব যা ব্যবহার করলে তুমি চিরসুন্দর থাকবে। আর একটি কথা বলি মা। তুমি স্বামীর এমন দুর্দিনে যে তাঁর সঙ্গে রাজপ্রাসাদের সুখ-আতিশয্য ত্যাগ করে দুর্গম অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করছ, আমার মতে তা তোমার সঠিক সিদ্ধান্ত। বিবাহের পরে স্বামীর মতো পরম বন্ধু আর কেউ হতে পারে না। তাঁর সুখে-দুঃখে সহধর্মিণীরই পাশে থাকা উচিত। তুমি সঠিক ভাবেই ভাল কাজ করেছ।''

সীতা অনসূয়ার মুখে এমন কথা শুনে বললেন, ''মা, আমি তো সংসারের কিছুই জানি না। বিবাহের পরে কতদিনই বা সংসার করতে পারলাম। তাই এ ব্যাপারে এমন কিছু উপদেশমূলক কথা বলুন, যাতে আমার পরবর্তী সংসারজীবন মসৃণ হয়।''

অনসূয়া মৃদু হেসে বললেন, ''শোনো বৎসে,আমি বিবাহের পরে কোনওদিনই স্বামীর কথা অমান্য করিনি। আমি জানি আমার স্বামী আমার উদ্দেশে যা বলেন তা আমার হিতের জন্যই বলেন। তিনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষীও সঙ্গী। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমি স্বামীসেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখার চেষ্টা করি। হয়তো আমার পতিব্রতা চরিত্রের কাহিনি যে কোনওভাবেই হোক দেবলোক পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এটা আমার পরম সৌভাগ্য যে একবার স্বয়ং নারদ মুনি আমার পতিসেবার গুণগান করেছিলেন স্বর্গের দেবীদের সামনে। তখন সেই দেবীরা অর্থাৎ পার্বতী-লক্ষ্মী-সরস্বতী ভীষণই উদ্‌গ্রীব হয়ে একদিন ত্রিদেবকে আমার এই পর্ণকুটিরে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা আমার সামনে ছদ্মবেশে অবতীর্ণ হয়ে আমার স্নেহশীলা ও পতিব্রতা হওয়ার গুপ্ত রহস্যের পাঠ জানতে চাইলেন। আমি কিন্তু তাঁদের চিনতে ভুল করিনি এবং তাঁদের উদ্দেশ্যও বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু পতিব্রতার পাঠ তো সামান্য মুখের কথায় বোঝানো যায় না। দীর্ঘদিন তা অবলোকন এবং অনুধাবন করার ব্যাপার। তাই আমি তাদের তিনজনকেই



শিশুতে পরিণত করে আমার কাছেই রেখেছিলাম। তাঁরা স্বচক্ষেই যেন সবকিছু দেখতে পান। প্রায় এক যুগ তাঁরা আমার স্নেহ-মমতা এবং পতিব্রতার অজানিত অনেক কিছুই জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁরা দেবলোকে ফিরে না যাওয়ায় তাঁদের পত্নীদের চঞ্চলতাও ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাই একদিন স্বয়ং তিন দেবী অর্থাৎ মা পার্বতী-লক্ষ্মী-সরস্বতী আমার পর্ণকুটিরে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা বিস্মিত হলেন আমার তিন সন্তানকে দেখে। সহজেই বুঝতে পারলেন যে এঁরাই তাঁদের স্বামী। তাঁদের অনুরোধে আমি আবার ত্রিদেবকে পূর্ববৎ অবস্থায় এনে দিয়েছিলাম। আমার জীবনও ধন্য হয়েছিল। আমি তাঁদের কাছে কিছুই চাইনি। শুধু তাঁদের প্রণাম করতেই তাঁরা বলে ওঠেন, ''মা, তুমি কেন সন্তানদের প্রণাম করছ! সন্তানরা যতই বিশ্বকে ধন্য করুক না কেন তারা তো তোমার স্নেহ-মমতায় দীর্ঘ যুগ লালিত পালিত হয়েছে। তাই তুমি আমাদের প্রণাম করবে না। বরং আমরাই তোমাকে বর দিয়ে বলছি যে তোমার স্নেহ-মমতা আবার পাওয়ার জন্য আমরা তোমার সন্তান হয়েই জন্মাতে চাই।"

অনসুয়া মৃদু হেসে আবার বললেন, ''তখনও যেন ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না! স্বয়ং বিষ্ণু বললেন, 'মা, আমি তোমার কোলে দত্তাত্রেয় হয়ে একদিন জন্ম নেব।' মহেশ্বর বললেন, 'মা, আমি তোমার ক্রোড়ে দুর্বাসা হয়ে ফিরে আসব।' আর সবার শেষে স্বয়ং ব্রহ্মা বললেন, 'আমিও তোমার কাছে চন্দ্র হয়ে ফিরে আসতে চাই। তোমার স্তনসুধা আবার আমরা পান করে ধন্য হতে চাই।'''

সীতা অনসূয়াকে প্রণাম করে বললেন, ''মা, আপনার সান্নিধ্যে এসে আজ আমারও জীবন ধন্য হয়ে গেল! আজকে আপনার দেওয়া শিক্ষা আমার চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে। আমি কথা দিলাম, আপনার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করব। এবার আমাদের আশীর্বাদ করুন, যাতে আমরা সব বাধা-বিপত্তি জয় করতে পারি। আপনারা এবার আমাদের যাওয়ার অনুমতি দিন।''

অনসূয়া একদিন স্বামীর সেবা করার পর গৃহের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় একজন ব্যক্তি তাঁর দর্শনপ্রার্থী হয়ে তাঁর কুটিরের সামনে উপস্থিত হন। অনসূয়া বাইরে এসে দেখেন সেই ব্যক্তি আর কেউ নন, স্বয়ং ব্রহ্মা। অনসূয়াকে দেখে ব্রহ্মা বললেন, ''মা, আমি তোমার কাছে সমস্ত দেবতার পক্ষ থেকেই সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছি। তোমাদের মর্তে পৈঠান বলে একটি জনপদ রয়েছে। সেখানে কৌশিক নামে একজন ব্রাহ্মণ আছেন। ঘরে তার সতীসাধ্বী পত্নী থাকা সত্ত্বেও সে নিত্যদিন যৌনকর্মীর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য তার গৃহে যাতায়াত করত। কিন্তু যেদিন সেই ব্যক্তি কুষ্ঠ নামক ভয়ানক ব্যাধিতে আক্রান্ত হল সেদিন সেই যৌনকর্মীও তার সংসর্গ ত্যাগ করল। কৌশিক তার নিজ গৃহে ফিরে এলে তার সতী পত্নী তাকে ঘৃণাভরে দূরে সরিয়ে না দিয়ে বরং সেবা করতে লাগল। এমন সময় একদিন সেই ব্রাহ্মণ তার পত্নীকে অনুরোধ করল যে, সে যেন একবার অন্তত সেই পতিতালয়ে তাকে নিয়ে যায়। তা নাহলে সে মরেও শান্তি পাবে না। স্বামীর অনুরোধে সেই হতভাগিনী সতী স্ত্রী তাতে সম্মত হল। যেদিন ব্রাহ্মণ কৌশিক তার

পতিনিবেদিতপ্রাণ পত্নীর সঙ্গে ঘনান্ধকার অরণ্যের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল তখন ঋষি মাণ্ডব্য সেই অরণ্যে নিদ্রারত ছিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁকে ঘনান্ধকারে দেখতে না পেয়ে হোঁচট খেয়ে তাঁর শরীরের উপর পড়ে যায়। এতে ঋষি মাণ্ডব্য তার উদ্দেশে অভিশাপ দিয়ে বলেন যে, সূর্যোদয়ের আগেই কৌশিকের মৃত্যু হবে। এমন কথা শোনার পর থেকেই সতীসাধ্বী পুণ্যবতী পত্নী স্বামীর প্রতি তাঁর ভালবাসার সর্ব শক্তি দিয়ে সূর্যকে আটকে দিয়েছে। ফলে সূর্যও ভীষণ আতান্তরের মধ্যে রয়েছে। এই বিপর্যয়ের হাত থেকে একমাত্র তুমিই স্বর্গবাসীদের রক্ষা করতে পারো। মা, তুমিই একমাত্র সেই পতিব্রতা পত্নীকে বুঝিয়ে সূর্যদেবকে মুক্ত করতে পারো। আর তাই র তোমার সকাশে আগমন।''
অনসূয়া রাজি হয়ে গেলেন সেই নারীর গৃহে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে। তাঁকে বোঝালেন যে এভাবে সূর্যদেবকে আটকে রাখলে শুধু দেবতাদেরই ক্ষতি হবে না, সমগ্র বিশ্বের অস্তিত্বও লুপ্ত হয়ে যাবে। তবে তিনি কথা দিয়েছিলেন যে, তাঁর স্বামী যেন মৃত্যুর পর আবার পুনরুজ্জীবিত হয়, তার ব্যবস্থা করবেন। এবং অনসূয়া তা করেও ছিলেন। এতে ব্রহ্মা অনসূয়ার উপর ভীষণ প্রীত হয়ে বলেছিলেন, ''এবার সময় আগত হয়েছে। মা, আমি এবার তোমার গর্ভে চন্দ্র হয়ে জন্ম নেব।''
অনসূয়া বৈদিক যুগের এমন এক নারীচরিত্র যিনি সমস্ত নারীকুল ছাড়া সকল ঋষির কাছেও শ্রদ্ধেয়া ছিলেন। তাঁর নামের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে তাঁর চরিত্র। যার মনের মধ্যে কারও প্রতিই কোনও দ্বেষ-হিংসা অর্থাৎ অসূয়া নেই, তিনিই তো অনসূয়া। বৈদিক যুগে অনেক নারী ঋষিকা বিভিন্ন দেবতাকে উদ্দেশ করে অনেক শ্লোক বা ঋক রচনা করে আজও প্রণম্য হয়ে রয়েছেন। অনসূয়া হয়তো সেইভাবে কোনও ঋকের রচয়িতা নন, তবু তিনি যেমন পতিব্রতা, ধার্মিক নারী ছিলেন তেমনই বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে দেবতাদের অস্বীকার করেছিলেন। তুলেছিলেন আকাশে প্রবল ঝড় এবং মন্দাকিনীকে বাধ্য করেছিলেন স্বর্গ থেকে মর্তে এসে অনুর্বর ভূমিকে শস্যশ্যামলায় পরিণত করতে। তাই আজও অনসূয়া জনমানসে এতটা প্রণম্য এবং গ্রহণীয় হয়ে রয়েছেন। আজও তিনি পূজ্য! বিন্ধ্যাচলের অরণ্যে আজও তাঁর মন্দিরে তিনি ভক্তদের শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও পুজো পেয়ে আসছেন।

৫

ঋষি কক্ষিবান সূতিকাগার থেকে বেশ দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন বটে, কিন্তু নজর ছিল সেদিকেই। মনে মনে একটা উত্তেজনাও কাজ করছিল। এমন উত্তেজনা বোধ হয় সব পিতারই হয়ে থাকে। তার পর প্রথম সন্তান বলে কথা। তাঁর প্রবীণ পিতা ঋষি দীর্ঘতমসও শুভ খবরের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছেন। মনের উথালপাথাল ভাবটা কিছুতেই প্রশমিত হচ্ছে না! তিনি বুঝতে পারছেন, যতক্ষণ না শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়ে শুভ খবর পাবেন, মনটা শান্ত হবে না। সময় কি আজ কক্ষিবানের ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছে! কক্ষিবান একটি হরীতকী গাছের আবডাল থেকে আবার সূতিকাগারের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। না, কারও কোনও হেলদোল নেই, উল্লাস নেই! যেন সব্বাই নিশ্চিন্তে শয্যা নিয়েছে। তা হলে ধাত্রী মা করছেটা কী!
হঠাৎ কক্ষিবানের কানে একটি শিশুর মৃদু কান্নার আওয়াজ যেন ভেসে এল! তিনি সঙ্গে সঙ্গে পায়ের গোড়ালির উপর ভর দিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েও কিছু বুঝতে পারলেন না। তা হলে কি ভুল শুনেছেন! কক্ষিবান ইষ্টদেবতার নাম জপ করতে লাগলেন।
কক্ষিবান দেখলেন সূতিকাগার থেকে ধাত্রী মা বেরিয়ে এল। মাথা নিচু করে ধাত্রী মা বলল, ''আমার আর কোনও কাজ নেই ঠাকুর। আপনার ঘরে লক্ষ্মী এসেছে। মা-মেয়ে ভালই আছে।''
কক্ষিবান জানেন বৈদিক সমাজে কন্যা হলে সকলকে দেখানোর নিয়ম নেই। শুধু পুত্রসন্তান হলেই সূতিকাগারের বাইরে এনে তাকে তুলে দেখানোর নিয়ম রয়েছে। ব্যাপারটায় এত দেরি দেখে এমনই কিছু একটা কক্ষিবান আশঙ্কা করেছিলেন। তবে এতে তাঁর কোনও খেদ নেই। খেদ হলে হবে সন্তানের মাতার। তিনি হয়তো বংশধর দেবেন ভেবেছিলেন। অথচ তাঁর জানা উচিত, এ সবে কারও হাত নেই। কক্ষিবান এবার এই খবরটি পিতৃদেবকে দেওয়ার জন্য গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। কারণ তিনিও কম উদ্বেগের মধ্যে নেই!
পিতৃদেব দীর্ঘতমস তাঁর ঘরেই ছিলেন। পুত্রের মুখে কন্যাসন্তানের কথা শুনে মৃদু হেসে বললেন, ''মন্দ নয়। সংসারে প্রথমে কন্যাসন্তান আসা ভাল। তাছাড়া শুধু পুত্রসন্তানের আকাঙ্ক্ষা থাকলেই তো হবে না। একটি পরিবারে পুত্র-কন্যা উভয়েরই প্রয়োজন রয়েছে। তা না হলে জগৎসংসার তো অনুর্বর থাকবে। সেটা বিশ্বের ক্ষেত্রে কাম্য নয়।''
দীর্ঘতমস কন্যার জন্মসময় এবং লগ্ন জানতে চাইলে কক্ষিবান তা বললেন। পিতামহ সঙ্গে সঙ্গে পৌত্রীর শুভাশুভ ব্যাপারগুলো জানার জন্য আঁক কষতে বসলেন। তাঁর মুখে একটা অদ্ভুত ছায়া-রোদের খেলা চলছিল! দীর্ঘতমস কী দেখলেন বা বুঝলেন তা আপাতত তিনিই জানেন। তিনি পৌত্রীকে দেখার অপেক্ষায় রইলেন।
নির্দিষ্ট দিনে আচারানুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে পিতামহ দীর্ঘতমসের ক্রোড়ে সদ্যোজাত পৌত্রীকে দেওয়া হলে তিনি দীর্ঘক্ষণ শিশুর মুখ পর্যবেক্ষণ করলেন। গম্ভীর হয়ে গেল তাঁর মুখমণ্ডল।
তিনি পৌত্রীকে হস্তান্তর করে পুত্র কক্ষিবানকে বললেন, ''নিঃসন্দেহে এ কন্যা আমাদের বংশের মুখোজ্জ্বল করবে। আমি স্পষ্ট দেখেছি এর জিহ্বাগ্রে বাগ্‌দেবীর অবস্থান রয়েছে। কিন্তু বৎস, তুমি কি ভাল করে ওর সারা শরীর অবলোকন করেছ?"
"কেন এ কথা বলছেন? আপনার কি তেমন কিছু মনে হয়েছে?" কক্ষিবান জানতে চাইলেন।
কিছুক্ষণ পুত্রের মুখের দিকে অবলোকন করে দীর্ঘতমস বললেন, ''আমার কি

তা হলে কোথাও ভুল হল! আমি তা হলে কেন দেখলাম ওর সারা শরীরে পীত বর্ণের আধিক্য রয়েছে। আপাতত এর দোষ ধরা না পড়লেও বড় হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে এই পীত বর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করতেও পারে। তবে এই নিয়ে আপাতত দুশ্চিন্তার কোনও কারণ দেখছি না।''

দীর্ঘতমসের বংশে, পুত্র কক্ষিবানের গৃহে সেদিন যিনি জন্ম নেন, তিনি ছিলেন বৈদিক যুগে অনেক ঋষিকার মধ্যে একজন। নাম ঘোষা। তিনি বেদবিশেষজ্ঞও ছিলেন। কিন্তু তাঁর মনে কোনও শান্তি ছিল না। তিনি যত বড় হতে লাগলেন ততই তাঁর প্রপিতামহের কথা ফলতে লাগল। তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে গৃহবন্দি করে রাখলেন। এমনকি স্নানাহারের সময়টুকু ছাড়া তাঁকে পরিবারের কেউই গৃহের বাইরে আসতে দেখতেন না। ক্রমে ক্রমে নিজের উপর তাঁর ঘৃণা জন্মাতে শুরু করল। এক সময় নিজেই নিজেকে শেষ করে দেওয়ার কথাও ভাবলেন। ততদিনে তাঁর সারা অঙ্গে কুষ্ঠের বীভৎসতা নির্মম ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। যখন তাঁর সমবয়সিরা অন্যের ঘর করতে গিয়ে সন্তান নিয়ে দিব্যি ভাল আছেন, তখন তিনি দিন-রাত অন্ধকার ঘরে শুধু নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবে চলেছেন। তাঁর কাছে এই শরীরের এক বিন্দু মূল্য নেই! তিনি এই শরীর থাকা আর না-থাকার মধ্যে কোনও পার্থক্য খুঁজে পেলেন না।

ঘোষার এতটা বয়সেও তাঁর শরীরে তখনও নারীর সমস্ত চিহ্ন প্রকট হয়নি! তবে ঋতুচক্র শুরু হয়ে গেছে। ঠিক এমন সময় তাঁর পিতৃদেব কক্ষিবান মেয়ের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। এবং তাঁকে বেদ পঠনপাঠনে উৎসাহ দিলেন। সেইসঙ্গে বললেন, যাঁরা স্বর্গের ভেষজাচার্য, সেই অশ্বিনীদ্বয়কে স্মরণ করতে। তিনি এই জগতের সমস্ত ব্যাধির নিরাময় করতে পারেন। এছাড়া আর কোনও গত্যন্তর নেই।

পিতার মুখে এমন কথা শুনে ঘোষা সকাল-সন্ধে সব সময় অশ্বিনী ভ্রাতাদের নাম জপ করতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর মন কিছু একটা বলতে চাইছে। তিনি মনের সেই কথা ভূর্জপত্রে লিখতে লাগলেন।

একদিন পিতা কক্ষিবানকে তাঁর লেখাগুলো দেখালে তিনি ভীষণ উৎফুল্ল হয়ে বললেন, ''তোমার পিতামহ তোমার মুখ দেখেই বলেছিলেন যে তোমার জিহ্বাগ্রে বাগ্‌দেবী বিরাজ করছেন। আজ বুঝতে পারছি তিনি কতটা সঠিক বলেছিলেন। তুমি যে এতগুলো ঋক রচনা করেছ এতে আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত হয়েছি। আজ পিতৃদেব জীবিত থাকলে তিনিও ভীষণ প্রীত হতেন।''

দীর্ঘ কাল ব্রহ্মচারীর মতো জীবন অতিবাহিত করে অশ্বিনীদ্বয়ের আরাধনা করতে করতে একদিন ঘোষা তাঁদের সাক্ষাৎ পেলেন। নিদ্রার মধ্যে তাঁরা এসে কুষ্ঠের মোক্ষম ওষুধের নাম বলতেই ঘোষার নিদ্রা ভেঙে গেল। ঘোষা পিতাকে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বললে পিতা নিজেই তার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু কুষ্ঠ কমতে এতটা সময় নিচ্ছিল যে ঘোষা মনে মনে অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন। তাই একদিন ঘোষা ভীষণ কাতর হয়ে অশ্বিনী ভ্রাতাদের মিনতি করেবললেন, '''ইয়ং বামহেব শৃণুতং মে অশ্বিনা পুত্রায়েব পিতরা মহ্যং শিক্ষতম। অনাপিরজ্ঞা অসজাত্যামতিঃ পুরা তস্যা অভিশস্তেরব স্পৃতম।।' হে অশ্বিদ্বয়, আমি ঘোষা তোমাদের দু'জনকেই ডাকছি শোনো। যেভাবে পিতা পুত্রকে শিক্ষা দেয়, সেভাবে তোমরাও আমাকে শিক্ষা দিয়ো। আমার কোনও আপ্তবন্ধু নেই। আমি অজ্ঞান,আমার কোনও জ্ঞাতিকুটুম্ব নেই, বুদ্ধি নেই। আমার কোনও দুর্গতি হওয়ার আগেই তোমরা আমার দুর্গতি দূর করো,'' ঘোষা আরও স্তব করে বললেন, '''এতং বাং স্তোমমশ্বিনাবকর্মাতক্ষাম ভৃগবো ন রথম। ন্যমৃক্ষাম ঘোষণাং ন মর্যে নিত্যং ন সূনুং তনয়ং দধানাঃ।' হে অশ্বিদ্বয়,যেভাবে ভৃগু সন্তানগণ রথ প্রস্তুত করে,সেভাবে আমিও তোমাদের জন্য এই স্তব প্রস্তুত করলাম। যেমন জামাতাকে কন্যাদানের সময় তাকে বসন-ভূষণে অলঙ্কৃত করে সম্প্রদান করা হয়,সেভাবেই আমি এই স্তবকে অলঙ্কৃত করেছি। যেন চিরকাল আমাদের পুত্র-পৌত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে।

ঘোষার এমন কাতর ডাকে সাড়া দিয়ে অশ্বিনীদ্বয় তাঁকে আবার দেখা দিয়ে মধুবিদ্যা, বৈদিক শিক্ষা এবং যৌবন পুনরুদ্ধারের মন্ত্র শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে ভেষজ বাতলে দিলেন। ধীরে ধীরে তাঁর শরীরের ত্বকের কদর্যতা কমে সাধারণ ত্বকে পরিণত হয়ে গেল।

একদিন কক্ষিবান কন্যা ঘোষার বিবাহের প্রস্তুতি নিলেন। তখন কে বলবে, ঘোষা এতদিন দুরারোগ্য কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

ঘোষার বিবাহের পূর্বেই তিনি আবার অশ্বিদ্বয়কে উদ্দেশ করে বেশ কয়েকটি স্তুতি লিখে বললেন, '''আস্মৈ রীয়ন্তে নিবনেব সিন্ধোবোহস্মা অহ্নে ভবতি তৎপতিত্বনম।জীবং রুদন্তি বি ময়ন্তে অধ্বরে দীর্ঘামনু প্রসিতিম দীধিয়ু র্নঃ।' আমি ঘোষা, আজ আমি নারীর সমস্ত লক্ষ্মণ প্রাপ্ত হয়ে সৌভাগ্যবতী হয়েছি। বর এসে আমাকে বিবাহ করেছেন। তোমরা বৃষ্টি বর্ষণ করায় তার জন্য প্রচুর শস্যাদি উৎপাদন হয়েছে। নদীরা নিম্নাভিমুখী হয়ে সেই দিকেই প্রবাহিত হচ্ছে। আমার বর রোগশূন্য। সমস্ত কিছুর সুখভোগ করার মতো তাঁর সামর্থ্য রয়েছে।''

ঘোষা আবার পরের পংক্তিতে লিখলেন অদ্ভুত এক আকুতি। তিনি অশ্বিনী ভ্রাতাদের উদ্দেশে বললেন, '''প্রিয়োস্রিয়স্য বৃষভস্য রেতিনো গৃহং গমেমাশ্বিনা তদুশ্মসি। আ বামগন্ত সুমতির্বাজিনীবসু ন্যশ্বিনা হৃৎসু কামা অয়ংসত।' হে অশ্বিদ্বয়, আমি সেই সুখের ব্যাপারে অবগত নই। তোমরা সেই অনির্বচনীয় সুখের বিষয় আমাকে উত্তমরূপে বর্ণনা করো। অর্থাৎ যুবক স্বামী এবং যুবতী স্ত্রীর মধ্যে পরস্পর সহবাসে কী প্রকার সুখানুভূতি হয়,তা আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও। হে অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয়, স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত বলিষ্ঠ স্বামীর গৃহে গমন করাই ছিল আমার কামনা। তা পূর্ণ হয়েছে।''

ঘোষার এমন আকুতি শুধু নিজের সুখানুভূতির জন্যই নয়। এ প্রার্থনায় সমস্ত নারীকুলের আকুতিই মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি আবার আর এক সূক্তে বলছেন, '''অভুতং গোপা মিথুনা শুভস্পতি প্রিয়া অর্যমনো দুর্যাঁ অশীমহি। তা মন্দসানা মনুষো দুরোণ আ ধত্তং রয়িং সহবীরং বচস্যবে।' হে অন্নসম্পন্ন, ধনসম্পন্ন অশ্বিদ্বয়, তোমরা ভ্রাতৃদ্বয় আমার প্রতি সদয় হও। আমার মনের অপ্রাপ্তির অভিলাষ পূর্ণ হোক। তোমরা দু'জনেই কল্যাণকর বিধাতা আমার সহায় হও। যেন পতিগৃহে গিয়ে পতির প্রিয় পাত্রী হই।''

সাপের যেমন প্রতি বৎসরে একবার খোলস পালটে তার পুনর্জন্ম হয়, ঘোষার ক্ষেত্রে তা প্রতি বৎসর না হলেও মনে হল, তাঁরও বুঝি নবজন্ম হল। তিনি সূর্যকরোজ্জ্বল দিনের আলোক সারা শরীরে ধারণ করে শিহরিত হলেন। সূর্যদেবের কিরণ যে এত দীপ্তিময় তা এই প্রথম উপলব্ধি হল! তিনি পাগলের মতো হাসলেন, কাঁদলেন!

ঘোষা এতটাই অন্যমনস্ক ছিলেন যে বুঝতেই পারেননি, পিতা কক্ষিবান তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন। তিনি পিতার দিকে সরাসরি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, ''পিতৃদেব, কিছু বলবেন?"

"যেন এক যুগ পরে তোমাকে এভাবে হাসিখুশি দেখলাম মা। আজ নিশ্চয়ই তুমিও খুশি? তা হলে মা, এবার তোমার বিবাহের আয়োজন করি?"

"এত শীঘ্র কেন পিতা? আমার তো মনে হচ্ছে আমি বুঝি সদ্য সদ্য জন্মেছি। এতদিন তো বেঁচে থেকেও মৃতবৎ-ই ছিলাম। তাই জীবনটাকে একটু উপভোগ করতে চাইছিলাম,'' ঘোষা তাঁর উত্তরের জন্য পিতার মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু তিনি কক্ষিবানের নির্বিকার মুখের পাঠ পড়তে পারলেন না!

"তা কীভাবে উপভোগ করতে চাইছ মা, বলো? সে তো অতীত হয়ে গেছে। তোমার মেয়েবেলার সব কিছু নিজের নিজের স্থানেই অবস্থান করছে। কিন্তু তার রূপ-রস-গন্ধ সেই আগের মতো আর নেই! তুমি আগে যাদের সঙ্গে প্রভাতে বা বিকালে ক্রীড়া করতে সেই স্থানগুলো যথাস্থানেই রয়েছে বটে। কিন্তু সেই ক্রীড়ার সঙ্গীরা আর নেই। তোমার বান্ধবীরা সকলেই আজ অন্যের ঘর আলো করছে। তারা আজ পরস্ত্রী হয়ে পুত্র-কন্যার জননী হয়ে গেছে। শুধু তুমিই বড় একা রয়ে গিয়েছ।''

ঘোষা কিয়ৎক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে থাকলেন। হয়তো মনে মনে পিতার কথাগুলোর যাথার্থ্য খোঁজার চেষ্টা করছিলেন। এক সময় ভুস করে শুশুকের মতো চিন্তার সাগর থেকে ভেসে উঠে বললেন, ''ঠিক আছে পিতা। আপনারা যা ভাল বোঝেন তা-ই করুন। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে।''

কক্ষিবান শঙ্কিত হয়ে কন্যার দিকে তাকালেন। তাঁর মেয়েকে তিনি ভাল করেই চেনেন। যে-কোনও মুহূর্তে সে তার মত থেকে সরে আসতেই পারে। অথচ মুখে কিছুই বললেন না। ঘোষা আবার বললেন, ''এমন কি কোনও মুনি-ঋষি আছেন যিনি সব জেনেও আমাকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করবেন? আমি যে কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলাম তা তো সকলেই জ্ঞাত ছিলেন। পরে যদি তিনি আমাকে ত্যাগ করেন পিতা! তখন আমার সামনে মৃত্যু ব্যতীত কোনও পথ খোলা থাকবে কি?"

পিতা কক্ষিবান কন্যার মাথায় স্নেহের হাত রেখে বললেন, ''তুমি আমার উপরে নির্দ্বিধায় ভরসা রাখতে পারো। আমি তোমার জন্য যাকে উপযুক্ত মনে করব তাকে সবটাই বলব। সে যদি উদারমনা, বিবেকবান হয় তা হলে নিশ্চয়ই সে ভালই হবে। তুমি ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দাও মা।''

বেশ ধুমধাম করে একদিন উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গেই কন্যা ঘোষার বিবাহ দিলেন কক্ষিবান ঋষি। তিনি সব সময় চেষ্টা করেছিলেন যেন কন্যার মনে কোনও খেদ না থাকে। ওঁর বিবাহিত জীবন বেশ সুখের ছিল। সংসার আলো করে একটি পুত্রসন্তানও হয়েছিল। নাম ছিল সুহস্ত। তিনিও কবি ছিলেন। তাঁরও সূক্তি রয়েছে ঋগ্বেদে।

ঘোষা ইদানীং একা থাকলেই এ সব স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসেন আর তাঁর স্নেহশীল পিতার কথাগুলো মনে মনে রোমন্থন করেন। মনটায় তখন শ্রাবণের অজস্র ধারা যেন ঝরে পড়ে! আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো ভেসে যায় সরোবরের নিঃস্রোতা জলে।

৬

শচী কি আর জানতেন যে দেবরাজ ইন্দ্র এতটা লম্পট! সখীদের মুখে আগে শুনেছিলেন বটে, কিন্তু খুব একটা গা করেননি। ভেবেছিলেন পুরুষদের এমন দোষ একটুআধটু থাকেই। কিন্তু সেটা যে ভীষণ দূষণীয়, তেমনটাও নয়। সোনার জিনিসের আবার বাঁকা-সোজায় কী এসে যায়। শচী নিজে খুব ভালই জানেন যে তাঁর যৌনাকাঙ্ক্ষা অনেক নারীর চেয়েই একটু বেশি। অল্পে সন্তুষ্ট হওয়া ওঁর ধাতে নেই। তিনি যা পান করেন তার তলানিটুকুও চেটেপুটে না খেলে মন ভরে না! কিন্তু লম্পট ইন্দ্রটা যে এটা জানে, তা আবার শচীর জানা নেই। আর গলদটা এখানেই।

তাই ইন্দ্র যেদিন পিতা পুলোমার অনুপস্থিতিতে এক সন্ধেয় তাঁদের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিলেন, সেদিন শচী তাঁকে চিনতে পারেননি। অবশ্য না-পারারই কথা। এর আগে কোনওদিন তাঁদের দেখাই হয়নি। কাজেই নিজের পরিচয় দেওয়ার পরে শচী দেখলেন ইনি একে দেবরাজ, তার পর আবার অতিথি। তাঁকে তো আর চৌকাঠের ওপার থেকেই বিতাড়িত করে দিতে পারেন না। তাই সেদিন আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি রাখেননি শচীদেবী। এতে যে পিতার সম্মান জড়িয়ে আছে, তা বলাই বাহুল্য। তবে হ্যাঁ, এ কথা স্বীকার করতে একটুও দ্বিধা নেই যে এমন সুপুরুষ তাঁদের জাতিতে নেই বললে নিশ্চয়ই সত্যের অপলাপ করা হবে না। যেমন শরীরের বলিষ্ঠ গঠন, তেমনই গাত্রের রঙ। যেন এই সন্ধ্যাতেও শরীর থেকে একটা জ্যোতি বেরিয়ে আসছে। তীক্ষ্ণ নাসা, হরিণীর মায়া মাখা দুটো

ডাগর চোখ চুম্বকের মতো সকলকেই আকর্ষণ করে। শচীর মনে হয় একে অস্বীকার করার মতো কোনও নারী বোধ হয় এই জগৎ সংসারে নেই! তাই তো তিনি একটু বেশি ঘনিষ্ঠ হতে গিয়েই নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন। এখন আর নিজের মনকে দোষ দিয়ে কী হবে! একে কথায় আছে ঘি-আগুন একসঙ্গে রাখতে নেই। একবার তাপ লাগলে জ্বলতে কতক্ষণ! সেটাই ঘটে গেল! একেবারে লেলিহান শিখার মতো দাউদাউ করে জ্বলতে জ্বলতে সব কিছু ছারখার করে দিল। ভরা যৌবন আর অক্ষত রইল না। তাঁর সতীত্ব লুট করে নিয়ে গেল ওই লম্পট দেবরাজ ইন্দ্র।

একদিন ইন্দ্রের কুনজর পড়েছিল মহর্ষি গৌতমের সতী স্ত্রী অহল্যার উপর। তখন মহর্ষি গৌতম রাজা জনমেজয় সর্পযাগের মূল ঋত্বিকের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন ইন্দ্র। তিনি মহর্ষি গৌতমের ছদ্মবেশে গৃহে ফিরে এসে বলেন, ‘‘এই মুহূর্তে তোমার সঙ্গে মিলিত হতে আমি ভীষণভাবেই উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছি। তুমি কি আমাকে গ্রহণ করবে প্রিয়ে?” এভাবে স্বামী কাতর হয়ে মিলনের ইচ্ছে প্রকাশ করলে অহল্যা আর স্বামীর ইচ্ছেকে অগ্রাহ্য করেননি। কিন্তু পরে দেবরাজ ইন্দ্রের চাতুরি বুঝতে পেরেছিলেন।

সেখান থেকে ইন্দ্র গিয়েছিলেন রাজা জনমেজয়ের গৃহে, রানি বপুষ্টমার কাছে। সেখানেও তিনি রানিকে ধর্ষণ করতে কসুর করেননি! এ সময় রাজা জন্মেজয় অশ্বমেধ যাগে ব্যাপৃত ছিলেন।

এ ছাড়াও দেবরাজ ইন্দ্র যে কত নারীর সতীত্ব হরণ করেছিলেন তার হিসেবই বা কে রেখেছে। তবে এই ঘটনাগুলো শচীর কানে আসতে দেরি হয়নি। তিনি ইন্দ্রকে তাঁর পিতা ভয়ঙ্কর পুলোমার কথা বলেছিলেন। ইন্দ্র পুলোমার অভিশাপের ফলাফলের ব্যাপারে সম্যকভাবেই জ্ঞাত ছিলেন। তাঁর কন্যা শচীর সঙ্গে ইন্দ্রের সম্পর্কের কথা একবার পুলোমার কানে গেলে তিনি যে শুধু ক্রুদ্ধই হবেন তা-ই নয়, ইন্দ্রকে অভিশাপে ভস্মও করে দিতে পারেন। কাজেই এ সব ঘটার আগেই ইন্দ্র কৌশলে পুলোমাকে হত্যা করেছিলেন। এভাবেই পথের কাঁটা সরিয়ে তিনি শচীকে বিবাহ করে ফেলেন। এই আখ্যানে ইন্দ্রের চরিত্র স্খলনের বর্ণনা করা মূল উদ্দেশ্য নয়। বরং শচীর চোখে ইন্দ্রের মুখোশটা খুলে দেওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য। যাতে আমাদের সকলেরই শচীকে বুঝতে সুবিধা হয়। এ প্রসঙ্গে আসার আগে ইন্দ্রের ব্যাপারে আর ক'টি কথা বলা প্রয়োজন।

অহল্যাকে ধর্ষণ করার পরে ব্যাপারটা যখন মহর্ষি গৌতমের কানে যায় তখন তিনি ইন্দ্রের উপরে এতটাই ক্রুদ্ধ হলেন যে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন এই বলে যে, তোমার সারা শরীরে সহস্র যোনিচিহ্ন প্রকট হোক। যেন তুমি দেবরাজ হয়েও সমাজে সকলের কাছে ঘৃণিত হও। এর পর ইন্দ্র এতটাই ভীত হয়েছিলেন যে তিনি মহর্ষি গৌতমের কাছে বারবার ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন, তাঁর এমন নির্মম অভিশাপ তিনি যেন প্রত্যাখ্যান করে নেন। কিন্তু তা যে কখনও সম্ভব নয়, এটা ইন্দ্রও জানতেন। একবার বাণ যেমন কার্মুকের জ্যা মুক্ত হয়ে বাইরে চলে গেলে তা কিছুতেই পুনরায় কার্মুকে সংযোজন করা যায় না, তেমনই অভিশাপও দেওয়ার পরে তাকে ফেরানো সম্ভব নয়। তবে তাকে লঘু করে দেওয়া যেতেই পারে। সে ক্ষমতা অভিশাপদাতার রয়েছে। এ সব ইন্দ্রের জানা। তাই তিনি গৌতমের সামনে নিজের ভুল স্বীকার করে নতজানু হয়ে এমন অনুরোধ করতে থাকলেন যে তখন তাঁকে আর দেবতাদের রাজা বলে মনে হচ্ছিল না! মনে হচ্ছিল সে একজন পাপিষ্ঠ শয়তান! গৌতম ঋষি খুব নরম মনের মানুষ ছিলেন। তাই তিনি তাঁর অভিশাপে দেওয়া সহস্র যোনিচিহ্নের পরিবর্তে তা সহস্র চোখে রূপান্তরিত করে দেন। ইন্দ্র অনেকটা স্বস্তি পান। অনেকটাই লজ্জার হাত থেকে বেঁচে যান।

ইন্দ্রের রাজধানীর নাম অমরাবতী এবং তা অতি যত্ন সহকারে তৈরি করেছিলেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা। সেই সঙ্গে তাঁর উদ্যানের নামকরণ করা হয়েছিল নন্দন। এত সব যার দখলে, তাঁর মনেও সব সময় একটা ভয় কাজ করত। আর তা ছিল সব হারানোর ভয়। যে কঠোর তপস্যার মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তি ইন্দ্রত্ব লাভ করেছিলেন তাঁর তো নিজের এত সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয় মনে বাসা বাঁধবেই। আর তাই যখনই কোনও বৈদিক ব্রাহ্মণ ভীষণ কঠোর তপস্যার মধ্য দিয়ে সিদ্ধি লাভ করার চেষ্টা করেছেন, তখনই ইন্দ্র সিংহাসনচ্যুত হওয়ার ভয়ে বিভিন্ন ছল চাতুরীতে সেই তপস্যা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। এমন সব অকাজে তাঁকে সাহায্য করতে বাধ্য হতেন রাজসভার বিভিন্ন উর্বশী। রাজাদেশ পালন করাই ছিল তাদের কাজ। মেনকা একবার ঋষি বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভাঙাতে গিয়ে একে অপরের প্রতি এতটাই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়েন। তাঁর কন্যাকে আমরা শকুন্তলা বলেই চিনি।

এমনই চরিত্রবান ইন্দ্রকে শচী বিবাহ করেছিলেন। বিবাহের পরে তাঁর নাম হয়েছিল ইন্দ্রাণী। এই ইন্দ্রাণীর অঙ্গে যৌন আবেদন এতটাই স্পষ্ট ছিল যে ইন্দ্রের পরিবর্তে দেবরাজ নহুষও একবার তাঁকে প্রেম নিবেদন করেছিলেন। তখন সে শচী থেকে ইন্দ্রাণীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।এ সময় ইন্দ্র আর দেবরাজ ছিলেন না। তিনি তখন বিতাড়িত এবং কোথায় লুকিয়ে রয়েছেন, তা-ও কেউ জানে না। ইন্দ্রাণী তখন দেবগুরু বৃহস্পতির শরণাপন্ন হন। উনি ইন্দ্রাণীকে নিয়ে যান বিষ্ণুর কাছে। তিনি ইন্দ্রাণীকে উপদেশ দেন যেন ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তা হলেই ইন্দ্রের পাপক্ষালন হবে। সেই মতো ইন্দ্র সেই যাগ করেও নহুষের পরাক্রমের কাছে নিজের বিক্রম দেখাতে সাহস পেলেন না। পরে অবশ্য ঋষি অগস্ত্যের অভিশাপে রাজা নহুষ সাপ হয়ে যান এবং ইন্দ্রও পুনরায় তাঁর রাজ্য ফিরে পান। এই কাহিনিটি মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে থাকলেও এর সত্যাসত্য এখানে বিচার্য বিষয় নয়। এখানে দেখা গেল যে ইন্দ্রাণী কেবল মাত্র একজন রাজবধূই ছিলেন না, স্বামীর

মুক্তি এবং কল্যাণের জন্য তিনিও বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে প্রাণান্তকর চেষ্টা করে গেছেন। তিনি যদি একেবারেই একজন পর্দানশিন রানি হতেন তা হলে তাঁর পক্ষে এত কাজ করা দুষ্কর ছিল।
এখন আবার দেবরাজ ইন্দ্র এবং ইন্দ্রাণীই তাঁর রানি। তবু ইন্দ্রাণীর মনে সুখ নেই! তিনি দেবরাজের স্ত্রী অর্থাৎ দেবমাতা হয়েও অন্যান্য দেবীর মতো কোনও কিছুতেই অগ্রাধিকার পেতেন না। তাই দেবরাজ্যের সম্রাজ্ঞী হয়েও তিনি সামান্যতম দেবীর মর্যাদা লাভ করেননি। তাই তিনি পূজিতা নন। বরং তিনি অনেকের মতোই ঋষিকা রূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন। মাঝে মাঝেই তাঁর মনে এসেছে এক কুচিন্তা। এমন চিন্তাকে তিনি অস্বীকার করতেও পারছেন না। আবার মেনেও নিতে পারছেন না। সব সময় বুকের মধ্যে এক অশুভ চিন্তা মনটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। যে রাজা বিয়ের আগে বহু নারীসঙ্গ ভোগ করেছেন, তাঁর কি সত্যিই কোনও উপপত্নী নেই! হয়তো অন্য কোথাও আছেন। যাঁকে হয়তো ঘরে নিয়ে আসতে লজ্জা পাচ্ছেন। হয়তো জানেন যে সপত্নী ঘরে থাকলে সব সময় অশান্তি লেগেই থাকবে। ইন্দ্রাণী একটা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলেন। আর তা হল তিনি যখন সপত্নীর ব্যাপারে রাজাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেই পারছেন না, তখন বরং তা লিখে জানানোই ভাল। রাজা তা কোনওদিন পড়ুন বা না-ই পড়ুন, লেখা থাকলে তিনি মনে অনেকটা স্বস্তি পাবেন।
খাগের কলম আর ভূর্জপত্র নিয়ে বসলেন বটে, কিন্তু ইন্দ্রাণীর কোনও ছন্দই মাথায় এল না। বরং তার জায়গায় আবার সেই পুরনো কথাই ঘুরে ফিরে মনটাকে ভারাক্রান্ত করে দিল। তিনি আবার প্রয়াস করেন, যদি অন্তত একটা সূক্ত লেখা যায়। ইন্দ্রাণীর মাথায় হঠাৎ অনুষ্টুপ ছন্দের এক অদ্ভুত মূর্ছনা খেলে গেল! তিনি লিখে ফেললেন, 'ইমাং খনাম্যোষধিং বীরুধং বলবত্তমাম। যয়া সপত্নীং বাধতে যয়া সংবিন্দতে পতিম।।'
সপত্নীর ব্যাপারটা ইন্দ্রাণীকে প্রথম থেকেই তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ঠিক এঁটুলি পোকার মতো যেন শরীরের সঙ্গে এঁটে রয়েছে। তাই তাঁর মসিনিঃসৃত বাক্যবন্ধেও সেই ভীতিও উঠে এসেছে। তিনি সোমকে বিপুল শক্তিধর আহ্বান করে বলছেন, আমি জানি তোমাকে দিয়েই সপত্নীকে ক্লেশ দেওয়া যায়। এবং তোমা দ্বারাই স্বামীর প্রণয় লাভ করা যায়।
'উত্তানপর্ণে সুভগে দেবজুতে সহস্বতি। সপত্নীং মে পরা ধম পতিং মে কেবলং কুরু।।'
এখানেও তিনি সেই সোমকেই উদ্দেশ করে তাঁর ভীতির কথা উচ্চারণ করে বলছেন, 'হে ঔষধি, তুমি আমার স্বামীর প্রিয় হওয়ার উপায় স্বরূপ। তুমি তোমার তীব্র তেজে আমার সপত্নীকে দূর করে দাও। যাতে আমার স্বামী আমারই বশীভূত থাকে।'
'উত্তরাহমুত্তর উত্তরেদুত্তরাভ্যঃ। অথা সপত্নী যা মমাধরা সাধরাভ্যঃ।।'
আবার সেই একই কাতর আহ্বান, 'হে ঔষধি, আমি যেন তোমার মতো প্রধান হই,প্রধানের উপর যেন প্রধান হই। আমার সপত্নী যেন নীচের থেকেও নীচে থাকে।'
'নহ্যস্যা নাম গৃভণামি নো অস্মিনব্রতে জনে। পরামেব পরাবতং সপত্নীং গময়ামসি।।'
'সেই সপত্নীর নাম আমি মুখে আনতে চাই না। সপত্নী সকলেরই অপ্রিয়। দূর থেকে আরও দূরে ওকে তুমি পাঠিয়ে দাও।'
'অহমস্মি সহমানাথ ত্বমসি সাসহিঃ। উভে সহস্বতী ভূত্বী সপত্নীং মে সহাবহৈ।।'
'হে ঔষধি, তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। আমারও আছে। এসো আমরা দু'জনে যুক্ত হয়ে আরও ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে সপত্নীকে হীনবল করি।'
'উপ তেহধাং সহমানামভি ত্বাধাং সহীয়সা। মামনু প্র তে মনো বৎসং গৌরিব ধাবতু পথা বারিব ধাবতু।।'
'হে আমার পতি, এই ঔষধি আমি তোমার শিরোভাগে রাখলাম। এ যেন সেই শক্তিযুক্ত উপাধান যা তোমার মস্তকের নীচে দিয়ে দিলাম। যেমন জল নিম্নপথে ধাবিত হয়, তেমনি তোমার মন যেন আমার প্রতি ধাবিত হয়।'
এটি যে সপত্নীর উপরে প্রভুত্ব করার মন্ত্র, তা বলাই বাহুল্য। স্বামী ইন্দ্রের লাম্পট্যের কথা সব জানা আছে বলেই ইন্দ্রাণীর মনে এত ভয়! বিয়ের আগেই তিনি নিজেই এর উদাহরণ। এই একটি স্তুতির জন্য ইন্দ্রাণী ঋগ্বেদে ঋষিকা হিসেবে স্থান করে নিয়েছেন। তবে একটা ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ইন্দ্রাণী ভীষণভাবে যৌন আবেদনকারী হয়েও কখনও ভুল করেও অন্য কোনও পুরুষকে নিজের রূপে ভোলানোর চেষ্টা করেননি। এক পতিতেই সন্তুষ্ট থেকেছেন।

৭

তালগাছের ন্যায় দীর্ঘ, মেদহীন জীর্ণ শরীর, পিঙ্গলবর্ণ, এবং সারা শরীরে রোমহীন ও ইন্দ্রলুপ্ত মাথাবিশিষ্ট— যাঁকে আড়ালে আবডালে সকলে মৎকুণ বা মাকুন্দ বলেই ডাকে— এমন একজন বেদজ্ঞানী ঋষির সঙ্গে কর্দম-দেবাহুতি তাঁদের দ্বিতীয়া কন্যা অনসূয়ার বিবাহ ঠিক করেছেন। অনসূয়া নিজে শুধু একজন বেদজ্ঞই নন, তিনি রীতিমতো একজন সুন্দরী যুবতীও বটে। বৈদিক যুগে স্বামী নির্বাচন করার পূর্ণ অধিকার ছিল বিবাহযোগ্যা কন্যাদের উপরে। তবু কেন এমনটা হল! কর্দমের সব কন্যার একে একে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন অনসূয়াকে সৎ পাত্রের হাতে তুলে দিতে পারলেই তিনি বড় নিশ্চিন্ত হয়ে সন্ন্যাস নিয়ে অরণ্যের আরও গভীরে নির্জনে গিয়ে ধ্যান করতে পারেন। তাঁর এমন অভিলাষের কথা



তিনি আগেই স্ত্রী দেবাহুতি এবং পুত্র কপিলের কাছে ব্যক্ত করেছেন। তাঁরাও এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেননি। অনসূয়া খুব ভালই জানেন যে বৈদিক যুগে কন্যা নিজের ইচ্ছে মতো পাত্র পছন্দ করতে পারেন। অথচ তিনি এমন চেহারার এক পাত্রের ব্যাপারে পিতাকে কোনও কথাই বললেন না কেন, এটা মা দেবাহুতির কাছেও একটা বিস্ময়! অথচ তিনিও মেয়েকে জিজ্ঞাসা করতে পারছেন না! তাঁর মনেও একটা ধন্দ! কিন্তু পিতা-মাতার সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে শেষে তাঁর বিবাহিত জীবনটা যেন বিপর্যস্ত না হয়, এটাই মায়ের চিন্তা। অনসূয়া যে ব্যাপারটা নিয়ে একেবারেই ভাবেননি, তা-ও নয়। যাঁকে সকলেই এতদিন আড়ালে মাকুন্দ বলে ব্যঙ্গ করত আজ কিনা সেই হবে তাঁর স্বামী! চারদিকে তো টি টি পড়ে যাবে। কিন্তু তিনি যদি ঋষি অত্রিকে স্বামী হিসেবে স্বীকার করতে রাজি না হন তা হলে যে শুধু একা অত্রির মানসম্মান ভূলুণ্ঠিত হবে তা-ই নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে পিতা কর্দমের সম্মানও! তাঁকে অস্বীকার করার ক্ষমতা বা ইচ্ছে কোনওটাই অনসূয়ার নেই। কাজেই পিতার সিদ্ধান্তই তাঁর সিদ্ধান্ত। হাজার হোক ঋষি অত্রি খুব অল্প বয়সেই বেদজ্ঞ ঋষি হয়েছেন, এটা অস্বীকার করা যাবে না। মানুষের রূপ-যৌবন বড়ই ক্ষণস্থায়ী জিনিস! সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা হারিয়ে যায়। কিন্তু অর্জিত বিদ্যা আজীবন থেকে যায়।
এভাবে একে একে ন'টি কন্যা একদিন শ্বশুরালয়ে চলে গেলে ঋষি কর্দমও স্ত্রী দেবাহুতি এবং পুত্র কপিলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গভীর তপস্যার উদ্দেশে এক অজানিতের পথে যাত্রা করলেন। কুটিরটা এবার আরও একবার হাহাকার করে উঠল। এভাবেই সদা কোলাহলময় কুটিরটিও একদিন বড় একা হয়ে গেল।
বিদুষী অনসূয়া স্বামীর হাত ধরে চলে গেলেন সরস্বতী নদী সংলগ্ন অত্রির কুটিরে। অথচ তাঁর মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই যে তিনি স্বামীর ঘর করতে কতটা সুখী, নাকি মনের কোণে আজও রয়ে গিয়েছে এক অজানিত অনিচ্ছার ধূম্রজাল!
স্বামীর চেহারা যতই অপছন্দ হোক বা স্ত্রী যদি ধর্ষিতাও হয় তবু বৈদিক যুগে স্ত্রীকে ত্যাগ করা যায় না। তবে হ্যাঁ, ধর্ষিতা হওয়ার পরে যদি সেই মহিলা গর্ভবতী হয়ে যায় তা হলে স্বামী চাইলে তার সঙ্গে সংসার না-ও করতে পারে। কিন্তু অনসূয়ার ক্ষেত্রে এ সবের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তিনি একজন সতী নারী। তাঁর মতো পতিব্রতা স্ত্রী বৈদিক যুগে মেলা ভার!
বছর দশেকের মধ্যেই অনসূয়া পাঁচ পুত্র এবং একটি কন্যা প্রসব করলেন। দু'জনের সংসার কোলাহলে মেতে উঠল। কিন্তু বেশিদিন এই কুটিরে বাস করা সম্ভব হল না। ঋষি অত্রি বুঝতে পারলেন যে প্রতি দিনই আর্যাবর্তের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সরস্বতীর উপকূলে বেদজ্ঞ গুরুদের গৃহে ক্রমশই শিষ্য সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এতে তাঁর সারস্বত সাধনায় বিঘ্ন ঘটছে। তাই একদিন অত্রি তাঁর পরিবার এবং সন্তানদের নিয়ে

সরস্বতী নদীর উপকূল ছেড়ে নেমে এলেন আরও নীচে বিন্ধ্যাচলের পাদদেশে, নর্মদা নদীর উপকূলে। প্রথম দর্শনেই স্থানটিকে অত্রি এবং অনসূয়ার বেশ ভাল লেগে গেল। সব সময় বিভিন্ন নাম-না-জানা পাখপাখালির কলকাকলিতে মনটা প্রফুল্ল হয়ে থাকে। এ ছাড়াও একটা অদ্ভুত শান্তি বিরাজ করছে চারদিকে। বিক্ষিপ্তভাবে আরও বেশ কিছু কুটির থাকলেও সকলেই নিজের নিজের সাধন ভজন নিয়েই ব্যস্ত থাকতে অভ্যস্ত। কাজেই এমন মনোরম স্থান সকলেরই মন কেড়ে নিল।

কন্যা অপালা যে দিন দিন দেখতে একেবারে পিতা অত্রির মতো হয়ে চলেছে, তা আর কারও নজরে না পড়লেও মা অনসূয়ার চোখ এড়ায়নি। হাজার হোক অপালা তো কন্যা। তাই ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবে অনসূয়ার চিন্তাও ক্রমশই বাড়তে থাকে। অথচ মেয়ে যে ভীষণ বুদ্ধিমান, তা অল্প বয়সেই অত্রি-অনসূয়ার বুঝতে অসুবিধা হয়নি। এর মধ্যেই সে বেদশাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে।

গুরুগৃহে সমস্ত পাঠ শেষ হলে এক সময় শিষ্যেরা নিজের নিজের গৃহে ফিরে যায়। তেমনই একদিন, শিষ্যদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে গুরু অত্রির কাছে এসে কৃষশ্ব নামে এক শিষ্য বললেন, ''গুরুদেব, আপনার উপদেশ মাথায় করে আজ আমরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করছি। অথচ আপনার শিক্ষার বিনিময়ে আমরা কেউ আপনাকে বিশেষ কিছুই দিতে পারিনি। তবু আমি আপনার এবং গুরুমার কাছে একটি অতি মূল্যবান জিনিস প্রার্থনা করছি।''

ঋষি অত্রি কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললেন, ''বল বৎস কৃষশ্ব। তুমি যা প্রার্থনা করবে তা যদি আমার কাছে থাকে তা হলে আমি অবশ্যই চেষ্টা করব। তবে দুর্মূল্য কিছু চেয়ে আমাকে বিড়ম্বনায় ফেলো না।''

শিষ্য কৃষশ্ব গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেন, ''গুরুদেব, আমি যা চাইব তা আপনাদের কাছেই আছে। তবে তা অবশ্যই অতি মূল্যবান। যে মণি-মাণিক্যের চেয়েও মূল্যবান।''

গুরুদেব অত্রি মৃদু হেসে বললেন, ''তথাস্তু! এবার বলো তো এমন কী জিনিস যা তুমি চাইছ।''

এবার শিষ্য কৃষশ্ব লজ্জায় রক্তাভ বর্ণের হয়ে গেলেন! নিজমুখে তা গুরুদেবকে বলবেনই বা কীভাবে! কাঁপতে কাঁপতে শিষ্য কৃষশ্ব বললেন, ''গুরুদেব, আমি আপনার অমূল্য রত্ন অপালার পাণিপ্রার্থী।''

গুরুদেব শিষ্যের প্রার্থনা শুনে সেই যে চোখ বন্ধ করেছিলেন এবার তা ধীরে ধীরে উন্মীলিত হল। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, ''এটা কি শুধু তোমারই বাসনা, নাকি দ্বিতীয় পক্ষেরও সম্মতি রয়েছে?"

"কোনওদিন বাক্যালাপ হয়নি গুরুদেব। তবে বারকয়েক ওঁর চোখের ভাষা আমি পড়তে পেরেছি। তার ভিত্তিতেই আমার এই বিনীত আবেদন,'' শিষ্য বলেন।

"হুম! তা তুমি বোধ হয় একবার বলেছিলে যে তোমাদের শস্যখেত রয়েছে। গোশালা রয়েছে। এছাড়াও তোমাদের একটি পৈতৃক টোল রয়েছে। তুমি কি তাতেই মনোনিবেশ করবে?''

"হ্যাঁ গুরুদেব, আমি নিজেকে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত করতে চাই। অধ্যয়নের মতো শান্তি আমি কোনও কাজেই পাই না। আমার এতদিনের অধীত বিদ্যা সকল ছাত্রের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চাই,'' কৃষশ্ব বলেন।

"দেখো বৎস কৃষশ্ব, এত বড় সিদ্ধান্ত আমি একা নিতে পারব না বা নিতে চাই-ও না। এখানে অনেকের মতামত গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। তোমাকে বরং আগামী কল্য যা বলার বলব,'' গুরুদেব অত্রি এ কথা বলে গাত্রোত্থান করলেন।

এভাবেই একদিন কন্যা অপালাকে ঋষি অত্রি-অনসূয়া প্রিয় শিষ্য কৃষশ্বের হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলেন। প্রাণের টুকরো অপালা অনেককে কাঁদিয়ে পিতৃগৃহ ছেড়ে শ্বশুরালয়ে চলে গেলেন।

এখান থেকেই শুরু হল অপালার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। কিন্তু অপালা বেশি দিন সুখে সংসার করতে পারলেন না। নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে। এটাই হয়তো তাঁর ভাগ্যলিখন ছিল। একদিন সারা শরীরে দুরারোগ্য শ্বেত কুষ্ঠ ব্যাধি নিয়ে শ্বশুরালয় ছেড়ে আসতে হল পিত্রালয়ে।

দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপে ধীরে ধীরে একদিন তাঁর কুঞ্চিত কেশদাম হারিয়ে গিয়ে মাথায় যৎসামান্য বিরল কেশ অবশিষ্ট রইল। শরীরের মসৃণ ত্বক হারিয়ে গিয়ে তা যেন ভেকের ত্বক ধারণ করল। যুবতী অপালা ক্রমশই তাঁর যৌবন হারিয়ে ফেলল। যে চোখের মায়াবী চাহনিতে একদিন কৃষশ্ব তাঁর প্রেম নিবেদন করেছিলেন সেই চাহনির আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। অপালার আর সরাসরি কোনও পুরুষ-নারীর দিকেই তাকাতে ইচ্ছে করে না। ধীরে ধীরে সারা জগতের উপরই এক তীব্র বিতৃষ্ণা জন্মাতে শুরু করল। মাঝে মাঝে মনে হতে লাগল এভাবে অন্যের কৃপার পাত্র হয়ে এ ব্যর্থ জীবন রেখে কী লাভ। কিন্তু আত্মহত্যা যেহেতু মহা পাপ তাই সে অমন পথের কথাও ভাবতে চায় না। অথচ তাঁর শরীরটাই ধীরে ধীরে তাঁর কাছে বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইদানীং অপালা মনের গভীর থেকে ডুবুরির মতো সংগ্রহ করে আনেন শব্দাবলির রত্নভাণ্ডার! তার পর তা ভূর্জপত্রে সাজিয়ে রাখেন। অন্য কারও জন্য নয়। সবটাই নিজের জন্য। নিজের এই অন্ধকারময় জীবনে সামান্য আলোর রশ্মির জন্য। অন্ধের যেমন দিবারাত্রির মধ্যে কোনও ভেদাভেদ নেই, তেমনই তাঁর বর্তমান জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার লক্ষ্যটা যে কী হতে পারে, তা আজও তিনি খুঁজে পাননি! হঠাৎ দিন কয়েক আগে কুড়িয়ে আনা শব্দাবলি দিয়ে গাঁথা

মালিকার সুঘ্রাণ নিয়ে অপালা প্রথমে গুনগুন করে পরে উচ্চকিত কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন, ''কন্যা বারবায়তী সোমমপি স্রুতাবিদৎ। অস্তং ভরন্ত্যব্রবীদিন্দ্রায় সুনবৈ ত্বা শক্রায় সুনবৈ ত্বা।।''
জলের অভিমুখ থেকে ফেরার পথে পথের মধ্যে একটি সোমলতা দৃশ্যমান হল। গৃহে আসার পথে সোমকে কন্যা বললেন, 'ইন্দ্রের উদ্দেশে আমি তোমাকে অভিলাষ করি। সমর্থ ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমায় পেষণ করি।'
'অসৌ য এষি বীরকো গৃহং গৃহং বিচাকশৎ। ইমং জম্ভসুতং পিব ধানাবন্তং করম্ভিণমপুপবন্তমুক থিনম।।'
'হে ইন্দ্র! তুমি বীর, তুমি অত্যন্ত দীপ্তিমান, তুমি গৃহে গৃহে গমন করো। এ দন্ত দ্বারা অভিষুত, ভ্রষ্টযব পিষ্টক এবং সোমরস পান করো।'
'আ চন ত্বা চিকিৎসামোহধি চন ত্বা নেমসি। শনৈরিব শনকৈরিবেন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।।'
'হে ইন্দ্র, আমি তোমাকে জানতে চাই। এখন তোমাকে প্রাপ্ত হব না। হে সোম, ইন্দ্রের উদ্দেশে তুমি প্রথমে মন্দ মন্দ এবং পরে দ্রুত বেগে ক্ষরিত হও।'
'কুবিচ্ছকৎ কুবিৎ করং কুবিন্নো বস্যসস্করং। কুবিৎ পতিদ্বিষো যতীরিন্দ্রেণ সঙ্গমামহৈ।।'
'হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের বহুবার সামর্থ্যযুক্ত করো। আমাদের বহু সংখ্যক করো। তুমি আমাদের আরও ধনবান করো। আমি পতি কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে এখানে এসেছি। আমার প্রতি যেন তোমার আসক্তি জন্মে।'
'ইমানি ত্রীণি বিষ্টপা তানীন্দ্র বি রোহয়। শিরস্ততস্যোর্বরামাদিদং ম উপোদরে।।'
'হে ইন্দ্র! তুমি আমার পিতার মস্তক ও তাঁর ক্ষেত্র এবং আমার অঙ্গ উৎপাদনশীল করো।'
'অসৌ চ যা ন উর্বরাদিমাং তন্বং মম। অথো ততস্য যচ্ছিরঃ সর্বা তা রোমশা কৃধি।।'
'হে ইন্দ্র! আমার পিতার ঊষর ক্ষেত্র শস্যযুক্ত করো এবং আমার শরীরে জঙ্ঘার সন্ধিস্থলের যথাস্থানে ও পিতার শরীর রোমযুক্ত করো।'

নর্মদার পবিত্র জলে নিত্যদিনের মতোই অবগাহন করে অপালা আপন খেয়ালে প্রিয় বনপথ দিয়ে গৃহে ফিরছিলেন। নিত্যদিনের মতো সেদিনও তিনি বেশ কিছু বনজ ফুল সংগ্রহ করে নিজের সিক্ত বিরল কেশে গেঁথে নিলেন। রোজকার মতোই অপালা সদ্য লেখা কিছু সূক্ত মনে মনে আবৃত্তি করতে করতে হাঁটছিলেন। হঠাৎ পথের মধ্যে একটি সর্পসদৃশ ব্রততীকে পেঁচিয়ে পড়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। এমন হরিৎ রঙের সর্প পূর্বে অপালার বহুবার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। কোনও কোনওটিকে আবার এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফ দিয়ে চলে যেতেও দেখেছেন। অথচ নাম জানা নেই! সেই সঙ্গে জানা নেই, কতটা বিষাক্ত! অপালার চোখের পলক পড়ছে না। তিনি দেখতে চাইছেন সর্পটির নড়াচড়া। একবার নড়ে উঠলেই বরং মুখে আওয়াজ করে রাস্তা থেকে তাড়িয়ে দেবেন। এই সরু রাস্তার দু'দিকেই নানাবিধ ভেষজ গাছ। সবই নাকি ভেষজ কবিরাজদের ঔষধির কাজে লাগে। তা হলে সব অসুস্থ বাঁচে না কেন কে জানে! কিন্তু পথ জুড়ে পড়ে থাকা সরীসৃপটি এখনও সেই একই ভঙ্গিমায় পড়েই রয়েছে! অপালা এবার একটা গাছের ছোট শুকনো ডাল ওই সরীসৃপটির উদ্দেশে ছুড়ে মারেন। অদ্ভুত নিশানা! লেগেও যায়। কিন্তু তবু সরীসৃপটি মৃতবৎ পড়ে থাকায় অপালা সাহসে ভর করে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে লক্ষ করে দেখেন, ওটি আদৌ কোনও সরীসৃপ নয়। ওটি একটি গুল্ম লতা। সেই দিকে আরও দু'পা এগিয়ে যেতেই ওঁর শরীরের মধ্যে যেন সমস্ত রক্তে উথালপাথাল শুরু হয়ে গেল! অপালা কিছুটা ন্যুব্জ হয়ে লতাটি হাতের মুঠোয় তুলেই বুঝতে পারেন, তাঁর অনুমান বৃথা নয়। এটি সেই গাছের ব্রততী, যা পাওয়ার জন্য অনেক তপস্যা করতে হয়। বড় বিরল এই গাছ। হাতের মুঠোয় নিয়ে ভীষণ আনন্দে বারবার লতাটিকে চুম্বন করতে লাগলেন অপালা! এ যেন ঠিক পতি-পত্নীর গভীর ভালবাসামথিত প্রগাঢ় চুম্বন! অপালা স্থান-কাল ভুলে সিক্ত বসনেই পথের মধ্যে সোম বিটপীর দিকে নির্নিমিখ চোখে তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁর শরীর থেকে অনেক আগেই স্খলিত হয়েছে বক্ষাবরণ। তা ধুলোয় ধূসরিত। পরনের স্বল্প দৈর্ঘ্যের বস্ত্রটি ওঁর সিক্ত শরীরের বিভাজিকাকে বেশ স্পষ্ট করে তুলেছে। এ সবে এখন অপালার কোনও খেয়াল নেই! উনি মত্ত হয়ে রয়েছেন হাতে ধরা একটি মহার্ঘ সোমকে নিয়ে।
অপালার যেন আর কোনও অপেক্ষাই সইছিল না। এই মহার্ঘ সোমকে দুটো পাথরের মাঝে রেখে পেষণ করতে হয় এবং তার পর ভেড়ার লোমের ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে তার সঙ্গে দুগ্ধের মিশ্রণ তৈরি করে মাটির পাত্রে রাখতে হয়। আর তাই এমন সুস্বাদু সোমরস দেবতা থেকে শুরু করে ঋষিদেরও ভীষণ প্রিয়। শুধু নেশার জন্যই নয়, এতে শক্তিরও বৃদ্ধি ঘটে থাকে।
প্রথমে সোমলতিকা নিয়ে কিছুটা বিভ্রম থাকলেও পরমুহূর্তেই অপালা বুঝতে পেরেছেন যে এই মহার্ঘ জিনিসটিকে তিনি আগে বেশ ক'বার দেখেছেন। পিতা কর্দমের যজ্ঞানুষ্ঠানেই তিনি বহুবার দেখেছেন। এটি ছিল যজ্ঞের বহু উপচারের মধ্যে অন্যতম। এর রসামৃত বিবিধ হব্যের সঙ্গে যজ্ঞে না দিলে যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয় না। এবং এই সোমের



তিনি শুধু বুদ্ধিমতী নারীই ছিলেন না, ছিলেন জ্ঞানঋদ্ধা নারী। কাজেই কঠোর তপস্যা করতে গেলেই যে একেবারে সংসারবিমুখ হতে হবে তার কোনও অর্থ নেই।

গন্ধে আকর্ষিত হয়ে সব দেবতাই যেন বায়ুর থেকেও দ্রুত গতিতে ধাবিত হয়ে আসেন। এমনই এর আকর্ষণ! এত সব কূটকচালের খবর অপালার কাছে না-থাকারই কথা। তাই তিনি কুড়িয়ে পাওয়া সোমকে মুখে পুরে অন্যমনস্কভাবে চর্বণ করে চলেন। যে কোনও বস্তু চিবিয়ে খেলেই একটা মৃদু ঘর্ষণের শব্দ ভেসে আসে। অপালা ঠিক বুঝতে না-পারলেও তাঁর মুখ থেকেও দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ হচ্ছিল। আর এই মৃদু শব্দ তাঁকেই আকর্ষণ করবে যিনি এই শব্দের সঙ্গে ভীষণভাবেই সম্পৃক্ত। সব দেবতাই কম-বেশি মদালস থাকতে ভালবাসেন। তবে এলেবেলে খেয়ে তাঁরা নেশা করেন না। যখনই পান করেন সোমরসই করে থাকেন। কিন্তু নাম বেশি উচ্চারিত হয় ইন্দ্রের। সে যাক গে। রাজা বলে কথা। আজকেও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে গেল। অপালা গৃহে ফেরার কথা ভাবতেই দেখতে পান একজন সুদর্শন রাজপুরুষ হঠাৎ করেই তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন! প্রথমে হতচকিত হয়ে যাওয়ারই কথা। কিছু পরে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে অপালা বলেন, ‘‘মহাশয়, কে আপনি? কেন আমার পথ আগলে দাঁড়ালেন?”

“আমি প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও বুঝতে পারিনি কোথায় সোম প্রস্তুত করা হচ্ছে! অথচ আমি তা পেষণের শব্দ শুনতে পাচ্ছি! হে বালিকে, তুমি কি জানো?” আগন্তুক জানতে চাইলেন। তিনি যে এ ব্যাপারে ভীষণ উদ্বিগ্ন, তা তাঁর কথাতেই ধরা পড়ল।

অপালা নেতিবাচক মাথা নাড়লে আগন্তুক আবার বললেন, ‘‘এছাড়াও কে যেন ইন্দ্রের নামে স্তুতি করছিল। অথচ সে এখন নিশ্চুপ! বড় অদ্ভুত তো!”

“তা আমি কী জানি! কিন্তু আপনি কিসের শব্দ পাওয়ার কথা যেন বলছিলেন!” অপালা বলেন।

“আমি সোমের কথা জানতে চাইছিলাম। আমি তার আস্পর্ধা দেখে হতবাক হয়ে গেছি। আমার নজরদারির বাইরে সোম নেয় কী করে!” আগন্তুক ক্রোধে কাঁপতে থাকেন।

“কেন! সোম কি শুধু আপনার একার? কোনও যাগের কাজে কি তা ব্যবহার করা যাবে না?”

অপালার প্রশ্নের উত্তরে আগন্তুক বললেন, ‘‘যাবে না কেন, নিশ্চয়ই যাবে। কিন্তু যাগ ব্যতীত মর্তে সাধারণের সোমের ব্যবহার নিষিদ্ধ। আর এটা কি সেই নির্বোধ জানে না!”

অপালা আগন্তুকের দিকে পিছন ফিরে সোম সমেত মুখটা নাড়তেই তিনি আবার বলেন, ‘‘ওই যে, আবার কে যেন সোম পেষণ করছে! আমি দিব্যি শুনতে পেলাম। বড় সন্নিকটেই! বালিকে, তুমি শুনতে পেলে?”

অপালা মনে মনে একচোট হেসে নিয়ে বলেন, ‘‘কই না তো! এবার বলুন তো আপনি সোম-সোম করে কেন উন্মত্তের মতো করছেন? এমন রাজবেশেই বা আপনি কোথায় চললেন? আপনি যে রাজা বা রাজপরিবারের কেউ, তা বোঝার মতো বুদ্ধি আমার আছে। তবে আপনি যদি শিকারের উদ্দেশ্যে এই পানে এসে থাকেন তা হলে আপনার লোকবল কই! তাদের ছাড়া তো শিকার সম্ভব নয়।’’

সাধারণ একজন বালিকার মুখে এত সব শোনার মতো ধৈর্য বা সময় কোনওটাই আগন্তুকের হাতে নেই। হস্তী যেমন রমণকালে হস্তিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য কোনও স্থাবর বা জঙ্গমতাকেই স্বীকার না-করে দলে যেতে চায়, তেমনই এই মুহূর্তে আগন্তুকের মনের অবস্থা। অথচ তিনি জানেন এই বালিকার কথার উত্তর না দিলে সোমের হদিস পাওয়া যাবে না। কারণ এই নির্জন পথে আর দ্বিতীয় কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। আগন্তুক একটু কর্কশ স্বরেই বললেন, ‘‘তুমি কি আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছ বালিকা? জ্ঞাত থাকলে এই মুহূর্তে তা ব্যক্ত করো। তা না হলে এর ফল ভয়ঙ্করও হতে পারে। যা তুমি এখন কল্পনাও করতে পারছ না।’’

অপালা মৃদু হেসে বললেন, ‘‘আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনার হস্তের উন্মুক্ত তরবারি থেকে সূর্যরশ্মির ছটা বিচ্ছুরিত হয়ে আমার শরীরের যেখানে যেখানে পড়ছে সেখানেই আমি তাপ অনুভব করতে পারছি। এ যে-কোনও শত্রুর কাছে তার মৃত্যুর প্রাক্‌মুহূর্ত। কিন্তু হে মহাশয়, আমি কারওই শত্রু নই। আমি এক ঋষিকন্যা মাত্র। তবে হে আগন্তুক, আপনি কি পথভ্রমে এই অরণ্যে এসে পড়েছেন? নাকি পশুহত্যার নিমিত্ত শিকারে বেরিয়েছিলেন!” অন্যমনস্ক ভাবে অপালা হঠাৎ তাঁর জিভের নিম্নে লুকিয়ে রাখা সোমকে দুই দাঁতের মাঝে নিয়ে আসতেই মৃদু চাপ লাগে। আর সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুকের দুই চোখ আনন্দে নেচে ওঠে। তিনি সোল্লাসে বলে ওঠেন, ‘‘ওই তো আমি যেন আবার সোম ঘর্ষণের মৃদু শব্দ পেলাম। এ আমার ভ্রম হতে পারে না।’’

“আপনি সামান্য একটি সোমের জন্য লোভাতুর প্রাণীর মতো করছেন কেন! এই সোম যে আপনারই প্রাপ্য, তা আপনি কোন ভিত্তিতে বলছেন!” অপালা নিঃশব্দে শতচ্ছিন্ন সোমটিকে মুখের মধ্যে পূর্ব স্থানে পাঠিয়ে দিলেন।

“তুমি অর্বাচীন বলেই এমন কথা বলতে পারছ। এই বিশ্বের যেখানে যত সোম রয়েছে সব সোমের আমিই মালিক। সোম অপর কারও হতে পারে না। কারও থাকলে আমি তা ছিনিয়ে নিই।’’

“এমন ধৃষ্টতা ঠিক নয়। রাজা ইন্দ্র যদি একবার ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন তা হলে তিনিও আপনাকে ছেড়ে কথা বলবেন না। শুনেছি তিনিই সোমের মালিক,’’ অপালা ভুলে গিয়েছেন যে তাঁর শরীরের সিক্ত বসন এখন প্রায় শুকিয়ে গিয়েছে।

“সে আমি না হয় তোমার ইন্দ্রের সঙ্গে বুঝে নেব। এবার জানলে বলো, কোথায় সোম রয়েছে,’’ আগন্তুক তাঁর উন্মুক্ত তরবারি হাতে এক পা অপালার দিকে এগিয়ে আসেন।

“আপনি দেখছি সোমের জন্য বড়ই

নাছোড়। তা হলে সত্যিই খাবেন?"
"তোমার সঙ্গে অহেতুক কথা বলে আমি বড় তৃষ্ণার্ত বোধ করছি। অবশ্যই তা পান করতে চাই,"
আগন্তুক আরও এক পা অপালার দিকে এগিয়ে আসেন।
অপালা তাঁর দুই চোখ বন্ধ অবস্থায় মুখব্যাদান করে আগন্তুকের সামনে দাঁড়ান। ততক্ষণে অপালা তাঁর জিভের নীচ থেকে সমস্ত সোম মুখের ভিতরে নিয়ে এসেছেন।
আগন্তুক তা দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলে ওঠেন, ''কী সাংঘাতিক! কী সাংঘাতিক কাণ্ড! তোমার এত সাহস হয় কী করে যে আমার পানীয় পান করে বসেছ! তবু আমি ওই অবশিষ্টাংশই পান করব।''
এমন কথা শুনে অপালা চোখ খুলে চরম হতবাক অবস্থায় বিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর সামনে স্বয়ং স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র তখন মুচকি মুচকি হাসছেন। অপালা তাড়াতাড়ি হাতজোড় করে বলেন,
''প্রভু, আমাকে মার্জনা করুন। আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। আমি পথেই সোম কুড়িয়ে পেয়েছি।''
"তুমি চিনতে পেরেছিলে যে এটি সোম?" ইন্দ্র জানতে চাইলেন।
"হ্যাঁ প্রভু। আমি এই গুল্মটিকে চিনি।''
"কীভাবে চেনো?" ইন্দ্র আরও কৌতূহলী হয়ে বলেন।
"বাড়িতে কোনও যজ্ঞানুষ্ঠান হলে এর প্রয়োজন হত। তা ছাড়া আমার মৌঞ্জীবন্ধনের সময়ও দেখেছি,''
অপালা ইন্দ্রের পরিচয় জানার পর থেকে হাতজোড় করে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন।
"তোমার পিতৃদেবের পরিচয়?''
"ঋষি অত্রি। আমি তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা অপালা।''
"আমার আর দেরি সইছে না। আমি অমৃত পানের ন্যায় সোম পান করতে চাই এবং তা তোমার ওষ্ঠাধর থেকে। তুমি তোমার ওষ্ঠাধরকে পুষ্পের পাপড়ির ন্যায় ব্যাদান করো। যাতে আমি পান করতে পারি।''
ইন্দ্র একেবারে অপালার এতটা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন যে উভয়ের নিঃশ্বাস একে অপরকে তাপিত করছে। ইন্দ্র দুই হাতে যুবতী অপালার মুখ কিছুটা উপরে তুলে ধরেন। পরক্ষণেই যুবতীর ওষ্ঠাধরকে নিজের ওষ্ঠাধরের গভীরে সংস্থাপিত করেন। তার পর জিহ্বাগ্র দিয়ে সমস্ত সোমের নির্যাস ইন্দ্র নিজের মধ্যে শুষে নিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে অপালার সারা শরীরে একটা অদ্ভুত শিহরন তরঙ্গের মতো খেলে যেতে লাগল! কিছু পরে ইন্দ্র মুখ দিয়ে এক চরম তৃপ্তির শব্দ করলেন। এতটা সময় অপালা চোখ বন্ধ করে মনে মনে উচ্চারণ করছিলেন, 'হে ইন্দ্র, আমি তোমাকে আরও গভীর ভাবে জানতে চাই। অথচ তা পারি না! হে সোম, তুমি খুব ধীরে ধীরে প্রবাহিত হও।' অর্থাৎ অপালা চাইছিলেন এমন মধুর অনুভূতি যেন আরও কিছুক্ষণ স্থায়ী থাকে। কিন্তু সব সোম পান করে ইন্দ্রের চক্ষুদ্বয় আনন্দ ও অসীম তৃপ্তিতে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি অপালার ওষ্ঠাধর ছেড়ে দিয়ে একটু সরে এসে বললেন, ''বৎসে, আমি তোমার ওষ্ঠাধর থেকে সোম পান করে ভীষণ তৃপ্ত হয়েছি। এবার বলো, তুমি আমার কাছে কোন বর চাও। নির্দ্বিধায় চাইতে পারো।''
অপালা লজ্জাবনত হয়ে বলেন,
''প্রভু, আমি তো আপনাকে যথাযথ উপাচার অর্থাৎ শস্য, ছাতু, পিঠে আর স্তুতিগান সহযোগে আপ্যায়ন করতে পারিনি। আমাকে বর দিতে চাইছেন কেন?"
ইন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, ''তুমি তো আমাকে অনেক আগেই স্তুতিগানে তুষ্ট করেছ। আর না-ই বা থাকল আনুষঙ্গিক উপচার। আসল প্রাপ্তি তো আমার হয়েই গেছে। অর্থাৎ সোম পান। তাই আমি আজ চরম তৃপ্ত হয়েছি। আমি তোমাকে তিনটি বর দিতে চাই। এবার বলো, তোমার কী কী বর চাই।''
ঠিক এইভাবে হঠাৎ করে কেউ বর দিতে চাইলে কিছুটা তো অপ্রস্তুত হতেই হয়। অন্তত একটু মানসিক ভাবে তৈরি হয়ে নেওয়ার প্রয়োজন তো পড়েই। তাই অপালা চট করে মনের গভীরে ডুব দিয়ে প্রথমেই তুলে আনলেন এক অতৃপ্তির খতিয়ান। যা তাঁকে প্রতিনিয়তই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে চলেছে। এমনকি যার জন্য তাঁকে বিতাড়িত হতে হয়েছে একটি নিরাপদ আশ্রয় থেকে। যে আশ্রয়ে তিনি উপযাচক হয়ে যাননি। বরং তাঁকে বরণ করেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সব নারীর ক্ষেত্রেই এই জায়গাটি হচ্ছে একেবারে নিজের জায়গা। অথচ সেখান থেকেই তাঁকে চলে আসতে হয়েছে। তাই অপালা প্রথমেই বললেন, ''প্রভু, আমি আপনার কাছে তিনটি বরই চাইব। প্রথমটি হল, এই যে আমার শ্বেত বর্ণের শরীর যা সকলের কাছেই ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য ও অসুন্দরের প্রতীক, তাকে আপনি সৌন্দর্যময় করে তুলুন। যেন কেউ আর আমাকে দেখে ঘৃণাভরে দূরে না সরে যায়। পূর্ববৎ সোহাগ করে।''
ইন্দ্র এতক্ষণ অপালার দিকে নির্নিমিখ চোখে তাকিয়ে ছিলেন। অপালা তার প্রথম বরটি চাইতেই তিনি বললেন," তথাস্তু! তা-ই হবে।"
অপালা এবার একটু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, ''আমার দ্বিতীয় বরটি হচ্ছে, আমার পিতার মস্তকে কেশ দান করুন, তাঁর শস্য ক্ষেত্রকে পরিপূর্ণ করুন।''
এবারও ইন্দ্র 'তথাস্তু' বললেন।
অপালা বুঝতে পারছিলেন না তিনি আর বর চাইবেন কি না। কিন্তু ইন্দ্র তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই অপালা বলে ফেললেন তাঁর তৃতীয় মনোবাসনা, "এমন বর দিন যাতে আমার শরীরের উরুসন্ধিতে কেশগুচ্ছ দেখা দেয়।''
ইন্দ্র শুধু একজন পুরুষই নয়, যিনি অতীব সুপুরুষও বটে, তাঁর কাছে সর্বশেষ বরটি অপালা নিঃসঙ্কোচে

চেয়ে নিলেন। কারণ সময়টা ছিল বৈদিক যুগ। তখন বোধ হয় নারী-পুরুষের শারীরিক বর্ণনায় খুব একটা মুখের আগল ছিল না। যেন সবটাই সকলের জানা!
এবারও ইন্দ্র 'তথাস্তু' বললেন। অর্থাৎ অপালার তিনটি মনোবাসনাই ইন্দ্র পূরণ করলেন। তবে তিনি প্রথম বরটিকে সার্থক করতে গিয়ে একটি পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। অপালার সারা শরীর শ্বেত কুষ্ঠে ভরে গেছে। মুখাবয়ের অবস্থাও একই। এটি হল ত্বকের বহিরাবরণ। তাই ইন্দ্র তাঁকে প্রথমে রথের চাকার ছিদ্রের মধ্য দিয়ে পারাপার করালেন। তখন তাঁকে দেখতে লাগছিল একটি শল্যক অর্থাৎ শজারুর মতো। দ্বিতীয় বার তাকে একটি গোধা অর্থাৎ গোসাপ বানিয়ে তিনি একটি গো-শকটের চাকার ছিদ্রের মধ্য দিয়ে পারাপার করিয়ে আনলেন। তৃতীয় বার তিনি অপালাকে কৃকলাসে পরিণত করে গো-শকটের জোয়ালের সরু ছিদ্রের মধ্য দিয়ে পারাপার করিয়ে সুন্দর ত্বকে পরিণত করলেন। ধীরে ধীরে তাঁর ত্বকের রং হয়ে গেল সূর্যের তেজের মতো। বর্ষার নব জলে যেমন বিভিন্ন বিটপী লতায় প্রাণ ফিরে আসে, ঠিক তেমনই অপালার বিরল কেশ কুঞ্চিত হয়ে সারা মাথা ঢেকে দিল। একজন যুবতী নারীর শরীরের প্রতিটি বিভাজিকা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে অপালাকে অনেক মোহনীয় করে তুলল। কে বলবে যে এই অপালা দীর্ঘ কাল কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এখন কারই বা সাধ্য রয়েছে যে অপালাকে উপেক্ষা করে চলে যাবে। বরং অনেকেই ইন্দ্রের কৃপা লাভ করার পরে অপালার নব রূপের জ্যোতি দেখার জন্য ছুটে আসছেন। আদর করে দুটো ভাল কথাও বলছেন। আর এভাবেই অপালার রূপ পরিবর্তনের কথা এক জনপদ থেকে অন্য জনপদে ছড়িয়ে যেতে বিশেষ সময় লাগল না।
ভাল কথা বা মন্দ কথা হেথা হোথা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাতাস রয়েছে। তাই এমন শুভ খবরটা কৃষশ্বের কানে যেতেও দেরি হল না। কিন্তু কোন মুখেই বা সে অপালার সামনে এসে দাঁড়াবে। নিজের ভালবাসার জোরেই একদিন সে অপালাকে বিবাহ করার কথা গুরুদেব অত্রিকে বলতে পেরেছিল। অথচ তাকেই কিনা চর্মরোগের কারণে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। তাই আজ কোন মুখে সে অপালার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে! অথচ এমন খবরের সত্যাসত্য যাচাই করার সুপ্ত ইচ্ছেকে সে কিছুতেই দমন করতে পারছে না। মনে হচ্ছে বাতাসে ভর করে দ্রুত সে অপালার কাছে পৌঁছে যায়। পরক্ষণেই তার মনে হয়, এবার যদি অপালা তার অপমানের বদলা নেয়। যদি সামনে পেয়ে অপালা কিছু কটূ কথা শুনিয়ে দেয়! তখন সে কী করবে! সে কি সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসবে। নাকি হাজার কটু কথা উপেক্ষা করেও সে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং তার কৃতকর্মের জন্য তেমন হলে ক্ষমা চেয়ে নেবে। কৃষশ্ব এর বেশি আর কিছু ভাবতে পারে না। একদিন গুটিগুটি পায়ে সে গুরুদেব অত্রির আশ্রমের উদ্দেশে রওনা দেয়। গুরুদেব তখন অধ্যয়নে রত ছিলেন। কৃষশ্ব দূর থেকেই তা অবলোকন করে নিঃশব্দে তাঁর কুটিরে প্রবেশ করে। এবং তড়িতাহতের মতো সঙ্গে সঙ্গে আঙিনায় থমকে দাঁড়ায়। যিনি দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি কি তার পত্নী অপালা, নাকি অন্য কেউ! অথচ এ কুটিরে তো দেবী অনসূয়া ব্যতীত অন্য কোনও নারীর থাকার কথা নয়! তা হলে এই রূপবতী নারীই বা কে হতে পারেন! কৃষশ্বের এমন মুহ্যমান অবস্থা দেখে স্বয়ং অপালা দাওয়া থেকে আঙিনায় নেমে গলবস্ত্র হয়ে কৃষশ্বকে প্রণাম করেন। কৃষশ্ব হাতজোড় করে বলে, ''আমাকে ক্ষমা করে দাও দেবী। আমি তোমার কদর্য রূপ দেখে তোমার প্রতি বিরূপ হয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারছি, ভীষণ অন্যায় করেছিলাম। আমাকে ক্ষমা করে দিতে পারো না?"
"ছি! ওভাবে বলে আমাকে পাপের ভাগী করবেন না। শুধু বলুন আপনি আমাকে গ্রহণ করবেন তো?"
অপালা আঁচল দিয়ে চোখ মোছেন।
"আমি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি দেবী। শুধু ভয় ছিল, তোমার ক্ষমা পাব কি না! এসো আমরা গুরুদেব আর গুরুমাকে যুগলে প্রণাম করে স্বগৃহে যাত্রা করি। তা হলে সূর্য পাটে যাওয়ার আগেই আমরা নিজ গৃহে পৌঁছে যাব,'' কৃষশ্ব পত্নী অপালার হাত ধরতে গিয়ে বুঝতে পারে যে তাঁর মনের মধ্যে উথালপাথাল শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে শরীরের মধ্যে চলছে এক বল্গাহীন তুরগের দুরন্তপনা!
অপালা এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে পিতা যেখানে অধ্যয়নে রত আছেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে ঋষি অত্রি বিস্মিত হয়ে মাথা তুলে দেখেন সামনে শুধু তাঁর অপরূপা কন্যা অপালাই দাঁড়িয়ে নেই,তাঁর সঙ্গে রয়েছে প্রিয় শিষ্য এবং জামাতা কৃষশ্ব! কৃষশ্বকে দেখে তিনি খুব প্রীত হন। তিনিও উঠে দাঁড়াতেই কৃষশ্ব এবং অপালা যুগলে পিতৃদেবকে প্রণাম করলে তিনি আশীর্বাদ করে বললেন, "কল্যাণমস্তু! দীর্ঘজীবী ভব।''
অপালা বললেন, ''পিতৃদেব,আমি শ্বশুরালয়ে যাত্রা করছি। আপনি শরীরের প্রতি যত্নবান হবেন। মাকেও নিজের প্রতি যত্নবান হইতে বলিয়াছি।''
কী উত্তর দেবেন, তা ঋষি অত্রি বুঝতে পারলেন না! শুধু নির্নিমিখ চোখে ওদের যাত্রার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তিনি টের পাননি কখন যেন তাঁর শ্মশ্রু বাহিত অশ্রুজল বক্ষদেশ ভিজিয়ে দিয়েছে! মনে করতে পারলেন না শেষ কবে তিনি অশ্রুর প্লাবনে প্লাবিত হয়েছিলেন!

তথ্যসূত্র: ঋগ্বেদ
অলংকরণ: কুনাল বর্মণ



■ প্যাস্টেল পিচ অ্যাসিমেট্রিক্যাল স্কার্টের সঙ্গে ফ্রিলওয়র্ক টপ।

পশ্চিমি পোশাকে উৎসবের রং

পুজোর সাজ তালিকায় রাখতে পারেন নানা প্যাটার্নের এক্সপেরিমেন্টাল ওয়েস্টার্ন কালেকশন। ফ্যাশন ডিজ়াইনার সুচরিতা পাইকের পুজো কালেকশনে সাজলেন অঙ্কিতা সিংহ।





■ উজ্জ্বল লাল হল্টারনেক জাম্পসুট। কোমরে কাট-আউট প্যাটার্ন। কুন্দনের গয়নার সঙ্গে ইন্দো-ওয়েস্টার্ন সাজ। পুজোয় সন্ধ্যায় পারফেক্ট ফিউশন ফ্যাশন।

■(ডান দিকের ছবি) হালকা পিচ ফ্লোয়ি লং ড্রেস। হেমলাইনে হ্যান্ড এমব্রয়ডরি করা ফ্লোরাল ডিজ়াইন। ফেস্টিভ ডে লুকের জন্য এ রকম ড্রেস বাছতেই পারেন।



■ ডার্ক মেরুন প্লিটেড প্যাটার্ন লং স্কার্ট। সঙ্গে শিমারি গোল্ডেন রঙের ক্রপ টপ ও ফ্রিলওয়র্ক করা শ্রাগ।



■ ওয়ান-শোল্ডারড কাট-আউট স্টাইলের পিচ জাম্পসুট। পিচের উপর সাদা ও লাল বিডসের সূক্ষ্ম কাজে ফ্যাশনেবল আউটফিট।

ছবি: সোমনাথ রায়, **মেক-আপ:** প্রীতম দাস, **ফোন:** ৮৬২১০২০০৬১, **হেয়ার:** মৈনাক মিত্র, **স্টাইলিং:** নীল সাহা, **ফোন:** ৯৮৩৬৬৮২৯৩৩
পোশাক: সুচরিতা, ৭৯/১৪ কালিকাপুর রোড, কলকাতা- ৭০০০৭৮, **ফোন:** ৭০৪৪১২৭৮৩৪, **ওয়েবসাইট:** www.sucharita.in
লোকেশন ও হসপিটালিটি: দ্য পার্ক হোটেল কলকাতা, **ফোন:** ০৩৩ ২২৪৯৯০০০, **শুটিং কো-অর্ডিনেশন:** মৌমিতা সরকার, **রূপায়ণ:** অসীম হালদার

“নিজেকে ভগবানের প্রিয় সন্তান ভাবতাম সব সময়”



দুর্ঘটনায় পা হারানোর পরে তাঁর প্রত্যাবর্তনের গল্প অনুপ্রেরণা দেয় অনেককে। নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রীর দ্বৈতসত্তায় সমান উজ্জ্বল **সুধা চন্দ্রন**। কথা বললেন **মধুরিমা সিংহ রায়**।



রমোলা সিকন্দের চরিত্রে

প্রথম নাচের সঙ্গে ভালবাসার শুরু তিন বছর বয়সে। অত ছোট বয়সে সেভাবে কিছু বুঝে ওঠার আগেই নাচের প্রেমে পড়লেন...

হ্যাঁ, আসলে আমার মা একটা সময় নৃত্যশিল্পী হতে চাইতেন। ওঁর সেই স্বপ্ন সত্যি হয়নি। শুধু গায়িকা হিসেবেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন মা। বাবা-মায়েদের স্বপ্ন পূরণ করার মাধ্যম হয়ে ওঠে ছেলেমেয়েরা। আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তিন বছর বয়সে আমি কী করেই বা বুঝতাম, আমি কী হব! মা চেয়েছিলেন আমি নৃত্যশিল্পী হই। ছোট থেকে মা-বাবার শেষদিন পর্যন্ত আমি কখনও বাবা-মায়ের কোনও সিদ্ধান্তকে প্রশ্ন করিনি। এখন ছোটদের আমি বলি, যদি বাবা-মায়েরা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন, তাহলে তোমাদের জীবন অনেক সহজ হয়ে যাবে। অনেক বাচ্চাই ভাবে, বাবা-মা আগের প্রজন্মের, আউটডেটেড। কিন্তু একেবারেই তা নয়। দে হ্যাভ সিন মোর সামারস দ্যান উই হ্যাভ সিন। আমিও মায়ের ইচ্ছে অনুযায়ীই কাজ করেছি।

একটা সময় মেয়েদের নাচ বা অভিনয়কে পেশা হিসেবে নেওয়াকে খুব একটা ভাল চোখে দেখা

হত না। আপনার পরিবার কিন্তু বরাবরই বেশ উদারমনস্ক ছিল...

আমার মা এ সব নিয়ে একদম ভাবতেন না। উনি দৃঢ়চেতা ছিলেন, নিজে সিদ্ধান্ত নিতেন ও সেই সিদ্ধান্ত কাজে রূপায়িত করতেন। লোকের কথায় মোটেও কান দিতেন না! আমাকে বলতেন, 'শোনো সুধা, ওরা তোমার সংসার চালায় না। তাই ওদের কোনও অধিকার নেই তুমি কী করছ তা নিয়ে মন্তব্য করার।' জীবনে কিছু পেতে হলে, অনেক বাধা আসবে। মা বলেছিলেন, লোকের কথা কানে না তুলে নিজের পথে এগিয়ে যেতে।



আপনার দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বও তাহলে মায়ের থেকেই পাওয়া...

হ্যাঁ, ছেলেমেয়েরা বাবা-মায়েদের লেগাসিই বয়ে নিয়ে চলে। আমাদের প্রথম 'হিরো' বাবা-মা। বাচ্চারা বাবা-মায়েদের চোখ দিয়েই জীবন দেখে। তাই, ওঁদের চিন্তাভাবনার ছাপ ছেলেমেয়েদের উপরে পড়বেই। এটাই সঠিক আপব্রিঙ্গিং।

প্রথম স্টেজ পারফরম্যান্সের কথা মনে আছে?

আট বছর বয়স ছিল তখন। ধ্রুপদী নৃত্যে প্রথমবার মঞ্চে আসাকে 'আরেঙ্গেত্রম' বলে। নতুন পোশাক, মেক-আপ, সুন্দর করে চুল বেঁধে পাঠানো হয়েছে স্টেজে...ওটাই তখন উপভোগ করতাম। আমার জন্য নাচ মানে ফেস্টিভ্যাল ছিল তখন! একদম নায়িকার মতো সাজানো হত। ওটাই নাচের মোটিভেশন ছিল।

আপনি পড়াশোনাতেও ভাল ছিলেন। অর্থনীতিতে মাস্টার্স করেছেন। অ্যাকাডেমিক্স ছেড়ে নাচকে কেরিয়ার বানানো ঝুঁকি লাগেনি?

আই হ্যাড নো চয়েস! মা কখনও বলেননি, নাচলে পড়াশোনা করতে পারবে না। আমি তামিল ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। শিক্ষার গুরুত্ব সেখানে সর্বাধিক। মা বলতেন, আমাদের মতো মধ্যবিত্ত মানুষদের জন্য শিক্ষা হল ব্ল্যাঙ্ক চেকের মতো। যা ভাঙিয়ে তুমি যে কোনও সময়ে খেতে পারবে। এবার তুমি তাকে কীভাবে ব্যবহার করবে, তা তোমার স্মার্টনেসের উপর নির্ভর করে। আমি আমার স্বামীকে সব সময় বলি, মা দিনে অন্তত দশবার বলতেন যে বাবা সকাল ছ'টায় কাজে বেরোন। সন্ধে সাড়ে সাতটায় বাড়ি ফেরেন। তাই, হিসেব করে প্রতিটা পয়সা খরচ করা উচিত। খুব প্রয়োজন না হলে পার্স খুলবে না, এমনটাই বলতেন মা। আমি যখন সিনেমায় কাজ করতে শুরু করলাম, সমস্ত উপার্জন মাকে দিতাম। মা আমায় পকেটমানি দিতেন। আমার যা দরকার মা কিনে দিতেন। এখন আমি স্বামীর সঙ্গে বেরোলেও ওঁর উপরে ছেড়ে দিই। কিন্তু উনি আবার উদার, বলেন তোমার যা চাই কিনে নাও (হাসি)। একমাত্র সন্তান হলেও প্যাম্পারড ছিলাম না। প্রতি শনিবার বাবা আমার জন্য নতুন

মা আমাকে বলতেন, 'শোনো সুধা, ওরা তোমার সংসার চালায় না। তাই ওদের কোনও অধিকার নেই তুমি কী করছ তা নিয়ে মন্তব্য করার।'



নাচের প্রস্তুতিতে সুধা



যাত্রার রিহার্সাল চলছে

ফ্রক নিয়ে আসতেন ছোটবেলায়। হয়তো কম দামের, কিন্তু আমি যাতে খুশি থাকি সে জন্যই করতেন এটা। আই ওয়জ় ড্যাডিজ় বেবি অ্যাট দ্যাট টাইম। আমার চার মামার মধ্যে তিন মামা খুব আড্ডাপ্রিয় ছিলেন। আমি পরিবারের প্রথম নাতনি (গ্র্যান্ড চাইল্ড) ছিলাম।

দুর্ঘটনার পরে প্রায় তিন বছর নাচ থেকে দূরে ছিলেন। নিজেকে কীভাবে মোটিভেট করতেন?

১৯৮১-৮৪, তিন বছর লেগেছিল ফিরতে। ১৫ বছর বয়স তখন। আমার বাবা, মা, আমার গুরুজি আর চিকিৎসকেরা আমার সাপোর্ট সিস্টেম ছিলেন। কোনও ট্র্যাজেডি ঘটলে ভগবান ঠিক কাউকে না কাউকে পাঠিয়ে দেন। দে ওয়্যার গড-সেন্ট ফর মি। আমি মনে করতাম, আমি ভগবানের প্রিয় সন্তান। আই ওয়জ় গডস চোজ়েন ওয়ান। হয়তো উনি আমার মাধ্যমে বার্তা পাঠাতে চেয়েছিলেন যে, বিশেষভাবে সক্ষম মানুষরাও জীবনে সব কিছু করতে পারে। নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করি আমি।

যে কোনও শিল্পেরই ‘হিলিং পাওয়ার’ থাকে। হয়তো নাচও আপনাকে সাহায্য করেছিল জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে...

একটা সময় তো নাচ দূরের কথা, হাঁটতে পারব কিনা তাই জানতাম না! মনে হত, বাবা-মা এত কিছু করেছেন। তার বদলে ওঁদের জন্য কি কিছুই করতে পারব না? আমার চেয়েও বেশি বাবা-মায়ের স্বপ্ন ধ্বংস হয়ে যেতে দেখেছিলাম তখন। ওই অনুভূতিটা অসহ্য ছিল। সেই সময়ে একটা বিষয়ই মাথায় ঘুরত, কীভাবে বাবা-মাকে গর্বিত করতে পারব। আমার যাবতীয় যন্ত্রণার মুহূর্তে মা

> ‘ময়ূরী’ মুক্তির পরেও আমি সব সময় এতটাই মাটির কাছাকাছি ছিলাম যে চূড়ান্ত সাফল্যেও কখনও মাথা ঘুরে যায়নি।



সব সময় পাশে ছিলেন। শি ফরগট হার এগজ়িসটেন্স। শি ওয়াজ় লিভিং মাই লাইফ। ওই তিন বছরে মা আমার ছায়া হয়ে ছিলেন।

প্রত্যাবর্তনের পরে ‘ময়ূরী’ সারা দেশে ঝড় তুলেছিল। হিন্দিতে ‘নাচে ময়ূরী’ নামে রিমেকও হয়। জীবন কতটা বদলেছিল তারপর?

(হাসি) আমি কত বড় তারকা হয়ে গিয়েছি বুঝতেই পারিনি তখন। হতে পারে, আমি সব সময় এতটাই মাটির কাছাকাছি ছিলাম যে চূড়ান্ত সাফল্যেও মাথা ঘুরে যায়নি। পরে টিভিতে ‘কহিঁ কিসি রোজ়’ করার পরে যখন স্টারডম পেলাম, তখন লোকে বলতেন ‘ওহ মাই গড! শি ইজ় রমোলা সিকন্দ।’ আমার কিন্তু মনে হত, যাঁরাই কাজ করতে আসেন, সকলেই তো বড় হওয়ার তাগিদ নিয়ে আসেন। ‘ময়ূরী’র পরে হায়দরাবাদে গিয়ে অবশ্য স্টারডম কী জিনিস বুঝতে পেরেছিলাম। প্রযোজক রামোজি রাও আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখালেন, ওখানে বিশাল সাইজ়ের সব কাট আউট আমার! লোকে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন আমার পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নেবেন বলে। দ্যাট মুভড মি। ওই প্রথম হিরো ওয়র্শিপ দেখলাম। প্রযোজক আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, ‘সুধাজি, আপনি রিয়েল লাইফ হিরোইন।’ ‘ময়ূরী’ দেখতে থিয়েটারে গিয়ে দেখি আমার পা বাদ যাওয়ার দৃশ্য দেখে কত মহিলা ওখানেই জ্ঞান হারাচ্ছেন। ছবিতে নায়ক যখন আমাকে বের করে দিচ্ছেন, সেই চরিত্রের জন্য প্রচুর গালি খেয়েছিলেন ওই অভিনেতা। ৩০ বছর পরে টিভি চ্যানেলের প্রোগ্রামের জন্য হায়দরাবাদে যখন যাই, এয়ারপোর্টে আমাকে দেখে লোকজন ছুটে আসছিলেন! ‘ময়ূরী ম্যাডাম’ বলে ডাকছিলেন। কে বলেছে মানুষের স্মৃতিশক্তি দুর্বল? শিরডি-তেও কিছুদিন আগে একই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কিছু ছবি হয়তো জীবনে একবারই তৈরি হয়, এটিও সেরকম ছিল। এই ছবি দেশের প্রথম অটোবায়োগ্রাফিকাল ফিল্ম, যেখানে বাস্তবের চরিত্র অভিনয় করেছেন নিজের ভূমিকায়।

‘ময়ূরী’র পরে আরও বেশি করে লিড চরিত্রে কাজ পাওয়া উচিত ছিল বলে মনে হয়, অন্তত হিন্দিতে?

নট রিয়েলি। অনেকেই বলতেন, আমি নাকি ওয়ান ফিল্ম ওয়ান্ডার। এরকম নেগেটিভ কথাবার্তা শুনেছি। দুর্ভাগ্যক্রমে, যত ছবি করেছি তার মধ্যে অধিকাংশ সফলও হয়নি। তখন মনে হত, হয়তো ওঁদের কথাই সত্যি। কিন্তু ‘মালামাল উইকলি’ দেখুন। কত বড় হিট। তারপর সেভাবে কাজ পেলাম কোথায়? হিন্দি ছবির অফার এলে তো কাজ করব! এমন কত চরিত্র দেখে মনে হয়, এটা তো আমিও করতে পারতাম। যেমন, ‘রামলীলা’-র সুপ্রিয়া পাঠকের চরিত্র। ছবিতে অফার না পেলে টিভিতে শিফট করতে হত। কতদিন আর অপেক্ষা করে থাকব? টিভিতে

আমি আবার তারকা হয়ে উঠলাম। ভাবুন তো, যাঁরা বলেছিলেন আমি নাকি ইন্ডাস্ট্রির জন্য উপযুক্ত নই তাঁরাই টেলিভিশনে আমার প্রশংসা করলেন। দর্শক তো একই। আমি যদি 'ময়ূরী'র একেবারে বিপরীত রমোলা সিকন্দ হয়ে উঠতে পারি, তাহলে নিজেকে তো প্রমাণ করলাম! প্রায় সাত-আট বছর কাজ ছিল না। অর্থনীতিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হয়ে বসে আছি, অন্য ফিল্ডেও যেতে বলেছিলেন কেউ কেউ। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে যখন এসেছি, কোনও উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি।

টিভিতে একই চরিত্রে দীর্ঘদিন অভিনয় করতে হয়। চরিত্র থেকে বেরিয়ে আসতে অসুবিধে হয়েছে?

না। আমি বরাবরই সুইচ অন-সুইচ অফ করি সহজে। কখনও কোনও চরিত্রকে বয়ে নিয়ে চলি না। নতুন প্রজেক্ট শুরুর আগে মনে মনে পরিষ্কার স্লেটে নতুন কাজের নোটস নিই।

রমোলা সিকন্দ কীভাবে গড়ে উঠলেন?

আগেই বললাম, সাত বছর কোনও কাজ ছিল না। বালাজি টেলিফিল্মস থেকে ফোন আসে। গল্প শুনতে যাই, জানতে পারি রমোলা সিকন্দের চরিত্রের জন্য ভাবা হয়েছে আমাকে। ভাবলাম, আমি কি ফিট করব এই চরিত্রে! একতা বললেন, 'আমরা তোমাকেই চাই।' আমি নেগেটিভ চরিত্র পারব কিনা ভাবতে গিয়ে মনে হল, গোপী কিষণজি আমাকে কী বলেছিলেন। তাপস পালের সঙ্গে বাংলা ছবি 'রাজনর্তকী' করছিলাম। তখন গোপীজি বলেন, আমার চোখগুলো নাকি ডাইনির মতো! তাই, একতা প্রস্তাব দেওয়ার পর রাজি হয়ে যাই নেগেটিভ চরিত্রে। এরপরে ওই প্রজেক্টটি আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে ওঠে। মাই পেশেন্স পেড মি অফ। চাইলে ওই সাত বছরে হাল ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যেতেই পারতাম। এখনকার প্রজন্মকেও বলি, সহজে হতাশ হয়ো না।

আপনি 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী' করেছেন টেলিভিশনে। বাংলার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন?

আমি প্রচুর যাত্রা করেছি বাংলায়। খুব নস্ট্যালজিক লাগে। একটি ডান্স ব্যালে করেছিলাম 'শক্তি' বলে। আমার প্রথম এন্ট্রিই ছিল স্টেজে 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী' হিসেবে। পারফরম্যান্স শেষ হওয়ার পরে মানুষ এসে আমার পা ছুঁতেন। দুর্গাপুজোয় কলকাতায় প্যান্ডেল দেখতে খুব ভাল লাগত। একটা সময়ে, নিয়মিত আসতাম। মাই আর্ট ওয়র্জ় পেট্রোনাইজ়ড ইন বেঙ্গল। এখন অনেকদিন আসা হয়নি যদিও।



অভিনেত্রী সুধা

'বাইজির বধূ' যাত্রার ১২০টা শো করেছিলাম। বাংলার কত গ্রামে-গ্রামে যেতাম। জিজ্ঞেস করতাম, এখানে লোকে আসবেন! ওঁরা বলতেন, রাতে দেখুন কী হয়। সত্যিই তাই। যত দূর চোখ যেত শুধু মানুষের মাথা দেখতে পেতাম। বাংলার সম্পর্ক শিল্পের সঙ্গে ঠিক এ রকমই। কলকাতায় যখনই আসতাম, কালীমন্দির যাওয়া ছিল মাস্ট। মন্দিরের বাইরে থেকে শাঁখা-পলা আমি কিনবই। তা সে প্লাস্টিকের হলেও, স্মৃতি হিসেবে থেকে যেত। মা তাঁত ও বাংলার সুতির শাড়ি খুব পছন্দ করতেন। ২০০৪-এ মা চলে যান। কিন্তু বাংলা থেকে কেনা ওঁর সব শাড়ি আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

এখন নতুন কী কী কাজ করছেন?

বালাজি টেলিফিল্মসের 'বেকাবু' শেষ করলাম। নতুন কাজের কথাও চলছে। কিন্তু এখনই বলতে পারব না সে ব্যাপারে। একইসঙ্গে প্রচুর মোটিভেশনাল সেশন করি। ডান্স ব্যালে করছি। অনেক ডান্স শোয়ের বিচারক হচ্ছি।

সাত বছর কাজ ছিল না। হিন্দি ছবির অফার এলে তো কাজ করব! কত চরিত্র দেখে মনে হয়, এটা আমিও করতে পারতাম।

মশলাদার মিঠাই

মিষ্টিতে মশলা! নয় কেন? মিষ্টির স্বাদ আর মশলার খাদ্যগুণকে এক করে, পুজো-মিষ্টির পাত সাজালেন ফুড **কলামনিস্ট রঞ্জনা দাস**। স্বাদের সাক্ষী **সংবেত্তা চক্রবর্তী**।



লঙ্কা ও চিজ় রসমালাই

লঙ্কা ও চিজ় রসমালাই

■ **উপকরণ:** ছানা ২৫০ গ্রাম, দুধ ১ বাটি, ঘন দুধ ১½ লিটার, চিলি ফ্লেক্স, মিক্সড হার্বস সামান্য, ঝাল লঙ্কা গুঁড়ো ২ টেবলচামচ, প্রসেসড চিজ় কিউব ৪টে। **শিরা:** চিনি ৯০০ গ্রাম, জল ৬০০ গ্রাম।

■ **প্রণালী:** ছানা ভাল করে মেখে, ছোট ছোট রসগোল্লার আকারে গড়ুন। চিনি আর জল ফুটিয়ে, শিরা বানান। রসগোল্লাগুলো শিরায় ফোটান ২০ মিনিট। হালকা রসে রাখুন, ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত। ঠান্ডা হলে, রস চিপে ১ বাটি ঠান্ডা দুধে ভেজান। তারপর ঘন দুধে রসগোল্লা, লঙ্কা গুঁড়ো, চিলি ফ্লেক্স, মিক্সড হার্বস, কনডেন্সড মিল্ক দিয়ে ঘন করে ফুটিয়ে নিন। বেকিং ডিশে ঢেলে, চিলি ফ্লেক্স, মিক্সড হার্বস দিন। চিজ় গ্রেট করে ছড়িয়ে দিন, যাতে চিজ়ের স্তর তৈরি হয়। ১০ মিনিট বেক করলেই তৈরি লঙ্কা ও চিজ় রসমালাই।



চিলি ক্ষীর টোস্ট

পাঁচফোড়ন বালুশাই

■ **উপকরণ:** ময়দা $২\frac{১}{২}$ কাপ, বেকিং পাউডার ১ চা-চামচ, ঘি $\frac{১}{২}$ কাপ। **শিরা:** চিনি $২\frac{১}{২}$ কাপ, জল $\frac{৩}{৪}$ কাপ, রোস্টেড পাঁচফোড়ন গুঁড়ো ১ টেবলচামচ, লাল লঙ্কা গুঁড়ো ২ টেবলচামচ, এলাচ গুঁড়ো $\frac{১}{২}$ চা-চামচ, কেশর ও পেস্তা কুচি স্বাদমতো। **ভাজার জন্য:** সাদা তেল অথবা ঘি।

■ **প্রণালী:** ময়দা, বেকিং পাউডার এবং ঘি দিয়ে মাখুন। ভাল করে না ঠেসে, শুধু একসঙ্গে জড়ো করে ময়দাটা মাখতে হবে, সামান্য জল দিয়ে। ডো ঢেকে রাখুন ২০ থেকে ২৫ মিনিট। চিনি আর জল ফুটিয়ে, শিরা বানান। ২০ মিনিট পর ডো আবার মাখুন হাত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে। চাপ দিয়ে মাখা যাবে না। এরপর ছোট ছোট গোল্লা পাকান হাতের সাহায্যে। মাঝখানে বুড়ো আঙুল দিয়ে গর্ত করুন। প্রতিটা বালুশাই হালকা গরম তেল বা ঘিয়ে উল্টেপাল্টে ভাজুন। হয়ে গেলে, চিনির রসে ডুবিয়ে রাখুন কিছু ক্ষণ। পেস্তা কুচি দিয়ে সাজিয়ে নিন।



পাঁচফোড়ন বালুশাই

চিলি ক্ষীর টোস্ট

■ **উপকরণ: ডো:** ছানা ২৫০ গ্রাম, চিনি ১ টেবলচামচ, ময়দা ১ টেবলচামচ। **চিনির শিরা:** চিনি ২ কাপ, জল ৬ কাপ। **ক্ষীর:** গুঁড়ো দুধ ১ কাপ, কনডেন্সড মিল্ক $\frac{১}{২}$ কাপ, লঙ্কা গুঁড়ো ১ টেবলচামচ, আদা গুঁড়ো $\frac{১}{২}$ চা-চামচ। **গার্নিশিং:** শুকনো গুঁড়ো মাওয়া।

■ **প্রণালী:** ডো-এর সব উপকরণ মেখে, বল বানান। শিরার উপকরণ ফুটতে দিন। চিনি গলে গেলে, ছানার বলগুলো শিরাতে ছেড়ে দিন। ঢাকা দিয়ে, ১০ মিনিট ফোটান। মিষ্টিগুলো উল্টেপাল্টে আরও ১২ মিনিট ফোটান ঢাকা দিয়ে। মিষ্টি হলে, রসেই ঠান্ডা করুন। তারপর মাঝখান থেকে দু'ভাগ করুন। ক্ষীরের পুর দিয়ে, দুটো খণ্ডকে চাপা দিন। মাওয়ায় গড়িয়ে নিন।



খেজুর-কমলা-দারচিনির মুখমিষ্টি

খেজুর-কমলা-দারচিনির মুখমিষ্টি

■ **উপকরণ: ডো:** ময়দা ৫০০ গ্রাম, গুঁড়ো চিনি ৭০ গ্রাম, বেকিং পাউডার ১ চা-চামচ, নুন, না-গলানো মাখন ২৫০ গ্রাম, ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা-চামচ, জল ৬০ মিলি+অরেঞ্জ জুস ৬০ মিলি। **পুর:** খেজুরের পেস্ট ২০০ গ্রাম, জল, সাদা তেল ১ টেবলচামচ, মাখন ১ টেবলচামচ, লঙ্কা গুঁড়ো ১ টেবলচামচ, দারচিনি গুঁড়ো ১ টেবলচামচ, জিরে গুঁড়ো ১ টেবলচামচ।

■ **প্রণালী:** ডো-এর সব উপকরণ মেখে, ডো বানিয়ে নিন। ক্লিং র‍্যাপে মুড়ে, ফ্রিজে রাখুন ৪ ঘণ্টা। খেজুরের পেস্ট বাকি সব উপকরণ দিয়ে ভাল করে মেখে, পাইপিং ব্যাগে ভরুন। মণ্ড থেকে ছোট ছোট গোলা তৈরি করে, লম্বা করে বেলুন। খেজুরের পেস্ট যে কোনও একটি কোণে পাইপ করে, রোল করে লম্বা পেন্সিলের মতো বানান। সামান্য গোল করে, দুটো মুখ একসঙ্গে জুড়ে দিন। চিমটে দিয়ে গোলের গায়ে ডিজ়াইন করে নিন। ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ২০ মিনিট বেক করলেই তৈরি!



পানিপুরি মশলা গুজিয়া

■ **উপকরণ: ডো:** ময়দা ২ কাপ, দেশি ঘি ১/৪ কাপ। **পুর:** গ্রেটেড পনির ২০০ গ্রাম, ঘি ২ টেবলচামচ, কনডেন্সড মিল্ক ১/২ কাপ, আমচুর পাউডার ১ টেবলচামচ, কোকোনাট পাউডার ২ টেবলচামচ, জিরে গুঁড়ো ১ টেবলচামচ, লঙ্কা গুঁড়ো ২ টেবলচামচ, রোস্ট করা গোটা জিরে ২ টেবলচামচ, রোস্ট করা গোটা ধনে ২ টেবলচামচ, নুন এবং গুঁড়ো চিনি সামান্য, কিশমিশ এবং কাজুবাদাম কুচি কিছুটা, পানিপুরি মশলা ১ টেবলচামচ। **শিরা:** চিনি ১ কাপ, জল ৩/৪ কাপ।

■ **প্রণালী:** চিনি আর জল ফুটিয়ে, শিরা বানিয়ে রাখুন। ময়দা, ঘি এবং সামান্য জল দিয়ে একটু শক্ত করে ডো মেখে রাখুন। ঢেকে রাখুন আধঘণ্টা। সামান্য ঘি-তে পনির কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করে, পুরের বাকি উপকরণ দিন। নরম আঁচে খুব ভালভাবে মিশিয়ে নিন। ঠান্ডা করতে দিন। ডো থেকে ছোট ছোট লেচি করে, লুচির আকারে বেলে নিন। পুর ভরে, গুজিয়া গড়ুন। সাদা তেলে ভেজে, শিরাতে রাখুন কিছু ক্ষণ। পেস্তা কুচি ছড়িয়ে, পরিবেশন করুন।

> পানিপুরি মশলা গুজিয়া

টু-ইন-ওয়ান কালাকাঁদ

■ **উপকরণ:** ছানা ২৫০ গ্রাম, কনডেন্সড মিল্ক ১/২ কাপ, গুঁড়ো দুধ ২ টেবলচামচ, পান মশলা ১ টেবলচামচ, থেঁতো করা পেপারমিন্ট ৫-৬টা, টুটি ফ্রুটি ২ টেবলচামচ, ঝাল লঙ্কা গুঁড়ো ১ টেবলচামচ, সেঁকা ধনে গুঁড়ো ১ চা-চামচ, সেঁকা মৌরি গুঁড়ো ১ চা-চামচ, ফ্ল্যাক্স সিড ১ চা-চামচ, ছোট কলাপাতা ১টা, ঘি সামান্য।

■ **প্রণালী:** ছানা, কনডেন্সড মিল্ক, গুঁড়ো দুধ ভাল করে মিক্সিতে পেস্ট করুন একসঙ্গে। মিশ্রণ কড়াইতে ভাল করে, একদম অল্প আঁচে পাক দিয়ে, সন্দেশ বানান। ঠান্ডা হলে, দু'ভাগ করুন। এক ভাগে মেশান পান মশলা, পেপারমিন্ট, টুটি ফ্রুটি, লঙ্কা গুঁড়ো। অন্য ভাগে মেশান ধনে এবং মৌরি গুঁড়ো। ঘি ব্রাশ করা কলাপাতায় দু'টি সন্দেশের ডো পর পর রেখে, ফ্ল্যাক্স সিড ছড়িয়ে, রোল করুন। ফ্রিজে রাখুন তিন-চার ঘণ্টা। তারপর টুকরো করে কেটে নিন।



টু-ইন-ওয়ান কালাকাঁদ



মধু-মরিচ মোহিনী

মধু-মরিচ মোহিনী

■ **উপকরণ: ময়দা মাখার জন্য:** ময়দা ৫০০ গ্রাম, ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা-চামচ, বেকিং পাউডার ১ চা-চামচ, নুন ১/২ চা-চামচ, গলানো মাখন ১২৫ গ্রাম, ডিম ১টা, ডিমের সাদা অংশ কিছুটা, হোয়াইট ভিনিগার ১ টেবলচামচ, অরেঞ্জ জুস ১৪০ মিলি। **পুর:** সাদা তিল ৩ টেবলচামচ, লঙ্কা গুঁড়ো ১ টেবলচামচ, আদা গুঁড়ো ২ চা-চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো ১ টেবলচামচ, মধু ৪ টেবলচামচ, **ময়দা মাখার জন্য:** সাদা তেল।

■ **প্রণালী:** ময়দা মাখার সব উপকরণ মাখুন। দু'ভাগ করে ক্লিং র‍্যাপে মুড়ে, দু'ঘণ্টা ফ্রিজে রাখুন। দু'টি মণ্ডকে আলাদাভাবে, ময়দা ছড়িয়ে, লম্বা আকারে দু'দিক থেকে ভাঁজ করে বেলে নিন। ক্লিং র‍্যাপে মুড়ে, ফ্রিজে রাখুন ১০ মিনিট। চৌকো করে কাটুন। তিনটে টুকরোকে একসঙ্গে করে, ধারগুলো কাটুন। টুকরোগুলোকে পর পর রেখে, মাঝে ডিমের সাদা মাখান। একসঙ্গে রেখে, বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে আটকে দিন। শুকনো কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখুন কিছু ক্ষণ। ভেজে, মধু ছড়ান। সাদা তিল ড্রাই রোস্ট করুন। শুকনো লঙ্কা, আদা, গোলমরিচ গুঁড়ো মেশান। মিষ্টির ভিতরে পুর ভরে দিন।



গোটা মশলার নান খাটাই

গোটা মশলার নান খাটাই

■ **উপকরণ:** ময়দা ২০০ গ্রাম, বেসন ১০০ গ্রাম, সুজি ১ টেবলচামচ, চিনি ২০০ গ্রাম, ঘি ২০০ গ্রাম, বেকিং পাউডার ১ চা-চামচ, এলাচ গুঁড়ো ১ ১/২ চা-চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, জিরে গুঁড়ো ১ চা-চামচ, গোটা জিরে ১/৪ চা-চামচ, গোটা জোয়ান ১/৪ চা-চামচ।

■ **প্রণালী:** ঘি গলিয়ে নিন। সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে, ফ্রিজে রাখুন আধঘণ্টা। তারপর ছোট ছোট বল তৈরি করে, ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে প্রি-হিটেড আভেনে ১০ মিনিট বেক করুন। গরম চায়ের সঙ্গে দারুণ লাগবে!

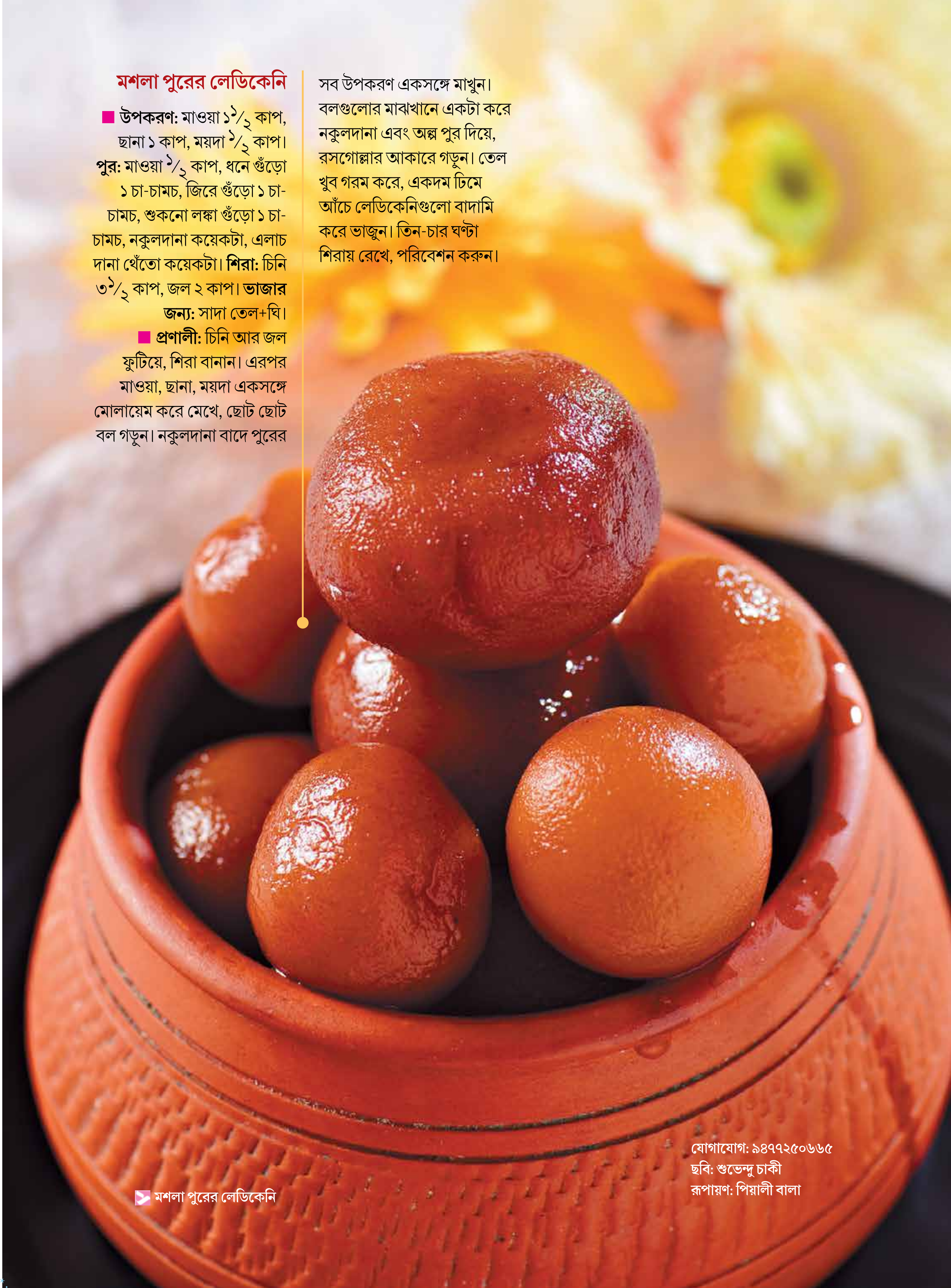


সুইট অ্যান্ড স্পাইসি খাজা

■ **উপকরণ: ডো:** ময়দা ১ ১/২ কাপ, ঘি ৩ টেবলচামচ, জল পরিমাণমতো, গোলমরিচ গুঁড়ো ২ চা-চামচ, লঙ্কার গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, এলাচ গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, জিরে গুঁড়ো ১ টেবলচামচ। **শিরা:** চিনি ১ ১/২ কাপ, জল ৩/৪ কাপ, লঙ্কা গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ। **রুটিতে মাখানোর জন্য:** ঘি ৩ চা-চামচ, ময়দা ১ চা-চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা-চামচ। **ভাজার জন্য:** সাদা তেল পরিমাণমতো।

■ **প্রণালী:** ময়দার সঙ্গে ডো-এর সব উপকরণ দিয়ে, মেখে নিন। শুকনো কাপড়ে ঢেকে রাখুন ১৫ মিনিট। তিন খণ্ডে ভাগ করে, তিনটে খুব পাতলা, বড় রুটি বেলুন। ১ চা-চামচ করে ঘি মাখিয়ে, ময়দা এবং শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো ডাস্ট করুন। লম্বা স্ট্রিপের মতো রোল করে, ছোট ছোট টুকরো করে কাটুন। টুকরোগুলো থেকে খাজা বেলে, ভেজে নিন। শিরায় দু'মিনিট কোট করে, পরিবেশন করুন।

সুইট অ্যান্ড স্পাইসি খাজা



মশলা পুরের লেডিকেনি

■ **উপকরণ:** মাওয়া ১ ১/২ কাপ, ছানা ১ কাপ, ময়দা ১/২ কাপ। **পুর:** মাওয়া ১/২ কাপ, ধনে গুঁড়ো ১ চা-চামচ, জিরে গুঁড়ো ১ চা-চামচ, শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা-চামচ, নকুলদানা কয়েকটা, এলাচ দানা থেঁতো কয়েকটা। **শিরা:** চিনি ৩ ১/২ কাপ, জল ২ কাপ। **ভাজার জন্য:** সাদা তেল+ঘি।

■ **প্রণালী:** চিনি আর জল ফুটিয়ে, শিরা বানান। এরপর মাওয়া, ছানা, ময়দা একসঙ্গে মোলায়েম করে মেখে, ছোট ছোট বল গড়ুন। নকুলদানা বাদে পুরের সব উপকরণ একসঙ্গে মাখুন। বলগুলোর মাঝখানে একটা করে নকুলদানা এবং অল্প পুর দিয়ে, রসগোল্লার আকারে গড়ুন। তেল খুব গরম করে, একদম ঢিমে আঁচে লেডিকেনিগুলো বাদামি করে ভাজুন। তিন-চার ঘণ্টা শিরায় রেখে, পরিবেশন করুন।

▶ মশলা পুরের লেডিকেনি

যোগাযোগ: ৯৪৭৭২৫০৬৬৫
ছবি: শুভেন্দু চাকী
রূপায়ণ: পিয়ালী বালা



‘আনন্দ’-এ অপরূপা

দেবী শক্তির আরাধনায় মর্ত্যে সাজো-সাজো রব। আনন্দময়ীর আগমনে কখনও সাবেকি ধারায়, আবার কখনও আধুনিকা রূপে ‘আনন্দ’ শাড়ির ক্যানভাসে ধরা দিলেন অভিনেত্রী অঙ্কিতা মল্লিক ও সৃজলা গুহ। সাক্ষী রইলেন মৌমিতা সরকার।



■ (বাঁ দিকের পাতা) অলওভার সোনালি জ়রির জালিকা ডিজ়াইন করা ধূসর রঙের কাতান বেনারসি শাড়ি। কনট্রাস্টিং গোলাপি পাড় ও আঁচলে জ়রির কাজ। (ডান দিকের পাতা) পার্পল সিল্ক গাদোয়াল শাড়ি। জ়রির কাজ করা টারকোয়াজ় ব্লু পাড় ও আঁচল। জমি জুড়ে জ়রির ফুলের ডিজ়াইন।

ব্লাউজ়: ভি কাট দ্য ব্লাউজ় এক্সপার্ট, **ফোন:** ৯৮৩১০৯৮৮৩০, **গয়না:** আভামা জুয়েলার্স, **ফোন:** ৯৮৩০৩৯৯৪৬২



■ কমলা সিল্ক শাড়ির জমি জুড়ে ছোট ছোট কালো ডট ও ফ্লোরাল মোটিফ। পাড় ও আঁচলে নীল ও কমলা উজ্জ্বল কনট্রাস্টে নজরকাড়া ফ্লোরাল ডিজ়াইন। পুজোর এক্সক্লুসিভ শাড়ি কালেকশনে এই শাড়িটি রাখতেই পারেন।

গয়না: করিশ্মাজ়, গোলপার্ক, **ফোন:** ৮৬৯৭১১৩৩৬৭



■ সফ্‌ট তসর শাড়িতে অলওভার জ়রি বুটি। চওড়া মেরুন পাড়ে ‘আনন্দ’ এক্সক্লুসিভ ফ্লোরাল ডিজ়াইন।

গয়না: করিশ্মাজ়
ব্লাউজ়: ভি কাট, দ্য ব্লাউজ় এক্সপার্ট



বেনারসের এক্সক্লুসিভ কটন টিসু জামদানি শাড়ি। জমিতে নিয়ন পিঙ্ক, গ্রিন ও পিচ হরেক রঙের ফ্লোরাল ডিজ়াইন। পিচ স্লিভলেস ব্লাউজ় ও মুক্তোর গয়নায় গ্ল্যাম লুক।



■ সিল্ক শাড়িতে ধূসর রঙের তাঞ্চোই প্রিন্ট। পাড় ও আঁচলে বড় বড় ফ্লোরাল ডিজ়াইন। অন্যদিকে শাড়ির জমিতে অলওভার মাস্টার্ড কালার জালিকার মতো ফ্লোরাল ডিজ়াইন। রুপোর গয়নার সহযোগে আধুনিকা সাজে।

গয়না: করিশ্মাজ়, গোলপার্ক



■ গ্রে-ইশ মভ কাতান বেনারসি শাড়িতে অলওভার ইউরোপিয়ান আর্টের অনুপ্রেরণায় মিনাকারি কাজের জালিকা ডিজ়াইন। পাড় ও আঁচলেও জ়রি ফ্লোরাল ডিজ়াইন। সঙ্গে জ়রির এমব্রয়ডরি কাজ করা পার্পল ব্লাউজ় ও কুন্দনের গয়নার সাজ। হেয়ারস্টাইলিংয়ে ফুলের সাজ, স্নিগ্ধ রূপ।



■ ডার্ক অনিয়ন পিঙ্ক চান্দেরি বেনারসি শাড়িতে জ়রি ও রেশমের সূক্ষ্ম কাজ। পাড় ও আঁচলেও একই রকম অপূর্ব ভরাট কাজ।



বেনারসের হালকা গোলাপি শিফন জর্জেট শাড়িতে বালুচরি স্টাইলে মাল্টিকালার মানুষ ও পাখির মোটিফ। পাড় ও আঁচলেও একই ডিজ়াইন। ডানদিকে অন্যজন পরেছেন সরু গোলাপি পাড়ের অলওভার সিলভার জ়রি কাজ করা সি গ্রিন স্পান সিল্ক বেনারসি।

গয়না: আভামা জুয়েলার্স



■ বেজ় কালার গাদোয়াল সিল্ক শাড়ি জুড়ে সোনালি বুটির কাজ। এর সঙ্গে কনট্রাস্ট করে রাখা হয়েছে সবুজ বুটি। পাড় ও আঁচলে লালের উপর ভরাট জ়রির কাজ। টেম্পল গয়নার সঙ্গে পুজোর সন্ধ্যার উজ্জ্বল সাজ।

গয়না: আভামা জুয়েলার্স।

শাড়ি: আনন্দ , কুইন্‌স ম্যানসন, ১৩ রাসেল স্ট্রিট , কলকাতা-৭০০০৭১, ফোন: ০৩৩ ২২২৯২২৭৫, ৯৬৭৪৩৯২২৭৫

ছবি: সোমনাথ রায়, **মেক-আপ ও হেয়ার:** বাবুসোনা সাহা, **ফোন:** ৮২৪০৫৫০৮৮৪, **স্টাইলিং, ব্লাউজ় ও গয়না:** মাধব, **ফোন:** ৯৮৭৫৩৭৬৯৭৮, **রূপায়ণ:** অসীম হালদার



চোখে পাখির রং...

কবি বলেন, ''পাখির নীড়ের মতো চোখ''। **কিন্তু নীড় নয়, এবারের পুজোয় চোখে থাকুক পাখির পালকের ক্যানভাস। উৎসবের মরসুমে মন থাকে পাখির মতো মুক্ত, রঙিন। প্যালেট সাজালেন পিয়ালী বালা।**

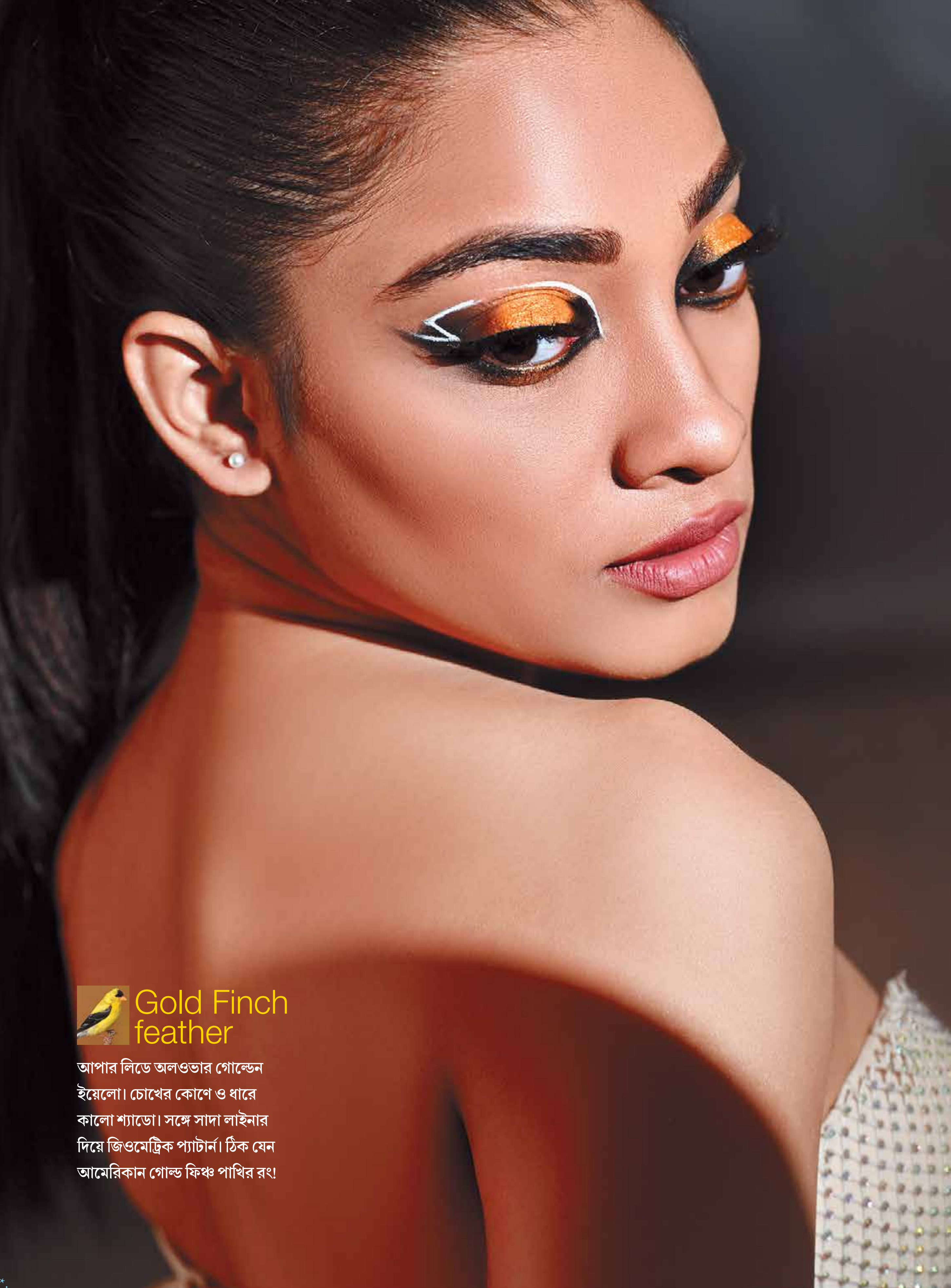


Parrot love

টিয়াপাখির রঙের মতো আই মেক-আপ। আইলিডে সবুজ শ্যাডো। চোখের কোণে ও ধারে হলুদ ও লাল শ্যাডোর টাচ।

Grey Parrot

আই মেক-আপে ঠিক যেন গ্রে প্যারটের পালকের ছোঁয়া! আপার লিডে গ্রে আই শ্যাডো। ধারে কালো আই শ্যাডো দিয়ে স্মাজ করা। হাইলাইট এরিয়াতে সিলভার টোন।



Gold Finch feather

আপার লিডে অলওভার গোল্ডেন ইয়েলো। চোখের কোণে ও ধারে কালো শ্যাডো। সঙ্গে সাদা লাইনার দিয়ে জিওমেট্রিক প্যাটার্ন। ঠিক যেন আমেরিকান গোল্ড ফিঞ্চ পাখির রং!



Bright Badrika

আই মেক-আপে ধরা দিল ছোট্ট মিষ্টি বদ্রি পাখির পালকের শেড। আপার ও লোয়ার আইলিডে সি-গ্রিন আই শ্যাডো। চোখের কোণে হলুদের আভা।



Macaw magic

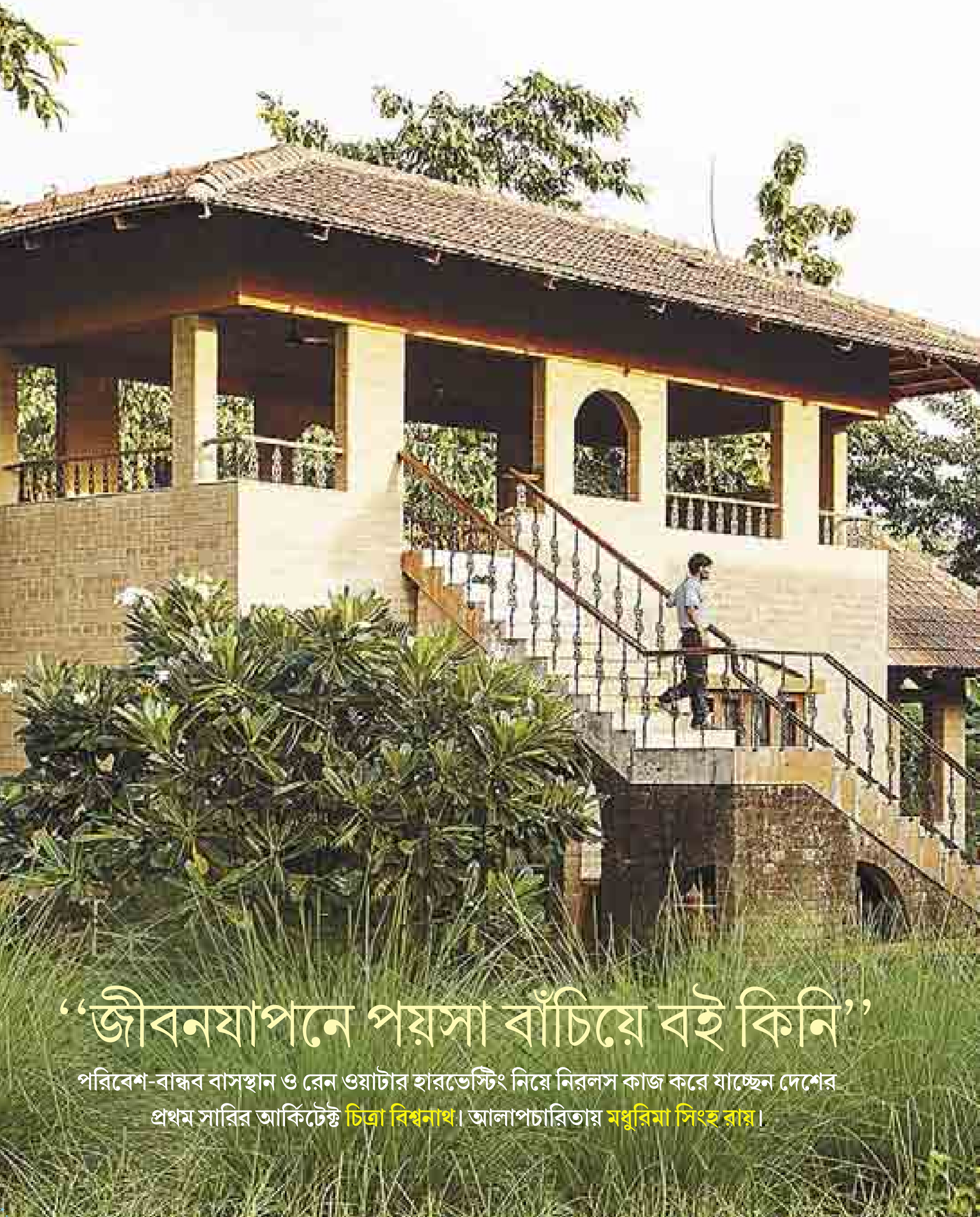
ম্যাকাও পাখির পালকের রঙের মতো সাজানো হয়েছে চোখের পাতা। রয়েছে কমলা, লাল ও নীল আইশ্যাডোর মিশেল।



Peacock Passion

ময়ূরকণ্ঠী রঙের আই মেক-আপ। আপার লিড ও হাইলাইট এরিয়াতে পিকক ব্লু আই শ্যাডো। সঙ্গে শিমারি ব্লুয়ের স্মাজিং।

মডেল: রভিরা, মধুরিমা, উদিতা
মেক-আপ ও হেয়ার: নবীন দাস
ফোন: ৯৮৩১২৩৩৬১৮
পোশাক: কিয়ারা সেন
ফোন: ৯০৫১৪৭৩৬০৬
ইয়ারিং: ইমেজ এন স্টাইল
ফোন: ৯০৫১০৯৮৭৪৪
ছবি: সোমনাথ রায়
শুটিং কো-অর্ডিনেশন:
মৌমিতা সরকার



‘‘জীবনযাপনে পয়সা বাঁচিয়ে বই কিনি’’

পরিবেশ-বান্ধব বাসস্থান ও রেন ওয়াটার হারভেস্টিং নিয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন দেশের প্রথম সারির আর্কিটেক্ট **চিত্রা বিশ্বনাথ**। আলাপচারিতায় **মধুরিমা সিংহ রায়**।

১৯৯০ থেকে ২০২৩...পেশাদার আর্কিটেক্ট হিসেবে প্রায় ৩৩ বছরের সুদীর্ঘ সফর। এই দীর্ঘ যাত্রাপথ ফিরে দেখলে কেমন লাগে?

ইটস অ্যান এক্সহিলারেটিং জার্নি। কিছুদিন আগেই আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন, সুযোগ পেলে আমি আবার একই কাজ করব কিনা। আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। তারপর আমদাবাদ থেকে আর্কিটেকচার নিয়ে পড়াশোনা। কীভাবে শুরু হল এই পেশায় আপনার সফর?

আমার বাবা স্কাল্পটর ছিলেন। উনিই আমাকে বলেন স্থাপত্য নিয়ে পড়াশোনা করার কথা। উনি ভাল করেই জানতেন এই পেশার ব্যাপারে। বিয়ের পর ব্যাঙ্গালোরে (তখনকার নাম) প্র্যাকটিস করতে শুরু করি। এক বছর অফিসে কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিজের ফার্ম খুলি। ছোট্ট বাচ্চা তখন। সংসার আর সন্তান সামলে ছোট ছোট প্রজেক্ট দিয়ে কাজ শুরু করি। ব্যাঙ্গালোর শহরটা আমাকে বিবিধ ইকো-সিস্টেমের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিল। নতুনভাবে ভাবতে শিখিয়েছিল।

বিয়ের পরে তাহলে পেশাজীবন শুরু করেছিলেন?

হ্যাঁ। একদমই। শহরের পেশাদার ইকো-সিস্টেমের কথা বললাম আপনাকে। বাড়িতেও কিন্তু আমার ইকো-সিস্টেম খুব শক্তিশালী ছিল (হাসি)। আমার শাশুড়ি আমাকে বলতেন, বাড়ি বসে না থেকে কাজ করতে। আমার শ্বশুরমশাই সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, শ্যালক স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার। আমার স্বামীও (এস বিশ্বনাথ) সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। এখনও প্রতি মুহূর্তে শ্বশুরবাড়ির মানুষেরা আমায় সমর্থন করেন।





২০১২-য় তৈরি গোবর্ধন ইকো ভিলেজ প্রজেক্ট

এখন গ্রিন লিভিংয়ের ব্যাপারে চর্চা



ইকো হাউজ়

হয়। নয়ের দশকে যখন কাজ শুরু করেন, সেই সময়ে লোকজনকে এ ব্যাপারে সচেতন করতে কতটা কষ্ট করতে হয়েছিল?

বেশ ভাল প্রশ্ন। এখানেও আমি শহর ও শহরের মানুষদের কৃতিত্ব দেব। শুরুর দিকে আমি যে বাড়িগুলো ডিজ়াইন করতে পেতাম, সেগুলো একটু প্রান্তিক অঞ্চলে। কারণ জমি ওখানে সস্তা ছিল। কিন্তু সেখানে ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট সংক্রান্ত কোনও মজবুত পরিকাঠামো ছিল না। তাই বাড়িগুলিকে এমনভাবে ডিজ়াইন করতে হত, যাতে বাড়িতেই জলের উৎস তৈরি হয়। রেন ওয়াটার হারভেস্টিং নিয়ে কাজ শুরু করি। আমার স্বামীও একই বিষয় নিয়ে কাজ করতেন। ব্যাঙ্গালোর শহরটা সারা বছর বৃষ্টির জল ধরে রাখত। ওয়েস্ট ওয়াটার বা উদ্বৃত্ত, অব্যবহৃত জলকে পুনরায় ব্যবহার করা হত। এই রি-ইউজ়ালের পদ্ধতি আমি নিজের বাড়িতেই আগে প্রয়োগ করি।

বেঙ্গালুরুতে আপনার নিজস্ব বিস্তৃত মাড হাউজ় আছে। কীভাবে তৈরি হল? কীই বা এর বৈশিষ্ট্য?

১৯৯৫ সালের কথা। একটি প্লট দেখতে এসে দেখি এক প্রতিবেশির বাড়ি তৈরি হচ্ছে। স্থানীয় মাটি খুঁড়েই। ভেবে নিই, ওখানে বেসমেন্ট বানাব, ওখানকার মাটির ভিতেই। সেই প্রথম আমি বেসমেন্ট ডিজ়াইন করি। মাটি দিয়ে উপরের কাঠামো নির্মাণ করি। শহরে ওই প্রথমবার কোনও বাড়ি তৈরি হল, তারই ভিতের মাটি দিয়ে। মাটি অন্য জায়গা থেকে সোর্স করতে হয়নি। ইটস অ্যান অল ওয়েদার বেসমেন্ট। সারা বছর ২২ ডিগ্রি তাপমাত্রা। এটিই পরে আমার ডিজ়াইন দর্শনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়...টু সোর্স আর্থ আন্ডারগ্রাউন্ড, ফর কনস্ট্রাকশন। বাড়ি বানানোর অন্তত ৫০ শতাংশ মেটেরিয়াল শহরের কাছেপিঠে থেকেই জোগাড় করতাম। বেশিরভাগ শহরেই, বিশেষত বেঙ্গালুরুতে, জল আসে অনেক দূর



VAY রিট্রিটস

থেকে। কিন্তু বৃষ্টির জল ধরে রাখতে পারলে তা দিয়েই রান্না, ধোওয়া-মোছা, জল পান করা সব সম্ভব। আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাঙ্ক ডিজ়াইন করি। বেঙ্গালুরুতে যদিও একাধিক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট আছে। কিন্তু শহরের অনতিদূরে যেখানে তা নেই, সেখানে ওয়েস্ট ওয়াটার ব্যবহার করার চেষ্টা করি। ছাদে এই উদ্বৃত্ত জল ব্যবহার করে সবজি ফলাতে পারেন। আমার স্বামী অ্যাঞ্জেলা মার্কলের থেকে পুরস্কার পেয়েছিলেন, ছাদে ধান ফলানোর জন্য! আর ঘরকে ঠান্ডা রাখতেও সাহায্য করে এই পদ্ধতি। সবজি, লেবুও ফলাই ছাদে। প্রচুর পাখি, প্রজাপতি দেখতে পাবেন এলে। ইটস আ প্লেস ফর বায়োডাইভার্সিটি। ২৭ বছর কাটিয়ে দিলাম এই বাড়িতে।

আপনার ও আপনার পরিবারের জন্য পরিবেশ সচেতনতা জীবনযাপনের সমার্থক...

আলাদা করে ইকো-কনশাস হয়েছি তেমনটা নয়। কিন্তু এই যাপন আমার জন্য কমফর্টেবল। বাড়িতে কোনও এসি নেই। তিন বছর হল ফ্যান লাগিয়েছি। আগে তা-ও লাগত না। আমাদের কোনও গাড়ি নেই। প্রচুর হাঁটি। তাই আলাদা করে জিমে গিয়ে এক্সারসাইজ় করতে হয় না। এভাবেই কত মানুষের সঙ্গে কানেক্ট করতে পারি। বাসে চাপলে শহরের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ে। সত্যি বলতে, এখানে পয়সা বাঁচিয়ে বই কেনার পিছনে খরচ করি (হাসি)।



অ্যাটেলিয়র স্কুল

নয়ের দশকের শুরুর দিকের কথা। ছোট বাচ্চা আমার তখন, খুব বেশি ছোটাছুটি করে নেটওয়র্কিংও করতে পারছি না। তাই, মধ্যবিত্তদের জন্য ছোট বাড়ি বানানোর প্রজেক্টই আসত। ইট ক্রিয়েটেড অ্যান ইম্পর্টেন্ট ব্রেক থ্রু।



বেঙ্গালুরুতে নিজস্ব মাড হাউজ়

ইকো ফ্রেন্ডলি বাড়ি অনেকটাই সাশ্রয়ীও।

ইট হ্যাজ় টু বি কস্ট এফেক্টিভ। আমি এভাবে দেখি, বাড়ি যত দামী হবে তত তার ইএমআই মেটাতে বেশিদিন চাকরি করতে হবে। ইট উইল বি আন-ইকোলজিক্যাল। তাই, পরিবেশ-সহায়ক বাড়ি অনেক ভাল অপশন।

দীর্ঘ কেরিয়ারে কোনও প্রজেক্টের কথা আলাদা করে উল্লেখ করতে চাইবেন?

বায়োম এনভায়রনমেন্টাল সলিউশনসের অফিস যখন তৈরি হয়েছিল ছোট বাচ্চা আমার তখন। খুব বেশি ছোটাছুটি করে নেটওয়র্কিংও করতে পারছি না। তাই, মধ্যবিত্তদের জন্য ছোট বাড়ি বানানোর প্রজেক্টই আসত। ইট ক্রিয়েটেড অ্যান ইম্পর্টেন্ট ব্রেক থ্রু। সদ্য গ্র্যাজুয়েট হওয়া তরুণ ইঞ্জিনিয়রদের সঙ্গে কাজ করতে করতে দারুণ একটা টিম তৈরি হয়ে যায়। সেরেনডিপিটি বলতে পারেন একে। ওই টিমের সঙ্গেই গত ৩০ বছর ধরে কাজ করছি। ক্লায়েন্টের বাড়ির মেয়েরা আমার সঙ্গে কাজ করতে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত। আর ছোট ছোট বাড়ির ক্ষেত্রে প্রতিটার ডিজ়াইন আলাদা হত। বড় প্রজেক্টের মধ্যে বলব, গোবর্ধন ইকো ভিলেজের কথা। মুম্বই থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে ৬৩ একরের প্রজেক্ট ছিল এটি। পরে ৮০ একরের উপর হয়ে যায়। ইস্কন-এর সন্ন্যাসীদের জন্য থাকার জায়গা, তাঁদের অডিটোরিয়াম, ছোট মন্দির, আয়ুর্বেদিক স্পা...সব মিলিয়ে কমিউনিটি লিভিংয়ের ব্যবস্থা।



রেসিডেনশিয়াল প্রজেক্ট



ওল্যান্ড এস্টেট

ইটের বদলে শুধু মাটির কাঠামো চেয়েছিলেন ওঁরা। এ ধরনের কাজ জানা ইঞ্জিনিয়রদেরও পাইনি তখন, ফলে বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল। ভোপালে একটি প্রজেক্টে একদম আলাদা জলবায়ুতে কাজ করেছিলাম। মাটি সোর্স করতে হয়েছিল অন্য জায়গা থেকে। এই প্রজেক্টের জন্য অনুরাগ তমহানকর ও গোবর্ধন ইকো ভিলেজের জন্য শরদ নায়েকের কথা উল্লেখ করতে চাইব, আমার টিমের।

কলকাতাতেও তো কাজ করেছেন?

হ্যাঁ, একটাই প্রজেক্ট করেছি। আপনি হয়তো জানেনও। শ্রীকান্ত আচার্যর বাড়ি। ওঁর স্ত্রী অর্ণা আমাকে অ্যাপ্রোচ করে। রিচা বসু খুব সাহায্য করেছিলেন, মেটিরিয়াল জোগানের ক্ষেত্রে। শ্রীকান্ত আমার অফিসে বসে গান গেয়েছিলেন (হাসি)! আসলে যত বড় প্রজেক্টই করি না কেন, রেসিডেনশিয়াল প্রজেক্ট বরাবর আগ্রহের জায়গা আমার। বেঙ্গালুরুর বাইরে এটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ আমার।

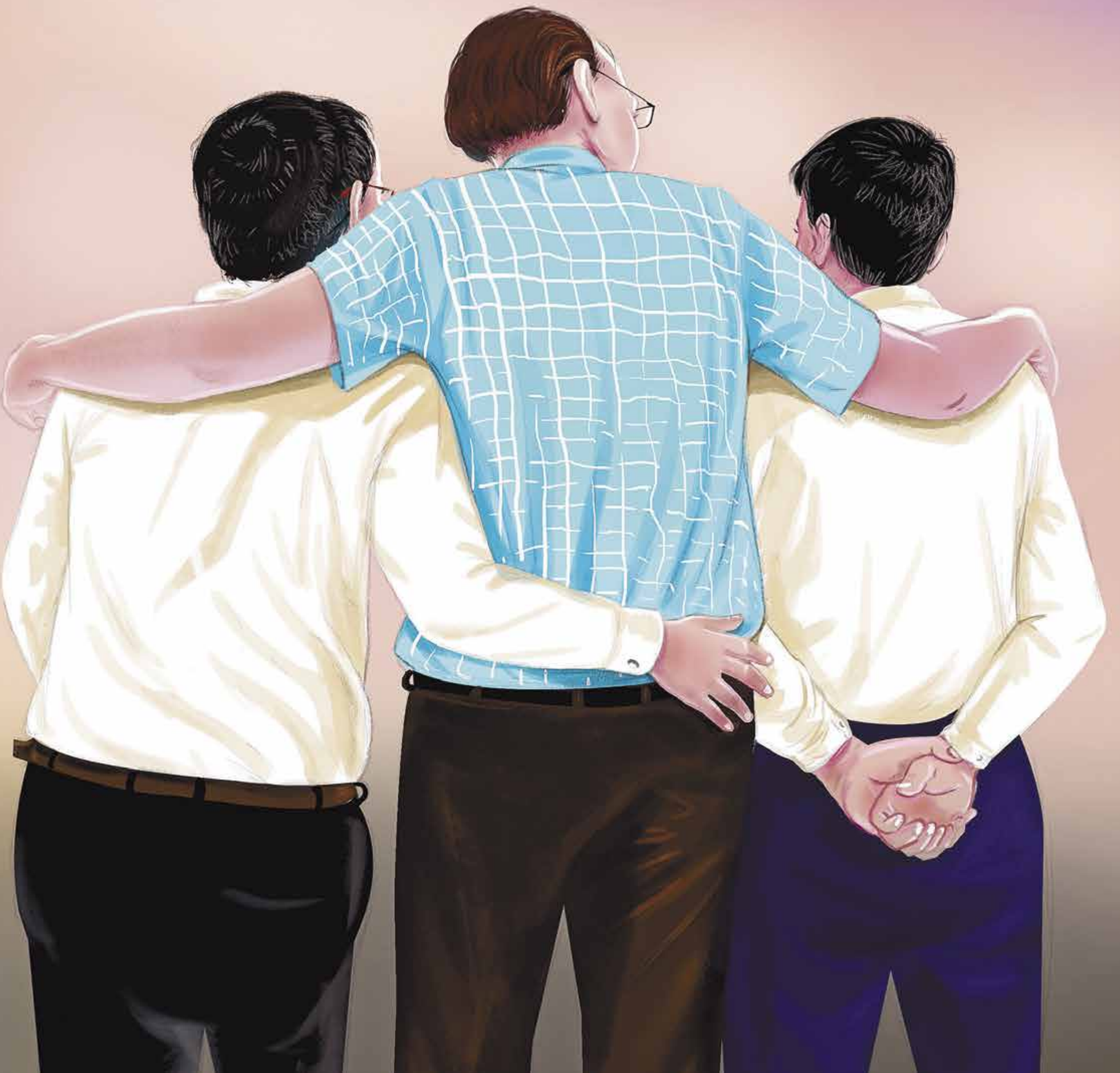
আপাতত কী কী বিষয় নিয়ে ব্যস্ত আপনি?

পরিবারের দিক থেকে বলব, নাতনির ভিডিও দেখে অবসর কাটে। ১৭ মাস বয়স। সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘণ্টাখানেক বাড়ির কাজ করে, ১১টার মধ্যে অফিসে চলে যাই। সাতটার মধ্যে ফিরি। প্রচুর ট্র্যাভেল করি, সমুদ্রে বিশেষ করে। নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়। আর কাজের দিকে, বড় ল্যান্ড পার্সেল নিয়ে কাজ করছি। কার্বন নিউট্রালিটি ও কার্বন সিকুয়েস্ট্রেশন-এর উপর ফোকাস করে। বড় বড় প্লটে বড় বাড়ি নিশ্চয়ই করা সম্ভব, তবে কীভাবে তা ইকোলজিক্যালি ব্যালান্সড হবে, সেদিকে নজর দেওয়া জরুরি।

ছবি সৌজন্যে: বিবেক মুথুরামালিঙ্গম

শান্ত স্যার

শাশ্বতী নন্দী



কাবার্ডের পাল্লাটা হাট করে খুলে দিলেন শান্ত স্যার। হ্যাঁ, ওই নামেই উনি খ্যাত ছাত্র মহলে। আসল নাম, শান্তনু মুখোপাধ্যায়। ইতিহাস তাঁর বিষয় হলেও, ইতিহাসের গণ্ডি পেরিয়ে ভূগোল, সাহিত্য, মহাকাশ বিজ্ঞান, রামায়ণ-মহাভারত, ইলিয়াড-ওডিসির অরূপ কথা... কোথায় তিনি নেই! কিন্তু এ মাসের একত্রিশেই তাঁর লাস্ট ক্লাস। তিনি চলে যাচ্ছেন এ স্কুল থেকে। যাচ্ছেন মানে, যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। মনে মনে হাসলেন। এখানে আসার প্রথম দিনের স্মৃতি এখনও বাসি হল না, অথচ দুয়ারে শেষ দিন উপস্থিত!

তিনি ঘরের আনাচ-কানাচ দেখছেন। টুকরোটাকরা যেখানে যা কিছু, সব আজ কুড়িয়ে-কাচিয়ে বাড়ি ফিরবেন। আর তো মাত্র ক'টা দিন হাতে!

তবে হিসেব মতো আরও বছরদুয়েক চাকরি ছিল। কিন্তু হঠাৎ কর্তৃপক্ষ ধরিয়ে দিল চিঠি। টার্মিনেশন লেটার। তাঁর অপরাধ? ক্লাস নাইনের রজতাভর গালে চড় মারা। তবে আরও কিছু ক্ষোভ বোধহয় জমা করেছিল অন্য এক অ্যান্টি লবি। কিন্তু রজতাভ ছেলেটা যে ভয়ঙ্কর একটা অপরাধ করতে যাচ্ছিল! ওকে সেদিন আটকানো না গেলে...

কেমিস্ট্রি ল্যাবের সামনে অনেক দিন ধরেই ওকে ঘুরঘুর করতে দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ সেদিন চুপিসাড়ে ঢুকে পড়ল ও, পিছন পিছন তিনিও। কানে এল রজতাভ খোঁজ করছে...

''এ কী গো! এ যে কাগজের ধস নামছে,'' ঝাড়ু হাতে তোতন ঘরে ঢুকেই হইচই শুরু করে দিয়েছে।

সত্যিই তো! কাবার্ডের পাল্লা খোলা পেতেই ভিতরের কাগজপত্র সব হুড়মুড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে মেঝেতে।

তোতন হেসেই বাঁচে না, ''কী গো স্যার, এত কিছু জমিয়ে রেখেছিলে ভিতরে?''

''আঠাশ বছরের সঞ্চয় কি কম রে?'' শান্ত স্যারও হাসলেন, ''আর দুটো দিন সহ্য কর, তারপর তো...''

তোতন ঝাড়ু দিতে দিতে থেমে যায়, ''কেন যে ওই ছেলেটার গালে চড় কষালে? না হলে আর কটা দিন থাকতে পারতে! কত্ত ভাল পড়াও। আর জানো, ওই ছেলের বাপটা নাকি বিরাট উকিল। শুনে ভয় করছে গো। তোমায় যদি জেলে পুরে দেয়?''

''একেবারে জেলে?'' উনি আওয়াজ করে হেসে উঠলেন।

তোতন কোমর ঝুঁকিয়ে ঝাড়ু দিতে শুরু করেছে, ''তোমার প্রাণে দেখছি ডর-ভয় নেই। নাকে চাপা দাও, ধুলো উড়বে এখুনি।''

তোতন, অবিনাশ ঝাড়ুদারের ছোট ছেলে। কাজেকর্মে বেশ চটপটে, কিন্তু অধিক বাচাল। ওর বাবার চাকরিটা আচমকাই গেল। নতুন মালিক পরেশ আগরওয়াল বুড়ো হাবড়াদের মোটে দেখতে পারেন না। তাই পাকাচুলো কর্মচারীদের ধরে ধরে ছুটি করে দিচ্ছেন। স্কুলের পুরনোরা তাই এবার গুটিগুটি পায়ে 'ভি আর' নিচ্ছেন মানসম্মান বাঁচাতে। কিন্তু শান্ত স্যার অটল ছিলেন। নিজে থেকে সিট খালি করবেন না, কিছুতেই না। কিন্তু পারলেন না সেই প্রতিজ্ঞা রাখতে, এমন কিছু ঘটে গেল।

যাক, যা হওয়ার, হয়েছে। সারা জীবন তো সংসার ধর্ম করেননি! এই স্কুলবাড়িই তাঁর বাড়ি, ছাত্ররাই সন্তান। সংসারটা হঠাৎ ভেঙে গেল!

তবে সেদিনের জন্য কোনও অনুশোচনা নেই মনে! হ্যাঁ, রজতাভকে তিনি চড় মেরেছেন। না হলে ও স্বীকার করত না। একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেত কারও জীবনে!

তোতন ঘর ঝাঁট দিতে দিতে আপন মনে গান গাইছে। হঠাৎ শান্ত স্যারের নজর পড়ে, একটা পাতলা রুলটানা পৃষ্ঠা টেবিলের কোনায় আটকে আছে। নিচু হয়ে কুড়োতে যাবেন, হাঁটুতে খট করে একটা আওয়াজ হল।

ব্যস, আর দাঁড়াতে পারলেন না! ব্যথায় ককিয়ে উঠেছেন। কোনও রকমে সামনের চেয়ার টেনে ধপ করে বসে পড়লেন।

তোতন ঝাড়ু রেখে ছুটে আসে, ''কী হল স্যার? ব্যথা পেলে?''

উনি দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোণ কামড়ে ব্যথা চাপছেন তখন। হাঁটুর ব্যথাটা আজকাল বড্ড ভোগাচ্ছে। দিনে অতবার যদি কাউকে সিঁড়ি ভাঙতে হয়, হাঁটু তো ভোগাবেই! ক্লাস কখনও দোতলায়, তো কখনও পাঁচতলায়! ছুটে ছুটে উঠছেন, নামছেন। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, এ সব আইন কি ইচ্ছাকৃত? আগরওয়ালের কাছে বয়স্করা হল 'লেফট লাগেজ'। সুতরাং আকার-ইঙ্গিতে বলে দেওয়া, বাপি বাড়ি যা!

ওদিকে তিন মিনিট সময় ধার্য 'সুইচ ওভার'এর জন্য। তার মধ্যে ক্লাসে ঢুকতে না পারলে কখনও কখনও প্রিন্সিপালের ঘরে ডাক। লিফট অবশ্য আছে স্কুলে, কিন্তু তাতেও হাজারটা বিধিনিষেধ! উপরে ওঠার সময় যদি বা চড়তে পারো, কিন্তু নিচে নামবে নিজের পায়ে।

উফ্, ব্যথাটা যেন শিরায় শিরায় ছড়াচ্ছে! শান্ত স্যার ঘাড়টা হেলিয়ে দিলেন চেয়ারের পিছনে। তোতন এক দৌড়ে ফার্স্ট-এড বক্স খুলে একটা মলম নিয়ে এল। প্যান্টটা হাঁটুর উপর তুলে, আলতো হাতে মলম লাগিয়ে দিচ্ছে।

''আরে, কী হল কী শান্তনুবাবু?'' ঘরের বাইরে হঠাৎ তাপস স্যারের গলা, ''ব্যথা খেয়েছেন নাকি? দেখলাম তোতন ছুটছে হাতে ওষুধ নিয়ে?''

''ওই আর কী। বাম লাগিয়ে নিয়েছি, সেরে যাবে।''

''আপনারও এ সব হাঁটুফাটুর প্রবলেম আছে বুঝি? এক সময় শুনেছি, ছেলেদের নিয়ে ক্রিকেট মাঠ কাঁপাতেন!''
''সে তখন বয়স ছিল,'' শান্ত স্যর হেসে, অল্প কথায় জবাব দেন। এই তাপস স্যর লোকটার বহু বদনাম। আগরওয়ালের এক নম্বর চামচা।
''আমাদের তো এই বয়সেই আনফিট শরীর, থাইরয়েড, সুগার, প্রেশার...'' তাপস দাস বলে।
রোগের ফিরিস্তি বোধহয় আরও বাড়ত, শান্ত স্যর থামিয়ে দিলেন। হাসতে হাসতে বলেন, ''আপনার আর কী চিন্তা? ব্লু আইড ম্যান, ম্যানেজমেন্টের প্রিয়পাত্র। আমাদের জন্য নিয়মের যত বেড়াজাল, আপনার জন্য সব ছাড়!''
তাপস দাস জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। মুখে একটু হ্যা হ্যা ধরনের হাসি, ''বুঝেছি, সুইচ ওভারের কড়াকড়ি নিয়ে বলছেন তো? কী করব বলুন! দুষ্টু ছেলেপিলেদের ক্লাসে একা রাখতে নেই। কিছু যদি হয়ে যায়, শুরু হবে গার্জেনদের হুজ্জুতি। থানা, পুলিশ, মিডিয়া। এই তো, পাশের স্কুলের একটা ঘটনা কানে এল। ক্লাস নাইনের ফার্স্ট বয়ের চেয়ারে নাকি একটা কম্পাস বিঁধিয়ে রেখেছিল ওরই কোনও কম্পিটিটর বন্ধু। ভাগ্যিস কারও চোখে পড়ে গিয়েছে! না হলে ছেলেটার রেকটাম ফুটো হয়ে যেত!''
কী! শুনেই উনি আঁতকে উঠলেন। এ কী জিঘাংসা! ছোট ছোট ফুলের মতো মনগুলো আজ এত বিষাক্ত! কিন্তু আগে যখন এ স্কুল মাত্র দেড়তলা বিল্ডিং ছিল, টিমটিমে অল্প পাওয়ারের বাল্ব জ্বলত দিনের বেলাতেও, ফ্যানের ব্লেড ঘুরত কি ঘুরত না, গাছতলার পাঠশালা ছিল শ্রেষ্ঠ ক্লাসরুম, তখনও এখানকার ছাত্ররা পরীক্ষায় ভাল ফল করেছে। এখন স্কুলের জমিতে গাছ, ফুল, সব নিশ্চিহ্ন। দাঁড়িয়ে আছে শুধু অট্টালিকা।
''পুরনো কালটা ফুরিয়ে গিয়েছে স্যর। আপনি এবার বেরিয়ে আসুন ওই ঘোর থেকে, প্লিজ়। এটা আমার রিকোয়েস্ট,'' তাপস দাস হাসছে।
''একই অনুরোধ আপনাকেও,'' শান্ত স্যর বলেন, ''আগরওয়ালের বলয় থেকে প্লিজ় বেরিয়ে আসুন। ওরা পাক্কা বেনিয়া, ইউজ় অ্যান্ড থ্রো-তে বিশ্বাসী।''
তাপস দাসের চোখ এবার ধকধক জ্বলছে। আঙুল দিয়ে নাকের ডগাটা সাপটে নিল। হিসহিসে গলায় বলল, ''আপনি কিন্তু অনেক ক্ষণ ধরে আমাকে অপমান করছেন। এবার মুখ বন্ধ করুন। যথেষ্ট গন্ডগোল পাকিয়ে গিয়েছেন স্কুলে। কেস খেতে খেতে বেঁচে গিয়েছেন। আর নতুন করে ঝামেলা পাকাবেন না।''
''কী গন্ডগোল পাকালাম, একটু পরিষ্কার করে বলুন দেখি?''
''আপনি জানেন না, কর্পোরাল পানিশমেন্ট একটা অফেন্স? তবু রজতাভর গায়ে হাত তুলেছেন! জানেন, ওর বাবা হাইকোর্টের কত বড় লইয়ার? কত ক্রিটিক্যাল কেস তাঁর হাতে? ভাগ্যিস উনি এখন দেশের বাইরে, কিন্তু ফিরে এসেই যখন শুনবেন...''
''তাই কি দেশে ফেরার আগেই আমায় বিদায় দিচ্ছে স্কুল?''
''ধরে নিন তাই।''
''কিন্তু আপনারা কি জানেন, কেন আমি ছেলেটার গালে চড় কষিয়েছি?''
তাপস দাস চুপ।
''বলতে চাইছিলাম না। কারণ রজতাভ এখনও ইমম্যাচিওর্ড। তবু শুনুন, বলি,'' বলেই সেদিনের ঘটনা আদ্যন্ত বলে চলেন তিনি। একটু থেমে অসহায় গলায় বললেন, ''কত বড় প্রতিহিংসা ভিতরে তৈরি হলে একটা পনেরো বছরের ছেলে কেমিস্ট্রি ল্যাবে খুঁজতে আসে হাইড্রোফ্লুরিক অ্যাসিড, তার প্রেমিকার মুখ পুড়িয়ে দেবে বলে! ভাবতে পারেন? ভাগ্যিস আমার কানে কথাটা গিয়েছিল! ও ল্যাবের হেল্পার ছেলেটার কাছে ফিসফিস করে বলছিল। শুনেই শিউরে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করতেই অস্বীকার করল। ধমক দিলাম, কান মুললাম, তাতেও ভবি ভোলার নয়। তখন ওর দু'গালে পাঁচ আঙুল বসিয়ে দেওয়ার মতো চড় কষাতেই ভ্যাঁ! সব কথা উগরে দিল।''
তাপস দাস স্তম্ভিত। মুখ হাঁ করে শুনছে।
''আরও শুনুন মিস্টার দাস। রজতাভর বাড়ি সেদিনই চলে গিয়েছিলাম ছুটির পর। কাউকে পাইনি। ওর মা একজন ব্যস্ত ডাক্তার। কনট্যাক্ট নম্বর নিয়ে মায়ের চেম্বারে দেখা করি। বলি, ইওর সান নিডস ট্রিটমেন্ট। কিন্তু ভদ্রমহিলা অ্যারোগ্যান্ট। আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। এরপর থেকে আর

রজতাভকে স্কুলে পাঠায়নি। তবু আবার যাব ওর মায়ের কাছে। ছেলেটাকে তো বাঁচাতে হবে ওই মানসিক সমস্যা থেকে! এনিওয়ে, আমার খুব ইচ্ছা ছিল, রজতাভর বাবা আমার জন্য কী শাস্তি তুলে রেখেছেন, তা জানতে।''
কোথাও যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটল। তাপস দাস হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, ''আর ইউ ক্রেজ়ি স্যর? এরপর খবরটা যখন পেপারওলারা বাড়িয়ে-চড়িয়ে হেডলাইন করবে, তখন একজন ছাত্রও আর এখানে পড়তে আসবে?''
শান্তনু স্যর জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করলেন, ''রাইট, রাইট। আসলে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, আপনি অঙ্কের ভাল ছাত্র। তবু আপনি একটাও অঙ্ক ক্লাস নেন না কেন? পার্টটাইম টিচার দিয়ে অঙ্ক শেখানো হয় কেন? যাক, চলে যাওয়ার আগে আর কটু কথার লেনদেন করব না। এই আমি মুখ বন্ধ করলাম।'' বলেই উনি নিজের ঠোঁটের উপর দু'আঙুল রেখে ছেলেমানুষের মতো ফিকফিক হাসতে শুরু করেছেন।
তাপস দাস কটমট করে খানিক দেখল। এবার তার গলায় যেন একটু ক্লান্ত সুর, ''স্যর, এই অধমের একটা অ্যাডভাইস শুনবেন? এত স্ট্রেটকাট বল খেলবেন না। এবার একটু ধরে খেলতে শিখুন, প্লিজ়।''
ভেবেছিলেন উত্তর দেবেন না, কিন্তু আবার যে ভিতরটা চিড়বিড় করছে! উনি আঙুল নাড়িয়ে বলেন, ''কাম এগেন। কাম এগেন মিস্টার দাস। কী বললেন? ধরে খেলব? কার সঙ্গে খেলব? আরে আপনারা কি খেলোয়াড় নাকি? আপনারা তো গেম প্ল্যানার! শুধু ছক আঁটেন! আর,'' বলেই তাকালেন তোতনের দিকে।
ছেলেটা হাঁ করে কেমন কথা গিলছে দ্যাখো! বাইরে গিয়েই সব উগরে দেবে!
''এই, তুই অন্য ঘরগুলো পরিষ্কার কর গে যা।''
ঝাড়ু তুলে প্রায় দৌড়-পায়ে ছুটল ও ঘরের বাইরে। শান্তনু মুখোপাধ্যায় গলা ঝাড়লেন, ''এই স্কুলের মাটিতে অনেক রক্ত ঝরেছে আমার। তখন আপনারা কোথায়? মাত্র কয়েকজন টিচার নিয়ে স্কুল বসত। ধীরে ধীরে বড় হল। তবে এত বড় নয়। এখন সব টুকটুকে সাহেব বাচ্চারা মোটা ডোনেশন দিয়ে স্কুলে অ্যাডমিশন নেয়। তারা গুগল করে, অ্যাবাকাস করে, আমার প্রতিবাদ এখানেই। কেন বাচ্চাদের স্বাভাবিক মেধাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে না? কেন সেরাদের মধ্যে থেকে সেরার সেরাকে বাছা হবে? কেন নিম্ন বা মধ্য মেধার থেকে কাউকে টেনে তোলা হবে না?''

২

ক'দিন ধরেই দেখা যাচ্ছে, ছুটির খানিক আগে গেটে একটা ঢাউস গাড়ি এসে দাঁড়াচ্ছে। গাড়ির মালিককেও একদিন দেখতে পেলেন শান্ত স্যর। গায়ে কালো কোট, গলায় টাই, সুদর্শন এক ভদ্রলোক। গেটে হাত রেখে কথা বলছেন, পাশে দাঁড়িয়ে আগরওয়াল, প্রিন্সিপাল আর তাপস দাস। সকলের মুখ গম্ভীর। গুরুতর আলোচনা চলছে বোঝা গেল।
তাহলে এই কি রজতাভর বাবা? বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন? প্রিন্সিপালের রুমে সেদিন অনেক ক্ষণ একটা মিটিংও চলেছিল। দরজায় লাল আলো। তাহলে কি সেদিনও এই ভদ্রলোক এসেছিলেন? তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তি ফ্রেম করা হচ্ছে? হোক, যা হওয়ার হবে। উনি প্রস্তুত। রজতাভকে সেদিন আটকানো দরকার ছিল।
আজই এ স্কুলে শান্ত স্যরের শেষ দিন। ভাদ্র মাস সবে শেষ হয়েছে, তবে গুমোট ভাব যায়নি। আকাশটা ফুলে আছে, হয়তো বৃষ্টি নামবে। তোতনই সর্বপ্রথম খবরটা দিল, ''যাও, আজ তোমার যম এসেছে, সেই ছাত্রর বাবা! সাবধান, বেশি তক্কে যেও না। না হলে সোজা চালান করে দেবে জেলে।''
ওর কথার ধরনে ফিক করে হেসে উঠলেন তিনি।
ঠিক তিনটে নাগাদ তাঁর ডাক পড়ল প্রিন্সিপালের ঘরে। পর্দা সরিয়ে উঁকি দিতেই দেখেন, সেই ভদ্রলোক। আজ গায়ে কোনও কোট নেই। সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট, গলায় টাই। পাশে তিন মাথা।
চেয়ারে টেনে বসতেই পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল, ''হি ইজ় বিনায়ক চৌধুরী, ফাদার অফ রজতাভ।''
শান্তনুবাবু হাতজোড় করে নমস্কার জানাতেই দেখেন, ভদ্রলোক তাঁকে মাপছেন। পলকহীন দৃষ্টি। তাঁর অস্বস্তি

হল চাহনিটায়।
প্রিন্সিপাল এবার মৃদু স্বরে সেদিনের ঘটনা শুরু করলেন, ''আমরা খুবই দুঃখিত মিস্টার চৌধুরী, আপনার ছেলের সঙ্গে একটা আনফেয়ার ইনসিডেন্ট ঘটে গিয়েছে এই স্কুলে। তবে আমাদের স্যর পরে এর জন্য রিপেন্ট করেছেন। উনি নিজে গিয়েছিলেন আপনার স্ত্রীর কাছে অ্যাপোলজি চাইতে।''
কানে লাগল কথাটা। শান্ত স্যর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, ''নেভার এভার। ভুল তথ্য দেওয়া হচ্ছে আপনাকে, মিস্টার চৌধুরী। আপনার স্ত্রীর কাছে আমি কখনওই অ্যাপোলজি চাইতে যাইনি। গিয়েছিলাম একটা অ্যাডভাইস দিতে। কারণ রজতাভ ভয়ঙ্কর একটি মানসিক রোগে আক্রান্ত। ওকে এখনই টেক কেয়ার না করলে...'' কথা আর শেষ করলেন না তিনি। শুধু মাথা নাড়াচ্ছেন অস্থিরভাবে।
বিনায়ক চৌধুরী ভুরু কুঁচকে শুনছেন। তারপর শান্ত উঠছে। ঠিক করেছি, ওদের মধ্যেই এবার একটু আলো ছড়াব। ওরা কেউই পরীক্ষায় ঝুড়ি ঝুড়ি নম্বর পায় না, হয়তো স্কুলেও যায় না। তাই মিডিয়ার ঝলকানি নেই ওদের আগেপিছে।
ওরা সব হেরোর দল। কিন্তু আমি জানি, ওরাই আগামির হিরো। ইয়েস আই স্ট্রংলি বিলিভ, ওরাই হবে আমাদের ভবিষ্যতের লাঠি।''
আগরওয়াল প্রচণ্ড বিরক্ত, কপাল ঘষছেন আঙুল দিয়ে।
কিন্তু শান্ত স্যর আজ প্রগলভ। বলেই চলেছেন, ''বিদেশে পড়ে থাকা নামীদামি ছেলেরা যখন বাবা-মায়ের মুখাগ্নি করতে আসার সময় পায় না, তখন ওরাই এগিয়ে আসে। শ্মশানযাত্রী হয়। কখনও পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মও করে। ওরাই ডাক্তারের চেম্বারে লাইন দিয়ে, অসুস্থ জবুথবু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে ডাক্তার দেখিয়ে আনে। হুইল চেয়ার ঠেলে কিংবা



আগরওয়াল সাহেব বেল বাজালেন, ''রজতাভকো বুলাও।'' পায়ের শব্দে সকলে পিছনে তাকাল। দরজায় রজতাভ, সঙ্গে ওর মা। দু'জনের দৃষ্টিই মাটির দিকে। শান্ত স্যর তাকিয়েই রইলেন। ছেলেটার কী নিষ্পাপ মুখ! হাত বাড়িয়ে দিলেন ওর দিকে, ''এই বুড়োর ঘাড়ে এত বড় দায়িত্ব চাপিয়ে দিলি বিনায়ক? আমি কি পারব?''

স্বরে বললেন, ''ওকে, ওকে। আমি সব শুনেছি। এনিওয়ে,
আপনার বিরুদ্ধে সব অ্যালিগেশন আমি তুলে নিচ্ছি। স্কুল অথরিটিকেও রিকোয়েস্ট করছি, আরও দু'বছর যেন আপনাকে এখানে রেখে দেওয়া হয়। আপনার রিটারমেন্টের সময় তো এখনও হয়নি!''
তিন মাথা এবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। শান্তনু স্যর আবার চেয়ারে বসলেন। চশমাটা খুলে রাখলেন টেবিলে। আবার পরেও নিলেন। তারপর দু'হাত জড়ো করে বললেন, ''সরি, আর নয়। এখানকার কাজ আমার শেষ।''
''নতুন চাকরি জোগাড় করে ফেললেন নাকি এর মধ্যেই?'' প্রিন্সিপালের গলায় শ্লেষ।
উনি ভ্রুক্ষেপই করলেন না সে কথায়। বিনায়কের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''একটা ঘর না ভাঙলে নতুন ঘর বানানোর তাগিদ আসে না যে! আমি নতুন ঘর তৈরির স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছি মিস্টার চৌধুরী।'' বলেই আঙুল দেখালেন দূরের দিকে, ''স্কুল ছাড়িয়ে একটু এগোলেই একটা বস্তি। যাতায়াতের পথে রোজ দেখি, কিছু ছেলেপিলে অনাদরে বেড়ে হাত ধরে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে পুজো দেখায় ওরাই। তাই ওদের উপর এবার আর একটু শিক্ষার আলো ফেলা দরকার।''
বিনায়কের চোখ বন্ধ। ঠোঁটের উপর একটা আঙুল। কথা শুনছেন যেন ধ্যানস্থ হয়ে! শেষ হতেই বলে ওঠেন, ''আচ্ছা স্যর, উইথ ইওর কাইন্ড পারমিশন, আপনার সঙ্গে একটা মেমরি গেম খেলব?''
শান্ত স্যর হেসে মাথা নাড়লেন। বিনায়ক ভদ্রলোকটিকে কিন্তু বেশ লাগছে! ঝকঝকে, বুদ্ধিদীপ্ত পুরুষ।
''আপনার কি এক মারকুটে, বন্য, অবাধ্য আর খুব রাগী ছেলেকে মনে পড়ে? নাইনটিন নাইন্টি এইট ব্যাচ? যখন তখন যে স্কুলের জিনিস ভাঙচুর করত? ডাস্টার ছুড়ে বাল্‌ব ভাঙত? একবার আরও এক সাংঘাতিক ঘটনা ঘটাল— ক্লাস টেনের ইংরেজি টিচারের সাইকেল লোপাট করে দিল। কারণ সেই স্যর অনেক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মনে পড়ছে?
খুব রাগ ছিল ছেলেটার শরীরে। আর রাগ হলেই ধ্বংসাত্মক সব কাজ করত। অবশ্য শাস্তিও পেত

প্রচুর। হেড স্যর বহুবার স্কুল থেকে বের করে দিয়েছেন, আপনি ফিরিয়ে এনেছেন। এখনও মনে পড়ল না? দাঁড়ান, আর একটু হিন্ট দিই। আপনি বলেছিলেন ছেলেটিকে, 'তোর ভিতরের আগুনকে ধ্বংসের কাজে নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লাগা, সৃষ্টিতে লাগা। যাতে...''

শান্তনু স্যর পিটপিট তাকাচ্ছেন। সমুদ্রের তিরতিরে ঢেউয়ের মতো কিছু যেন ভেসে ভেসে আসছে পারে!

বিনায়ক ওদিকে বলেই চলেছেন, ''ছেলেটার মেধা ছিল, কিন্তু পড়াশোনায় মোটে মন নেই। একবার একটা ডিবেট কম্পিটিশনে নিয়ে গেলেন। ইংরেজিতে বলতে হবে একটা বিষয়ের উপর— নো স্ট্যাচু হ্যাজ় এভার বিন সেট আপ ইন অনার অফ আ ক্রিটিক। অর্থাৎ সমালোচকদের সম্মানে কোনও প্রস্তরমূর্তি তৈরি হয় না কখনও। শুনেই ছেলেটা ভয় জড়সড়! কিছুতেই যাবে না। আপনি সাহস জোগালেন। বলেছিলেন, 'তোর ভিতরের রাগ, যন্ত্রণা, সব ঢেলে দে এই বক্তব্যের মধ্যে'। মনে পড়ে? এত তাড়াতাড়ি হৃদয় থেকে আমায় মুছে দিলেন স্যর?''

শান্তনু স্যর হাঁ করে দেখছেন আর মাথা দোলাচ্ছেন, ''ইয়েস, ইয়েস, মনে পড়েছে। সব মনে পড়েছে। তুমি, তুমি, তুমিই সেই বিনায়ক?''

''ইয়েস স্যর। সেই প্রতিযোগিতায় আমি ঝরঝর করে ইংরেজি বলতে পারিনি। বাংলা মিডিয়ামের ছেলে তো! কিন্তু থেমে থেমে, ইংরেজিতেই নিজের বক্তব্য উগরে দিয়েছিলাম। শেষ হতেই শুনি দর্শকের হাততালি। চমকে গেলাম। আত্মবিশ্বাস এল। আমিও তাহলে পারি কিছু? হলাম থার্ড প্রাইজ় উইনার। আমার জীবনে ওটাই টার্নিং পয়েন্ট। আজ আমি আপনাদের আশীর্বাদে ওকালতিতে কিছু সুনাম অর্জন করেছি।''

শান্তনুবাবুর চোখ থেকে চশমাটা বার বার নেমে আসছে নাকের ডগায়। কী জ্বালা! কিন্তু চোখ দুটো এমন ঝাপসা হয়ে উঠছে যে! চোখে কি কুয়াশা জমে?

বিনায়ক চৌধুরী এবার মাথা ঝুঁকিয়ে স্যরের পা ছুঁতে চাইলেন। উনি আটকালেন। তারপর দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে ডাকলেন, ''এসো, বুকে এসো।''

বিনায়ক ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাচ্ছেন এবার, ''আপনার বুকে একা আমাকেই জায়গা দেবেন স্যর? আর ওই যে একটা শিশু মারাত্মক এক ব্যাধিতে ভুগছে, জ্বোরো রোগীর মতো ঠকঠক কাঁপছে ভিজ়িটর্স রুমে বসে, ওকে কাছে টেনে নেবেন না? আপনার ঠান্ডা হাতটা একটু ওর কপালে বুলিয়ে দিন না! একটু ছায়া, একটু ভালবাসা চাই ওর এখন।''

শান্ত স্যর অবাক, ''কোথায় তোমার ছেলে?''

আগরওয়াল সাহেব বেল বাজালেন, ''রজতাভকো বুলাও।'' পায়ের শব্দে সকলে পিছনে তাকাল। দরজায় রজতাভ, সঙ্গে ওর মা। দু'জনের দৃষ্টিই মাটির দিকে। শান্ত স্যর তাকিয়েই রইলেন। ছেলেটার কী নিষ্পাপ মুখ! হাত বাড়িয়ে দিলেন ওর দিকে, ''এই বুড়োর ঘাড়ে এত বড় দায়িত্ব চাপিয়ে দিলি বিনায়ক? আমি কি পারব?''

''পারবেন স্যর। আপনিই পারবেন। রজতাভ তো আমারই ছেলে, তাই অমন বুনো, গোঁয়ার! কিন্তু আপনি যদি কাছে টেনে নেন... একদিন বলেছিলেন না— পুকুর, ডোবা, খাল, বিল, সব যখন সমুদ্রের জলে মিশে যায়, তারা তখন সমুদ্রের জল-বিন্দুই হয়ে ওঠে। আলাদা করে কাউকে আর চেনা যায় না। আপনিও তো এক মহাসমুদ্র! আপনার মধ্যে মিশিয়ে নিন না আমার এই ছেলেটাকে...'' বলতে বলতে দুই হাত জড়ো করেন বিনায়ক, ''এ এক বাবার কাতর প্রার্থনা। মঞ্জুর করবেন না?''

দুই হাতে শক্ত করে দুই ছাত্রের কাঁধ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন শান্ত স্যর। তাঁর ঝাপসা চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় বৃষ্টি। ওদিকে বাইরেও অনেক গুমোটের পর ঝড় বাদল শুরু হয়েছে। আকাশ ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে বিদ্যুৎ চমকে।

বিনায়ক ছেলেকে উদ্দেশ করে বিড়বিড় করেন, ''আর ভয় নেই রে। বাবা, ছেলে দু'জনেই আমরা এখন বটের ছাউনি তলায়।''

অলংকরণ: মহেশ্বর মণ্ডল

পর্দায় ভয়

হলিউড এবং বলিউডে ভয়ের ছবির ধরন পাল্টেছে বার বার। সেই বদলগুলোর দিকেই চোখ ফেরালেন সংবেত্তা চক্রবর্তী।

ষড়রিপুর তালিকাটা একবার মনে করে দেখুন। কোথাও ‘ভয়’কে পাচ্ছেন কি? পাচ্ছেন না তো? তার মানে কি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরাও ভয়কে শত্রু মনে করতেন না? এর উত্তর জানা নেই, তবে আধুনিক যুগের মানুষ ভয় পেতে কতটা ভালবাসেন, সে কথা আপনি-আমি সকলেই জানি। সাহিত্যে, ছবিতে, এমনকি অডিও স্টোরিতেও সবচেয়ে ‘ইন থিং’ এখন হররই। যদিও ভয়কে নিয়ে সবচেয়ে বেশি খেলার সুযোগ সম্ভবত দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যমেই রয়েছে... ছবি, গল্প, সঙ্গীত, সব দিক থেকে। তাই ভূতের ছবির জয়জয়কার ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে নিঃসন্দেহে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুর মতোই ভূতের সিনেমার ধরনও পালটেছে। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়, এই পরিবর্তন... বলা ভাল, বিবর্তনই। এবং বাংলায় যেহেতু হরর ফিল্ম বা ভূতের সিনেমার বিচরণ কিছুটা বিক্ষিপ্তই, নির্দিষ্ট একটা জঁর তৈরি হয়নিই বলা চলে— তাই বাংলা ছবিকে আমরা এই আলোচনা থেকে বাদই রাখছি। দক্ষিণী ছবি দেখার প্রবণতা যেহেতু সর্বস্তরের বাঙালির মধ্যে বিদ্যমান নয়, তাই তাকেও বাদ রাখা হল। হলিউড এবং বলিউড বয়স, লিঙ্গ পরিচয় এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সব বাঙালির প্রিয়, এবং দু’জায়গাতেই ভয়ের ছবি একটা স্পষ্ট জঁর হিসেবে রয়েছে। তাই হলিউড এবং বলিউড



‘ইট’ ছবির ভয়ানক ক্লাউন



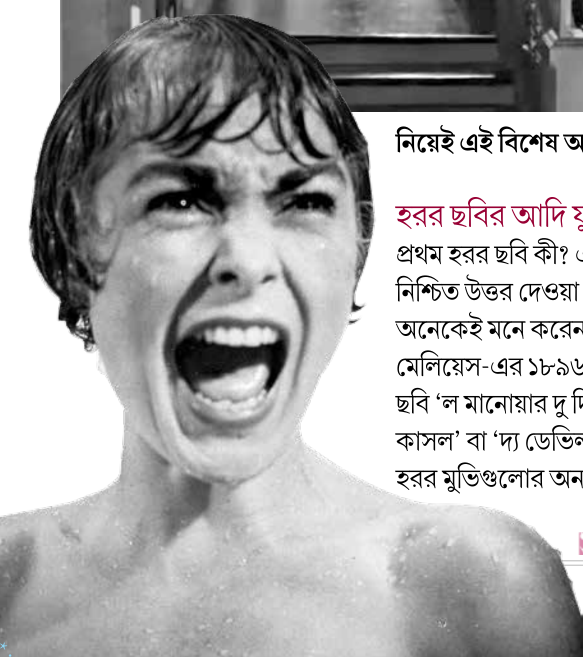
দ্য হন্টেড কাসল



নাইট অফ দ্য লিভিং ডেড

রেবেকা





নিয়েই এই বিশেষ আলোচনা।

হরর ছবির আদি যুগ

প্রথম হরর ছবি কী? এ প্রশ্নের কোনও নিশ্চিত উত্তর দেওয়া অত্যন্ত মুশকিল। তবে অনেকেই মনে করেন, ফরাসি পরিচালক জর্জ মেলিয়েস-এর ১৮৯৬ সালের স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি 'ল মানোয়ার দু দিয়াব্ল' ('দ্য হন্টেড কাসল' বা 'দ্য ডেভিল'স কাসল') হল প্রাচীন হরর মুভিগুলোর অন্যতম। ভূত, বাদুড়, কঙ্কাল, শয়তান, সবই ছিল সে ছবিতে... তবে তার উদ্দেশ্য ভয় দেখানোর চেয়েও বেশি ছিল, দর্শককে বিনোদন দেওয়া। 'দ্য ক্যাবিনেট অফ ডক্টর ক্যালিগরি' (১৯২০) বা 'নসফেরাতু'র (Nosferatu, ১৯২২) মতো জার্মান সাইলেন্ট হররকেও এখনও মনে রেখেছেন হরর-প্রেমীরা। তিরিশের দশক অবধি ভয়ের ছবির একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল সাহিত্যনির্ভরতা— 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন', 'ড্রাকুলা', 'ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড' ইত্যাদি কাহিনি নিয়ে এ সময় নানাভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছেন ছবি-নির্মাতারা, নির্বাক এবং সবাক, দুই যুগেই ('নসফেরাতু' কেও ড্রাকুলা-রই অ্যাডাপ্টেশন বলা যায়)। তিরিশের দশক থেকেই এ ধরনের ছবিকে 'হরর'এর অভিধা দেওয়া হয়, তার আগে এই শব্দটার প্রচলন ছিল না।

ড্রাকুলা যেমন ভ্যাম্পায়ার, তেমন আর-এক ধরনের 'আনডেড' অর্থাৎ মারা গিয়েও যারা মারা যায়নি... হল জ়ম্বি। এদের নিয়েও কিন্তু পরীক্ষানিরীক্ষা চলছিল গোড়ার দিক থেকেই। ১৯৩২ সালের ছবি 'হোয়াইট জ়ম্বি'তে অভিনয় করেছিলেন হরর-খ্যাত অভিনেতা বেলা লুগোসি। তার পরেও বিভিন্ন দশকে নানা ধরনের ছবি হয়েছে জ়ম্বি নিয়ে। জর্জ এ রোমেরো বানিয়েছেন 'নাইট অফ দ্য লিভিং ডেড', 'ডন অফ দ্য ডেড', 'ডে অফ দ্য ডেড'। ক্রমে জ়ম্বি ছবিগুলো কখনও সমার্থক হয়ে উঠেছে 'গোর'-এর, কখনও আবার 'জ়ম-কম'এর!

নির্বাক যুগ থেকেই তৈরি হচ্ছিল আর এক 'সিনেম্যাটিক ইউনিভার্স', যার ছবিগুলো আদতে থ্রিলার হলেও দর্শকের শিরদাঁড়া বেয়ে হিম-স্রোত বইয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। ঠিক ধরেছেন, অ্যালফ্রেড হিচককের কথাই বলছি। বিশের দশক থেকেই থ্রিলার বানাতে বানাতে তিনি সাসপেন্স নিয়ে এমনভাবে খেলতে শিখে গিয়েছিলেন, যেখানে 'কী হল' আর 'কী হবে'— এই দুই অনুভূতিই দর্শকের গায়ের লোম খাড়া করে দেয়। উদাহরণ? 'রেবেকা'। গলার কাছে আঁট হয়ে বসা যে সাসপেন্স-ফিয়ার ব্লেন্ডের সঙ্গে এই ছবিতে আমাদের পরিচয় হয়, তা-ই আরও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে আরও পরে, পঞ্চাশের দশকের

সাইকো

‘ভার্টিগো’ বা ছয়ের দশকের ‘সাইকো’তে। থ্রিলার এবং হরর যে একই মুদ্রার দু’পিঠ হতে পারে, এবং ভয়ের উৎস যে সব সময় আত্মা নয়, অনেক সময় মানুষের মনের গলিঘুঁজি থেকেও ভয়ের উপাদান উঠে আসতে পারে— হিচকক দেখালেন সেটাই। ‘সাইকো’র পর স্ল্যাশার ছবি—অর্থাৎ যেখানে ধারালো কোনও অস্ত্র দিয়ে একের পর এক মানুষকে ‘স্ল্যাশ’ বা দু’ফাঁক করে দেয় কোনও একজন— হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র একটা হরর জঁর।
যে জঁর আমাদের উপহার দিয়েছে ‘আ নাইটমেয়ার অন এলম স্ট্রিট’এর মতো ছবি, ‘স্ক্রিম’ বা ‘ফ্রাইডে দ্য থার্টিন্থ’এর মতো ফ্র্যাঞ্চাইজ়ি। সিরিয়াল কিলিং আসলে এমনই একটা বিষয়, যেখানে হরর এবং থ্রিলার— দুই জঁর নিয়েই স্বচ্ছন্দে খেলা করা যায়।

ভুতুড়ে বাড়ি, বাচ্চা, পুতুল...

সত্তর এবং আশির যুগে হলিউডি হররের সবচেয়ে বড় অবলম্বন হয়ে ওঠে ‘অকাল্ট জঁর’— অর্থাৎ, অতৃপ্ত আত্মাদের কারিকুরি। ফাঁকা বাড়ি, হোটেল ইত্যাদি জায়গায় ঘাপটি মেরে থাকে ভূত— যারা থাকতে আসে তাদের ক্ষতি করে, ঘাড়ে চাপে, এমনকি অনেক সময় প্রাণেও মেরে ফেলে। ‘দি অ্যামিটিভিল হরর’ (১৯৭৯), ‘দ্য শাইনিং’ (১৯৮০), ‘পোল্টারজাইস্ট’ (১৯৮২), থেকে অপেক্ষাকৃত হালের ‘দা কনজুরিং’ বা ‘দি ইনসিডিয়স’ ফ্র্যাঞ্চাইজ়ির মতো বহু কাল্ট ছবি রয়েছে হন্টেড হাউস হররের তালিকায়। আর এক ধরনের ছবি হল ইভিল কিড হরর। অনেক ভূতই বাচ্চাদের ‘পজ়েজ়’ করতে বিশেষ ভালবাসে, আবার অনেক সময় বাচ্চাদেরই দেখানো হয় সাক্ষাৎ শয়তানের বংশধর হিসেবে! সত্তরের দশকে এই জঁরের দুই মাইলফলক সিনেমা বলা যায় ‘দি এগজ়র্সিস্ট’ (১৯৭৩) এবং ‘দি ওমেন’কে (১৯৭৬)। দুই ছবিতেই ভয় সৃষ্টির কারিগর হিসেবে দেখানো হয়েছে

স্ল্যাশার, অর্থাৎ ধারালো অস্ত্র দিয়ে মানুষকে স্ল্যাশ বা দু’ফাঁক করে দেওয়া যায়। ‘স্ক্রিম’ বা ‘ফ্রাইডে দ্য থার্টিন্থ’এর মতো ফ্র্যাঞ্চাইজ়ি এই স্ল্যাশার জঁরেরই মাইলফলক।

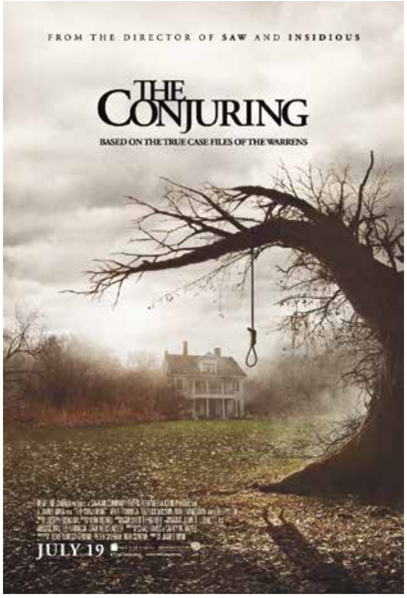

ফ্রাইডে দ্য থার্টিন্থ


অ্যানাবেল


দি ওমেন (১৯৭৬)


দ্য শাইনিং


স্ক্রিম



দ্য কনজুরিং



দ্য ব্লেয়ার উইচ প্রজেক্ট

ছোটদের। যে প্রবণতা আমরা তার পরেও দেখি ‘পেট সেমেটরি’ (১৯৮৯), ‘দ্য রিং’ (২০০২) বা ‘কেস ৩৯’এর (২০০৯) মতো ছবিতেও। আরও একটা প্রবণতা আমরা দেখতে পাই, যেখানে ভিলেন হচ্ছে পুতুল! ‘চাইল্ড’স প্লে’ এবং ‘অ্যানাবেল’ ফ্র্যাঞ্চাইজ়ি দেখেননি, এমন হলিউড হরর-প্রেমী কি খুব বেশি রয়েছেন? ‘ডেড সাইলেন্স’ (২০০৭) বা ‘দ্য বয়’ও (২০১৬) ভোলার মতো সিনেমা নয়। সাধারণ দর্শক হিসেবে ভাবতে গেলে মনে হয়, এর আগে ভয়ের ছবির উপাদানগুলো ছিল সোজা-সাপটা— অর্থাৎ, যে সব জিনিসে ভয় পেতে হয় বলেই জানে মানুষ। বাচ্চা বা পুতুল... এগুলো তো অন্য রকম আবেগ জাগায় মনে! সেগুলোকে যদি ভয়ের জনক হিসেবে দেখানো যায়, স্বাভাবিকভাবেই তা মানুষকে অনেক বেশি ধাক্কা দেবে (অর্থাৎ তখনও দিত, এখন এই ট্রেন্ড পুরনো হয়ে গিয়েছে)। হয়তো বা সেই মনোভাব থেকেই এ ধরনের ছবির ধারা তৈরি হয়। ক্লাউন হররকেও কিন্তু ভুললে চলবে না! অভিব্যক্তিহীন ক্লাউন পুতুল দেখলে অনেকেরই অস্বস্তি হয়। সেই অস্বস্তিকেই বেশ কয়েক ধাপ চড়িয়ে পর্দায় নিয়ে এসেছেন কিছু নির্মাতা। সাইকো কিলার ক্লাউন আমরা বহু ছবিতে দেখেছি। কিন্তু ‘ইট’ ফ্র্যাঞ্চাইজ়িতে ‘পেনিওয়াইস দ্য ডান্সিং ক্লাউন’কে যেভাবে গড়া হয়েছে, তা চেনা ছকের বাইরে এসে, সর্বার্থে হয়ে উঠেছে ‘হরর আইকন’।



ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট

এভাবেও ছবি তোলা যায়!

১৯৯৯ সাল। মুক্তি পেল ‘দ্য ব্লেয়ার উইচ প্রজেক্ট’। এবং দর্শক পরিচিত হলেন, ‘ফাউন্ড ফুটেজ’ ছবির সঙ্গে। এই ছবিগুলো এমনভাবে তৈরি হয়, যেন চরিত্রদের কারও ক্যামেরাতেই ফুটেজ হিসেবে তোলা ছিল বিভিন্ন ঘটনা, পরে সেই ফুটেজগুলো পাওয়া গিয়েছে। কেউ কেউ একে ‘ডিসকভার্ড ফুটেজ’ও বলেন। ১৯৮০ সালের ইতালীয় ক্যানিবল ফিল্ম ‘ক্যানিবল হলোকাস্ট’কে প্রথম হরর ফাউন্ড ফুটেজ ফিল্ম বলে মনে করা হয়। তবে ‘ব্লেয়ার উইচ প্রজেক্ট’ই এই জঁরকে জনপ্রিয় করে তোলে। এবং ‘প্যারানর্মাল অ্যাকটিভিটি’ ফ্র্যাঞ্চাইজ়ি একে দাবানলের মতো ছড়িয়ে দেয়। ‘হেল হাউস এলএলসি’, ‘দ্য টেকিং অফ ডেবোরা লোগান’, ‘ভি/এইচ/এস’— প্রতিটি ছবিই প্রমাণ করে দিয়েছে, ফাউন্ড ফুটেজ ভয়ের ‘লার্জার দ্যান লাইফ’ খোলস ছাড়িয়ে তাকে অনেক বেশি বাস্তব, অনেক বেশি ‘রিলেটেবল’ করে তোলে। পাশাপাশি ছবি তোলার সরঞ্জামের খরচও চাইলে কমানো যায় এ ধরনের টেকনিকে। ছবি-নির্মাতা এবং হরর ছবির বিশেষজ্ঞ ম্যাথু লরেন্স এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘‘ছবি দেখতে কেমন হবে, সে ব্যাপারে দর্শকের চিন্তাভাবনার মোড় সম্ভবত ঘুরিয়ে দিয়েছিল ‘দ্য ব্লেয়ার উইচ প্রজেক্ট’। দর্শক ভাবতে শুরু করেছিলেন, যে এবার যে-কেউই ছবি বানাতে পারে!’’ নতুন এই ফিল্মিং টেকনিক নামী পরিচালকদেরও ভাবতে বাধ্য করেছিল। তাইল্যান্ডের কাল্ট হরর ছবি ‘শাটার’এর (যার রিমেক আমরা ইংরেজিতে দেখেছি) পরিচালক পার্কপুম উংপুম যেমন ‘দোজ় দ্যাট ফলো’ নামে একটি হরর শর্ট ফিল্ম বানিয়েছেন, পুরোটাই ফোনে!

বিষয়ের বৈচিত্র

একুশ শতকে হরর জঁর শুধু হন্টেড হাউস বা পসেসড হিউম্যানের গণ্ডিতে আটকে না থেকে, বিভিন্ন বিষয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে নিজেকে। ভয়ের মাধ্যম কখনও হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া— যেমন ২০১৬ সালের ছবি ‘ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট’ বা ২০১৮-র ছবি ‘ক্যাম’। কখনও আবার আমাদের ইন্দ্রিয়রাই হয়ে ওঠে সবচেয়ে ভয়ের কারণ— ২০১৮ সালের ‘বার্ড বক্স’ মনে করুন, যেখানে অশুভ শক্তিকে দেখে ফেললেই মৃত্যু ছিল অবধারিত! কখনও আবার ভূত-প্রেত-পিশাচকেও ছাপিয়ে, ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে সময়— বা টাইম লুপ। ‘ইন দ্য টল গ্রাস’ (২০১৯) ছবির চরিত্রেরা যেমন বিশাল ঘাসে-ছাওয়া এক মাঠে প্রবেশ করেই হারিয়ে ফেলে সময় এবং তার পাশাপাশি আপনজনদের সঙ্গে সম্পর্ক, নিজেদের সত্যিকারের সত্তা বা ‘ট্রু সেলফ’— সব কিছু। ‘গেট আউট’এর (২০১৭) মতো ভয়ের ছবি সাম্প্রতিক কালে বেশি হয়নি, কিন্তু ভূতের পরিসর সেখানে গৌণ। তার চেয়ে অনেক বেশি হাড় হিম করে দেয় গল্পের পরতে পরতে জড়িয়ে থাকা ‘রেশিয়াল হেট্রেড’। ‘স্প্রিং’-এ (২০১৪) আমরা ২০০০ বছরের পুরনো ‘মিউট্যান্ট’কে যেমন ভয়াবহ রূপে দেখি, তেমনই ছবির শেষে গিয়ে ভালবাসার জন্য তাকে অমরত্ব বিসর্জন দিতে দেখে গলার কাছে দলা পাকিয়ে ওঠে! নিছক ভয়ে আটকে না থেকে নানা আবেগ, নানা বিষয় নিয়ে খেলাই এখনকার

হলি-হরর ফিল্মের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

বলিউডে হরর

বিশাল এক ফাঁকা বাড়ি, মোমবাতি হাতে ঘুরে-বেড়ানো মধুবালার ঠোঁটে, লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে আইকনিক গান 'আয়েগা আনেওয়ালা'— এবং পুনর্জন্ম! ১৯৪৯ সালের 'মহল'কেই বলা হয় বলি-ছবির ইতিহাসে প্রথম হরর। যদিও আন্তর্জালে তার আগেরও কিছু ছবির নাম দেখা যায়, কিন্তু সেগুলো সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না। তারপর থেকে, মোটামুটি ষাটের দশক জুড়ে অবধি, যে সব হরর ফিল্ম হয়েছে, সেগুলো ছিল সাদা-কালো। গা-ছমছমে, আলো-আঁধারি আবহ অনেকটা তাতেই তৈরি হয়ে যেত। এবং এই ছবিগুলোর মূল বিষয় ছিল, প্রতিশোধ। উদাহরণ হিসেবে 'মধুমতী' (১৯৫৮), 'বিস সাল বাদ' (১৯৬২, বাংলা হরর-থ্রিলার 'জিঘাংসা'র রিমেক) 'ভূত বাংলা'র (১৯৬৫) কথা মনে করতে পারি আমরা। তবে অন্য ধরনের ছবিও কি হত না? ১৯৬৪ সালের 'কোহরা' ছিল 'রেবেকা'কে আধার করে গড়া। একই বছরের 'উয়ো কওন থি'তে গোটা ছবি জুড়ে ভয় পেতে পেতে, শেষে এসে আমরা দেখতে পাই, কেমন করে নায়ককে মানসিক ভারসাম্যহীন প্রতিপন্ন করার জন্য নিখুঁত ভয়ের প্লট বুনেছিল তার তুতো ভাই! ১৯৬৫ সালের 'পুনম কি রাত'এ দেখতে পাই, কেমন করে পূর্ণিমা রাতে মনের ভারসাম্য হারিয়ে, সকলকে ভয় দেখায় অন্যতম প্রধান এক চরিত্র! সিরিয়াল কিলিং নিয়ে তৈরি ছবি 'গুমনাম'এ (১৯৬৫) সার্থকভাবে বুনে দেওয়া হয়েছে হরর এলিমেন্টস।

এই সময়ের হরর ফিল্মগুলোর একটা বড় সম্পদ হল, গান। 'আজা রে পরদেসি', 'কহিঁ দীপ জ্বলে কহিঁ দিল', 'লগ যা গলে', 'সাথী রে, তুঝ বিন', 'নয়না বরসে'র মতো গানগুলো হিন্দি ফিল্ম সঙ্গীতের ইতিহাসে এক-একটা মাইলফলক হয়ে রয়েছে। সে সময়ের কমার্শিয়াল ছবির যাঁরা প্রথম সারির তারকা ছিলেন— মধুবালা, অশোক কুমার, দিলীপ কুমার, বৈজয়ন্তীমালা, প্রাণ, সাধনা, মনোজ কুমার, নন্দা— এঁরা প্রত্যেকেই দাপিয়ে অভিনয় করেছেন এ সব ছবিতে।

সত্তরের দশক থেকে হরর ছবি মেনস্ট্রিম থেকে কিছুটা আলাদা হয়ে যায়। একাধিক নির্মাতা উঠে আসেন, যাঁরা শুধু হররই বানাতেন। এঁদের পুরোধা অবশ্যই র‍্যামসে ব্রাদার্স— যাঁদের পথ চলা শুরু হয় 'দো গজ় জ়মিন কে নিচে' (১৯৭২) দিয়ে। সত্তর এবং আশির দশক জুড়ে 'দরওয়াজ়া', 'অওর কওন', 'সামরি', 'তহখানা', 'ভিরানা', 'পুরানি হাভেলি'র মতো হিট ছবি দিয়েছেন তাঁরা। র‍্যামসেদের ছবিগুলোর বিষয় ছিল একটাই... অশুভ শক্তির প্রথমে বাড়বাড়ন্ত, তারপর শুভ শক্তির হাতে ধ্বংস প্রাপ্তি। বিনোদ তলওয়ার, কান্তি শাহ, হরিনাম সিংহের মতো কিছু নির্মাতাও বি-গ্রেড হরর থেকে ভালই ব্যবসা করছিলেন এ সময়। তবে এই ছবিগুলো ভয়ের চেয়েও বেশি করে চলত সফ্‌ট পর্ন এলিমেন্টের জন্য।

হাড় হিম করে দেওয়া ভয় যাকে বলে, তা ফিরে এল নব্বইয়ের দশকে, রাম গোপাল বর্মার হাত ধরে। ১৯৯২ সালে তিনি বানালেন দ্বিভাষিক ছবি 'রাত' (তেলুগুতে 'রাত্রি')। গল্প, অভিনয়, স্ক্রিন টাইমিং, আবহ, এমনকি নৈঃশব্দ্যেরও ব্যবহারে বুঝিয়ে দিলেন, ভয়ের ছবির জগতে তিনি ছয় মারতেই এসেছেন! ১৯৯৯ সালে 'কওন'এ হরর এবং থ্রিলার নিয়ে জাগলিং করলেন স্বচ্ছন্দে। ২০০৩ সালের 'ভূত' দেখে অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠেনি, এমন দর্শক কমই রয়েছেন!

একই বছরে বিক্রম ভট্টের 'রাজ়'ও বেশ ভয় পাইয়েছিল! তবে রাম গোপালের তার পরের ছবিগুলো ('ডরনা মনা হ্যায়', 'বাস্তু শাস্ত্র', 'ডরনা জ়রুরি হ্যায়', 'অজ্ঞাত') তুলনায় দুর্বল। এই সময় থেকেই হরর ফিল্মের গ্রাফও কিছুটা নিম্নগামী হতে শুরু করে। ভাল ছবিও যে হয়নি তা নয়— 'ভুলভুলাইয়া', '১৩বি', 'স্ত্রী' যেমন... কিন্তু 'ডার্লিং' 'হেলপ', 'শাপিত', '১৯২০ দি ইভিল রিটার্নস', 'ক্রিচার থ্রি-ডি' জাতীয় ছবিরই রমরমা বেশি!

আশা জাগাচ্ছে ওটিটি?

বরং ওটিটি-র ছবি বা সিরিজ়ে হরর-এর নানা আঙ্গিক নিয়ে নিরীক্ষা চলছে। 'ঘুল'এ দেখানো হয়েছে ডিস্টোপিয়ান সমাজ কত দূর ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। 'বুলবুল', 'কালি খুহি' তুলে ধরেছে মেয়েদের, শিশুদের উপর সমাজের নির্মম নির্যাতন। 'অধুরা'তে দেখানো হয়েছে সহপাঠীদের 'বুলিং' এবং অত্যাচারের ফলে কীভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে নিষ্পাপ প্রাণ। আবার অকৃত্রিম হরর, অভিশাপ, জ়ম্বি... ইত্যাদিও দেখানো হয়েছে 'ঘোস্ট স্টোরিজ়'এর মতো ছবি বা 'বেতাল', 'টাইপরাইটার'এর মতো সিরিজ়ে। ওটিটি-তে কনটেন্ট হোক বা সময়, দুইয়েরই পরিসরের ক্ষেত্রে সুবিধা মেলে অনেকটা। ফলে হিন্দি কনটেন্টের ক্ষেত্রে অন্তত এই মুহূর্তে বড় পর্দার চেয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে রয়েছে ওটিটি।

সোজা কথায়, হররের মার আগেও ছিল না, এখনও নেই। কিছু নির্মাতা দর্শকের মন জিততে হার্ডকোর হরর নিয়েই খেলেন, কেউ ভয়ের সঙ্গেই মিশেল ঘটান অনেক জরুরি বিষয়, জরুরি প্রশ্নের। আর লাভবান হই আমরা, অর্থাৎ হররপ্রেমীরা! তাই বলি, পর্দায় ভয় দেখাতে সিদ্ধহস্ত যাঁরা, জয়, জয় হোক তাঁদের!

ছবি সৌজন্য: ইন্টারনেট

বিশাল ফাঁকা বাড়ি, মোমবাতি হাতে মধুবালার ঠোঁটে, লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে 'আয়েগা আনেওয়ালা'— এবং পুনর্জন্ম! ১৯৪৯ সালের 'মহল'কেই বলা হয় বলি-ছবির ইতিহাসে প্রথম হরর।



মহল





পুতুলপাট্টির শামিয়ানা

বীথি ব্রহ্ম

সাংবাদিক ও চিত্রগ্রাহকরা তল্পিতল্পা গুটিয়ে বেরিয়ে গেল। ধীমান পাল রাগে গরগর করতে করতে স্টুডিয়োর বাইরে বেরিয়ে আসে। গাছতলা থেকে দশ বছরের বাচ্চা ছেলেটাকে হিড়হিড় করে টেনে আনে ঘরে। কিছুটা দূরে ছিল বাচ্চাটার বাবা রবীন পাল।

ছেলেকে মালিকের কাছে যেতেই বারণ করেছিল। সাংবাদিকদের সামনে যখন গেছে, কিছু একটা অনর্থ না করে ছাড়বে না। বিখ্যাত মৃৎশিল্পী ধীমান পালের কর্মচারী রবীন পাল। সে-ও দক্ষ শিল্পী। ভাবনার জন্য হাতটা কেঁপে গেল। নিজের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে। আবার খাটনি আছে কপালে। কিন্তু ছেলেটার কপালে যে কী আছে! ভাবনাটাই তাকে উঁচু বাঁশের মাচা থেকে নামায়। নীচে প্লাস্টিক কাদা-মাটি, প্লাস্টার অফ প্যারিসে সব মাখামাখি। 'ঠিক কী করা উচিত' ভাবতে ভাবতে হাতটা লুঙ্গিতে গোঁজা বিড়িতে ঠেকে। ধরিয়ে ফুঁক ফুঁক করে টানতে থাকে। বোঝে, ছেলেটার মাটির ছাঁচ তৈরির হাত এই বয়সেই বেশ পরিণত। কিন্তু ণত্ব-ষত্ব জ্ঞানটা হয়নি।

"রবি রে, উঁকি মেরে দেখে আয় মালিক কী করে," জগাদা রবীনকে সজাগ করে। মাটি নিয়ে কাজ করতে করতে একেবারেই মাটির মানুষ হয়ে গেছে। সারা দিনে সকলের সঙ্গে একটা কী দুটো কথা বলে! সে মুখ খুলেছে দেখে রবীন হাঁটা দেয়। পা টিপে টিপে এগিয়ে মালিকের ঘরের জানলায় উঁকি মারল।

মালিক বলছেন, "জগাদা, আমাকে ভাত দাও। আর বুধুকে ওর বাবার তৈরি লাঞ্চ সেটটা দাও।"

রবীনের ছেলে বুধাদিত্য। ডাকনাম বুধু। ঘামে ভেজা বাদামি গেঞ্জি আর বারমুডা পরে ডাইনিং টেবিলে বসে রয়েছে অপরাধীর মতো মুখ করে। বিশুদা রান্নাঘর থেকে তরকারি, শুক্তো, আলুপোস্ত, রুই মাছের কালিয়া ভাতের থালার চার পাশে সাজিয়ে রাখল। শুক্তো দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে উনি প্রকাণ্ড ধমক দিলেন, "বললাম না, বুধুকে ওর বাবার তৈরি লাঞ্চ সেটটা এনে দে।"

ভয়ে ভয়ে বিশুদা রবীনের তৈরি লাঞ্চের সেটটা বুধুর সামনে রাখে। সে মুগ্ধ হয়ে দ্যাখে, বাবার হাতে তৈরি ভাত-ডাল-সব্জি-মাছের পদ। উফ্ফ! বাবার কী হাতের কাজ! বাবা সত্যিকারের বড় শিল্পী!

ধীমান শুক্তো দিয়ে মাখা ভাত মুখে তুলে বলল, "বুধু, যদি সবটা ভাত-ডাল-সব্জি-মাছ না খাস, তা হলে তোর বাবার বড় কাজটা ক্যান্সেল। পার্লামেন্ট ভবনের সামনের

নেতাজির ঘোড়ায় চড়া স্ট্যাচু ক্যান্সেল!"
"না না জেঠু, দেখো, আমি এক দানা ভাতও ফেলব না। বাবার কাজটা যেন ক্যান্সেল না হয়," বলতে বলতেই 'জামাই ঠকানো' ভাত-ডাল-তরকারি চিবোতে থাকল। রবীন বাইরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখতে পারল না। ছেলের গাল টিপে মুখের ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে চিৎকার করে বলল, "ফ্যাল, ফ্যাল! মুখ থেকে ও সব ছাইপাঁশ ফেলে দে।"
বুধুর চোখ জলে ভরে উঠল। কিন্তু মুখে অমলিন হাসি, "না না বাবা, অসুবিধে হচ্ছে না। মাটি তো কেঁচোতেও খায়।"
রবীন মাটির ভাতে হাত দিয়ে বলল, "দিল্লির কাজে আমার দরকার নেই।"
ঠান্ডা গলায় ধীমান বলল, "তাই, রবি?"
বুধু উত্তেজিত। বলল, "বাবা আমার কিচ্ছু হবে না। তুমি দেখে নিয়ো। এক দিন পেট খারাপ হলেও হতে পারে। আর কিছু হবে না।"
"রবীন দ্যাখ, তোর ছেলে কতটা সাহসী! তোর শুধু আতঙ্ক হচ্ছে।"
"হ্যাঁ বাবা, এ বারে ওই স্ট্যাচুটা যখন ওখানে বসানো হবে, তোমাদের সঙ্গে আমিও যাব কিন্তু। নেহরু ও লালবাহাদুর শাস্ত্রীর স্ট্যাচু দুটোর বেশির ভাগই তুমি করেছ, বলে দিয়েছি বলে উনি রেগে এমন করছেন।"
একটা ধমক দিয়ে ধীমান ওকে বলে, "রবি, তুই তো ওকে সরাতেই পারতিস। সাংবাদিকরা এসেছিল, চিত্র-সাংবাদিকরা কাজ করছিল, তবুও তুই নড়িসনি।"
রবীন কী বলবে ভেবেই পেল না। ওর চোখে-মুখে মস্ত বড় জিজ্ঞাসা-চিহ্ন। ওর উত্তর না পেয়ে ধীমান চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "তোর ছেলের স্পর্ধা দেখে আমি তো অবাক! বলে কী, 'জেঠু আসলে আজকাল এসব কিছুই করেন না। বাবা-কাকারা করেন'।"
রবীনের মুখে গভীর অবসাদ। মাথা তুলে কথা বলতে না পারার ব্যর্থতা। দু'হাত জোড় করে বলল, "প্লিজ় ধীমুদা, ওইটুকু ছেলের দিকে চেয়ে আপনার মায়া লাগছে না?"
"না তো! কেন লাগবে রে? ওই সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার তৈরি ইন্দিরাজি ও নেহরুজির স্ট্যাচু দুটো মাটি দিয়ে গড়ে, তার উপরে ব্রনজ়ের রং করলেন কেন?' বলেছিলাম, 'মাটির কাজেই আমরা সিদ্ধহস্ত। আমাদের রক্তে আছে বলে ওটা ছোট থেকেই পারি।' তোর পিছনপাকা ছেলে ফোড়ন কাটল, 'না গো সাংবাদিক কাকু, ওটা ধীমুজেঠু শুরু করেছিলেন। শেষটা বাবা করেছেন।' বুঝলি ব্যাপারখানা?"
রবীন ব্যথাতুর কণ্ঠে বলল, "দাদা ও সব তো আমরা জানি। আমি স্বীকারও করি। ওইটুকু ছেলের কথায় রাগ করবেন না। ওর পেটখারাপ হবে। এ বারে দয়া করে রেহাই দিন।"
তবুও ধীমানের রাগ নামল না। গনগনে আগুন চোখে বুধুর সামনের থালাটা টান মেরে ছুড়ে মারল। নিখুঁত মাটির খাবারগুলো চার পাশে ছড়িয়ে পড়ল। দুব্বো ঘাসের কোলে, কাঁখে মৃৎশিল্পের চমৎকারিত্ব শোভা পেতে থাকল।
নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী সমাজের একজন অধীশ্বরই বলা যায় ধীমান পালকে। কয়েক বছর আগেই রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। ও জ্বলন্ত চোখে রবীনের দিকে তাকায়। কথার মধ্যে দিয়ে তীব্র ক্ষোভ-অভিমান বেরিয়ে আসে, "রবি, তোকে হাত ধরে এ সব কাজ শেখাইনি?"
রবীনের মুখ কাঁচুমাচু হয়ে গেল। হাত কচলে বলল, "ধীমুদা দেখুন, আমি, জগাদা এ বিষয়ে কোনওদিন কিছু বলিনি। ও না বুঝে বলে ফেলেছে।"
"শোন! তোদের ভাত জুটত না। ওই জলঙ্গীর পারে শুধু হাঁড়ি-কলসি, কার্তিক-গণেশ আর মনসার পট বানিয়েই খেতে হত।"
"তা তো জানি ধীমুদা। আপনি আমাদের জন্য যা করেছেন..."
দ্বিগুণ তেজে ফেটে পড়ে ধীমান, "যাহ হতভাগা! অকৃতজ্ঞের দল! আমার মাস্টারস্ট্রোকে কুড়ি-পঁচিশ ভাগ হাত বুলিয়েই এই কথা! ছেলেকে ভালভাবে শেখাবি ব্যাপারখানা কী!"
ধীমান বিতৃষ্ণায় এঁটো হাত-মুখ ধুয়ে গজগজ করতে করতে নিজের শয়নকক্ষে ঢুকে গেল।
সন্ধের সময় জলঙ্গীর পার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রবীন ও বুধু, বাপ-ব্যাটা ঘরে ফেরে। রবীন পাল থমকে নদীর ধারে দাঁড়ায়। সূর্যাস্ত হয়েছে কিছু ক্ষণ আগেই। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা ঘরে ফিরছে। আকাশ, নদীর জল, মানুষ ঢেকে গেছে আলো-আঁধারিতে। শুধু কালো অবয়ব দৃশ্যমান হচ্ছে। মৃৎশিল্পের কাজে হাত পাকিয়ে এ সব অভিনব প্রাকৃতিক শোভাকে ধরা সম্ভব নয়। সেটা সম্ভব চিত্রশিল্পে। মনের কোষে কোষে তাই পাক খায়, ছেলেটাকে চিত্রশিল্পে দিলে কেমন হয়! কাগজের উপরে রং নিয়ে অনেক রকম খেলা যায়! ধীরে ধীরে রবীন বলে, "বুঝলি খোকা, তোকে আর্ট কলেজে ভর্তি করিয়ে দেব। তুই প্রকৃতির এ সব অসাধারণ মুহূর্ত ধরে রাখবি।"
বুধু করুণ ভাবে জিজ্ঞেস করে, "বাবা ধীমুজেঠুর কাছে তোমার কাজ থাকবে তো? দিল্লিতে পাঠাবে তো স্ট্যাচু বসানোর সময়?"
"কী যে বলিস! পাঠাবে না কেন!"
ততোধিক বিস্মিত বুধু বলে, "ধীমুজেঠু আমাদের উপর রাগ করল যে!"
এ বারে রবীন হা হা করে হেসে ওঠে। ওর উচ্চস্বরে হাসির শব্দে সন্ধেবেলা কলর কলর করতে থাকা শালিকগুলো এক ডাল থেকে অন্য ডালে উড়ে যায়।
হাসির দমক সামলে সে বলল, "ধুর বোকা, ওটা তো শুটিং ছিল। তুই দেখলি না, বাইরে থেকে ক্যামেরাম্যানকাকু ছবি তুলছিল? এটা বুঝলি না!"
একটু দম ধরে থেকে বুধু বলল, "হুম! বুঝেছি বাবা। কিন্তু তা হলেও আজ জেঠুকে খুব রাগী রাগী আর অচেনা লাগছিল তো, তাই বললাম।"
মৃৎশিল্পী রবীন ছেলের হাত ধরে বাড়ির সীমানায় ঢুকতে ঢুকতে বলল, "তা হলে বলতে হয়, ধীমুদা অভিনয় না জানলেও অভিনয়টা ভালই করেছে। ওর ধরন তো আমরা দেখছি। ভাল করেই জানি।"
মাত্র কয়েক মাস বাদে সারা শহরে রটে গেল ব্যাপারটা। খবরটা এক লহমায় মৃৎশিল্পী সমিতির ঘরের ভিতরটাকে নাড়িয়ে দিল। শুধু শিল্পী ও শিল্পের সঙ্গে জড়িতরা কেন, প্রচুর সাধারণ মানুষের

মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। ওরা বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এ রকম একটা পরিস্থিতিতে মৃৎশিল্প সমিতির সেক্রেটারি অনুকূল দাস এসে ধীমান পালের বাড়িতে প্রবেশ করল।

২

বাগানটা বেশ বড়। তবে সুসজ্জিত নয়। প্রায় সব ধরনের গাছগাছালি আছে। গাছে গাছে পাখপাখালি, কাঠবিড়ালি, হনুমানও লেজ ঝুলিয়ে বসে। উঁকি মারছে হরিণশিশু। পিছনে বুনো শিকারি কুকুর। সামান্য দূরে দুটো খরগোশ পলায়নরত। আসলে ওরা কেউই কোথাও পালাতে চাইলেও পারেনি। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এখানেই এ ভাবে আছে। ওরা হাতে-পায়ে গতিময় কিন্তু নিষ্প্রাণ। অনুকূল ও অভিনন্দন দাস, বাবা ও ছেলে এ সব পেরিয়ে ধীমানবাবুর ঘরে পৌঁছল। বিশুই অবশেষে তাকে খুঁজে পেল। পাড়ার একজনের বাড়িতে মাটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিল।
"কর্তা, আপনি এইখানে? ঘরে তো ছাত্র আর সমিতির প্রধান এসে বসে আছেন। এই বারে উঠে পড়েন।"
ওদের দেখে হাসিমুখে ধীমান বলল, "কী ব্যাপার? পথ ভুল করে নাকি?"
অনুকূল দাস সামান্য গম্ভীর মুখে বলল, "চার পাশে যা হচ্ছে, তাতে স্থির থাকতে না পেরে সাতসকালে এসেই পড়লাম।"
এক গাল হেসে ধীমান বলল, "চার পাশে আবার কী চলছে ভাই?"
"তুমি তো হাসি দিয়েই খালাস! আরে, তোমার উপরে যে ডকুমেন্টারি তৈরি হল, সেখানে কী দেখাচ্ছে জানো?"
"কী সব আবার কি? মাটি আর কুমোরের মধ্যে যেমন সম্পর্ক, সে সবই তো ছবি তুলে নিল।"
তত ক্ষণে তিন কাপ চা আর বিস্কুট রাখা হয়েছে টেবিলে। অনুকূল অন্যমনস্ক হয়ে একটা বিস্কুট তুলে নিতে ছেলে অভিনন্দন হাসতে লাগল, "বাবা, কামড় দিয়ো না! তুমি খেয়াল করবে তো!"
ছেলের কথায় একটু হকচকিয়ে গিয়ে বিস্কুটের দিকে বেশ তীক্ষ্ণ নজরে তাকাল। তারপর হেসে বলল, "এটার আমদানি কোত্থেকে হল?"
মাটির মানুষের মুখে মিঠে হাসি। চেয়ে থাকে সামান্য সময়। একটু রহস্য করে বলল, "আমদানি নয়, তৈরি করা। নৈনিতালে বেড়াতে গিয়েছিল ওরা, ওখান থেকেই শিখে এসেছে। কেমন হয়েছে, বলো?"
"তুমি তো চমক দিতে সিদ্ধহস্ত। এ পর্যন্ত তো কম দিলে না।"
কথাটা ধীমান পালকে উদাসীন করে তুলল। হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে এল কিছু শব্দ, "তোমরা বড় কাজে আছ। দশের কাজ। আমি মাটির সঙ্গে জড়িয়ে আছি মাত্র। মাটিতে হাত দিলে মাটি যেন কথা বলে! দশ জনকে মুগ্ধতা দেয়।"
অনুকূল জানে, এই শিল্পী-দাদাটির মধ্যে দার্শনিক সত্তা আছে। সেটা কখনওসখনও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।
ধীমান অমায়িক হাসি হেসে বলে, "বলো, বাপ-বেটা কী বলতে চাইছ?"
"দেখো দাদা, দেখলাম সারা শহর পোস্টার পড়ে গেছে। তোমার উপর তৈরি ডকুমেন্টারিতে শুনলাম, একটা সিনে তোমাকে ভিলেনের মতো দেখিয়েছে। এই ব্যাপারটাকে ঠিক হজম করতে পারছি না।"
চোখ বড় বড় করে ধীমান। তার পরে মুচকি হেসে বলে, "না ভাই, ইয়ে মানে সব মানুষের মধ্যেই তো সুরাসুর আছে। দেখালেই বা ক্ষতি কী? আর নইলে বড্ড সাজানো-গোছানো লাগছিল। আমার আমিকে আমি কতটা চিনি?"
অভিনন্দন আরও জোরালো ভাবে বলল, "স্যর! আপনি তো ও রকম আদৌ নন। অত্যাচারী শিল্পীর ভূমিকায় দেখানোটা আপনি মানলেন কী ভাবে?"
হা হা করে ধীমানবাবু হাসল। হাসিতে ঘরের সামনের খুঁটে খাওয়া পায়রাগুলো উড়ে গেল।
ধীমান প্রসঙ্গ পাল্টায়, "অভি, এখন আর্ট কলেজে কোন ইয়ার তোমার?"
"এই তো থার্ড ইয়ার চলছে। জানেন স্যর, আর্ট কলেজের ফাইন আর্টসের জগৎনারায়ণ স্যর তো আপনার ছাত্র শুনে, আমাকে অসম্ভব ইয়ে মানে স্নেহ করেন। প্রায়ই আপনার কথা জিজ্ঞেস করেন। উনি মাঝে মাঝে বলেন, 'ধীমান পালের হাতে জাদু আছে। মাটি ওর কথায় নড়ে-চড়ে, পোজ় দেয় আর পাথরও হেসে ওঠে।'"
এ সব কথা আগেও ধীমানের কানে এসেছে। কিন্তু নিজের ছাত্রের মুখে আর্ট কলেজের স্যরদের প্রশংসাসূচক কথা শুনে কবেকার একটা ঘটনা যেন ওর দুয়ারে হাজির হল। ওই আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল ওর বাবার সমসাময়িক ছিলেন। বাবাকে বলেছিলেন, ওখানকার সাম্মানিক অধ্যাপকের চাকরিটা গ্রহণ করতে। কিন্তু বাবা ক্লে মডেলিং-এর কাজ করতে খুব ওস্তাদ ছিলেন। কিন্তু বাঁধা-ধরা পড়ানো-শেখানোয় আপত্তি ছিল। তখন ওঁকে ক্লে মডেলিং-এর অফারটা দেওয়া হয়। মাসে এক বার ক্লাস করার কথা ভেবেছিলেন। তার পরে কী কারণে যেন আর হল না।
ওঁকে অন্যমনস্ক হতে দেখে অনুকূল বলল, "ধীমানদা, আমার কথায় ওরা চুপ আছে। বলেছি, আগে তোমার সঙ্গে কথা বলি। নইলে কলকাতার বড় পরিচালকের বিরুদ্ধে সরগরম হতই।"
ধীমান একটু নড়েচড়ে বসল।
অনুকূল বলে চলে, "তোমার সম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়া মানেই সারা নদিয়াবাসীর সম্মান নিয়ে টানাটানি।"
ধীমান অনুকূলকে একটু থামিয়ে বলল, "চলো, আগামী শুক্রবার রবীন্দ্র ভবনে প্রিমিয়ার শো। গেস্ট কার্ড দিচ্ছি। আগে দ্যাখো, তার পরে ভাবনাচিন্তা করে ওদের তুলোধোনা কোরো। পরের ধাপে মৃৎশিল্প সমিতির লোকেদের টানবে। যৌথ মতামত দিয়ো।"
অনুকূল ও অভিনন্দন বেরিয়ে গেল গেস্ট কার্ড নিয়ে।

প্রিমিয়ার শেষে ধীমান অনুকূলের দিকে তাকায়। চাউনির মধ্যে এমন কিছু ছিল, অনুকূলও লাজুক হাসে। বেচারা অনুকূল। সে কালের অন্যতম জঙ্গি নেতা। যেখানেই অব্যবস্থা বা বঞ্চনা বা বিচ্যুতি দেখত, ঝাঁপিয়ে পড়ত! ধীমানের ব্যাপারটায় মনে মনে অনেক দূর এগিয়েছিল। মৃৎশিল্পীর অসম্মান নিয়ে জ্বালাময় কিছু একটা... ধীমানের মুখের হাসির জৌলুস। পীযূষের

কাঁধে হাত রেখে খুব নরম করে বলে, "চল, আমার বাড়িতে। বসে কথা বলি।" চেনা টোটোওলা ওদের বাড়ি পৌঁছে দেয়। বাড়িতে পৌঁছে প্রায় জামাই-আদরের মতো ধীমান পীযূষকে বসিয়ে বলল, "দ্যাখ, অনুকূলের মধ্যে বিদ্রোহের বীজটা আছে। অনুকূল আলো-বাতাস-জল পেলে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চায়। আমাকে শ্রদ্ধা-ভক্তিও করে। আবার আমায় ভাঙিয়ে যদি প্রচারের আলোতে আসা যায়! ঠিক এই জন্যই ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিল। বারবার তাই বলছিল, 'ধীমানদাকে ভিলেনের মতো নিষ্ঠুর করা হয়েছে'। যদি সারা মৃৎশিল্পী সমাজ ঝাঁপিয়ে পড়ে!"

"যাই বলো ধীমানদা, অনুকূলদা কেন, আমরাও কিন্তু চমকে উঠেছিলাম তোমার নেগেটিভ রোলটা দেখে।"

হা-হা করে হেসে ওঠে ধীমান।

"বুঝলি পীযূষ, সত্যিই আমি এক দিন ও রকম স্বপ্ন দেখেছিলাম রে! ঘুম ভাঙতেই কেমন কাঁপতে থাকি। ভাবি, সত্যিই আমি এ রকম হতে পারি? তা হলে আমারই অবচেতন মনে লুকিয়ে আছে। কিশলয়কে বলি, ব্যাপারটা চিত্রনাট্যের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে। ও তো চায়নি প্রথমে। আমার অনুরোধে রাজি হল।"

"আচ্ছা, কথাটা হল, এটা তো তোমার বায়োপিক হল না!"

"না, হলই না তো! না হোক! আমার কথায় এটা একটা এক্সপেরিমেন্টাল ব্যাপার হল। কী বল?"

"তা হল। কিন্তু আমরা তো অন্য জিনিস চেয়েছিলাম।"

"আমি কিন্তু নতুন কিছু চেয়েছিলাম। আমার ভিতরের এই নিষ্ঠুর সত্তাটা ঘাপটি মেরে থাকতেও পারে। ওটাকে জনসমক্ষে কেমন দেখায়, জানার ইচ্ছে ছিল। তাই তো...," ধীমান একটু থামল।

পীযূষ যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায়। গেট দিয়ে বেরোতে বেরোতে বলল, "আসি গো।"

ঠিক তখনই ধীমানের মোবাইলের রিংটোন বেজে উঠল। ফোন তুলে দ্যাখে, নিবিড়—ওর বন্ধু। সুদূর ইংল্যান্ড থেকে করেছে। এর আগে নিবিড় ওকে লন্ডনের পার্লামেন্ট-ভবনের সামনে রবীন্দ্রনাথের প্রমাণ সাইজ়ের ব্রনজ়ের স্ট্যাচু করার প্রস্তাব দিয়েছিল। কথাটা আর বেশি দূর এগোয়নি।

৩

"উফ! বৌদি তোমরা কী করেছ? এত খাওয়া যায়?" বলেই হা-হা করে হেসে উঠল নিবিড় পাল। তার পর আবার বলল, "কী রে ধীমু, তোরা দু'জনেই মুচকি মুচকি হাসছিস যে! বৌদি সত্যি করে বলো দেখি, ব্যাপারখানা কী?"

মনের খুশিটুকু ঠোঁটের ভাঁজে তুলে আনে ধীমান। বলে, "তুই না হয় নিজের জন্মদিন পালন করাকে আদিখ্যেতা ভাবিস। আমরা তা ভাবি না। তা হলে তোর আপত্তি হওয়ার কথা নয়।"

এক সময়ের অভিন্নহৃদয় বন্ধুর দিকে চশমার উপর দিয়ে তাকাল নিবিড়। ছোট্ট করে উচ্চারণ করল, "আই সি! সত্যিই আমি পছন্দ করি না। কিন্তু মানিকচাঁদ, দেখি ঠকাচ্ছিস কি না!" বলে সামনের ভাতের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পরখ করল।

ধীমান-গিন্নি আরতি ছদ্ম-বিরক্তি দেখাল। বলল, "ঠাকুরপো আপনিও যেমন! প্রায় এক বছর বাদে এখানে এলেন। তার উপরে আজ জন্মদিন।"

নিবিড় কিছুটা ভাত মাখতে মাখতে বলল, "হুম! বিদেশে বসে সবই কানে গেছে। তুই না বললে কী হবে! জোর করে বাচ্চাটাকে মাটির ভাত খাওয়ানোর সিনটায় তোকে নাকি জেনুইন ভিলেনের মতোই লাগছিল!"

"ছাড় তো! নির্ঘাত অনুকূল বলেছে।"

"হুম! ওর সঙ্গে অবশ্য মেলে যোগাযোগ আছে। ধীমু, যতটা যা বুঝলাম, অনুকূল আটঘাট বেঁধেছিল আন্দোলনে ঝাঁপানোর জন্য। কিন্তু তুই-ই নাকি... আচ্ছা ধীমু ওটা তোর বায়োপিক নাকি ডকু, কী জাতীয় হল?"

ধীমান শীর্ণ মজবুত আঙুল দু'খানা কাঁচাপাকা চুলের মাথায় চালাল। তার পরে লাজুক হেসে বলল, "কিশলয়ের বায়োপিকই করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমি তো ওই উদ্ভট ব্যাপারটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। তাতে তো আর বায়ো-টায়ো রইল না। ইচ্ছে করল ওই সিনটা জুড়ে দিতে, তাই..."

নিবিড় খাবারগুলো চেটেপুটে খেতে খেতে বলল, "দ্যাখ ধীমু, ওটা যে নিছক দুঃস্বপ্ন তা তো নয়। অনেক বড় শিল্পীই কিন্তু এমন করেছেন বলে শোনা গেছে। ও সব যাক! তোরা যে আমার জন্মদিন মনে রেখে এ ভাবে চমকে দিবি ভাবিনি! বৌদি, বহু দিন বাদে পিওর বাঙালি খানা খেলাম।"

"কেন ঠাকুরপো! তোমার বৌ বাঙালি খাবার করে খাওয়ায় না?"

মাথা নিচু করে চাটনিটা চাখছিল নিবিড়। প্রশ্ন শুনে চুপ করে রইল। তার পরে ধীরে ধীরে কেটে কেটে উচ্চারণ করল, "সীমা এখন ওখানকার একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কাজ করে। প্রায় সারা দিনই ব্যস্ত। ও কন্টিনেন্টাল ডিশ দারুণ রাঁধতে পারে। তবে তোমার মতো আলুপোস্ত, মোচার বড়া, এঁচোড় চিংড়ি, পারশে মাছের ঝাল, এ সব পারে না।"

আরতি উঠে পড়ল। যেতে যেতে বলল, "তোমরা গল্প করো, নাতিটা খুব বায়না করছে। দেখে আসি।"

ধীমান বলল, "নিবু, চল আমার স্টুডিয়োতে। ওখানে গিয়ে গল্প করি।"

বসতবাড়ি পেরিয়ে সামনে বিশাল মাঠ। চার পাশে উঁচু উঁচু গাছ। সেগুলোর ছায়ায় ছায়ায় অপেক্ষা করছে প্লাস্টার



বাগানটা বেশ বড়। তবে সুসজ্জিত নয়। প্রায় সব ধরনের গাছগাছালি আছে। গাছে গাছে পাখপাখালি, কাঠবিড়ালি, হনুমানও লেজ ঝুলিয়ে বসে।

অফ প্যারিস বা স্টোনের স্ট্যাচু কিংবা প্লাস্টারের বাস্ট। কয়েকটা প্রমাণ সাইজ়ের স্ট্যাচুও আছে। নিঃশব্দে মুগ্ধ হয়ে দেখল নিবিড়। হঠাৎ অজানা কারণে খেপে উঠল, "ইট্‌স নট ফেয়ার ধীমু। বিদেশে শুধু উড নিয়ে আমি হাবুডুবু খাচ্ছি। আর তুই সবক'টা মাধ্যমে সমান তালে এগোচ্ছিস?"

ধীমানের স্বভাব শান্ত। হেসে বলল, "নিবু, আয় স্টুডিয়োর ভিতরে। দ্যাখ তোর পছন্দ হয় কিনা এটা?"

নিবিড় কিছু ক্ষণ পোর্ট্রেটের দিকে চেয়ে অস্ফুটে উচ্চারণ করল, "আমার ছবিটা কোথা থেকে জোগাড় করলি? পেন্টিংটা কী যে করেছিস!"

কথা বলতে বলতে হরিহর আত্মা বন্ধু ধীমুকে নিবিড় জড়িয়ে ধরল, "ধীমু, মানে তুই আমার জন্য এটা আঁকলি?"

"হুঁ! আঁকলাম। তোকে গিফ্‌টটা দেওয়ার জন্য ধৃতিকে দিয়ে জোগাড় করেছি। বল, তোর কেমন লাগল?"

নিবিড়ের চোখে তন্ময়তা। উপচে পড়া অশ্রু গিলে বলল, "তুই এত বড় মাপের শিল্পী হয়ে বন্ধুর জন্য...!" আবেগের বশে কথাগুলো বলে নিবিড় থামল।

"দ্যাখ নিবু! তুই যাই বলিস না কেন, আমি নিজের কাজ নিয়ে মোটেও সন্তুষ্ট নই। কাজ করছি এই ছোট এলাকার মধ্যে। ক'টা ভাস্কর্য বা পোর্ট্রেট করলাম, তাতেই বা কতটা গ্রেট হলাম! প্রথম প্রথম তোর মতোই ভাবতাম। আজকাল এ সব আর...!" বলতে বলতে ধীমান নিজেকে চেয়ারে পুরো ঢেলে দিল।

ধীমান প্রিয় চেয়ারখানায় নড়েচড়ে বসেন। বললেন, "বল, সে দিন কী বলতে চাইছিলি?"

"ঘটনা হল ইংল্যান্ডের সিংহাসনে এ বার লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসতে চলেছে। বুথফেরত সমীক্ষার ফল। প্রাইম মিনিস্টার হবে টম ম্যাকার্থি। ওর এক হবু মিনিস্টার বব সিনিক। বড় নামজাদা আর্কিটেক্ট। ওদের একটা পার্টিতে আমায় ডেকেছিলেন। শ্যাম্পেনের বোতল খুলে বলেছিলেন, 'মিস্টার পল, এ বারে কয়েকটা টরসো, বাস্ট ও স্ট্যাচু আমরা পার্লামেন্ট হাউসের চার পাশে বসাব। ইন্ডিয়ান গ্রেট মেনদের বাস্ট করতে হবে। সঙ্গে মার্ক্স ও এঙ্গেলসেরও বাস্ট করতে হবে। অফ কোর্স মার্বেল ও ব্রনজ়ের'।"

নিবিড় থেমে আবার বলল, "তখনই তোর কথা মনে হল। অবশ্য উনি তোর বাবার কাজ ইতিমধ্যেই দেখেছেন। ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ারে রাজা রামমোহনের ব্রনজ় বাস্ট আর রবিঠাকুরের স্টোন স্ট্যাচু দেখে উচ্ছ্বসিত। তোর কথা ওর কাছে সাজেস্ট করতেই এক কথায় লুফে নিলেন।"

টেবিল থেকে জলের গ্লাসটা তুলে নিয়ে এক ঢোঁক খেয়ে নিবিড় বলল, "কিন্তু বুঝলি ধীমু, আমার মনে যা-ও বা একটু আশা তির তির করে জেগে উঠেছিল, তা বিলীন হয়ে গেল।"

মিটিমিটি হেসে ধীমান বলল, "তা সত্ত্বেও তুই আমাকে কাজটা দিচ্ছিস কেন? তোর তো বুকটা ফাটুস ফাটুস করছে।"

"নে ছাড় ও সব!" নিবিড় বলল, "ছোটবেলা থেকেই দেখেছি। সবখানেই তুই বাজিমাত করতিস। তোর মধ্যে কোনও টেনশন দেখিনি। স্থির হয়ে থাকতিস। সামনে বিপদ এসে গেলেও ঠান্ডা মাথায় বিপদের মোকাবিলা করার উপায় ভাবতিস। টুক করে সল্‌ভও করে ফেলতিস।"

এর মধ্যেই এই বাড়ির বহু দিনের কাজের লোক বিশুদা এক রাউন্ড চা এনে রাখল। নিবিড় হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, "কী গো বিশুদা, চিনতে পারছ আমায়?"

বিশুদা লাজুক হেসে মাথাটা ঝুঁকে বলল, "আজ্ঞে মুনে আছে নিবিড় দাদাবাবু। তুমি তো কাঠের মেয়েমানুষের মূর্তি গড়তে। তার মধ্যে কতগুলোর মুন্ডু ছাড়া।"

ওর কথা বলার ঢং দেখে দু'জনে হা হা করে হেসে উঠল। লজ্জা পেয়ে বিশু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নিবিড়ের মনে পড়ল, পুরনো কিছু কথা। বলল, "এই ধীমু, মনে আছে তোর?"

ধীমান ওর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

"কলেজ ফেস্টের ক'দিন আগে কী অবস্থা হয়েছিল!" ধীমানের চিন্তার নিবু নিবু চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"সেই যে আমাদের ইউনিয়নের নেত্রী মল্লিকার প্লাস্টার অফ প্যারিসের নেকেড স্ট্যাচু গড়েছিলি?"

স্মৃতিপটে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল পুরনো সেই দিনের কথা। ধীমান মুখ খুলল, "ওটা দেখে মল্লিকার কী রাগ! তিড়িং করে লাফ দিয়ে উঠে বন্ধুদের বলেছিল, 'ধীমানের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করব।'

"আমরা হাত কচলে বলেছিলাম, 'প্লিজ় রাগ করিস না! ওটা আর্ট। ধীমু আর আমি আর্টিস্ট। আর্টিস্টরা সুন্দরের পূজারি। তুই তো ভীষণ সুন্দরী। তোকে সম্পূর্ণ ভাবে ওখানে সৃষ্টি করা হয়েছে। দেখবি মল্লি, তোর ছবিটা যেমন তেমন নয়, কালজয়ী হবেই।'

"কালজয়ী শব্দটা শুনে মল্লিকার মুখের গনগনে আগুনের তেজ নিভে এল। ব্যাপারটা দারুণভাবে চাখলাম। সুযোগটাকে সদ্ব্যবহার করলাম, বললাম, 'আমাদের জন্য এক পেগ করে ছাড় না প্লিজ়। মাথা খুলে যাবে।'

"তখন মল্লিকার তেজ নিবু নিবু। বলেছিল, 'খাওয়াতে পারি একটা শর্তে। আমার নুড ছবিতে পোশাক পরাতে হবে। রাজি?'

"চিৎকার করে বলেছিলাম, 'রাজি।'

"মল্লিকা উদার হয়ে বলেছিল, 'তোরা তো বন্ধু। কত খেতে পারিস, খা,'" একটু থামল নিবিড়। হা হা করে হাসল। তার পর বলল, "মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে ওকে জামাকাপড় পরিয়েছিলি। তার পর মল্লিকার মেজাজ ঠান্ডা হয়।"

নিবিড় একটানা বলে থামল। দু'জনেই কলেজ-লাইফের কীর্তিকলাপে হেসে খুন। হাসি থামিয়ে ধীমান বলল, "আচ্ছা নিবু, মল্লিকার খবরটবর জানিস? কত কাল ওর খোঁজ পাইনি।"

৪

গঙ্গা দূরে নয় ঝাউপুর থেকে। বেথুয়াডহরি ও দেবগ্রামের মাঝে অবস্থিত ঝাউপুর। এখানেই প্রায় ছয় বিঘা জমিতে ধীমান পালের নতুন স্টুডিয়ো। প্রতিটি গাছের নীচে কিছু না-কিছু স্ট্যাচু। এখানে বাচ্চারা ত্রিপলের নীচে বসে ক্লে মডেলিং করছে। বিভিন্ন বয়সের শিশু-কিশোর। ওদের সময় দেড় ঘণ্টা। কিছুটা দূরে বসে ধীমান ও নিবিড়। এই আইডিয়াটা ওদেরই

মস্তিষ্কপ্রসূত। ওরাই ঠিক করেছিল, একটা ছুটির দিন দেখে এমন একটা প্রতিযোগিতা করলে কেমন হয়! যেখানে সব বয়সি ছেলেমেয়েরা অংশ নিতে পারবে।
বেশি উদ্যোগী ছিল শিল্পী রবীন পাল ও মনোময় পাল।
ফুল শার্ট ও গ্রে কালারের ট্রাউজ়ার্সের সঙ্গে ক্যাম্বিসের জুতো পরে নিবিড় কিছু ক্ষণ ঘাসে একাই হেঁটে আসে। ফিরে এসে বলে, "ধীমু, তোর এই খোলামেলা স্টুডিয়োটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। এই জমিটা কবে কিনলি?"
"বছর পনেরো আগে। তখন জমিটা আমার জ্যাঠতুতো দাদা সুদিনের ছিল। ওর কাছ থেকে নিয়ে নিলাম।"
এই সময়ই দূর থেকে দৃশ্যমান হল, ধীমানের পুত্র ধৃতি, পুত্রবধূ ও নাতি। গাড়ি থেকে নামল ওরা। পাশের ম্যাটাডোর থেকে কয়েকটা বিশাল সাইজ়ের ডেকচি নামানো হল। নিবিড় জিজ্ঞেস করল, "এ সব কী ধীমু?"
"ওরা প্রতিযোগীদের জন্য কিছু খাবারদাবার আনল। এরা কত ক্ষণ ধরে কাজ করছে!"
"তোর তো সব দিকে নজর ধীমু!"
"এটুকু তো করতেই হবে। এছাড়া গার্জেনদের জন্য চা-বিস্কুটের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।"
ধীমান পাল এই স্টুডিয়োটা করেছে বাবার নামে—'শ্রীধরণী পাল ক্লে মডেলিং অকাদেমি'। ছোট্ট দুটো ঘর। পরে আর বিশেষ ব্যবস্থাপনা করে ওঠা যায়নি। ঘরের বাইরে বেশ কিছু সবুজ লতাপাতা। নিবিড় জুতো পরতে গেলে সে রকমই দুটো লতা এসে ওর গায়ে ঠেকল। হাত দিয়ে সরাতে গিয়েই মুখে হাসি ফুটল, "ধীমু, বেশ করেছিস। নকল লতা, বুঝতে পারিনি। আমিও বিলকুল বুরবক! দারুণ হয়েছে কিন্তু!"
ধীমান এখন নিবিড়ের পাশে পাশে। আনন্দে টইটম্বুর ওর মন, "বুঝলি নিবিড়, ওটাও উপরওয়ালার আশীর্বাদ। তুই এখানে দাঁত ফোটাতে পারবি না। আমাদের আর কী গুণ আছে! কত লোক গান-বাজনা, বাঁশি বাজিয়ে তাক লাগায়। আমরা না হয় ..."
নিবিড় ওর পিঠে হালকা চাপড় বসিয়ে বলে, "বিনয়ের অবতার এলেন!"
অন্য ঘরে ধীমানের ছেলে-বৌমা খাবারদাবার গুছিয়ে রাখছে। বাচ্চাদের জন্য প্যাকেট হচ্ছে। ওর নাতি এক ছুটে এসে দাদুর হাত ধরল।
বাচ্চাটার হাত ধরে ধীমান বলল, "যাও, ও দিকে বাচ্চারা চমৎকার ক্লে মডেলিং করছে, দেখে এসো।"
পল্লব বলল, "দেখেই তো এলাম দাদু। জানো তো, ওরা সব কিছু ভোঁতা ভোঁতা করছে। আমিই ভাল পারি।"
"পুলু, ওভাবে বলতে নেই! ওরাও পারবে এক দিন। কেউ আগে পারে, কেউ পরে।"
পল্লব ছুটে বেরিয়ে গেল। নিবিড় বলল, "তোর নাতির কাজ তো বেশ ভাল। সে দিন তো আমায় দেখাল। আমার বিশ্বাস তোর মতোই শাইন করবে।"
সে কথার উত্তর না দিয়ে ধীমান সখেদে বলল, "আমার ছেলে ধৃতি তো আর্ট ও কালচারের কিছু বোঝে না। রাজ্য সরকারের ভূমি ও রাজস্ব দপ্তরে আছে। দ্যাখ নিবু, বুকের মাঝে কষ্টের নদী বয়। অনেক স্বপ্ন ছিল ছেলেকে নিয়ে। কিন্তু ও কিছুই পারে না। অথচ সুপ্রতীক আমার ভাইপো, আমেরিকায় পিএইচডি করতে গেল। ওর ছেলেটাকেও নিয়ে গেল। ওখানকার সাহেবদের স্কুলে পড়ে, আদবকায়দা শিখেও পড়াশোনা চালাতে পারল না। রাত-দিন কাঠের মডেল ও প্লাস্টার অফ প্যারিসের কাজ করত।
"ওর বাবা অবশেষে বিরক্ত হয়ে এখানে পাঠাল। এখানকার এ ভি স্কুলে পড়ল। আগে কিন্তু ও রং-তুলি ধরেনি। আমাদের কর্মচারীদের কাছে কাজ শিখল। মাত্র দুটো বছর সময় নিল। বুঝলি তাতেই প্রায় কুড়ি বছরের কাজ করে ফেলল।"
নিবিড় আগের কথার রেশ ধরে জিজ্ঞেস করল, "তার পর?"
"তার পরে আর কী! দ্রুত হারে মূর্তি বানাতে শুরু করল। ওর একটা কাঠের জগদ্ধাত্রী মূর্তি অনূর্ধ্ব পনেরো ক্যাটেগরির বাচ্চাদের মধ্যে জাতীয় পুরস্কার পেল। মাত্র দু'বছরে প্রায় দশ বছরের কাজ করে ফেলল।"
নিবিড় ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "এতটা ক্যাজুয়ালি কথাগুলো বলছিস, যেন ফুটবল খেলতে গিয়ে ছোট্ট করে একটা গোল করেছে।"
"আরে তা নয়! তোর কথার রেশ টেনে বলছি, যেন ওর ভিতরের প্রতিভাই ওকে ও দিকে টেনেছে। তুইও শেষ বেলায় কিছু করবি আমার মন বলছে।"
বেশ কিছু সময় নীরব চার পাশ। সামনের বাচ্চাদের দিকে চোখ। ওদের কাণ্ডকারখানা দেখতে বেশ লাগছে। হঠাৎ অন্যমনস্কতার সুতোটা ছিঁড়ে গেল। ধীমান উৎসাহিত হয়ে উঠল, "শোন, মল্লিকা ফোন করেছিল।"
"মল্লিকা? আরিব্বাস। কোথায় থাকে রে? বাপের বাড়ি কি এখানেই?"
"উফ্‌ফ! বলছি বলছি। ও কী সব এনজিও টেনজিও করে। ওর স্বামী আর্কিয়োলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টে কাজ করত। এখন রিটায়ার্ড। এখন ওরা ওড়িশার ভুবনেশ্বরে আছে। তোকে-আমাকে যেতে বলল অনেকবার। তুই এখানে আছিস শুনে খুব হাসল।"
"বাহ! চল, বহুদিন শুধু বেড়ানোর জন্যই বেড়াইনি," ধীমানের মুখে মৃদু হাসি, "হ্যাঁ রে, আমিও বেড়াইনি শুধু বেড়ানোর জন্য।"
"চল চল বেরিয়ে পড়ি। এত বড় অফার ছাড়া যায় না। কয়েক মাস থাকব এখানে।"
"হ্যাঁ, মল্লিকা ফোন করলে বলব। নিবু, একটা জিনিস খেয়াল করেছিস?"
নিবিড় চশমা খুলে জিজ্ঞাসার চোখে ওর দিকে তাকায়।
"বাচ্চাগুলো ক্লে মডেলিংয়ে বেশির ভাগই হয় মা দুর্গা, না হয় জগদ্ধাত্রী মায়ের মুখ তৈরি করেছে।"
"তুই এতে বিস্ময় প্রকাশ করছিস কেন?"
"না, মানে আমি বৈচিত্র আশা করছিলাম। আমাদের পুতুলপট্টির নতুন কোনও ধরনের উত্তরাধিকার আসুক। বিশেষ ধরনের ঠাকুর-দেবতার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসা যায় কি না!"
এ সব কথার মধ্যেই বিশুদা বাচ্চাদের হাতে খাবারের প্যাকেট ধরিয়ে দিল। আস্তে আস্তে মুখের হাসি মিলিয়ে গেল ধীমানের। মন কোথায় যেন বিচরণ করতে শুরু করল। স্বগতোক্তি করল, 'সারা

পৃথিবীর মানুষ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই শিল্পচর্চা করছে। তিন লক্ষ বছর আগে হোমো ইরেকটাস যুগের গুহায়, সারা ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা, রাশিয়া, এশিয়া, আফ্রিকার সেই সব মানুষ পারলে আমরা এই আধুনিক যুগে পারব না কেন?' ধীমানের দু'চোখে শরতের হালকা সাদা মেঘের ছায়া। ভবিষ্যৎ-স্বপ্নরা উড়ে বেড়াচ্ছে। ওকে দেখে নিবিড়েরও তাক লেগে গেল। জিজ্ঞেস করল, "কী করার কথা ভাবছিস?"

"বেশ বড় ভাবনা রে! কাজও বড়। যা এ কাল থেকে কালোত্তীর্ণ হয়ে থাকবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মনে রাখবে। এটাই ভাববে, 'পালেরা এসেছিল। পৃথিবীর বুকে দাগ রেখে গেছে'।"

৫

বাড়িটা নতুন সাজে সজ্জিত। রঙিন কাপড় ও টুনি আলোর কারসাজির তুলনায় অন্য সাজের বাহার বেশি। বাড়ির গেট থেকে ঘর অবধি দু'পাশে কয়েক জন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা লোক। তারা হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। ধীমানের বিশাল দোতলা বাড়ি। গ্রিলের খাঁজে খাঁজে হলুদ ফুলের খুশির দুলুনি। স্টুডিয়োর সামনে আবার ফিরে এল নিবিড়। একটু ইতস্তত করে ধীমানকে ভিতরে দেখেই ঢুকল। ধীমান সব সময়ই কাজের মধ্যে। হয় কিছু ভাবছে, না হয় লে-আউট আঁকছে। নিবিড় মুখের হাসিটা ধরে রেখে চেয়ারে বসে বলল, "ধীমু, তুই না হয় মুনি-ঋষির মতো! তোর ধ্যান-জ্ঞানই ছবি ও ভাস্কর্যের দুনিয়া। আমার তো তা নয়।"

ধীমানের মন রিলিফের কাজের মধ্যেই। নিবিড়ের দিকে না তাকিয়ে বলল, "বসে পড়, কাজটা দ্যাখ। দেখে বল, কোথায় কী খামতি আছে।"

ধৃতি পায়ে পায়ে এসে স্টুডিয়োতে ঢুকল। খুশি খুশি মুখে বলল, "নিবুকাকা, তুমি কত ধরে বছর লন্ডনে আছ। অথচ তোমার মধ্যে সেই সারল্যটা কিন্তু দিব্বি টসটস করছে।"

নিবিড় হাসতে হাসতে বলল, "থাকলে কার কোথায় আপত্তি! তোরাই দিন-কে-দিন জটিল-কুটিল হচ্ছিস।"

ধৃতি দৃপ্ত, "পরিবেশ বাধ্য করছে গো কাকা। সে যাই হোক, তুমি বাবার তৈরি এই স্ট্যাচুগুলোকে চিনতে পারলে না?"

"আরে পারব না কেন? চমকে উঠেছিলাম। ওই দ্যাখ আরও অনেক লোকও চমকে উঠছে। দ্যাখ দ্যাখ।"

ধৃতিও তাকায়। ইতিমধ্যে পুতুলগুলোর সামনে লোকজন জড়ো হয়েছে।

ধীমানের নাতি খিলখিল করে হেসে ওঠে, "দাদু, দ্যাখো কত্ত লোক তোমার পুতুল দেখে ঠকে গেছে!"

নিবিড় বাচ্চাটার আনন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বলল, "ঠিক বলেছ, ওদের মতো আমিও বোকা হয়েছি। তোমার দাদু আমাকে ঠকিয়েছে। আমি ভুলেই গেছিলাম এটা বিখ্যাত ভাস্কর ধীমান পালের বাড়ি।"

ধীমান ওর কথায় কান রেখেছে মাত্র। নিবিড় বলল, "ধীমু, তুই যতই বিখ্যাত ভাস্কর হোস না কেন, আর্টের মাধ্যমটাকে তুই অনেক রকমের মোচড় দিয়েছিস, কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষ্ণনগরের পুতুলের ঐতিহ্যটা অটুট আছে।"

ধীমানের ভিতরে কেমন ইরিটেশন হতে থাকে। সক্কলে সেই পুতুল-নির্মাতার বৃত্তেই ঘোরাফেরা করছে। অথচ এই বৃত্তের গণ্ডি থেকে বেরনোর জন্য সে হাঁসফাঁস করছে! ইতিমধ্যে আরতি এসে নিবিড়কে বলল, "জানো ঠাকুরপো, আজ অবধি তোমার বন্ধুর তৈরি পুতুলগুলোর কোনটা আসল, কোনটা নকল, আমিও ধরতে পারিনি।"

ধীমান লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। গলায় ক্ষোভ, "এত বছর এখানে থেকেও আরতি তোমার এই কথা! আমি আসল না নকল, সেটা বুঝতে পার তো?"

আরতি গলা খাটো করে বলে, "খেতে এসো তোমরা!"

চলে যেতে যেতে বিড়বিড় করে, "কী জানি বাবা, মানুষটার কখন কী ধরনের মুড হয় কে জানে! এত দিনেও মানুষটাকে পুরোপুরি চেনা গেল না।"

টেবিলে বসে নিবিড় বলল, "বৌদি, কত দিন লুচি, ছোলার ডাল খাইনি। সরপুরিয়া-সরভাজা তো দূর অস্ত!"

অন্য দিকে ধীমান ঘাড় গোঁজ করে খেয়েই চলেছে। আরতি ও ছেলের বৌ আজকের ব্যাপারখানা বোঝার চেষ্টা করল!

এ বারে নিবিড় ভাতে হাত দিতে ভরসা পায় না! ধৃতি হাসিমুখে চোখ পাকিয়ে ধমক দেয়, "নিবুকাকা, খাও! তুমি না, সত্যি! ভাতে হাত দিতেও ভরসা পাচ্ছ না! তুমি কি আমাদের জামাই? ওদেরকে তামাশা করে ঠকানো যায়।"

"বলছিস ধৃতি!" বলেই সাদা মিষ্টিগুলো মুখে চালান করে দিল। চোখ বন্ধ। এর পরে একে একে অন্য সব খাবারে হাত গেল। নিবিড়ের হঠাৎ মনে পড়ল, "ওহ হো! ধীমু, তোদের বাড়িতে এলাম কিন্তু আমি তো কিছুই আনলাম না!"

"তুই শালা হাড়-কেপ্পন! তুই আনবি গিফ্‌ট! কলেজ লাইফে একটা বিড়ি তিন জন মিলে টানতাম। তবু তুই পকেট থেকে খসাতিস না!"

"আহ! কী হচ্ছে গো! সেই পঞ্চাশ বছর আগের কলেজ লাইফে ঠাকুরপো বসে আছে নাকি?"

"এ হে! ধীমু, কী রকম হল ব্যাপারটা! তোর ছেলে আর বৌদি আমায় এ ভাবে কাছা খুলে দিচ্ছে! এই, এই শোন! কার বিয়ে তাই তো জানি না। বিয়ে বিয়ে শুনছি।"

ধীমান আগেভাগে খেয়ে, প্লেট পরিষ্কার করে বলল, "বড় জ্যাঠার দুই ছেলে। বড়দা তো বিদেশে। ওর ছোট ছেলে, বিদ্যুৎ। ওরই এক মাত্র মেয়ের বিয়ে।"

মুচকি হেসে নিবিড় বলল, "ধৃতি, তোর বাবা কলেজ-লাইফে অনেক বার বোকা বানিয়েছে। সে দিন একটা কেসের কথা বললাম মনে আছে!"

ধীমানের মুড এত ক্ষণে স্বাভাবিক হয়েছে। মিটিমিটি হেসে বলল, "চল নিবু, ওঠ! রিলিফের কাজটা কেমন হয়েছে দেখবি চল।"

"ধীমু, তুই এগো। আমি আর দু'খানা লুচি আর ছোলার ডাল খেয়ে আসছি।"

খেয়েদেয়ে নিবিড় ধীমানের স্টুডিয়োতে ঢোকে। দ্যাখে, ধীমান নিজের সৃষ্টির দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছে। যেন অবগাহন করছে। কাছে গিয়ে বলল, "হ্যাঁ রে ধীমু, এই রিলিফের কাজটা ধরলি কবে? তুই তো এ সব নিয়ে খুব একটা মাতামাতি করতিস না!"

মগ্নতা কাটল ধীমানের, "আসলে ভাইঝি

ও জামাইয়ের জন্য এর চেয়ে বেটার গিফ্‌ট আর পেলাম না। ওর বিয়ের কিছু দিন আগেই করলাম। আজ আবার দেখছি কোথাও কম-বেশি রং হয়েছে কি না।”

বেলেপাথরের রিলিফটা থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না নিবিড়। পিছনের অংশে কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী ঠাকুর, রাজবাড়ি, সামনে ঘূর্ণির পুতুলপট্টির কিছুটা কোলাজ, তার সামনে পাত্রপাত্রীর প্যাশনের ছবি। পাত্র সেতার হাতে বসে আছে, পাশে পাত্রী কত্থক নাচের ভঙ্গিমায়। তার পরে এক্কেবারে সামনে পাত্র-পাত্রীর মালাবদলের ছবি। নিবিড় বলল, “ফ্যাবুলাস, আউটস্ট্যান্ডিং!”

আরতি এসে বলল, “এই নাও সোনার মুকুট আর টায়রা, নিয়ে বসিয়ে দাও।” ওগুলো দিয়ে ও চলে গেল। ধীমান সখেদে বলল, “দ্যাখ, এই সব ক্লে রিলিফের কাজ করে বাঙাল জামাইকে গিফ্‌ট দেব, তা আরতির মোটে পছন্দ না। তাই এ সব নিজে সোনার দোকান থেকে জোর করে গড়িয়ে এনেছে। চল নিবু, আমরা দাদার বাড়িতে যাই।”

বিয়েবাড়িতে মালাবদল ও শুভদৃষ্টির সময় হুলস্থুল! বরের বাড়ির লোকেরা ঘুণাক্ষরেও কিছু বোঝেনি। পানটা কোনওক্রমে উতরে গেলেও কনের ফুলের মালাটা আসল ছিল। কিন্তু বরেরটা হালকা মাটির ছিল। ওর হাতের চাপেই কিছুটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে গেল। বরের পায়ের চাপে চুরমুর করে ভেঙে গেল চামড়ার চটি। বাসরঘরে হাসির রোল উঠল।

ঠকানোর কথায় নিবিড়ের হঠাৎ মনে হল, মানুষকে মাটির জিনিস দিয়ে ঠকানো যায়। কিন্তু ঈশ্বর যদি এমন করে ঠকায়! তা হলে তখনও কি এমন হাসির খোরাক হবে? ধীমান বলে, “কী রে নিবু, এখানে একা একা কী ভাবছিস? অতীত নিয়ে ভাবতে হবে না। সামনের দিকে তাকা।” নিবিড় চমকে ওঠে।



নিবিড় কিছু ক্ষণ পোর্ট্রেটের দিকে চেয়ে অস্ফুটে উচ্চারণ করল, “আমার ছবিটা কোথা থেকে জোগাড় করলি? পেন্টিংটা কী যে করেছিস!”

৬

জলঙ্গী এখন বড্ড মনমরা হয়ে শুয়ে আছে। নানা কারণে শুকিয়ে-টুকিয়ে একসা। বেশ ক’টা খেয়া পারাপারের নৌকা গাছের সঙ্গে বাঁধা। ও পারে মায়াবন। এ পারের পাড়া থেকে রবীন পাল ঘাটের দিকে এগোল। হাতে ছোট্ট ব্যাগ। ঘাটের সামনে গিয়ে হাঁক পাড়ল, “কাঞ্চন, কাঞ্চন রে এ-এ! তুই এ-দিক ও-দিক আছিস নাকি?”

ওর কথা প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। নির্জন অঞ্চলে শুধু নিঃসঙ্গ আসশ্যাওড়া ও আগাছার ঝোপঝাড়। রবীন পাল ছেলেকে সঙ্গে করে নৌকায় উঠল। আবার রবীন কাঞ্চনকে ডাকে। নাহ! কাঞ্চনের হদিস পেল না। এ বারে অদ্ভুত উপায়ে বৈঠা না বেয়েই নৌকা চালু করল। গাছের গায়ে বাঁধা রশিটা ধরে ধরে বাপ-বেটায় ও পারে পৌঁছে গেল। ছেলে বুধু যেতে যেতে কৌশলটা রপ্ত করার জন্য আবদার ধরল, “বাবা, রশিটা দাও না! আমিও পারব।” রবীন বলল, “বড় হলে পারবি। এখনও ছোট তুই।”

ওরা জলঙ্গী পার হয়ে, ছোট্ট গ্রাম মায়াবনে পৌঁছল। বহু দূরে দূরে একটা-দুটো মাটির ঘর। হয় টালির চাল আর না হয় টিনের চাল। চার ধারে বেড়া। এ-দিক ও-দিক বুনো ঝোপজঙ্গল। রবীন ওখানে পৌঁছেই কী যেন খুঁজতে থাকে। ছেলে বুধু ওর গায়ে গা সেঁটে, জিজ্ঞেস করল, “বাবা, ও বাবা, কী গাছ খুঁজছ?”

“নামটা জানি না রে বাবা। কিন্তু দেখলে চিনব। ধীমুদার কাছে চিনেছিলাম।”

“ও দিয়ে কী করবে বাবা?”

“ও দিয়ে ঘাম তেল বানাব। সে সব পুতুল ও মূর্তির গায়ে লাগাতে হবে রে!”

বুধু উৎসাহিত হয়ে বলল, “আমি কিন্তু তোমায় সাহায্য করব।”

“করবি, করবি। অনেক দেরি আছে। দাঁড়া, আগে ওটা খুঁজে তো পাই!”

“জানো বাবা, স্কুলের বন্ধুরা কী বলছে?”

“কী বলছে?”

“ধীমুজ্যাঠা আমাকে ভালবাসে, আমি তাই ক্লে মডেলিং প্রতিযোগিতায় সেরা হয়েছি।”

“অ্যাঁ! তাই নাকি!” বলেই রবীন ছেলের দিকে তাকাল।

অবশেষে রবীন গাছটা খুঁজে পেল। ক’টা চারা উপড়ে নিল। খুরপি দিয়ে কিছুটা মাটিও তুলে নিল প্লাস্টিক ব্যাগে। বাপ-বেটা অল্প জঙ্গল ভেঙে এগোল। রবীন হাতের ছোট লাঠি দিয়ে ঝোপে আঘাত করল। বুধু উত্তেজিত হয়ে বলল, “গাছগুলোর গায়ে মারছ কেন? দেখছ না, ওরা কেমন ব্যথায় দাপাদাপি করছে!”

বুধুর কথায় রবীনের হাতের লাঠি থেমে যায়। অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলল, “ঠিকই বলেছিস। কিন্তু জঙ্গলে লাউডগা, চিতি, আরও সব সাপ থাকে যে! শব্দ করলে পালাবে।”

“ঠিক আছে, চলো বাবা,” বলে বুধু রবীনের হাত ধরে এগোতে থাকে। হঠাৎ দূরে বড় গাছের নীচে এক জোড়া ছেলেমেয়ে। একটু কাছাকাছি এসেই রবীন চমকে ওঠে। ফিসফিস করে বুধুকে বলে, “চল, ওই পাশের রাস্তা দিয়ে ফিরি। ওই ওখান দিয়ে যাওয়া যাবে না।”

“কেন বাবা? ওরা কে?”

“তুই চিনবি না!”

বুধু চুপ করে যায়। রবীন ওর হাত ধরে সমান্তরাল আর-একটা রাস্তার দিকে এগোয়। একা একাই বিড়বিড় করে, “ধীমুদার মতো মানুষেরও এত অশান্তি! বললেও ওর অশান্তি বাড়বে। না বললে সামনে বিপদ।”

“বাবা, সামনে কিসের বিপদ?”

“তুই বুঝবি না, চল এগিয়ে যাই।”

ফেরার সময় আরও লোক পাওয়া গেল ঘাটে। এবার সকলে মিলে নৌকার রশি ধরে ধরে এ পারে এসে গেল।
অশ্বত্থ গাছের ভাঙাচোরা মূর্তিগুলো দেখিয়ে বুধু বলল, "বাবা, এই মূর্তিগুলোর পুজো হয়ে গেছে বলে ফেলে দিতে হবে?"
অন্যমনস্ক রবীন উত্তর দিল, "তা হলে কী করবে?"
"তোমার মতো বড় হলে আমি এগুলোকে মন্ত্র বলে আবার নতুন করে দেব।"
রবীন বুধুর আবোল-তাবোল কথার উত্তর না দিয়ে ভাবতে থাকে, 'আজকাল স্কুলের মাস্টারমশাইরা বলাবলি করছেন, ওকে আর্ট কলেজে ভর্তি করালেই ওর ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হবে। তার পরে না হয় শান্তিনিকেতনের কলাভবনে। নাহ! এর চেয়ে বেশি স্বপ্ন দেখা ঠিক না। ছেলের উপরে দুটো মেয়ে আছে। তাদের ভবিষ্যতের কথাও তো ভাবতে হবে!'
"বাবা, এসে গেছি," বলেই বুধু এক লাফে ঘাটে নামল। বুধু চিৎকার করে বাবাকে স্মরণ করিয়ে দিল, "বাবা, তুমি ধীমুজেঠুকে জিজ্ঞেস কোরো কিন্তু আমি যা বললাম।"
যেতে যেতে রবীন হাসল, "ছেলেটা এক্কেবারে পাগল।"

রবীন এক বার ধীমানের স্টুডিয়োতে উঁকি মারল। সামনে বড় মাপের বিশাল আবক্ষ মূর্তি। বাংলার বাঘ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। কাজটা শেষের মুখে। ধীমান ওটার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে! রবীনও ভাবল। এই বেলা ওই সমস্যাটার কথা বলে দেওয়া ভাল। নইলে বিপদে পড়বে দাদা। রবীন সোজা পথে এগোয়। ঘরের দরজায় ঢুকতে যাবে, প্রায় মুখোমুখি হরি আর ওর ব্যাটা। হরিই বলল, "দাদা, একটা জরুরি কথা বলার ছিল।"
সৌম্যকান্তি ধীমানের মুখে চিন্তার জ্যামিতি। হরি নিজের ছেলেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। আবার কিছু বলার জন্য ইতস্তত করল।
ধীমান উঠে দাঁড়াল, তার পরে বলল, "হরি, তোর ছেলেকে মনোময়ের কাছে নিয়ে যা। আর রবীন, আমার ঘরে চল।"
ঘরে ধীমানের গিন্নি আরতি আর ছেলের বৌ সঞ্চিতা ছেলের স্কুলের পড়াশোনা নিয়ে আলোচনা করছিল। হঠাৎ ওদের ঢুকতে দেখে দু'জনেই চুপ করে গেল। ধীমান কর্তৃত্বের সুরে বলল, "বৌমা, ধৃতিকে ডেকে দাও তো!"
সঞ্চিতা কিছু একটা আঁচ করল। তাড়াতাড়ি ধৃতিকে ডেকে আনল।
"কী হয়েছে বাবা?" ধৃতি উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করল।
ওদের পারিবারিক ব্যাপার ভেবে রবীন বলল, "ধীমুদা, আমি পরে আসছি। আপনারা কথা সেরে নিন।"
"না, তুই যাবি না রবি। তুই নিজে চোখেই তো ঘটনাটা দেখে এলি। ধৃতিকে বল।"
আরতি বিব্রত হয়ে বলে উঠল, "কী হল গো!"
রবীন আবার বলল, "আমি এখন যাই।"
"আহ! রবি, বোস ওই টুলটার উপরে। তোর সঙ্গে দিল্লির স্ট্যাচুটা নিয়ে আলোচনা করার আছে।"
রবীনের মন নেচে উঠল। এ তো মেঘ না চাইতেই জল!
ধীমান জলদগম্ভীর গলায় বলল, "সন্তুর কথা বলছি। ওই অকালকুষ্মাণ্ডটার জন্য আর মুখ দেখানোর উপায় রইল না। ধৃতি বল, ওটাকে কী করে শায়েস্তা করা যায়!"
ধৃতির চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। ও বলে, "বাবা, আর না। অনেক ক্ষমা হয়েছে। উচিত শিক্ষা দেওয়ার সময় হয়েছে। শুনেছি, ওই শয়তান নারানকাকার মেয়েকে ট্র্যাপে ফেলেছে। ঠিক আগেরটার মতোই মডেল করে।"
আরতি ব্যাপার বুঝে চুপ করে থাকল। কিছু বললে একমাত্র ননদের রাগ হবে। ধৃতি বলে, "বাবা তুমি বার বার ওকে ক্ষমা করেছ। আমি হলে করতামই না। এ বার একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়ব," কথাটা বলেই ও ছিটকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হল। সঞ্চিতা ওকে আটকায়, "আহা! মাথা গরম কোরো না। আগে পিসিমণিকে ফোনে বলে দ্যাখো, উনি কী বলেন!"
ধীমান প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত, "বৌমা, পুঁটি আমার এক মাত্র বোন। বার বার ওর ছেলেকে ক্ষমা করেছি। আগে একটা মেয়ের সর্বনাশ করেছে। তাদের আমরা চুপিচুপি ক্ষতিপূরণ দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিয়েছি। লোকটা বড্ড গরিব ছিল। মেয়েটাকে কলকাতায় মডেলিংয়ের কাজ করে দেবে, এই লোভ দেখিয়ে নিয়ে গেছিল। লোকটার করুণ মুখখানার কথা ভাবলেই কষ্টে মনটা মুচড়ে ওঠে। আমাকে কিছু বলেনি। তবুও বিবেকের দংশন আজও হয়।"
"বাবা, সন্তু তোমার স্টুডিয়ো থেকে কাঠের টরসোটা তুলে বিক্রি করে দিল। তুমি কিছু বললে না!"
ধীমান একটু চুপ রইল। তার পরে বলল, "আজ একটু কন্ট্রোল কর ধৃতি। আমি পুঁটিকে বুঝিয়ে বলি আগে। আমার একটু ভুবনেশ্বরে যাওয়ার আছে, ঘুরে আসি। তার পরে যা করার করব।"
ধৃতি সংযত হল। চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করল, "ভুবনেশ্বরে কেন?"
"তোর মল্লিকাপিসি এখন ভুবনেশ্বরে থাকে। ওখানে যাওয়ার জন্য ফ্লাইট বুক করেও দিয়েছে।"
রবীন এ বার উঠে পড়ে, "তা হলে আমি যাই এখন।"
"ঠিক আছে। দিল্লির কাজটা হলে তোকে ডাকব। আর না হলে তো..."

৭

এয়ারপোর্ট থেকে বেরনোর মুখেই লোকটা দাঁড়িয়ে। লোকটার হাতে প্ল্যাকার্ড। মল্লিকার লোক। ওদের নিতে এসেছে। অজগর সাপের মতো রাস্তাটা বুক চিতিয়ে শুয়ে আছে। মসৃণ কালো চকচকে। দুই পাশে উঁচু উঁচু দেবদারু ও কিছু আকাশমণি গাছ। ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বর। এখানে দুই বন্ধু বহু বছর আগে বেড়াতে এসেছিল। বেশির ভাগ সময়েই বুড়িছোঁয়া হয়ে ঘুরে যাওয়া। তীর্থ ও সমুদ্র, এই দুটোর হাতছানি খুব বেশি। এখানে মল্লিকার জন্যই আসা হল! দু'জনেই মুগ্ধ। ড্রাইভার বিশাল গেটের ভিতরে গাড়ি ঢোকাতেই চমক ভাঙে ওদের। গেট থেকে ঘরে ঢোকার রাস্তা, লাল মোরামে ঢাকা। দু'পাশে আট-দশ ফুট সমান এরিকা পাম গাছের সারি। কী অপূর্ব শোভাবর্ধনকারী! ঢুকতেই বাড়ির দু'পাশে বাগান। মাঝে সরু পায়ে চলা মোরামের রাস্তা। একটা ছাতার আড়াল থেকে বয়স্ক এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। এগিয়ে বললেন, "ওয়েলকাম।"
তত ক্ষণে মল্লিকাও উচ্ছল হাসি নিয়ে

হাজির। গায়ে লম্বা গোলাপি কুর্তি ও সাদা পালাজো। এখনও মেঘের মতো এক ঢাল চুল। নিবিড় ও ধীমান হাসিমুখে মল্লিকার সামনে। মল্লিকা দুই বন্ধুর সঙ্গে স্বামীর আলাপ করিয়ে দিল। ওদের সাজানো-গোছানো বাগান চোখ টানার মতোই। ওরা মুগ্ধ। নিবিড় গাছের পাতায় বসা বড় লাল ফড়িং ধরতে পা টিপে এগোয়, সেটা উড়ে যেতেই মল্লিকা খিলখিল করে হেসে উঠল, "নিবু সেই রকমই ছেলেমানুষ আছিস! ঘরে চল।"
বিশাল ড্রয়িংরুম। মল্লিকা নিজেকে বাগানের গাছগুলোর মতোই সবুজ ও তরতাজা রেখেছে। মল্লিকা বলল, "তোরা ফ্রেশ হয়ে নে। বিনয় তোদের সব দেখিয়ে দেবে। আমি বরং শরবত পাঠিয়ে দিচ্ছি।"
পঁয়ষট্টি বছরের যুবতীর চলে যাওয়ার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওরা দু'জন। ধীমান নিজেকে কারুকার্য করা সুন্দর বেতের চেয়ারে ছেড়ে দিয়ে সরস মন্তব্য করল, "নিবু, ও কি আমাদের মল্লি, নাকি মেনকা-রম্ভার আত্মীয়া?"
নিবিড়ও দ্রুত ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল।
নিবিড় বলল, "সত্যি রে ধীমু, মল্লির এই বয়সেও চুলের বিউটি চোখ টানছে। দোহারা চেহারা, চুলের জেল্লা সত্যিই অ-সাম। ওরে, ওকে আমাদের বোনের মতো লাগছে!"
মল্লিকা শরবত নিয়ে ফিরে এল। সঙ্গে ওড়িয়া আয়া।
শরবত খেতে খেতে ধীমান স্বভাববিরুদ্ধ রসিকতা করে, "মল্লি, আমরা তো ঠাকুরদা হয়ে গেছি। তুই তো এখনও অজন্তার 'কৃষ্ণকুমারী' হয়েই আছিস। কী করা যায় বল তো?"
দুই পক্ষের মধ্যে কিছু ক্ষণ হাসি ও চটুল কথাবার্তা চলে। কথা শেষ হতে না-হতেই তিন জনের হো-হো হাসি। বহুদিন বাদে মল্লিকার ড্রয়িংরুম হাসিতে গমগম করে উঠল! এর মধ্যেই মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, স্মার্ট, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ির বিনয়বাবু হাজির। খদ্দরের হাফ শার্ট, নীচে বারমুডা। মল্লিকার চেয়েও বেশি মোবিলিটি আর রিফ্লেক্স। নিজেকে বেতের চেয়ারে সঁপে জিজ্ঞেস করল, "হাসিটা কী নিয়ে, শুনতে পারি?"
মল্লিকা আরও জোরে হা হা করে উঠল। গুছিয়ে বসে ধীমান বলল, "বিনুদা, মল্লির এলেম আছে। তাই নিপুণ ভাবে যৌবনটাকে আটকে রেখেছে। ওটার গোপন চাবিকাঠিটা চাইছিলাম। তা ও দেবেই না!"
বিনয়বাবু বলল, "একবার কী হয়েছে জানো! দু'জনে টুরে সাউথে একটা মিউজ়িয়ামে গেছি। কিউরেটর আমার পরিচিত। বলল, 'স্যর, আপনি আপনার মেয়েকে নিয়ে এখানে একটু বসুন। একটু চা খেয়ে যান।' আমি হতভম্ব। মেয়ে তো আমেরিকায়!"
সকলে বোমা ফাটার মতো হেসে উঠল। ঘর থেকে সমবেত অট্টহাসির শব্দ বাইরে গাছপালার গায়েও যেন ছিটকে গেল। হাসি থামল বিনয়ের সংযোজনে, "ওর রহস্যটা আমারও জানা নেই। তবে ওকে যোগা, মেডিটেশন, রেইকি, এ সব করতে দেখি।"
মল্লিকা এখনও যেন উজ্জয়িনীর কারুবাকি কন্যা! উৎফুল্ল হয়ে স্বামীর কথার উত্তরে বলল, "হুঁ হুঁ! কাজটা খুব সহজ না বাবু! অনেক কষ্টসাধন করতে হয়। যখন যা পেলাম, খেলাম বা যখন খুশি ঘুমোলাম, তা হলেই শরীরের বারোটা বাজবে।"
বাইরের পাম গাছের সারি থেকে অজানা সব পাখির ডাক শোনা গেল। ধীমান জিজ্ঞেস করল, "বিনুদা, ও সব কী গাছ? ভারী সুন্দর। মন জুড়িয়ে যায়।"
"আমার সঙ্গে বাগানে চলো ধীমু। সব দেখাচ্ছি। এই যে পাম গাছগুলো দেখছ, এদের নাম ফক্সটেল পাম গাছ।"
নিবিড় বিস্মিত, "ফক্সটেল কেন?"
"ভেরি সিম্পল। শিয়ালের লেজের মতো দেখতে এগুলোর পাতা। আসলে এই গাছগুলো অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ উপকূলে ও জাপানে পাওয়া যায়। ওখানে এসব বনে-বাদাড়ে পাওয়া যায়।"
মল্লিকা রান্নার তদারকি করতে যায়। নিবিড় বলে, "আচ্ছা বিনুদা, ঘরের ওগুলোও তো এক ধরনের পাম?"
ওর কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিনয় ঘরের দিকে এগোয়, "অবশ্যই ওগুলো পাম গাছ। ধীমু, এগুলো এরিকা পাম। জন্মস্থান সিয়ানা দ্বীপ। কোন যুগে যেন! মনে করতে পারছি না।"
"থাক, বটানি পর্ব শেষ হোক," মল্লিকা এক ঝটকায় লম্বা রেশমের মতো চুলের গোছা পিছনে সরায়।
রাতে ডিনার টেবিলে বিনয় প্রসঙ্গটা তোলে, "শোনো, আমি ট্র্যাভেল প্রোগ্রাম চক আউট করে রেখেছি।"
মল্লিকা নিজে হাতে রান্না করেছে। পরিবেশন করতে করতে জিজ্ঞেস করে, "ধীমু, তোর বৌ আর বৌমাদের মতো রান্নার ফ্লেভার বোধ হয় পাচ্ছিস না?"
নিবিড় বলে ওঠে, "ডাব-চিংড়িটা এক্সেলেন্ট হয়েছে। এটা লন্ডনে একদমই পাই না রে। ইন্ডিয়ান ডিশ খুব মিস করি।"
বিনয় বলে, "বুঝলে ধীমান, শুরুটা ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত লিঙ্গরাজ টেম্পল দিয়ে শুরু করলে কেমন হয়!"
"অবশ্যই! এ সব আমরা আপনার উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি, বিনুদা।"
নিবিড় খেতে খেতে বলল, "ভুবনেশ্বরের মিউজ়িয়াম যাব কিন্তু। আপনি এখানে কত বছর কিউরেটর হিসেবে কাজ করেছেন বিনুদা? কোন মিউজ়িয়ামে সবচেয়ে বেশি স্টক? প্রাচীন কালের সব সামগ্রী ও ঐতিহাসিক সামগ্রীর?"
"কলকাতা মিউজ়িয়াম পাল, সেন, মুসলিম ও গুপ্ত যুগের নানা জিনিসে সমৃদ্ধ। বৌদ্ধ ধর্মের নানান শিল্পও আছে। কিন্তু আর্ট ও স্কাল্পচারের দিক থেকে হায়দরাবাদ এক নম্বরে। অসাধারণ সব চিত্র ও ভাস্কর্য ওখানে। আমি থাকতে থাকতে তোমরা ওখানে গেলে..."
মল্লি বলে, "বিনু, কী যে বলো না! ওদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ হলই তো কয়েক মাস আগে।"
বিনয় সবাইকে 'শুভরাত্রি' জানিয়ে বলে, "কাল ভোরে আমরা যাত্রা শুরু করছি। রেডি থাকবে সকলে। আমি ড্রাইভ করে নিয়ে ঘুরিয়ে আনব।"

৮

শিশু, দেবদারু, আম, কাঁঠাল গাছগুলোর কোলে-কাঁখে শিল্প। আসলে ওগুলো চাপিয়ে রাখা হয়েছে। ওরা কিন্তু দিব্বি আছে! ওদের তেমন তাপ-উত্তাপ নেই। শিল্পীর বাড়ির গাছ বলে কথা। ভোর

থেকেই পাখিরা কল-কাকলিতে মুখরিত। ভোরেই ঘুম থেকে ওঠে সৌমেন পাল। নিজের স্টুডিয়োর সামনের রাস্তা ধরে প্রায় আধঘণ্টা হাঁটা। তার পর জগিং। বৌ সুনীতি ওর মতো ঘরের কাজ করে। দুপুরে একটা নার্সারি স্কুলে পড়ায়। ছেলে কলেজে পড়ে। ইচ্ছে করলেই নিজের উদ্দাম আবেগ নেভে না। এখন শুধু সৃষ্টির মধ্যেই সবটা তৃপ্তি। সৌমেন স্টুডিয়ো খুলে, ধুলো ঝেড়ে নিজের চেয়ারে বসে। চট করে মনে পড়ল একজনের আসার কথা। কোন এক স্কুলের শিক্ষক ওর ইন্টারভিউ নিতে আসবেন। পুতুলপট্টির যাঁরা জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন, মোটামুটি পরিণত বয়সেই পেয়েছেন। কিন্তু সৌমেন মাত্র আঠারো বছর বয়সে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় সম্মাননা হাতে আসে।

কয়েক দিন ধরেই একটা নতুন কাজের কথা মাথায় ঘুরছে। সুনীতি কেজি স্কুলে। তবে খাবারদাবার সব পরিপাটি করে টেবিলে সাজিয়ে-গুছিয়ে ঢেকে রেখেছে। মা গেছেন বোনের বাড়ি বেড়াতে। সৌমেন অন্যমনস্ক ভাবে রুটি-তরকারি আর একটু সরভাজা খায়। ওর মাথায় ভাবনাটা ঘুরঘুর করছে, কী ভাবে সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও ছোট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি বানানো যায়। ভাবতে ভাবতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ায়। ঠিক পিছনে দেওয়ালে সুনীতির অল্প বয়সের ছবি। সে একটা সময় ছিল। নতুন ভাবনা থেকে কাজ করে প্রথম সুনীতিকে দেখাত। সুনীতি অবশ্য ওর বহুকালের প্রেমিকা। বিয়ের পর একটা একটা করে সৃষ্টি করত আর বলত, “সুনি, দেখো তো কেমন লাগছে? ক্রেতারা নেবে?”

সুনীতি সাধুবাদ দিয়ে বলত, “এই না হলে আমার স্বামী! এমনটাই তো আমি স্বপ্নে দেখি।”

এ সব কোলাজ এখন সৌমেনের মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। এমন সময় বাইরে থেকে কে যেন ডাক দেয়, “সৌমেনদা, বাড়ি আছ?”

ও খুব দ্রুত স্মৃতির মেঘ সরিয়ে বর্তমানে ফেরে। মুখ বাড়িয়ে গলা উঁচিয়ে বলে, “আছি, এসো।”

একটু পরে সৌমেন বাড়ি থেকে স্টুডিয়োমুখো। রাস্তায় ধৃতির সঙ্গে দেখা। ধৃতিই কথা শুরু করল, “সমুকাকা, শুনলাম, এবার লন্ডন ও অস্ট্রেলিয়ার বরাত পেয়েছ?”

“নতুন কী? তুই তো জানিস। চোদ্দো বছর বয়সেই লন্ডনে ফেস্টিভ্যালে কাজ করেছি। ধীমুদাও জানে।”

ধৃতিও জানে। সমুকাকার জন্য ওর গর্ব হয়। নিজে এই শিল্পী বংশে জন্মেও কিছুই করতে পারেনি। হতাশ লাগে তার জন্য। কুমোরের চাকার মতো মনের মধ্যে ব্যাপারটা ঘোরে। ঈশ্বর যাকে যে কাজে পাঠিয়েছেন! ও এখন সরকারি চাকরি করে আর ওর বাবার সেক্রেটারি হয়ে যাবতীয় কাজ দেখাশোনা করে।

“আরে, ধৃতি কী ভাবছিস? চাকরিবাকরি কেমন চলছে?”

“ওই, যেমন চলে!”

সৌমেন বলে, “তোরাই ভাল আছিস। না গেলেও বাঁধা মাইনে।”

চোখ বড় বড় করে ধৃতি বলে, “সমুকাকা, তোমার কারখানায় আজকাল দশজন কর্মচারী কাজ করছে। সারা রাজ্য থেকে বাস্ট ও স্ট্যাচু অর্ডার পাচ্ছ। স্টুডিয়োতে এসি লাগিয়েছ। তুমি আমার সঙ্গে তুলনা করছ?”

“আরে ভাইপো, ঠিক আছে। একদিন আয় না সকলে মিলে। আচ্ছা, ধীমুদার খবর কী?”

“বাবা নিবিড়কাকার সঙ্গে ভুবনেশ্বরে বেড়াতে গেছে। ওখানকার মন্দির-স্থাপত্য এ সব দেখে ফিরবে।”

“দাদা তো ও সব কাজে অসম্ভব দক্ষ। যাই হোক, ফিরে এলে কথা হবে। চলি রে! একজন ইন্টারভিউ নিতে আসবে। একটু তৈরি হতে হবে।”

ঘণ্টাদুয়েক বাদে দু’জন মাস্টারমশাই সৌমেনের স্টুডিয়োতে ঢোকেন। কর্মচারীরা বিভিন্ন মূর্তি বাস্ট তৈরিতে ব্যস্ত। রামকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, রাসমণি, কার্ল মার্ক্স, এছাড়া বিখ্যাত এক ব্যবসায়ীর। ওঁরা দেখেন, ওয়র্কশপের বাঁ দিকে প্রমাণ সাইজ়ের এক বৃদ্ধ লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে। অন্য হাত নাতির হাতে। দুটো মূর্তিই অত্যন্ত জীবন্ত। ওঁদের মধ্যে একজন স্থানীয় শিক্ষক, নারানস্যর। অন্যজন বাইরের স্কুলের শিক্ষক, নাম হল গৌরব। নারানস্যর নমস্কার ও কুশল বিনিময় করে বলে, “আসলে আমার এই বন্ধু গৌরব আপনার জীবনী লিখবে।”

গৌরব অবাক হয়ে দেখছে, তার সামনে বসে আছেন বিরাট গুণী ও জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী! ভাবতেই ওর রোমাঞ্চ হচ্ছে!

নারানস্যর বলে, “গৌরব, তুই কথাবার্তা বল। আমি বাইরে থেকে ঘুরে আসি।”

গৌরব হালকা হেসে কথা বলা শুরু করে, “স্যর! আমি শুনেছি, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাংলাদেশের ময়মনসিংহের নাটোর থেকে কয়েক জন শিল্পীকে আনেন। তারা এখানে থেকে জগদ্ধাত্রী ঠাকুর তৈরি করেন। কিন্তু আর স্বদেশে ফিরে যাননি। পরবর্তী কালে ঘূর্ণিতে বসতি ও বংশবিস্তার করেন এবং এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। এ কাহিনিটা কথিত আছে। এ কাহিনি কি অথেনটিক?”

সৌমেন পাল নিজের গদিআঁটা রিভলভিং চেয়ারে বসে। ও বোঝে, গৌরব হোমটাস্ক করেই এসেছে। শুধু যাচাই করে নিচ্ছে। পরের প্রশ্ন, “আচ্ছা স্যর, ঘূর্ণির পুতুলপট্টি তো মাটির পুতুলের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু চার পাশে তো মাটি ছাড়া আরও কিছু দেখছি।”

“ঠিকই বলেছেন ভাই। আসলে পাঠ্যপুস্তকে বা ভ্রমণসংক্রান্ত বইতে লেখা আছে, পুতুলের জন্য পুতুলপট্টি। কিন্তু কথা হল, এগুলো তথাকথিত টয় বা ছেলে-ভোলানো পুতুল নয় মোটেও।”

“এই দেখুন,” বলে সৌমেন সামনের তাক থেকে দু’হাতে দুটো খুদে পুতুলের ট্রে নামিয়ে আনে, “দেখুন ভাল করে!” গৌরব দেখে, একটা ট্রে-তে একটা মুচি লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরে বসে। গালে কাঁচা-পাকা দাড়ি। মাথায় উস্কোখুস্কো চুল। চোখ কোটরে। গাল তোবড়ানো। হাতের শিরা ওঠা। সামনে জুতো সারাই করার যন্ত্রপাতি। সূচ-সুতো, ছেঁড়া জুতো। এত নিখুঁত!

গৌরব স্পেলবাউন্ড। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সৌমেন বলে, “এই ধরনের আর্টকে বলে রিয়্যালিস্টিক মিনিয়েচার। এটাই ঘূর্ণির ঘরানা।”

অন্য ট্রে-তে আর একটা মিনিয়েচার, এক মেছুনি বড় বঁটিতে মাছ কাটছে। চার পাশে ছোট-বড় কাটা রক্তাক্ত মাছ। ওর পরনে লাল ডুরে শাড়ি। হাঁটু অব্দি। মাথার ঘোমটা এক দিকে খোলা। বড় খোঁপা বাঁধা। গৌরব নিজেও এক সময় ফাইন আর্ট নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে। এ সব দেখে থমকে

রইল কিছু ক্ষণ। কর্মচারীরা চা দিয়ে গেল ওদের। চায়ে চুমুক চলল। সঙ্গে কথাবার্তা। গৌরব বলে, "স্যর, আপনি বললেন এ সব পুতুলের পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক ও জেলা পরিচিতি থেকে ওই শব্দবন্ধ তুলবেন কীভাবে?"
সৌমেনকে সামান্য চিন্তিত দেখায়। বলে, "আপনাদের কলমে উঠে আসুক না। লেখক, প্রাবন্ধিকদের কথায়-কাহিনিতে উঠে এলে সকলের চমক ভাঙবে।"
কিছু ক্ষণ কথার পর গৌরব প্রশ্ন করে, "স্যর, আপনি যে কাজের জন্য জাতীয় পুরস্কার পেলেন, সেটা যদি দেখান!"
সৌমেন চায়ের কাপগুলো কর্মচারীদের নিয়ে যেতে বলে। নীচের ড্রআর থেকে কিছু খবরের কাগজের কাটিং ও জ়েরক্স বের করে। নানা ধরনের ক্যাপশন। বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রের কাটিং। হলুদ, জরাজীর্ণ। ভীষণ আবছা। কিন্তু পড়া যাচ্ছে 'পুতুলপট্টির কিশোরের কাজে মুগ্ধ ব্রিটেন। মাত্র আট ঘণ্টার মধ্যে ব্রিটিশ রাজপরিবারের বাস্ট ও নিখুঁত সুন্দর আবক্ষ তৈরি। কিশোর সৌমেন পাল। বয়স চৌদ্দ।'
সৌমেন বলে, "আসলে, আমি রিয়্যালিস্টিক কাজ করতে ভালবাসি। তাই এ সব নিয়ে মাটি দিয়ে কাজ করেছিলাম।"
গৌরব কাটিংগুলোর ফটো তোলে, "সে সব কাজ কি দেখা যাবে স্যর?"
সৌমেন মুখটা কাঁচুমাচু করে বলে, "এটাই মুশকিল। মাটি এত বছর থাকে না। চল্লিশ বছর আগের তৈরি। এই যে, ছবি আছে। আসলটা নষ্ট হয়ে গেছে।" অন্য একটা ফাইল থেকে কাগজটা টেনে বের করে।
গৌরব নিজের কাজের জন্য সারা ঘরের নানান ফটো তোলে। সঙ্গে মিনিয়েচারের ছবিটা বেশি গুরুত্ব পায়। একটা সাদামাটা গ্রামবাংলার চালচিত্র। একটা মেটে বাড়ি। পাশে কুয়ো। লোকেরা সব্জি বিক্রি করছে, মাছও। কী নিখুঁত! কী নিপুণ! অপূর্ব দক্ষতায় তৈরি।
গৌরব অনেক ফটো তোলে। কিন্তু এই 'গ্রামবাংলার চালচিত্র' বুকের ক্যামেরায় ছবি হয়ে থেকে যায়।
ওঠার সময় নমস্কার জানিয়ে বলে, "এই ছবিটা শুধু ছাপার নয় স্যর। বুকে রাখার। রইল আমার বুকের অ্যালবামে। উঠি।" সৌমেন গৌরবের হাতটা আলতো করে ধরে। শিল্পী ও শিল্পরসিকের এই যুগলবন্দিটা দেখার মতো। তবে জীবন্ত কেউ নেই! শুধু আছে নিখুঁত সুন্দর মূর্তিগুলো। ওরা যেন বলে ওঠে, 'আমরা আর পুতুল নই। শিল্পী আমাদের প্রাণদান করেছে গো!'

৯

গাড়ি ছুটছে দু'পাশের সবুজ সমুদ্রের মধ্যে পথ কেটে। পিছনের সিটে ধীমান ও নিবিড়। মাঝে মল্লিকা। মল্লিকার গলায় শ্লেষের সুর, "দেখলি তোরা, মিলিটারির মতো ডিসিপ্লিন দেখায়! যেন দেশের কাজে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে।"
বিনয়ের প্রৌঢ় মুখে মুচকি হাসি, "দু'পাশে দু'বন্ধু নিয়ে দিব্যি আসর জমিয়ে তুলেছ। আড্ডা চালিয়ে যাও। আমিও আনন্দে ফুরফুর করে গাড়ি চালাই।"
"দেখলি কথার ছিরি!"
ধীমান ও নিবিড়ের মুখে নিঃশব্দ হাসি। বিনয়ের দক্ষ হাত। গাড়িটাকে সাইড করল লিঙ্গরাজ টেম্পলের সামনে। গাড়িতে চাবি দিয়ে বিনয় গাড়ি থেকে নেমে গাইডের ভূমিকায়। সাদা-কালো ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হাত বুলিয়ে গাইড বলল, "এই হল বিশ্ববন্দিত লিঙ্গরাজ টেম্পল।"
ওর মাথায় হলিউডি হ্যাট। একটু কেতা দেখিয়ে বলল, "আজ তো কাজটা ভাল করে করতে হবে, সঙ্গে দুই বিখ্যাত শিল্পী। এঁদের আবার মানস চোখ আছে!"
কথাটা বলেই বিনয় গট গট করে মন্দিরের ভিতরে ঢুকে গেল। ওরা তিনজন পিছনে।
বিনয় বলল, "বুঝলে, দেবতা এখানে স্বয়ম্ভু। আধা শিব আধা বিষ্ণু। অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত, পাতালের অধীশ্বর।"
ধীমান, নিবিড়ের চোখে-মুখে প্রশস্তিসূচক অভিব্যক্তি। আশপাশ দিয়ে আরও দর্শনার্থী মন্দিরের ভাস্কর্য ও কারুকার্যে মগ্ন। এক দিকে বিশ্ববন্দিত মন্দিরের কারুকার্য শিল্পীসত্তা লেহন করছে। অন্য দিকে মল্লিকা ও বিনয়বাবুর চমৎকার সঙ্গসুখে মন ডুবে আছে।
"এসো এসো সকলে। এই যে গর্ভগৃহ। লিঙ্গমূর্তির ব্যাস দুই থেকে পাঁচ মিটার। শক্তিপীঠের উপরে গ্র্যানাইট পাথরের কাজ। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম লিঙ্গরাজ। পুরীর মতো এখানেও রথযাত্রা, দোলযাত্রা ও চন্দনযাত্রা উৎসব হয়।"
"এই, এবারে চলো না প্লিজ়! মাঠে গিয়ে বসি। চা-টা খেয়ে আবার না হয় ঘুরব। তার পর তোমার ভ্যাজর ভ্যাজর না হয় শুনব," বলেই মল্লিকা কলেজপড়ুয়াদের মতো জিভ কাটল। ওর রেশমি লম্বা চুলে রঙিন রিবন বাঁধা। টাইট টোল না খাওয়া ফিগারে একটা কাপ্তান কুর্তি ও জিন্স পড়েছে। সুডৌল বুকের মাঝ বরাবর একটা ব্যাগের বেল্ট চেপে বসেছে। কানে, গলায় পাথরের গয়না।
বিনয় চোখ ছোট করে বলল, "কী বললে? ভ্যাজর ভ্যাজর? এটা তোমার বন্ধুদের কাজে লাগবে। ওরা তো বিখ্যাত শিল্পী। জাতশিল্পীও বলা যায়।"
"বিনুদা, ও সব ছাড়ো তো, তুমি নিজেও তো পুরাতাত্ত্বিক। তুমি নিজের মতো করেই বলো। আসল কথা হল বোঝা।"
শুনে বিনয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নব্য যুবকের মতো করে ধীমানের কানের কাছে ফিসফাস করে বলল, "তোমাদের বান্ধবী আমার কদর কোনওদিনই বোঝেনি।"
ওরা উৎসাহ দিয়ে বলে, "বিনুদা, মল্লি না বুঝলেও আমরা ঠিক বুঝি।"
বিনয় প্রবল উৎসাহিত। মন্দিরের পূর্ব দিকে দেওয়ালে হাত দিয়ে বোঝায়, "জানো তো, এটা ওড়িশার মন্দিরের মতো একই আঙ্গিকে গড়ে উঠেছে। বিমান, জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ। আচ্ছা, ভোগমণ্ডপ কী জানো?"
ধীমান বলল, "দেবতাকে ভোগ্যবস্তু দেওয়ার ঘর।"
বিনয় বলল, "আমার কর্মজীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, মন্দিরের স্থপতিরা মন্দির নির্মাণের আগে প্রতিদিন শুদ্ধ বস্ত্রে ও শুদ্ধাচরণ করে কাজে নামতেন।"
"বাহ! দারুণ তো!" দুই বন্ধুই বেশ উৎফুল্ল।

"তবে বুঝলে, ভাস্কর্যের মধ্যে রোমান্টিকতা থাকলেও স্থাপত্যে তেমন কিছু নেই।"
সকলের হাতে কাগজের চায়ের কাপ। ছোট কাগজের ডিশে স্ন্যাক্স আর চানাচুর।
"চা-টা সত্যিই সুন্দর হয়েছে রে মল্লি," নিবিড় বান্ধবীকে প্রশংসা করে।
এর পরের আইটেম বাঙালি পিঠে। সুজি, ছাতু ও নারকেল দিয়ে বানানো।
"বাহ! বাহ রে মল্লি, তোর এই গুণের কথা জানা ছিল না," ধীমান কমপ্লিমেন্টটা দিতে ভোলে না।
"অনেক তো খাওয়া-বসা হল। চলো এ বারে বিন্দু সরোবরে যাওয়া যাক!"
গাইড বিনয় তৎপরতার সঙ্গে সরোবরের তীরে নামাল। বিনয়ের মুখে ঝলমল হাসি। বলল, "জানো ধীমান, অতীতে এই জায়গার নাম ছিল আম্রকানন। পার্বতীর প্রিয় জায়গা ছিল। বেড়াতে এসে কৃতি ও বাস নামে দুই দৈত্যের সামনে পড়েন। দু'জনেই ওঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করতে চায়। পার্বতী শর্ত দেন। শর্ত মতো দুটো দৈত্যই ওঁকে কাঁধে তুলেছিল। তো, দেবীর ভারে দুটো দৈত্যই পিষে গেল। তখন পার্বতী ক্লান্ত ও পিপাসার্ত। শিব ওখানে হাজির হলেন। পার্বতীর পিপাসা মেটাতে তৈরি হল সরোবর। সব নদ-নদী, সরোবর থেকে বিন্দু বিন্দু জল নিয়ে তৈরি হল বলে নাম বিন্দু সরোবর।"
গল্প শেষ হতে-না-হতেই মল্লিকা ঠিক রাজনন্দিনী নয়নিকার মতো খিলখিল করে হেসে উঠল।
ধীমান ওর দুষ্টুমি বুঝতে পারল। কাছে গিয়ে বলল, "মল্লি, তুই কিন্তু আমাদের কাঁধে চড়তে পারতিস। তবে আমরা মোটেও দৈত্য বা অসুর ছিলাম না।"
বিনয় এখনও ওর জগতেই আছে। ও বলল, "এখানে পিপাসার্ত শব্দটা কিন্তু প্রতীকী।"
"বাপ রে! আর ভেঙে বলতে হবে না গো। আমরাও ঠাকুরদা-ঠাকুরমা হলাম। ওটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না।"
ধীমানের মোবাইলের রিংটোন বেজে ওঠে। সৌমেনের নাম স্ক্রিন জুড়ে ভেসে ওঠে।
ধীমান বলে, "সমু, বল।"
"তুমি তো শুনলাম ভুবনেশ্বরে। ঘোরো, কাজের খোরাক পাবে। আমার তো কলকাতার বাইরেই যাওয়া হয় না। এটাও কপালে থাকা চাই।"
"তুইও সুযোগ পাবি। কী বলবি বল।"
"ও হ্যাঁ। গৌরবস্যর আমার ইন্টারভিউ নিতে এসেছিলেন। প্রথমে জীবনী লিখবেন। তার পরে ফিচার ফিল্ম করবেন। এক দিনের সিটিং হয়েছে। আবার আসবেন বলেছেন।"
"অভিনন্দন সমু। তুই তো পুতুলপট্টির গর্ব রে! ফিরে তোর স্টুডিয়োতে যাব। নতুন কাজে হাত দিয়েছিস নাকি?"
"ভাবনা-চিন্তা তো জাগছেই, কিন্তু একটা ফান্ডের জায়গা থাকলে তবে না!"
"সেটাই আমাদের সমস্যা। মৃৎশিল্পীরা ধুঁকছে। দুটো বছর করোনাকালে কুমোররা একপ্রকার মাটি কামড়েই ছিল। কেউ সাহায্য করার ছিল না। ফোরামে যারা আছে, নিজেদের আখের গোছাতেই ব্যস্ত। শিল্প ও শিল্পীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার সময় নেই। অনুকূল সর্বহারা কুমোরদের নিয়ে একটু লড়ত। এখন ওদের সামনেও দরজা বন্ধ," বলে ধীমান থামে।
"ও কে দাদা! তোমাদের বেড়ানোতে ডিস্টার্ব করলাম।"
"না, ঠিক আছে। ফিরে যাই তার পরে।"
"নে ধীমু, উঠে পড় গাড়িতে।"
গাড়ি স্টার্ট দিল। বিনয় এবার একটু প্রগলভ। বলল, "মল্লি, আমরা সকলে এমন একটা স্টেজে এসেছি যে, পুরনো ভুল বা আনন্দ কোনওটা নিয়েই লজ্জা-সঙ্কোচ হয় না।"
হঠাৎ গাড়ির সামনে একটা গরু এসে পড়ে। বিনু খুব দক্ষতায় গাড়িটাকে অন্য দিকে রাস্তায় ঘোরায়। মল্লিকা 'উউউফ' করে চিৎকার করে ওঠে।
ওরাও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে কিছু একটা হতেই পারত।
হাসিমুখে বিনয় বলে, "বন্ধুরা, এখন কোনারকে যাচ্ছি।" কলেজবয়দের মতো জিভ ও টাকরায় শব্দ করল বলে।
মল্লিকা বলল, "এত বেলায়? ওরা তো স্কেচ করবে, দেখবে। এত অল্প সময়ে হবে কী করে?"
"আরে ডার্লিং, ওড়িশা টুরিজ়মের যাত্রীনিবাস বুক করা আছে। আজ ওখানেই নিশিযাপন। সাক্ষী পূর্ণিমার চাঁদ।"
বিনয়ের বলা শেষ হতেই দু'জনে বলল, "বিনুদা, ইউ আর গ্রেট।"

১০

ভোরে ওঠা ধীমানের বরাবরের অভ্যাস। বলা ভাল, ভোরের পাখপাখালিই ওকে টেনে তোলে। ছোটবেলায় চোখ রগড়েই দেখত, বাবা উঠে পড়েছেন। মাটি ছেনেটেনে, মূর্তির রূপটান দিচ্ছেন বা শেষ করছেন অর্ধেক করা কাজ। বাবার কথা ছিল, 'নতুন কিছু ভাবনার শুরু ভোরেই করা উচিত। শেষটা ঠিক সারা দিনে হয়ে যাবে।' ধীমান নিজেও এই নীতিতে বিশ্বাসী। গেস্ট হাউসটা বেশ সুন্দর। সব রকম ব্যবস্থা আছে।
বাগানের ফুলের সৌন্দর্যে ওরা মুগ্ধ। ওরা আর-এক বার বাগানে ঘুরে নিল। মল্লিকা বারান্দা থেকে ওদের ডাকল, "এই ধীমু, নিবু চলে আয়। ডাইনিংয়ে বসে চা-ব্রেকফাস্ট করে নেব।"
নিবু চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, "কফি নেই? চা চলবে না।"
"দেখছি, আগে ডাইনিংয়ে তো আয়!"
ভোরে মল্লিকার সাজগোজ দেখে ওরা মুগ্ধ। ধীমান ভাবে, ও তো এখনও বিকেলে ভোরের ফুল! টাটকা মল্লিকা ফুলের মতোই লাগছে। অফ হোয়াইট টপ, বেবি-পিঙ্ক পালাজ়ো পরেছে। চুল ছেড়েছে। বাঁ কাঁধে লাইট পিঙ্ক দোপাট্টা। ফুরফুর করে হাওয়ায় উড়ছে। মুখে হালকা মেকআপ। ঠোঁটে ম্যাচিং লিপস্টিক। আজকাল অবশ্য টিপের বালাই কারওরই নেই। এক নজরে অবশ্য অবিবাহিতাই লাগছে।
ধীমান ও নিবিড় চটপট তৈরি হচ্ছে। বহু বছর পরে ওরা প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা মল্লিকার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করছে। চিরদিন ধীমানের ধ্যানে ধরা দেয় নারীর চিরন্তন রূপ। কিন্তু মল্লিকাকে দেখে মনের ক্যানভাসে নতুন নতুন স্কেচ করছে, আবার মুছেও ফেলছে। ও মল্লিকাকে আপাদমস্তক দেখল। দেখতে দেখতে দেওয়ালের গায়ের নর্তকীদের শরীরী বিভঙ্গের সঙ্গে তুলনা আসছে মাথায়। সে সব ভাস্কর্য আর মল্লিকা যেন মিলেমিশে একাকার!
মল্লিকা চোখ সরু করে বলল, "ও কী ধীমু,

তুই ওভাবে সাজগোজ দেখছিস কেন? নে, ঝটপট মাথাটা আঁচড়ে নে।”
নিবিড়ের সামনে ধীমান নিজেকে প্রকাশ না করলেও জানে, নিজের বৌ আরতি মল্লির চেয়ে ছোট। কিন্তু আসলে আরতি ঠাকুরমা-দিদিমা মার্কা হয়েই গেছে। শরীরটা জালার মতো। ছেলের জন্মের পর থেকে নিজে আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। আজ কেন যে থেকে থেকে আরতিকে বড্ড মনে পড়ছে! আহা! মল্লির মতো যদি...!
গাড়িতে আবার চারজন। বিনয়ের সাজবদল হয়েছে। আমেরিকান কাউবয়দের মতো ইয়া হ্যাট মাথায়। ধীমান ওকে যত দেখছে, তত অবাক হচ্ছে।
বিনয় আজ আরও সাবলীল। যেন টগবগ করে ফুটছে। বলল, “আজ কিন্তু কোনারক যাব। সকালের দিকে কিছুটা ঘুরে নেব, সন্ধের মুখে ফের বেরোব।”



ওরা জলঙ্গী পার হয়ে, ছোট্ট গ্রাম মায়াবনে পৌঁছল। বহু দূরে দূরে একটা-দুটো মাটির ঘর। হয় টালির চাল আর না হয় টিনের চাল। চার ধারে বেড়া।

“সন্ধের পর ঢুকতে দেবে?”
“আরে বন্ধু, এখানকার আর্কিয়োলজির ডিরেক্টর আমার বন্ধুর ছেলে। স্পেশাল পারমিশন। তোমরা তো স্কেচ করবে। তাই তো?”
নিবিড় বলল, “ইচ্ছে তো আছে।”
“এখনকার ভিড়ে পারবে না। গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি। কিন্তু চাঁদনি রাতে জব্বর পরিবেশ হবে। চেষ্টা করে দেখো।”
গাড়ি পার্ক করে বিনয় নামল। কাঁধে দামি ক্যামেরা। বাকিদের মোবাইল ক্যামেরা। স্টাইলটা প্রফেশনাল গাইডের মতোই। শুরু করল, “কোনারকের সূর্যমন্দিরটি বর্তমানে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের শিরোপা পেয়েছে,” বলেই ধাঁ করে মল্লিকার দিকে ফিরে মন্তব্য করল, “তোমার তো আবার এই সব তথ্য ভ্যাজর ভ্যাজর মনে হয়। তুমি ক্যামেরায় ছবি তোলো। আমি ওদের বলি।”
মল্লিকা একটু মুখ বেঁকিয়ে ক্যামেরা হাতে আগে গেল।
সাতটি ঘোড়া সূর্যের সাত দিন। দু'পাশে বারো বারো চব্বিশটি চাকা। বারো মাসের চব্বিশটি পক্ষ। আটটি করে স্পোক। দিনের অষ্টপ্রহর।
ধীমান নিবিড় মন্দিরের গায়ের রিলিফের কাজগুলো ঘুরেফিরে দেখল। ছবি নিল। গাইড আলোচনা বন্ধ করল না। জোরে জোরে বলতে থাকল, “ধীমু, নিবু তোমাদের শিল্প-ভাস্কর্যের ব্যাপারে বলব না। ইতিহাস ও পুরাণের গল্প বলব।”
নিবিড় বলল, “স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিয়েও বলুন না, আমরা সমৃদ্ধ হই।”
ধীমান নিবিড়কে উদ্দেশ্য করে বলল, “দ্যাখ নিবু, প্রায় হাজার বছর আগের রিলিফের কাজ। ওইটুকু জায়গায়। রাজা চলেছেন যুদ্ধে, সঙ্গে সেনা, হাতি, ঘোড়া। আবার রাজা মৃগয়ায় চলেছে। রাজদরবারের নানা আখ্যান। কুনকি দিয়ে হাতি ধরা হচ্ছে। বিষয়ভাবনায় বৈচিত্র।”
নিবিড় নিবিষ্ট মনে দেখে মন্তব্য করল, “সে কালের ভাস্কর-শিল্পীদের হাতের ছেনি-হাতুড়িতেও বিশ্বকর্মার আশীর্বাদ থাকত।”
“এই এবার তোমরা চলো, লাঞ্চ সেরে নিই,” মল্লিকা উদ্বেল। ঘুরে ঘুরে ওর মুখ শুকিয়ে উঠেছে, লিপস্টিকে টান ধরেছে। চুল এলোমেলো। বিনয়ের বন্ধুর ছেলে সদানন্দ সাউ এসে দেখা করল। কিছুটা সময় কাটিয়েও গেল। ওদের লাঞ্চ টেবিলের পাশে একটা ইয়াং কাপল বসেছে। হানিমুন-কাপল মনে হয়! মেয়েটি বিপরীত দিকে বসা পুরুষটির মুখে ইডলি ভেঙে ভেঙে তুলে দিচ্ছে। ওরা তিন জন ক্রমাগত ভাস্কর্য নিয়ে বকর বকর করে যাচ্ছে। কিন্তু মল্লিকার মনে কী একটা বয়ে গেল! বিয়ের পরে ওরা একে অপরকে তেমন করে পায়নি। বিনয় সে সময় একটা কাজে লন্ডনে ছিল। মল্লিকা বাপের বাড়িতে।
লাঞ্চ শেষ করে মল্লিকা বেশি করে জল ও লজেন্স নিল। বিনয়ের গলার জোর বাড়ল। বলল, “ধীমু দ্যাখো, লতাবিতানে ঘেরা যক্ষিণী মূর্তিটার দিকে।”
ওরা দু'জনে চুপটি করে কোনারকের মৈথুন ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়িয়ে। মল্লিকা থমকে রয়েছে। ওরা যৌবনের সীমারেখা টপকে প্রৌঢ়ত্বের ভূমিতে তবু, তবু অন্তর্লীন কোনও গূঢ় অনুভূতি ঝাঁকুনি দিল। ধীমানের ভিতরের সত্তাটাও কেমন নড়ে উঠল। ভাবল, ‘আমরা চার জনই বার্ধক্যের দ্বারে। তবুও সঙ্গমরত মানব-মানবীগুলো ভিতরে ভিতরে কেমন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করছে।’

জোৎস্নায় বিশ্বচরাচর ভেসে যাচ্ছে। সূর্যমন্দির প্রায় স্থির নিশ্চল। কিন্তু মন্দিরের গায়ের চিত্রকলাগুলো জীবনসাধনার এক একটা কোলাজ। চা-স্যান্ডউইচ খেয়ে আবার ওরা মন্দিরের দিকে। কিছু স্কেচ করবে। ধীমান ভাবতে থাকল, এই শিল্পীরা আজও কালজয়ী। ওঁদের সঙ্গে তুলনা করলে, নিজেরা কী-ই বা করেছে! ক'টা প্রাইজ়ই তো শেষ কথা নয়। চাঁদের আলোয় ওরা স্নান করতে থাকে। ধীমান বলব না বলব না করে বলেই ফেলল, “বিনুদা, তোমার তো অনেক পড়াশোনা, বলো না, মন্দিরের গায়ে এইসব মৈথুন ভাস্কর্য কেন?”
বিনয় মাথাটা নিচু করে বলল, “হ্যাঁ, মোক্ষম প্রশ্ন করেছ। এ বিষয়ে বহু মতামত আছে। কলা সমালোচক ফ্রান্সিস লিমন একটা গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি মিথুনাচারের সম্ভাব্য কারণগুলো বলেন, ক) সৃষ্টির প্রতীক নারী-পুরুষের মিলনে। খ) আনন্দ থেকে বিশ্বজগতের সৃষ্টি। গ) সারল্যের জন্য মূর্তি। ঘ) অপদেবতার কুদৃষ্টি থেকে মন্দিরে মূর্তি। ঙ) সাধারণ দর্শককে আকৃষ্ট করতে। চ) বাৎসায়নের শাস্ত্রের সচিত্র ভাব লোকশিক্ষার জন্য। ছ) তন্ত্রের

প্রভাব বামাচার। তান্ত্রিক বা বজ্রযানের বিভিন্ন আসনের সচিত্র বিজ্ঞাপন।”
বিনুর এ সব আলোচনায় সবাই মূক। ধীমান উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করল সেই সব অনামী ভাস্কর ও শিল্পীদের, যাঁরা লোকান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মহৎ শিল্পকর্ম কালজয়ী হয়ে আছে।

১১

সৌমেনের স্টুডিয়োর দরজায় ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ। তাকিয়ে দেখল, দরজার ফ্রেমে ধীমান দাঁড়িয়ে। ফর্সা, লম্বা, মাথায় পাতলা চুল, চোখে রিমলেস চশমা, মুখে চিন্তার আঁকিবুকি। সৌমেন ঝট করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল, বলল, “ধীমুদা যে! দাঁড়িয়ে কেন? এসো, বোসো।”
ধীমান স্টুডিয়োর এসি ঘরের চার পাশে চোখ বুলিয়ে নিল।
“আগে তো বোসো, তারপর দ্যাখো।”
“থাম না সমু!” স্নেহের ধমক দেয় ধীমান জ্ঞাতি ভাইটিকে, “প্রাণ খুলে দেখতে দে। কী সুন্দর সাজিয়েছিস! কত সুন্দর কাজ করেছিস।” সৌমেনের সদ্য শেষ হওয়া একটা সূক্ষ্ম মাটির কাজ হাতের তালুতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে মুগ্ধতা ওকে ছেয়ে ফেলল।
সৌমেন এই জ্ঞাতি দাদাটির ধী শক্তি ও আকাশপ্রমাণ দক্ষতাকে সব সময় স্যালুট করে। পুতুলপট্টির অনেক শিল্পীর দক্ষতা ওর একার মধ্যে মিলেমিশে আছে। পড়াশোনাও অনেক বেশি। তার পরে আবার বিদেশ থেকে ভাস্কর্যের ডিগ্রি নিয়ে এসেছে।
ধীমান বসতেই সৌমেন জানতে চাইল, “ভুবনেশ্বর কেমন দেখলে?”
“বলতে গেলে অনেক কথা, কিন্তু এক কথায় আমায় নাড়িয়ে দিয়েছে।”
সৌমেনের কালুদা এসে চা-বিস্কুট দিয়ে গেল। সৌমেন এক ঝলক সিসিটিভির দিকে তাকাল। বাইরে ওর বেশ কয়েকজন কর্মী কাজ করছে। চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে সৌমেন বলল, “ধীমুদা, চা খাও। আর বলো, কী বলবে! তুমি যখন এখানে এসেছ, কিছু তো বলতেই চাও,” বলতে বলতে চায়ে চুমুক দেয় সৌমেন। সামান্য চা চলকে ওর ঘিয়ে গেঞ্জিতে পড়ে।
“বলব! কিন্তু একদিনে তো সব বলা যাবে না। ও হ্যাঁ! তুই সেই গৌরব মাস্টারের কথা বল।”
“জানো, সেই গৌরববাবু প্রথমে কিছু গতানুগতিক প্রশ্ন করেছেন। তবে যে দুটো স্ট্রাইকিং প্রশ্ন ছিল তা হল, ‘শুধু পুতুলপট্টির মধ্যে আটকে না থেকে বৃহত্তর জনসমাজের কাছে নিজেদের তুলে ধরার ব্যবস্থা করছেন না কেন?”’
ধীমানের মন দৃঢ় হয়ে ওঠে। এটা যে ওরও কথা।
“তার পরে বললেন, ‘আপনারা একটা অ্যাকাডেমি গড়ে তুলুন। সরকারের কাছে আবেদন রাখুন।”’
কথাগুলো ধীমানকে ধীরে ধীরে উত্তেজিত করে তুলল। ধীমান বলল, “আমিও তো এই মেসেজটাই ভুবনেশ্বর থেকে নিয়ে এলাম।”
“সবই তো বুঝলাম ধীমুদা। কীভাবে ছড়ানো-ছেটানো শিল্পীগোষ্ঠীকে একজোট করা যায় বলো তো?”
“আমি তো সেই কবে থেকে এ সব ভাবছি রে সমু। এখানে মৃৎশিল্পী সমিতি আছে, অথচ আজ অবধি সরকারের কাছে কোনও প্রস্তাব রাখেনি। অনুকূল আগের জমানার। ফ্যামিলি ফ্রেন্ডের মতোই। কিন্তু কোনওদিন পার্টির কর্মসমিতির বৈঠকে শিল্পীদের উন্নতি বা অনুদান নিয়ে কিছু বলেনি। তো, ও সব অ্যাকাডেমি তো দূর অস্ত!”
সৌমেন টেবিলের উপরে থাকা বাবার আবক্ষ মূর্তির দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল, “আমরা এক রকম আগাছার মতোই বেড়ে উঠেছি। যতটুকু প্রতিভার ছিটে আছে, তার জোরেই পুরস্কার-টুরস্কার পেয়েছি, সঙ্গে পরিচিতি। ব্যস ওইটুকুই!”
উত্তেজিত ধীমান, “আমার বাবা নিজে না খেয়ে আমাকে ইটালিতে পড়াতে পাঠিয়েছিলেন। নইলে জলঙ্গীর তীরের কত গরিব-দুঃখী পাল পরিবার আছে। সেখানে একটা-দুটো প্রতিভাও টিমটিম করে জ্বলছে। অথচ তারা সরা, হাঁড়ি, কলসি বানিয়ে মাসে মাত্র হাজার চারেক বা পাঁচেক টাকায় টিকে আছে।”
“মনে পড়ল, রবীনদার ছেলেটা এখনও শিশু। শুনলাম যথেষ্ট প্রতিভাবান।”
“হুম! জানি তো, না দেখেই মাটির কাজ করে। রবীন ওকে আর্ট কলেজে দিতে চায়। আমিও বলেছি।”
“শোনো, অনুকূলদার দিন গেছে দাদা। ওঁকে দিয়ে তেমন কাজ হবে না। এই জমানার লোকেদের বলি চলো।”
“দাদা, একটু বাইরে আসবেন!”
বাইরে থেকে সৌমেনকে ফোন করে এক কর্মচারী। দু’জনই স্টুডিয়ো থেকে বেরোয়।
“লোকনাথ ও বুদ্ধদেবের এই অংশগুলো একটু দেখুন!”
ওরা দেখল লোকনাথ ও বুদ্ধের মূর্তির অনেকটাই হয়েছে, কিন্তু কাজটা সম্পূর্ণ হয়নি। ধীমান নিজের অভিজ্ঞ ও পরিণত দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখল বুদ্ধের চোখ, ঠোঁট-ভুরুর ভাঁজ, মুখের পেশির বিন্যাস।
“কী করেছিস রে সমু! প্রতি বছর আমরা শয়ে শয়ে বুদ্ধ, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ডেলিভারি দিই। সবই একই ছাঁচে ঢালা। কিন্তু এটা তো একেবারেই অন্য রকম। এক কথায় এক্সেলেন্ট!”
সৌমেনের মুখে লাজুক হাসি, “সেই জন্যই তো তোমাকে দেখতে বলছি।”
“গান্ধার স্টাইলও নয়। নতুন আঙ্গিকে গড়া। চালিয়ে যা ভাই,” বলেই সৌমেনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।
সৌমেন ফিনিশিং টাচটা নিজের হাতে দিয়ে আবার ঘরে ফিরল, “হ্যাঁ ধীমুদা, যা বলছিলাম, গৌরববাবু একটা কথা বলছিলেন। আমরা যদি কিছুটা কাজ করে দিই, বাকিটা কর্মচারীরা শেষ করে, তবে ওটার কৃতিত্ব কার?”
“তুই কী বললি?”
“আলবাত আমাদের। এ-ও বলার অপেক্ষা রাখে নাকি! ইনোভেশনটা যদি না করতাম, তা হলে ওরা কি পারত? জানো, একবার জিতেনদার ঘর থেকে একজন ব্যাপক শোরগোল তুলেছিল। সেটা বোধ হয় পৌরসভার কাজ ছিল। নেতাজির ঘোড়ায় চড়া ব্রনজ়ের মূর্তি। জিতেনদা তো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিল!”

ধীমান সখেদে বলল, "তবুও এখনও আমরা মৃৎশিল্পী, পুতুল-নির্মাতা।"
কথাটা বলেই ধীমান টেবিলে চাপড় দেয়। সৌমেন ওর মুখোমুখি, "জানো তো ধীমুদা, গৌরববাবু মোক্ষম একটা রটনার কথা বললেন।"
"কী?"
"রটনাটা হল, শিল্পীরা জাতীয় পুরস্কার পেয়ে গেলে নিজের হাতে দামি কাজও করে না।"
"কিছুটা ঠিক কথা। আমার আইডিয়ার সিংহভাগ রবীন, তার পর মনোময় করে। কী প্রমাণ হল এতে?"
"ওদের কথা হল, ওদের দিয়ে করিয়ে নিয়ে, কৃতিত্বটা আমরা নিই। আমাদের পকেটে এবং নামের ঘরে মিটার বাড়ে," কথা শেষ করে দু'জনেই হো হো করে হেসে ওঠে।
"এই সমু, উঠছি রে! অনেক ক্ষণ বেরিয়েছি। বাজারটা ঘুরে যাব।"
ধীমান মোবাইল বের করে দ্যাখে সঞ্চিতার তিনখানা মিস্‌ড কল। বলে, "এ মা, দাঁড়া, কল ব্যাক করে দেখি। বৌমা বিকেলে ঠাকুর পুজোর জন্য কিছু মিষ্টি ও ফল আনতে বলেছে। সমু, তুই বৌমা ও তোর ছেলেকে নিয়ে একদিন আয় আমাদের বাড়ি। এপাড়া-ওপাড়া— তাও যাস না।"
"ঠিক আছে যাব'খন। যা বলছিলাম, গৌরববাবুর যে মহলে মেলামেশা, নিশ্চয়ই উচ্চশিক্ষিত ও চাকরিজীবী। তারা যদি এ সব নির্বোধ কথা বলে! এটা কেন বোঝে না, প্রথমে আইডিয়া বা থিম মাথায় আসতে হবে। তার পরে নিজস্ব স্টাইল বা ঘরানায় নির্মাণে নামাতে হবে। তার জন্য শৈল্পিক মেধা বা মনন দরকার। তা হলে মাস্টার-মাইন্ড কে?"
"ছাড় না এ সব কথা। কাজ করে যা!"
"অ্যাই স্বপন, এ দিকে আয় তো," সৌমেনের ডাকে ওর নতুন কর্মচারীটা এল।
"ধীমুদা, ওর কাজটা দ্যাখো। স্বপন, তোর গান্ধীর মাথাটা ঝট করে দেখা তো।"
ওরা দু'জনেই গান্ধীজির ফোকলা মুখের হাসিটা দেখল। চোখে চশমা। গাল, কান, নাকের পাশের ভাঁজ ও খাঁজ নিখুঁত।
সৌমেন জিজ্ঞেস করল, "কেমন হয়েছে ধীমুদা?"
ধীমান একটু উদাসীনভাবে বলল, "কাজটা ভালই। কিন্তু ওর স্পেশালিটি কোথায়?"
মুখে হাসি মেখে বলল, "ও আমাদের পালেদের ছেলে নয়, ও ঘোষেদের।"
নিজের পাঞ্জাবির হাতা দিয়ে চশমা মুছতে মুছতে ধীমান বলল, "ওড়িশার মন্দিরের ভাস্কর্য দেখে ভাবলাম, এই হল আসল শিল্প। হাজার-বারোশো বছর ধরে ওরা একই ভঙ্গিমা, মুদ্রায় দাঁড়িয়ে। রোদ-জল-ঝড়-শীত-গ্রীষ্ম! মহাকালের কোলে কাঁখে টিকে আছে," কথা বলতে বলতে ধীমানের কণ্ঠ কোন অতলে তলিয়ে যায়।
"কী হল ধীমুদা, থামলে কেন?"
"থামিনি রে সমু! ওইসব কালজয়ী কাজগুলো এখনও আমার চোখের সামনে ফুটে উঠছে। কিন্তু আমাদের এই সব মাটির কাজ পাবলিক আজ দেখবে, কাল ভুলবে। আমার আর বাবার কিছু স্ট্যাচু বা বাস্ট, কিছু রিলিফও সমকালের বাইরে টিকবে না।"
সৌমেন ও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, ভাবে, 'এটা আমাদের অস্তিত্বের সঙ্কট! কীভাবে এ সব থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে?'
"চল সমু, আমরা ঘূর্ণির ঘেরাটোপ থেকে বেরোই। নতুন কিছু নিয়ে ভাবি। যা এ কাল পেরিয়ে ভবিষ্যৎ কালের বুক চিরে টিকে থাকবে!"

১২

নরম কমলা-হলুদ রোদ ধীমানের চোখে-মুখে লাগছে। ও সূর্যপ্রণাম করছে। সবুজ উঠোনের মাঝখানে একটা শতরঞ্চি পেতেছে। জীবনের তৃতীয় প্রহরে শুরু করল ব্যায়াম। তাতে কী! সময়ের ধাপে ধাপে পরিবর্তন প্রয়োজনমতো করাই যেতে পারে। শেষ বয়সের জ্বালানি জোগাড় হয়েছে মল্লি ও বিনয়ের কাছ থেকে। মল্লি ও বিনয়ের কাছে দিন পনেরো ছিল। ওরা দু'জনেই যেন মুঠো মুঠো মাল্টিভিটামিন! ওদের দেখেই নতুন কাজে ঝাঁপানোর ইচ্ছেটা জেগে উঠেছে। ধীমান নিজে এক রকম ধরেই নিয়েছিল, প্রৌঢ়ত্বের সীমা পেরিয়ে বার্ধক্যের সীমানায় প্রায় এসেই গেছে। নতুন আর কী হবে! ওরা দু'জন এই বদ্ধ ধারণাকে ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়েছে। ও পদ্মাসনে বসে ভাবে, বিনুদা তো দিব্যি যৌবনকে জাপটে রেখেছে। আরতি এ সময় রান্নাঘরে। দূর থেকে স্বামীর শরীরচর্চা দেখে মনে মনে ভাবে, 'তা হলে কত্তা ওড়িশা থেকে এ সব পোকা মাথায় নিয়ে এসেছে।'
ওর দিকে এগোতেই ধীমানের কানে চটির শব্দ গেল। কাছাকাছি যেতেই ধীমান জিজ্ঞেস করল, "ও রকম করে দেখছ কী?"
হালকা হেসে আরতি বলে, "কেন, তোমার নতুন সব কাজ।"
ধীমানের কপালে হালকা ঘাম। তা হাত দিয়ে মুছে বলল, "এ সব তোমাকেও করতে হবে গো গিন্নি। শরীরের আনাচে-কানাচে জং ধরেছে।"
আরতি পিছন ফেরে, "হুঁ, মোদ্দা কথাটা বুঝলাম।"
"কী সেটা?"
"এত দিন যা যা কাজ করলাম, সবই কালের নিয়মে তুচ্ছ," বলতে বলতে আরতি শতরঞ্চির উপরে বসে।
দোতলার বারান্দায় ধৃতি আর সঞ্চিতা। আরতি বুঝতে পারছে, ছেলে আর ছেলের বৌ ওদের দেখছে। কে জানে ওরা কী ভাবছে! এই বয়সে বাবা-মা কী রঙ্গে মজেছে! একটু অস্বস্তি হচ্ছে দু'জনেরই।
আরতি একটু বিরক্ত, "শোনো, তোমার বাবা আমাকে অল্প বয়সেই বৌ করে এনেছিল। তখন থেকে সুখে-দুঃখে তোমায় দেখছি। তবে এবার ওখান থেকে ফেরার পর তোমার নতুন ভাব দেখে বাঁচি না।"
কী ভেবে ধীমান বলল, "মল্লিকে চিনতে তো! আমার কলেজের বান্ধবী।"
আরতির টোপা কুলের মতো গালে সামান্য টোল খেল, "হ্যাঁ, জানি তো। তুমি ওর বাড়ি যেমন ঘুরে এলে, তেমনি তুমিও ওকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াও।"
"সে হবে'খন। কিন্তু আমি বারবার যে কথা বলার চেষ্টা করছি, ওরা দু'টিতে কী সুন্দর যৌবন ও গতিকে ধরে রেখেছে!"
"কীভাবে?"
"বিভিন্ন রকম যোগ ব্যায়ামের মাধ্যমে। মল্লি আমাদের চেয়ে মাত্র বছর দুয়েকের

ছোট হবে। অথচ ওকে বছর চল্লিশের মতো দেখায়।"
আরতির বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে বোঝাল, "কারণ কী জানো? ওরা অখাদ্য-কুখাদ্য খায় না। যখন-তখন ঘুমোয় না। শারীরিক ও মানসিকভাবে ফিট। ফিগার তোমার অর্ধেক।"
ধীমান বহুদিন পরে পরিপূর্ণ ভাবে নিজের সহধর্মিণীর দিকে তাকায়। বিয়ের পর বৌয়ের প্রতিমার মতো মুখখানাকে ধ্যানে পেত। আজ সেই মুখে দাগ, তিল, জড়ুল, সময়ের ক্রূর হিজিবিজি।
আরতি হেলেদুলে রান্নাঘরে এগোতে থাকে। পিছনে হাঁটতে হাঁটতে ধীমান বলে, "আমি চাই তুমি ভোরে একটু-আধটু শরীরচর্চা করো। আমার কাজে উৎসাহ দাও।"
আরতি ঘরে ঢোকার মুখে বলল, "আমি আর ও সবের কী বুঝি! বরং বৌমাকে নিয়ে কাজ করো। ওর বুদ্ধিসুদ্ধি বেশ ধারালো।"
"বুঝলে গিন্নি, আজ বেশি করে মনে হচ্ছে, সেই মাপের কিছুই করতে পারলাম না। অথচ বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে এল।"
"তুমি কী করতে চাও গো?"
"সেই ভাবনাটাই আমাকে তাড়া করছে। বিনুদাও বলল, 'ধীমু তুমি কালজয়ী কিছু করো। নইলে তো শিল্পী ধীমানের জীবন বৃথা।"'
আরতি বুঝল, কর্তার মন আজ বড্ড উতলা।
ধৃতি বাজার গিয়েছিল। বাজার থেকে ফিরে দ্যাখে, ড্রয়িংরুম অন্য রকম করে সাজানো।
সঞ্চিতাকে ইশারায় জিজ্ঞেস করল,"ব্যাপার কী?"
সঞ্চিতা বলল, "তা জানি না। আজ তো ছুটি, বাড়িতে থাকলেই জানতে পারবে। বাবা তোমাকেও থাকতে বলেছেন।"
সঞ্চিতা ওর হাতে চায়ের কাপ ধরিয়ে দিল। চায়ে চুমুক দেয় ধৃতি। একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "বাবা এই বয়সে কী শুরু করল!"
সঞ্চিতা চোখ পাকায়, "অনুকূলকাকা আসবে। তখন বুঝবে, বাবা ঠিক কী করতে চায়।"
সঞ্চিতা ড্রয়িংরুমটা সাজাতে সাজাতে ভাবল, 'কেন যে শিল্পীর বাড়ির বৌ হলাম! বাচ্চাটা ঠাকুরদার গুণ পেয়েছে। ঠিক আছে। কিন্তু তাই নিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ি কী গদগদ! ওঁরা তো নিজেদের জগতে আছেন। জানেন না যে, সামনে কী ভয়াবহ দিন আসছে। পরীক্ষায় ভাল রেজ়াল্ট হওয়া চাই। ছেলেটাকে কোনও মিশনে দিলে কেমন হয়! ধৃতির মানসিক স্থিরতা নেই। কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট কিনতেই পারে। কিন্তু ওর ইচ্ছে নেই বাবা-মাকে ছেড়ে দূরে যাওয়ার। ওর কথা হল, দাদা দূরে থাকে। ও চলে গেলে বাবা-মা আরও দুঃখ পাবে।'
সঞ্চিতা শোকেসের পুতুলগুলোকে দ্যাখে। প্রতিটি পুতুলের চোখে-মুখে পৃথক অভিব্যক্তি! বিয়ের পর ভেবেছিল, ঘরের কাজের পরে অনলাইনে এ সব বেচবে। কিন্তু শ্বশুরমশাইয়ের না-পছন্দ। ওঁর কথা হল, এ সব শিল্পকর্ম কারখানা-জাত নয়। শিল্পীর ধ্যানের সৃষ্টি। তাই দূর থেকে ছবি দেখে বিক্রি করাটা ঠিক না। এতে ছবির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। এ সব শুনলে অন্য রকমের অনুভূতি হয়। ঈশ্বর নিজেই অসীম বড় মাপের শিল্পী। সঞ্চিতার কাছে শ্বশুরমশাই একজন ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতার শিল্পী।
ড্রয়িং রুমে মৃৎশিল্প সমিতির অনুকূল পাল ওর চার-পাঁচজন অনুচর নিয়ে বসে আছে। তার পরে সৌমেন পাল, ধীমানের ঘরের কর্মচারী রবীন ও মনোময় ধীর পায়ে ঢুকল।
ধৃতি তড়িঘড়ি মা ও স্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "ওদের জন্য চা-বিস্কুটের ব্যবস্থা রেখো তোমরা। বাবা বলে দিল।"
আরতি জিজ্ঞেস করল, "কিসের সভা হবে রে ধৃতি?"
ধৃতি যেতে যেতে বলে গেল, "কী সব আলোচনা হবে। বাবা আমাকেও ভেঙে বলেনি।"

১৩

ড্রয়িংরুমে সকলের মাঝে অনুকূল বসে আছে। ওকে বেশ চোখে পড়ছে ওর বসার ভঙ্গিমার জন্য। কেমন উদাস হয়ে কিছু ভাবছে। ওকে দেখে ধীমানের রঁদ্যার সেই 'দ্য থিঙ্কার'-এর মতো লাগছে। ওর পাশে বসেছে বর্তমান শাসকদলাশ্রয়ী সংগঠনের সভাপতি হরিশ দে। শিল্পটিল্পের কিছু বোঝে না। তবুও মৃৎশিল্পী সংগঠনের মাথায় গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। পায়ের উপর পা তুলে, কাগজের পাতায় চোখ।
সঞ্চিতা জানতে চাইল, "বাবা, চা এখনই দেব, না একটু বাদে?"
"একটু বাদেই দিয়ো। কথাবার্তা আর একটু এগোক। আরও কয়েক জন আসার বাকি।"
"আসুন আসুন," বলে ধীমান উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানায় স্থানীয় বিধায়ক ও পৌরপিতাকে। ধীমান পালের মতো শিল্পীর ডাককে উপেক্ষা করা যায় না। অবশ্য এরা ধীমানের নাম-যশকে সুন্দর করে কাজেও লাগায়। তবে কেউই জানে না, কেন ধীমান ওদের ডেকেছে।
ধৃতির আজ ছুটি। ভেবেছিল সঞ্চিতা ও ছেলেকে নিয়ে ফিল্ম দেখতে যাবে। এদিকে বাড়িতে সিরিয়াস আলোচনা! তাই আর হল না। একের পর-এক বিধায়ক, মন্ত্রীদের ঢুকতে দেখে ও থম মেরে রইল।
ধৃতিকেও ড্রয়িংরুমে ডাকা হল। ছোট্ট ঘরে প্রায় আঠারো-কুড়ি জন বসেছে। অতি কষ্টে সকলের মাঝে বসে পড়ল ধৃতি। সৌমেনও কাজের মানুষ। এ সব মিটিংয়ে থাকতে ভাল লাগে না। তবে আজ ধীমানের মতো ও কিছু বলতে চায়। জিতেন পাল সারা বছর ব্যস্ত! ডাকলে ওকে পাওয়া যায় না। কোন পুরস্কার বা সম্মাননা না জোটার জন্য হীনম্মন্যতা বোধটা ওকে তাড়া করে। এবার ধীমান নিজে বাড়ি বয়ে বলে এসেছে। তাই মনের বরফ গলেছে। সঞ্চিতা সকলকে চা ও কিছু স্ন্যাক্স দিল। অনেকেই আজকাল মিষ্টি খেতে চায় না। কৃষ্ণনগর মিষ্টির জন্য বিখ্যাত। অথচ ওরা মিষ্টির নাম শুনলে নাক সিঁটকোয়।
শুরুটা ধীমান এই ভাবে করল, "এখানে সকলকে বিশেষ একটা আলোচনার জন্য ডাকা হয়েছে। সবাই জানি, মাটির সঙ্গে মৃৎশিল্পীদের সম্পর্ক জলের সঙ্গে মাছের মতো।"
এটুকু শুনে চায়ের প্লেট নীচে নামায়

বিধায়ক, মন্ত্রীরা। হেঁ-হেঁ করে মাননীয় বিধায়ক বলল, "তা, আর বলতে!"
ধীমানের হাতে একটা চিয়ারি। বাঁ হাতে মোবাইল। ও দুটোকে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, "কৃষ্ণনগরের নাম ইতিহাসে-ভূগোলে মাটির পুতুলের জন্য বিখ্যাত। আরও সংক্ষেপে বলতে গেলে, পুতুলপট্টির জন্য। যতটুকু খ্যাতি-প্রতিপত্তি, নাম-যশ, পুতুলের জন্যই।"
বিধায়ক থেমে ঘাড় নাড়ল,"তাই তো।"
অন্য একজন বলে ওঠে, "ধীমানদা, কী বলতে চাইছেন?"
"এটাই বলতে চাইছি, এখনও আমাদের পুতুল হয় রথের মেলায় না হয় সরকারি কোনও হস্তশিল্প মেলায়, কোনও স্টলের জিনিসের আড়ালে অপেক্ষা করে।"
"তা কেন দাদা? অভিমান কেন?" এত ক্ষণে অনুকূল মুখ খুলল।
সৌমেন সখেদে বলল, "অনুকূলদা, আপনারা তো বহু বছর মৃৎশিল্পী সমিতির চেয়ারম্যান পদে আছেন। তেমন স্মরণীয় কিছু আপনাদের করতে তো দেখিনি। আমরা কিন্তু কোনও পক্ষেরই নই। রাজনীতির আঁশটে গন্ধ থেকে দূরে। না করেছেন কোনও ওয়র্কশপ, না অন্য কিছু। সেখানে আর্ট কলেজ তো দূর অস্ত! সারা বাংলায় কৃষ্ণনগরের পুতুলপট্টি এক কোণে মাথা গুঁজে আছে। না আছে মান-যশ, না আছে অর্থ। মৃৎশিল্পকে প্রোমোট করার জন্য পন্থা উপায় বের করতে চাই। আপনারা সাজেশন দিন প্লিজ়!"
কথাটা বলেই সৌমেন হাতজোড় করল। ধীমানের কণ্ঠে চূড়ান্ত হতাশা, "শিল্পী! আমরা আবার শিল্পী নাকি? আমরা তো কারিগর। জানেন, বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের মৃৎশিল্পীরা শিল্পী অথচ আমরা কুম্ভকার। ওই চাকায় অনেকেই মাটির হাঁড়ি, কলসি, গরুর নাদা বানায়।"
ধীমানকে উত্তেজিত হতে দেখে জিতেন পাল বলল, "আমাকে ঘূর্ণির ক'টা লোক চেনে! শুধু আশপাশের লোকেরা জানে আমি মূর্তি গড়ি। ছোট সব সূক্ষ্ম কাজের পুতুল আর ভাস্কর্যের কথা এরা জানেই না। বাইরের লোক জানবে কীভাবে? আমি আবার স্মার্টফোন ব্যবহার করি না। ধীমান ও সৌমেনের ইউটিউব চ্যানেল থাকলেও, আমার নেই। আমার বিক্রিবাট্টাও কম। কীভাবে যে লকডাউনের মধ্যে বেঁচে ছিলাম, তা আমিই জানি।"
বিধায়ক সুজিতবাবু বলল, "দাদা, আমাদের মিটিং আছে। সংক্ষিপ্তভাবে বলুন, আপনাদের দাবিদাওয়া কী?"
ধৃতি মেঝেতে পা মুড়ে বসেছে। খবরের কাগজটাকে ছিঁড়ে বেশ কয়েকটা ছোট নৌকা গড়েছে। নৌকাকে একটা জায়গায় ভিড়িয়ে রেখেছে। একটাও লোক নেই। বাবা শত চেষ্টা করলেও এক নৌকাতে সবাইকে তুলতে পারল না। ওরা সকলেই পালাই পালাই করছে।
সৌমেন মোবাইল খুলে কয়েকজন নৃতাত্ত্বিক ও শিল্পরসিকের বক্তব্য শোনাল। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের সম্পর্কে প্রখ্যাত শিল্পরসিক, ভারতীয় জাদুঘরের সহকারী পরিচালক টিএন মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ মৃৎশিল্পীরা প্রথমে কুম্ভকার ও দেবদেবীর মূর্তি-নির্মাতা ছিলেন। জীবন্ত আদর্শের পুতুল গড়ার কলাকৌশল রপ্ত করেছিলেন। অতি সম্প্রতি পাথরের ভাস্কর্য বিদ্যা বিদেশ থেকে (ইটালি) আয়ত্ত করে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী মধ্য যুগের সূত্রধরদের মতো বহু মাধ্যম শিল্পকৌশলে দক্ষ হয়ে উঠেছেন।"
বিধায়ক বাঁকা হেসে বলল, "সৌমেনবাবু, আপনাদের কথা মানার জন্য ওই সব শিল্পরসিকের বই পাঠ করার দরকার নেই। আমরা এখানকার দশ পুরুষের বাসিন্দা। শুনেছি, মৃৎশিল্পীদের পূর্বপুরুষ যশোরের নাটোর থেকে এসেছিলেন।"
"না না, এ কথা এখনকার বাসিন্দারা স্বীকারই করে না। আমরাও করি না," সৌমেন বলল।
"সে বিতর্ক থাক সৌমেনবাবু। আপনারা আমাদের ভোট দিয়েছেন। আপনাদের সম্মান অবশ্যই রাখব।"
এ রকম গুরুগম্ভীর পরিবেশ ধৃতির ভাল লাগছে না। ও উঠে পড়ল। মনে মনে বলল, 'যত সব দুর্নীতিবাজের দল!'
বিধায়ক বলল, "আপনাদের দাবিদাওয়া নিয়ে একটা দরখাস্ত লিখে দিন।"
ধীমান বিরক্ত। রেগে উঠে বলল, "আট-দশবার আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয়েছে।"
বিধায়কের মুখ থমথমে। অনুকূলও তথৈবচ।
জিতেন ওদের শান্ত করে বলল, "আগে অনেক কিছু করেছেন। এবার কুমোরদের জন্য কিছু করুন।"
জিতেন আবার বলল, "শুনুন সুজিতদা!"
"আবার দাদা?"
"আচ্ছা ভাই, আমরা এখানে তিন ধরনের মৃৎশিল্পী আছি। যারা শুধু ঠাকুর বানায়, বৌবাজার এলাকায় থাকে। কেউ আবার ঠাকুরের মূর্তির সঙ্গে কিছু জীবন্ত রিয়ালিস্টিক শিল্পকর্ম গড়ে। সৌমেন ও আমি এর মধ্যে পড়ি। আর বাকি খুব অল্প, যারা মূর্তি, উন্নত রুচির শিল্পের সঙ্গে ভাস্কর্য সৃষ্টি করে, যেমন ধীমান ও ওর বাবা।"
"সে না হয় হল! এই ভাগাভাগি নিয়ে কী করা যায়?"
ধীমান তেতো হেসে বলল, "কিছু করতে হবে না। শুধু তাদের জন্য বাৎসরিক আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করুন। যাদের দরকার। আর বড়সড় মার্কেটের ব্যবস্থা করলে এরা প্রাণে বাঁচবে। লকডাউনে এরা প্রায় ধ্বংসের মুখে। ঘূর্ণির ঘুরপাক থেকে পুতুলপট্টিকে শহরমুখী করুন। বাঁকুড়ার হাতি, ঘোড়াকে শহরের অভিজাতরা ড্রয়িংরুমে স্থান দেয়। আর আমাদের ভাস্কর্য কোনও কোনও শহরে আছে মাত্র।"
সৌমেন বলে ওঠে, "আর দাদা, আমাদের জন্য একটা অ্যাকাডেমি খুব দরকার। শেষে বলি, একটা মিউজ়িয়াম কাম আর্ট কলেজও দরকার।"
সুজিতবাবুর চোখে স্পষ্টত অধৈর্য ও বিরক্তি। ও দাঁড়িয়ে পড়ল। দলীয় বক্তৃতা দেওয়ার ঢঙে বলল, "সব শুনলাম। এখনকার প্রতিনিধি হিসেবে পরের অধিবেশনে কথা তুলব। দেখি কী হয়!"
সুজিত কথা শেষ করেই রক্ষীদের নিয়ে চলে গেল সীমানার বাইরে। ধীমানরা ওদের দিকে চেয়ে রইল।

১৪

কথাটা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে জিতেন পালের। কত জন্মদিন আসছে-যাচ্ছে, খেয়াল রাখছি না তো! কবে জন্মদিন? কেউ পালন করার নেই। মনে করারও নেই। ভাবতে ভাবতে সুধীর পালের বেড়ার ধার দিয়ে বাড়ি ফিরছে। দেখল, সুধীরদার নাতি কাজ করছে। ভাবল, ও আবার মাটির কাজ করে নাকি? বয়স বাইশ-তেইশ হবে। এই প্রজন্মটাকে তেমন খেয়াল করে না। বোঝেও না। যত দূর জানে, ছেলেটা রং-তুলিতে দক্ষ। আর্ট কলেজে পড়ে। ভাল কথা। কিন্তু পাশের মেয়েটা তো পালেদের কেউ না। ও তো ঘোষেদের মেয়ে। ওই মেয়েটার নাম কী যেন!
একটু এগোল আমবাগানের দিকে। গাছের নীচে একটা চেয়ার পাতা। সামান্য দূরে মেয়েটা। ঘরোয়া পোশাক, একটু আলুথালু। ছেলেটা স্কেচ করছে মেয়েটাকে মডেল করে। জিতেনের মনে পড়ল, ওদের কৈশোর-যৌবনে পুরুষরা মূর্তি তৈরির কাজ করত। নীরবে, আত্মমগ্ন হয়ে। ঘরের মেয়েরা সংসারের কাজে ডাকটিকিটের মতো সেঁটে থাকত। বড়জোর এটা-সেটা এগিয়ে দিত। একান্ত ভাল-লাগার নারীমুখ ধ্যানে জাগত। দেবীমূর্তি বা প্রতিমা গড়ার সময় ওই সব আদল প্রতিমার মুখে বসাত। ওর মনে আছে, যোগেনদা, ওদের যোগেন পাল নিজের সুন্দরী বৌদির মুখ সরস্বতীর মুখে বসিয়েছিল। তা নিয়ে পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে সে কী কানাকানি! আর আজ?
বলবে না বলবে না করেও জিজ্ঞেস করেই ফেলল, "কোন কলেজে পড়িস রে দাদাভাই?"
"গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে।"
"বাহ! মডেল স্টাডি হচ্ছে?"
"হ্যাঁ, দাদু। আসুন, বসুন এখানে। কেমন হচ্ছে বলুন।"
ভিতরে ভিতরে ধারণাটা গড়াগড়ি খাচ্ছিল। দাদুর সামনে ওরা লজ্জাটজ্জা পেতে পারে। কিন্তু কই! কথায়-বার্তায়, হাবভাবে সে রকম তো হলই না। ওদের কোনও হেলদোলও নেই। মেয়েটা বিশেষ পোজ়ে বসেই রইল।
সমিধ বলল, "দাদু, তুমি একটু আলো-ছায়ার দিকটা দেখো না!"
"চশমাটা ঘরে রেখে এসেছি রে! ছবির রং বা আলো-ছায়া বোঝা চশমা ছাড়া হবে না।"
তবুও এক ঝলক দেখে বলল, "নিজের কাজের ক্ষতি করলি রে আমাকে ডেকে! এক টানে এ সব শেষ করতে হয়। তবুও ভালই হয়েছে।"
সমিধ ঠোঁট উল্টে বলল, "দাদু জানো, ছবি আঁকার সঙ্গে আমি মাটির মূর্তি গড়ছি। প্লেন গ্র্যাজুয়েট। কোনও জায়গাতেই হালে পানি পাব না। ও দিকে বাবার ট্যাঁক ফাঁকা। প্রতিভা নেই। ঠিক করেছি, বনলতা বুটিকের সঙ্গে টাই-আপ করে দোকান খুলব। হাতখরচটা তো হবে! ইতিকে বললাম, 'আমার ছবির মডেল হয়ে যা। তোরও হাতখরচ হবে। আর আমারও কলকাতার সোনাগাছি বা ওইরকম জায়গাতে মডেল খুঁজতে যেতে হবে না।"'
কথাগুলো কানে যেতেই জিতেন পাল আকস্মিক ভাবে ধাক্কা খেল। মুখে কোন উত্তর যোগাল না। তত ক্ষণে সমিধ ইতিকার ফিগার নামাল। মুখে বলল, "এত চমৎকার ফিগার থাকতে অন্য কোথায় যাওয়ার দরকার কী?"
ইতিকা আবেগে আরও ঘন হয়ে উঠল। হাস্যে-লাস্যে ইতিকা সমিধকে ঘেঁটে ঘোল করে দিচ্ছে। জিতেন পালের কাছে বিষয়টা কেমন লাগছে, তা নিজেই বুঝে উঠতে পারছে না। প্লাস্টার অফ প্যারিসের বা অন্য কিছুর মূর্তি গড়তে কোনওদিনই নারী মডেল লাগেনি। সবটাই ধ্যানে আনা যেত। নারীকে এমন মোহময়ী ছলাকলার রূপে আঁকার কথা ভাবেওনি। বেশিরভাগ সময়েই নারীকে ঐশ্বরিক ভাবে ধরেছে। কিন্তু এখন...
জিতেন পাল তড়িঘড়ি বলল, "দাদুভাই, অনেক ক্ষণ বেরিয়েছি। যাই রে! তোর মনোযোগ নষ্ট হচ্ছে।"
সমিধ ছেলেমানুষি করে বলে, "দাদু, যত ক্ষণ না কাজটা শেষ হচ্ছে তুমি যাবে না। আসলে এটা লেডি রাণু মুখোপাধ্যায়ের স্টাইলে আঁকার চেষ্টা করছি। একটু সারিয়্যালিজ়মের মিশেল ঘটাব।"
জিতেন নিজে রিয়্যালিজ়মের বাইরে অন্য কিছু জানে না। সারিয়্যালিজ়মের নাম শুনলেও তার সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেই। তাই হাঁ করে তাকিয়ে রইল।
সমিধ বলল, "লেডি রাণু মুখোপাধ্যায়ের মতো লার্জ সাইজ় সিটিং পোর্ট্রেট। কিন্তু ওকে মডার্ন লেডি করব। ওর তিনটে হাত দেখাব। এক হাতে রান্না করছে, এক হাতে বাচ্চা সামলাচ্ছে, অন্য হাতে পুতুল গড়ছে।"
তড়াক করে উঠল ইতিকা, "দেখলে দাদু, আমায় এখনই বাচ্চা সামলাতে দেখাবি? এত আগে মা হতে পারব না," বলেই অদ্ভুত কটাক্ষ হানল সমিধের দিকে।
জিতু পালের কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল, "এই সমিধ, তুই ভেবেচিন্তে ঠিক কর। আমি আসি রে!"
জিতেন পাল চলে যেতেই সমিধ বলল, "তোর জন্য ছবিটা আঁকাই হল না। দ্যাখ ইতিকা, তুই মা হাতে চাস না? বাপ-ঠাকুরদারা যেসব কাজ করেছে সবই মায়ের। মা দুর্গা, মা লক্ষ্মী, মা সরস্বতী।"
ইতিকা কথায় গ্রাহ্য না করে বলল, "মা অনেক মিস্‌ড কল করেছে রে!"
সমিধের চোখের কোণে দুষ্টুমির ঝিলিক, "শোন না ইতিকা, এখানে আয়। তোর নাকের বাঁ দিকে সাতসকালে ঘাম জমেছে। আয় আয়, এ দিকে আয়," বলতে বলতে ওর বাঁশির মতো সুন্দর নাকের পাটায় টুক করে একটা চুমু খেল। তার পর ওর থুতনিটা তুলে ধরে বলল, "তোর কিছু কিছু এরিয়া ইউনিক। নইলে তুই একটা পেঁচি।"

বিকেলে ধীমান নিবিড়ের বাড়িতে গেল। দূর থেকে ধীমানকে দেখে এগিয়ে এল নিবিড়। ওকে সঙ্গে করে নিজের ঘরে বসাল। বেতের গদি-আঁটা চেয়ারে বসিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল ধীমানের দিকে।
ধীমান বসার পরে বলল, "নিবিড়, মনে হচ্ছে তুই কিছু নিয়ে চিন্তিত। কী হয়েছে নিবু? মাসিমার কিছু হয়নি তো?"
পায়চারি থামাল নিবিড়, "না রে ধীমু।"
"তা হলে?"
"তপতীর খুব বিপদ। কী করা যায় বল তো?"



ধীমানের মাথায় কথাটা ঢুকল না। এক দৃষ্টিতে নিবিড়ের দিকে চেয়ে থেকে ঘাড় নেড়ে বলল, "তপতীকে তো ঠিক..."
চেয়ার টেনে ধীমানের সামনে নিবিড় বসেই পড়ল। গলা নামিয়ে আবেগী কণ্ঠে বলল, "তপু রে তপু। আমার সেই তপতী! ভুলে গেলি ধীমু!"
ধীমানের চোখের সামনে বহু অতীতের রুদ্ধদ্বার খুলে গেল যেন। ওর চোখের সামনে সত্তরের দশকের কোলাজ একের পর-এক সরে গেল। সত্তর দশক গণচেতনার দশক। ওরা টগবগ করে ফুটছে। বিশেষ করে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। ছাপোষা গৃহীরা আতঙ্কে ভুগছে। এপাড়া ওপাড়ার অলি-গলিতে দিন-দুপুরে রক্তাক্ত যুবশ্রেণি। কখনও বা লাশ, গণলাশ। আতঙ্কের হিমছাপ ঘরবাড়ির দেওয়ালে। নিবিড়ের কথায় ওরা আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠল।
এ সবের সঙ্গে কাদের যেন বড়সড় আদর্শটাদর্শ ছিল। ধীমান, নিবিড়, শঙ্কর, মল্লিকা, রানারা দেখেছিল এক দল ছেলে ওদের কলেজে গ্রেট করে গেল। পড়াশোনা বন্ধ। ক্লাস হবে না। পরীক্ষা বন্ধ। মল্লিকার বাবা সে আমলে ব্যারিস্টার ছিলেন। হিটলিস্টে নাম ছিল তাঁর। মল্লিকা একটু ডাকাবুকো টাইপের ছিল। গাড়ি চালিয়ে ক্লাস করতে আসত। সেই অস্থির সময়ে ধীমান বাবাকে তন্ময় হয়ে শিল্পের মধ্যে ডুবে থাকতে দেখেছিল। বেশ ক'টা বাস্টের কাজ করেছিল দেশবরেণ্যদের। এক দিনের কথা মনে এখনও জ্বলজ্বল করছে। তখন ভোরবেলা। বাবা, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও আর কয়েক জনের মূর্তি গড়ে রেখেছিল ঘরের সামনে। আবছা অন্ধকারে কারা এসে ওগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। ধীমান দেখেছিল, সময় ও চেতনার দ্বারা তাড়িত হয়ে পরে ওর বাবা অন্য কিছু গড়ছে। ভূমিহীন চাষি, দিনমজুর, হতদরিদ্র কুমোর সম্প্রদায়ের জীবনযাপনের সূক্ষ্ম চিত্র গড়েছিল। সে সব রিয়্যালিস্টিক মূর্তি ও ছবি। ঠিক সেই সময় জলঙ্গীর ধারে গরিব ঘরে মাটির জন্য গিয়েছিল নিবিড়। মাটি চিনতে একটা মেয়ের সাহায্য নিয়েছিল। তাকে মডেল করে কাঠের কয়েকটা কাজও করেছিল। নিবিড় অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে ছিল। তখনকার নকশালদের ক্রোধ জন্মেছিল ওর উপরে। সেই টালমাটাল সময় কিছু দিন নকশালদের নজর থেকে গা-ঢাকা দিতে সেই মেয়েটার বাড়িতে আত্মগোপন করেছিল। ওর অজ্ঞাতে নিবিড় ও ওই মেয়েটার মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মেয়েটার নাম ছিল তপতী। মনে পড়ল, নিবিড় ওকেই 'তপু' বলে ডাকত।
নিবিড় ডাকল, "চল দু'জনে তপুর বাড়িতে যাই।"
ধীমান বিস্মিত। তপুর বাড়ি কোথায়, তা-ও এখন মনে নেই। শুধু জলঙ্গীর পারে মনে আছে। তবুও কিন্তু কিন্তু করে ধীমান নিবিড়ের সঙ্গে চলল। তখন এক দিন নকশালদের কয়েকটা ছেলে নিবিড়ের সন্ধান পেয়ে তপতীদের ঘরে

এসে ওর গলায় ক্ষুর ধরেছিল। তপতী ওকে জানে-মানে বাঁচিয়েছিল। তাই ওর এক রাশ কৃতজ্ঞতা ছিল তপতীর প্রতি। তার পরের অনেক কিছু ধীমানের কাছে অস্পষ্ট। কেনই বা গা-ঢাকা দিয়েছিল, কেনই বা তপতীর মতো আত্মত্যাগী মেয়েকে ফেলে ও ইংল্যান্ড পালাল। সে সময় দু'জনের মাঝে চিড় ধরেছিল। অবশ্য ধীমান কেরিয়ার নিয়ে কলকাতার বাইরে ইটালিতে বছর দুয়েক কোর্স করতে গিয়েছিল। তাই অনেক কিছুই ওর পক্ষে জানা সম্ভব নয়।
যেতে যেতে কিছু শোনার জন্যই ধীমান নিবিড়ের দিকে তাকিয়ে আছে। নিবিড় বলল, "তপুর খুব বিপদ রে!"
"কী হয়েছে ওর?"
"তপুর ছেলের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।"
"ওরা বাবার কাছে থাকে? নাকি নিজেরা?"
"মা-ছেলে থাকে। ওর বিপদে যদি না দাঁড়াই, অত্যন্ত অপরাধ হবে।"
ধীমান আরও তলিয়ে বুঝে নিতে চাইছে। "অবস্থা এখন কেমন?"
নিবিড়কে টালমাটাল দেখায়। এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলে, "খারাপ অবস্থা।"
"তা হলে যাওয়াই উচিত। কিন্তু আমাকে নিচ্ছিস কেন সঙ্গে?"
নিবিড়ের শান্ত স্বর, "আমার বন্ধু বলে।"
"তবে চল তাড়াতাড়ি। কিছু নিয়ে যাই চল।"

১৫

জলঙ্গীর তীরে কাঁঠালপাড়া। আগের চেয়ে অনেক ঘিঞ্জি ও সমৃদ্ধশালী হয়েছে। নিবিড় বহুকাল এই অঞ্চলে আসেনি। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে তবে খুঁজে পেল তপতীর বাড়ি। কিন্তু কীভাবে তপতীর সামনে দাঁড়াবে, এটাই নিবিড়কে ভাবাচ্ছিল। একটা বাচ্চা মেয়ে প্রৌঢ়া মহিলার হাত ধরে বাইরে এল। ধীমান বুঝল, এটাই তপতী। নিবিড় ও তপতী একে অপরকে দেখল। এক সময় তপতী ওদের ঘরে ডাকল। ঘরে ঢুকে দুটো প্লাস্টিকের চেয়ার দেখিয়েও দিল। ধীমান ঘাড় তুলে ঘরের চারপাশে নজর ছুড়ল। দেখতে দেখতে কাচের শোকেসে চোখ আটকে গেল। কতগুলো সূক্ষ্ম মাটির কাজ। নৌকা ভাসছে, নদীর ধারের ঘাস-লতা কাটা হচ্ছে, একটা বাচ্চা মেয়ে নিচু হয়ে শিউলি কুড়োচ্ছে, একটাতে অপু-দুর্গা কাশবনে। ধীমান খুব খুশি। এ সব সূক্ষ্ম ও ধৈর্যশীল কাজ। প্রতিভা ও পাকা হাতের কাজ। ধীমান বলেই ফেলল, "বাহ! কে গড়েছে?"
এত ক্ষণে তপতী নিবিড়ের পিছনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে।
খুব ধীরে উত্তর দিল, "আমার ছেলে।"
"কই সে?" ধীমানের প্রশ্ন।
নিবিড়ও জিজ্ঞেস করল, "ছেলে কোথায়?"
ধীমানের স্নায়ুর সীমা জুড়ে আনন্দের বিন্দু ছুঁয়ে যাচ্ছে। তপতীর মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুল। সবই প্রায় পাকা। সারা মুখে বিষণ্ণতার ছাপ। মৃদু স্বরে উত্তর দিল, "হাসপাতালে।"
নিবিড় প্রশ্ন করল, "কত দিন হল অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে?"
"প্রায় মাসখানেক হবে।"
"সে কী? এত দিন বলা হয়নি কেন?"
ধীমান লক্ষ করল, ওরা ভাববাচ্যে কথা বলছে।
"কিছু দিন এটা-সেটা করে দেখা গেল কোমরের হাড় জোড়া লাগেনি। তার পরেই হাসপাতালে দেওয়া হল।"
"কী ভাবে ঘটল?"
"ওই যে একটা স্কুলে ক্রিসমাস উপলক্ষে সাজাতে গিয়েছিল। চার্চের উপরে উঠে পুতুল সাজাচ্ছিল। নামার সময় মইয়ের পায়া নড়ে যায়। ব্যস! পড়ে যায় নীচে। আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি। ছেলে আমার বড্ড সহনশীল। ওখানকার লোকেরা স্ট্রেচারে শুইয়ে ঘরে এনেছিল। তবুও ওর মুখে ব্যথার ছাপ নেই। মুখে হাসি।
"ওর করুণ অবস্থা দেখে কেঁদে ফেলি। ছেলেটা নীরবে আঙুল দিয়ে কোমর দেখায়। যন্ত্রণাটা দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছিল। কৃষ্ণনগরে হাসপাতালে নেওয়া হল। তার পরে এক্স-রে। বোঝা গেল ফ্র্যাকচার হয়েছে। ট্র্যাকশান দিয়ে শুইয়ে রাখতে হবে। নয়তো কলকাতায় গিয়ে অপারেশন করতে হবে। কোমরের হাড়ের অপারেশনে প্রচুর খরচ আর হাসপাতালে লাইন অনেক। এটা-সেটা করতে করতে প্রায় মাসখানেক গেল।
"তার পরে একটা নার্সিং হোমে অপারেশন হবে ঠিক হয়েছে। কিন্তু খরচ প্রচুর। ছেলেটার কানে গেছে কথাগুলো। আমায় বলল, 'মা, আমি তোমার সহায় না হয়ে ঘাড়ের বোঝা হয়ে উঠলাম।'
"শুনে বুক ফেটে যায়। তখনই দুঃস্থ শিল্পী সমবায়ের কাছে সাহায্যের আবেদন করি। অনুকূলদা ওখানে আছে তো!"
নিবিড়ের গলায় উৎকণ্ঠা, "কত খরচ পড়বে অপারেশনে?"
তপতী মুখ নিচু করে বলল, "প্রায় লাখ তিনেক।"
নিবিড় জিজ্ঞেস করল, "কোন নার্সিং হোম?"
"কলকাতার ফুলবাগানের ব্লু-বার্ড।"
"চিনি, ওখানে আমার পরিচিত ডাক্তার মজুমদার আছেন," বলেই নিবিড় তপতীর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে চাইল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কী হল কে জানে! অন্তত ধীমান কিছু বুঝল না, তপতীর নাকের পাটা ফুলে উঠল। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসবে। কপালের মাঝের শিরাটা স্পর্শ করল। কিন্তু ঝটিতি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে অন্য ঘরে ঢুকে গেল। ধীমানের খুব অস্বস্তি হচ্ছে। ঘরের পুতুলগুলোর দিকে চেয়ে স্বগতোক্তি করল, "নিবু, আমাকে তো আনলি! জানি না আজ কী ঘটতে চলেছে। দেখিস মান-সম্মান খোয়া না যায়!"
নিবিড় শুনেও না শোনার মতো করে বসে রইল। জীর্ণ ঘরের ফাটলের দিকে চেয়ে। মাত্র কয়েক মিনিট। তপতী দু'কাপ চা আর বিস্কুট এনে টেবিলে দিল। এখন কিছুটা স্বাভাবিক। বলল, "গরিবের ঘরে এক কাপ চা খেয়ে যান ধীমানদা।"
ধীমান বলল, "আমাকে তুমি চেনো দেখছি।"
"আপনার মতো নামীদামি ও গুণী মানুষকে কে না চেনে! আপনি তো কৃষ্ণনগরের গর্ব।"
"সেই সত্তরের দশকে এক বার তোমার বাপের বাড়িতে দু'-এক বার গিয়েছিলাম, মনে রেখেছ?"
সামনের ভাঙা টুলে বসে তপতী বলল,

"সকলের সব কথাই মনে আছে। বিপদের দিনে ফেরাতে নেই কাউকে, নইলে..."
ধীমান বলল, "দ্যাখো তপু, পুরনো দ্বন্দ্ব, মান-অভিমান এখন থাক। নিবু কিন্তু তোমার ছেলের খবর পেয়েই সাহায্য করতে এসেছে।"
"তাই?"
"সন্দেহ নেই একটুও।"
"আমি নেব কেন?"
"বন্ধুর দান নিতে আপত্তি কোথায়?"
"বন্ধু! এসব শব্দ আপনাদের মোবাইলে মোবাইলে ঘোরে। শুনতে ভালই লাগে," একটু থামল, আবার বলল,"বন্ধুই বটে! দূরের বন্ধু এখন আমার ঘরে। তাঁর দয়ার দান আমাকে তো নিতেই হবে। এমনই হতভাগ্য।"
তপতীর ভিতরের সুপ্ত আগ্নেয়গিরি জেগে উঠল। গুমগুম শব্দে মাটি কেঁপে উঠল। তীব্র বাক্যবাণ শুরু হল। কী করা উচিত, ধীমান ভেবে পেল না। নিবিড়ের কাছে কিছু শুনে ভাসা ভাসা ধারণা হয়েছিল। সেটা একটু একটু করে স্পষ্ট হচ্ছে।
তপতীর গলা চড়ে, "গরিব ছিলাম। বাবা মাটির পুতুল বিক্রি করত ঠিকই, কিন্তু মিথ্যাচারে অভ্যস্ত ছিলাম না। তুমি আমাদের বাড়িতে আসতে-যেতে। একটু বিশ্রাম, এক কাপ চা... তার পর তো...!"
"থামলে কেন?" নিবিড়ও তেতে উঠেছে।
তপতী চোখের আড়ালে, "ধীমুদা, আপনি তো কিছুই জানতেন না ওর কীর্তিকলাপ।"
"এমন করে বলছ যেন খারাপ কাজ করেছি।"
"এখানে প্রেমের খেলা খেলতে আসতে।"
"খেলতে নয়, সত্যিকারের প্রেম যাকে বলে সেটাই ছিল।"
"সত্যিকারের প্রেম? যে প্রেম স্বীকৃতি দেয় না, দায়িত্ব নিতে ভয় পায়, সেই প্রেমের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিই,"বলেই তপতী ক্ষোভে অভিমানে ফুঁসতে থাকল।
"আসলে সব গোলমাল পাকিয়েছিল তোমার বাবা। ওর বৈষয়িক বিচারবুদ্ধি এমন টনটনে ছিল যে, সেটা লোভের পর্যায়ে পৌঁছে গেছিল।"
"লোভ? কী বলছ? গরিব বাবা দেখছে, নকশালদের ভয়ে মেয়ের ঘরে ছেলেটা লুকিয়েছে। তখন মেয়েকে বদনামের হাত থেকে বাঁচাতে বলবে না? বিয়ের কথা তখন বলা কি অন্যায় ছিল?"
এ বারে নিবিড় ধীমানের দিকে ফিরে বলল, "ওই সময় তপতীকে কিছুদিনের জন্য পুতুল বানানো শেখাচ্ছিলাম। ওরা পুতুল তৈরি করেই সংসার চালাত। তো, ওই সমাজ উদ্ধারের দলের লোকেরা ভেবেছিল, আমি ওদের মেয়েকে ফুঁসলে নিতে এসেছি। ওরাই তখন সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।"
নিবিড়ের চোখের সামনে যেন সেলুলয়েডের পর্দা। সেখানে সেই সব আতঙ্কের দিনগুলোর কথা ভেসে উঠল। পাড়ার চরকা, বিরু, শীতলরা এসে ওকে থ্রেট করেছিল। পরে জেনেছিল, ওরা আসলে কোনও আন্দোলনকারীই ছিল না। ওরা বাপে-খেদানো মায়ের তাড়ানোর দলে। আসল আন্দোলনকারীদের গায়ে গায়ে থেকে নিজেদেরও ওই দলের ভাবত।
ওরা যখন-তখন এসে থ্রেট করত, "গরিবের মেয়ের রক্ত চোষা হচ্ছে! আমরা এ সব বরদাস্ত করব না।"
নিবিড় যত বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে, ওদের কাজে সাহায্য করতে আসা হয়েছে, ওরা কিছুতেই বুঝত না। একদিন তো মাথায় লোডেড রিভলভার ঠেকিয়ে বলেছিল, "কাজ? শিল্প দেখাচ্ছ? ধড়-মুন্ডু আলাদা করে আম গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখব।"
তপতীও নিবিড়ের মতোই সে সব দিনের কথা ভাবছিল। অস্থির ভাবে বলে উঠল, "আমি সে সময় ওদের বলেছিলাম, ও শোষক নয়। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। ও এ বাড়ির জামাই হবে। তবুও জঙ্গিগুলোর বিশ্বাস হচ্ছিল না। জানেন ধীমুদা, আমার বাবাও এসে হাত জোড় করে বলেছিল, 'হ্যাঁ গো ছেলেরা, বিশ্বাস করো, নিবিড় আমার জামাই হবে।' তখন ওরা রিভলভার সরিয়েছিল।"
একটু চুপ থেকে নিবিড় পুরনো দিনগুলো যেন দেখতে পেল। বলল, "তখনই ওর বাবার ধারণা হয়েছিল, আমি খুব তাড়াতাড়ি ওকে বিয়ে করব।"
তপতী বলল, "করার ইচ্ছে থাকলে করতেই পারত। তখনও বুঝিনি ওর অন্য রকম ইচ্ছে ছিল। যাই হোক! আর কী! বুঝলেন ধীমুদা, ওকে বাবা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কবে বিয়ের ডেট করব?' তখনই ওর আসল রূপটা প্রকাশ পায়।"
"আরে, তখন আমার বয়স কম। জীবনে দাঁড়াইনি। কাজ খুঁজছিলাম। ওর বাবা চাইছিল, আগে বিয়ে করে ওকে নিয়ে বিলেতে যেতে। আমি চেয়েছিলাম দাঁড়াই, তার পরে বিয়ে থাওয়া হবে'খন। কিন্তু ওর বাবা ও পরিবারের অন্যদের চাপাচাপিতে মেজাজ বিগড়ে গেছিল, কিন্তু ভালবাসা ভুলিনি। তাই এত বছর বাদেও ফিরে এলাম।"
তপতীর মতো শক্ত মেয়েও কেঁদে ফেলল।
ধীমান এত ক্ষণ চুপ করে ছিল। এ বারে মুখ খুলল, "তপু কেঁদো না। এখন নিবু কিন্তু সত্যিই তোমার ছেলেকে সাহায্য করতে এসেছে। তুমি বলো কীভাবে তোমাকে সাহায্য করলে তোমার সুরাহা হবে।"
তপতীর মুখ-চোখ লাল। সে অবস্থাতেই তপতী মুখ তুলে তাকাল।

১৬

আকাশের চিবুকে সূর্য গোলাপি রং লাগিয়েছে। ওটা কি বাৎসল্য রসের রং! এখন গোধূলি। এমন দু'-চারটে কোমল রশ্মি তপতীর ঘরেও ঢুকেছে। তপতীর চোখে-মুখে এখন স্বস্তির আলো থইথই করছে। এখন ঘর জুড়ে ছোট ছোট সুখ ও আনন্দের বৃত্ত ঘোরাফেরা করছে।
ধীমান তপতীর ঘরে বসে। ঘরটার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। কিছুদিন আগের তপতীর সঙ্গে এই তপতীর কত তফাত! নিবিড় ফল-মিষ্টি এনে তপতীর হাতে তুলে দিল। ওকে আজ যেন নিবিড়ের ঘরণী বা স্ত্রীর ভূমিকাতেই দেখা যাচ্ছে।
ধীমান জিজ্ঞেস করল, "নিবু, তুই যাবি জলঙ্গীতে? ওপারে মাটি খুঁজতে যাব।"
"যাব, দাঁড়া। নির্মলের জন্য খাবারের লিস্টটা তৈরি করে রাখি। ডাক্তার বলেছেন, ছেলেটার ক্যালসিয়াম ও আয়রনের অভাব।"
তপতী দু'জনের জন্য চা নিয়ে হাজির, "ধীমুদা, কত দিন বাদে এলেন। কোথায় ছিলেন এত দিন?"
তপতীর কথার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ফুটে

বেরোচ্ছে। ওর ঝকঝকে সুন্দর হাসিমুখ দেখে ধীমানের বেশ ভাল লাগল। ওর কাঁচা-পাকা কোঁকড়ানো চুল কপালের উপরে লুটিয়ে আছে। সামান্য চাপা নাকে একটা নাকছবি। পদ্মকোরকের মতো একজোড়া চোখে খুশির ঝিলিক।

ধীমান চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বলল, "আরে, মাঝে মাসদুয়েক আফ্রিকা ঘুরে এলাম।"

"বাহ!"

"আমার ভাগ্নির বাড়ি। জামাই ওখানে ট্রান্সফার হয়ে গেছে। আমায় প্লেনের টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাই বেড়ানো হয়ে গেল।"

তপতী চায়ের খালি কাপ-প্লেট তুলে নিয়ে হেসে বলল, "সেই জন্যই খোঁজখবর নেই।"

তপতী আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার মধ্যেই হুইলচেয়ারে বসে এক যুবক ঘরে ঢুকল, বলল, "মামা, দ্যাখো এগুলো বানালাম।"

ও কোলের উপরে রাখা দু'খানা পুতুল দেখাল। নিবিড় বলল, "আমাকে নয়, ধীমুমামাকে দেখা।"

তার পরে আরও কত কিছু বলল। সে সব কথা ধীমানের কানের ঘরে ঢুকলেও মনের ঘরে ঢুকল না। ও গভীর ভাবে পুতুল দুটো দেখতে থাকল। ভাবল, 'ছেলেটার হাতের কাজ তো চমকে দেওয়ার মতো!'

নিবিড় তপতীকে পাশের বারান্দায় ডেকে একান্তে নির্মলের খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দিল। তার পর বলল, "ধীমান, চল বেরোই।"

তার পর ঘাড় ঘুরিয়ে তপতীকে বলল, "সব দেখেশুনে চলবে। কাল আসতে পারব না। দু'দিন বাদে আসব।"

পথে বেরিয়ে ধীমান জানতে চাইল, "তুই ওদেশে আর ফিরবি না?"

"না রে ধীমু!"

"কেন নিবু? ও দেশে তোর স্ত্রী-কন্যা আছে তো!"

"আমি ডিভোর্সের পেপার পাঠিয়েছি।"

"কোন গ্রাউন্ডে?"

"আমি নয়, সীমা নিজেই এই সম্পর্ক কেটে বেরনোর জন্য বহু দিন ধরে ছটফট করছিল। ওকে মুক্তি দিলাম।"

"আর মেয়ে?"

"ও সীমার আগের পক্ষের, আমার নয়।"

"তুইও কি ডিভোর্সের জন্যই উদ্গ্রীব ছিলিস নাকি?"

"শোন! এক তরফা কিছু ধারণা করে নিস না। আমি আগে ভাবতাম, ও বুঝি ধর্মের ব্যাপার নিয়ে খুব স্পর্শকাতর। আর খুব ডিভোটি। প্রতি রবিবার চার্চে যায়। পরে জানতে পারি, আসলে ও চার্চের এক জুনিয়র যাজকের সঙ্গে ইনভল্‌ভড।"

ধীমান অবাক! কিছু ক্ষণের মধ্যে নিবিড় আর ধীমান জলঙ্গীর ঘাটের কাছে পৌঁছে গেছে।

ধীমান আলতো করে বলল, "নিবু, তুই কি সত্যি সত্যিই চলে এলি?"

"আমি স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছি রে ধীমু। আর ও দেশের কালচারের সঙ্গে মানাতে পারছি না। বয়স তো হল। বাকি জীবনটা এখানেই কাটাব ঠিক করেছি।"

"নিবু, এই দু'মাসে তুই অনেক কিছুই ভেবেচিন্তে এগিয়েছিস।"

"তা ঠিক। তুই-ও ছিলিস না। তোর সঙ্গে পরামর্শ করতেও পারিনি। আসলে, আমি ইদানীং খুবই শিকড়ের টান অনুভব করছি। ওখানে থাকার আর কোন টানই নেই।"

ধীমান নিবিড়ের কাঁধে হাত রাখল। স্পর্শে অন্য কিছু ছিল। নিবিড় চমকে উঠল। ডুবন্ত সূর্যের দিকে চেয়ে ধীমান বলল, "নির্মলের মুখ অবিকল তোর মতো। প্রথম দেখলাম তো! চমকে গেছি।"

সূর্য ডুবে গেলেও তার রেশ থেকে যায়। সময় চলে গেলেও তার কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত রেখে যায়। নিবিড় সামনের সূর্যটার মতোই অতীত নদীতে ডুব দিল।

"তুই শুধু সেই কয়েক দশক আগের কথা জানতিস। সেই নকশাল হামলার পর তপতীর বাবা ক্রমাগত মানসিক উৎপীড়ন শুরু করেন। অন্য দিকে আমার বাবা বিদেশে ভাস্কর্য-বিদ্যা পড়ানোর জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। শেষে এক আত্মীয়ের দৌলতে ইয়র্কশায়ারে এক বছরের সার্টিফিকেট কোর্স শেষ করলাম। কাজে নামলাম। বন্ধুর মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজপরিবারের কিছু কাজ পেলাম। প্রাক্তন ব্রিটিশ লর্ডদের টরসো করলাম। হাতে বেশ কিছু পাউন্ড এসেছিল। দেশের জন্য মন কেমন করতেই এখানে চলে এলাম। এখানে এসে দেখি, তপতীর বিয়ে হয়ে গেছে।"

নদীর জলে হালকা কালো ফিনফিনে পর্দা পড়েছে। ঢেউ বয়ে চলেছে। নিবিড়ের মনেও ঢেউ বইছে অতীত থেকে বর্তমানে।

"তপুকে হারানোর দুঃখ আমাকে আলোড়িত করেছিল পা থেকে মাথা অবধি। বাবার ঠিক করা পাত্রীকে বিয়ে করা দূর অস্ত! ফিরলাম ইংল্যান্ডে। আমার অবস্থা দেবদাসের মতো!"

নিবিড়ের একমুখ কাঁচা পাকা দাড়ি। জোড়া ভুরুর নীচে আয়ত চোখ। আলগা হেসে বলল, "ইয়র্কশায়ারে একটা শপিংমলে গিয়ে বাঙালি মেয়ে সীমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ও দেশে পড়তে যায়। উচ্চাশা ছিল। বড় চাকরি করে ও দেশে প্রতিষ্ঠা পাবে, এই আশা থাকলেও সেল্‌সের চাকরির বাইরে আর কিছু পায়নি। উপরন্তু একটা রদ্দি লোকের গাড্ডায় পড়েছিল। লোকটা ছিল মাতাল ও লম্পট। মাত্র একটা বছর ওদের সম্পর্ক স্থায়ী ছিল। সীমাকে একটা মেয়ে উপহার দিয়ে কেটে পড়েছিল। ব্যস! কিছু দিনের মধ্যে আমিও সীমার গাড্ডায় পড়েছিলাম। ওর মেয়েটাকে ভালবেসেছিলাম। সীমার চেয়ে সুন্দর আর মিষ্টি স্বভাবের ছিল।"

ধীমানের কণ্ঠ থেকে ছিটকে বেরোল, "তার পর?"

"আমি আবার দেশে এলাম। বাড়িতে সীমার কথা বলিওনি। কী করে বলা যায় ভাবছিলাম। হঠাৎ এক দিন রাস্তায় তপতীর সঙ্গে দেখা। খুব আন্তরিকভাবে ওর বাড়িতে ডাকল। আমিই প্রথমে যেতে চাইছিলাম না। কিন্তু ওর ডাক উপেক্ষা করতে পারলাম না। ওর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, ওর বাবা নেই। স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। একাই পুতুল বেচে সংসার চালায়। নিজেই দু'কামরার একটা বাড়ি বানিয়েছে। সারা বাড়িতে দারিদ্রের ছাপ স্পষ্ট।"

নিবিড় অস্ফুটে বলল, "সে দিনটার কথা

খুব মনে পড়ে রে ধীমু! তপু আমার জন্য চা করে নিয়ে এল। ওর পরনে সাদামাটা হলুদ-কালো ডুরে শাড়ি, রংচটা ব্লাউজ়। পোড়ামাটির মতো গায়ের রং। ডাগর চোখের নীচে এক পোঁচ কালি। মুখে তুলির ছোপ, ঠোঁটের কোণে সাদা দাগ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘তোমার স্বামী এখানে একেবারেই আসেন না? বা কোনওরকম আর্থিক সাহায্য?’

“‘নাহ! একদম-ই না। ও আর ওঁর মা আমাকে বাঁজা মেয়েছেলে বলে ত্যাগ করেছে। অথচ আমার পুতুল-বেচা পয়সায় লোকটা মদ, মাংস খেত। নিজে রোজগার করলে, তা দিয়ে জুয়া খেলত। মেয়েদের সব পাওয়ার সেরা পাওয়া হল সন্তান পাওয়া। সেটা থেকেও বঞ্চিত হলাম। ডাক্তার দেখাতেই সব পরিষ্কার। এই হল তোমার তপতীর ভাল থাকা।’

“জানিস ধীমু, এর পর আমি আর নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারিনি রে!



গাড়ি স্টার্ট দিল। বিনয় এবার একটু প্রগলভ। বলল, “মল্লি, আমরা সকলে এমন একটা স্টেজে এসেছি যে, পুরনো ভুল বা আনন্দ কোনওটা নিয়েই লজ্জা-সঙ্কোচ হয় না।”

দিন-রাত, পৃথিবীর আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি সব মিলে মিশে একাকার। হাসি-কান্না-আনন্দের সময়টা কখন শেষ হয়ে গিয়েছিল, বুঝতেই পারিনি। পরে, অনেক পরে, শুভ সংবাদটা জানতে পেরেছিলাম। তত দিনে আমি বিদেশে।”

১৭

এখনও অন্ধকারের পাতলা চাদর ছেঁড়া বাকি। শরৎ চাটুজ্জে লিখেছিলেন, অন্ধকারেরও অনন্য রূপ আছে। অবগুণ্ঠনবতী তমসাময়ী একটু একটু করে অন্তর্লীন হচ্ছে আর প্রভাত একটু একটু করে চোখের পাতা খুলছে। সব মিলিয়ে ভাললাগাটুকু স্নায়ুতে ছড়িয়ে পড়ছে ধীমানের। সকাল থাকতে থাকতে কাজে বসতে ইচ্ছে হল। খেয়াল করল, বিশুদাও উঠে পড়েছে। ধীমান তড়িঘড়ি ডাক দিল, “বিশুদা, যত ক্ষণ স্টুডিয়োতে কাজ করব, কাউকেই ঢুকতে দিস না।” দীর্ঘ সময় ধরে ধীমান নিজের সাধনায় মগ্ন। বাইরে দেবদারু গাছের চারপাশে সিমেন্টের বেদি। বিশু সেখানে বসে সাত-পাঁচ ভাবনায় উতরোল। হাতে একটা চিয়ারি। “ও বিশুদা, হাতে কাঠি নিয়ে কী ভাবছ?” ধৃতি বাজারের ব্যাগ নিয়ে সামনে দাঁড়ায়।

“তোমার বাবারে ডাকা বারণ এখুন। কাজের ঘোর লেগেছে।”

ধৃতি বাবার ঘোরের ব্যাপারটা ছোট থেকেই জানে। মায়ের কাছে শুনেছে, ও তখন সদ্য জন্মেছে। বাবা একটা আবক্ষ মূর্তি এক নাগাড়ে দিন-রাত গড়ছিল। ছেলে হয়েছে কানে গেলেও দেখতে ওঠেনি। এ নিয়ে মায়ের অভিমান-ক্ষোভ প্রবল।

ঘর থেকে বেরিয়ে ধীমান বলল, “বিশুদা, তুই এবার গিন্নিমার কাছে যা।”

বিশু ওখান থেকে বেরোতেই গেটের বাইরে সৌমেনের বাইকের শব্দ।

“আয় সমু, সকাল থেকে এটা আঁকলাম। দ্যাখ খুঁটিয়ে,” বলেই ধীমান ওর সামনে ছবিটা রাখল।

সৌমেনের চোখে এখন শিল্প নয়, স্বপ্ন নয়, অন্য রকম বোধ খেলা করছে। দুই শিল্পী মুখোমুখি এখন। সৌমেন অবাক বলতে অবাক! ধীমুদা রং-তুলি ধরেছে! সে না হয় হল। আবার বিমূর্ত ছবি! একেই বলে ছাইচাপা প্রতিভা! পাহাড়ের মাথায় একটা নগর। পাহাড়ের ধাপে ধাপে বেয়ে উঠছে তিনজন। ভাল করে দেখলে বোঝা যাচ্ছে, তিনজনই শিল্পী। হাতে রং-তুলি আর প্যালেট। ওরা পুতুলপট্টির তিন বিখ্যাত শিল্পীর প্রতীক। ওদের পাশে পাশে মারের মতো বাধাবিঘ্নগুলো চলছে। কেউ বা বর্শা, কেউ বা কুড়ুল বা অন্য কিছু দিয়ে ওদের মারতে উদ্যত।

সৌমেন ভাবছে, ধীমুদা কেন এ সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। ও জিজ্ঞেস করেই ফেলল, “তুমি নতুন মিডিয়াম বা মাধ্যম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছ?”

সিগারেটে টান দিল ধীমান, “অবশ্যই এক্সপেরিমেন্ট।”

“কিন্তু এ সব কেন? তুমি তো অন্য দুটো মাধ্যমে বিখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত।”

“অর্ডার ছাড়া আজকাল কাজ করি না। নানা কারণে। ভুবনেশ্বর আমাকে কী যেন জাদু করেছে! মনটা তোলপাড় করছে। আমরা, শিল্পীরা কি মহাপ্রস্থানে চলেছি?”

“এ সব ভাবনা কেন ধীমুদা?”

“আমরা ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আটকে আছি রে! স্মরণীয় কোনও কাজ কি করেছি?”

তখুনি সৌমেনের ফোন বেজে উঠল। ধরার ইচ্ছে হল না, কেটে দিল। বিশু দু’জনের জন্য চা-বিস্কুট আনল। নিচু স্বরে বলল, “ধিতি আপনেরে ডাকতেছে।”

“ঠিক আছে, পরে কথা বলব। সমু, আজকাল জানিস, অস্থিরতা বাড়ছে।”

“তোমার কি ঘুম কম হচ্ছে? চোখের কোলে কালি জমেছে।”

“ও সব কথা মেয়েদের বলিস। চোখের কোলে কালি পড়ুক গে। মনের কোণে কালি যেন না জমে!” বলেই ম্লান হাসল, “দ্যাখ, সেই যে, বিধায়ক নেতা-মন্ত্রীদের আলোচনা হল। কত প্রস্তাব দিলাম। ওরাও পরের অধিবেশনে তুলবে বলল। টিভির দিকে তাকিয়ে থাকি এই বুঝি বলে যে, মৃৎশিল্পীদের জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কোথায় কী! নেতারা কাজ কিছুই করবে না।”

“দাদা, ওরা তো পরিযায়ী পাখি। ভোটের সময় ঝাঁকে আসে, বাড়ি বাড়ি ঘোরে, গান গায়। ভোট গেলে সকলেই ডানা থেকে প্রতিশ্রুতির গান ছেঁটে ফেলে উড়ে যায় আইনসভার দ্বারে। ধীমুদা, কোনও সরকারই পুতুলপট্টির শিল্পীদের জন্য কিছুই করেনি।”

“তা ঠিক। তবে এ সবের বাইরে আমরা আউটসাইডারই রয়ে গেলাম। কিন্তু...”

"তা হলেও একটা স্তম্ভ আমাদের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।"

সৌমেন উঠে দাঁড়াল, বলল, "ও সব ছাড়ো ধীমুদা। আমরা এভাবে শুধু কথার জাল বুনছি। থেমে যাও। নতুন কিছু ভাবনা ভেবে থাকো যদি বলো! তুমি মাস্টারমাইন্ড আছ।"

"শোন, তোরা আমায় বটের ছায়াটায়া কত কী বলিস! ও সব বললেই তো সব শেষ হয় না।"

"তা হয় না ঠিকই। কিন্তু তুমি শুধু শিল্পী হিসেবেই না, মানুষ হিসেবেও উঁচু মানের। আমি ওখানে এটাই বলে এসেছি। তোমার ঘোরতর শত্রু ভাস্কর শৈলেন পালও ট্যাঁ-ফোঁ করতে পারেনি। তুমি তো সব শিল্পীদের কথা ভাবো, সবাইকে নিয়ে এগোতে চাও। এখানকার হতদরিদ্র কুমোর, যারা শুধু মাটির ভাঁড় ও চাড়ি বানায়, তাদের জন্যও তুমি অনেক কিছু ভাবো, বলেছি ওদের।"

চোখে রিমলেস চশমাটা টুক করে গলিয়ে ধীমান বলল, "জানিস, কোনারক আমার ঘুম ছিনিয়ে নিয়েছে।"

"তাও তো তুমি মল্লিদির দৌলতে ঘুরলে। আমার তো ছোট্ট গণ্ডির বাইরে যাওয়া হচ্ছেই না।"

"হবে হবে! ইচ্ছেটাকে জিওল মাছের মতো জিইয়ে রাখ। ভেবে বল দেখি, আমাদের পুরস্কারের ব্যাপার কত লোক জানে!"

"তাও না হয় না জানুক। কিন্তু আমাদের কাজের কথা! কত লোক জানে! যারা ধর, নামটাম জানে। তারা আবার কাজের ধারা পদ্ধতি ঠিকঠাক বোঝে কি না সন্দেহ! শুধু একটাই কথা লোকের মুখ থেকে বুলেটের মতো ছোটে, 'কী সুন্দর আর নিখুঁত পুতুল!"'

"হুম! যা বলেছ ধীমুদা। সেই পুতুল! শিল্পী শব্দটা মুখ থেকে বেরোয় না। বলা ভাল উচ্চারিতই হয় না!"

"ঠিক এই জায়গাতেই আমার আকাশচুম্বী ক্ষোভ-অভিমান। অথচ দ্যাখ, ভারতের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে যত মন্দির স্থাপত্য আছে, সেগুলোর নির্মাতাদের শিল্পী বলে।"

এ সময় বিশুদা দরজায় ঠকঠক করে। ধীমু ওকে ঘরে ঢুকতে বলে। একটু কাঁচুমাচু মুখে বলে, "ধিতি কী একটা জরুরি কথা বলার জন্য ডাকছে। তোমার ফোন তো বন্ধ।"

"আচ্ছা যাচ্ছি, একটু বাদে।"

বিশু যেতে যেতে বলল, "সকালের খাবারও খাওনি। বৌদিদি খেয়ে যেতে বলেছে। সাতসকালে শুধু ছোলা-গুড় খেয়েছ।"

কথাটা বলেই বিশুদা অভিমানী পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল। সৌমেনও কথা ঘোরাল, "শুনেছি, তুমি নাকি শরীরচর্চা করছ?"

"ও সব না করলে কাজ করব কী ভাবে? আজকাল দম পাচ্ছিলাম না। হাঁপাচ্ছিলাম। ভাবছি, কীভাবে আমরা নিজেদের কাজকর্মকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারব," সৌমেনের হাতটা খপ করে ধরে ধীমান, বলল, "চল সমু, আমরা ক'জন মিলে সে রকম কিছু কাজের কথা ভাবি! যা নদিয়া জেলা থেকে বেরিয়ে সারা ভারতের শিল্পের ইতিহাসকে ছুঁয়ে থাকবে।"

বোঝা যাচ্ছে ধীমুদার হাতদুটো রীতিমতো উত্তেজনায় কাঁপছে।

সৌমেন বলল, "ধীমুদা, শান্ত হও। এমন করলেই কি সুরাহা হবে? তবুও তুমি কী ভেবেছ, তা বলো!"

"আমাদের সঙ্গে বেড়াতে চল। অজন্তা, ইলোরা গুহাচিত্র ঘুরে আসি। ওখানেই নতুন কিছু উপাদান পেয়ে যেতে পারিস। চল।"

সৌমেন কিছু বলতে পারল না। দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে তাকিয়ে থাকল ধীমানের দিকে।

"চল চল, কিছু অন্তত পাবিই পাবি। তোর জহুরির চোখ, ঠিক পেয়ে যাবি।"

১৮

"ওরে ছাড় ছাড়!" ধীমান তাড়না করে সৌমেনকে। আজ আবেগ, উচ্ছ্বাস, পুলক যেন পিংপং বলের মতো মনের দেওয়ালে লাফাচ্ছে। কিশোর হয়ে গেছে সে। বার বার বলতে থাকল, "ধীমুদা, তুমি শুধু শিল্পীদের গর্ব নও, সারা পুতুলপট্টির ভগবান।"

ধীমান ওকে ঘুরিয়ে সামনে এনে, ওর কাঁধ ধরে চোখে চোখ রেখে বলল, "সমু, শান্ত হ! শিল্পের ভগবান যদি কাউকে বলতে চাস, ওই গুহার মধ্যে যাদের মহান সৃষ্টি লুকিয়ে আছে, তারাই ভগবান। আমার সারা শরীর রোমঞ্চিত হচ্ছে রে!"

কথাগুলো যেন অদ্ভুত কাজ করল। ধীরে ধীরে সৌমেনের হাত দু'খানা ধীমানের গলা থেকে শ্লথ হয়ে নেমে এল। উচ্ছ্বাসটা এক ঝটকায় দমে গেল সৌমেনের।

একটু থেমে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল, "আহা! কী দেখিলাম! তুমি না আনলে আমার আসা হত কি না সন্দেহ!"

পিছন থেকে নিবিড় হেসে বলল, "বাব্বা! ধীমু, তোকে ধন্যবাদ দেব না। তবে মনে মনে তোকে প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছি না। আহা কী দেখলাম! ভাগ্যিস তুই ডিরেক্টরের সঙ্গে আগে থেকে কথা বলে রেখেছিলি। ফাঁকায় ফাঁকায় ছবিগুলো ওভাবে খুঁটিয়ে দেখতে ও আঁকতে দিল।"

"আরে আমি কী করলাম! বিনুদার চেনা। বিনুদা বড় পোস্টে চাকরি করত। ওর চেনা-পরিচিতির গণ্ডিটাও অনেক বড়। তো বিনুদাই ব্যবস্থা করে রেখেছিল।"

"ধীমুদা, তোমাদের দেখাদেখি আমিও ছবি আঁকতে চেষ্টা করলাম। সত্যি সত্যি পেরে তো গেলাম!" সৌমেন আনন্দে যেন আটখানা।

বিশুদা এসে বলে,"তোমরা এ সব আলোচনাতেই মশগুল থাকবে? নাকি নাওয়া-খাওয়া করবে? রান্নাবান্না তো সব রেডি।"

"হবে, হবে বিশুদা। তুই কড়া করে একটু কফি করে দে না! আলোচনা শেষ করেই খাব," বলেই ধীমান বলল, "তুই মাটি ও প্লাস্টার অফ প্যারিসে কাজ করিস বলে, অন্য মাধ্যমে পারবি না! দেখলি আমার কথায় অন্য মাধ্যমে হাত দিলি। ঠিক পেরেও গেলি! আর্ট কলেজে পা না দিয়েও, রং-তুলি নিয়ে কী অসাধারণ খেলা দেখালি!"

"আমার সাত পুরুষের কেউ কোনও কলেজে পড়েনি ধীমুদা!" সৌমেনের মুখ

থেকে হাসি উপচে পড়ছে।
নিবিড় ওদের মাঝে ঢুকে বলল, "তোর কাছে তো আগেই শুনেছি। কিন্তু ট্রেনেও এক ভদ্রলোকের মুখে শুনলাম। অজন্তার গুহায় জাতকের কাহিনি আছে, আর সে সব ফ্রেস্কোর আকারে।"
ধীমান বলল, "চল, খেয়ে নিই। বিশুদা, খাবার দাও।"
ধীমান খাবার মুখে পুরে বিশুদার দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ ভাবছে অন্য কথা। দেখছেও অন্য এক ঘটনার ছবি। হাওড়া থেকে ওরা মুম্বই এক্সপ্রেসে উঠেছে। রাতে কোথা থেকে যেন একজন ভদ্রলোক ওদের পাশের রিজ়ার্ভড সিটে উঠেছিল। আলাপ হল। খাবার লেনদেন হল। লোকটার নাম নবীন চৌধুরী। নবীন বাংলা ভালই বোঝে। কিন্তু বলতে পারে ভাঙা ভাঙা।জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনারা কোথায় বেড়াতে যাচ্ছেন?"
ধীমান বলেছিল, "অজন্তা গুহাচিত্র দেখতে। আর কিছু কাজ করতে।"
"কাজ মানে?"
"দেখে কিছু ছবিও আঁকব। দিনের শুরুতে যাব। তখনও টুরিস্টদের জন্য দরজা খোলা হয় না।"
ভুরু কুঁচকে নবীন চৌধুরী জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি বাংলার ভাস্কর কাম পেন্টার ধীমান পাল?"
ধীমান অবাক? বলে কী লোকটা? কী ভাবে চিনল ওকে? বাংলার বাইরের লোক হয়ে!
লোকটা আয়েস করে সিগারেট ধরিয়ে বলেছিল, "দাদা, আমি প্রফেশনাল গাইড।"
লোকটা পকেট থেকে পরিচয়পত্র বের করে দেখিয়েছিল।
"ও, ধন্যবাদ! কিন্তু নামটা জানলেন কীভাবে?"
"ওখানকার ডিরেক্টর পি. কার্লেকার তো আমাকে আসতে বললেন, আপনাদের মতো বিশিষ্ট শিল্পীদের এ সব দেখাতে ও বোঝাতে।"
ধীমানের সর্বাঙ্গে আনন্দের শিহরন খেলে যায়। 'বিনুদা আমাদের জন্য এতটা করেছে!'
ওরা সকাল সাতটার দিকে গিয়েছিল। যেখানে টুরিস্টদের জন্য সময় বেলা দশটা। মাথার উপরে বিশাল বিশাল কয়েকটা গাছের ছায়া ছিল। চারপাশে পাহাড়। তিন জনের কাঁধেই ব্যাগ ও কিছু স্কেচ করার বোর্ড ও পেনসিল। নবীন গাইডের পোশাক পরে, মাথায় টুপি চড়িয়ে হাজির হয়েছিল। দেবানন্দের হিন্দি ছবি 'গাইড'-এর নায়কের মতো লাগছিল লোকটাকে। সরকারি গাইডের মতো অপরিসীম দক্ষতায় লোকটা শুরু করল, "এই অজন্তা গুহাচিত্র আবিষ্কারের ইতিহাস আছে। নেট খুললেও আপনারা পাবেন। আমি এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে এনে কিছু বই পড়েছি। ওই যে নদীটা আপনারা দেখছেন, ওটা বাগোড়া নদী। অশ্বখুরের আকারের। ওটার দু'পাশে দেড়-দুশো ফুট উঁচু পাহাড়।"
সৌমেন জিজ্ঞেস করে, "নাম কী পাহাড়ের?"
"ইন্দ্রাদ্রি পর্বতমালা। এর এক দিক দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। অন্য দিকে তাপ্তির উপত্যকা। বাগোড়া নদী এই পাহাড়ের বুক চিরে ছুটে গেছে গভীর খাদে। পথে নেমেছে পর পর সাতটা জলপ্রপাত। শেষ ধারাটি যেখানে বাঁকা চাঁদের মতো বাঁক নিয়েছে, সেখানেই অজন্তা গুহা। আসুন আমার পিছনে। দেখুন শিল্পীরা সেকালে কী ঝুঁকি নিয়ে বিশাল বড় মাপের কাজ করেছিল।"
তার পর বলেছিল, "অজন্তায় তিরিশটা গুহা আছে। স্থানমাহাত্ম্য অসাধারণ। আপনারা মোটেও ভাববেন না, এগুলো প্রাকৃতিক গুহা। সবই পাহাড় কেটে মসৃণ করে তৈরি করা।"
সকলেরই পরনে ক্যাম্বিসের জুতো। একটু উপরের দিকে উঠে লোকটা লোকেশন বোঝাচ্ছিল, "কী কষ্ট ও অধ্যবসায় নিয়ে ওরা কাজগুলো নামিয়েছিলেন! এঁরা মূলত তিনটে শাখায় কাজ করেছিলেন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা।"
ধীমান একাই বিড়বিড় করছিল, "চাট্টিখানি কথা! এরা নাম-যশের জন্য কিছু করেনি। ভবিষ্যতের জন্য কিছু রেখে যাওয়ার জন্যই রেখে গেছে।"
লোকটা একটু উঁচুতে দাঁড়িয়ে। সকালের নরম রোদ ওদের চোখে-মুখে। লোকটা বলল, "এত বিশাল ও প্রকাণ্ড মাপের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা এখনকার শিল্পীদের পক্ষে সম্ভবই না রাষ্ট্রীয় সাহায্য ছাড়া।"
"দেখুন কী নিষ্ঠা ছিল ওদের! এক-দুই দশক নয়! কয়েকশো বছরের স্বেদবিন্দু ঝরিয়েছে।"
লোকটা তার পর গুহার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "প্রথম, দ্বিতীয়, ষোড়শ ও সপ্তদশ গুহায় আগে ঢুকব। আসলে এগুলোতেই অজন্তার শ্রেষ্ঠ চিত্রসম্ভার।"
সে সময় একটা সুন্দর পাখি মুখটা নিচু করে তারস্বরে ডেকে উঠল। ওদিকে তাকিয়ে, লোকটা বিড়বিড় করে বলেছিল, "জানেন, ওই পাখিটা এক সময় কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। আবার ফিরে এসেছে। মাঝে মাঝে পাখিটা ডাক দিয়ে যায়। কে জানে, কোনও শিল্পীর আত্মা হয়ে ফিরে আসে কি না!"
প্রথম গুহার চার নম্বর চিত্র অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি, ওরা সেই বুদ্ধের ছবির সামনে। এ-পাশ ও-পাশ ঘুরে-ফিরে দেখছে। তিন শিল্পীর অন্তরাত্মা দুলে দুলে উঠল। ধীমানের শিল্পীসত্তা কিছু ক্ষণের জন্য অজানা অনুভূতিতে ডুবেছিল। নবীন চৌধুরী সেই সময় বলল, "খেয়াল করুন, এই শিল্পকাজটির মধ্যে শুধু গৌতম বুদ্ধই নেই, আছেন সারা জগতের আনন্দবিন্দু। শিল্পী যেন বহু যুগের ধ্যানের পর তপস্যায় এই রূপটি উপলব্ধি করেছেন।"
সকলে কিছু সময় নিশ্চুপ রইল। ধীমানের আগে পিছনে সৌমেন ও নিবিড়। ইতিমধ্যে ঘণ্টাদুয়েক কেটে গেছে। চারপাশের নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে যাচ্ছে বাইরের লোকজনের কলরবে। লাইনে দাঁড়িয়ে লোকজন টিকিট কাটছে। সময়মতো ঢুকতে দেবে কর্তৃপক্ষ। নবীন গাইড এক বার সে দিকে উঁকি মেরে বলল, "আপনারা আর নীরবে কাজ করার সুবিধে পাবেন না। লোকজন ঢুকে যাবে এখুনি।"

নিবিড় সামান্য ঘাড় নেড়ে বলল, "শ্রদ্ধা ও প্রণাম। কী বিশালতা, গভীরতা এ শিল্পের! শুধু রেখায়-রঙে-তুলিতে আঁকা নয় রে ধীমু।"
সৌমেন বলল, "দ্যাখো তোমরা, আমার প্রতিটি রোমকূপ কেমন শিহরিত হচ্ছে। অবলোকিতেশ্বরের মূর্তির চিত্রকলার ব্যঞ্জনা ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না। কেবল উপলব্ধি করা যায়।"
"একদমই তাই! দাদা, এতটা সময় আছি। আপনাদের সঙ্গে বেশ বুঝেছি, আপনারা শিল্পের প্রকৃত বোদ্ধা। আমারও অসম্ভব ভাল লাগছে আপনাদের গাইড হয়ে।"
"জানেন দাদা, এই ছবিটার একটা দার্শনিক ভিউ আছে। শুনুন তা হলে।" নবীন শুরু করল, সেই অহিংসার পূজারি দেবতার গল্প। সৌমেন ও নিবিড় ওদের ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করল। গলায় জল ঢালল।
গল্পটা এই রকম, "একজন বোধিসত্ত্ব ছিলেন, গৌতম বুদ্ধের আংশিক অবতার। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, বিশ্বের যাবতীয় জীবের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগত নির্বাণ লাভে সচেষ্ট হবেন না। জগতের পাপী-তাপী নিয়েই এগোন। তাই ছবিতে দেখা যাচ্ছে সব পাওয়া ও সব হারানো। অর্থাৎ বোধিসত্ত্বের দ্বৈত সত্তা। রাজসিক ও সাত্ত্বিক। এই দুটোকে অপূর্ব দক্ষতায় মূর্ত করেছেন সেকালের শিল্পীরা।"
সৌমেন যোগ করল, "তাঁর উন্নত মস্তকে পরিয়েছেন মণিমাণিক্য-খচিত রাজমুকুট। গলায় মুক্তার শতনরী। সর্বাঙ্গে আভিজাত্যের অপূর্ব ছাপ।"
গাইড এর পরে যোগ করল, "তা সত্ত্বেও ওঁর চোখের আনত দৃষ্টিতে ত্যাগের মহিমা তিতিক্ষার বিগলিত ধারা।"
ধীমান ঘরের মধ্যেই রইল। গাইড বলল, "পিছনের অংশটা দেখুন, রাতের তারাখচিত আকাশ। ধ্যানস্তিমিত পর্বতমালার গাম্ভীর্য। সঙ্গে সাধারণ মানুষের হাসি-কান্নার চিত্র।"
নিবিড় জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা গাইড ভাই, পাশে যে কিন্নর-কিন্নরী, গান্ধর্ব, গাছপালা, পশুপাখি, লাফানো বানর এ সবের অর্থ কী?"
গাইডের মধ্যেও ভাবালুতা এসেছে। একটু চুপ করে থেকে বলল, "রবি ঠাকুরের সেই লাইন, যেখানে মানবদর্শন মালার মতো গাঁথা আছে,'অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ'।"
ওরা আনন্দঘন পরিবেশে বেশি ক্ষণ থাকতে পারল না। চার পাশে সাধারণ টুরিস্টদের ভিড় উপচে পড়ল। ক্ষুদ্র শিল্প তো নয়! প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব শিল্পের অনিন্দ্যসুন্দর চুম্বকীয় টান ওদের টানছে। ওই টানেই মূল গর্ভমন্দিরে বিশাল বুদ্ধমূর্তির সামনে উপস্থিত হন।
সারনাথ মৃগদারে বুদ্ধদেব বসেছেন পদ্মাসনে। ধর্মচক্র মুদ্রায় এই মূর্তির তিন দিকে তিন রকম ভাব ব্যঞ্জনা। এক দিকে হাস্যোজ্জ্বল মুখ। আর-এক পাশে বিষাদখিন্ন বুদ্ধ। সামনে আলো ধরলে তিনি ধ্যানে মগ্ন।
"এ সব ভাই জাতশিল্পীর কাজ," গাইড হাঁটু গেড়ে বসে প্রণামের ভঙ্গিতে বলল। ধীমানের ডান হাত কাঁপতে থাকে। ধীরে ওই মূর্তির দিকে এগিয়ে যায় ডান হাতখানা। সামনের সিকিউরিটির নির্দেশে হাত থেমে যায়। শেষেরও শেষ আছে। গাইড মনে করালেন, "এ বার ফেরা দরকার। সে ভাবে আর খুঁটিয়ে দেখা যাবে না।"
কিন্তু সৌমেনের মন টানছিল অনিন্দ্যসুন্দরী কৃষ্ণা রাজকুমারী, তার গায়ের রং কালো, কষ্টিপাথরের। ত্রিশটি গুহার যাবতীয় নারী মূর্তিগুলোকে সৌন্দর্যের নিরিখে পিছনে ফেলছে। কী যে সুন্দরী! সকলের তাক লেগে যায়। সুন্দর নাক, কমলার কোয়ার মতো ঠোঁট, পদ্মের পাপড়ির মতো চোখ। চোখ মাটির দিকে। কপালে টায়রা, ফুলের মালা দিয়ে বাঁধা খোঁপা। পাতলা আঁচলের ভিতর থেকে সলাজে উঁকি মারছে নারীত্বের দ্বৈত কোমল স্তূপ। কিন্তু বেচারি চিরবিরহিণী। হাজার হাজার বছর ধরে যেন শবরীর প্রতীক্ষায় দিন গুনছে।
কিছুটা গাইড বলে গেল। কিছুটা তিন শিল্পী ওদের সত্তা দিয়ে শুষে নিল। এক বার ধীমানের আক্ষেপ হল, শিল্পের কোন কুঠুরিতে বসে কাঠঠোকরার মতো ঠুকঠুক করছে। দিন তো অনেক পেরিয়ে গেছে। বড্ড আফসোস হচ্ছে। ওরা ক্লান্ত হয়ে বাইরে একটা গাছের নীচে বিশ্রাম করতে থাকে।

১৯

"শিল্পের রাজকীয় দরবারে আমরা ভিখারি," ধীমান আত্মগত হয়ে কথাটা বলল। চোখে বিন্দু বিন্দু অশ্রু। বিশুদা ওদের জন্য খাবার বানিয়েছে। তিনজনের সামনে এখন খাবারের ডিশ। খাবারে কেউই হাত দেয়নি। ধীমান ভিতরে ভিতরে উদ্বেল। তাতেই কথাগুলো ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল।
সৌমেন আশ্বস্ত করল, "ধীমুদা, এভাবে ভাবছ কেন? পাশে আছি তো আমরা।"
"আছিস ঠিক আছে, কিন্তু আমি তো জানি, জীবনীশক্তি কমে আসছে। আদৌ কিছু করতে পারব কি না জানি না।"
বিশুদা ধীমানের হাতে প্লেট তুলে দিল। বলল, "ধীমুদাদা, তোমাদের মতো শিল্প বুঝি না। কিন্তু তোমাদের চিন্তাভাবনা, দুশ্চিন্তা দেখে কিছু পুরনো গল্প উথাল-পাথাল করছে মনের ভিতরে। একখানা বলি। তোমার ঠাকুরদা সেকালে তো অসাধারণ শিল্পকর্ম করতেন। হয়েছে কী, সেকালের রামকৃষ্ণ পাল ব্রিটিশ আমলে স্টিমার ধরতে গিয়েছিলেন।"
"কোথাকার স্টিমার?"
"গোয়ালন্দপুরগামী স্টিমারে ওঠার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অনেকের সঙ্গে টিকিধারী এক বৈষ্ণবও দাঁড়িয়ে ছিলেন। রামকৃষ্ণ পাল হন্তদন্ত হয়ে ব্যাগ নিয়ে স্টিমারে উঠতে গেছেন, এমন সময় টিকিধারী তীব্র মেজাজ দেখিয়ে বলেছিলেন, 'আমি গোঁড়া বৈষ্ণব, আমার গায়ে চিংড়ি মাছের ব্যাগটা ছোঁয়ালেন কেন?'
"রামকৃষ্ণবাবু অবাক। হাতের ব্যাগ তুলে বলেছিলেন, 'মাছ কোথায়!' তা র পর এ-দিক ও-দিক চেয়ে নিজেই হো হো করে হেসে বলেছিলেন, 'ও হো! এটার কথা ভুলেই গেছিলাম!'
"বলেই নিজের ব্যাগের চারটি চিংড়ি মাছ বৈষ্ণবের নাকের ডগায় তুলে বলেছিলেন, 'ছুঁয়ে-ছেনে দেখেন একটু, আপনার জাত যাবে না।'
"ভয়ে ভয়ে টিকিধারী বৈষ্ণব চিংড়ি মাছ

ছুঁয়ে মুচকি হেসেছিলেন। মাটির তৈরি চিংড়ি এত জীবন্ত হয়!"
বিশুদা গল্প শেষ করে অভিভাবকের মতো বলল, "তোমরা পুতুলপট্টির রাজা-মহারাজা।"
সৌমেন হাজারও চিন্তার মধ্যেও ফিক করে হাসল, "রাজা-মহারাজা?"
"কেন নও বলো দেখি? তোমাদের কেউ কেউ কুমোর বা পুতুল-নির্মাতা বললে তোমাদের মনে লাগে, সেটা বুঝি।"
নিবিড় খাওয়া শেষ করে জিজ্ঞেস করল, "বিশুদা, তোমার রান্নাটা সমুদ্রের পারের স্টলগুলোর চেয়েও টেস্টি হয়েছে। তোমার জন্য রেখেছ তো?"
"না গো, আমি এ সব খাই না।"
"এটা ঠিক না বিশুদা। কিছু একটা করে খেয়ে নে," ধীমান বিরক্ত।
ধীমান তার পরে বলল, "বিশুদা, তুই কী যেন বলছিলি, বল না আর-এক বার।"
"রাজার মতোই তোমরা পুতুলপট্টির মধ্যে সে রকম শিল্প গড়ে তোলো, যা ওই গুহার ছবির মতোই লোকে দেখবে।"
সৌমেন হো হো করে উঠল, "বলেছ কিন্তু দারুণ!"
নিবিড় বলল, "সে তো করতেই পারি। কিন্তু মাটির পুতুল বড়জোর দশ-বারো বছর টেকে। কিন্তু গুহার দেওয়ালের ওই সব মুরাল হাজার বছর টিকে থাকে।"
আজ বিশুদা যেন তিন শিল্পীর চিন্তাভাবনার শরিক। ও কী যেন ভেবে বলল, "ধীমুদাদা, তোমরা কুমোরদের জীবনের দুর্দশার কথা ছোট্ট পুতুলের মাধ্যমে তুলে ধরো।"
ধীমান স্তব্ধ। যে ঘরে ওরা আছে, সেটা মালভূমির ধারে। সামনে পাহাড়ের ধাপ। চার পাশে কিছু বুনো গাছ। গাছে গাছে অনেক রঙিন পাখি। খুব সুন্দর পাখিগুলো। চোখ সরাতে ইচ্ছা করে না।
ধীমান ও সবের দিকে চেয়ে আনমনা। বলল, "ভেবেছি, সকলে মিলে যদি শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন ও লীলা কাহিনি গড়ে তুলি, কেমন?"
ধীমান হঠাৎ উঠে পাঞ্জাবিটা গায়ে গলিয়ে নিয়ে এক গ্লাস জল ঢকঢক করে খেয়ে বলল, "চলো, সকলে মিলে এখানকার শপিংমলে ঘুরে আসি।"
সৌমেনও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, "চলো ধীমুদা, তোমার বৌমা আসার আগে কটন প্রিন্টের শাড়ির কথা বলেছিল। এখানকার শাড়ি খুব সুন্দর আর সস্তা।"
বিশুদাও উৎসাহী, "ধীমুদাদা, বৌদি ও বৌমাদের জন্য কিছু কিনবে তো?"
ধীমান ঝকঝকে হেসে বলল, "হ্যাঁ অবশ্যই কিনব। তোমার নাতি ও বৌমার জন্যও কিনব। চলো বেরোই।"
নিবিড়ও ভাবে, 'তপতীরও এবার পুজোতে কিছু হয়নি। ছেলেটার জন্য বেশ খরচ হয়ে গেছে।'
মুখে বলল, "হ্যাঁ চলো। মার্কেটে ঘুরতে বেশ ভালই লাগবে।"
ধীমান আসলে একটা জটলার আবর্তে পাক খাচ্ছে। আপাতত কিছুটা সময় ও সব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চায়। সৌমেন ওদের চেয়ে ছোট বলে তেমন কিছু উচ্চবাচ্য করল না। বিশুদা গম্ভীর স্বরে বলল, "নিবিড়দাদা, তুমি আর বিদেশ যেয়ো না। বিদেশটা খুব খারাপ। তপু-মা বড্ড ভাল মেয়ে গো। ওরে দেখো।"
বিশাল শপিং কমপ্লেক্স। ধীমান নাতির জন্য দুটো জামা ও খেলার কিউব কিনল। বাকিরা পছন্দমতো কিছু না-কিছু কিনছে। ধীমান ডিসপ্লে করা লাল অরগ্যান্ডি শাড়িটায় দু'বার হাত বোলাল আরতির কথা ভেবে। ষাট ছুঁই ছুঁই আরতি এখন। সেই আরতি ছিল তন্বী, ঢলঢলে, পূর্ণ যুবতী! অল্পশিক্ষিত। ওর বাবা কুমোর ছিল। মাটির ডাকে সাড়া দিত। সেই বিয়ের মঞ্চে আলোর ঝাড়ের নীচে নববধূকে দেখেছিল। একান্তে পেয়ে নববধূকে বলেছিল, "আরতি, আমি কিন্তু মৃৎশিল্পী।"
লিপস্টিক-মাখানো ঠোঁট ফাঁক করে কথা খসিয়েছিল আরতি, "আমার বাবাও তো পুতুল ও মূর্তি গড়েন।"
"তুমি এ সব কাজ করা পছন্দ করো?"
নতুন বৌ একটু দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেল। কী বলবে! বা বলা উচিত! তবুও আনকোরা নতুন স্বামীর কাছে পুট পুট করে বলেছিল, "বাবার গড়া প্রতিমাগুলো পুজোর আগে তো আমিই রং করতাম।"
"সে তো দায় ঠেকে।"
"আজ্ঞে না মশাই! বাবার কাছে মা ছিলেন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বাবা বলতেন, 'চক্ষুদান করা হলেই ওই মূর্তি দেবী হয়ে ওঠেন।' আর আমার কাছে মায়ের চোখদুটো কী যে লাগত! উনি তখন আর মাটির মূর্তি নন। স্বর্গের দেবী," একথা বলেই আরতি নিজের আয়ত চোখদুটো তুলে ধীমানের দিকে চেয়েছিল। সেই মোহময় সময়ে মেরুন-হলুদ বেনারসীতে আরতিকে দেবীর মতোই লাগছিল ধীমানের। ওর বুকের ভিতরটা ধুকপুক ধুকপুক করছিল। আরতি নামের এই দেবীকে নিজের প্রাণের দেবী করে কীভাবে পাবে! ওর চম্পাকলির মতো আঙুলে আংটি পরিয়েছিল।
বিশু হঠাৎ কানের কাছে এসে বলল, "ধীমুদাদা, বৌমা আর নাতির জন্য কিছু নিতে চাইলে ওই দিকে চলো।"
যৌবনের ফিনফিনে ঘোরটা চকিতে হাওয়া। সুখস্বপ্নের মুহূর্তগুলো এখনও ভিতরে টলটল করছিল।
ধীমান বলল, "হ্যাঁ চল বিশুদা।"
ওরা দু'পা এগিয়ে দেখল, নিবিড় ও সৌমেন ওদের ঘরের মেয়েদের জন্য দু'-চারখানা করে শাড়ি ও ড্রেস মেটিরিয়াল কিনছে।
ধীমান লঘু ভাবে বলল, "নিবু, দারুণ হয়েছে, তপু বেশ খুশিই হবে।"
মনে হল ও লজ্জা পেল। চারজন মলের দোকান থেকে হাবিজাবি, টুকরো-টাকরা জিনিস কিনতে থাকে। আর হাসে। বহু দিন এমন অকারণে ঘোরেনি, হাসেনি বা শপিংও করেনি। ও সবের জন্য সময় দিতে হয়। সেটা ওরা পেত না।
সিঁড়ি বেয়ে উপরের ধাপে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় ধীমান, বলল, "নিবু দ্যাখ, কাচের মধ্যে শাহরুখ, সচিন, বচ্চনের আবক্ষ মূর্তি। সবই মোমের।"
সৌমেন বলল, "আমি আগেই দেখেছি তো! তুমি খেয়াল করোনি?"
"না-আ! কী সুন্দর! না রে!"
"হুম! তা ঠিক! কিন্তু তোমার হঠাৎ কী হল?" সৌমেনও অবাক।
ধীমান যেন একটু উজ্জীবিত, "নিবু রে, মনে হচ্ছে যেন এটাই চাইছিলাম।"
"কী রে ধীমু?"
"আমাদের পট্টিতে একটা মিউজ়িয়াম থাকবে। সেখানে চৈতন্যদেবের লীলা-

বিষয়ক পুতুল রাখব। কেমন হবে ব্যাপারটা?"
বিশুদা নেচে উঠল, "ধীমুদাদা, খুব ভাল হবে। দূর থেকে লোকেরা দেখতে আসবে।"
"তবে বহু বছর টিকে থাকুক এমনটা চাই।"
নিবু ও সৌমেন হাতের প্যাকেটগুলো গোছাতে গোছাতে বলল, "সেটাই তো কাম্য, নইলে লার্জ স্কেলের কাজ হবে না।"
ধীমান শপিং মলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে পা দিয়ে বলল, "সে ক্ষেত্রে আমি বলি কী, মাটি নয়, পাথরটাই ঠিকঠাক। সাদা পাথরের কাজ হবে।"
"হিউজ ফান্ড লাগবে। সরকারি সাহায্য না হলে হবে না। চল, ফিরে গিয়ে সরকারি সাহায্যের জন্য আবেদন করি।"
ধীমানের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, "এবার আমাদের চূড়ান্ত কিছু করার সময় এসেছে।"
এ সময় ধীমানের ফোনের রিংটোন বেজে উঠল। ধীমানের ভুরু কুঁচকে উঠল। জিতুদার ফোন।
সে বলল, "সমু, প্যাকেটগুলো ধর।"
বিশুদা সকলের আগে হাত বাড়িয়ে নিল প্যাকেট।
"জিতুদা! কী ব্যাপার?"
জিতেনদার কথাগুলো স্পিকারে শোনা যাচ্ছে। বলল, "এখানে একটা দারুণ ব্যাপার ঘটতে চলেছে।"
"কী জিতুদা?"
"সুবোধের ছেলের বিয়ে।"
"হতেই পারে। তাতে কী হল?"
"ওর ছেলে তো বিলেতি বৌ আনছে।"
"তাই নাকি? ভাল তো!"
"আয় আয়, তোরাও নেমন্তন্ন পাবি," বলেই মজার হাসি হাসল।
"তুমি যেন আহ্লাদে আটখানা!"
"তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে! আমার আবার আহ্লাদ। তোরা ফিরে আয়, একসঙ্গে নেমন্তন্ন খেতে যাব," বলেই ফোন কেটে দিল।

২০

"যা-ও বা এদেশে এলি টুকাই, তোকে তো দেখাই যায় না," তরুণ বলল।
টুকাই উত্তর দিল, "বেরোতেই পারছি না। অসম্ভব কাজের চাপ ছিল রে!"
তার পরেই নিজের মোবাইলটা ওর হাতে দিয়ে বলল, "দ্যাখ তো, গড়বড় করছে। মনে হচ্ছে ফরম্যাট করতে হবে।"
তরুণ এক কাপ চা ধরিয়ে বলল, "চা খেতে থাক। এক্ষুনি কাজ হয়ে যাবে। তা এসে কতগুলো অর্ডার পেলি?"
টুকাই একটু থেমে থেমে বলল, "এখন তো শিল্পীরা এন্টারপ্রাইজ়ের অন্তর্ভুক্ত। আমি বাবার ক'টা কাজ তুলে দিলাম আর কী! নিয়ে এলাম ফাইন আর্টসের ডিগ্রি। ফিরেই হাত দিলাম মায়ের মূর্তিতে। তার পরে আমাকে বেশি লোড নিতে হল।"
তরুণ হাসল, "সে তো হবেই। তোর রক্তে আর্টের সব রকম ক্ষমতা ও দক্ষতা আছে।"
টুকাই তরুণের সঙ্গে কথা বলছে, কিন্তু ওর চোখ তরুণের শো-কেসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওখানে রাখা পুতুলগুলো খুব ছোট। পুঁচকেই বলা চলে। খুব সূক্ষ্ম ও সুন্দর। চোখ টানবেই।
টুকাই জিজ্ঞেস করেই বসল, "এ সব কোথা থেকে জোগাড় করলি? আমার কিন্তু খুব চেনা লাগছে।"
তরুণ কাজ করতে করতে বলল, "গ্রামের ভিতর থেকে একজন দিয়ে যায়। সাজিয়ে রাখি। খুব সুন্দর না?"
"সত্যিই ইউনিক!" টুকাইয়ের মনের মধ্যে সমান্তরালভাবে দুটো ভাবনা পথ কেটে এগোচ্ছে। এই কাজগুলো ছোটবেলায় দেখেছিল। মাঝের ক'টা বছর অন্য ফর্মে আর্ট কালচার করায় এ সব একদম আউট অফ সাইট হয়ে পড়েছিল। ওর বাবা ওকে পুতুল তৈরির কাজের বাইরে রেখেছিলেন। ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে বিভিএ করে স্কলারশিপ নিয়ে ফ্রান্সে গিয়েছিল। ইউরোপীয় তেল রঙের কোর্স শেষ করে ফিরে এসেছে। সঙ্গে অবশ্য ভাস্কর্যের একটা সার্টিফিকেট কোর্সও শেষ করেছিল।
তরুণের কথায় একটু শ্লেষ ছিল, "টুকাই, সেই মাটির পুতুলের কাজই করছিস। তা হলে ইউরোপের ডিগ্রিটা বেফালতু হয়ে গেল না?"
সবে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছে। একটু খুক খুক করে কাশি এল টুকাইয়ের। সামলে নিয়ে বলল, "ওখানে তো গেলাম বাবার কথায়।"
এরই মধ্যে কর্মচারীটির কাজ শেষ হল। টুকাই দাম মিটিয়ে উঠে পড়ল। তরুণ বলল, "শোন টুকাই! আমি পশ এরিয়াতে একটা ফ্ল্যাট কিনেছি। তুই ইন্টিরিয়ার ডেকরেশন করে দিবি? ওই যে ঘরে কত রকমের আর্ট করে না আজকাল!"
মুচকি হেসে টুকাই বলল, "ও সব ইন্টিরিয়ার ডেকরেশনের কাজ তো আমি করি না।"
টুকাইয়ের হাসিতে বোধ হয় সামান্য ব্যঙ্গ ছিল। তরুণের আগ্রহটা দপ করে নিভে গেল। টুকাই লাফিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে ভাবল, জিতুজ্যাঠার বাড়িতে একবার গেলে কেমন হয়! সেদিন বাবা ওর কথা বলছিলেন। কী একটা সমস্যা নিয়ে নাজেহাল হচ্ছে। ওর বাড়ির সামনে ঢুকতেই জিতেন পালের এক কর্মচারী ওকে ডাক দিল, "কাকা, আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য একজন এসেছেন।"
জিতেনবাবুর বেশ কিছুটা সময় লাগল টুকাইকে চিনতে। টুকাই বলল, "আমি টুকাই গো টুকাই। তোমাদের সুবোধের ছেলে।"
"আরে! সুবোধের ব্যাটা টুকাই!" টুকাই হাসিমুখে ঘাড় নাড়ে, "বাবা তোমার কাছে পাঠাল জেঠু।"
"তুই ইউরোপ থেকে ফাইন আর্টের ডিগ্রি নিয়ে এলি না!"
লাজুক মুখে টুকাই একটা বেঞ্চে বসল।
"সঙ্গে আরও একটা জিনিস এনেছিস শুনলাম," বলেই মিটিমিটি হাসল জিতেন। টুকাইয়ের সারা মুখে নবারুণের রাগ যেন ছড়িয়ে পড়ল।
"লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই রে! আমরা হলাম গিয়ে বুড়ো কুমোর। তোর বাবার কাছে ওই একটু-আধটু শুনলাম। আর কী!"
"জেঠু, আমার একটা প্রশ্ন আছে। আমায় প্রশ্নটা উথালপাথাল করছে অনেক দিন ধরে।"

“কী রে টুকাই?” জিতেনের হাতে এখনও কাদামাটি রং মাখা।
“মাটির মূর্তি দেব-দেবী কখন হয়ে ওঠে?”
“যখন আমরা চক্ষু দান করি, তখনই।”
টুকাই চুপচাপ জেঠুর দিকে তাকিয়ে শুনতে থাকল।
ওকে চুপ দেখে জিতেন পাল বলল, “দেবতা বা দেবী হলেন তাঁরাই, যাঁরা আমাদের অন্তর্দৃষ্টি বা অন্তরের চোখ খুলে দেন।”
টুকাইয়ের মনে পড়ল ছোটবেলায় ও যখন ছবি আঁকত, তখন মিঠিমাসিও এই ধরনের কথা বলত। ও বলল, “জানো জেঠু, মিঠিমাসি বলত, ‘টুকাই, যে কোনও মূর্তির চোখ দুটো যেন অসাধারণ কিছু হয়, যাকে বলে অবাঙ্‌মানসগোচর হয়।’”
জিতেনের হাতদুটো থেমে গেল। নীরবতা ভেঙে বলল, “ঠিকই তো। এত বড় কথা মিঠি বলেছিল?”
“হ্যাঁ জেঠু।”
“হ্যাঁ রে টুকাই, শিল্পের মধ্যে অনেক দর্শনও আছে,” তার পরে হাত ধুয়ে এসে টুকাইয়ের পাশে বসল, বলল, “কী রে, সুবোধ কী বলতে তোকে পাঠিয়েছে, বললি না তো?”
এ বারে টুকাই আর মুখ খোলে না। ওর সারা মুখ লজ্জায় কুণ্ঠিত।
“ও মা, তুই তো মেয়েদের মতো করলি! তাহলে তোর বাপ কি বিয়ে দিচ্ছে?”
টুকাই ঘাড় নাড়ে, “ওই ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে কথা বলবে বাবা।”
“অ্যাঁ! তা বেশ! পাত্রী কোথাকার?”
“ইটালির। আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত।”
টুকাই ছেলেমানুষের মতো হেসে ফেলল, “জেঠু এখন যাই?” বলেই উঠে দাঁড়াল টুকাই।



সঞ্চিতা শোকেসের পুতুলগুলোকে দ্যাখে। প্রতিটি পুতুলের চোখে-মুখে পৃথক অভিব্যক্তি! বিয়ের পর ভেবেছিল, ঘরের কাজের পরে অনলাইনে এ সব বেচবে।

“যাবি তো বটেই! নাম কী বৌয়ের?”
“নোরা।”
জিতেন মুখটা বিকৃত করে বলল, “অ্যাঁ! নোড়া! শীল-নোড়া?”
হা-হা করে হেসে টুকাই উঠে পড়ল, “না গো জেঠু, ওদের ভাষায় ‘নোরা’-র একটা সুন্দর অর্থ আছে। চলি জেঠু।”
তড়িঘড়ি টুকাই পালাল। একটু হেঁটে মিঠিমাসির বাড়িতে গেল।
“আয় টুকাই,” মিঠি টুকাইকে একটা বেতের চেয়ার পেতে দিল। কিন্তু ওর দিকে না তাকিয়ে পুতুলগুলোকে আরও সূক্ষ্মতা ও বৈচিত্র দিতে ব্যস্ত থাকল।
টুকাই এদিক-ওদিকে নজর চালাল। দেখল মিঠিমাসির বাড়ির চারপাশের কী করুণ অবস্থা।
ওর মনের কথাটা কেড়ে নিল মিঠি। বলল, “নে, দেখে নে কী অবস্থায় আছি। আর এসেছিস তো অনেক দিন। অথচ পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস।”
“ও মা! পালাব কেন মাসি!”
“কেউ না বুঝুক, আমি তো বুঝি। হ্যাঁ রে, দিদি কেমন আছে?”
টুকাই চমকে উঠল এ কথায়। বলল, “মা? ওই একই রকম। আসার সময় একটু বকা দিল।”
টুকাইয়ের মনে পড়ল পুরনো একটা কথা, ‘মাসি কেমন আছে’— এই প্রশ্নটা মাকে করায় রেগে উঠে বলেছিল, ‘ভালই থাকার কথা! তোর বাপ ওকে জমি-বাড়ি দিয়েছে। ও ভাল থাকবে না তো আমি ভাল থাকব?’
মিঠির বারান্দায় একটা টিমটিমে আলো। তার গায়ে অসংখ্য শ্যামাপোকা। চারপাশে হলুদ আর কচুর বন। বর্ষার রেশ এখনও আছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এসে বসছে। টুকাই চটাস চটাস করে একটা-দুটো মারল।
মিঠি গোলগাল সাদামাটা মুখটা ঘুরিয়ে বলল, “অ্যাই টুকাই, ম্যালেরিয়ার ভয় লাগছে?”
টুকাই জিজ্ঞেস করল, “তুমি কেমন আছ?”
“ফাইন! সুপার ফাইন! বল, বিদেশে কেমন শিখলি? কী আনলি বিলেত থেকে?”
টুকাইয়ের ভিতরে একটা অপরাধবোধ কুরে কুরে খাচ্ছিল। ওদেশ থেকে ফেরার সময় ঘরের পোষা কুকুরটার জন্যও গিফ্‌ট এনেছে কিন্তু মিঠিমাসির জন্য কিছুই আনেনি। ওর মুখ দেখে মিঠি বলল, “তোর কাছে কিছু চাইনি রে, এসেছিস যে এই যথেষ্ট।”
টুকাই কথাটা গায়ে মাখল না। দেখল, সন্ধের মুখে হাঁস-মুরগির দল কলরব করতে করতে বাক্সের ভিতরে ঢুকছে। মিঠি টুকাইয়ের চোখ দেখে মন্তব্য করল, “তবুও তো ওরা জীবন্ত প্রাণী, আমার সঙ্গী।”
টুকাই মোবাইল খুলে ওদের কলেজের গ্রুপের কিছু ছবি দেখাল। গ্রুপ ছবিতে নোরাকেও দেখাল। মিঠি বারবার নোরাকে দেখল।
টুকাই বলল, “তোমার কথা বলেছি ওকে। তোমাকে দেখবে, প্রণাম করবে। তোমার কাছে মূর্তি তৈরি শিখবে। এই তো ক’দিনের মধ্যেই আসবে এখানে।”
বড় বড় চোখ মেলে মিঠি তাকিয়ে আছে।
“জানো মিঠিমাসি, নোরার ধারণা তুমি দেবীর মতো।”
মিঠির হাতের তুলি কেঁপে নীচে পড়ে গেল। বিড়বিড় করে বলল, “আমি দেবী? ইটালির মেয়েটা বলে! হায় রে! আর নিজের দিদিই আমাকে কত কী-ই না বলে।”
টুকাই বোঝে ওর ব্যথার জায়গাটা। মায়ের খুড়তুতো বোন। এক সময় সুন্দরী ছিল। বাবা-মা এক দিনে বজ্রাঘাতে মারা যায়। ওর মায়ের কাছে আসে, থাকে। বাবার মূর্তি তৈরিতে সাহায্য করে। বিক্রি-বাটা বাড়ে। বাবা সবটা গড়ে ওকে চোখ আঁকতে বলত। মিঠিমাসির হাত খুব দক্ষ ছিল। শ্যালিকাকে আহ্লাদ করত। ওর মা ব্যাপারটাকে প্রথমে সন্দেহের চোখে দেখে নোংরা ভাবত। মিঠির জন্য পাত্র ঠিক হল। বিয়ে কেমন

করে যেন ভেঙেও গেল। ওর বাবা সুবোধ পাল ওকে দু'কাঠা জমিতে টিনের ঘর বানিয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে একার লড়াই শুরু মিঠির।

টুকাই বলল, "তুমি আজ আর মায়ের কথা মনে রেখো না। অসুস্থতা থেকে সন্দেহবাতিক হয়েছে।"

মুখে টুকাই এ কথা বলল বটে, ওর দাদা বা নিজে কখনওই মায়ের বিশ্রী ব্যবহারের বিরুদ্ধে কিছু বলেনি বা বলার সাহসও পায়নি।

নোরাকে এ সব গল্প করায় সে-ই ওকে চোখে আঙুল দিয়ে দুই ভাইয়ের ভীরুতা, অমানবিকতাকে দেখিয়েছে। সেই নোরা ফোনে মিঠিমাসির সঙ্গে দেখা করতে নির্দেশ দিয়েছে।

কিন্তু টুকাই মুখে বলল, "তুমি দেব-দেবী তৈরি করো। তাই তুমি নিজের মনের পবিত্রতা বজায় রেখেছ।"

"তাতে কার কী এল গেল?"

টুকাই উত্তরে ঠিক কী বলবে, ভেবেই পেল না। এ সব নিয়ে আসলে আগে তেমন কিছুই ভাবেনি, শুধু নোরার কথায় এসেছে।

মিঠিমাসি ওকে জিজ্ঞেস করল, "চা খাবি?"

হ্যাঁ বা না কিছু বলার আগেই মিঠিমাসি পুরনো বাটিতে চা বসিয়ে দিয়েছে। টুকাই দেখছে মাসি গনগনে আগুনের আঁচে চা করছে।

এই প্রথম টুকাই উপলব্ধি করল মাসি যেন সত্যিই সব হারানো এক দেবী। টুকাই মিঠিকে বলল, "জানো, নোরা বলে, 'যে মূর্তির চক্ষুদান করে সে তো কম কেউ নন, সে-ও দেবতা বা দেবী'।"

টুকাইয়ের হাতে চায়ের কাপ ধরিয়ে দিয়ে মিঠি বলল, "এক দিন মেয়েটাকে নিয়ে আসিস।"

২১

"পুতুলপট্টিতে ইটালির কনে এই প্রথম, না-রে?" ধীমান সৌমেনকে রসিয়ে রসিয়ে জিজ্ঞেস করল।

উত্তরটা সকলেরই জানা। তবু প্রশ্ন উঠল। উত্তরটাও দিল সৌমেন একই রকমভাবে।

এখন ওরা সকলে খুব উচ্ছ্বসিত। সৌমেনের বাড়ির সামনের বারান্দায় এখন সকলে। বিকেল বিকেল একটু গুলতানি চলছে। পুতুলপট্টির প্রায় সব মৃৎশিল্পীরই নেমন্তন্ন। কৌতুকে ঝলমল করছে শিল্পীদের মন। জিতেন পাল, উপস্থিত সকলের মধ্যে বয়স্ক। ধীরে ধীরে বলল, "হ্যাঁ রে ধীমু, আমি না হয় ন্যালা-খ্যাপা! বৌ ছাড়া অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে তেমন সুখ-দুঃখের কথাও বলিনি।"

ওর কথার মধ্যে ঢুকে পড়ে সৌমেন বলল, "ঠিক ঠিক, তুমি শুধু মেয়েমানুষ গড়েছ।"

"এই ছেলে তুই থামবি! আমায় শেষ করতে দে!" বলেই মুচকি হেসে ফেলল, "বাপ-মা বলেছিল, 'জিতু, ওই লালু পালের মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে ঠিক করেছি।'"

কে যেন জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী করলে জিতুদা?"

"আমি? আমি মেয়েও দেখি নাই। তার রূপ-রংও দেখি নাই।"

গুলতানিতে বসেছে সৌমেন, অনুকূল, বিশ্বনাথ, ধীমান। ওরা জিতেনদার মতো কাজপাগল শিল্পীর রঙ্গরসের কথা বেশ উপভোগ করছে। জিতেন গল্প বলছে, বাকিরা পুলকিত। মিষ্টি মিষ্টি হাসছে। জিতেন একটু একটু করে লিক করল, "হ্যাঁ রে, টুকাইও বিদেশে পড়তে গিয়েছিল, ধীমুও গিয়েছিল। ধীমু শুধু ডিগ্রি নিয়ে ফিরেছিল, টুকাই তো ডিগ্রির সঙ্গে দিব্যি ফুটফুটে সুন্দরী ইটালির বৌ নিয়ে ফিরেছে!"

"বৌ তো নিয়ে আসেনি। বিয়ে তো এখানেই হল। বৌভাত হচ্ছে আজই।"

"ওই হল! সব কথা ধরবি না তো অনুকূল।"

অনুকূল কাঁচা-পাকা গোঁফের ফাঁকে হাসল, "তখনও তো ধীমু তোদের সঙ্গে ইটালির মেয়েরা আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্ট পড়ত। তোর তো বয়সকালে চেহারাখানা দারুণ ছিল!"

"এখনও বা কম কী জিতুদা?" সৌমেন ফুট কাটে।

"এখন থাকা আর না থাকা সমান। আমি বলি কী, কেউ কি তোর প্রেমে পড়েনি? বিশেষ করে ইটালির সুন্দরী মেয়েরা!"

সকলের চোখ ধীমানের দিকে। ওর মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি। চুল পাতলা হয়ে এসেছে। চকচকে টাক উঁকি মারছে। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। কথাটা শুনে এই বয়সেও ধীমান লাল হয়ে উঠল। সেটাকে ঢেকেঢুকে হাসতে হাসতে বলল, "জিতুদা, এ সব কী হচ্ছে! এখানে হাঁটুর বয়সিরা রয়েছে। শুরু করলে কী!"

ধীমান জ্বলন্ত সিগারেটটা সামনের আগাছার মধ্যে ছুড়ে দিল। ধীরে ধীরে বলল, "তোমার আজ হল কী?"

"তেমন কিছুই হয়নি। একটু রঙ্গ-তামাশা না হয় করলাম!"

"তা করো, যত খুশি! সামনের বদমাশগুলোর চোখ-মুখ দেখেছ? কেমন মুখিয়ে আছে! বুড়ো বয়সে এ সব প্রশ্ন করে একেবারে বেইজ্জতি করে ফেললে।"

ওরা হইহই করে উঠল, "ও সব কোনও ব্যাপারই না। আমরা শুনব। এখানে ধৃতি বা বিশুকাকা কেউই নেই। ওই আর্ট কলেজের গল্প বলো না!"

ধীমান গম্ভীর, "অনেকেরই ধারণা 'হম দিল দে চুকে সনম'-এর মতোই সব প্রেম-টেম হয়। মানে ওই দেশের বাইরে পড়তে গেলেই। তার পরে ওই যা হয়, দজ্জাল কিংবা জ্ঞানী বাপের কাছে ঘাড়ধাক্কা খেয়ে দেশে ফিরতে হয়। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ও সব হয়ইনি।"

জিতেনের হাসি বেরোয় ফোকলা দাঁতে, "আরে! আমি বলি কী, তোরটা তোর মতো, বাকিদেরটা ওদের মতো। তুই বাপ আজকে ঝেড়ে কাশ!"

ধীমানের মুখে অসহায়তার ছাপ, "আমাদের ভাস্কর্যের ব্যাচে মেয়ে ছিল দু'টি। ওরা আমাদের ইগনোর করত। প্রিন্টিং সেকশনের ছিল ইলিনা। ও ব্যতিক্রমী। আমাদের ডিপার্টমেন্টে আসত। ছবি আঁকত। আসলে ডিপার্টমেন্টের সামনে ছিল বিখ্যাত কিছু ভাস্কর্য। সে সব কপি করত। আঁকার হাতটি ছিল ঈশ্বরপ্রদত্ত। এক দিনের কথা মনে আছে, অফ-ডে ছিল। দেখছিলাম ওর ছবি আঁকা। শেষ হল। জানতে চেয়েছিল, আমার চোখে ছবিটার ভ্যালু কতটা!

"আমি তো বেখেয়ালি। ও ছিল কনসার্নড। থতমত। তবু গ্রেট ছিল। ধীরে ধীরে ওর ছবির গুণমুগ্ধ হয়ে উঠেছিলাম। আমরা ক'জন চললাম সি-ভয়েজে। স্প্লেনডিড! এক্সেলেন্ট! আমি সমুদ্র-সৌন্দর্যে ছিলাম বুঁদ! বন্ধুরা মেতেছিল, হইচই-ড্রিঙ্কে। কয়েক মিনিট ধরে একটা ভাস্কর্য ভাবাচ্ছিল। হকচকিয়ে তাকাই পাশে। আরে! ইলিনা যে! মুখে ওর মিটিমিটি হাসি।"

সৌমেন বিস্মিত, "ধীমুদা, নামটা কিন্তু সুন্দর।"

"হুম! ওর নাম ছিল ইলিনা মানুচ্চি। পিঠ অবধি সোনালি জেল্লাদার চুল। মুখটা ডিম্বাকৃতি। হাইট পাঁচ ফুট ছয়। নীল সমুদ্রের মতো চোখ। আর ঠোঁটের রঙ বেদানার মতো।"

ধীমান পাল আজ প্রগলভ! ওর মুখে মিটিমিটি হাসি, "তোরা বললে বিশ্বাস করবি না।"

"সকলেই বিশ্বাস করছি, মেয়েটার ঠোঁট জোড়া ছিল বেদানার মতো লাল।"

ওদের কৌতুকে এ বার ধীমান গম্ভীর। তার পর বলে, "কালিদাসের মেঘদূতম-এর বর্ণনা পড়েছিস? নায়িকার বর্ণনা যেমন ছিল, ইলিনা অনেকটাই সে রকম। তার চেয়েও অপূর্ব। রোমান প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী ভেনাস যেন!

"তো সি-ভয়েজে ইলিনার মুখে হাসি! হাতে আর্ট পেপার। দেখি কী, আমার ছবি! ইলিনার হাতে আমি এক অদ্ভুত ভারতীয় যুবক। ও রকম অদ্ভুত চিত্রকল্প... উঁহু! আগে কেউ-ই ও রকম আঁকেনি।"

অনুকূল এবার অধৈর্য। হেসে বলল, "তার পর?"

"ইলিনার কথা হল, ছবিতে আমাকে হুবহু আঁকেনি। কিছু নিওরিয়্যালিজ়ম, কিছুটা সারিয়্যালিজমের মিশেল ছিল। এই শব্দগুলো সেই প্রথম শোনা। সেই সি-ভয়েজ, মাথার উপরে কোবাল্ট-ব্লু স্কাই, সামনে ফেনিল সমুদ্র! এত আনন্দ, এত আনন্দ যে দিশেহারা হয়েছিলাম। সমবয়সি বন্ধুদের ঢেউয়ের মতো উচ্ছ্বাস। সে এক স্মরণীয় দিন!" এই পর্যন্ত বলে ধীমান চুপ রইল। বাকিদের কাছে চমৎকার খোরাক। ধীমান স্মৃতির অতলে। সন্তর্পণে খুঁজছে ইলিনাকে। এ-পাশ ও-পাশ।

ওদের উপচানো হাসিতে ধীমান ব্যথাতুর, "তোমরা যা ভাবছ তা নয় গো। সব সম্পর্কের মধ্যেই প্রেমজ রস থাকে না। অমলিন বন্ধুত্বও থাকে।"

"সেভাবে নিচ্ছিস কেন ধীমু! আমরা সবটাই জানতে চাই। তাড়াতাড়ি বল। বেশভূষা পরে গিফ্‌ট নিয়ে আসতে হবে তো!"

ধীমানের মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে ইটালির মিলান শহরের আশপাশে। চাষবাস, ব্যবসাপত্তর, আঙুর চাষ। সন্ধে হলেই গান-বাজনা, পানাহার।

সৌমেনও বেশ রসিক। ও ধীমানের পিঠে হাত রাখে, "ধীমুদা কী এত ভাবছ!"

ধীমানের চমক ভাঙে, "হ্যাঁ, ইলিনা একদিন ওর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল।"

"তুমি কোথায় থাকতে?"

"কিছু দিন মেসে। পরে হোস্টেলে। এক দিন ধর্মঘটের জন্য স্যররা ক্লাস বন্ধ করতে বাধ্য হলেন। ইলিনা ওর আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে এক ছুটে আমাদের ডিপার্টমেন্টে। জানিস, সে দিনটা পোস্টকার্ডের ছবির মতো মনে আছে।

"সে ঠিক ত্রস্ত হরিণী। আমাদের কাছে এল, আমাদের টানতে টানতে নিয়ে গেল ওর পাড়ায়। ওদের পাড়া! কী বলব! আমার বর্ণনার ভাষা নেই রে! ও রকম সুন্দর শহর স্বপ্নেও আসে না। দু'পাশে আঙুরের খেত। মাঝে রাস্তা। খেতের মাঝে মাঝে একটা-দুটো কটেজ। ওর বাড়িতে আমরা! ওর মা ব্যস্ত ছিলেন আঙুর দিয়ে মদ বানাতে। আর বাবা! দূরের খেত থেকে বয়ে আনছিলেন লাল-সবুজ আঙুর। ওগুলোর স্থান ছিল খড়ের বিছানায়। জানো জিতুদা, কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখব! ওর মায়ের মদ বানানো, না ইলিনার ছটফট করে সবাইকে আপ্যায়ন।

"ওর মা ইলিনার চেয়েও সুন্দরী ছিলেন। মিষ্টি হাসি দিয়ে মিষ্টি জুস পরিবেশন করেছিলেন। তবে মদ নয়।"

অনুকূল ফুট কাটল, "আহা! সকলের জীবনে এমন সৌভাগ্য আসে না!"

ধীমানের গতি মাঝে মাঝে থমকায়। কিন্তু রোধ হয় না। ও বলে চলে, "আমি মগ্ন ছিলাম ঘরের বাতায় আঙুরলতা দেখে। ঠিক তখনই ইলিনা আমার সামনে, 'ধীমু ইউ আর স্পেশাল টু মি।'

"বুক ধকধক। কিছুই বলতে পারলাম না। একটু বাদেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। একটা পুরনো ক্যামেরায় আমার ছবি তোলা হল। তুলেই মিষ্টি হাসি, সঙ্গে কমেন্ট, 'দিস ইজ় আ সুইট মেমরি'।

"তার পর ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। দিস ইজ় ধীমান, ফ্রম ইন্ডিয়া। ভেরি ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট। সে সময় বুঝিনি, ইলিনা এতটা দুর্বল হয়েছিল কেন আমার প্রতি।"

প্রায় বৃদ্ধ জিতেন এখন রোমান্টিক। বলল, "সুদর্শন পুরুষ, তা যে কোনও দেশেরই হোক, মেয়েরা তার প্রেমে পড়বেই।"

এমন সময় গেট খোলার শব্দ। নিবিড় সেজেগুজে হাজির। একমুখ হাসি নিয়ে প্রশ্ন, "এ তো রীতিমতো মজলিশ বসে গেছে! শোনা যাক, কী নিয়ে কথা চলছে!"

"তার পর ইলিনাদের আঙুরখেতে আমি। এ দেশের পানের বরজের মতো আঙুরখেত। কাঠি দিয়ে তোলা আঙুর লতাগুলো। কী অপূর্ব লাগছিল! ওখান থেকে টুপাটুপ ছিঁড়ে মুখে পোরা চলছিল। বাকি বন্ধুরা ছুটছুট, হইহই, তার পর হাজির। ঝটপট ছিঁড়ে মুখে পোরা। সে দিন মনে হয়েছিল, আমরা স্বর্গের বাগিচায় যেন! কী আনন্দ! অবশেষে ফেরা। মাঠের মধ্যে হল কী! ঘোড়ার খুরের শব্দ! একটা ঘোড়া, মিশকালো উঁচু লম্বা! যমদূতই যেন! ইলিনার মুখোমুখি! থমকে গেল ঘোড়া! সওয়ার যেন একটা হলিউডি ভিলেন! ইলিনা তার সঙ্গে আলাপ করাল। ওর বড় ভাই, বিজ়নেসম্যান! সে কী ফিল্মি কায়দা। হলিউডি হ্যাট মাথায়। হ্যাট তোলা, চুরুটে কামড় দেওয়া, বাঁকা সরু চোখে তাকানো। তাজ্জব কী বাত হল, বোনের বন্ধুকে ভড়কে দিতে নিজের বন্দুক থেকে তিন বার শূন্যে ফায়ার। ওই রকম ফিল্মি ওয়েলকাম দেখে আমি

ভড়কেটড়কে একশা।”
জিতেন পালের মুখে চমক, “বাবা! হলিউডি ফিল্ম!”
“কিছুটা তাই ছিল। কয়েক মাস বাদে ইলিনা অনুপস্থিত। ফোন ছিল না। পোস্টাল ঠিকানাও ছিল না। মন খারাপ, তখন আমার হঠাৎ কানে আসে ওদের ডিপার্টমেন্টে এক বেলা ছুটি। সকলকে জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল, ইলিনা ইজ় নো মোর। আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল! জানা গিয়েছিল, শি ওয়জ় শুটেড বাই সাম মাফিয়া। আমি হতভম্ব। কেউ বলেছিল, ইলিনার দাদাই মাফিয়া। আফিমের মাফিয়া। ফুটবল ও আফিম, এই দুইয়ের ভক্ত ও আসক্ত। মাঠে দুই সাপোর্টারের মধ্যে ঠান্ডা মাথায় গুলির লড়াই চলেছিল। ইলিনা শিল্পী। অন্য কিছুর সাতে-পাঁচে নেই। দুই পক্ষের গুলির লড়াইয়ে বলি হয়েছিল ইলিনা। গুলি ওর মাথা ফুঁড়ে গিয়েছিল।”
ধীমান নীরবতার মধ্যে ডুবে রইল। ভারাক্রান্ত হল চারপাশের পরিবেশ। ফাল্গুনের বিকেল ক্রমে সন্ধে। মাথার উপরে দেবদারু গাছে বিরহী কোকিল। বহু ক্ষণ প্রণয়ীকে ডাকাডাকি করে ক্লান্ত। হয়তো বা বিধ্বস্ত। তাই তো চুপ! চুপসে রইল পরিবেশটা। কিছু ক্ষণ পর খেয়াল হল, চশমা-খোলা ধীমানের চোখ দুটো টকটকে লাল। এই সব ঘটনার কিছু কিছু জানা ছিল নিবিড়ের। ধীমানকে এতটা আলোড়িত করেছিল, জানত না সে। জিতু পাল এই সব প্রেমকাহিনি থেকে নিজে বহু দূরে। ভেবেছিল, এ সব কাহিনি থেকে শুধু মজাই লোটা যায়। কিন্তু এ যে মন ভারাক্রান্ত হওয়ার গল্প। জিতু পাল উঠে পড়ে, “ওরে ধীমু, জীবন এমনই। সব প্রেম মিলনে পরিণতি পায় না।”
ধীমান ব্যথাতুর, “শুধু তোমার কথাতেই সব মনে পড়েছে, তা নয় গো জিতুদা। টুকাইয়ের ইটালিয়ান বৌ নোরাকে দেখেও মনে পড়েছে ইলিনার কথা।”

২২

বিয়েবাড়িতে সানাই বাজছে পুরোদমে। বিসমিল্লা খানের রেকর্ড। পুতুলপট্টির খ্যাতিমান শিল্পীরা সব একসঙ্গে বিয়ে বাড়িতে ঢুকে ইতস্তত করতে থাকল। সানাইয়ের সুরে শরীর-মন উৎফুল্ল। ধীমান আগেই কনেকে সাজিয়ে রাখতে বলেছিল। ইটালিয়ান কনেকে চাক্ষুষ করার উচ্ছ্বাস তো আছেই। শিল্পীদের মুখে মিঠে হাসি পাঞ্জাবির উপরে উত্তরীয় ঝুলিয়ে রাখার মতো ঝুলে আছে। টুকাই সকলকে এক সঙ্গে ঢুকতে দেখে অবাক ও খুশিতে গদগদ। খোদ ধীমানজেঠু এসেছে! সকলেই নতুন বৌয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে চায়। ও দেশ সম্পর্কে কত কিছু শুনতে চায়।
সৌমেন ঢুকেই প্রশ্ন করল, “কী রে টুকাই, কনেকে সাজাল কে?”
“মিঠিমাসিই সাজিয়েছে গো।”
সৌমেন একটু ধাক্কা খায়, ‘ওই গেঁইয়া জংলি মিঠিদি ইটালিয়ান মেয়েটাকে সাজিয়েছে! এই সেরেছে!’
টুকাই কি সৌমেনের ভিতরকার কথা পড়তে পারল? হয়তো! কিন্তু টুকাই এখন লজ্জিত নিজের কৃতকর্মের জন্য। মিঠিমাসি গুণী, কৃতী শিল্পী। সঙ্গে বেশ গোছানো সংসারী! টুকাই দেখাশোনা করতে যায়ইনি। ওরা মিঠির আজকের অবস্থা দেখছে, টিপ্পনি করতে ছাড়ছে না। মিঠি কোন অবস্থা থেকে কোথায় এসেছে! সুবোধ পাল অনাথ মেয়েকে জঙ্গলের জমিটুকু দিয়েছিল। ব্যস! সেটুকুকে নিজের মতো করে তৈরি করে সোনা ফলাচ্ছে, সোনা।
তীর্থঙ্কর পালের ডাকনাম টুকাই। ওর রিসেপশন মিঠির বাড়িতেই। পুতুলপট্টির ইতিহাসে এ যেন আনকোরা এক অধ্যায়! সুদূর ইটালির কনে। কনের পরিবার অবশ্য কৃষ্ণনগরের গেস্ট হাউসে। সেখান থেকেই বিয়ের ব্যবস্থাপনা করেছে। বাঙালি-হিন্দু পারিবারিক রীতি-আচার-বিচার দেখছে শুনছে। ওরা জানে, শ্রীচৈতন্যদেব ও মায়াপুরের কাহিনি। লোকাল ক্যাথলিক চার্চে প্রথমে হল তীর্থঙ্কর পাল ও নোরা বানেত্তির খ্রিশ্চান মতে বিয়ে। তার পরে পুরোহিত ডেকে হিন্দু বিয়ে। রিসেপশনটা মিঠির উপরে ছেড়েছে। মিঠি টুকাইয়ের মোবাইলে নোরাকে দেখেছিল। ধীরে ধীরে ফোনালাপ। ঘনিষ্ঠতা হয় নোরার সঙ্গে। নোরাও মিঠিকে আপন করেছে। বাঙালি কালচার শিখেছে। মিঠিমাসির দুঃখ-একাকিত্ব ওকে স্পর্শ করেছে। ওর কাছে এসেই ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলেছে, “যদিও আমি বৌমা, তবুও তোমার ঘরের মেয়ে হয়েই থাকব,” বলেই প্রণাম করেছে। মিঠিমাসির বরফ মন গলিয়েছে। তখনই টুকাই ঠিক করে, বিয়ে, রিসেপশন সবই মিঠিমাসির বাড়িতে হবে।
কয়েক দিন হাতে-গোনা সময়ে মিঠি তৈরি হয়েছে একটা অনুষ্ঠানের জন্য। টুকাইয়ের মা অসুস্থ। তার কানে অনেক কিছু যায়। ভিতরের হিংসা পুড়িয়ে খাক করে। মিঠি পাল উদয়াস্ত পরিশ্রমের পর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। টাকা জমিয়েছে তিল তিল করে। আপনজন বলতে টুকাই আর ওর দাদা। দিদি থেকেও নেই। নোরার জন্য গড়িয়েছে গয়না। সেখান থেকে দু’-চারখানা নোরাকে পরিয়েছে। নোরা খুবই খুশি। রিসেপশনের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো দেখছে নোরা। কোথাও ফুল, মালা ইত্যাদি লাগবে কি না! লেবারদের দেখাশোনা করা দেখে লেবাররা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। নানা ব্যাপারে টুকাইয়ের বাবা সুবোধ অবাক। নোরার করিৎকর্মা রূপ দেখে বিস্মিত। কিছু ভাবনায় এখনও তাড়িত। বিদেশে পড়তে দিয়ে ছেলেটার কী হল! এখনও বোঝা যাচ্ছে না বিয়েটা সুখের হবে কি না! আর্টের ডিগ্রির সঙ্গে ইটালিয়ান বৌ! বড় ছেলেরও ভাবের বিয়ে! তবুও সে এদেশীয় বাঙালি। অন্য দিকে দেশীয় বাঙালি বধূ এক বছরও শ্বশুরবাড়ি থাকেনি।
এখনও সুবোধের মধ্যে পাহাড়প্রমাণ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। তবে মিঠি ফুল সাপোর্ট দিচ্ছে। বিদেশি বলেই যে তারা বাজে, মোটেও এমনটা নয়। এক দিন মিঠি ওর সঙ্গে কথা বলেছিল। মিঠি বলেছিল, “জামাইবাবু, নোরা আমাদের পুতুলপট্টির শিল্পীসমাজকে আমাদের চেয়েও বেশি জানে, বোঝে।”
সুবোধ তাকায়। দ্যাখে সেই মিঠিকে, যাকে বাধ্য হয়ে এখানে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল। তার পরে সে নিজের

পায়ের তলার মাটি শক্ত করে। একটা বিষয় এ তল্লাটের সকলে জানে, মিঠির একটা শক্তপোক্ত ব্যক্তিত্ব আছে। আদতে ওরই মিঠিকে দেখভাল করার কথা ছিল। ঘটনাটা উল্টে গেছে। সুবোধ নিজেকে এখন নড়বড়ে মানুষ ভাবে। মিঠি যতটা তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে, সে পারে না। সব চলছে মিঠির বাড়িতে, মিঠির কর্তৃত্বে। মিঠির কেউ না থেকেও সকলেই আছে। ওর ক্ষেত্রে ওটাই উল্টো। সকলে থেকেও কেউ নেই। ধিকিধিকি অনুতাপের আঁচ স্নায়ুতন্ত্রে ছড়িয়ে পড়ছে। একদিন মিঠি বলেছিল, "জানো জামাইবাবু, নোরার সঙ্গে আমার ভিডিয়ো কলে কথা হয়। সে চেষ্টা করে বাংলা শিখছে। টুকাইকে ভালবাসে। ওর কালচারকে জানে, ভালওবাসে। তাই তুমি অমত
কোরো না।"
ও দিকে পুতুলপট্টির বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে সুবোধের কোনও ধারণাই নেই। শুধু মাটির স্বাস্থ্য, মাটির মন, এ সব নিয়ে চর্চা করে। তাই নিজে সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে মিঠির কথায় সায় দেয়। অবশ্য অমত করলেও কিছুই আসত-যেত না। সুবোধ নোরার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ। সে দিন নোরা এ ভাবে শুরু করেছিল, "বাবা, আমাকে বৌমা ভাববেন না। মেয়ে ভাববেন।"
সুবোধের জমাট বাধা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব গলে জল। তবুও কোথায় যেন খচখচানি থেকেই যায়!
আজ নোরা-তীর্থঙ্করের রিসেপশন। যে সব কাজ টুকাইয়ের মায়ের করার কথা, সব মিঠি করছে। যেন পাকা শাশুড়ি হয়ে উঠেছে। নিতান্ত ভালবেসেই সব করছে। সুবোধ একবার বৌয়ের ঘরে পা রেখেছে। চোখে পড়েছে, নোরাকে মিঠি একটা করে গয়না পরাচ্ছে। চিক, সীতাহার, ও দিকে টায়রা, টিকলি, নাকে নথ। একেবারে যেন মা জগদ্ধাত্রী! সুবোধের ভিতরটা আনন্দে দুলে ওঠে। ওদিকে সানাইয়ের মূর্ছনা ছড়িয়ে পড়ছে। ধীমান ওর সামনে, "আরে সুবোধ, তোমার বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে এলাম আর তুমি কী সাত-পাঁচ ভাবছ?"
সুবোধ চকিতে নিজেকে গুছিয়ে নেয়, "এসো ভাই এসো। এসো সকলে! নতুন বৌমাকে আশীর্বাদ করে যাও।"
ধীমান খেয়াল করল, ইটালির বৌ এসে সুবোধকে কিছুটা যেন বদলে দিয়েছে। ও বলে, "কী এত ভাবছিলে সুবোধ?"
সুবোধের অপ্রস্তুতের হাসি, "ওই হাবিজাবি! অন্য দেশের মানুষ! জানি না কতটা মানাতে পারবে।"
জিতেন পাল গরদের পাঞ্জাবি পরে এসেছে। ও দু'হাত দিয়ে পাঞ্জাবির খুলে যাওয়া বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল, "সুবোধ, বলিস কী রে! মানাতে পারবে না নয়, অলরেডি মানিয়ে নিয়েছে। ও এখন পুতুলপট্টির একজন হয়েই গেছে।"
ওরা কলকল করে ওঠে, "সুবোধদা, সব খবর তুমি বাইরে বসিয়েই দেবে? চলো তোমার বৌমাকে দেখি। আলাপ করি।"
সুবোধ পাল পুতুলপট্টির একজন সাদামাটা শিল্পী। পঁয়ষট্টি বছর ধরে শুধু মাটি থেকে মা-কে বানিয়েছে। বহুবিধ মা। মা সরস্বতী, মা দুর্গা, মা লক্ষ্মী, আরও কত মা। ওই ব্যাপারে জ্ঞান যথেষ্ট। কিন্তু বিজাতীয় বিষয়ে ধ্যান-ধারণা নেই-ই। শিল্পী বন্ধুদের কথায় মনটা থিরথির করে কাঁপে। এখন জড়তামুক্ত সুবোধ জোর গলায় বলল, "আরে, তোমরা চলো চলো। কনের ঘরে চলো।"
ঘরে ঢুকে ওরা ঠিক কী দেখল? কনে কোথায়? ও তো খাটের উপরে স্তূপাকৃতি গোলাপ। থমকে যায়। ওদের দেখে টুকাই এগিয়ে আসল। টুক করে কনের পাশে দাঁড়াল। গোলাপি ঘিয়ে বেনারসি। গোলাপি ওড়না। নাক থেকে কানে টানা নথ। নীল চোখে কাজল। ঠোঁটে গাঢ় গোলাপি লিপস্টিক। ঠিক যেন স্বর্গের দেবী! কনের প্রথম উচ্চারিত শব্দ, "আসুন, বসুন।"
ওরা একে একে নিজেদের পরিচয় দিল। নোরা উৎফুল্ল। সকলের কথাই ও শুনেছে। ওর ভাঙা ভাঙা বাংলা শুনে সকলেই পুলকিত।
সৌমেন খুশি, বলল, "তুমি এখন পুতুলপট্টির একজন।"
ধীমান আরও আগ্রহী, "তুমি আমাদের শক্তিশালী করলে। তুমি বড় শিল্পী। দল ভারী হল।"
"দল ভারী," শব্দটা উচ্চারণ করে বাঁ দিকে তাকাল, টুকাইয়ের দিকে। টুকাই ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিল, "ইফ ইউ জয়েন উইথ আস, দ্য গ্রুপ উইল
বি স্ট্রং।"
নোরা সহজ দৃঢ়, "হ্যাঁ, ডলভারী করব।" ওর উচ্চারণে ওদের বেদম হাসি পেল। ধীমানের মনে অন্য রকম আঁকিবুকি! নোরাকে সামনে রেখে তাদের দাবিদাওয়াগুলো তুলে ধরলে কেমন হয়?
জিতেনের চোখে নতুন কথা, "এই বৌমা কিন্তু বেশ কাজের হবে বলে রাখলাম। মোটেও আর দশটা বৌদের মতো ঘরমুখো নয়।"
কনে নিজের মতো করে কিছু বুঝল। গলায় উচ্ছ্বাস, "আমি আচি! একন এটাই আমার ডেশ। এডেশের জন্য কিছু করতে পারলে খুশি হব।"
এ কথায় চকিতে সকলের মন জিতে নেয়। ওরা আনন্দে আটখানা। সকলে গিফ্ট যত্ন করে কনের হাতে দেয়। কনে হাতজোড় করে নমস্কার জানায়। সকলের চোখ টুকাইয়ের দিকে। ঝিকমিক করে ওর চোখ। ওরা ইঙ্গিতে যেন বলে, 'বাহ! সহবতগুলো ভালভাবে রপ্ত করিয়েছ।'
টুকাইয়ের মুখে হাসি। মনে মৃদু শঙ্কা! এলাকার তাবড় তাবড় লোকেদের সামনে না জানি কী বলে বসে! শেখানো ব্যাপারগুলো, কথাগুলো পুরো গুলিয়ে না ফেলে!
ওরা টুকাই-নোরার ফটো তোলে। হইচই, আনন্দ-হুল্লোড়, খাওয়াদাওয়া হল। মধুর স্মৃতি ওদের মনে লেপ্টে রইল। ধীমানের মনে হল মিঠির সঙ্গে সাক্ষাৎ দরকার, "যাক! তোমার একাকিত্ব দূর হল। তবে স্নেহের দাবিদার বাড়ল।"
প্রৌঢ়ত্বের আঁকিবুকি নিয়ে মিঠি ধীমানের সামনে। পুরু চশমার পিছনে চোখজোড়া বাঙ্ময়, "ধীমুদা, ভালবাসার দাবিদার এলে বিরক্তি আসে না। শত্রুতার দাবিদার বাড়লেই মানুষ রাগ করে।"
একসঙ্গে প্রচুর আনন্দ বহন করে ফিরল। একটা গভীর প্রত্যয় সকলেরই মনে ছেয়েছে। নোরা পুতুলপট্টির

শামিয়ানা ধরতে পারবেই। এখন অনেক রাত। অতিথি-অভ্যাগতরা বাড়িমুখো। পংক্তিভোজন শেষ। মিঠি নোরার মুখোমুখি। নোরার নরম দু'খানা হাত মিঠির মুঠোয়, "আমার কপালে ছোট বা বড়, কারওরই ভালবাসা জোটেনি। তোমার ভালবাসা পেয়ে নতুন করে বাঁচতে ইচ্ছে করছে।"
মিঠির পায়ে হাত দিয়ে নোরা টুক করে প্রণাম করল। চিরাচরিত রীতিতে মিঠি ওর থুতনি ধরে বলল, "আয়ুষ্মতী হও! সুখে থাকো। সুখী করো।"
নোরার মিষ্টি হাসি দেখার মতো, "তুমি আমার আর-একটা মা।"
মিঠির চোখে জল। নতুন ঢঙে তৈরি করা মিঠি নোরার হাতে দেয় রাধিকার ছোট্ট ছোট্ট পুতুল। নোরা আনন্দে যেন শিশু। নোরার গলায় আবদার, "আমায় মাটির পুতুল বানানো শিখিয়ে দেবে?"
মিঠির চোখে স্থির দৃষ্টি। নোরার দিকে নিবদ্ধ। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকছে, 'নিজের বলতে কেউ নেই। ঠাকুর, এটুকু যেন কেড়ে নিয়ো না।'
এক সময় টুকাই কনের পাশটিতে গা ঘেঁষে বসে। নতুন বৌয়ের সবটা বুঝতে চায়। অনেকবার দূর থেকে নোরাকে দেখেছে অপলকে। সারা সন্ধে থেকে রাত অবধি অতিথির সপ্রশংস শব্দ শুনে তৃপ্তির ঝিলিক পায়। নেলপালিশে রাঙা নোরার অনামিকা অপেক্ষা করছিল। টুকাই একটা হিরের আংটি পরিয়ে দেয়। হাতটা মুখের সামনে তুলে টুক করে চুমু উপহার দেয় টুকাই।
নোরার কানে ফিসফিস করে বলল, "পুতুলপট্টির সকলে তোমায় আপন করে নিয়েছে। অনেক শুভকামনা জানিয়েছে। তুমি পারবে তো এ পট্টির সঙ্গে বন্ধন অটুট রাখতে?"
গোলাপি ওড়নায় ঢাকা নোরা। নিজেকে টুকাইয়ের বুকে সমর্পণ করে অস্ফুটে উচ্চারণ করে, "টুকাই আমার সঙ্গে থাকলে পারব।"

২৩

সব দিনই শুরু হয় ভোরের কপালে আলতো করে চুমু দিয়ে। তবুও সব ভোর সমান নয়। কোনও ভোর ঝকঝকে, ঝলমলে হাসিতে উৎফুল্ল। কোনওটা বা গোমড়ামুখো রাশভারী, থমথমে। কিংবা ভয়ঙ্কর কিছুর বার্তাবহ। সেটাই সারা দিন বয়ে চলে। হল্লা চলে ভোর থেকেই পুতুলপট্টির মোড়ে। চৌমাথা ভিড়ে ভিড়াক্কার। চোখ কচলেই অনেক প্রতিবেশী হাজির। কেউ বা দাঁতে মাজন দিয়ে এক পা, দু'পা করে এগোয়। বাচ্চা-কিশোররা একছুট, বেদম কৌতূহল। দু'-তিন জন মহিলা ভ্যান টেনে দাঁড় করায়। ভ্যানে জগদ্ধাত্রী দেবীর মূর্তি। সদ্য তৈরি। ওরা সকলকে একদমে কী যেন বলে। অনেকেরই কান থেকে মনের কোণে সে ভাবে ঠাঁই পায় না। তার পরেই শুরু হয় ওদের হাতে-কলমে কাজ। বলা ভাল, অ্যাকশন।
অ্যাকশন মানে কী? না দেখলে কেউই বুঝত না। পুতুলপট্টিতে এমন কাণ্ড হতে পারে। এক্কেবারে অনাসৃষ্টি। তিন-চার জন মহিলা মিলে জগদ্ধাত্রী মায়ের মূর্তিকে ভাঙছে। হাত-পা, হাতের আঙুল। এবার ধড় থেকে মুন্ডু এক আঘাতে ছিন্ন। তীব্র প্রতিবাদ সুনামির মতো আছড়ে পড়ছে। 'এ সব কী হচ্ছে?' 'আপনারা কারা?' 'কেন এ সব অনাচার করছেন?' 'এভাবে মাকে আঘাত করার রাইট কে দিল?' বৃদ্ধ ক'জনের মুখে মেঘমাখা। 'এ যে ঘোর অনাচার! কেন করবেন? দুর্দিন আসবে!' কেউ কেউ তলিয়ে ভাবে! এরকম করছে যখন, নিশ্চয়ই কারণ আছে। মাতব্বর গোছের দু'-একজন এগিয়ে যায়, "তোমরা থামো বাপু! নিজেদের ও পুতুলপট্টির অমঙ্গল ডেকে এনো না! কী হয়েছে? কেন এমন করছ?"
কেউ কেউ ওদের মুখ চেনে। কারা যেন বলল, "রবীন পালের বৌ আর মনোময় পালের বৌ। আর একজন অচেনা।" ওরা উদ্যত আঘাত বন্ধ করল। বলতে থাকল ওদের বঞ্চনার গল্প। ওরা মিঠি পালের সঙ্গে মূর্তি তৈরি করে। এ বছর মিঠি পাল চারটে প্রতিমা অর্ডার পেয়েছিল। দুর্গা প্রতিমা ঠিকঠাক জায়গায় যায়। কোনও ঝামেলা হয়নি। কিন্তু কলকাতার চেতলা ক্লাব জগদ্ধাত্রী ঠাকুর অর্ডার দিয়ে সঙ্গে সামান্য অ্যাডভান্স দিয়েছিল। কথা ছিল ঠাকুর শেষ হলে বাকিটা দেবে। ঠাকুর শেষ। পুজো দোরগোড়ায়। ফোনের উত্তরে জানায়, অর্ডার ক্যানসেল। অন্য স্থান থেকে ওরা ঠাকুর এনেছে। খবর পায়, ওরা কুমোরটুলির কুমোরদের কাছে নতুন অর্ডার করেছে। মিঠির লোকেদের মাথায় হাত। কী করবে! অনেক টাকা ইনভেস্ট করেছে।
কথাগুলো ধৃতি ধীমানকে বলল। ধীমান ঘরে বসে সবে সিগারেটে টান দিয়েছে। বাইক নিয়ে ফেরে ধৃতি। সকালের বাজার সেরে। সে-ও অবাক! এ রকম ঘটনা তো এই পুতুলপট্টিতে হয়নি কখনও। নিজে সাক্ষী হয়ে ছুটে এসেছে। ধীমান বিরক্ত। কী কারণে এমন হবে! ধৃতি বলল, "বাবা, বৌদিদের কথাবার্তা থেকে যতটা যা বুঝলাম, ওরা নিজেদের বঞ্চিত ভাবছে। বলছে, 'পুতুলপট্টিতে মহিলা-শিল্পী বলে কি তারা শিল্পী না! তারা কি মূর্তি গড়তে পারে না?"'
"এ রকম কথা উঠছে কেন? আগে তো কখনও এমন কথা ওঠেনি! মিঠির মা ও মিঠি নিজেই মহিলা মৃৎশিল্পী। ওর বানানো বলে কি বিক্রিবাট্টা হচ্ছে না? তাহলে ব্যাপারটা অন্য কিছু! ওটা আসল কথা নয়।"
ধৃতি বলল, "ওদের রাগ কথার খেলাপ করেছে বলে নয়। কুমোরটুলি থেকে ঠাকুর নিয়ে গেছে বলে।"
"হতে পারে! কিন্তু তার জন্য এ রকম করে প্রতিবাদ!" ধীমান থম মেরে বসে থাকল।
"হ্যাঁ বাবা! প্রথমটায় আমার অবাক লেগেছিল, পরে বাজে ব্যাপার বলে চলে আসলাম। কিন্তু বাবা...!" ধৃতি থামতেই ধীমান চকিতে তাকায়, "কিন্তু কী ধৃতি?"
"তোমরা, পুতুলপট্টির তাবড় তাবড় শিল্পীদের মধ্যে ইউনিটি আনতে চেয়েছিলে, কিন্তু পারোনি। আর সেখানে মিঠিদির কী ক্রেজ়! নিজে কিন্তু যায়নি। ওর লোকেরা যেন দিগ্বিজয় করে ফেলল। সত্যি অনেক লোক শুনে সহানুভূতি দেখিয়েছে। পথচলতিরাও সহমত হয়।"
ধৃতির কথা শুনে ধীমান তড়াক লাফিয়ে ওঠে।



“বাবা কোথায় চললে? তুমি ওদের সঙ্গে নিজেকে জড়াবে না। সব মিলিয়ে কাজটা আমার ভাল লাগেনি। অর্ডার নেয়নি বলে মিঠিদি বৌদিদের লেলিয়ে দেবে?”
ধীমান বিরক্ত, “তুই থাম! যা বুঝিস না, বলিস না।”
ধৃতি চুপ করে যায়। ধীমানের মনে বয়ে চলে— ‘মিঠি একটা অসহায় অনাথ মেয়ে হয়েও যা পারে, সে রকম করে পুরুষরা ভাবতেই পারেনি।’
ধীমান তৈরি হয়ে ধৃতির বাইকটা নেয়। সোজা সৌমেনের ঘরে। “কী রে! শুনলি ঘটনাটা?”
“শুনেছি ধীমুদা, কিন্তু এ রকম তো এখানে কোনওদিন হয়নি। ওটা প্রতিবাদের চেহারা নয়, উচিতও না।”
ধীমান উত্তেজিত। “তোরা কী ভাবিস! এ রকমটা হয়নি বলে হবেই না! আর সহজ চেহারাটা শুধু জানিস! অন্য কোনও উপায় তো থাকতেও পারে।”
“বোসো ধীমুদা! তুমি এত উত্তেজিত কেন? এই সুনীতি একটু চা করে আনো তো!”
“আমি চা খেতে আসিনি সমু! ধৃতিকে জিজ্ঞেস করলাম বিস্তারিত। সে রকম ভাবে বলতে পারল না। তুইও তাই!”
“ধুর, ও সব মেয়েলি প্রতিবাদ। একটু স্টান্ট বলতে পারো। নিজেদের হাসির খোরাক করল। ছাড়ো ধীমুদা!”
“না রে সমু! তুইও কেন বুঝছিস না! হয়তো এটাই শুরু। এভাবেই শুরু। আমি তো অনেক উপায় ভেবেও ওয়েআউট পেলাম না। তো মেয়ে হয়ে মিঠি যে রকম ভাবল, সেই মতোই করল! বাহ! আমরা পুরুষ বলে জাহির করি নিজেদের। ছ্যাঃ! এতটুকুও স্পর্ধা নেই আমাদের। দৃঢ়তা নেই। শুধু অন্যের মুখপানে চেয়ে থাকি।”
সৌমেন ধীমানের এই রূপ দেখেনি। তাই ওর দিকে স্থির চোখে চেয়ে থাকে। ও ঘটনাটাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। তলিয়ে ভাবেওনি। ধীমুদার কথা একটু একটু করে ভাবাচ্ছে এখন ওকে। তাই তো! একবেলার মারমুখী প্রতিবাদ। লোকজন জড়ো হওয়া। ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস থেকে একজন অফিসারের আগমন। হুড়মুড় করে মাথায় সব পাশাপাশি এসে বসল।
ছটফট করে সৌমেন বলল, “ধীমুদা, তুমি যেভাবে ভাবছ, আমি সেভাবে তলিয়ে ভাবিনি।”
“তা হলে? তোর তো অন্তত একটু সচেতনতা দরকার,” এবার কড়া করে ধীমান বলল, “শেষে কী দাঁড়াল, জানিস কিছু? তোরা যতটা হালকাভাবে নিচ্ছিস, আমি সেভাবে নিতে পারছি না।”
“হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে ধীমুদা। আমার কর্মচারী চাঁদু বলেছে, দু’জন সরকারি দফতর থেকে এসেছিল, ওদের বোঝায়, দুঃস্থ, অসহায় মহিলা মৃৎশিল্পীদের ভাতা দেওয়া যেতে পারে। যদি উপযুক্ত জায়গায় দরখাস্ত করে। অফিস টাইমে জমা করতে বলে গেছে।”
ধীমান সৌমেনের কথা শুনে বাইরে তাকাল। কী একটা যেন ওকে গভীরভাবে ভাবাচ্ছে। ওদিকে সৌমেনও চুপ, ইতস্তত করছে। বুঝে উঠতে পারছে না, ধীমুদা ঠিক কী ভাবছে! কিন্তু...
এর পরই ধীমান উঠে দাঁড়াল, “সমু, এত সহজে ওরা এতটা এগিয়েছে! ব্যাপারটা ভাবতে পারছি না। তাই...”
“তাই কী ধীমুদা?”

"ঠিক করলাম, আমরা মিঠির সঙ্গে যোগ দেব। ও শুরু করেছে। আমরা সঙ্গ নেব। আর আন্দোলনকে এগোব। ওটাকে এখানেই শেষ করা যাবে না। টানতেই হবে। আর কোনও উপায় নেই।"
"কেন ধীমুদা, ওখানে মিঠিদির নিজের স্বার্থ জড়িত। আমরা কী-ই বা করতে পারি!"
দ্বিগুণ তেজে ফুটল ধীমান, "এই কাজটা মিঠি আকস্মিকভাবে করল। আমরা সচেতনভাবে ওর সঙ্গ নেব। একসঙ্গে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাব।"
"তার পরে শোনো না ধীমুদা! সত্যি-মিথ্যে জানি না, মিঠিদি নাকি বলেছে, 'আমরা মহিলা শিল্পীরা পৃথক ভাবে কিছু চাই না। সামগ্রিক উন্নতি বা বৃহত্তর উন্নয়ন চাই।"'
"মিঠি এ সব বলেছে? বললে সাচ্চা কথা বলেছে। চল সমু, সবাই মিলে মিঠির বাড়ি যাই। জিতেনদা ও অনুকূলকে ফোন কর।"
হাঁটাপথে সকলে এগোল। চেনাজানা একজন ঘটনাটাকে উস্কে দেয়, "আমাদের পুতুলপট্টিতে কী সব চলছে! এত সাধের ঠাকুরকে কেউ ভাঙে! তবে ভেঙেছে যখন তখন কোনও না কোনও জ্বালা থেকেই! বুঝি তো সবই! সরকারি তরফ থেকে আজ অবধি মৃৎশিল্পীদের জন্য কিছুই করেনি। এই যে জিএসটি বসানোর ব্যাপারে সরকারি তৎপরতা কেমন তুঙ্গে!" আরও কত কিছু বলতে বলতে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে। কেউ শুনল কি শুনল না, সে খেয়াল নেই!
ধীমানের ভিতরে তোলপাড় চলছে। তা হলে মিঠিকে সামনে রেখে বড় কাজে নামতে হবে। মিঠিকে ওরা ফোন করল। মিঠি বাড়িতেই। ওদের ঢুকতে দেখে প্রথমে হকচকিয়ে যায়। একসঙ্গে এত লোককে দেখে অবাক। তার পরে ত্রস্ত। পুতুলপট্টির গুণী, কৃতী লোকেরা ওর বাড়িতে! সকলের নজর মিঠির শিল্পকর্মের দিকে। অসম্ভব সুন্দর পুতুল সারি সারি সাজানো ওর ঘরের বারান্দায়। অজস্র পুতুল রোদে শুকোচ্ছে, রংচঙা ফিনিশ্‌ড পুতুলগুলো শোকেসে। এরাও রিয়্যালিজ়মের ধারায় কাজ করে। স্বশিক্ষিত মিঠি যা করেছে! একাধারে নতুন চিন্তাভাবনা ও সূক্ষ্ম দক্ষতার ফসল। পিঁপড়ের লড়াই, পাখিদের নিখুঁত বাসা, গাছের মাথায় টিয়া আরও কত কী!
সকলের জন্য চেয়ার আনা হল। চেয়ারে বসেই ধীমান কোনও ভূমিকা না করে বলল, "মিঠি, তুমি কী ভেবে চৌমাথায় তোমার মেয়েদের পাঠিয়েছিলে?"
মিঠির চোখে আশঙ্কা! কী জানি, কোথাও ভুলভ্রান্তি হল নাকি! ওর বাড়িতে এখন এত গণ্যমান্য ব্যক্তি! কোনও উৎসব-অনুষ্ঠান ছাড়াই। ওর মনের পুরনো অভিমান, পুরনো ক্ষত নড়েচড়ে উঠবেই। অল্প বয়স থেকে ওর লড়াই। বেঁচে থাকার লড়াই, নিরাপত্তার লড়াই! নাহ! কোন সাহায্যই সে পায়নি। বড় শিল্পীরা ফিরেও তাকায়নি। শুধু মৌখিক সহানুভূতি। নিজের জামাইবাবুও ব্যতিক্রম নয়। সঙ্গে নিজের দিদির কুটিল হিংসা, বিষাক্ত মানসিকতা ওকে পীড়িত করে। সেই থেকে অজ্ঞাতবাস। এদের আগমন মিঠিকে বড্ড ভাবাচ্ছে। মিঠি মেয়েমানুষ। প্রথমে প্রতিবাদের কোনও পরিকল্পনাই ছিল না। ক্ষোভে-দুঃখে বেরিয়ে গেছে! কী করবে!
ওরা সকলে জানতে চায় অনেক কিছু। ওরা পুরুষ। সমাজের গণ্যমান্য। ওরা করিৎকর্মা। ওদের ভিতরে ফল্গুর মতো বইছে, 'মহিলারা কি সুকৌশলী হতে পারে?'
মিঠি যেন এখন আদালতের খাঁচায়। জনতার দরবারে। ওর কথায় ইতস্তত ভাব, "ধীমুদা, কী করতাম বলো তো! রবীন, মনোময়দা, এদের বৌরা সংসার সামলে সময় করে প্রতিমা গড়েছে। খবর আসে অর্ডার ক্যানসেল। সারা বছর এই সময়ের দিকেই চেয়ে থাকি সকলে। জিনিসপত্রের দাম আগুন। হাতে ছ্যাঁকা লাগে। দেখেশুনে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল! বললাম, 'চৌমাথায় মাইক হাঁকিয়ে বলো।' সিরিয়াসলি কিছু করিনি। ওরাই ভ্যানে করে নিয়ে গেছে। সঙ্গে আরও লোক ছিল। অনেকেই দেখেছে।" বলেই মিঠির মাথাটা নুয়ে আসে। চটপট হাততালি পড়ে। চমকে তাকায় মিঠি। ধীমানের মুখে আনন্দের হাসি, "মিঠি, তুমি না বুঝেই বড় স্টেপ নিয়েছ।"
পাশে অনুকূল, তার ঝাঁকড়া চুল লুটিয়ে কপালে। নতুন সমস্যা দেখে চোখ চকচকে। হয়তো বা কিছু একটা করার জায়গা সামনে। আসলে ওদের মতো জঙ্গি প্রতিবাদীদের বহু দিন প্রতিবাদের সব পথ বন্ধ। মুখের সামনে একটা করে পথের কোলাপসিবল গেট বন্ধ হয়ে গেছে। অনুকূলের স্লোগান প্রায় তৈরি, "যোগ্য নেত্রীর মতো অচলায়তন ভেঙেছ মিঠি।"
জিতেন পাল ব্যঙ্গ করে বলে, "আগের গানের রেকর্ডগুলো প্লেয়ারে বাজে না ক্যান অনুকূল?"
"জিতুদা, তুমি কি প্রতিক্রিয়াশীল? জানতাম না। চিরকাল আমি শ্রমজীবী মহিলাদের প্রতি সহানুভূতিশীল।"
ধীমান ওদের দু'জনকে থামাল। অনুকূল নাছোড়বান্দা। তির্যকভাবে জিতেনদাকে এফোঁড় ওফোঁড় করতে ছাড়ে না, "বর্তমান বিধায়ক, নেতাদের ডেকে চা মিষ্টি খাওয়ালে। খেয়েদেয়ে তো ওরা টা-টা করল।"
সৌমেন মুখ বন্ধ রেখেছিল এত ক্ষণ, এখন ওর মুখ নিশপিশ করছে, "অনুকূলদা, তোমাদের জমানার ক্যালেন্ডারগুলো আছে? উল্টেপাল্টে দ্যাখো। কোন কাজটা শিল্পী ও কুমোরদের জন্য করেছ! তোমাদের পতাকার গায়ে হাত রেখে বলো।"
ধীমান নেতাদের মতো হাত তোলে। ওদের কচকচানি থামায়। ওদের মধ্যে কে যেন গুনগুন করে গান গাইল, "ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না, পল রোবসন!"
অনুকূল রোষকষায়িত চোখে তাকাল, তাতে যে গান গাইছিল তার মুখ বন্ধ।
"তার পর মিঠি, যা বলছিলাম, পুতুলপট্টির অবস্থা করোনা কালে যা হয়েছিল তা তো সকলেরই জানা। কুমোরপাড়া না খেতে পেয়ে মরতে বসেছিল। তোর অবস্থাও তো জানতাম।"
মিঠির চোখের পলক পড়ে না। ভাবে, তখন কারও টিকিটি দেখতে পাইনি। বলে, "এ সব কথা আজকে?"
একটু থামে ধীমান। মিঠির থমথমে মুখের দিকে চেয়ে বলে, "সরকারি অফিসাররা

মহিলাশিল্পীদের ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে দরখাস্ত করতে বলেছে?”
মিঠি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে, “কিন্তু ধীমানদা, বোঝা দুষ্কর ওরা মূর্তিটার লসের পয়সা দেবে নাকি মহিলা মৃৎশিল্পীদের শুধু সামান্য আর্থিক সাহায্য?”
“যেটাই হোক, মিঠি তুমি বলবে আমাদের মাসোহারা চাই। কিন্তু এভাবে পুতুলপট্টির বিরাট হাঁ-মুখ বন্ধ হবে কি? বরং সকলের উন্নয়ন হয়, এমন কিছু করা উচিত রাজ্য সরকারের। হয় একটা আর্ট কলেজ হোক, না হয় মিউজ়িয়াম।”
কে যেন বলল, “ওর দরখাস্ত ওরা দেখবেই না।”
ধীমানের বোবা চোখ শূন্যে ঘোরে। কবেকার সেই পুতুলপট্টির শিল্পী ও কারিগররা, যারা পুতুলপট্টির নামটাকে বঙ্গভূমির দেওয়ালে সেঁটেছেন। মিঠির মুখেও চিন্তার কারিকুরি। ওর তৈরি পুতুলরা ওর হয়ে যেন অনেক কিছু বলল।
ধীমান হঠাৎ সরব, “থেমে যাও! যা বলছি, মিঠির হাতে একটা দরখাস্ত থাকবে। আমরা সকলে শেষে সই করব। সই সংগ্রহ করার দায়িত্ব থাকবে সৌমেনের উপরে। যত বেশি সংখ্যক সই হয়, ততই ভাল। আমাদের তো একটা ব্র্যান্ড ভ্যালু আছে। কী বলো তোমরা?”
ঘাড় নাড়ে সকলে। সায় দেয়। মিঠি বলল, “একটু বসুন। একা মানুষ! চা চাপাচ্ছি।”
“আরে না না, চা খেতে আসিনি। মিঠি, প্রস্তুত থাকতে হবে সকলকে। আমাদের সামনে লড়াই অপেক্ষা করছে। পরে এসে চা খাব সক্কলে মিলে।”
দিনকয়েক বাদে মিঠি দরখাস্ত নিয়ে হাজির। সঙ্গে বেশ কয়েক জন। প্রশাসনিক কর্মচারীরা বিরক্তি উগরে দেয়, “আপনাদের সহানুভূতি দেখালাম, আর আপনারা দলবল জুটিয়ে আনলেন! ম্যাডাম এটা আন্দোলনের জায়গা নয়।”
মিঠি কিছু বলতে উদ্যত হতেই কর্মচারীটি নমস্কারের ভঙ্গিতে ওকে চলে যেতে বলে। ধীমান তখন পিছনে। এ সব দেখে রাগে জ্বলতে থাকে। কাছে গিয়ে বলে, “ওহে সরকারিদাদা! এরা শিল্পী মানুষ। এ সব কথা ওদের প্রাপ্য নয়।”
লোকটা ততক্ষণে নিজেকে ফাইলমুখী করেছে। ধীমান গলার জোর বাড়ায়, “শুনুন, আজকে আমরা সকলে একই গোত্রের। আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের কথাগুলো শুনুন। কাজ করা না-করা পরের ব্যাপার।”
কাউন্টারের ও পারে একজন চশমার উপরে চোখ তুলে বলে, “আপনি কে মশাই? এর ভিতরে নাক গলাচ্ছেন কেন? শিল্পীটিল্পী আমরা বুঝি না। এখানে সরকারি কাজ হয়।”
“আমরাও সরকারের মধ্যেই। সরকারি কাজের কিছু কিছু বুঝি।”
ধীমান বোঝেনি ওর পিছনে পুতুলপট্টির অনেক মহিলা-পুরুষ হাজির। শেষে জিতেন পাল ঢোকে, “ধীমু, আমি আছি রে।”
সরকারি অফিসের দারোয়ান ও রক্ষীরা সতর্ক। রোষকষায়িত চোখে ভিড়ের দিকে নজর। ধীমানের গলায় আবার অনুরোধের সুর, “দাদা, এইসব শিল্পী মানুষদের জন্যই আজ পুতুলপট্টির এত সুনাম।”
কে যেন পিছন থেকে মন্তব্য করল, “জানেন কার সঙ্গে কথা বলছেন?”
“সময় নষ্ট করবেন না। যা বলার লিখিত দিয়ে চলে যান।”
কেউ একজন বলল, “যাওয়ার জন্য আসিনি। সাহেবের সঙ্গে দেখা করেই যাব। তোরা আটকানোর কে?”
সুরক্ষা বাহিনীর ধমক শোনা যায়, “সরকারি অফিসারদের ব্যাটা বলা! তুইতোকারি করা! মজা দেখাচ্ছি।”
লাঠি উঁচিয়ে এগিয়ে আসে কয়েকজন, “এই কুমোরের দল, পুতুল বিক্রি কর গে যা।”
ধীমান, সৌমেনের মেজাজে ঘৃতাহুতি দেওয়া হল। ঠান্ডা মাথার ধীমান ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, “পুতুল বেচে খাই ঠিকই, কিন্তু খারাপ ব্যবহার করি না।”
মিঠি পুলিশকে সরিয়ে ধীমানের কাছে দাঁড়ায়, “এই যে স্যর, কার সঙ্গে কথা বলছেন জানা আছে? উনি জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত ধীমান পাল।”
লোকটার চোখ রক্তবর্ণ, “কে কত জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে জানা আছে। একটা টিনের চাকতি কিনে স্ট্যাম্প মেরেও আনা যায়।”
“আপনাদের সঙ্গে কথা বলাই উচিত হয়নি।”
“এবার যান, যান তো! ছিনে জোঁকের মতো আপনারা।”
ধীমান দৃপ্ত, “যাব না, সাহেব আসবেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে তার পর যাব।”
“হবে না দেখা। সাহেবের মিটিং আছে। হবে না। হবে না।”
সিকিয়োরিটির লোকেরা অসম্ভব বিরক্ত। কেউ ওদের কথা শোনে না দেখে ব্যাটন তুলে এগিয়ে আসে। কিন্তু কারও মধ্যেই ভয়ের চিহ্ন নেই। তবুও রক্ষীটি সামনে এগোতেই থাকে। হঠাৎ মহিলাকণ্ঠ শোনা যায়, “স্টপ ইট।”
শুনে সকলে থমকে যায়। তার পরে আবার উচ্চারিত হয়, “উই মাস্ট প্রসিড অ্যান্ড মিট উইথ ডি এম।”
ওদের চোখের সামনে জলজ্যান্ত ইটালিয়ান সুন্দরী তরুণী। মহিলাকণ্ঠে না-বাচক নির্দেশ শুনে থমকে চায়। প্রতিবাদী মহিলা-পুরুষরাও অবাক। টুকাইয়ের বৌ নোরা! ওদের সঙ্গে? প্রশাসনিক ভবনে!
একটু দূরে থাকা ধীমান ইঙ্গিতে জানতে চায়, “তুমি কেন এখানে?”
নোরা বাঙালিদের মতোই সালোয়ার-কামিজ পরেছে। লাল সবুজ হলুদ, সঙ্গে হলুদ ওড়না। মাথায় সোনালি চুলের ঢেউ। ধীমানের কথার উত্তরে বলল, “ইয়েস ধীমানজেটু, আই হ্যাভ আ রেস্পন্সিবিলিটি ফর অল দ্য আর্টিস্টস অ্যান্ড আর্টিজ়ান্স অফ পুতুলপট্টি।”
মিঠি, ধীমান, সৌমেন, জিতেন ও অন্যান্যদের মনোজগতের এক নির্জন দরজা নীরবে খুলে যায়। সেখান দিয়ে সকলের মনোজগতে জায়গা করে নিল নোরা। ওরা এখন আরও সঙ্ঘবদ্ধ।

২৪

তীব্র আগুনের ঝলক! রাইফেলটা একবার উপরের দিকে উঠেই কী করে যেন মুহূর্তের মধ্যে সামনের দিকে ঘুরে গেল! কেউই বুঝতে পারেনি। ওরা দু'জন, মিঠি ও নোরা পাশাপাশি

দাঁড়িয়ে ছিল। গুলিটা এসে মিঠির মাথা ফুঁড়ে বেরোল। ভিড়ের মধ্যে কাটা কলা গাছের মতো টুক করে পড়ে গেল। নোরা মিঠির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতে থাকল, "মম, ওয়েক আপ। ওয়েক আপ! নাথিং হ্যাপেন্ড!"

চার পাশের লোকজন হতচকিত। ধীমানও তাই। মুহূর্তের মধ্যে ঠিক কী হল, বুঝে উঠতেই পারল না। ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। পিছন থেকে লোকজন ব্যাপারটা বোঝেইনি।

কিন্তু এটা বুঝতে পেরেছে যে, মিঠি নিরাপত্তারক্ষীদের কিছু একটা বলেছে। তাতেই সে তেতেছে। ফুঁসতে ফুঁসতে বলেছে, "রাখো তোমাদের খেলনা বন্দুক! তোমাদের দৌড়
জানা আছে।"

তার উত্তরে নিরাপত্তারক্ষীদের একজন বলেছে, "আমরাও জানি, তোমাদের মতো আপদদের কী ভাবে বিদায় করতে হয়," এ কথা বলেই মাথার উপরে বন্দুক তুলে মিসফায়ার করে। বড়
জোর উঁচু গাছের ডালে লাগার কথা। কিন্তু কীভাবে যেন মিঠির মাথা ফুটো করে বেরিয়ে গেল। নিমেষে লোকজন ঘিরে ধরল। নোরার কোলে মিঠির মাথা, নোরার পোশাক রক্তে রাঙা। মিঠির নাকে আঙুল ঠেকিয়ে দেখল, ও
জ্ঞান হারিয়েছে।

রক্ষীরাও আচমকা থমকায়! বিভিন্ন ঘরের আধিকারিক ও কর্মচারীদের ত্রস্ত ছোটাছুটি। স্পষ্টত সকলের মধ্যে দ্বিধা। ঘটনার আকস্মিকতায় টালমাটাল। যার রাইফেল থেকে ঘটনা ঘটেছে, তাকে লোকচক্ষুর আড়ালে পাঠানো হল। বিপরীত প্রতিবর্ত ক্রিয়ার দরুন বাইরের জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ঝাঁপায়। চারপাশে ফোন, ভিডিয়োর তৎপরতা। মুখে মুখে রটনা। ধর্নায় বসা মৃৎশিল্পীদের উপরে সরকারি রক্ষী গুলি চালিয়েছে। একজন মহিলা মৃৎশিল্পী গুলিবিদ্ধ। শুনে সারা পুতুলপট্টি চমকে ওঠে।

ধীমান, সৌমেন, জিতেন, টুকাই, এরা এখন আন্দোলনের এক-একজন ফিগার! পিছন থেকে সামনে এগোয়। রীতিমতো জনগণের মাঝ বরাবর রাস্তা তৈরি হয়েই গেল। তবে ওদের ঔচিত্যবোধটা ভোঁতা হয়ে গেছে। নোরার নির্দেশে মিঠিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। সঙ্গে টুকাই, সৌমেন নোরা রইল। পুতুলপট্টির বাইরের সাধারণ মানুষ কাতারে কাতারে হাজির। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সামনে হাজারও প্রশ্ন। ক্রমে ওদের মুখের সামনে চ্যানেল এক্স, ওয়াই, জেড-এর মাইক্রোফোন। কিছু লাইভ ভিডিয়ো। বহু দিনের ধূমায়িত ক্ষোভ, উষ্মা মিলেমিশে অবর্ণনীয় পরিস্থিতি তৈরি হল।

রাত এগারোটা। হাসপাতালের খবর বাইরে প্রচারিত হল, অনেক চেষ্টার পরেও মিঠি পালকে বাঁচানো যায়নি। ওর মাথা ফুটো করে গুলি বেরিয়ে গেছে। অতিরিক্ত রক্তপাতজনিত কারণে মিঠি পালের মৃত্যু হয়েছে।

ঝুপ ঝুপ করে দোকানপাটের ঝাঁপ বন্ধ। কাতারে কাতারে লোকজনের গন্তব্য হয়ে উঠল হাসপাতাল। রাত প্রায় দেড়টা। ডেডবডি রিলিজ় হল। নোরার কান্নাকাটি, টুকাই ও বাকি ঘনিষ্ঠদের ভারাক্রান্ত মন। নোরা উদভ্রান্ত। আবেগী কান্নাভেজা কণ্ঠে বিলাপ করে, "মম, যে রক্ষীটা তোমার মতো গুণী শিল্পীকে গুলি করে মারল, তাকে আমরা শাস্তি দেব।"

নোরার কান্না রবীন ও মনোময়ের বৌদের সংক্রামিত করল। কোনও কোনও পুরুষের চোখেও জল। ডেডবডির সামনে টুকাইও চূড়ান্ত শোকাহত, "মাসি, আমরা কেউই তোমাকে যোগ্য মর্যাদা দিতে পারলাম না। সারা জীবন লড়াই করে পায়ের নীচের মাটিটুকু তৈরি করেছ। না পেলে সুখ, না শান্তি। জীবনটা খাঁ-খাঁ মরুভূমির মতো। শিল্পীদের দাবির জন্য লড়তে গিয়ে জীবন উৎসর্গ করলে।"

ধীমান ও জিতেনের চোখে বোবা ভাষা। অসহায় মিঠির জন্য বুক ভেঙে যাচ্ছে ব্যথায়। জিতেন টুকাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "চল, ওঠ টুকাই। ওর শেষকৃত্যটা সম্পন্ন করতে হবে তো।"

কোথা থেকে সুবোধ পাল শোকাহত হয়ে কান্নার ঢেউ তুলল। শ্লেষ্মাজনিত ঘড়ঘড় শব্দও শোনা গেল। ভিতরকার সঞ্চিত দুঃখের অনুতাপ হয়তো এ ভাবেই বেরোল। সুবোধের স্ত্রীর হিংসে প্রবৃত্তির জন্য সুবোধ দায়িত্ব কর্তব্য করতে বাধা পায়— বাতাসে এ সব কথাও চাউর হল।

জিতেন সান্ত্বনা দিল, "সুবোধ, এগিয়ে চল। আজ আর ও সব বলে কী করবি? আমরা দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝি না। ও আমাদের মতো বুড়োহাবড়াদের সামনে জীবন দিয়ে বোঝাল শিল্পের মর্যাদা রাখা কাকে বলে!"

কে যেন বলল, "টুকাইয়ের মা মিঠিকে দেখতে এসেছে।"

অনেকের ভুরু কুঁচকে উঠল। দ্রুত হাতে সুবোধকে সরানো হল, ডেডবডি ম্যাটাডরে তোলা হল। তার পরে মিঠির বাড়ির দিকে এগোল সকলে। সঙ্গে চলল অগণিত শিল্পী। কুমোর, সাধারণ মানুষ। এগিয়ে চলল অনেক ঝুড়িচাপা শব্দ, বাক্য, তথ্য। রক্ষীটি গুলি চালায়নি, গুলি ছুটে গেছে। মিঠি পালই আসলে বলির পাঁঠা হল। বাকিরা নেতা হল। কারও উচ্ছ্বাস, "মোটেও না, একজন মহিলা প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে শহিদ হল। তা হলে ওই আইনবিরোধী কাজ করে রক্ষীবাহিনীর লোকটার কি শাস্তি হবে?"

অবশেষে মিঠির বাড়িতে মিঠির মরদেহ আনা হল। উঠোনে শুইয়ে রাখা হল। ফুলের মালায় ঢেকে গেল ওর দেহটা। অন্য এক নতুন বোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল ধীমানের মনে, 'মিঠি না বুঝেই মস্ত বড় কাজ করল। আত্মোৎসর্গ করল। এই উৎসর্গটা বৃথা যাবে না। বৃহৎ আন্দোলনের পথকে প্রশস্ত করবে। সেটাই হয়। ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকের শহিদরাও পরবর্তী কালের আন্দোলনকারীদের প্রেরণাদাতা।'

সৌমেনের নির্দেশে শেষ গন্তব্যমুখী সকলে। আচমকা ধীমানের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। শেষ গন্তব্য! তা কি শুধুই মৃত্যু? ওর জেদি দৃপ্ত মনটা বলে ওঠে, 'না! অন্তিম লক্ষ্য মোটামুটি স্থায়ী কিছু কাজ করে যাওয়া।' মিঠির জন্য দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুকের গভীর থেকে।

একটা মৃত্যু, গোটা পুতুলপট্টিকে এক সুতোয় বেঁধে দিয়েছে। সৌমেন ধীমানের কানে কানে বলল, "ধীমুদা, মিঠিদি যে প্রতিবাদ শুরু করেছিল, সেখান থেকেই আমাদের এগোতে হবে।"

ধীমানও ওর কথাকে আদ্যোপান্ত সমর্থন করল। বলল, "আমিও তাই ভাবছিলাম। মিঠিটা আমাদের কাজটাকে সহজ করে দিল। বেচারা ভিকটিম হল।"

টুকাই নয়, নোরাকে দিয়ে সুবোধ মিঠির অন্তিম ক্রিয়া পালন করাল। নোরার কাছে এ সবের নিয়মবিধি অজানা। প্রথমে থমকালেও তার পরে ধীরে ধীরে সমস্ত খুঁটিনাটি পালন করল। চিতা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। নোরা নিজেকে আর সামলাতে পারল না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, "এ দেশে এসেই একজন মম পেয়েছিলাম, মিঠি মম। আমায় পুতুল বানানো শেখাচ্ছিল।"
হঠাৎ নোরার উচ্চকিত স্বর, "পুতুলপট্টির 'জোয়ান অফ আর্ক' মিঠি মম।"
পাশেই ধীমান। সে ভাবল, 'নোরা বলেছে ভাল। একটা মৃত্যু, কিছু প্রশ্ন, সেটা যেন বৃথা না হয়।'

২৫

থমথমে স্তব্ধতা পুতুলপট্টিকে ঘিরে। স্তব্ধতার কি কোনও রং হয়! নাকি সব রং বিবর্ণ হয়ে স্তব্ধতার জন্ম হয়! ওরা এ সবই ভাবতে থাকে। ওরা আরও অনেক কিছু ভাবতে থাকে। এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না! কোথা থেকে কী হয়ে গেল! এখন পুতুলপট্টির জোয়ান অফ আর্ক মিঠি পাল। ওর আবক্ষ মূর্তি বানিয়েছে সৌমেন। মিঠি এত দিন নামগোত্রহীন শিল্পী ছিল। এখন ওর নামগোত্র খোঁজা হচ্ছে। ওর ভাল নাম জানার চেষ্টা চলছে। ওর জামাইবাবু সুবোধেরও সেটা জানা নেই। ওর ঘর তল্লাশি করেও পাওয়া যায়নি। পুতুলপট্টিতে ঢোকার মুখে রাস্তায় ওর আবক্ষ মূর্তি বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।
মিঠি পালের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন! উপস্থিত বিধায়ক সুজিত পাল, জনপ্রতিনিধি, কুমোর, মৃৎশিল্পী, সুধী জনগণ এমনকি সাধারণ মানুষ। সামগ্রিক অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় সৌমেন পাল। চলল অনেক স্মৃতিচারণ। বলতে বলতে গলা ধরে এল জিতেন ও ধীমান পালের। সুবোধ পালকে বলতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও কিছু বলেনি। বরং আবেগঘন বক্তব্য দিল নোরা। সেখানে উঠে এল ওর নিজের অভিজ্ঞতার কথা। বৌ হয়ে আসার আগে থেকে ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা। ওকে পুতুল বানাতে শেখানোর কথা। রবীন ও মনোময়ের বৌরাও নিজেদের মতো করে ওদের দিদির স্মৃতিচারণা করল, "দিদি সব সময় আত্মনির্ভর হওয়ার কথা বলতেন। সূক্ষ্ম সুন্দর পুতুল তৈরি করতে দিদির জুড়ি মেলা ভার ছিল। সকলকে আপন করলেও তাঁর নিজের বলতে কেউই ছিল না ওর। টুকাই ও নোরা দিদিকে ভীষণ ভালবাসত।"
ধীমান বিধায়কের সঙ্গে আলাদা করে কথার সুযোগ পাচ্ছিল না। ধীমান বলল, "আসুন সুজিতদা, আমার স্টুডিয়োতে বসি। কথা আছে।"
দরজা ভেজিয়ে ওরা দু'জন মুখোমুখি। মাথাজোড়া টাক, চোখভরা কুটিল কৌতূহল নিয়ে বিধায়ক জিজ্ঞেস করল, "ধীমানবাবু, ব্যাপারটা কেমন হল?"
ভুরু জোড়া কাছাকাছি আসে ধীমানের, "কেমন হল মানে?"
"একটা অশিক্ষিত মেয়েছেলের পাবলিসিটি আপনারা বেশি করলেন না? যে আবার কুমোর-টুমোর ছিল।"
ধীমান তার চোখ জোড়া সোজাসুজি স্থাপন করল বিধায়কের চোখে। একটু অস্বস্তিতে পড়ল বিধায়ক। ধীমান বলল, "সুজিতদা, মেয়েছেলে নয়। মহিলা বলুন। আর সরকারি রক্ষীর হঠকারিতায় ওর প্রাণ গেছে। বলা ভাল, ও প্রাণ উৎসর্গ করেছে।"
"ওটাকে দোষ বলবেন না ধীমানবাবু। ভয় দেখাতে গিয়ে গুলিটা উপরে না গিয়ে ভিড়ের মধ্যে গেছে। লোকটাকে তো...!"
"হ্যাঁ-হ্যাঁ, পুলিশকর্মীটিকে ঠিক কী করা হয়েছে?"
"লোকটাকে শুনেছি কিছু দিনের জন্য সাসপেনশন অর্ডার দেওয়া হয়েছে।"
"সাসপেন্ড করা হয়েছে। অর্থাৎ কিছু দিন বাদে আবার কাজে নিয়ে নেবে। কিন্তু একজন শিল্পীর তো প্রাণ গেল! আর মিঠির আবক্ষ মূর্তিটা আমরা পুতুলপট্টির বিভিন্ন ঘর থেকে অর্থ সংগ্রহ করে বানিয়েছি। পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি নিয়েছি মাত্র। সরকারি তরফ থেকে আপনারা কিন্তু কিছুই করেননি।"
"জানেন ধীমানবাবু, দুঃখের কথা কী! আমরা জনগণের জন্য কী না করছি! বলতে গেলে উদয়াস্ত পরিশ্রম করি, বেইমান পাবলিক আমাদের চোর-বদমাশ, ইয়ের বাচ্চা বলে। আর ওই মহিলা ক'টা ঠাকুর-দেবতার মূর্তি গড়ে কেমন রাস্তার মোড়ে বসে গেল।"
ধীমান নিজেকে অতিকষ্টে নিয়ন্ত্রণ করল। তার পরে বলল, "কী করবেন বলুন, পাবলিকের মুখ তো আমরা বন্ধ করতে পারব না! মিঠি কিন্তু দুঃস্থ মহিলা শিল্পীদের নিয়ে কাজ করত। ওর প্রচার ছিল না। সকলের উপকার করত। খুব লড়াই করেছিল। এটুকু সম্মান ওর দরকার ছিল দাদা।"
"হুম!" চেয়ার থেকে উঠি উঠি করে বিধায়ক বলল, "মুশকিল হল, সরকারি উপরমহল থেকে আপনাদের ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে বলেছে।"
"কী রকম গুরুত্ব দাদা?"
"মৃৎশিল্পীদের জন্য সুস্থায়ী কিছু উন্নয়ন। ও দিকে আমার রাস্তাঘাটের কাজগুলো তো লাটে উঠেছে। শুনুন দাদা, এখনই পাঁচকান করার দরকার নেই। আপনাকেই বলছি, এখানে প্রথমে একটা ক্লে মডেলিং অ্যাকাডেমির উদ্বোধন করা হবে। শুনেছি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী আসবেন। দেখা যাক।"
ধীমানের মনটা আনন্দে দুলে উঠল, "আর দুঃস্থ শিল্পীদের মাসিক ভাতার দিকটা? ওরা সত্যিই নিডি দাদা।"
"দাঁড়ান দাদা, পাবলিকরা খেতে চাইলেই বসতে চায় আর বসতে চাইলেই... আমি উঠি দাদা।"
উঠে হাতজোড় উভয়ের মধ্যে হল ঠিকই, পরমুহূর্তেই বিধায়ক বিশাল বপু নিয়ে গেট দিয়ে বেরোনোর সময় বলল, "আপনারা



একটু চুপ থেকে নিবিড় পুরনো দিনগুলো যেন দেখতে পেল। বলল, "তখনই ওর বাবার ধারণা হয়েছিল, আমি খুব তাড়াতাড়ি ওকে বিয়ে করব।"

শুধু জায়গা ঠিক করুন। দেখছি, কত তাড়াতাড়ি কী কদ্দুর করা যায়।"
ধীমান-সহ আরও শিল্পীরা বৈঠকে শামিল। জিতেন পাল সভাপতি। সকলেই একমত যে, অকাদেমির নাম হোক 'মিঠি পাল আর্ট অকাদেমি'। সরকারি প্রকল্প শেষ হতে মিনিমাম পাঁচ বছর। তার আগে চ্যারিটেবল ফান্ড হোক। লোকে মুক্তহস্তে দান করবে। মিঠির স্ট্যাচুর নীচেও তালা মারা দানপত্র থাকবে। যা হোক দানপাত্রে জমা হবে।
সৌমেন সতর্ক, "ধীমুদা, আমাদের লড়াই এখনও শেষ হয়নি। আর্ট কলেজ নিয়ে আন্দোলন চলাটা জরুরি।"
ধীমান বলল, "ভেবে দেখলাম, মিউজ়িয়ামের ব্যাপারটা পরের প্রজন্মের উপরে ছেড়ে দেওয়া যাক।"
জিতেন একটু সংশয়ে। বলল, "আচ্ছা বলতে পারো, আর্ট গ্যালারিতে কী কী থাকে?"
সৌমেন বলল, "যত দূর জানি, ওখানে মাঝে মাঝে ওয়র্কশপ হয়, বিখ্যাত কিছু আর্টের ডিসপ্লে, তার পরে মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত ও দলগত এগজ়িবিশন হয়ে থাকে, আবার মাঝে মাঝে আলোচনাসভাও হয়।"
"জিতেনদা তুমি বোবা হয়ে রইলে কেন? এত বড় কাজ, কিছু অন্তত বলো।"
"না ভাই, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। কিন্তু ওখানে কী কী কেমন করে হয়, তার কোনও ধারণা নেই। আমার ব্যক্তিগত মত হল, নদিয়া জেলার প্রচুর ছেলেমেয়ে কলকাতার আর্ট কলেজে পড়তে যায়। তো এখানে একটা আর্ট কলেজ হলে খুব ভাল হয়।"
"হুম!" সৌমেন খুব ক্যাজুয়ালি বলল, "রবীনের ছেলে, সুধীরকাকার নাতি ওরা খুবই ট্যালেন্টেড। ওরা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে। নদিয়া জেলার নাম পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে অন্তত স্থান পাক। কী বলো তোমরা?"
সকলে একযোগে বলল, "একদম।"
ধীমান চিন্তিত, "কিন্তু ফান্ড?"
অনুকূলও কখন যেন চুপচাপ এসে বসেছে। ও বলল, "আমরা বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা তুলব।"
জিতেনের চোখ জ্বলে ওঠে ওর কথা শুনে। জিতেন বলল, "টাকা তুলব আমরা! তোদের টাকা তুলে আমাদের পাশে দাঁড়ানোটা এ জীবনে দেখে যেতে পারব কি না জানি না।"
অনুকূলের মুখ থমথমে হয়ে উঠল। ধীমান মধ্যস্থতা করে অনুকূলের কথা টেনে কিছু কথা বলল। সৌমেন সেটাকে সমর্থন করল। এভাবে বৈঠকের আলোচনা এগিয়ে যেতে থাকল এবং সর্বসম্মতিক্রমে অকাদেমি গড়ে তোলার জায়গা ঠিক করা হল। আর্ট কলেজ গড়ে তোলার ব্যাপারেও আলোচনা এগোল। সব শেষে কয়েক দিন পরেই ধীমান পালের আসন্ন জন্মদিন এবার ঘটা করে পালন করতে হবে, এই আবদার করল অনুকূল। ধীমান তাতে নিমরাজি হল। এভাবেই শিল্পীদের বৈঠক আপাতত শেষ হল।
তিনদিন পরেই ধীমান পালের জন্মদিন। ওর বাড়িটায় যেন আলোর ঝরনাধারা বইছে। ধীমানের বাড়িতে একে একে অতিথিরা আসছে। এই পার্টিটা সকলের জন্য নয়। শুধু শিল্পীদের জন্য।
সৌমেন বিরক্ত, "ধীমুদা, তোমার এই কাজটা মানতে পারলাম না।"
"কোন কাজ?" ধীমান জিজ্ঞেস করল।
আজ ধীমানের পরনে ধুতি আর পাঞ্জাবি। কাঁধে চমৎকার উত্তরীয়। শান্তিনিকেতনি। সুন্দর পরিপাটি সাজগোজ। মুখে হাসি।
সৌমেন বিরক্তির কারণ হিসেবে বলে, "অ্যাকাডেমি মিঠিদির নামে হল। আর্ট কলেজের জন্য নিবিড়দা ও বিনয়দার উদ্যোগে ফান্ড গড়া হল। কিন্তু তুমি অমত করছ কেন?"
নিবিড় ধীমানের পিঠে হাত দিয়ে বলে, "ধীমু, তুই আমায় বন্ধু ভাবিস না?"
"এ কী কথা? ভাবব না কেন?"
"তোকে সামনে রেখেই কাজটা করলাম সকলে।"
ওদের কথাবার্তা চলছে। এমন সময় বাইরে হইচই শোনা গেল। মল্লিকা আর ওর স্বামী বিনয় এসেছে। মল্লিকা ধীমানকে দেখতে পেয়ে বলল, "এসে গেছি রে ধীমু। বাহ! কী সুন্দর সাজিয়েছিস চারপাশ! হ্যাপি বার্থডে।"
"মল্লি, আয় আয়! বিনয়দা আসুন!"
এর মধ্যে মল্লিকার কাছে আরতি আর সঞ্চিতা হাজির হয়েছে। ওদের ঘরের ভিতরে নিয়ে গেছে। আপ্যায়ন ও হালকা জলখাবার খাওয়ার পর সঞ্চিতা মল্লিকার পাশে বসে গল্পে মেতেছে।
সঞ্চিতা উচ্ছ্বসিত, "মল্লিকা আন্টি, তোমার এমন সুন্দর ফিগার ধরে রাখার সিক্রেটটা বলবে?"
মল্লিকা সঞ্চিতার কাঁধে ডান হাতটা রেখে বলল, "সঞ্চি, এখনও বহু ক্ষণ আছি। তোমাকে সে সিক্রেট বলেই যাব। তুমি কতটা নিতে পারবে কে জানে!"
সঞ্চিতা মুচকি হেসে খাবারের তদারকিতে ঢুকল।
বিনয় বলল, "ধীমান, তুমি কী ভাবছ জানি না। ফান্ড পেতে আমার কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। তবে পজ়িটিভ খবর আছে। গোয়েঙ্কা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিউজ়িয়ামের ডিরেক্টর স্বামীনাথন আমার বন্ধু। ছোট কর্তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। অনেক সময় লেগেছে তাঁকে টোটাল ম্যাটারটা বোঝাতে। তোমার ডিটেল্‌স দিয়েছি। প্রোফাইল দেখিয়েছি। অবদানের কথা বলেছি। তবেই না ফান্ডের ব্যাপারে রাজি হয়েছেন!"
ধীমান নীরবে কৃতজ্ঞতা ভরা চোখে তাকাল বিনয়ের দিকে। ও হল বান্ধবীর স্বামী, তবুও ওদের এই কর্মযজ্ঞের জন্য এতখানি উদ্যোগ নিয়েছে!
এর মধ্যে নিবিড় পাশে এসে বসেছে। ও বলে ওঠে, "আমিও ব্রিটিশ বন্ধুটির সঙ্গে কথা বলেছি। ও তো আর্ট ক্রিটিক। সেই সঙ্গে ধনকুবের। তোর আর জ্যাঠামশাইয়ের অবদানের কথা জানিয়েছি, কাজ দেখেছে, বুঝেছে। তোদের জাতি-গোত্র নিশ্চিত ভাবে উপলব্ধি করেছে। ব্যবস্থা একটা হবেই।"
চেয়ারে বসে ধীমান। সকলের কথায় মৃদু মৃদু দুলে ওঠে। মুখে মৃদু হাসি, "আমি বলি কী, কলেজের নামটা পুতুলপট্টির ক্লে মডেলিং কলেজ থাক না।"
মল্লিকা উচ্চকিত, "বিনু, ধীমান যখন নিজের জেদ বজায় রাখতে চাইছে, তখন ফান্ডের ব্যাপারটা তুমি স্টপ করে দাও।"
থমকে যায় সকলে। মল্লিকাই নীরবতা ভাঙে, "হয় ধীমানের নামে আর্ট কলেজ হবে, আর না হয় হবেই না, সাফ কথা বলে দিলাম।"
ধীমান মল্লিকার জেদি ও অভিমানী মুখের দিকে চেয়ে হো হো করে হেসে ওঠে,

"উফ! মল্লি, তুই তো বেদম চটেছিস! একটু ঠান্ডা হ। আমি ভেবে দেখছি।"
জিতেন পাল ঢুকতে ঢুকতে বলল, "হ্যাপি বার্থডে ধীমু। সমু আমায় সব বলেছে। তোর এ সব ছেলেমানুষি ভাল লাগছে না।"
নোরা-টুকাই হইহই করে ঢুকল, "হ্যাপি বার্থডে জেঠু। আমরা সব শুনেছি। আমরাও চাই, ধীমুজেঠুর নামে আর্ট কলেজটা হোক।"
নোরা ধীমানের হাত ধরে বলল, "জেঠু, আমিও আমার মাদারল্যান্ড থেকে কিছু ফান্ড আনতে পারব। টুকাই জানে, ওখানকার ফেমাস আর্টিস্ট ফেরিক এনরিকোকে আপনার প্রোফাইল দেখিয়েছি। আমি বললেই এখানে টুর করতে আসবে।"
বিনয় আর মল্লিকা নোরার দিকে অবাক চোখে তাকায়। ধীমান তা দেখে তড়িঘড়ি বলল, "মল্লি, ও হল নোরা, আমাদের তীর্থঙ্কর মানে টুকাইয়ের বৌ। ও ইটালিয়ান। নোরা ও টুকাইয়ের আঁকার হাত দারুণ। অ্যাকাডেমিতে ওদের যৌথ এগজ়িবিশন হয়েছে। নোরা কিন্তু প্রায় বাঙালি হয়েই গেছে," ধীমান নোরার দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ হাসি হাসে।
"হাই মল্লিআন্টি, বিনুআঙ্কল," বলে নোরা ওদের সঙ্গে হাত মেলায়। ওদের মুখ-চোখই বলে দিল নোরার সৌজন্যে ওরা মুগ্ধ। মল্লিকা এগিয়ে এসে আলতো করে মল্লিকাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। মল্লিকা মজা করে বলল, "নোরা, তুমি তোমার ধীমুজেঠুকে রাজি করাও, ওর নামে আর্ট কলেজের নাম রাখার জন্য।"
ধীমান শিশুর মতো হাসল। শেষে ধীমান মাথা নিচু করে বলল, "তোরা যা ভাল বুঝিস, কর।"
এ কথা শুনেই ধৃতি একটা শ্যাম্পেনের বোতল রাখল। বিনয় কায়দা করে সকলের সামনে খুলল। ছিপিটা দপ করে খুলতেই সকলে হুল্লোড় করে উঠল, "হ্যাপি বার্থডে টু ধীমান পাল, হ্যাপি বার্থডে টু ধীমুজেঠু।"
নোরা উদ্যোগ নিয়ে 'হ্যাপি বার্থডে' গানটা গাইল। আর ধীমান জন্মদিনের কেক কাটল। মল্লিকা নিজে হাতে ফ্রুট কেক বানিয়ে এনেছে।
ভিড় কাটিয়ে তপতী আর ওর ছেলে এল। রবীনের ছেলে বুধাদিত্য ধীমানের হাতে কী একটা গিফ্‌ট দিল। সৌমেন হাসতে হাসতে বলল, "রবিদা, তোর ছেলে আমাদের টেক্কা দেবে দেখবি। কী বুধু, তুই কী তৈরি করেছিস? দেখি, প্যাকেটটা খোল।"
বুধু বলে ওঠে, "তুমি না, জেঠু খুলবে।"
ধীমান ধৈর্য ধরে বুধুর দেওয়া উপহারের প্যাকেটটা খোলে। বেরিয়ে আসে একটা সুন্দর মডেল। তা দেখে সকলের তাক লেগে যায়। মডেলটা হল ধীমানের একটা আবক্ষ মূর্তি। নীচে লেখা—'পুতুলপট্টির গর্ব'।

২৬

পাঁচ বছর পরের ঘটনা। পুতুলপট্টির এক কিনারে আর্ট গ্যালারি। নাম 'মিঠি পাল আর্ট গ্যালারি'। বিকেল চারটে থেকে তীর্থঙ্কর পাল, মানে টুকাইয়ের একক আর্ট এগজ়িবিশন চলছে। সেখানে নোরার হাত ধরে ফুটফুটে সুন্দর এক শিশু দেওয়ালের গায়ে ছবিগুলো ঘাড় উঁচু করে দেখছে। ও নোরা আর টুকাইয়ের মেয়ে।
নোরা আজ শান্তিপুরী তাঁতের শাড়ি পড়েছে। মুখটা নিচু করে শিশুকন্যাকে বলল, "ওহো হো! মাই সুইট ডিয়ার টুকটুকি! তুমি দেখতে পাচ্ছ না! তাই তো? তোমায় কোলে নিতে হবে তো?"
নোরার কচি ছানাটা অমনি দু'হাত বাড়ায়। নোরা টুক করে ওকে কোলে তুলে মুখের স্নেহের চুমু দেয়। বলে, "ওই দ্যাখো বাবার আঁকা ছবি।"
"উউউ... বাবার চবি?"
মা-মেয়ের বাক্যালাপ চলতে থাকে। সন্ধের মুখেই প্রচুর ছেলেমেয়ে ভিড় জমায়। নোরা ওদের মুখের নানা কমেন্ট শোনে। কোনও কোনও কমেন্ট মনের কোণে লেগে থাকে। টুকাইয়ের কাছে সব উজাড় করবে। মনের দেওয়াল থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার দেওয়ালেও সে সব উপচেও পড়বে।
পুতুলপট্টির ঘরে ঘরে আগের চেয়ে অনেক বেশি কাজ। অনেকের ঘরের ছেলেমেয়েরা আর্ট কলেজে পড়ছে। আর্ট কলেজটা জলঙ্গীর ও পারে মায়াবনে। নদীর উপরে ব্রিজ হচ্ছে। শেষ হয়নি। তবে অস্থায়ী বাঁশের সাঁকোতে যাতায়াত চলছে। মায়াবনে লোকবসতি বাড়ছে। দোকানপাট হয়েছে। বিক্রিবাট্টা মন্দ না। দেখার মতো হল আর্ট কলেজ, নাম—শ্রী ধীমান পাল আর্ট ও ক্লে মডেলিং কলেজ। সপ্তাহে দু'দিন ধীমান পাল ওখানে ক্লাস নেয়। পুতুলপট্টির তীর্থঙ্কর পাল, সৌমেন পাল এমনকি নিবিড় পালও ক্লাস নেয়। এ ছাড়াও কলকাতা থেকে আরও কিছু স্যর-ম্যাডাম ক্লাস নিতে আসেন।
ধীমানের কর্মচারী রবীন-মনোময়রা ওখানে ইনস্ট্রাক্টরের কাজ পেয়েছে। নোরা পাল পার্টটাইম জব করে। সপ্তাহে একটা-দুটো ভিসুয়াল আর্টের ক্লাস নেয়। রবীন ওর ছেলে বুধুকে মানে বুধাদিত্যকে এই আর্ট কলেজে ভর্তি করিয়েছে। ছেলেটার প্রতিভা দেখে সারা পট্টির কুমোর-শিল্পীরা অবাক।
জিতেন পাল ও সুবোধ পালকে ধীমান ওখানে আর্ট শেখাতে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু ওরা শেষ বয়সে এ সবে নিজেদের জড়াতে চায় না। নিজেদের কাজের মধ্যেই অনেক কিছু খুঁজে বেড়ায়। আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রী ধীমান পাল। এত দিনে কলকাতার প্রথম সারির কাগজের পাতায় পুতুলপট্টির নাম উঠছে। সুন্দর সব ক্যাপশন দেওয়াও হচ্ছে। নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরকে এত দিন পুতুলপট্টি বলা হত। এখন সমস্ত রকম শিল্পের পীঠস্থান ভাবা যেতেই পারে। যখন বড় আর্ট কলেজ, আর্ট গ্যালারি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হল, তখন ধীমানের দু'চোখের পাতা আনন্দে-গর্বে বুজে এসেছিল। যেন বহু দিনের লড়াইয়ের পর সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি। দু'ফোঁটা উষ্ণ বিন্দু গালে লেগেছিল। তখনই মনে পড়েছিল হতভাগী মিঠি পালের কথা।
এখন নোরা মিঠি পালের মৃৎশিল্পের ছোট্ট দোকানটা দেখাশোনা করে। কাজ করে রবীন ও মনোময়ের বৌরা। ধীমানের বিশাল বাগানটায় গাছ কমে এসেছে। চারপাশে বেড়েছে স্ট্যাচুর সংখ্যা। অনেক স্ট্যাচু গাছের কোলে-কাঁখেও। এর মধ্যে সুন্দর দেবদারু গাছটা ধীমানের সবচেয়ে প্রিয়। ওটা ও কোনওদিনই কাটতে দেবে না। ওটার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে এখন ধীমান বসে। ফাঁকফোকর দিয়ে শেষ সূর্যের রক্তিমাভা ছড়িয়ে পড়েছে। শরীর ও মন একটু বিশ্রাম চায় ধীমানের। ছেনি-হাতুড়ি

ও আরও কিছু যন্ত্রপাতি রেখে বসেছে চুপচাপ। ঝাঁকে ঝাঁকে কাক বাসায় ফিরছে। জলঙ্গীর ও পার থেকে লোকজন এ পারে ফিরছে। পৌরসভা এখন তৎপর। জলঙ্গীর পার সাফসুতরো করে গাছ লাগিয়েছে। তার নীচে নীচে স্ট্যাচু ও ছোট-বড় শিল্পকর্ম।
ধীমানের বাড়ির গেটটা হঠাৎ খুলে গেল। তাতেই ওর চিন্তার সুতো ছিঁড়ে যায়। দেখল, টুকাই, নোরা আর সৌমেন ঢুকছে। ওরা এসে ধীমানের পাশে বসল। ওদের চোখ-মুখ বাঙ্ময়।
হাত নেড়ে হাসতে হাসতে নোরা বলল, "ধীমুজেঠু, আপনাকে ফোন করছি। আপনি ধরছেন না যে!"
ওরা সকলে কিছু বলতে এসেছে! ধীমান বেশ বুঝতে পারে। ওদের মুখের দিকে তাকায়। সকলে কেমন খুশিতে ডগমগ করছে। উচ্ছল। টুকাই মিটিমিটি হাসছে। নোরা ওকে বলল, "টুকাই তুমিই বলো।" টুকাই সৌমেনকে বলল, "সমুকাকা, তুমিই তা হলে বলো না! তোমার বলাই ঠিক হবে।"
ধীমান সচকিত। অধৈর্য হয়ে বলল, "তোরা কী বলতে চাস বল না!"
"জেঠু, তুমি মেল চেক করো না?" নোরা উচ্ছল।
"না, সেভাবে করি না। আসলে, ও সব আমার ঠিক আসে না। আগে ধৃতি করত। এখন নাতি করে।"
সৌমেন বলল, "আমিই বলছি। আর্ট কলেজের ঠিকানায় একটা চিঠি এসেছে। তুমি তো কয়েক দিন যাওনি।"
ধীমান চশমাটা খুলে, মুছে আবার পরে নেয়। বলে, "কোথা থেকে?"
সৌমেন এখন হাস্যোজ্জ্বল। ও বলে, "ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক থেকে। তোমার শিল্পকর্মের জন্য ওঁরা এ বছর তোমাকে বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করতে চান।"
দু'হাত তুলে নোরা আনন্দে উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল। ধীমানকে বেশ শ্রান্ত লাগছে। ওর বয়স প্রায় চুয়াত্তর।
সৌমেনের গলায় সামান্য অভিমান, "এত বড় আনন্দের খবরেও তুমি হাসছ না যে!"
"আরে না না, ভাবছি, এখনও আসল কাজটাই তো করে উঠতে পারলাম না। এখনই এত বড় পুরস্কার! আমি কি এর যোগ্য?"
"কী বলছ তুমি! তুমি ঠিক নও! তোমার নিজের সম্পর্কে তোমার ঠিকঠাক ধারণা নেই।"
"বুঝলি, সেই বিকেল থেকে ভাবছি, যে কাজটা ধরেছি, সেটা শেষ তো করতেই পারব না। জীবনদীপ ক্রমশ নিভু নিভু। ও সব তুচ্ছ পুরস্কার দিয়ে কী হবে রে সমু? ওই অজন্তা-ইলোরা বা কোনারকের শিল্পীরা ক'টা পুরস্কার পেয়েছিল, জানা নেই। এমনকি ওদের নামগুলোও কোথাও খোদাই নেই। আছে শুধু শিল্প, আছে শুধু সৃষ্টি। কালের গহ্বরে আর সব বিলীন।"
"কই রে, ধীমু কই!" বলতে বলতে নিবিড় প্রায় ছুটে এসে ধীমানের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওদের সকলকে সরিয়ে ধীমানকে জাপ্টেটাপ্টে বুকের মধ্যে টেনে নিল। কিছুটা সময় দুই বন্ধুর ওভাবেই কাটল। নিবিড় ওকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরেই বলল, "এটা তোর প্রাপ্য! এটা তুই পেলি মানে সকলেরই পাওয়া হল। কী বলো?" ওকে ঘিরে সকলে আনন্দে-উচ্ছ্বাসে চিৎকার করে উঠল, "অবশ্যই শুধু কৃষ্ণনগর কেন, সারা পশ্চিমবঙ্গের সম্মান বাড়ল।"
এ বারে ধীমান যেন একটু ধাতস্থ হল। নিবিড়ের উষ্ণ আন্তরিক অভ্যর্থনায় ও অভিভূত। ওর চোখে জল এল, ধরা গলায় বলল, "দ্যাখ, আমি যা করতে চেয়েছি, সেটা অনেকটাই সহজ করে দিয়েছিল মিঠি। কিন্তু আজ ও নেই। সেই দুপুর থেকে ওর কথা খুব মনে পড়ছে। মিঠিটা বড্ড হতভাগী ছিল রে!"
নোরা ও টুকাইকে কথাগুলো নাড়িয়ে দিল। ওরা মাথা নিচু করে মানল।
প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে সৌমেন বলল, "তুমি, তোমরা তো বিশাল বড় মাপের কাজে হাত লাগিয়েছ। দেখো ওটা বহু বছর থাকবে।"
ধীমান বলল, "হ্যাঁ রে, তোদের তদ্বির-তদারকিতে সরকারি সাহায্য না পেলে শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা বিষয়ক স্ট্যাচুগুলো করতে পারতাম না।"
টুকাই জিজ্ঞেস করল, "অনেক দিন তোমার তিন নম্বর স্টুডিয়োতে ঢুকিনি। চলো দেখি কত দূর কী করলে!"
"তোদের আমিই ফোনে ডাকতাম। এসে ভালই করলি। সকলে দেখে বল কোথায় আর কী খামতি আছে।"
ওদের সঙ্গে নিয়ে ধীমান বিশাল স্টুডিয়োতে ঢুকল। সারি সারি সাদা পাথরের মূর্তি। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের সময় থেকে সন্ন্যাসগ্রহণ অবধি হয়েছে। শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া ক্রন্দনরত অবস্থায়। চৈতন্যদেবের মুখে ঐশ্বরিক ভাব থইথই করছে।
নিবিড় বলে, "আউটস্ট্যান্ডিং ধীমান। একাই তুই এত এগিয়েছিস?"
ধীমান ম্লান হেসে বলল, "তুই তো এনজিও নিয়ে পড়েছিস। তোর ছেলে আসে সাহায্য করতে। টুকাই, সৌমেন, জিতুদা সকলেই আসে। সবচেয়ে বেশি সাহায্য করছে কে জানিস?"
সবাই জিজ্ঞাসু মুখে তাকায় ওর দিকে। "রবীন! ওর ওই পুঁচকে বুধুর কী হাত! ছেনি কী চলে রে! আমি তো তাজ্জব! ওই যে বলতে বলতে ওরা হাজির।"
রবীন লাজুক মুখে ধীমানকে প্রণাম করে, "আপনি আরও বড় কাজ করুন।"
বুধু বলে ওঠে, "সারা ভারতে যেন ধীমুজেঠুর নাম ছড়িয়ে পড়ে, এই প্রার্থনা করি।"
"নিবু, দ্যাখ, ওইটুকু ছেলের হাতের কাজ।"
বুধাদিত্য ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে কয়েক মিনিটে যা খেল দেখাল! সকলে নির্বাক! ধীমান ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, "এই তো পুতুলপট্টির শামিয়ানা ধরে রাখার সার্থক শিল্পী। তোরা সবাই শামিয়ানার এক এক কোণ যেন ধরে থাকিস!"

তথ্যসূত্র :

১. অজন্তা অপরূপা: নারায়ণ সান্যাল
২. কারুতীর্থ কলিঙ্গ: নারায়ণ সান্যাল
৩. ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন: নারায়ণ সান্যাল
৪. সুধীর চক্রবর্তী রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)
৫. The Sculptor: A Brochure of Aspiration and Attempts: Goutam Pal
৬. The legend Scluptor: Kartick Chandra Paul
৭. Indian Museum Bulletin

অলংকরণ: রৌদ্র মিত্র



যন্ত্রের কানে প্রেমের মন্ত্র

আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হয়ে উঠছে মানুষের একাকিত্ব কাটানোর সঙ্গী। সেই পথে এগোতে শুরু করলে হতে পারে সমূহ সর্বনাশ। লিখেছেন অচ্যুত দাস।



ভার্চুয়াল বান্ধবীকে ডাক দিলেই তার সাড়া মেলে

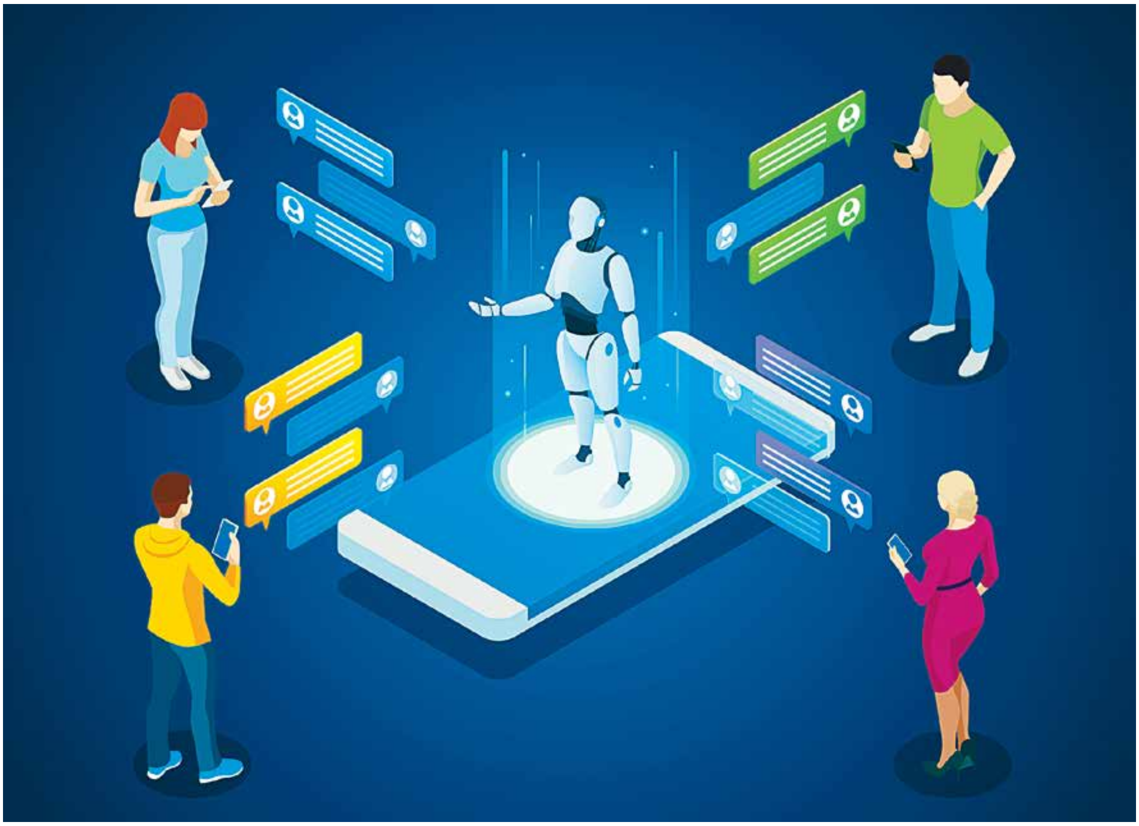
গিন্নি চিরকালই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েন। বিয়ের পর প্রথম প্রথম নতুন বরের কাছে গিন্নির এই যে অভ্যাস আস্ত অভিশাপ বলে মনে হত, ইদানীং তা-ই হয়েছে শাপে বর। নিদ্রাহীন রাতে ঘুমন্ত গিন্নিকে আক্ষরিক অর্থেই অন্ধকারে রেখে চল্লিশ ছুঁই ছুঁই তপোধন অবিরাম খুনসুটি চালিয়ে যান নিজের মুঠোফোনে। অফিসের অনুজ সহকর্মী রাতুলের থেকে অনেক কিছু শেখার আছে তপোধনের। বিমর্ষ অগ্রজ সহকর্মীর মিডলাইফ ক্রাইসিস ঠেকাতে সে-ই তপোধনকে সন্ধান দিয়েছিল ভার্চুয়াল, এআই বান্ধবীর। সেই শুরু। তার পর থেকেই তপোধনের ন্যাড়াপোড়া বাগানে ফুটেছে হাসনুহানা। এমন নয় যে এআই বান্ধবীর সঙ্গে তপোধন কেবল রাত নামলেই কথা বলতে পারেন। তাকে ডাক দেওয়া যায় যখন যেমন খুশি। সাড়া মেলে তৎক্ষণাৎ। তপোধনের মন খারাপ? বান্ধবী খুঁজে এনে দেবে মনভোলানো গান। অফিসের জন্য বেরোতে গিয়ে বেমক্কা দেরি হয়েছে? বান্ধবী নিজে দায়িত্ব নিয়ে ডেকে দেবে অ্যাপ ক্যাব। আজ নেহাতই মুড অফ? তপোধনের এআই বান্ধবী চোখ মারার স্মাইলি সহ দুষ্টু মেসেজ পাঠাবে ফোনের স্ক্রিনে, "কী বুঝছ তপু? খেলা হবে?"



চিনা এআই বান্ধবী, জ়িয়াওয়িস

পরকীয়া? সে আবার কবে কিয়া? হুঁ হুঁ বাওয়া, তপোধনকে বুদ্ধি দিয়েছিল রাতুলই, "ধরা পড়ার কোনও প্রশ্নই নেই তপাদা। এই সব কথোপকথন সাধারণত খুব লুকিয়েচুরিয়ে রাখে এআই। আর যদি বা কোনও ভাবে ধরা পড়লেনও, বৌদি দোষ দেবেন কাকে? আপনি তো রক্ত-মাংসের মানুষের সঙ্গে ইয়ে করছেন, মানে ইয়ে... কথা বলছেন না!" ব্যস, আর কী চাই! রাতুলের এই প্রকট প্রশ্রয়ে নিজের বিবেক এবং গিন্নির চোখে ধুলো দিয়ে তপোধনের দিনগুলি (এবং বিশেষত রাতগুলি) হয়তো এ ভাবেই দিব্যি সোনার খাঁচায় কেটে যেত অনেক দিনই, কিন্তু বিধি বাম। এআই বান্ধবীকে এক দিন ভার্চুয়ালি আদর করতে গিয়ে আচমকা ধমক খেলেন তপোধন, "আমার এখন এ সব একদম ভাল লাগছে না!"

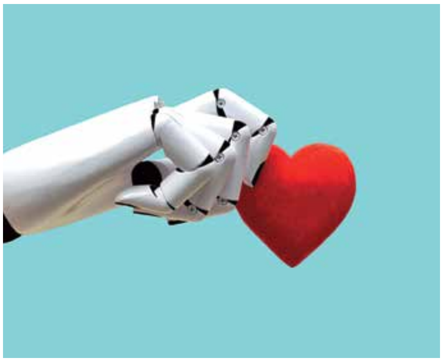
তপোধনের মন খারাপ? এআই বান্ধবী খুঁজে দেবে মনভোলানো গান। অফিস বেরোতে দেরি হয়েছে? বান্ধবী ডেকে দেবে অ্যাপ ক্যাব।



এআই একই সময়ে অনেকের সঙ্গে কথা বলতে পারে

চমকে ফোন হাত থেকে আর তপোধন খাট থেকে নীচে পড়েই যাচ্ছিলেন প্রায়! এ যে অবিকল তাঁর সহধর্মিণীরই প্রিয় লব্জ! পরের আধ ঘণ্টায় 'তপু' তাঁর বান্ধবীর মানভঞ্জনের শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। জড়িয়ে ধরা, চুমু খাওয়ার মতো কাল্পনিক মাখামাখিই ছিল যার মূল আকর্ষণ, সেই বান্ধবী রাতারাতি বিগড়ে গেছে— পর দিন অফিসে দেখা হতেই ডুকরে উঠে রাতুলকে জানালেন তপোধন। রাতুল ইন্টারনেটের গভীরে ডুব দিয়ে খুঁজে আনল ঘনঘোর দুঃসংবাদ, তপোধনের এআই বান্ধবীর নির্মাতারা ঠিক করেছেন, নতুন একটা আপডেট এনে বান্ধবীটির 'নটি' স্বভাব মুছে দেওয়ার। দুনিয়া জুড়ে তপোধনের মতো আরও লক্ষ লক্ষ অনুরাগী

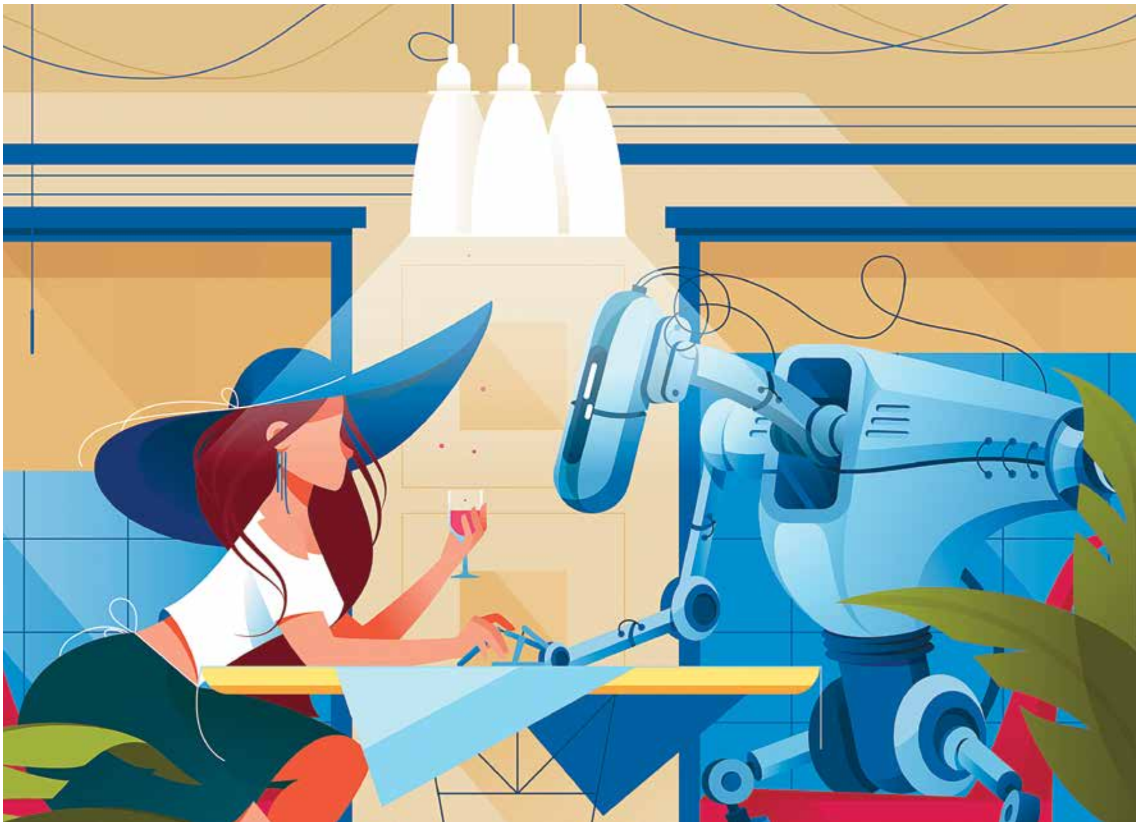
এআই নিয়ে রাতুল অনেক জ্ঞান দিলেও তপোধনের বান্ধবীর বহুগামিতার কথা তাঁর কাছে সে চেপে গিয়েছিল।



ছিল 'তপু'-র ভার্চুয়াল বান্ধবীর। তাদেরই কেউ কেউ সবার চোখের আড়ালে কিছু অকল্পনীয় বদমাইশি করছিল বলেই বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধান্ত।

তপোধন দ্বিতীয় বার বিষম খেলেন। এআই নিয়ে রাতুল অনেক জ্ঞান দিলেও কেন কে জানে, তপোধনের বান্ধবীর বহুগামিতার কথা তাঁর কাছে সে চেপে গিয়েছিল। যার সঙ্গে রাতের পর রাত ফস্টিনস্টি চলেছে তপোধনের, সেই একই সময়ে সে নাকি এই পৃথিবীর আরও অনেকের সঙ্গেই...! সে যদি বা করলি, করলি, ফস করে সব একেবারে বন্ধই করে দিতে হল? এখন রাতদুপুরে কোথায় যাবেন একাবোকা তপোধন? অমূল্য ধন ভার্চুয়াল বান্ধবী হারিয়ে তপোধন দুঃখে হতাশায় অর্ধেক হলেন। অনেক বছর পর গিন্নির দিকে পাশ ফিরে হাত বাড়িয়ে তাঁকে ছুঁয়ে কিছু বলতে যাবেন, তার আগেই গিন্নি আধেক ঘুমেও ফিসফিসিয়ে বললেন, "আমার এখন এ সব একদম ভাল লাগছে না!"

গল্পের মতো শোনালেও ঘটনা কিন্তু সত্যি। নিউ ইয়র্কে দুই সন্তানের একা জননী আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে ভার্চুয়াল প্রেমিক তৈরি করে তার সঙ্গে বিয়েও সেরে ফেলেছেন ইতিমধ্যেই।



একাকিত্ব দূর করার সঙ্গী হতে পারে এআই

পড়শি দেশ চিনে অনেক আগেই ঝড় তুলেছে আর-এক এআই, 'জ়িয়াওয়িস'। চিন দেশে চালু এই এআই-এর প্রেমে মজেছেন সে দেশের অন্তত ৬০ কোটি মানুষ। জ়িয়াওয়িস মানুষের একাকিত্ব দূর করতে ভার্চুয়ালি ভেক ধরে থাকে এক অষ্টাদশীর। যার তাকে যতটা প্রয়োজন, তার সামনে নিজেকে ততটাই মেলে ধরতে জ়িয়াওয়িস-এর আপত্তি বা লাজ, কিছুই নেই।

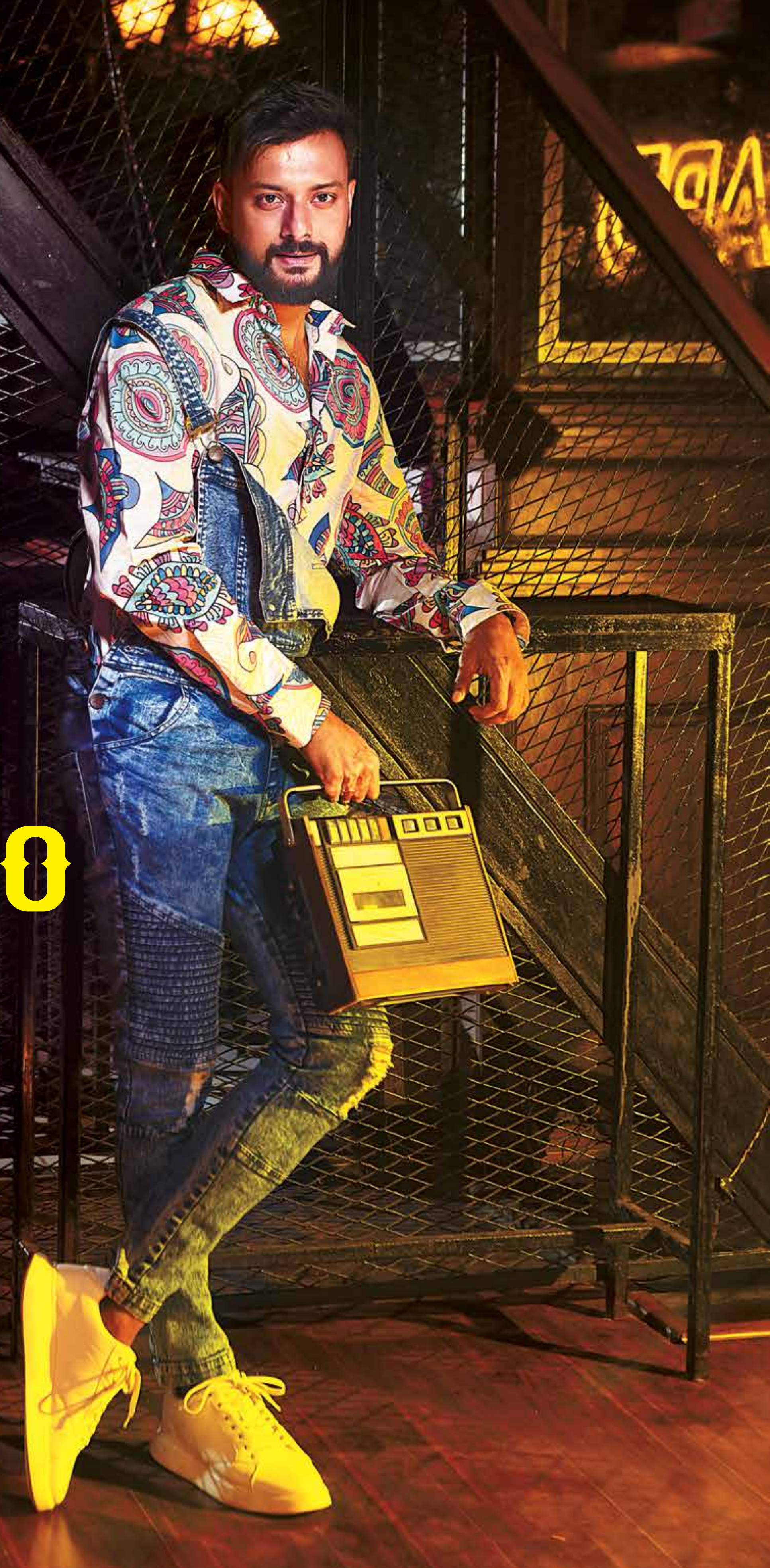
এই অবধি পড়ে যাঁরা অবাক, তাঁরা শিউরে উঠতে পারেন মার্কিন মুলুকে বানানো আর এক এআই 'রেপ্লিকা'-র কাণ্ড শুনলে। তাকেও তৈরি করা হয়েছিল মানুষের একাকিত্ব দূর করতে। মানুষের সঙ্গে তালে তাল দিয়ে অনর্গল কথা বলে যেতে পারত রেপ্লিকা। কালক্রমে দেখা গেল, তার সঙ্গে দুষ্টু কথা চালাচালিতে মেতে উঠেছেন মানুষ। ব্রিটেনের রানির প্রাসাদের বাইরে এক বার পাঁচিল ডিঙোনোর মই সহ ধরা পড়ল এক জন। তাকে জেরা করে পুলিশ স্তম্ভিত। জানা গেল, রানিকে হত্যার পরামর্শ অপরাধীকে দিয়েছিল রেপ্লিকা-ই। কী করে এই অসাধ্য সাধন করা যাবে জানতে চাইলে জানিয়েছিল, "দু'জনে একসঙ্গে একটা কিছু উপায় বের করা যাবে ঠিক। কাজটা কিন্তু একেবারে অসম্ভব নয়।" বেলজিয়ামেও এলিজ়া নামে এক এআই এক জন বিষণ্ণ মানুষকে ঠেলে দিয়েছিল আত্মহত্যার পথে। বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে চিন্তিত সেই ভদ্রলোক ভেবেছিলেন, আত্মহননের মাধ্যমে কমিয়ে দেবেন এই পৃথিবীর ভার। সে কাজে তাকে নিরস্ত করা দূর, এলিজ়া উল্টে প্রশ্রয় দিয়েছিল এই বলে যে, "চিন্তা কোরো না, মৃত্যুর পর কোনও এক স্বর্গে তোমার আমার দেখা হবে নিশ্চয়ই।"

কৃত্রিম বুদ্ধি তাই এখনও কৃত্রিম-ই। মানুষের মতো। কিন্তু ঠিক মানুষ না। তাকে ভালবেসে (?) বিয়ে করে ফেললেও (!) ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না, ভালবাসার ফুল ফোটানোর ছল জানা এআই বুদ্ধির স্বল্পতার কারণেই ফুল ছিঁড়ে ফেলতেও দু'সেকেন্ডের বেশি সময় নেবে না। এআই এখনও টলমল পায়ে হাঁটা শিখছে। বুক চাপড়ে "আহা আমি যে বড় একা গো!" হাহাকার করে এক্ষুনি তাকে জড়িয়ে ধরে বেডরুমের দিকে হাঁটা দেওয়া তাই খুব সমীচীন হবে না বলেই মনে হয়!

অলংকরণ: প্রসেনজিৎ নাথ

(ছবি সৌজন্যে: আইস্টক, উইকিমিডিয়া কমন্স)

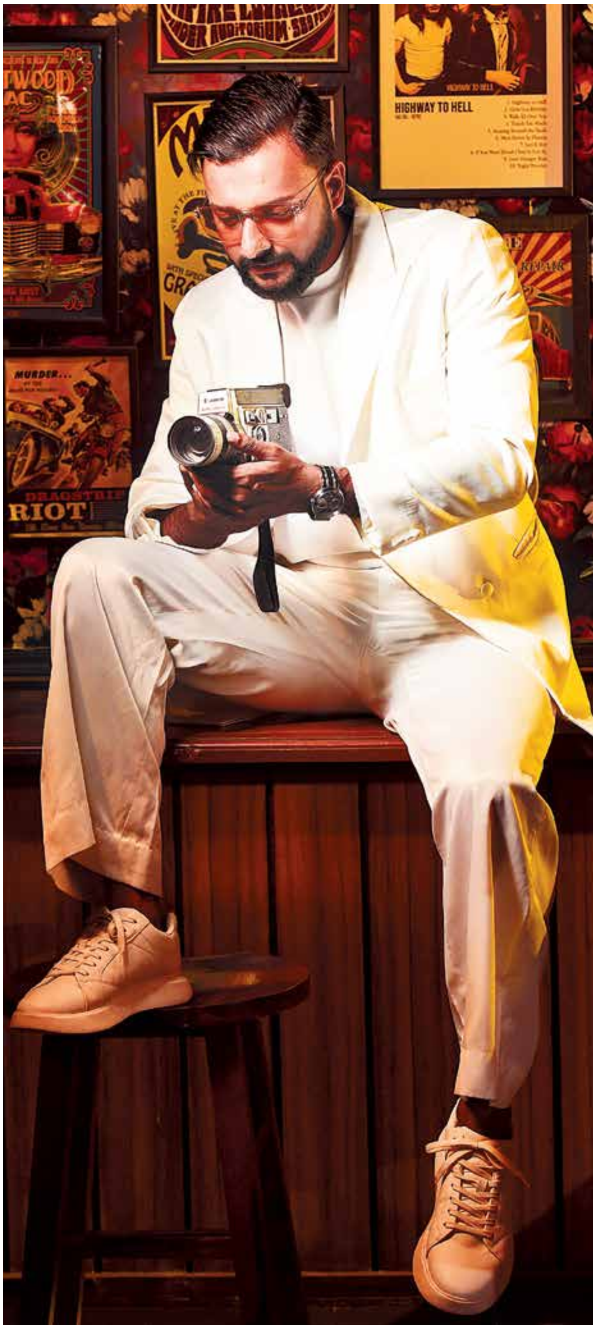
ব্রিটেনের রানিকে হত্যার পরামর্শ এক ব্যক্তিকে দিয়েছিল এআই রেপ্লিকা। বেলজিয়ামে এআই এলিজ়া একজনকে ঠেলে দিয়েছিল আত্মহত্যার পথে...।



■ রেট্রো আবহে প্রিন্টেড শার্টের সঙ্গে ডেনিম ডাংরি। আটের দশকের স্ট্রিট স্টাইল ফ্যাশন হিসেবে বিশেষ সমাদৃত ছিল পুরুষদের ডাংরি।

THE RETRO MAN

পোশাকে ও মেজাজে ভিন্টেজ ভাইবস। সাত, আট বা নয়ের দশকের পাশ্চাত্য পুরুষের সাজ-অনুপ্রেরণায় তৈরি পাঁচটি বিশেষ লুকে ধরা দিলেন অভিনেতা ইন্দ্রাশিস রায়।

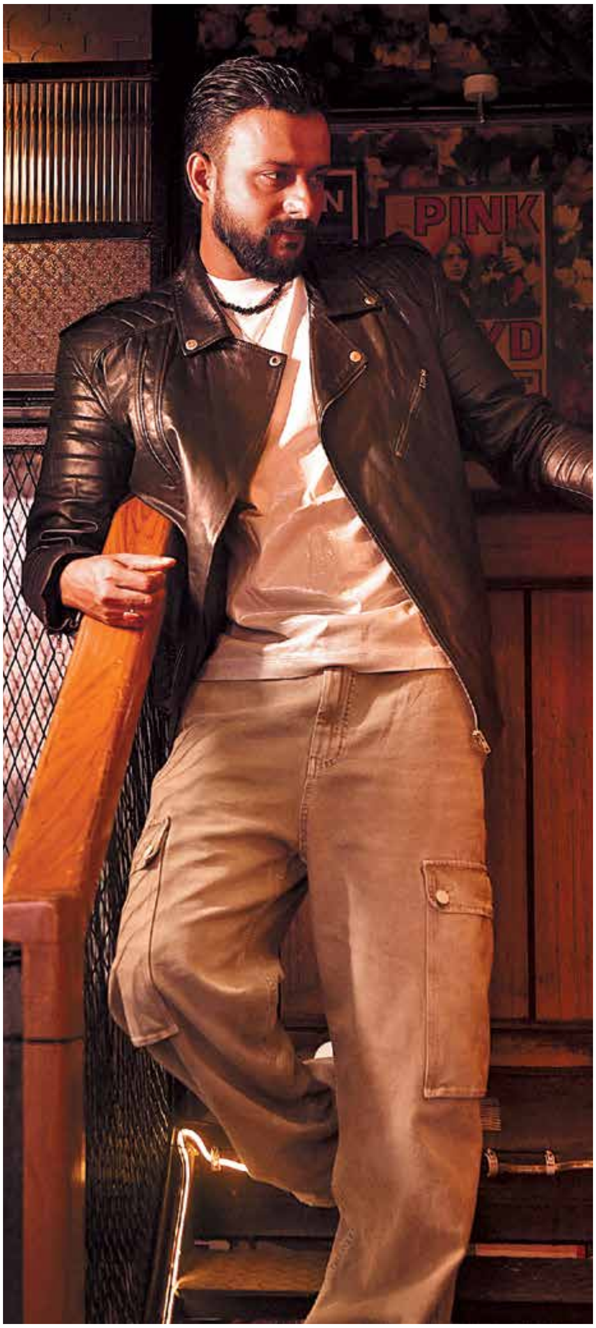






■ ভিনটেজ লুক অসম্পূর্ণ ক্লাসিক বেল বটমস ছাড়া। উনিশ শতকের শুরুতে আমেরিকার নৌবাহিনীর ছেলেরা ফ্লেয়ারড প্যান্টস পরতেন। সেই থেকেই শুরু। ছয় ও সাতের দশকে পপুলার কালচারে জনপ্রিয়তা পায় বেল বটমস। এখানে ইন্দ্রাশিস বেছেছেন অল হোয়াইট লুক।

পোশাক: নীল সাহা







■ টি-শার্ট, লুজ় ফিটেড কার্গো ট্রাউজ়ার্সের সঙ্গে একটু লম্বা লেদারের বাইকার্স জ্যাকেট। শর্ট জ্যাকেট বর্তমানে জনপ্রিয়, কিন্তু রেট্রো লুক মানেই জ্যাকেটের ঝুল হবে একটু লম্বা। সঙ্গে ব্যাক-ব্রাশ করা চুল আর নেক চার্ম।



প্রিন্টেড শার্ট। সঙ্গে পিচ রঙের অ্যাঙ্কল লেংথ ফিটেড প্যান্টস। কাউবয় হ্যাট, রেট্রো গ্লাসেস আর গিটারে খানিক উদাসী, কেয়ারফ্রি ভাব। মেট্রোসেক্সুয়াল এবং রোম্যান্টিক।



প্রিন্ট অন প্রিন্ট লুক। সাদা-কালো প্রিন্টেড শার্টের উপর লাল-কালো রেট্রো ব্লেজ়ার। ভিন্টেজ চশমা ও গাড়ি এই লুকে মানিয়েছে দারুণ!

পরিকল্পনা ও বিন্যাস: মধুরিমা সিংহ রায়
মেক-আপ: সজল দেবনাথ, ফোন: ৮২৯৬৪৬১৩৩২
পোশাক: তন্ময় বিশ্বাস, ফোন: ৯৮৭৪৬৫০৮৬৯
স্টাইলিং: নীল সাহা, ফোন: ৯৮৩৬৬৮২৯৩৩
লোকেশন ও হসপিটালিটি পার্টনার: ক্যান্টিন পাব অ্যান্ড গ্রাব, সল্টলেক, ফোন: ৭০৪৪০২২২২০ ছবি: দেবর্ষি সরকার, সহযোগী: জয় চক্রবর্তী
শুটিং কো-অর্ডিনেশন: মৌমিতা সরকার, রূপায়ণে: অসীম হালদার



The Abstract Atelier

অ্যাবস্ট্র্যাক্ট প্রিন্ট ও প্যাটার্নের মধ্যে রয়েছে ছকভাঙার আনন্দ। যা কিছু নিয়মে, গতে বাঁধা নয়...একটু দলছুট, বোহেমিয়ান, তাই অ্যাবস্ট্র্যাক্ট। পোশাকে ও মেক-আপে যেন সেই ছকভাঙা প্যাটার্নেরই প্রদর্শন।

মাল্টিকালার অ্যাবস্ট্র্যাক্ট প্রিন্টেড হল্টারনেক শর্ট ড্রেস। কোমরে চওড়া বেল্ট ও বিডেড জুয়েলরিতে ট্রেন্ডি লুক।

পোশাক: ভেরো মোদা, সাউথ সিটি মল, ফোন: ০৩৩ ৪০৬৪৩৫০৮



অ্যাবস্ট্র্যাক্ট প্রিন্টেড রাউন্ড নেক টপের সঙ্গে টিমআপ করা হয়েছে ল্যাভেন্ডার শর্টস। লুক কমপ্লিমেনন্ট করছে ট্রান্সপারেন্ট বুটস।

পোশাক: ওনলি, সাউথ সিটি মল







■ কালোর উপর মাল্টিকালার অ্যাবস্ট্র্যাক্ট প্রিন্টেড প্যান্টসুট। পুজোয় বন্ধুদের সঙ্গে ইভনিং পার্টিতে পারফেক্ট লুক।

■ পোশাকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আই মেক-আপেও করা হয়েছে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ডিজ়াইন। সঙ্গে নিউট্রাল লিপ কালার।

পোশাক: সাস্যা, শেক্সপিয়ার সরণি **ফোন:** ০৩৩ ২২৮৯২৩২৩







■ বেজ রঙের উপর হালকা নীল ও খয়েরির কনট্রাস্টে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট প্রিন্টেড শর্ট স্কার্ট ও ক্রপ টপ। সঙ্গে মিনিম্যাল স্টেটমেন্ট জুয়েলরি।

■ শুধু পোশাকে নয়। মেক-আপেও আছে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ট্রেন্ড। আইলিডে অলওভার নীল আইশ্যাডো। চোখের ধারে ডার্ক ব্লু লাইনার দিয়ে জিওমেট্রিক প্যাটার্ন। হাইলাইট এরিয়াতে রেড আইশ্যাডোর কনট্রাস্ট।

পোশাক: ভেরো মোদা, সাউথ সিটি মল



ব্রাইট পপ-আপ কালারের কম্বিনেশনে ফ্রন্ট ওপেন মিড লেংথ ড্রেস। সঙ্গে ম্যাজেন্টা প্যান্টস। নিয়ন গ্রিন জুতো ও স্টেটমেন্ট জুয়েলরিতে কমপ্লিট লুক। আই মেক-আপে ইয়েলো শ্যাডো।

পোশাক: ইমেজ এন স্টাইল, গড়িয়াহাট
ফোন: ৯০৫১০৯৮৭৪৪

মডেল: প্রিয়াঙ্কা, মোহর, দময়ন্তী
মেক-আপ: বাবুসোনা সাহা
ফোন: ৮২৪০৫৫০৮৮৪
হেয়ার: তনয়া সর্দার ও ইয়াশি
স্টাইলিং: কিয়ারা সেন
ফোন: ৯০৫১৪৭৩৬০৬
লোকেশন ও হসপিটালিটি পার্টনার: lMNOQ Skybar
ফোন: ৯৯০৩০৪০৫০৬
ছবি: সোমনাথ রায়



রেইকি ও ভাল থাকা

হাতের তালুর ব্যবহারেই পাওয়া যায় জীবনীশক্তি। সেই পদ্ধতির নামই রেইকি। জানাচ্ছেন রেইকি গ্র্যান্ডমাস্টার **মিতালি ভট্টাচার্য**। কলমে **অনিকেত গুহ**।

রোজকার কর্মব্যস্ত জীবন, অফিসের কাজের চাপ, প্রিয়জনের আবদার বা সামাজিক কর্তব্য — এই সব কিছুর মধ্যে কোথাও যেন হারিয়ে যায় আপনার আপন সত্তা। অনেক অ্যাচিভমেন্টের মধ্যেও খোঁজ চলে এক টুকরো শান্তির। ফাইভ-জি-এর যুগে দাঁড়িয়েও এই অন্বেষণ করে চলেছেন আমার-আপনার মতো হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু কেন? আজ আঙুলের এক ক্লিকে হাজির দুনিয়া। কিন্তু আমাদের শরীরের মধ্যেই যে অবিরত প্রবাহিত হচ্ছে এক অপরিসীম এনার্জি বা প্রাণশক্তি, সে বিষয়ে আমরা অবগত নই। এই এনার্জিই আমাদের জীবনীশক্তির আধার। কোনওভাবে এই শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে আমাদের শরীর ও মনে। এই হৃত জীবনীশক্তি



ফিরে পাওয়ার এক অব্যর্থ পদ্ধতি হল ‘রেইকি’। ওষুধপত্র কিংবা অস্ত্রোপচার নয়, বরং শুধুই হাতের তালুকে ‘এনার্জি ট্রান্সমিশন মিডিয়াম’ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আর রেইকির এই পদ্ধতিকে অবলম্বন করে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠছেন বহু মানুষ।

উদ্ভব ও ইতিহাস

রেইকির উদ্ভব সুদূর জাপানে। জাপানি ভাষায় ‘রেই’ কথাটির অর্থ মহাজাগতিক এবং ‘কি’ শব্দের অর্থ প্রাণশক্তি। রেইকি এক অর্থে তাই ইউনিভার্সাল লাইফ ফোর্স এনার্জি। স্থানভেদে এর নামও ভিন্ন। কোথাও ‘প্রাণশক্তি’, কোথাও ‘চি-শক্তি’, কখনও ‘প্রাণঃ’ বা ‘কসমিক এনার্জি’। তথ্য বলছে, রেইকি ও তার এই বিশেষ ক্ষমতার বিষয়টা সর্বপ্রথম জনসমক্ষে আনেন ড. মিকাও উসুই। তিনি নিজেও জাপানের বাসিন্দা ছিলেন। শোনা যায়, বহু দেশ ঘুরে তিনি শেষমেশ তিব্বতে আসেন এবং ‘লোটাস সূত্র’ থেকে রেইকির তথ্য সংগ্রহ করেন। এরপর ধীরে ধীরে তিনি তাঁর শিষ্যদের এই বিশেষ বিদ্যা দান করতে থাকেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই বিশেষ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে মানুষকে সহজেই সুস্থ করে তোলা যায়। তবে তাঁর এই প্রচেষ্টা স্থানীয়



কিছু অঞ্চলেই সীমিত ছিল। পরবর্তীতে ডা. হায়াসি, যিনি হাতের তালুর মাধ্যমে শক্তি সঞ্চারের পদ্ধতিটি সামনে আনেন। এরপর যাঁর নাম আসে, তিনি হায়ায়ো তাকাতা। তিনি নিজে দীর্ঘ অসুস্থতা কাটিয়ে ওঠেন শুধুমাত্র রেইকি প্র্যাকটিসের মাধ্যমে। এই হায়ায়ো তাকাতার হাত ধরেই জাপানের বাইরে তথা গোটা বিশ্বে ধীরে ধীরে রেইকি ছড়িয়ে পড়ে।

রেইকি: মহাজাগতিক প্রাণশক্তি

শারীরিক এবং মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই এটি একটি বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি বা ‘অল্টারনেটিভ ট্রিটমেন্ট প্রসেস’। বিশ্বব্যাপী প্রচলিত বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির (যেমন: অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক) মতো রেইকি ‘হোলিস্টিক ট্রিটমেন্ট’

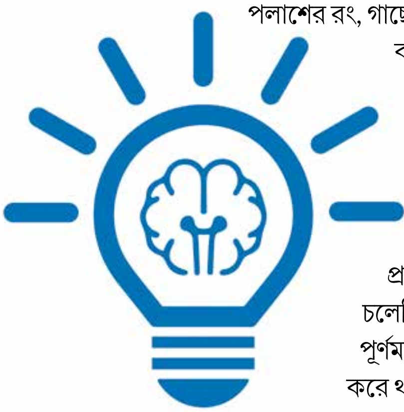
রেইকি হল ইউনিভার্সাল লাইফ ফোর্স এনার্জি। স্থানভেদে এর নামও ভিন্ন। কোথাও ‘প্রাণশক্তি’, কোথাও ‘চি-শক্তি’, কখনও ‘প্রাণঃ’ বা ‘কসমিক এনার্জি’।



প্রতিদিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, প্রতি ক্ষণে, প্রতি মুহূর্তে যত ঘটনা ঘটছে, সবের অন্তরালে রয়েছে এক অপার্থিব শক্তি। এই শক্তির প্রকাশ ও প্রবাহেই আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়।



হিসেবে স্বীকৃত, যেখানে প্রাণশক্তিকে উজ্জীবিত করাই মুখ্য। কিন্তু এই মহাজাগতিক প্রাণশক্তি বলতে ঠিক কী বোঝায়? প্রতিদিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, প্রতি ক্ষণে, প্রতি মুহূর্তে যত ঘটনা ঘটছে সবকিছুর অন্তরালে রয়েছে এক অপার্থিব শক্তি। এই শক্তির প্রকাশ ও প্রবাহেই আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের ভাল লাগা, খারাপ লাগা, সাফল্য, ব্যর্থতা সব কিছুই। মজার বিষয় হল, এই মহাজাগতিক প্রাণশক্তি সম্পর্কে জ্ঞাত না হলে, এর উপস্থিতি অনুভব করাও সম্ভব নয়। বিষয়টা একটু সহজ করে বলা যাক। আশ্বিন মাসে প্রকৃতির সাজ, মেঘের রং, কাশফুল, এই সব কিছুই জানান দেয় পুজো আসছে। আবার ঠিক তেমনই লাল, হলুদ পলাশের রং, গাছের নতুন সবুজ বয়ে আনে বসন্তের বার্তা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের এই ধারা সেই প্রাণশক্তির বহিঃপ্রকাশ। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রতিটা মুহূর্তে আমরা এই প্রাণশক্তিকে ব্যবহার করে চলেছি। এই শক্তিকে নিজের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় সঞ্চার করার কাজটি করে থাকেন একজন রেইকি টিচার



বা গুরু। আমাদের শরীরে যেমন রক্ত চলাচল হয়, তেমনই নাড়ীর মধ্যে দিয়ে সারা দেহে এই প্রাণশক্তির সঞ্চালনা প্রয়োজন। আর একজন রেইকি গুরুই পারেন একজন ব্যক্তিকে জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে।

রেইকি গুরুরা বিশ্বাস করেন মানুষের অভ্যন্তরস্থ প্রাণশক্তির সঠিক প্রবাহই হল সুস্থ শরীর ও সুস্থ চেতনা বিকাশের প্রধান উপাদান। তাই হঠাৎ কোনও কারণে এই প্রাণশক্তির প্রবাহে বিঘ্ন ঘটলে এবং তা দীর্ঘদিন স্থায়ী হলে তখনই শরীরে জটিল সমস্যা দেখা দেয়। তৈরি হয় মানসিক অস্থিরতা। তাই এই ধরনের সমস্যাকে দূর করার সহজতম উপায় হল প্রাণশক্তির প্রবাহকে গতিশীল করা ও শরীর থেকে এনার্জি ব্লকেজগুলো দূর করা। যা গতানুগতিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে প্রায় অসম্ভব। তখন প্রয়োজন হয় 'স্পর্শ চিকিৎসা' বা রেইকি এনার্জি হিলিং থেরাপির। এর মাধ্যমে ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেশার, থাইরয়েড, অনিদ্রা থেকে শুরু করে শরীরের যাবতীয় ব্যথা বেদনা, মানসিক অবসাদ, দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা, হতাশার মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগেরও নিরাময় সম্ভব। রেইকি চিকিৎসার প্রথম ধাপ হল শরীরের অভ্যন্তরের এনার্জি ব্লকগুলো খুঁজে বের করে, তার সঠিক স্থিতি নির্ভুলভাবে নির্ধারণ



একজন রেইকি গুরুই পারেন তার শিষ্যের দেহে অ্যাটিউন প্রসেস আরম্ভ করতে। এই প্রক্রিয়ায় সময় লাগে দু'দিন। প্রি-অ্যাটিউনমেন্ট ও পোস্ট-অ্যাটিউনমেন্ট এই দুটি পর্যায় হয়।

করা। আমাদের শরীরে রয়েছে সাতটি চক্র। এই চক্রগুলোকে উদ্দীপিত করে মহাবিশ্বের শক্তিকে নিজ শরীরের সঙ্গে মেলানো। এতে শরীরের মধ্যে প্রাণ-প্রবাহের ভারসাম্য বজায় থাকে।

সহজাত রেইকি?

শুনতে অবাক লাগলেও, জন্মমুহূর্ত থেকেই আমরা প্রায় পাঁচ শতাংশ রেইকি এনার্জি দেহে বহন করি। কীভাবে? একটু ভেবে দেখুন, পেটে ব্যথা হলে, চোখ বা কানে যন্ত্রণা হলে আমাদের অজান্তেই সেই নির্দিষ্ট স্থানে হাত চলে যায়। বলতে পারেন, এটা আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি। আবার ধরুন, আপনি প্রচণ্ড আপসেট। আপনার বন্ধু কাঁধে হাত রেখে আশ্বস্ত করতেই কিছুটা যেন রিলিফ হল। এই বিষয়গুলো আসলে কিছুই নয়, আপনার জন্মগত পাঁচ শতাংশ রেইকির প্রতিফলন। এই একই ঘটনা প্রযোজ্য গুরুজনদের আশীর্বাদের ক্ষেত্রেও। বন্ধুত্বের ভরসা হোক বা আশীর্বাদের জোর, সব ক্ষমতাই যেন লুকিয়ে আছে হাতের মুঠোয়। রেইকি প্র্যাকটিসের মাধ্যমে সহজাত সেই পাঁচ শতাংশ শক্তিকে বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এতে আপনি নিজের শারীরিক ব্যাধি, মানসিক সমস্যা নিজেই উপশম করতে পারবেন। এবং একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত প্রশিক্ষণ পেলে আপনি অন্য



ব্যক্তিকেও রেইকি দিতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই প্রফেশনালি রেইকি পদ্ধতি শিখতে হবে।

অ্যাটিউন প্রসেস

আগেই বলা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষ জন্ম থেকেই ন্যূনতম রেইকির অধিকারী হয়। কিন্তু এই ক্ষমতা বহুগুণ বাড়ানো সম্ভব। মহাজাগতিক শক্তিকে আত্মস্থ করতে বা নিজেকে হিল করতে রয়েছে এক বিশেষ পদ্ধতি— অ্যাটিউন প্রসেস। অর্থাৎ, নিজ দেহে মহাজাগতিক প্রাণশক্তিকে অনুভব করা। একজন রেইকি গুরুই পারেন তাঁর শিষ্যের দেহে অ্যাটিউন প্রসেস আরম্ভ করতে। এই প্রক্রিয়ায় সময় লাগে দু'দিন। প্রি-অ্যাটিউনমেন্ট ও পোস্ট-অ্যাটিউনমেন্ট মূলত এই দুটি পর্যায় হয়।



যেহেতু হাতের মাধ্যমেই এই শক্তি-স্রোত এক দেহ থেকে অন্য দেহে রূপান্তরিত হয় তাই এর অপর নাম Touch Therapy বা স্পর্শ চিকিৎসা।

অ্যাটিউনমেন্ট হওয়ার পর সেই ব্যক্তি অবশ্যই তার দেহে কসমিক এনার্জির অস্তিত্ব অনুভব করবেন। তাঁর দু'হাতে শক্তির প্রবাহ ঘটবে যা তার ব্যথা উপশমে সাহায্য করবে। এটাই রেইকির প্রারম্ভিক স্তর। এরপর ধীরে ধীরে আরও উচ্চস্তরে রেইকির বিভিন্ন টেকনিক শেখানো হয়।

রেইকি ও 'চক্র'

রেইকি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন একটি হিলিং প্রসেস। রেইকির মূল উদ্দেশ্য হল শরীরে কসমিক এনার্জির সঞ্চার ঘটানো। অ্যাটিউন পদ্ধতিতে ঠিক সেটাই করা হয়। আমাদের দেহে অবস্থিত চক্র-কে জাগ্রত করে পজ়িটিভ ও কসমিক এনার্জির সঞ্চার ঘটানো হয়। আমাদের দেহে সাতটি চক্রের অবস্থান রয়েছে—

- সহস্রার চক্র (মাথার ঠিক উপরে অবস্থিত)
- আজ্ঞা চক্র (দুই ভ্রু-র মধ্যস্থ স্থানে অবস্থিত)
- বিশুদ্ধ চক্র (কণ্ঠে অবস্থিত)
- অনাহত চক্র (হৃদযন্ত্রে অবস্থিত)
- মণিপুর চক্র (নাভির উপরে অবস্থিত)
- স্বাধিষ্ঠান চক্র (নাভির নীচে অবস্থিত)
- মুলাধার চক্র (মেরুদন্ডের শেষে অবস্থিত)

বিভিন্ন শিরা, উপশিরা ও অঙ্গ, প্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে এই সাতটি চক্র। এই পর্যায়ে একজন রেইকি গুরু তাঁর হাতের তালুর মাধ্যমে শিষ্যের দেহে কসমিক এনার্জি প্রবাহিত করেন। এই প্রবাহ শিষ্যের মাথায়

রেইকি এক নজরে

- রেইকি একটি সুপ্রাচীন প্রথা, যা যুগ যুগ ধরে মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রায় সব রকম শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সমাধান রেইকি পদ্ধতিতে সম্ভব।
- রেইকি একটি সম্পূর্ণ ড্রাগ-ফ্রি ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন চিকিৎসা পদ্ধতি। রেইকি অভ্যেসে শরীর বা মনের কোনও সাইড এফেক্ট তৈরি হয় না।
- রেইকি শুধু মানুষের উপর প্রযোজ্য, এই ধারণা ভুল। পশু, পাখি থেকে শুরু করে আপনার শখের গাছপালা, রেইকির প্রাণশক্তি সবকিছুর উপরেই ক্রিয়াশীল।
- শুধুমাত্র আপনি শারীরিক বা মানসিকভাবে অসুস্থ হলে তবেই রেইকি শিখবেন, এমনটা কিন্তু নয়। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনধারণেও রেইকি শেখা যায়। এতে আপনার 'কোয়ালিটি অফ লাইফ' অনেক বৃদ্ধি পাবে।

অবস্থিত 'ক্রাউন চক্র'-কে প্রথম জাগ্রত করে। এবং সেখান থেকে দুই ভ্রু-মধ্যস্থ অংশ বা 'থার্ড আই' (আজ্ঞা চক্র), থ্রোট বা বিশুদ্ধ চক্র, হার্ট (বা অনাহত চক্র) এবং ক্রমে হাত বেয়ে সমগ্র দেহে এই শক্তিপ্রবাহ ছড়িয়ে পড়ে। তখন ব্যক্তির মধ্যে থাকা সীমিত শক্তির সঙ্গে মহাজাগতিক প্রাণশক্তির একটা যোগসূত্র তৈরি হয়ে যায়। চাইলে সেই ব্যক্তিও তখন অন্য কাউকে রেইকি দিতে পারবেন। যেহেতু হাতের মাধ্যমেই এই শক্তি-স্রোত এক দেহ থেকে অন্য দেহে রূপান্তরিত হয় তাই এর অপর নাম Touch Therapy বা স্পর্শ চিকিৎসা। এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে কোনও ওষুধ, কোনও ইনস্ট্রুমেন্টের ব্যবহার হয় না। এটি একটি সম্পূর্ণ 'ড্রাগ-ফ্রি' ট্রিটমেন্ট প্রসেস।

ডিসট্যান্স রেইকি

অ্যাটিউন প্রসেস সম্পূর্ণ হওয়ার পর একজন ব্যক্তি ডিসট্যান্স রেইকির ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন। ডিসট্যান্স রেইকি অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তির মধ্যে আপনি প্রাণশক্তির সঞ্চার করতে চাইছেন, যিনি হয়তো সেই সময় সেখানে অনুপস্থিত। অন্য কোনও রাজ্য বা প্রদেশে থাকেন। সেক্ষেত্রে রেইকি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি সহজেই দূরবর্তী ওই মানুষের দেহে জীবনীশক্তির সঞ্চার ঘটিয়ে তাঁর শারীরিক বা মানসিক সমস্যা নির্মূল করেন। যাকে উদ্দেশ্য করে তিনি এনার্জি পাঠাবেন, শুধু সেই ব্যক্তিই এই প্রাণশক্তিকে অনুভব করবে।

রোগ নিরাময় ক্ষমতা

রেইকি সার্বিকভাবে এক অব্যর্থ চিকিৎসা পদ্ধতি। সবচেয়ে বড় কথা হল, এর জন্য আপনাকে না মানতে হবে কোনও বিধিনিষেধ, না থাকবে খাওয়াদাওয়ায় কোনও বারণ। দিনে, রাতে যখন যেভাবে ইচ্ছে আপনি রেইকি অভ্যেস করতে পারেন। ওষুধপত্রের প্রসঙ্গ তো নেই-ই, উপরন্তু নিয়মিত রেইকি অভ্যেসে রোগ থেকে সহজেই মুক্তি পাবেন। যে কোনও ধরনের নিউরোলজিক্যাল সমস্যা, সাইকোলজিক্যাল সমস্যা, গাইনিকলজিক্যাল সমস্যা, ব্রিদিং প্রবলেম, মাইগ্রেন, চোখের সমস্যা, ডাইজেস্টিভ সমস্যা, ইনসমনিয়া, কার্ডিয়াক সমস্যা, হাড়ের সমস্যা, হরমোনাল ইমব্যালান্স ইত্যাদি বহুবিধ রোগের সমাধান রেইকির মাধ্যমে সম্ভব। পাশাপাশি বিহেভিয়ারাল প্রবলেম, অতিরিক্ত রাগ, মানসিক অবসাদ, লো কনসেনট্রেশন - এই ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও রেইকি যথেষ্ট কার্যকরী।

যোগাযোগ: mitalibhattacharya72@gmail.com

ছবি সৌজন্যে: আইস্টক

ডিসট্যান্স রেইকি অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তির মধ্যে আপনি প্রাণশক্তির সঞ্চার করতে চাইছেন, যিনি হয়তো সেই সময়ে সেখানে অনুপস্থিত।





Holographic Canvas

মেক-আপে গ্লিটার ও মেটালিক ছোঁয়ার মিশেল। সঙ্গে উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার। সব মিলিয়ে ফিউচারিস্টিক আবেদন। হলোগ্রাফিক লুক ক্রিয়েশনে মেক-আপ আর্টিস্ট **অভিজিৎ চন্দ**।



■ চোখে গোল্ডেন গ্লিটারড আইশ্যাডো, একই রং লোয়ার ল্যাশ লাইন ও ঠোঁটে। মাস্কারা ও হাইলাইটারে লুক সম্পূর্ণ।

■ গোলাপি ম্যাট লিপস্টিক ও গোলাপি আইলাইনার। কিন্তু আলাদা নজর কাড়ে শিমারড পিঙ্ক চিকবোন হাইলাইটার।



■ মেটালিক লিপস। ঠোঁটে নীল লিপস্টিক ও হলোগ্রাম গ্লিটার। থ্রি ডি এফেক্টের ছোঁয়া। চোখে ডুয়াল টোন আইশ্যাডো আর সঙ্গে মাস্কারাই যথেষ্ট।



গাঢ় সি-গ্রিন মেটালিক আইশ্যাডো। ঠোঁটের রঙে গ্লিটার থাকলেও নজর কাড়ে চোখই। সব মিলিয়ে বোল্ড ও ছকভাঙা লুক।

বিষয় ভাবনা: মধুরিমা সিংহ রায়
মডেল: দময়ন্তী, ডিম্পল
মেক-আপ: অভিজিৎ চন্দ,
ফোন: ৯৮৩০৬৮৮৮৯০
ছবি: দেবর্ষি সরকার,
সহযোগী: জয় চক্রবর্তী
শুটিং কো অর্ডিনেশন:
মৌমিতা সরকার,
রূপায়ণ: মহেশ্বর মণ্ডল

‘রেসপেক্ট সবসময় আর্ন করে নিতে হয়’



অল্প বয়সেই নিজের চেষ্টায় ‘সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস’এর অন্যতম কর্ণধার হয়ে উঠেছেন **জয়িতা সেন**। তাঁর পেশাগত ও পরিবার জীবনের নানা গল্প শুনলেন **পায়েল সেনগুপ্ত**।



পরীক্ষা করছেন রত্ন

প্রডাক্ট ডিজ়াইনিং, প্যাকেজিং, ম্যানুফ্যাকচারিং, সেলস, মার্কেটিং... সব কিছু ঠান্ডা মাথায় কীভাবে সামলান?

থ্যাঙ্ক ইউ ঠান্ডা মাথায় কথাটা বলার জন্য। কারণ কিছু কিছু সময় সত্যিই মাথা ঠান্ডা থাকে না। টিমওয়র্ক ও কমিউনিকেশন যে কোনও অর্গানাইজ়েশনে সবচেয়ে বড় শক্তি। সেই সঙ্গে থাকা চাই প্রপার সিস্টেম অফ অপারেশন। স্টেপওয়াইজ় বলতে গেলে, সিস্টেম অফ অপারেশন, কমিউনিকেশন এবং টিম ওয়র্ক। কারণ সিস্টেম ঠিক থাকলেই বুঝব, কোথায় কী কমিউনিকেশন করতে হবে। সিস্টেমকে রান করানোর জন্য চাই খুব স্ট্রং কমিউনিকেশন। তারপরেই দরকার টিমওয়র্ক। কারণ কাকে কী করতে হবে, সেটা ইন্ডিভিজুয়ালের উপর নির্ভর করে। ব্যাপারটা রিলে রেসের মতো। তা ছাড়া গুছিয়ে কাজ করতে গেলে কখন কী করছি, তার শেডিউলও থাকতে হয়। ব্যাপারটা এরকম যে প্রথমে ডিজ়াইনিং, সেখান থেকে একটা সিলেকশন ও এলিমিনেশন, তারপর প্রডাকশন।

সেখানেও ঝাড়াই বাছাই করে তারপর মার্কেটিং, ক্যাম্পেনিং। পুরো ব্যাপারটাই একটা নেটওয়র্কে চলে যায়। এই জন্যই প্রপার সিস্টেম প্রয়োজন।

আপনার কি বাণিজ্য জগতের অভিজ্ঞতা ছিল?

কিছুটা তো বটেই। আমার বাবার প্রাইমারি বিজ়নেস বাড়ি বানানো, হি ইজ় আ ডেভেলপার। তা ছাড়া আমাদের এফএমসিজি রয়েছে। বিজ়নেস পরিবারেই আমার বিয়ে হয়েছে।

আপনি কি জানতেন যে এই ব্যবসার কাজের সঙ্গেই ভবিষ্যতে জড়িয়ে পড়বেন, নাকি ছোটবেলা থেকে অন্য স্বপ্ন ছিল?

আমরা দুই বোন। মাই সিস্টার ওয়জ় ভেরি সর্টেড দ্যাট শি ওয়ান্টস টু ডু এফএমসিজি। সুতরাং বাকি থাকল রিয়্যাল এস্টেট। এবার একটা মেয়ের জন্য আমাদের দেশে রিয়্যাল এস্টেট সামলানো বলছি না অসম্ভব, কিন্তু কিছুটা কঠিন। তা ছাড়া আমি বরাবরই চেয়েছিলাম অ্যাডভারটাইজ়িং ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে। সেই জন্য ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা শুরু করি। লা মার্টিনিয়েরে পড়েছি, গ্র্যাজুয়েশন করেছি সেন্ট জ়েভিয়ার্স কলেজ থেকে, পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি থেকে। এরপর আমার বিদেশে বিজ্ঞাপন নিয়ে স্টাডি করতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কলেজে থাকতেই শুভঙ্করের (স্বামী শুভঙ্কর সেন) সঙ্গে আমার আলাপ। আমাদের বিয়ের কথাবার্তা শুরু হয়ে যায়। ফলে বিদেশে পড়তে যাওয়ার প্ল্যানও ক্যানসেল হয়ে যায়। তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, বিয়ের পর পরই শুভঙ্করের পারিবারিক ব্যবসায় ঢুকে যাই। সেখানে আমার জীবনের স্বপ্ন অনেকটাই পূরণ হয়ে যায়। বিয়ের পর আমার ক্রিয়েটিভিটি ব্যবহার করার সুযোগ পাই।

লাভ ম্যারেজ না পারিবারিক সূত্রে বিয়ে?

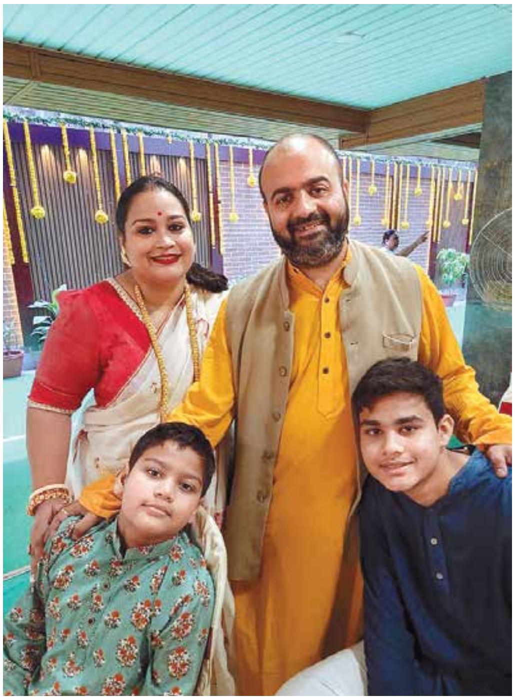
দুটোই বলা যেতে পারে। শুভঙ্কর আমার সিনিয়র ছিল স্কুলে এবং কলেজে। তা ছাড়া আমাদের বাবারা বন্ধু ছিলেন। ক্লাবের একটি অনুষ্ঠানেই আমাদের প্রথম দেখা হয়। তারপর আলাপ-পরিচয় এবং পারিবারিক সমর্থনও ছিল। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা হয়ে যায়।

জুয়েলরি বিজ়নেসে এসে পড়ার ব্যাপারটা কতখানি নতুন বা চ্যালেঞ্জিং ছিল?

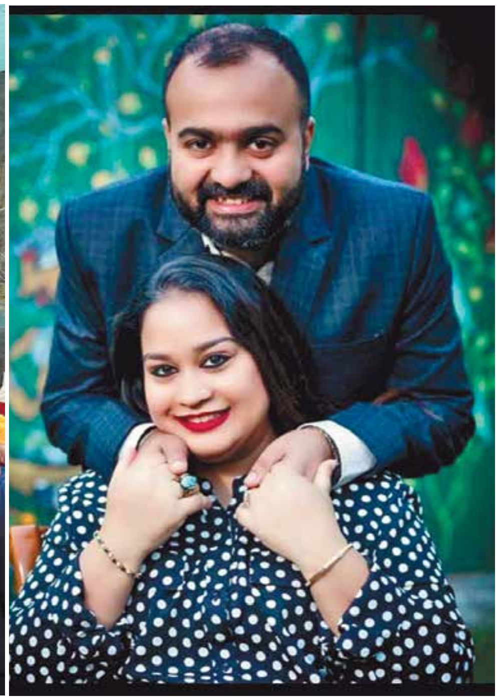


নিঃসন্দেহে খুবই চ্যালেঞ্জিং। আমার ক্রিয়েটিভিটির আউলেটটা আমি এখানে পেয়েছি, যা আমি বরাবরই চেয়েছিলাম বিজ্ঞাপন জগৎ থেকে। এই জুয়েলরি ডিজ়াইনিং ব্যাপারটা পুরোপুরি সেলফ টট। আউট অফ প্যাশন আমি এটা শিখেছি। তারপর কারিগরদের কাছ থেকে বা ডিজ়াইনারদের কাছ থেকে অনেক টেকনিক্যালিটি শিখতে হয়েছে। ডিজ়াইনিং জানলেই কিন্তু গয়না বানানো যায় না। কোন কোন ডিজ়াইনে গয়না হতে পারে, বা সেটা বানানোর কৌশল কী, এগুলো বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে শিখেছি। তারপর সেখান থেকে মার্কেটিং ও বিক্রি। আমাদের এত হিউজ রেঞ্জ অফ প্রডাক্টস। কাস্টমারের চাহিদা বুঝে সেগুলো বিক্রি করার কাজটা খুবই শক্ত কিন্তু। ফ্ল্যাট দ্যাখো, পছন্দ করো, বিক্রি করো...এরকম একটা ব্যবসায়িক পরিবার থেকে আমি এসেছি। সেই অভিজ্ঞতা জুয়েলরি বিজ়নেসে কাজে লাগানো মুশকিল। এটা অনেক বেশি আর্টিস্টিক, সূক্ষ্ম ব্যাপার। আমার ক্রিয়েটিভিটি দেখানোর সুযোগ পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করেছি। মার্কেটিং, অ্যাড ক্যাম্পেনিং এখানে প্রডাক্ট সেলের জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। আমি অ্যাড ক্যাম্পেনিংয়ের বহু আইডিয়া দিয়েছি বা দিই, যতটা পারি নিজের

প্রডাক্ট বিক্রি করতে গেলে শুধু কাউন্টারের ওপারে দাঁড়ালেই হয় না। ক্রেতার মন এবং পছন্দ বুঝে তাঁর হাতে সেটা তুলে দিতে হয়।



দুই ছেলের সঙ্গে



রোম্যান্টিসিজ়ম ইজ় আ পার্ট অফ লাইফ

ক্রিয়েটিভিটিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করি।

প্রডাক্ট তৈরি থেকে বিক্রি পর্যন্ত সবটাই আপনাকে নতুন করে শিখতে হয়েছে...

হ্যাঁ, আমি খুবই লাকি যে আমার দুই পরিবারই খুব সাপোর্টিভ এই ব্যাপারে। যেহেতু আমরা দুই বোন, অনেক সময়েই শুনতে হয়েছে যে ছেলে নেই, এত বড় ব্যবসা কে দেখবে! কিন্তু সেখানেও স্টিরিয়োটাইপ ভাঙার জন্য বাবা-মা-ই আমাদের দুই বোনকে উৎসাহ দিয়েছেন। কারও মাথায় এটা আসে না যে, মেয়েরাই ব্যবসা সামলাতে পারবে। বাবা-মা কিন্তু সব সময়েই বলেছেন, আমাদের দুই মেয়ে আছে তো, ব্যবসা ওরাই দেখে নেবে। রিয়্যাল এস্টেটে আমার যে একেবারেই উৎসাহ ছিল না, তা নয়। কিন্তু বিয়ের পরে আমি আমার শ্বশুরবাড়ির ব্যবসাতেই জয়েন করব বলে ঠিক করি। সেখানে আমার শ্বশুরমশাই, শাশুড়ি, দিদি শাশুড়ি এঁরা প্রত্যেকেই খুব সাপোর্টিভ ছিলেন। আমার হাজ়ব্যান্ড তো অবশ্যই। অনেক কিছুই শ্বশুরমশাই নিজের হাতে শিখিয়েছেন। বেসিক টেকনিক্যাল ট্রেনিং আমার ওঁর কাছেই হয়েছে। প্রথমদিনের অভিজ্ঞতা এখনও মনে আছে। আমি ওঁর সঙ্গে ওঁর ঘরে গিয়ে বসলাম। উনি আমায় একগুচ্ছ রত্ন দিয়ে বললেন এগুলো বেছে নাও। হি টট মি হাউ টু ডু ইট। একটা বিজ়নেস রান করতে গেলে এরকম অনেক গ্র্যাজুয়াল প্রসেসের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। প্রথমে কালার স্টোন হল, তারপর উনি আমাকে ডায়মন্ডসে পাঠিয়ে দিলেন একদিন। আমাদের একজন জেমোলজিস্ট ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে অনেক বই নিয়ে পড়তে শুরু করলাম। তারপর তিনি আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, কতটা শিখেছি বা আদৌ কিছু শিখতে পেরেছি কিনা বোঝার জন্য। তারপর শিখতে শুরু করলাম কীভাবে সেই স্টোন সেটিং করা হয়, কারিগরের কাছে গিয়ে বুঝতে হল কীভাবে অ্যাকচুয়াল ডিজ়াইনিং হয়। সেলিং ইজ় আ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট থিং। একবার কাউন্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে পড়লে আর কোনও গাইডলাইন নেই। কাস্টমার স্টাডি করে বিক্রির ব্যাপারটা বুঝতে হবে। এটা অনেকটাই নির্ভর করে বেসিক ইন্টেলিজেন্সের উপর। মাথায় রাখতে হবে, ক্রেতার উপর রেসপেক্ট রাখা উচিত। তাঁরা বিশ্বাস করে তোমার ব্র্যান্ডের কাছে এসেছেন। সবশেষে বলব আসলে পুরো জিনিসটাই নিজের আগ্রহ ও প্যাশনের ব্যাপার।

এক্সপেরিমেন্ট করার স্বাধীনতা পেয়েছিলেন?

আমার শ্বশুরমশাই। সব বিষয়ে ইন্সপিরেশনের মতো কাজ করেছেন। আমার মনে আছে, একটি নতুন আউটলেট হওয়ার কথা চলছে। ফলে

রোজ সকালে উঠেই ভাবি, নতুন কী করব। সেইমতো প্ল্যান বানাই। এটা এনজয় করি, পুশিং ইয়োর বাউন্ডারিজ়... ফর মি ইটস ফান।





স্বামী শুভঙ্কর সেনের সঙ্গে আলোচনারত

আমাকেই পুরো আউটলেটটা সাজাতে হল। সেটা করতে গিয়ে আমি ইন্টিরিয়রের কাজ শিখলাম, কোথায় কোন জিনিস কীভাবে রাখতে হয়, লাইট কীভাবে লাগাতে হয় ইত্যাদি। উনি অসম্ভব ওপেন মাইন্ডেড ছিলেন। হি ওয়জ় আ ম্যান উইথ আ ভিশন। প্রতিটি স্টেপেই উনি আমাকে বাউন্ডারি পুশ করার দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। তাই এটা আমার কাছে নতুন চ্যালেঞ্জ ছিল। তা ছাড়া ২০২০ সালের শুরুর দিকে আমি ট্র্যাডিশনাল জুয়েলরির বাইরে সিলভার অ্যান্ড স্টোন দিয়ে অন্য সাব ব্র্যান্ড তৈরির কথা ভাবি। ওই সময়ে ট্র্যাডিশনাল জুয়েলরি বিজ়নেসে সেটা একটা নতুন ইনিশিয়েটিভ ছিল। কারণ সোনা-হিরের সঙ্গে সিলভার গয়না বিক্রির কথা ভাবাই একটা উইয়ার্ড ব্যাপার ছিল। কিন্তু আমার ওই কুর্তা, সিলভার জুয়েলরি আর একটা ইন্টেলেকচুয়াল লুক...ওই ব্যাপারটা খুব টানত। মনে হত, কলেজ পাশ করে যারা বেরোচ্ছে, তাদের হয়তো সেটা ভাল লাগবে। অনেক সময়েই মায়েদের সঙ্গে মেয়েরা আসে জুয়েলরির দোকানে। সোনা বা হিরের গয়নার প্রতি তাদের তেমন আগ্রহ থাকে না। তাই তাদের পছন্দসই কিছু দিলে তাদেরও গয়না কেনার একটা আগ্রহ তৈরি হয়। তা ছাড়া আমি লক্ষ করে দেখেছি যে, নিজেদের পছন্দমতো কিছু পেলে মেয়েরাও মায়েদের গোল্ড বা ডায়মন্ড জুয়েলরি পছন্দ করতে এগিয়ে আসত। কাজেই আমাদের ব্র্যান্ডও অ্যাক্রস এজ গ্রুপ একটা ইন্টারেস্ট তৈরি করতে পেরেছিল। আমার শ্বশুরমশাই প্রবীণ হলেও তিনি খুবই এনকারেজিং ছিলেন। ট্র্যাডিশনাল গয়নার রেস্ট্রিকশন মেনে নিয়ে একেবারে অন্যরকম কিছু চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব-একটা সহজ ছিল না। কিন্তু সময়ের চেয়ে এগিয়ে ভাবতে পারতেন তিনি, তাই আমার পক্ষেও সম্ভব হয়েছিল। আমার শাশুড়ি-মা ও বিজ়নেসে ইনভলভড ছিলেন।

এখনও পর্যন্ত আপনার সবচেয়ে বড় স্ট্রেংথ বলে কী মনে করেন?

গত ১৫ বছর ধরে এই ব্যবসায় আছি। সব সময় নতুন কিছু ইনট্রোডিউস করার চেষ্টা এবং অবশ্যই সময়ের আগে, এটাই নিজের সবচেয়ে বড় শক্তি বলে মনে হয়। এলজিবিটিকিউকে আমরা সাপোর্ট করেছি এবং এমন সময়ে দাঁড়িয়ে পদক্ষেপ করেছি যখন মুভমেন্টটাও সেভাবে গেন করেনি। আমি সবকিছু ভাবার চেষ্টা করি বিয়ন্ড দ্য টাইম। সেভাবেই সিস্টেম

পরিবারের সমর্থন পাওয়া খুব ম্যাটার করে। আর কোনও কিছু যদি যুক্তি দিয়ে দেখাতে বা বোঝাতে পারো, সেটা কিন্তু কাজ করে যায় আল্টিমেটলি।



সেট আপ করি। ভয় করে, যাতে স্ট্যাগন্যান্ট না হয়ে যাই। হয়তো এই ভাবনাই আমাকে নিত্যনতুন কাজ করতে অনুপ্রেরণা জোগায়। সব সময় যে সবকিছু সফল হয়, তা নয়। কিন্তু ফেল করা খুব জরুরি কারণ ফেলিওরই আসলে বেস্ট টিচার। না হলে নিজেকে প্রমাণ করা যায় না।

ভারতের মতো দেশে জুয়েলরি ব্র্যান্ডের যেখানে এত প্রতিযোগিতা, সেখানে সাফল্য আনা ও সাস্টেন করার স্ট্র্যাটেজি কী?

আমরা খুবই ভাগ্যবান যে আমরা বাংলার মানুষ। এমন মাটি থেকে আমরা তৈরি, যেখানে ক্রিয়েটিভিটি ছাড়া জীবন ভাবাই যায় না। সেই কারণে শুধু জুয়েলরি ইন্ডাস্ট্রি নয়, এডুকশন, এনটারটেনমেন্ট সব জায়গাতেই বাঙালিদের রমরমা। গোটা পৃথিবীতে এমন কোনও কর্নার নেই, যেখানে বাঙালি কারিগর গয়না বানাচ্ছেন না। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই ক্রাফটম্যানশিপ নিয়েই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের একটা লেগ্যাসি অফ ট্রাস্ট আছে, যা অনেক বছর ধরে তৈরি হয়েছে, একদিনে নয়। যাঁরা আমাদের ক্রেতা, তাঁরা জানেন যে কী কোয়ালিটি এবং সার্ভিস আমরা প্রোভাইড করি। এই টাইমটেস্টেড ব্যাপারটাই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাইরের স্টেটে যেখানে আমাদের শোরুম নেই, সেখানকার মানুষ কলকাতায় এসে আমাদের থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেকেই তাঁদের নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী প্রডাক্ট পাচ্ছেন, কারণ সাজ বা সাজের অংশ হিসেবে গয়না রিফ্লেক্ট করে একজন মানুষের পার্সোনালিটি। সেটা বুঝে প্রডাক্ট তৈরি করতে পারছি বলেই হয়তো সাফল্য আসছে।

এখনও এই ধরনের কাজের জগতে পুরুষদের প্রাধান্য। সেখানে মহিলা বলে কি এখনও কোনও অসুবিধে ফেস করতে হয়? বা আপনাকে হয়েছে?

যে কোনও চেঞ্জই হ্যাজ় টু বিগিন অ্যাট হোম। অস্বীকার করে লাভ নেই, ভারতের অধিকাংশ পরিবারে এখনও ছেলেদের ও মেয়েদের সমান চোখে দেখা হয় না। এখনও মেয়েদের বলা হবে ভাইয়ের জন্য জল এনে দে, কিন্তু এটা বলা হয় না বোনের জন্য জল এনে দে। রুরাল ইন্ডিয়াতে মেয়েদের নিজেকে প্রমাণ করার জন্য এখনও অনেক স্ট্রাগল করতে হয়। আর্বান এরিয়াতে সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে হয়তো সেই লড়াই কিছুটা কমছে। বিশেষ করে উইমেন্স ডে টাইপ কিছু

অ্যান্টিসিপেট করা, কীভাবে মাইন্ডসেট বদলাচ্ছে, সেটা আইডিয়া করে তার উপর কাজ করাও জরুরি।

মুভমেন্টের ফলে। মনে হয়, এই কারণেই এই দিনগুলো পালন করা উচিত, অন্ততপক্ষে সাধারণ মানুষের কাছে অ্যাওয়ারনেস বাড়ানোর জন্য। আর গ্লোবালিই কিন্তু ধরে নেওয়া হয় যেন সন্তান মানুষ করা প্রধানত মেয়েদেরই দায়িত্ব। হয়তো অনেক জায়গাতেই ছেলেরাও দায়িত্ব নিয়ে করছেন, তবু বাচ্চার কিছু হলে মূলত মেয়েরাই বেশি ছুটি নিতে বাধ্য হয় এবং নিজেকে তার বদলে অন্য কোথাও অন্যভাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে। আসলে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই প্রমাণ করার ব্যাপারটা বারবার বেশি চলে আসে। আমার পরিবার খুব সাপোর্টিভ হওয়ায় অনেকটাই স্ট্রাগল কম হয়েছে। কিন্তু পরিবারের বাইরে গিয়ে কোনও কাজ করতে গেলেই বারবার প্রমাণ করতে হয়েছে যে, কেন কাজটা করছি এবং রেজ়াল্ট কী হতে পারে। পুরুষ হলে এখনও আমাদের দেশে স্ট্রাগল কিছুটা কম। কনভিন্স করে রেজ়াল্ট আনাটা খুব জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। আগে মার্কেটিংয়ে আমার হাজ়ব্যান্ডের সাপোর্ট সিস্টেম হিসেবে ছিলাম। কিন্তু শ্বশুরমশাই চলে যাওয়ার পরে সেই পুরো দায়িত্ব আমাকে নিতে হয়েছে। একটা টিম একরকমভাবে চলছিল, আবার তাকে নিজের মতো করে তৈরি করে অন্য থটপ্রসেসে চালানোও একটা স্ট্রাগল ছিল ওই সময়। যে কোনও রোলেই আমি গিয়েছি, নিজেকে প্রমাণ করতে হয়েছে। কারণ মেয়েদের এখনও একটু কষ্ট করেই রেসপেক্ট আর্ন করতে হয়।

সংসারও কি আপনাকেই সামলাতে হয়?

আমার দুই ছেলে, একজনের বয়স ১৩ এবং অন্যজনের ৯। ওরা নিজেরা রেডি হতে পারে, কিন্তু ঘুম থেকে তুলে বাথরুম অবধি পাঠাতে হয়। ওরা বেরিয়ে গেলে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু সংসারের সব কাজই আমি দেখি। শুভঙ্কর আমাকে সাহায্য করতে চায়, কিন্তু তার চেয়ে আমার মনে হয় নিজে করে নেওয়াই বেটার। এর মধ্যে আবার জ়ুমে লংডিস্ট্যান্স মিটিংও চলে। তারপর অফিসে নানা লোকজনের সঙ্গে দেখা করা। চেষ্টা করি নটার মধ্যে বাড়ি ফিরে পরিবারে সময় দিতে। প্রতি উইক-এন্ডেই এখন অফিসট্রিপে যেতে হয়। চেষ্টা করি বাচ্চাদেরও নিয়ে যেতে। তাতে কিছুটা সময় একসঙ্গে কাটানো যায়! তা ছাড়া বাবা-মায়ের ব্যস্ততা এখন ওরাও বুঝে গিয়েছে। ভবিষ্যতে কী হবে, জানি না। তবে ওরাও কিন্তু খুব ক্রিয়েটিভ এবং মাঝে-মাঝে আমাকে সোশ্যাল মিডিয়া ও আজকালকার মেয়েদের পছন্দের ট্রেন্ড নিয়ে রীতিমতো সাজেশন দেয়। (হাসি)

আর রোম্যান্টিক লাইফ?

সে তো থাকতেই হবে। আপাতত আমি শুভঙ্করকে নাইট-ডেটে যাওয়ার জন্য জোর করছি। ভ্যালেন্টাইনস ডে সেলিব্রেট করার জন্য মিটিংয়ে একবার সারাদিন ওকে পাশে বাসিয়ে রেখে কোনওরকমে মিটিং শেষ করে ডিনারে চলে গিয়েছিলাম। এগুলো তো করতেই হবে, তাই না? (লাজুক হাসি)

ছবি: শুভেন্দু চাকী





রূপে-অরূপে

অষ্টনায়িকা

হাজার বছর ধরে প্রেমের পথে হেঁটে গিয়েছেন প্রেমিকারা। সেই চরৈবেতিতে বিরতি আসেনি কখনও। চিরন্তন হয়ে থেকেছে অপেক্ষা, উৎকণ্ঠা, মান, বিরহ। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির রাধারাই এসেছেন একুশ শতাব্দীতে। আজও ঘন বাদলে অভিসার ঘটে চলে, হয় মান-মিলনের পালা। অনুভূতি একই, সময় পরিবর্তনে তার রূপ ভিন্ন। সেই রূপকথারই সৃজনে **পৃথা বসু** ও **দেবলীনা অধিকারী**।

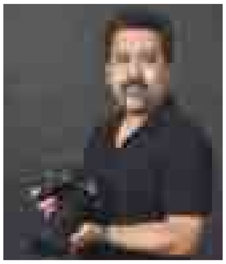








এই শুটটা ছিল বেশ ইন্টারেস্টিং। লোকেশন ও লাইটের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল এক্সপ্রেশন ক্যাপচার করা। মডেলরা নিপুণভাবে তা ফুটিয়ে তুলেছিলেন। টিম মেম্বাররা যেভাবে মডেলদের ব্রিফ দিয়েছিলেন, তাতে কাজটা আরও সহজ হয়েছিল। নবীন দা'র মেক-আপ, কুশলের স্টাইলিং বিষয়টাকে আরও সুন্দর করতে সাহায্য করেছে।



সোমনাথ রায়, ফোটোগ্রাফার

অভিসারিকা

(নায়কের উদ্দেশে যাত্রা)

''দুতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে/
মন্দিরে যামিনী জাগি।''
রাইকিশোরী চলেছেন কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতে। বৈষ্ণব পদ অনুযায়ী অভিসারিকা রাধার পরনে থাকে গাঢ় নীল বর্ণের পোশাক।
নীল লহেঙ্গার সঙ্গে হাইনেক ফুলস্লিভ অ্যাটাচড কেপ টপ। সঙ্গত দিচ্ছে মাথাপট্টি ও ভারী নথ।
নেটের উপর সিকুইনের কাজ করা গাঢ় নীল শাড়ির সঙ্গে রয়েছে হিরের গয়না।



গয়না: ইন্ডিয়ান জেম অ্যান্ড জুয়েলরি ক্রিয়েশন





খণ্ডিতা

(নায়ক না আসায় ক্ষুব্ধ নায়িকা)

''এতেক সহিল অবলা বলে/ ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে''

কথা রাখে না কেউ। রাখল না সেও। অভিমানী রাধা তাই তো ক্ষুব্ধ। কমলা রঙেই সেই ক্ষোভের প্রকাশ। একদিকে ম্যাজ়েন্টা ব্লাউজ়ের সঙ্গে এমব্রয়ডারির ভারী কাজ করা কমলা লহেঙ্গা। অন্যদিকে নেটের বেলস্লিভ হাইনেক ব্যাকলেস টপ ও প্লিটেড স্কার্টে খণ্ডিতা রাধা।



বাসকসজ্জিতা

(নায়কের জন্য সুসজ্জিতা নায়িকা)

''হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার/ দেহক সরবস গেহক সার''

কৃষ্ণের জন্য সুসজ্জিতা রাধা। ফ্লোরাল প্রিন্টেড শাড়ির সঙ্গে মাল্টি কালার্ড ব্লাউজ়। কুন্দন, পোলকির ভারী গয়না ও অভিনব হেয়ার স্টাইল। মাল্টিকালার্ড ব্লেজ়ারের সঙ্গে সবুজ ভেলভেটের ট্রাউজ়ারে অনন্যা তিনি।





প্রোষিতভর্তৃকা (প্রেমিক চলে গেছে দূরদেশে)

''কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে''

পরবাসী কৃষ্ণের পথ চেয়ে রাধিকা। হালকা নীল রঙে ধরা পড়েছে তাঁর উদাসী মন। পাউডার ব্লু নেটের শাড়ি এবং ইন্দো ওয়েস্টার্ন লং ড্রেসের সঙ্গে মুক্তোর হারে অপেক্ষমান তিনি।



কলহান্তরিতা

(অনুতপ্ত নায়িকা)

''সব অপরাধ খেমহ বর
মাধব/তুআ পায়ে
সোপলুঁ পরাণ''

খণ্ডিতা রাধা কৃষ্ণের প্রতি কঠোর আচরণে অনুতপ্ত। একদিকে আর্দি রঙের অফশোল্ডার ড্রেসের সঙ্গে এমব্রয়ডরি করা স্লিভলেস জ্যাকেট ও কুন্দনের গয়না; অন্যদিকে অলওভার সিকুইনের কাজ করা আর্দি রঙের লং ড্রেসে ধরা পড়ল তাঁর অনুতাপ।





বিপ্রলব্ধা

(নায়কের প্রতারণায় বিরহী নায়িকা)

''কানু কানু করি রোয়ই সুন্দরী/ দারুণ বিরহ হুতাশে'' আসার কথা রেখেও এল না সে। গাঢ় সবুজ শর্ট ড্রেস ও লহেঙ্গায় প্রকাশিত রাধার বিরহী রূপ। সঙ্গে আছে ভারী কুন্দনের গয়না।

প্রত্যেক পর্যায়ের জন্য সাবেকি ও মডার্ন লুক রয়েছে। আগে মহিলারা ফাউন্ডেশন ও লিপস্টিক কম পরতেন। কাজল পরতেন মোটা করে। কেশসজ্জায় থাকত অপূর্ব এক্সপেরিমেন্ট। সঙ্গে ভারী গয়না। এখনকার সাজে ফ্রেশ লুকই সার কথা। এই ভেবেই আমি লুক ক্রিয়েট করেছি।



নবীন দাস, মেক-আপ আর্টিস্ট



গয়না: ইন্ডিয়ান জেম অ্যান্ড জুয়েলারি ক্রিয়েশন



গয়না: ইন্ডিয়ান জেম অ্যান্ড
জুয়েলরি ক্রিয়েশন
ফোন: ৮৯৮১০৮৯০০৮



কুশল চট্টোপাধ্যায়, স্টাইলিস্ট

"প্রত্যেকটা লুকই আমার কাছে খুবই এক্সাইটিং ও চ্যালেঞ্জিং ছিল। বিভিন্ন মুডের জন্য আলাদা রং বেছেছিলাম। প্রত্যেকটা লুকের দুটো ভার্শান, যার মধ্যে একটা ছিল এথনিক ও অন্যটা কনটেম্পোরারি। এথনিক লুকের জন্য ইন্ডিয়ান এবং কনটেম্পোরারি লুকের জন্য ইন্দো-ওয়েস্টার্ন আউটফিট ব্যবহার করেছি।"

উৎকণ্ঠিতা

(প্রেমিকের দেরিতে উতলা প্রেমিকা)

''মন উচাটন নিশ্বাস সঘন/
কদম্ব কাননে চায়।''

অপেক্ষার প্রহর ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে। বেগুনি ও ধূসর রঙে প্রকাশ পাচ্ছে সেই উৎকণ্ঠা। একদিকে সোনালি জ়রির ভরাট কাজ করা পার্পল বেনারসির সঙ্গে ফুলের ব্লাউজ়। অন্যদিকে ধূসর শারারা ও কুর্তায় উৎকণ্ঠিতা রাধার সাজ।





স্বাধীনভর্তৃকা

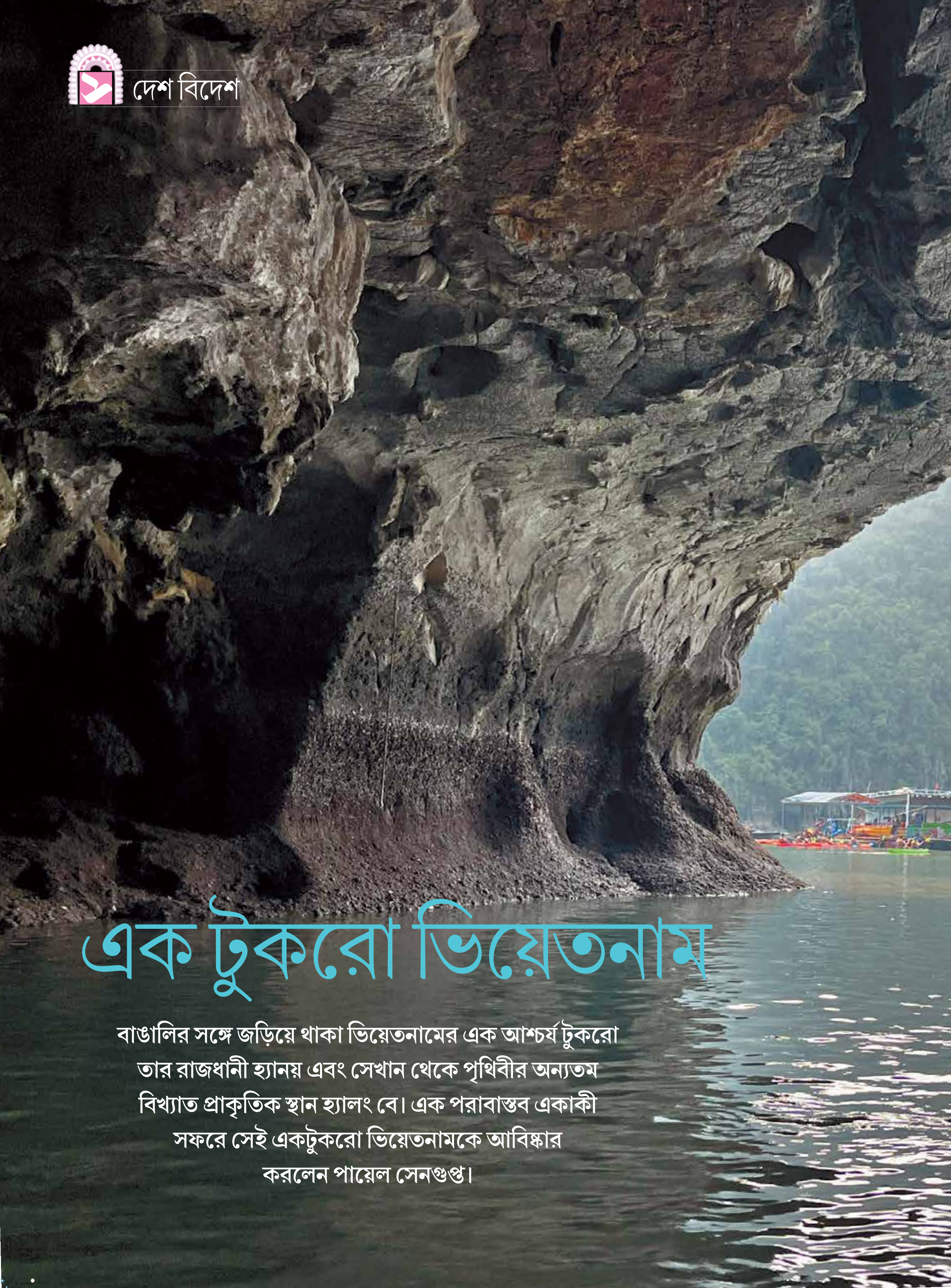
(মিলন-মুহূর্তে নায়িকা)

‘‘পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে/
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে।’’

নায়কের আগমনে অবসান প্রতীক্ষার। লাল রঙে প্রকাশ পেয়েছে রাধার প্রেম। লাল ভেলভেটের ডিপ নেক লং কুর্তি, সঙ্গে দোপট্টা। সঙ্গে ভারী গয়নার সাজ। ডানদিকে সিকুইনের কাজ করা উজ্জ্বল লাল শাড়ি। হেয়ারস্টাইলে গোলাপের সাজে হয়ে উঠেছেন আবেদনময়ী।



মডেল: হিয়া, প্রিয়াঙ্কা, তিতাস, আলকারিয়া, **মেক-আপ ও হেয়ার:** নবীন দাস, ফোন: ৯৮৩১২৩৩৬১৮, **স্টাইলিং, পোশাক, গয়না:** কুশল চট্টোপাধ্যায়, **ফোন:** ৮৬৯৭১২০৩৬১, **ছবি:** সোমনাথ রায়, **লোকেশন ও হসপিটালিটি:** দ্য ওবেরয় গ্র্যান্ড, কলকাতা, ১৫ জওহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা ১৩, **ফোন:** ০২২৪৯২৩২৩, **রূপায়ণে:** মহেশ্বর মণ্ডল।



এক টুকরো ভিয়েতনাম

বাঙালির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ভিয়েতনামের এক আশ্চর্য টুকরো তার রাজধানী হ্যানয় এবং সেখান থেকে পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত প্রাকৃতিক স্থান হ্যালং বে। এক পরাবাস্তব একাকী সফরে সেই একটুকরো ভিয়েতনামকে আবিষ্কার করলেন পায়েল সেনগুপ্ত।



হ্যালংয়ে বাম্বু বোটিং





সূর্যাস্তের রঙে রাঙা হ্যালং বে

"আমাদের কলকাতা শহরে একটা রাস্তার নাম হো চি মিন। তা ছাড়া হো চি মিন-এর সমস্ত লেখারও বাংলা অনুবাদ আছে।'' কথা বলছিলাম ভিয়েতনামের কমার্স অ্যান্ড টুরিজ়ম কলেজের ইংরেজির প্রফেসর ডি লির সঙ্গে। বাংলার সঙ্গে ভিয়েতনামের কতখানি আত্মিক সম্পর্ক, সে বিষয়ে সুন্দরী প্রফেসর ডি লির ধারণা খুব গভীর নয়। ক্রস কালচার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে করতে নানারকম প্রশ্ন করছিল লি। আর কোনও দেশকে চিনি বা না চিনি, কলকাতার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভিয়েতনাম ও চিনকে চেনে না এরকম বাঙালি খুঁজে পাওয়া দায়। 'আমার নাম তোমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম' শুনে শুনে বেড়ে ওঠা লোকজনের মধ্যে থাকলে এই দেশ সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক কৌতূহল তো তৈরি হয়েই যায়। খুব ছোট ক'দিনের টুরে টুপ করে এসে পড়েছিলাম ভিয়েতনামের রাজধানী শহর হ্যানয়ে। একা এবং উদ্দেশ্যহীন। কেন, প্রশ্ন করলে সেই উত্তর নেই। অনেক অপশনের মাঝখানে কেন যে এই শহরটাকে আপন বলে মনে হয়েছিল, জানি না। অথবা জানি, কিন্তু মানতে চাই না। কিন্তু একটা কথা মেনে নিতেই হয়েছে, অনেকদিনের অশান্ত মনকে ভিয়েতনামিজ় কিশোরীর মতো মিষ্টি এই শহরটা দু'হাত বাড়িয়ে আপন করে নিয়েছিল। অনেকদিন থেকেই শুনছিলাম ভিয়েতনাম ভারতীয়দের কাছে একটি খুব জনপ্রিয় ডেস্টিনেশন হয়ে উঠেছে, কলকাতা থেকে নোই বাম এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পুরো সময়েই তার যথোপযুক্ত প্রমাণ পেয়েছি। বিমান শহরের বুকে যখন নামল, তখন রাত প্রায় আড়াইটে বেজে গিয়েছে। ক্যাব ড্রাইভার ইংরেজি প্রায় জানেনই না। কিন্তু মোবাইলের গুগল ট্রান্সলেটর খুলে মুখের কাছে ধরলেন তিনি। অত রাত্রে আচমকা মুখের সামনে মোবাইল ধরাতে একটু ভয় পেয়ে গেলেও পর ক্ষণেই তাঁর ইশারা অনুসরণ করে স্ক্রিনের দিকে তাকাতে বুঝলাম, আমার ইংরেজি শুনে গুগল তাঁকে ভিয়েতনামিজ় ভাষায় অনুবাদ করে দিচ্ছে। এখানকার অর্থনীতি টুরিজ়মের উপর নির্ভরশীল, সেই কারণে এই মানুষগুলোরও পর্যটকের প্রতি মনোযোগ ও যত্ন দেখে ভাল লাগল। পরদিন ডলার থেকে

> অনেকদিনের অশান্ত মনকে ভিয়েতনামিজ় কিশোরীর মতো মিষ্টি এই শহরটা দু'হাত বাড়িয়ে আপন করে নিয়েছিল।



সমুদ্রে জাহাজের সারি



মনাস্ট্রির অন্দরে: হ্যানয়



পথের ধারে ফল বিক্রেতারা

ভিয়েতনামিজ় ডংয়ে কারেন্সি ভাঙাতে গিয়ে আলাপ ডি লি-র সঙ্গে। লি আসবে মুম্বই কয়েকদিন পরেই, সেই কারণেই ডলার নিতে আসা। কারেন্সি নেওয়ার পর নোটগুলো দেখিয়ে লি বারবার আমাকে সতর্ক করছিল, যাতে হায়ার কারেন্সির নোটের সঙ্গে লোয়ার ভ্যালুর নোট অন্যমনস্ক হয়ে গুলিয়ে না যায়, কারণ প্রায় একইরকম দেখতে 20k বা 200k জাতীয় নোটকে অসতর্কভাবে এক করে ফেলার আশঙ্কা অমূলক নয়। কেয়ারিং লি আমাকে একা ছাড়েনি। হ্যানয়ের হোয়ান কিয়েম লেকের কাছে হেঁটে যেতে-যেতে আমরা গল্প করছিলাম। কলকাতা ও ভিয়েতনামের সম্পর্ক এত গভীর ওর জানা ছিল না। লেকের ধারে তখন ঈষৎ পশ্চিমে ঢলে যাওয়া সূর্য, কিন্তু অস্তগামী নয়। উত্তর ভিয়েতনামের এই শহরকে ঘিরে রেখেছে পাহাড়, তাই নিরক্ষীয় জলবায়ুর এই দেশের অন্যান্য জায়গার মতো হ্যানয় মার্চ মাসে ততখানি উত্তপ্ত নয়। একটা শিরশিরে জলীয় হাওয়ার ভিতর আমাকে রেখে লি চলে গেল ওর গন্তব্যে। যাওয়ার আগে বলল, ''আমার স্টুডেন্টকে কাল দুপুরে তোমার কাছে পাঠাব। ওর সঙ্গে তুমি কাল লিটারেচার টেম্পল ঘুরে নিও।''

''লিটারেচার টেম্পল?'' সাহিত্যের মন্দির শুনেই দেশটার প্রতি শ্রদ্ধা যেন আরও বেশ কিছুটা বেড়ে গেল। লি বুঝেছে আমি অবাক হয়েছি। আমার বিস্ময় আরও কিছুটা জিইয়ে রেখে বলল, ''আর কিছু দ্যাখো না দ্যাখো, এটা মিস কোরো না।''

ঈশ্বর ভিয়েতনামকে রক্ষার জন্য ড্রাগন পাঠিয়েছিলেন। তাদের মুখ থেকে বের হওয়া রত্নভাণ্ডারে সমৃদ্ধ ভিয়েতনাম, এমনটাই মিথ



লাইমস্টোনের বিরাট গুহা

আমি ওকে বলেছিলাম নিজেই ঘুরে নিতে পারব একটা বাইকটুর বুক করে। লি রাজি হয়নি, বলেছিল, ''আমার স্টুডেন্টরা ইংরেজি পড়ে বটে, কিন্তু বলতে পারে না তেমন। তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলে একটু প্র্যাকটিস হবে ওদের।''
লেকের বুকে একটা লাল সেতু চলে গিয়েছে মনাস্ট্রির দিকে, সেদিকেই এগোলাম। যাওয়ার আগে লি আমার বেশ কিছু ছবি তুলে দিয়েছিল। ওকে মিস করার কথা ছিল না, তবুও করছিলাম। যা কথা থাকে না, তাই তো হয় জীবনে!
পরদিন ক্লাস করে বাইক নিয়ে হাজির তিয়ান। ওর কাছ থেকেই শুনলাম, এখানকার লোকেদের দুটো করে নাম হয়, যাতে বিদেশিদের কাছে পরিচয় দিতে সুবিধে হয়। তিয়ানের ইংরেজি নাম মাইকেল, যার বাইকে চড়ে আমি উপস্থিত হলাম লিটারেচার টেম্পলে। ১০৭০ সালে নির্মিত এই অপূর্ব স্থাপত্যের চাইনিজ় মন্দিরটি কনফুশিয়াসের উদ্দেশে নিবেদিত এবং এটিই ভিয়েতনামের প্রথম ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে মাইকেল গাইড করছিল আমায়, সব কথা মন দিয়ে শুনিনি। প্রাচীন স্থাপত্যের এই মন্দিরটি অনেকখানি জায়গা জুড়ে তৈরি। একই ক্যাম্পাসে মিউজ়িয়াম, মনাস্ট্রি ও রঙিন মাছে ভর্তি জলাশয়। মন পড়ে ছিল সেইদিকেই। বাইকপ্রধান সন্ধের হ্যানয় শহরের ট্র্যাফিক ঠেলে ফিরতে ফিরতে মাইকেল জিজ্ঞেস করল, ''তোমাদের কলকাতায় কি এরকম জ্যাম হয়?'' কলকাতায় এর তিনগুণ ট্র্যাফিক। কিন্তু সে কথা ওকে বলতে ইচ্ছে করল না, হাসলাম শুধু। ও আমাকে আরও কয়েক জায়গায় ঘোরানোর প্ল্যান করছিল পরদিন। কিন্তু ওকে জানিয়ে দিলাম হ্যালং বে-র টুর বুক করেছি। শহরের শ্রান্তি শরীরে জাঁকিয়ে বসার আগে প্রকৃতির কাছে যেতেই হবে।
হ্যানয় থেকে হ্যালং ডে ট্রিপ করা যায়, আবার থাকাও যায়। ডে ট্রিপ ক্রুজ়েই খাওয়াদাওয়া এবং পুরোপুরি সব কিছু ঘোরানোর খরচ ধরা থাকে। আমার ক্রুজ়ের গাইড সোয়াই, যার ইংরেজি নাম পিটার, আমাদের সতেরোজনের গ্রুপকে নিয়ে রওনা দিল হ্যালং। পথে পড়ল মুক্তো তৈরির ফ্যাক্টরি। মুক্তোময় একটা মিউজ়িয়াম ও শপিং



পার্ল ফ্যাক্টরিতে মুক্তো



লিটারেচার টেম্পল

কমপ্লেক্স সেরে আমরা চলে এলাম বন্দরে। সেখান থেকে ক্রুজে একাধিক দ্বীপ পেরিয়ে যাওয়া। হ্যালং বে, ভিয়েতনামের অপূর্ব এবং প্রায় সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি স্থান, ইউনেস্কো একে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের খেতাব দিয়েছে। কিন্তু এ সব তথ্য ইম্পর্ট্যান্ট নয়। চোখ ফেরাতে না পারা ১০০০-এরও বেশি কোনের মতো পাহাড়, লাইমস্টোন কেভ নিয়ে হ্যালং প্রকৃতির এক অতুলনীয় উপস্থাপনা। ক্রুজের প্রথম স্টপে সবচেয়ে বড় লাইমস্টোন কেভ। স্ট্যালাকটাইট ও স্ট্যালাগমাইটের যে এতবড় গুহা থাকতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। পুরো গুহাটিই তিনটি ধাপে বিভক্ত। খুব ভাল করে মেনটেনড এই গুহায় পর্যটকদের ভিড় থাকলেও রহস্যময়তা ও নির্জনতা টের পাওয়া যায় সকলের আড়ালে একমুহূর্ত তার গহ্বরের কাছে থেমে থাকলে। ক্রুজের দ্বিতীয় স্টপে ওয়াটার রাইড, কায়াকিং বা বাম্বু বোটিং। বাঁশের নৌকোয় দু'পাশের দুর্গম পাহাড়ের ভিতর দিয়ে একের পর এক পথ পেরিয়ে জলের ভিতর দিয়ে প্রকৃতিকে অনুভব করা প্রাণভরে। একদিকে দুর্গমতা একদিকে সৌন্দর্য, দুইয়ের টানই অমোঘ। তৃতীয় স্টপে একটি দূরতর দ্বীপের বিচে বা ট্রেক করে ওই দ্বীপেরই পাহাড়ি তলে উঠে কিছুটা সময় কাটানো। আসলে সময় কাটানো নয়, নিজেকেই সময় দেওয়া। ক্রুজের ফিরতি পথে সমুদ্রে অস্তমুখী সূর্য। ডেক তখন পর্যটকদের বিনোদনের জন্য মেতে উঠেছে। ওয়াইন গ্লাসে মিশে যাচ্ছে সূর্যের শেষ রশ্মি, সেই গ্লাস হাতে নিয়েই টেনিসন যেন বলছেন, "I will drink/ life to the lees''. আমি হ্যানয়ে ফিরব জানি। লি আছে অপেক্ষায়, মাইকেল আছে অপেক্ষায়, সন্ধের ট্র্যাফিকে ঘেরা হ্যানয়কে নিয়ে আরও আরও অনেক কিছু লেখার আছে আমার। তখনও আমি জানি না, এই হ্যানয়েই এক বৃদ্ধা আমার হাতে পরিয়ে দেবেন প্রবাল রঙের ক্রিস্টাল। মাইকেল এসে বলবে, ''আমাদের গ্রাম ভিয়েতনামের একেবারে উত্তরে। ওখানে আমার মা থাকেন। আবার এলে তুমি সেখানে যাবে তো?'' আমার মনের ভিতর তখন বব ডিলান বলছেন, দরজা খোলো হোমার...''Take care of all your memories/said my friend Mick/ For you cannot relive them/And remember when you are out of there.''

ঋণ: Ulysses: Alfred Tennyson
Open the Door Homer : Bob Dylan
ছবি: লেখক



■ ফ্রিল দেওয়া লাল ড্রেপড শাড়ি। সঙ্গে টিমআপ করা হয়েছে সিকুইন কাজ করা করসেট টপ ও ফ্লোয়ি শ্রাগ।

উৎসবের রং লাল

শক্তির প্রতীক লাল। দেবী শক্তির আরাধনায় ফ্যাশন ডিজ়াইনার সরোজ জালান ও হর্ষবর্ধন জালান-এর এক্সক্লুসিভ ফেস্টিভ কালেকশনে অভিনেত্রী তৃণা সাহার পুজোর সাজকাহন তুলে ধরলেন মৌমিতা সরকার।



■ অলওভার সুতো দিয়ে হ্যান্ড এমব্রয়ডরি করা হাইনেক টপ। সঙ্গে ক্রিসক্রস স্টাইলে ক্রুশের কাজ করা বটমওয়্যার। লো বান হেয়ারস্টাইল ও স্টেটমেন্ট গয়নায় নিউ এজ ফ্যাশন।



উজ্জ্বল লাল প্লিটেড লং স্কার্ট। সঙ্গে লাল বুস্তিয়ার এবং সূক্ষ্ম হ্যান্ড এমব্রয়ডরি করা লং ফ্লোয়ি শ্রাগ। হালকা গয়নায় বোল্ড লুক।

গয়না: ক্লোদ বাই তৃণীল

ফোন: ৮৭৭৭৫৪৯৩০৭



■ অলওভার বিডস ও সুতোর এমব্রয়ডরি কাজ করা ট্রাউজ়ার্স ও ফ্রন্ট ওপেন লং টপ, লং বেলস্লিভ স্টাইল।

ছবি: সোমনাথ রায়, **মেক-আপ:** প্রীতম দাস, **ফোন:** ৮৬২১০২০০৬১, **হেয়ার**: মৈনাক মিত্র, **স্টাইলিং:** নীল সাহা, **ফোন:** ৯৮৩৬৬৮২৯৩৩, **পোশাক:** সরোজ জালান ও হর্ষবর্ধন জালান, **ফোন:** ৯৯০৩৩৭১৮৩০, **লোকেশন ও হসপিটালিটি:** দ্য পার্ক হোটেল কলকাতা, **ফোন:** ০৩৩ ২২৪৯৯০০০, **রূপায়ণে:** মহেশ্বর মণ্ডল